খণ্ডিত ভারত

খণ্ডিত ভারত

ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার
গৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা

ানন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী
কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার
মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

মূল্য দশ টাকা

উৎসর্গ

যিনি আয়েস ও আরাম অপেক্ষা সেবা ও আত্মত্যাগই অধিক পছন্দ করিতেন, প্রাচুর্য অপেক্ষা দৈন্যই যাঁহার নিকট অধিকতর প্রিয়, প্রাসাদ অপেক্ষা কারাগার ও সিকন্দর মঞ্জিল অপেক্ষা সদাকত আশ্রমই যাঁহার নিকট প্রিয়তর স্থান—সেই ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান, গোঁড়া জাতীয়তাবাদী ও একাগ্র দেশপ্রেমিক **মজহর-উল-হকের** পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইল।

রাজেন্দ্র প্রসাদ

প্রকাশকের নিবেদন

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রণীত 'India Divided' গ্রন্থখানি ইতিমধ্যেই দেশবিদেশে সবিশেষ খ্যাতি ও সমাদর লাভ করিয়াছে। এরূপ একখানি সুবিখ্যাত গ্রন্থের বাংলা সংস্করণ প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হওয়ায় আমি গ্রন্থকারের নিকট সাতিশয় কৃতজ্ঞ। বইখানি বহু পূর্বেই প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কলিকাতায় উপর্যুপরি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই। আশা করি, গ্রন্থকার ও পাঠকসমাজ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জনা করিবেন।

অনেকেই অবগত আছেন যে, এই গ্রন্থখানি পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার দাবীর বিরুদ্ধে অকাট্য ও অখণ্ডনীয় তথ্য ও তত্ত্বের সমষ্টি। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই যে, পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইলে এই গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া যাইবে। পাকিস্থানের দাবী দুইজাতি-তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত; কংগ্রেস এবং দেশ অবস্থার চাপে পড়িয়া সাময়িকভাবে পাকিস্থান পরিকল্পনা আংশিকভাবে মানিয়া লইলেও, তাহার মূল ভিত্তি দুইজাতি-তত্ত্ব স্বীকার করিয়া লয় নাই। কাজেই পাকিস্থানের অসারতা ও অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে হইলে দুইজাতি-তত্ত্ব যে ভ্রান্তিপূর্ণ ইহা প্রমাণ করিতেই হইবে এবং তাহা করিতে গেলে সে তত্ত্বের মূলে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের যুক্তির কুঠারাঘাত ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। কাজেই দুইজাতি-তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া পাকিস্থানের যে প্রাসাদ তৈরী হইতে চলিয়াছে, যতদিন তাহা নিঃশেষে ধূলিসাৎ না হয়, ততদিন পর্যন্ত এই গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কেবলমাত্র এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই অতি বিলম্বে হইলেও গ্রন্থখানি পাঠকসমাজের নিকট উপস্থাপিত করিতে সাহসী হইলাম।

এই গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের ব্যাপারে যাঁহারা আমাকে অকুণ্ঠ সাহায্য দান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অন্যতম সহকারী সম্পাদক, সুকবি ও সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ বাজপেয়ীর নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংরাজী পুস্তক বাংলা ভাষায় প্রকাশের এই দুরূহ কার্যে ও গুরু দায়িত্ব বহনে আদ্যোপান্ত আমি তাঁহার সহযোগিতা লাভ করিয়াছি। সেজন্য তাঁহাকে আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতেছি। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র দাসকে সহকারীরূপে

পাইয়াও এ কার্যে আমার যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁ
শ্রম, চেষ্টা ও একাগ্রতার ফলেই নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বই
করা সম্ভব হইল।

পরিশেষে বক্তব্য এই, স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রন্থখা
সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল, এই অনিশ্চয়তা ও অস্বাভাবি
মধ্যে যে তাহা সম্ভব হয় নাই তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তথাপি আম
ইহাকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহা সত্ত্বেও
ঘটিয়া থাকিলে সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ যদি ভ্রমসংশোধনে সহা
তাহা হইলে অনুগৃহীত হইব।

শ্রীসুরেশচন্দ্র [illegible]

প্রকাশক

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দুইজাতি-তত্ত্ব

দ্বিতীয় খণ্ড

সাম্প্রদায়িক ত্রিভুজ

তৃতীয় খণ্ড

ভারত-বিভাগের পরিকল্পনা

চতুর্থ খণ্ড

পাকিস্থান সম্বন্ধে নিখিল-ভারত মুসলিম লীগের প্রস্তাব

পঞ্চম খণ্ড

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সম্পদ

ষষ্ঠ খণ্ড

পাকিস্থান প্রস্তাবের বিকল্প

ছক-এর সূচী

সংখ্যা-চিত্রাবলী ঃ


ভারতবর্ষ
কাশ্মীর
উত্তর পশ্চিম অঞ্চল
পাঞ্জাব
বেলুচিস্থান
সিন্ধু
রাজপুতানা
যুক্ত প্রদেশ
বিহার
পূর্ব অঞ্চল
আসাম
বঙ্গদেশ
মধ্য প্রদেশ
উড়িষ্যা
বেরার
হায়দ্রাবাদ
মহীশূর

খণ্ডিত ভারত

(এক)

দুই জাতি—পাকিস্থানের ভিত্তি

হিন্দু ও মুসলমান দুইটি স্বতন্ত্র জাতি—এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিয়া হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান রচনা এবং প্রত্যেকটি 'স্থানকে' লইয়া এক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব রচিত হইয়াছে। মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে মিঃ এম, এ, জিন্না ভারত বিভাগের এই অভিমত ব্যক্ত করেন এবং সেই অভিমতের অনুকূলে উক্ত অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। তিনি বলেন, 'জাতির যে কোন সংজ্ঞার দিক দিয়াই বিচার করা যাক না কেন, হিন্দু ও মুসলমান দুইটি স্বতন্ত্র জাতি এবং সেই কারণেই তাহাদের স্বতন্ত্র বাসভূমি, রাজ্য ও রাষ্ট্র-ভাষা থাকা একান্ত আবশ্যক।' ১ 'ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সত্যকার স্বরূপ আমাদের হিন্দু বন্ধুগণ কেন যে উপলব্ধি করিতে পারেন না তাহা দুর্বোধ্য। সঠিক শব্দগত অর্থের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক ধর্ম নয়, দুইটি স্বতন্ত্র সমাজ-ব্যবস্থা। এই দুই ভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে এক অভিন্ন জাতি তৈয়ারী করিবার পরিকল্পনা নিছক স্বপ্নবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। অখণ্ড ভারতীয় জাতি গঠনের ভ্রান্ত প্রচেষ্টা সীমা অতিক্রম করিয়াছে; আমাদের অধিকাংশ গোলযোগের মূলীভূত কারণ ইহাই এবং সময় থাকিতে এই ধারণা আমরা যদি পরিবর্তন করিতে না পারি, তাহা হইলে ইহাই শেষ পর্যন্ত ভারতকে ধ্বংসের মুখে টানিয়া লইয়া যাইবে। হিন্দু ও মুসলমান দুইটি স্বতন্ত্র ধর্ম-বিশ্বাস, সমাজ-ব্যবস্থা ও সাহিত্যধারার অধীন। তাহারা একে অপরের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় না, একত্র পানাহার করে না; বস্তুতঃ তাহারা এমন দুইটি পৃথক সভ্যতার অধিকারী, যাহাদের আদর্শ ও ধারণা মূলতঃ পরস্পর-বিরোধী। জীবন সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হিন্দু ও মুসলমান যে, ইতিহাসের দুইটি ভিন্ন উৎস হইতে অনুপ্রেরণা আহরণ করে—ইহা তো অতি সুস্পষ্ট। তাহাদের মহাকাব্য ভিন্ন, মহাকাব্যের আদর্শ চরিত্র ও ঘটনাবলী ভিন্ন। অনেক ক্ষেত্রে একের প্রধান চরিত্র অপরের নায়কের পরম শত্রু; এমন কি, একের জয়-পরাজয় পর্যন্ত অন্যের বিপরীত। এইরূপ দুইটি জাতি—যাহাদের একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ ও অপরটি সংখ্যাগরিষ্ঠ, যদি এক অখণ্ড রাষ্ট্র গঠনের

1. Recent speeches and writings of Mr. Jinnah.—P. 155.

উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহার ফলে অসন্তোষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং সেই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে কোনরূপ শাসনতান্ত্রিক কাঠামোই রচিত হোক না কেন, পরিশেষে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।'২

একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়াই 'কনফিডারেসী অব্ ইণ্ডিয়া' নামক এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের ১৫০—১৫১ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, "আমাদের পূর্ব আলোচনা হইতে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, হিন্দু ও মুসলমান দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা। তাহাদের সভ্যতা সুস্পষ্টরূপে বিভিন্ন এবং যদিও একের দ্বারা অপরে কিছুটা পরিমাণ প্রভাবান্বিত হইয়াছে, তথাপি কেহ কাহারও মধ্যে আপন বিশিষ্ট সত্তা বিসর্জন দিতে পারে না। তাহাদের আচার-ব্যবহার, সমাজপদ্ধতি, নীতি-শাস্ত্র, ধর্ম-রাজনীতি ও কৃষ্টিগত আদর্শ, ভাষা, সাহিত্য ও জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী শুধু বিভিন্নই নয়, পরস্পর-বিরোধী। তাহাদের উভয়ের জীবনের এইসব বিরুদ্ধ ও বিচিত্র উপাদান দিয়া এক অখণ্ড জাতি গঠিত হইতে পারে না। পরস্পরের সম্বন্ধে অবিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি এইগুলি হইতেই। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য, তাহাদের অতীত ও বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্মৃতি এবং বিগত এক সহস্র বৎসর ধরিয়া পরস্পরের প্রতি অনুষ্ঠিত অত্যাচার তাহাদের মধ্যে অলঙ্ঘ্য সাগর ব্যবধান রচনা করিয়াছে। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কোন সাধারণ বন্ধন যদি থাকিয়া থাকে, তবে তাহা বিগত কয়েক শতাব্দীর বৈদেশিক শাসন-শৃঙ্খল। বিদেশী শাসনের প্রতি আনুগত্যের সাধারণ বন্ধন-শৃঙ্খল যে মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে, সেই মুহূর্তেই তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের পরস্পরগত পার্থক্যসমূহ—যাহা বর্তমানে খু[illegible] প্রকট নয়—অথচ হওয়া উচিত, তাহা স্পষ্টতর হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে।"৩

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ জাফরুল হোসেন ও মোহম্মদ আফজল হোসেন কোয়াদ্রী ভারত বিভাগের পরিকল্পনাসম্বলিত যে প্রচার-পুস্তিকা লিখিয়াছেন, তাহার দাবীও এই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের বক্তব্য বিষয় হইতে কম বলশালী নয়। তাঁহারা বলেন, "ইহার (অর্থাৎ, ১৯৩৫ সালের গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের) প্রধান ত্রুটিই হইল এই যে, মুসলমানগণ হিন্দু হইতে যে একটা সম্পূর্ণ পৃথক জাতি, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ পরস্পর-বিরোধী এবং তাহারা কোনদিনই হিন্দু বা অ-হিন্দু অথবা তথাকথিত যে কোন এক জাতিতে পরিণত হইতে পারে না—এই অনস্বীকার্য সত্যটি ইহাতে স্বীকৃত হয় নাই।" আর এক স্থানে লিখিতেছেন, "আমরা ভারতীয় মুসলমানগণ এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর যে, আমাদের অন্যান্য আরও অনেক দাবীর মধ্যে মুসলমানগণের স্বতন্ত্র জাতিত্বের দাবী অতিশয় দৃঢ়তা ও ধৈর্য সহকারে নিত্য নিরন্তর আমাদিগকে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। হিন্দু ও অন্যান্য অ-মুসলমান সম্প্রদায় হইতে তাহাদের জাতীয়

2. Ibid, Page 153.
3. Confederacy of India, by 'A Punjabi,' Pp. 150-151.

সত্তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাস্তবিক পক্ষে, সুদেতান জার্মাণদের সহিত 'চেক্'দের যে পার্থক্য, হিন্দুদের সহিত তাহাদের পার্থক্য তাহা হইতেও গভীরতর।" ৪

এল্, হামজা 'Pakistan—A Nation' নামক তাঁহার স্বরচিত পুস্তকে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, (১) ভারতবর্ষ একটি দেশ নয়, ভিন্ন ভিন্ন মানব পরিবারের পরিবেশ লইয়া গঠিত বহু দেশের সমষ্টি, (২) ইহার অধিবাসিগণের মধ্যে কৃষ্টি ও গোষ্ঠীগত পার্থক্য এত বেশী যে, জাতির আধুনিক রাজনৈতিক অর্থের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, তাহারা এক জাতিরূপে পরিগণিত হইতেই পারে না; বস্তুতঃ তাহারা বহু স্বতন্ত্র জাতির সমবায়ে গঠিত। এই পার্থক্য দেখাইতে গিয়া তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাস কাব্যের কোঠায় গিয়া পৌঁছিয়াছে:—'হিন্দু-ধর্ম জন্মিয়াছে মৌসুমী অঞ্চলে, আর ইসলামের জন্ম মরুভূমিতে।' ৫ 'ভারতবর্ষে বাহন হিসাবে উষ্ট্রের প্রচলনই বোধ হয় একটি মাত্র ঘটনা যাহা হইতে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়।' ৬ "ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক প্রভৃতি চিন্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উষ্ট্রের সহিত আমাদের সম্পর্ক এত বহুল ও বিচিত্র যে, তাহাদেরই আলোকসম্পাতে সভ্যতার বিবর্তনের একটি যুগের ইতিহাস আমরা অধ্যয়ন করিতে পারি। ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশের যে বিপুল রূপান্তর জাতীয় অনুপ্রেরণারূপে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া খণ্ডে জন্মলাভ করিয়া, তাহার প্রবাহমুখে তৎকালীন পরিচিত পৃথিবীর প্রায় সমগ্র অংশ প্লাবিত করিয়াছিল, উষ্ট্রকে তাহার প্রতীকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আরবীয় অভ্যুত্থানের সেই বিচিত্র বর্ণচ্ছটা কালের দূরত্বের দরুণ যদিও কিছুটা অস্পষ্ট ও আবছা হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি কয়েক শতাব্দী পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আজও আমরা তাহা অবলোকন করিতে পারি; আমরা দেখিতে পাই শতাব্দীব্যাপী সেই বিচিত্র বিজয় অভিযান মরুভূমির উত্তপ্ত বায়ু-তাড়িত বালুকাকণার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া চলিয়াছে উষ্ট্রপৃষ্ঠে। আরবীয় মহত্ত্বের সেদিন আজ আর নাই কিন্তু বিস্তীর্ণ মরু-অঞ্চলের বিশিষ্ট জগতে উষ্ট্র আজও তাঁহার অধিবাসিগণের ধর্ম ও সংস্কৃতির ঐক্যের প্রতীকরূপে মানুষের নিত্য-সহচর হইয়া বিরাজ করিতেছে। উষ্ট্রের বাসভূমি আজিও সিমিটার ও টাম্বুরাইন, মসজিদ ও মুয়েজ্জিন, মিনার ও গম্বুজের দেশ।" ৭ উষ্ট্র অথবা ঐ জাতীয় কোন পদার্থের প্রাচুর্যের উপর ভিত্তি করিয়া ভারত বিভাগের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা যে কত অসার ও অসংলগ্ন, লেখক তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন এরূপ ভাব প্রকাশ করিতে তিনি নারাজ। আরবের মত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেও উষ্ট্র অধিক সংখ্যায় দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু ভারতের অন্য এক স্থানে রাজপুতানায় তাহার সংখ্যা উহা হইতে আদৌ কম নয়; অথচ রাজপুতানা 'সিমিটার ও টাম্বুরাইন, মসজিদ ও মুয়েজ্জিন, মিনার ও গম্বুজের' দেশ নয়। এই যুক্তি যদি মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ভারতের পূর্বাঞ্চল পৃথক করিবার

4. El. Hamza: Pakistan—A Nation. Page 7.
5. Ibid, Page 45.
6. Ibid, Page 70.
7. Hamza, Op. Cit, Page 72.

কোন হেতুই থাকে না, কারণ গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত বলিয়া তথাকার উদ্ভিদ ও প্রাণী, শ্যামল ক্ষেত্র এবং নিদারুণ ও দীর্ঘস্থায়ী মৌসুমী বায়ুর প্রভাব সমস্তই সেই মণ্ডলের উপযোগী এবং সেই যুক্তিবলেই গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত মালয় ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল মুসলমান-অধ্যুষিত হওয়া অনুচিত।

ভৌগোলিক অথবা অনুরূপ অন্য কোন যুক্তির ভিত্তিতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল লইয়া পাকিস্থান রচনার যে প্রস্তাব, মিঃ এফ্, কে, খাঁন দুরাণী তাহার অসারতা ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছেন; তাই তাঁহার 'The Meaning of Pakistan' নামক স্বরচিত পুস্তকে তিনি বলিতেছেন, "সমস্ত মুসলমানই, তা তাঁহারা পাকিস্থানের অধিবাসীই হোন, অথবা হিন্দুস্থানের অধিবাসীই হোন এক জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং আমরা যাহারা পাকিস্থানে বাস করি, আমাদের হিন্দুস্থানের অধিবাসী স্বধর্মাবলম্বী ভ্রাতৃগণকে অখণ্ড ইসলাম সমাজ-দেহের রক্ত-মাংসরূপে গণ্য করিব।" ৮

এল্, হামজার যুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বলেন, 'Pakistan —A Nation' নামক গ্রন্থের লেখক তাঁহার সমস্ত যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন শুধু একটিমাত্র বক্তব্যের উপর এবং তাহা হইতেছে এই যে, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান লইয়া সমগ্র উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ভারতের অবশিষ্ট অংশের ভৌগোলিক অবস্থান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কতকগুলি প্রদেশে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে। কোন কোন প্রদেশের প্রধান খাদ্য গম, আবার কাহারও কাহারও প্রধান খাদ্য চাউল। মৌসুমী অঞ্চল উদ্ভিদবহুল, অন্যান্য অঞ্চল উদ্ভিদ-বিরল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অনুর্বর শুষ্ক অঞ্চল উষ্ট্রের আবাসস্থান এবং আসাম, বাংলা ও সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের সিক্ত মৃত্তিকা দুর্মদ হস্তীর সূতিকাগার। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কঠোর ও কর্কশ ভূমি এমন এক জাতীয় মানুষের জন্মদাত্রী যাহাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অন্যান্য অঞ্চলের কৃষ্ণকায় মানুষদের স্বভাবধর্ম হইতে অনেকাংশে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভারতবর্ষের ন্যায় বিস্তীর্ণ দেশে যে সব ভিন্ন ভিন্ন মানব-গোষ্ঠী বাস করে, তাহাদের আবাসস্থান আস্তৃত রহিয়াছে বিভিন্ন অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে; তাহার কোথাও পর্বতের, কোথাও সমুদ্রের, আবার কোথাও বা মরুভূমির প্রভাবে পরিপুষ্ট; এরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন জিনিস ও জাতিসমূহের প্রাকৃতিক বিভিন্নতা অপরিহার্য। মুসলিম ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এই জাতীয় যুক্তি একেবারে অপ্রাসঙ্গিক, কারণ এই যুক্তি অনুসরণ করিয়া যদি আমাদিগকে চলিতে হয়, তাহা হইলে নিজেদের যুক্তিবলেই মুসলমানসমাজের এমন এক বিরাট অংশকে আমরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইব—যাহারা পাকিস্থানের বহির্ভূত অঞ্চলের অধিবাসী, যাহাদের বেশ-ভূষা ও আহার্য আমাদের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহাদিগকে বিজাতীয়রূপে গণ্য করিতে আমরা বাধ্য হইব, তাহাদের সহিত না থাকিবে আমাদের সাধারণ স্বার্থগত কোন সম্পর্ক, না থাকিবে জীবনযাপন-প্রণালীর কোন সামঞ্জস্য। এরূপ একটা প্রস্তাব পাকিস্থানের কোন মুসলমানই এক মুহূর্তের জন্যও মানিয়া লইতে

৮. F. K. Khan Durrani: The Meaning of Pakistan, Page viii,

পারে না। বস্তুতঃ পাঞ্জাবের প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য, এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণের অযোগ্য বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করা।" ৯

এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিবার জন্য আরও অনেকে, বিশেষ করিয়া ডাঃ আম্বেদকর ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বহু নজির আহরণ করিয়া তাঁহার 'Thoughts on Pakistan' নামক গ্রন্থে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ভারতের মুসলিম শাসনকর্তা ও আক্রমণকারিগণ কিরূপে সহস্র সহস্র হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিয়াছেন, দেববিগ্রহ চূর্ণ করিয়াছেন, ভগ্ন মন্দিরের মাল-মসলা লইয়া সেই স্থানেই বা অন্যত্র মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন; কেমন করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের অধিকার-সীমার অন্তর্গত হিন্দুদিগের সম্মুখে এক হাতে কোরাণ ও অপর হাতে তরবারি লইয়া দাঁড়াইয়া উভয়ের যে কোন একটি বাছিয়া লইতে বলিয়াছেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে, কিরূপে হাজার হাজার হিন্দুকে তাঁহারা নির্যাতিত করিয়াছেন—নিহত করিয়াছেন। এই সব ঘটনা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই সমস্ত নির্যাতনের কাহিনী হিন্দুরা আজিও বিস্মৃত হয় নাই এবং কখনও হতে পারিবে না—ইহা হিন্দুদিগের চিত্তে যে গভীর রেখাপাত করিয়াছে, তাহা অনপনেয়। তিনি আরও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, মসজিদের সম্মুখে গীতবাদ্য অথবা গোহত্যারূপ অতি তুচ্ছ ঘটনা অবলম্বন করিয়া যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে, তাহা হইতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরাতন বৈরিতা আজিও বিদ্যমান এবং দুইশত বৎসরের ইংরাজ শাসন বা সাধারণ দাসত্বের দুর্ভাগ্য আজও তাহাদিগকে মিলিত করিতে পারে নাই।

এই হেতুতে ভারতকে খণ্ডিত করিয়া হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান রচনার প্রস্তাব যাঁহারা সমর্থন করেন, তাঁহারা চান, খণ্ডিত ভারতের দুইটী অংশকে দুইটী পৃথক সম্প্রদায়ের হস্তে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিতে। আমাদের পক্ষে কিন্তু এইরূপ যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য।

তাঁহারা ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, আর্টের দিক হইতে এই বর্বরতা ও ধর্মের দিক হইতে এই কলুষতার কার্য ইসলাম ধর্মের অনুমোদিত। ইসলাম ধর্ম অতীতে যদি এই সব কার্য সমর্থন করিয়াই থাকে, তাহা হইলেও ভবিষ্যতে যে সে তাহা আর করিবে না—একথা কি জোর করিয়া বলা যায়? এই দিক দিয়া ইস্‌লামের মতি-গতির যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহারই বা প্রমাণ কি? আরবের ধর্মগুরু মহম্মদের ধর্মশিক্ষার সহিত ইহার সম্পর্ক মাত্র না থাকা সত্ত্বেও কোন কোন উচ্চাভিলাষী ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে, ইসলাম ধর্মের আবরণে আত্মগোপন করিয়া যদি এই সব অনাচারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতেও যে ঐরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির আবির্ভাব হইবে না এবং তাঁহাদের অর্জিত শক্তির অনুরূপ অপব্যবহার তাঁহারা করিবেন না—সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কি? তাঁহারা কি এই কথাই বলিতে চান যে, খণ্ডিত ভারতের স্থানে স্থানে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হোক এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যে সব অমুসলমান তাঁহাদের অধিকার-সীমার অধিবাসী হইবেন, তাঁহারা নিরবচ্ছিন্নভাবে নিপীড়িত ও নিগৃহীত

9. Durrani, Op. Cit.,—Pp. 1-2.

হইতে থাকুন? ইহাই যদি তাঁহাদের প্রামাণ্য বিষয় হয়, তাহা হইলে কোন অমুসলমান এইরূপ পরিকল্পনার পক্ষপাতী হইবেন—সে আশা করা তাঁহাদের পক্ষে অন্যায়।

আর ইসলাম ধর্মের ইহা যদি শিক্ষণীয় বিষয় না হয়, পক্ষান্তরে ইহা যদি তাহার শান্তিপ্রিয়তা ও সহনশীলতার মৌলিক শিক্ষার পরিপন্থী হয়, তাহা হইলে অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে এই সব দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া আজ আবার তাহা মুসলমান ও অমুসলমানদের দৃষ্টির সম্মুখে নূতন করিয়া তুলিয়া ধরা কি বাঞ্ছনীয়? সব সাধারণের কল্যাণের জন্য যে-সব তিক্ত স্মৃতি বিস্মৃত হওয়াই শ্রেয়স্কর, তাহাদিগকে পুনর্জাগরিত না করিয়া তাহা হওয়া কি সম্ভবপর? ইসলাম ইতিহাসের এক কলঙ্ককর অধ্যায়রূপে মুসলমানদের ইহা বিস্মৃত হওয়া কর্তব্য; কারণ ইসলাম ধর্মের সমর্থন না থাকা সত্ত্বেও, ইসলামের নামে যাঁহারা এই সব অনাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা ইসলামকে কলঙ্কিতই করিয়াছেন; বস্তুতঃ ধর্ম প্রচার তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল স্বার্থ-লোলুপতার চরিতার্থতা; কারণ ধর্মপ্রচারের জন্য প্রয়োজন ইহা হইতে পবিত্রতর ও মহত্তর পন্থার; এবং অমুসলমানগণেরও ইহা ভুলিয়া যাওয়া প্রয়োজন, কারণ, ভুলিতে পারিলে ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত অত্যাচারের দুঃস্বপ্ন বিভীষিকা তাহাদের মন হইতে মুছিয়া যাইবে; ফলে প্রভাত হইবে পারস্পরিক সদিচ্ছা ও সম্প্রীতির নবযুগ, দীর্ঘতর হইবে তাহার স্থিতিকাল, দীপ্ততর হইবে তাহার আলোক।

এই সব দৃষ্টান্ত দ্বারা যাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হয়, মুসলমান ও অমুসলমানগণ যদি তাহাই মুসলমান শাসনের স্বরূপ বলিয়া আংশিকভাবেও গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অতীতে মুসলমানগণ যে উপায়ে অত্যাচার করিবার অধিকার অর্জন করিয়াছেন, বর্তমানেও তাঁহাদিগকে ঠিক অনুরূপ উপায়ে সে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। যে-সব ক্ষেত্র হইতে এই জাতীয় দৃষ্টান্ত আহৃত হয়, সেখান হইতেই অন্যবিধ উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, সে যুগের মুসলমানগণ তাঁহাদের সমসাময়িক অমুসলমানদের সম্মতি ও সমর্থনক্রমে সে অধিকার অর্জন করেন নাই। ইতিমধ্যে ঘটনাবহুল দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতের মুসলমান ও অমুসলমানগণের পারস্পরিক মনোভাবের কোন পরিবর্তন যদি ঘটিয়া না থাকে, তাহা হইলে যে উৎপীড়ন বিশ্বের সমস্ত সভ্য জাতির নিন্দার্হ—এমনকি ভারতীয় মুসলমানগণের নিকটেও যাহা নিন্দনীয়, ভারতীয় অমুসলমানগণ নিজেদের উপর তাহার অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছায় সম্মতি দিবেন, শুধু এই দিক দিয়াই বা তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্তিত হইবে কেন? এইরূপ কার্য হয় ইসলামের বিধিসম্মত নয় বিধি-বহির্ভূত। যদি বিধিসম্মত হয়, তাহা হইলে কোন অমুসলমানই 'বিশুদ্ধ ইসলামীয় পন্থায় বিশ্ববিপ্লবের আদর্শ সম্বলিত এমন কোন ইসলাম রাষ্ট্র গঠনে' ১০ সম্মতি দিতে পারেন না যাহার সাহায্যে অত্যাচারের পুনরনুষ্ঠানের পথ অণুমাত্র প্রশস্ত হইতে পারে। কারণ উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহ হইতে ইহা

10. A Punjabi, Op. Cit.—Pp. 269-70.

স্বচ্ছন্দে ধরিয়া লওয়া যায় যে, এই জাতীয় ইসলাম রাষ্ট্রের অধীনে অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিবেই। আর যদি বিধি-বহির্ভূত হয়, তাহা হইলে অতীতের স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করিয়া কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যই সাধিত হইবে না। ইহার দ্বারা অমুসলমানগণের চিত্তের তিক্ততা বৃদ্ধি পাইবে মাত্র; ভারত বিভাগ সমর্থন করুন বা না করুন, অকারণ তিক্ততা বর্ধন কাহারও উদ্দেশ্য হইতে পারে না। এইরূপ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিবার উদ্দেশ্যে যদি ইহাই প্রমাণ করা হয় যে. অতীতের আচরণ স্মরণ করিয়া হিন্দু ও মুসলমান একত্র বসবাস করিতে পারে না, অতএব তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে, তাহা হইলে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইহার ফল ঠিক বিপরীতও ঘটিতে পারে। ঠিক এই কারণেই হিন্দুগণ উৎপীড়িত হইবার জন্য তাহাদের লক্ষ লক্ষ স্বধর্মাবলম্বীদিগকে মুসলমান অধিকৃত অঞ্চলে ফেলিয়া রাখিতে সম্মত নাও হইতে পারেন। বাস্তবতার দিক দিয়া এই প্রশ্নের বিচার করিতে গেলে এই ধরণের উদাহরণ ও উদ্ধৃতির কোন মূল্যই থাকে না।

তাহা ছাড়া, এই জাতীয় দৃষ্টান্তের বাস্তব উপযোগিতার কথা ছাড়িয়া দিলেও. সুদূর অতীতে অথবা আধুনিক যুগে লিখিত পুস্তকের শুষ্ক ও নীরস পত্র হইতে তাহাদিগকে আহরণ করা যে অতিশয় পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্য-সাধ্য ব্যাপার তাহাও নয়। অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ হইয়া আসিয়াছে রাজা ও দিগ্বিজয়ীদিগের জীবনী, তাঁহাদের কীর্তি ও অপকীর্তি, সংগ্রাম ও বিজয়, দরবারের ঐশ্বর্য ও প্রাসাদের অভিসন্ধি। এই সকল গ্রন্থের লেখকগণ সেই সব সাধারণ মানুষের প্রতি মোটেই মনোযোগ দেন নাই—যাহারা কৃষি অথবা কুটীরশিল্পকে আশ্রয় করিয়া শান্তিপূর্ণ গতানুগতিক জীবন যাপন করিত। একটা জাতির ইতিহাস রচনা করিতে গেলে জ্ঞানী ও ঋষিকল্প ব্যক্তি, শিক্ষিত ও সমাজসংস্কারক, ধার্মিক ও ধর্মপ্রচারক, কবি ও দার্শনিক, শিল্পী ও সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিগণের জীবনী ও জীবন-সাধনার উপর যে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা কর্তব্য, এই সকল গ্রন্থে তাহা আদৌ করা হয় নাই। বিজয়ী ও নৃপতিগণের পারিষদরূপে এই গ্রন্থকর্তা-দিগের তাঁহাদের প্রভু তথা প্রভুধর্ম ইসলামের প্রতি কিছুটা কর্তব্য ছিল এবং সেই কর্তব্যবোধের বশেই তাঁহারা সচেষ্ট হইলেন ইসলামের জয়গান ও প্রভুর ধর্মানুরাগের কথা জাহির করিয়া অন্নদাতার মনস্তুষ্টি করিতে। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণা পোষণ করার ফলে তাঁহারা বুঝিলেন, বিধর্মিগণের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের দ্বারাই ইসলামের মহত্ত্ব ও স্বধর্মের প্রতি অনুরাগ সার্থকরূপে সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। তাই বিস্তৃত বিবরণসহ সেই অত্যাচারের কাহিনী তাঁহারা এমন সবিস্তারে বিবৃত করিয়া গেলেন যে, তঁাহাদের রচিত ইতিহাস পরবর্তী মুসলমান শাসকগণের আদর্শ ও শাসিত জাতিসমূহের আশঙ্কাস্থল হইয়া রহিল। এই সকল ঘটনা মিথ্যা বা অতি-রঞ্জিত বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে হইবে এমন কথা আমরা বলিতেছি না; আমরা শুধু বলিতে চাই, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এগুলি ছাড়াও আরও অনেক ঘটনা

আছে যাহা সমভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু ও মুসলমান কিরূপে শত শত বৎসর ধরিয়া পরস্পরের সুখ-দুঃখের অংশভাগীরূপে একত্র বসবাস করিয়াছে; কিরূপে এক সম্প্রদায়ের সাধু ও মহাত্মাগণের চরিত্র অপর সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠান, জীবন ও পরিবেশ প্রভাবান্বিত করিয়াছে, গড়িয়া তুলিয়াছে; জন্ম ও বিবাহ সম্বন্ধীয় উৎসবানুষ্ঠানে একই প্রদেশবাসী হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে কেমন পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য দেখা যায়, অথচ সেই ব্যাপারে ভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দু ও হিন্দু এবং মুসলমান ও মুসলমানের মধ্যে কিরূপ প্রচুর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়; হিন্দু সম্প্রদায় হইতে যাঁহারা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যাধিক্যের পক্ষে মুসলমান নরপতি ও বিজেতৃগণের অগ্নি ও তরবারি অপেক্ষা ইসলামের সাধু মহাত্মাগণের পবিত্র প্রভাব যে অধিক কার্যকরী, ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে যদি এই সকল দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া একত্র করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, অত্যাচার ও উৎপীড়নের কাহিনী অপেক্ষা অনেক অধিক স্থান তাহারা অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। যে সকল ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে পূর্বোক্ত ঘটনাসমূহ উদ্ধৃত হয় এবং যাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তক রচিত হইয়া থাকে তাহাদের পত্রসংখ্যার সহিত শেষোক্ত রূপ ঘটনা-সম্বলিত পুস্তকের পত্রসংখ্যার আপেক্ষিক তুলনা যদি করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, এতদুভয়ের অনুপাত জনসাধারণের সংখ্যার সহিত নৃপতি ও পারিষদ, শাসক ও সেনাপতি, প্রাসাদ ও অন্তঃপুরের সংখ্যাগত অনুপাতের সহিত সমতাসম্পন্ন। জীবনের শান্তিপূর্ণ দিনের সদিচ্ছা ও সদনুষ্ঠান, সম্প্রীতি ও সহনশীলতা, সংঘর্ষ ও সংগ্রাম, দাঙ্গা ও দুর্বৃত্ততা, হত্যা ও লুণ্ঠন প্রভৃতি সম্প্রদায়গত পারস্পরিক উৎপীড়নের সহিত যে অনুপাত রক্ষা করে ইহাদের উভয়ের আনুপাতিক মান তাহার সহিত অবিকল সমতুল্য। অথচ তাহা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের সংবাদ যে পরিমাণ স্থান জুড়িয়া থাকে, সাম্প্রদায়িক ঐক্যের সংবাদ দ্বারা অধিকৃত স্থানের তাহার সহিত তুলনাই হয় না। সংবাদপত্র দ্বারা পরিবেশিত এই সমস্ত খবর উদ্ধৃত করিয়া ও তাহাদেরই উপর ভিত্তি করিয়া পাঁচ শত বৎসর পর যদি বর্তমান যুগের ইতিহাস রচনার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে অনায়াসে প্রমাণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে যে, এমন কি বৃটিশ আধিপত্যের আশ্রয়ে রহিয়াও ভারতবাসীদের একটি দিনও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে অতিবাহিত হয় নাই। যদি কোন একটা জাতির সম্পূর্ণ ও পূর্ণাবয়ব ইতিহাস রচনা করিতে হয়, তাহার সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও তদ্দ্বারা জাতির জীবনে অঙ্কিত গভীর ও স্থায়ী রেখাপাত যদি রূপায়িত করিয়া তুলিতে হয় জাতির আঙ্গিক রচনায় তাহার অদৃশ্য ও অননুভাব্য প্রভাব যদি পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে যথেষ্ট ও যথোপযুক্ত উপাদান ব্যতিরেকে তাহা করা সম্ভব নয়।

(দুই)

জাতি ও রাষ্ট্র

মুসলমানগণ ভারতবর্ষ নামক ভৌগোলিক অবস্থানের অন্যান্য সমস্ত অধিবাসীবৃন্দ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক জাতি—এই যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়াই উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবী প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য জাতি বলিতে কি বুঝায় সে কথা আমাদের সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়া রাখা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক একত্ব অনস্বীকার্য, কারণ ভূগোলের পরিবর্তন সাধন করা মানুষের সাধ্যাতীত। বস্তুতঃ মিঃ এফ, কে, খাঁন দুরাণী স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন. "পক্ষান্তরে ডাক্তার বেণীপ্রসাদের সহিত এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত যে 'অখণ্ড ভৌগোলিক অবস্থানরূপে পরিগণিত হইবার পক্ষে ভারতবর্ষের ন্যায় সাগর ও পর্বতের সীমারেখা দ্বারা এমন সুস্পষ্ট-রূপে পৃথকীকৃত স্থান পৃথিবীতে আর নাই।' বিভিন্ন জাতি, বিচিত্র জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা সত্ত্বেও সুলেমান পর্বতমালা হইতে আসামের পার্বত্য অঞ্চল, হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই দেশ এক অখণ্ড ভৌগোলিক সত্তা।" ১

তাহা হইলে এখন আলোচনা করিয়া দেখা যাক্, জাতি বলিতে কি বুঝায়। জাতি গঠনের উপাদান কি? ভারত বিভাগের পরিকল্পনার সমর্থকগণ এ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন ও তাহার উত্তর দিয়াছেন এবং প্রদত্ত উত্তরের পোষকতায় মনীষাসম্পন্ন গ্রন্থকারদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। মিঃ দুরাণী এই প্রশ্নটি সবিস্তারে পর্যালোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হইয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। '(১) ভৌগোলিক দিক দিয়া ভারতবর্ষ অখণ্ড সত্য. কিন্তু জাতির দিক দিয়া ইহার অধিবাসীরা তাহা নয় এবং জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে মানুষই প্রয়োজনীয়. ভূগোল নয়।......রেণাঁর ভাষায় বলিতে গেলে, "মানুষের সজীব প্রাণোচ্ছ্বাস নদীর প্রবাহ বা পর্বতমালার প্রসারের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইতে পারে না। ভূমি যোগায় সেই অধঃস্তর যাহার উপর রচিত হয় মানুষের কর্মক্ষেত্র ও রণক্ষেত্র, মানুষ যোগায় প্রাণ; জাতি বলিতে আমরা যাহা বুঝি, মানুষ সেই স্বর্গীয় সামগ্রীর সবখানি। বাস্তব প্রকৃতির কোন অংশই তাহার গঠনে কার্যকরী নয়।" (২) বস্তুতঃ গোষ্ঠীও ভূগোলের মত জাতি গঠনের পক্ষে বা বিরুদ্ধে চূড়ান্ত নিয়ামক নয়......(৩) হিন্দু নেতৃবৃন্দ প্রায় দুই দশক ধরিয়া প্রচার করিয়া আসিতেছেন, ধর্মকে রাজনীতির সহিত জড়িত না করিয়া কেবলমাত্র রাজনীতির উপর ভিত্তি করিয়াই এক সম্মিলিত জাতি গঠন করা কর্তব্য। কিন্তু কেবলমাত্র রাজনৈতিক ভিত্তিতেই জাতি গঠন কি সম্ভবপর? রাজনৈতিক চিন্তা-বিদ্‌গণ বলেন, জাতি গঠনের পক্ষে কেবলমাত্র রাজনৈতিক বন্ধনই যথেষ্ট নয়।' ২ তাঁহার এই যুক্তির সমর্থনে তিনি লর্ড ব্রাইস ও প্রোফেসার সিজ্‌উইকের উক্তি

---

1. F. K. Khan Durrani, The Meaning of Pakistan, P. 2.
2. Ibid.—Pp. 4-6.

উদ্ধৃত করিয়াছেন। সিজউইক বলেন, "যে রাজনৈতিক সমাজের মধ্যে একই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ছাড়া একত্ববোধের আর অন্য কোন বন্ধন বিদ্যমান নাই, তাহার অবস্থা অসন্তোষজনক ও অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী। বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ অসন্তোষের দরুণ মাঝে মাঝে যে আঘাত ও আলোড়ন আসিবে তাহা প্রতিরোধ করিবার মত পর্যাপ্ত ঐক্যবল এরূপ সমাজের নাই। অতএব আমাদের মতে কোন একটি রাষ্ট্রের সভ্যগণের মধ্যে 'জাতি' শব্দটি অস্পষ্টভাবে যাহা ইঙ্গিত করে—তাহার অতিরিক্ত বন্ধন থাকা উচিত।" ৩ সিজউইক আরও বলেন, "রাষ্ট্র বলিতে শুধু শাসনতান্ত্রিক কাঠামোই নয়, জাতিও; সুতরাং আধুনিক ধারণাসম্মতভাবে রাষ্ট্র হইতে গেলে তাহার সভ্যদের শুধু এই বোধ থাকিলেই চলিবে না যে. তাহারা একই শাসনযন্ত্রের অধীন; ইহা ছাড়াও, তাহাদের এ চেতনা থাকাও একান্ত অপরিহার্য যে, তাহারা একে অপরের এবং একই প্রতিষ্ঠানের সদস্য। তাহা যদি থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধ বা বিপ্লবের ফলে তাহাদের শাসন-যন্ত্র যদি চূর্ণ হইয়াও যায়, তথাপি তাহারা সংহত ও দৃঢ়সন্নিবদ্ধ হইয়া টিকিয়া থাকিতে পারিবে। এই চেতনা যদি তাহাদের থাকে. তাহা হইলে অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও জাতি হিসাবে গণ্য হইবার তাহারা যোগ্য।" ৪ জাতির সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া লর্ড ব্রাইস বলেন. "জাতি বলিতে এমন কতকগুলি লোকের সমষ্টিকে বুঝায় যাহারা কতকগুলি সাধারণ ভাবাবেগের দ্বারা আকৃষ্ট ও আবদ্ধ। ইহাদের মধ্যে জাতিগত ও ধর্মগত ভাবানুভূতিই যদিচ প্রধান, তথাপি একই ভাষার ব্যবহার, এক সাহিত্য সম্পদের অধিকার, অতীতে অর্জিত একই গৌরব ও দুঃখ বরণের স্মৃতি. এক আচার-ব্যবহার, আদর্শ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হওয়ার ফলে যে একত্ববোধ জন্মে, তাহার অস্তিত্বও একান্ত প্রয়োজন। কখনও এই সমস্ত ভাবাবেগের সবগুলি বন্ধনই বিদ্যমান থাকে, আবার কখনও বা তাহাদের দুই একটির অভাব ঘটিয়া যায়। এই বন্ধন শৃঙ্খলের সংখ্যা যেখানে যত অধিক. একত্ববোধ সেখানে তত বেশী প্রবল। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই বন্ধনের বলীষ্ঠতার চূড়ান্ত পরীক্ষা শৃঙ্খলের সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করে না—নির্ভর করে. এককভাবে প্রতিটি গ্রন্থির দৃঢ়তার উপর।" ৫ আরও কয়েকজন মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করিবার পর মিঃ দুরাণী এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন যে, 'জাতিত্ববোধ মনোজগতের একটা সচেতন অবস্থাবিশেষ মাত্র।' ৬ তাঁহার এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে ডাক্তার আম্বেদকরের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিতেছেন. "এই চৈতন্যবোধ একদিকে যেমন ইহার দ্বারা প্রবুদ্ধ ব্যক্তিগণকে এমন নিবিড়ভাবে বাঁধিয়া রাখে যে, অর্থনৈতিক অসাম্য বা সামাজিক স্তরবিন্যাস-জনিত পার্থক্য তাহার নিকট পরাভব মানে; অপর দিকে তেমনি সমবন্ধনে আবদ্ধ যাহারা নয়. তাহাদের নিকট হইতে ইহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে।" ৭

3. Durrani, Op. Cit.—Page 7.
4. Ibid—Page 9.
5. Ibid—Page 8.
6. Ibid—Page 11.
7. Ibid—Page 12.

মিঃ দুরাণীর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হইল, (৪) "হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে একত্ববোধ বা সংহতি-চেতনার চিহ্নমাত্র নাই। তাহারা এক সনে বসিয়া পানাহার করে না, পরস্পরের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয় না। একের যাহা খাদ্য, অপরের নিকট তাহা ঘৃণ্য বস্তু। এমন কি, হিন্দুরা মুসলমান স্পর্শ করিলেও অপবিত্র হয়। তাহাদের মধ্যে এমন কোন সামাজিক বন্ধন নাই যাহার ফলে সংহতি-চেতনা গড়িয়া উঠিতে পারে। এই দুইটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের মিলনে একটি অখণ্ড জাতীয় সত্তা গড়িয়া উঠা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া অসম্ভব।" ৮

জাতি সম্বন্ধে এই আধুনিক ধারণা বিগত দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সংহতি লইয়া জাতি গঠিত হয়, লর্ড ব্রাইস ও প্রোফেসার সিজউইকের বর্ণিত বন্ধনের প্রায় সমস্তগুলিই অল্পাবিস্তর পরিমাণে তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে বটে, তাই বলিয়া কোন একটি সংহতি 'জাতি' আখ্যা পাইতে পারে কিনা তাহা নির্ণয় করিবার জন্য প্রতিটি বন্ধন পৃথক-ভাবে বিচার ও কি পরিমাণে তাহা বিদ্যমান—ইহা নিধারণ করিবার প্রয়োজন হয় না। এই সব বিভিন্ন উপাদানসমূহের পরস্পরের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া এবং যে ঐতিহাসিক পরিবেশের মধ্যে তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহাদের মিলনোৎপন্ন সমবেত ফলই জাতি নির্ধারণের নিয়ামক। ষ্টালিনের মতে, 'জাতি হইতেছে কতকগুলি লোকের বিশিষ্ট প্রকারের এক সংহতি।' এই সংহতি যে গোষ্ঠী বা শ্রেণীগত হইতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। ইহা আকস্মিক বা ক্ষণস্থায়ী মিলনও নয়, জনসমষ্টির স্থায়ী সংহতি। এক ভাষা, এক দেশ, এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংযোজন—ইহারা প্রত্যেকেই জাতিত্বের এক একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহা ছাড়াও, জাতির একটি নিজস্ব আধ্যাত্মিক সত্তা—মানসিক গঠনের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে যাহা জাতীয় চরিত্র নামে আখ্যাত হইয়া থাকে এবং যাহার বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয় বিশিষ্ট একটি সংস্কৃতির মধ্যে। ষ্টালিন বলেন, "জাতি বলিতে এমন এক স্থায়ী জন-সংহতিকে বুঝায়, যাহার ভাষা, দেশ, অর্থনৈতিক জীবন ও মনস্তাত্ত্বিক গঠন সম্বন্ধে সমত্ববোধ এক সাধারণ সংস্কৃতির মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।" ৯

জাতি এবং রাষ্ট্রকে আমাদের পৃথক পৃথকভাবে বিচার করিতে হইবে। এই শব্দ দুইটি সব সময় সমার্থবোধক নয়, কারণ একাধিক জাতির সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্র অতীতেও ছিল ও বর্তমান যুগেও বিদ্যমান আছে। ইংরেজ ও ফরাসী দুইটি স্বতন্ত্র জাতীয় সংহতি হইলেও উভয়ে মিলিয়া কানাডায় এক রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজ ও বোয়ারগণ রক্তাক্ত সংগ্রামের শেষে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে এক রাষ্ট্র রচনা করিয়াছে। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ বহু জাতিতে বিভক্ত হইলেও একই রাষ্ট্রের অধীন। রাশিয়ার সোভিয়েট গণতন্ত্র বহু জাতির সমবায়ে গঠিত এবং প্রত্যেকটি জাতীয় রাষ্ট্রই গঠনতন্ত্রসম্মতভাবে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী। শুধু তাহাই

8. Ibid—Page 13.
9. J. Stalin: Marxism and the question of Nationalities.—Page 6.

নয়, এই জাতীয় রাষ্ট্রগুলির স্বায়ত্তশাসনাধিকার এতদূর বিস্তৃত হইয়াছে যে, ইচ্ছা করিলে তাহারা ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, নিজস্ব সৈন্যবাহিনী রাখিতে পারে এবং অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া দূত বিনিময় ও চুক্তি সম্পাদন করিতে পারে। সুইজারল্যাণ্ড—জার্মাণী, ফরাসী ও ইতালির দ্বারা চতুর্দিকে বেষ্টিত। জাতীয় চরিত্রের উপর এই তিনটি স্বতন্ত্র জাতির পৃথক পৃথক প্রভাব পতিত হওয়ার ফলে, তাহার জাতীয় সত্তা ত্রিধা বিভক্ত। তাহা সত্ত্বেও সুইজারল্যাণ্ডবাসিগণ একই রাষ্ট্রের সদস্য—বহু জাতির সমবায়ে এক রাষ্ট্র গঠনের ইহা এক অত্যুজ্জ্বল ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। সি, এ, ম্যাককার্টনে সাহেব বলেন, "জাতীয়তা শব্দটি দুইটি মনোভাবের যে কোন একটি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে।" ১০ ইংলণ্ডে এই দুইটি স্বতন্ত্র ভাব-বুদ্ধি যে সমার্থজ্ঞাপক একই শব্দে পরিণত হইয়াছে—ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথে তাহা এক আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র এবং দুইটি পৃথক শব্দের স্থলে একটিমাত্র শব্দ ব্যবহার প্রচলন করিবার পক্ষে ইংরাজী ভাষার শিথিল ব্যবহার ও উক্ত ভাষা-ভাষিগণের বাস্তব বোধ অনেকখানি কার্যকরী হইয়াছে। সে যাহাই হোক, এক জাতির সভ্য বলিতে যে জাতীয়তা বুঝায়, তাহা এক রাষ্ট্রের সদস্যজ্ঞাপক জাতীয়তা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহাদের উৎপত্তি বিভিন্ন কারণ হইতে, কাজেই বিভিন্ন লক্ষ্যের দিকে তাহাদের গতি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

'প্রথম প্রকারের জাতীয়তাকে বুঝিবার সুবিধার খাতিরে ব্যৈক্তিক জাতীয়তা বোধ সংজ্ঞা দেওয়া চলে, কারণ ইহা যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত, তাহা ব্যক্তিগত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, কাজেই বিষয়মুখী। ব্যক্তির বাসভূমির পরিবেশ কিরূপ, সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী তাহার সহিত সমভাবাপন্ন কিনা, যে শাসনতন্ত্রের অধীনে সে বাস করে তাহার পরিচালকগণ একই ভাব পোষণ করেন কিনা—এই সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষরূপেই ওই বিশেষত্বগুলি ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকে। একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিগণকে লইয়াই জাতি গঠিত হয়।' ১১ যে সকল বৈশিষ্ট্যের উপর এই জাতীয়তাবোধ নির্ভর করে তাহা বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে, কিন্তু মোটামুটিভাবে ধরিতে গেলে, জাতি, ধর্ম ও ভাষা—আন্তর্জাতিক মহাসভার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সংক্রান্ত চুক্তির এই ত্রিমূর্তির অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যেই তাহা সীমাবদ্ধ। 'ইহা তাহাদের মধ্যেই পুনরাবৃত্ত হইতে বাধ্য, ইহার কোনরূপ রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর নয়।' অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ব্রেজিল অথবা হনোলুলুর অধিবাসী একজন জার্মাণ বার্লিনস্থ যে কোন জার্মাণের মতই অস্থি-মজ্জায় জার্মাণ।

'রাষ্ট্রের ভিত্তি ও উদ্দেশ্য কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক। রাষ্ট্র বলিতে সেই যন্ত্রকে বুঝায়, যাহার দ্বারা কতকগুলি লোকের সাধারণ স্বার্থগত ব্যাপারসমূহ পরিচালিত ও সংরক্ষিত হয়; এই লোকগুলিকে লইয়াই রাষ্ট্রের গঠন। ইংলণ্ডে

---

10. C. A. Macartney: National States and National Minorities.
11. Macartney, Op. Cit.—Page 6.

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চরিত্রের বস্তু, 'জাতির' সহিত ইহা সমার্থবোধক শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে কারণে ইহারা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইতেছে ইহাদের মধ্যে সাধারণ স্বার্থগত সম্পর্ক; কিন্তু সে সম্পর্কের পরিসর সব দেশে ও সব কালে এক নয়, যুগে যুগে ও দেশে দেশে তাহার প্রচুর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা দেশরক্ষা ব্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, আবার অপরাপর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বাহিরে জীবনের যে অংশটুকু বিদ্যমান তাহার সবখানির উপরেই ইহার অধিকার-সীমা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এ স্থানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, যে সমস্ত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সমবায়ে ব্যক্তিগত জাতীয়তাবোধ গঠিত হয়, অধিকাংশ রাষ্ট্রই আজও তাহাদের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন নাই; শুধু তাহাই নয়, আজ পর্যন্ত তাহার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত জাতীয়তাবোধের সহিত রাষ্ট্রের করণীয় কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কবিহীন। বহিরাক্রমণ হইতে দেশরক্ষা, আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখা, অপরাধের নিবারণ ও দণ্ডদান, পথঘাট নির্মাণ, জনসাধারণের সম্পদ সংরক্ষণ, কর-নির্ধারণ ও তাহা আদায়—এই সব ব্যাপারের সহিত রাষ্ট্রের প্রত্যেক অধিবাসীর স্বার্থ সমভাবে সংশ্লিষ্ট—তিনি খৃষ্টান হোন অথবা মুসলমানই হোন, তাঁহার মাতৃভাষা ইংরাজী, ওয়েলস অথবা জুডীয় যাহাই হোক না কেন। এই সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যে অংশ গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রের যথার্থ কর্তব্য সম্পাদনে সকলেই সহায়তা করিবে এবং সকলেই সমভাবে তাহার দ্বারা উপকৃত হইবে।' ১২

অতএব দেখা যাইতেছে, ব্যক্তিগত জাতীয়তাবোধ রাষ্ট্রগঠনের পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হইলেও, তাহা একমাত্র, এমন কি প্রধান উপাদানও নয়। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক বন্ধন রাষ্ট্রগঠনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, এ কথা মানিয়া লইলেও, তাহা যে এক অতি প্রয়োজনীয় উপাদান তাহা অস্বীকার করা চলে না। যদি কোন সংহতি বহির্প্রভাবের অধীন হয়, তাহা হইলে, জুলিয়ান হাক্সলীর ভাষায় বলিতে গেলে, 'জাতীয় বিবর্তন ব্যাপারে সেই বহিরাগত চাপই এককরূপে সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী।' ভারতে ঘটিয়াছেও ইহাই। কিন্তু এ প্রসঙ্গ পরে আলোচ্য।

জাতীয় রাষ্ট্রের প্রশ্ন লইয়া প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে বহু গবেষণা হইয়া আসিতেছে এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া বহু সাহিত্যের সৃষ্টিও হইয়াছে। ম্যাক্‌কার্টনের যে প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে বহু অংশ উপরে উদ্ধৃত হইল তাহা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে এবং তাহার পর হইতেই গবেষণার মন্দীভূত ধারায় নূতন একটা বেগ সঞ্চারিত হইতে থাকে। এই সব আলোচনা ও গবেষণার ফলে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলিই সমর্থিত ও গৃহীত হয়। সেগুলি হইতেছে এই: ব্যক্তিগত জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক জাতীয় চেতনা দুই পৃথক ও স্বতন্ত্র বস্তু, রাষ্ট্র ও জাতীয়তা একার্থবোধক শব্দরূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়; জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের প্রচেষ্টা সর্বত্র ব্যর্থ হইয়াছে ও নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে; জাতীয়

12. Ibid—Pp. 11-12.

রাষ্ট্রগঠনের অভিজ্ঞতা ও তদন্তর্ভুক্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে আচরণ আনন্দ ও উৎসাহবর্ধনের পক্ষে সহায়ক নয়; সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থ-সংরক্ষণে জাতীয় রাষ্ট্রকে বাধ্য করিবার পক্ষে জাতিসংঘ যে নিশ্চয়তা দেন, অনেক ক্ষেত্রে তাহা ব্যর্থ ও নিষ্ক্রিয় হইয়াছে; সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের সমস্যা সমাধান জাতীয় রাষ্ট্রের পথে সম্ভবপর নয়, কারণ অন্যান্য বিভিন্ন জাতীয় উপাদানগুলি একেবারে বাদ দিয়া বিশুদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্রগঠনই অসম্ভব; অতএব তাহার সমাধানের সন্ধান করিতে হইবে বহু জাতির সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্রের মধ্যে —যেখানে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র জাতীয় 'সত্তা' আপন আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিকাশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও সুযোগ সম্ভোগের অধিকারী হইবে।

ফ্রাইডম্যান বলেন, 'জাতীয়তা ও আধুনিক রাষ্ট্র এক বস্তু তো নয়ই, এমন কি আনুষঙ্গিক ও সমান্তরাল সামগ্রীও নয়।' ১৩ তিনি যে সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন তাহা হইতেছে এইঃ "এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তিতে সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের ধারণার ভিতর অন্তর্নিহিত কতকগুলি অসঙ্গতি বিদ্যমান এবং জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব যতক্ষণ সর্বাগ্রগণ্যরূপে বিবেচিত হইবে, ততক্ষণ কোন সমস্যার সমাধান সেখানে সম্ভবপর নয়। এই সমস্যা গভীরভাবে যাঁহারা অনুধাবন করেন তাঁহারা সকলেই এ বিষয়ে একমত বলিয়া মনে হয়। পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের পর মিঃ ম্যাক্‌কার্টনে সেজন্যই সোভিয়েট রাশিয়া এবং গ্রেটবৃটেনের আদর্শে বহু জাতির সমবায়ে রাষ্ট্রগঠনেরই সুপারিশ করিয়াছেন।" ১৪ এই যুক্তির সমর্থনে অধ্যাপক কার প্রণীত 'The Future of Nations' নামক গ্রন্থের ৪৯ পৃঃ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলেন, "জাতি ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে গঠিত কোন এক সংহতিকে লইয়া রাজনৈতিক রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা বর্তমান যুগে অচল।" ১৫ আবার ডি, এইচ, কোলের 'Europe, Russia and the Future' নামক গ্রন্থ হইতে তিনি নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখান, "ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সত্তাসমূহ বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রগঠনের উপাদানরূপে বিবেচিত হইতেই পারে না।" ১৬

তাঁহার পরবর্তী সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, "জাতীয় রাষ্ট্র, বিশেষ করিয়া সে রাষ্ট্র যদি ক্ষুদ্রায়তন হয় এই যান্ত্রিক ও শিল্পগত উন্নতির যুগে তাহা টিকিয়া থাকিতেই পারে না। এরূপ রাষ্ট্র তাহার আভ্যন্তরীণ অভাব-অভিযোগ মিটাইতে অল্প-বিস্তর সক্ষম হইলেও হইতে পারে, কিন্তু বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু বর্তমান যুগের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ইহা হইতে বহু বিস্তৃত ব্যাপার। ইহার দ্বারা জনবল ও ধন-বলের যে অপরিমেয় প্রাচুর্য জ্ঞাপিত হয় তাহার বণ্টনের বৈষম্যের দরুণই বিশ্বের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই বিরাট ব্যবধান সৃষ্টিও দিনে দিনে সম্প্রসারিত

13. W. Friedmann: The Crisis of National State (1943)—P. 9.
14. Ibid—Page 40.
15. Ibid—Page 133.
16. Ibid—Page 9.

হইতে থাকে।"১৭ সংক্ষেপতঃ তাঁহার সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল এইরূপ ঃ "এই বিশ্লেষণ হইতে ইহাই সপ্রমাণ হইল যে, বর্তমান জগতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মতৎপরতার গতি 'জাতীয় রাষ্ট্র' হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। জাতীয়তা-বোধ ও রাষ্ট্রিক চেতনা যখন পরস্পরের অধিকার-সীমা লঙ্ঘন করে, তখনই তাহাদের সামরিক সহযোগিতা হয় সঙ্কটাপন্ন। সুতরাং জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার-সমস্যা সমাধানের অন্যতর বিকল্প ব্যবস্থা হইল বহু জাতির সমবায়ে এমন এক শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা যাহা বিভিন্ন জাতীয় সত্তাগুলির প্রত্যেকের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিবে এবং বিনিময়ে দাবী করিবে তাহাদের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের সর্তহীন সমর্পণ।"১৮

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে মিঃ কোবানের গবেষণালব্ধ ফল 'রয়াল ইনষ্টিটিউট অব ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স' নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁহার পুস্তকের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, এ সম্বন্ধে ম্যাককার্টনে ও ফ্রাইডম্যানের মত তিনিও একই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছেনঃ "বিশিষ্ট রাজনৈতিক সত্তা অথবা রাষ্ট্ররূপে জাতি হইতেছে এমন এক জন-কল্যাণ সঙ্ঘ যাহার গঠন রাজনৈতিক বুদ্ধির নৈপুণ্যসম্ভূত এবং যাহার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ও তৎসহ অর্থনৈতিক স্বার্থসাধন। রাজনীতির ক্ষেত্র হইতেছে প্রয়োজন সাধনের নিপুণতর ক্ষেত্র এবং তাহার কৃতকার্যতা নির্ভর করে ইহা হইতে প্রাপ্ত শান্তি, শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক সুখসুবিধার পরিমাণের উপর; কারণ স্বচ্ছন্দ জীবন বলিতে যাহা বুঝায় তাহার বাস্তব ভিত্তিভূমি রচনা করে ইহারাই। পক্ষান্তরে জাতি যখন সাংস্কৃতিক সত্তারূপে গৃহীত হয়, তখন ইহা হয় এক অন্য-নিরপেক্ষ স্বয়ং-সম্পূর্ণ সংহতি-জীবনের বনিয়াদ ও মূল সর্বাধার—অধ্যাত্মজীবনের উন্নততর ক্ষেত্রে ইহার কার্যতৎপরতা এবং সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মের ক্ষেত্রে ইহার কৃতকার্যতা। এই দুই স্বতন্ত্র সত্তার লক্ষ্য মূলতঃ এরূপ বিভিন্ন হইলেও, দুর্ভাগ্যক্রমে একই শব্দের দ্বারা ইহাদের উভয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে এই পার্থক্য যে কেবল ধারণাগত নয় তাহা অনায়াসে সপ্রমাণ করা যায়।"১৯ দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি প্রথম উল্লেখ করেন ফরাসী ও কানাডার বৃটিশ অধিবাসীদের কথা ঃ ইহারা স্ব স্ব ব্যক্তিগত জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জন না দিয়াও একই রাজনৈতিক সংহতির সভ্য; তাহার পর তিনি উল্লেখ করেন স্পেনীয় আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যগুলির কথা ঃ একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পৃথক পৃথক রাষ্ট্রিক সংহতিতে তাহারা বিভক্ত। তাঁহার মতে, 'রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তার মিলনের পক্ষে আরও বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতে পারে এবং ইহাও প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, আধুনিক যুগে যখনই তাহাদিগকে জোর করিয়া একই ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা হইয়াছে, তখনই তাহার ফলে ঘটিয়াছে বিপর্যয়।'২০

17. Friedmann op. cit—Page 140.
18. Ibid—Pp. 163-164
19. A. Cobban: National Self-Determination—Page 60.
20. Ibid—Page 60.

তিনি আরও বলেন, জাতিকে যদি রাষ্ট্রগঠনের মাপকাঠিরূপে গণ্য করা যায়, তাহা হইলেও তাহার মান সর্বত্র সমান হইতে পারে না; জাতীয়তার মতই তাহা দেশে দেশে, যুগে যুগে ও জনে জনে পৃথক। ইহার দ্বারা রাষ্ট্রের অধিবাসিগণের যে সমজাতিত্ব জ্ঞাপিত হয় তাহাও ভ্রমাত্মক; কেননা মানব জাতিকে এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন সমজাতীয় সত্তায় বিভক্ত করা যাইতে পারে না। তাঁহার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হইতেছে এইরূপ: 'রাজনৈতিক রাষ্ট্র ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তার ধারণা অতীত যুগ হইতে মানুষের মনে এরূপ ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া রহিয়াছে যে, তাহার জটিল গ্রন্থি নিঃশেষে খুলিয়া ফেলা সম্ভব নয় এবং তাহা নয় বলিয়াই, জাতীয় রাষ্ট্রই একমাত্র আদর্শ সংহতি—এরূপ ধারণা পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন। অ্যাকটন বহুদিন পূর্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন, বহু জাতির সমবায়ে এক রাষ্ট্র গঠনের ধারণা রাজনৈতিক বিধান হইতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত হইয়াছে। এখন পুনরায় তাহাকে তাহার পূর্বের অধিকৃত অঞ্চলে প্রবেশ করিতে দেওয়া কর্তব্য। গত শতাব্দী ও সাম্প্রতিক অতীতের ইতিহাস আমাদিগকে যে শিক্ষা দেয়, তাহা জাতি ও রাজনৈতিক রাষ্ট্রের সমত্ববোধের সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কৃষ্টিগত ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্রকে সুষ্ঠু ও সুদৃঢ় রাজনৈতিক সংহতি নির্মাণের একমাত্র ভিত্তিরূপে ব্যবহার করিবার প্রচেষ্টা—শুধু ধারণার দিক দিয়াই নয়, প্রয়োগের দিক দিয়াও ব্যর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে।'২১ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে চূড়ান্তনীতিরূপে মানিয়া লওয়ার ফলে, প্রত্যেকটী স্বতন্ত্র জাতির স্ব স্ব স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবী স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে; জাতি এবং রাষ্ট্র—এই দুই স্বতন্ত্র সত্তার ধারণার মধ্যে বিভ্রম সৃষ্টি করিবার মূলীভূত কারণ ইহাই। কিন্তু ইহা যে অবাধ অধিকারের নীতিরূপে গৃহীত হইতে পারে না তাহা অবশ্য স্বীকার্য, কারণ ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্রও যেমন নানাবিধ বিচার-বিবেচনার দ্বারা সীমাবদ্ধ, জাতীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রও তাহাই।

মিঃ কোবান প্রশ্ন তুলিয়াছেন, "সংক্ষেপতঃ ইহা কি সত্য নয় যে, এমন কতকগুলি ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবেচ্য বিষয় আছে যাহা পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের পক্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নামে সার্বভৌম রাষ্ট্রিক অধিকার সম্ভোগ করার পরিপন্থী? এমনকি, জাতির অধিকসংখ্যক সদস্যও যদি রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলেও অবস্থা তাহা পাইবার পক্ষে অনুকূল নাও হইতে পারে এবং যত অধিকসংখ্যকই হোক না কেন—সদস্যদের ইচ্ছা তাহার পরিবর্তন সাধন করিতে অক্ষম?" বার্কের ভাষায় বলিতে গেলে, "আমরা যদি শিশুদের মত চাঁদের জন্য কাঁদি, তাহা হইলে শিশুদের মত কাঁদাই আমাদের সার হইবে।"২২ আমি বলিতে চাই, এই সমস্ত যুক্তির দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, ভারতকে বিভক্ত করা চলিতে পারে না এবং তাহা বিশেষভাবে অচল এই কারণে যে, সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলমানদের সংখ্যালঘিষ্ঠতার হার যাহা, অন্ততঃ সেই অনুপাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে

21. Cobban, Op. Cit.—Pages 62-63.
22. Ibid.—Page 74.

ফেলিয়া না রাখিয়া, কোনরূপ সীমারেখা রচনা করাই অসম্ভব। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও সামরিক অবস্থার অনুরোধে তাহাকে খণ্ড খণ্ড কতগুলি জাতীয় রাষ্ট্রে বিভক্ত না করিয়া, এক রাজনৈতিক বৃহৎ রাষ্ট্ররূপে রক্ষা করা প্রয়োজন। বিভক্ত করিবার প্রয়াস ধ্বংসাত্মক এবং তাহা চরম ব্যবস্থারূপে তখনই অনুমোদন করা যাইতে পারে, যখন আর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। ভারতবর্ষে যদিও সেই অবস্থাই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, অবশ্য মুসলমানগণ ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ই এরূপ চূড়ান্ত ব্যবস্থার পক্ষপাতী নহেন. তথাপি কোন একটি বিশিষ্ট অঞ্চলকে পৃথক করিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না; কারণ অন্যত্র প্রদত্ত হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে, অমুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলিকে মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বা বহির্ভূত করিবার ফলে ২০০ বা ৩০০ লক্ষ মুসলমান পড়িয়া থাকিবে হিন্দুস্থানে এবং ১৭৯ বা ১৯৬ লক্ষ অমুসলমান পরিত্যক্ত হইয়া রহিবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির ভিতর। অতএব আমাদিগকে এমন এক সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যাহা আধুনিক ভাবধারার সহিত সুসংগত; বহু শতাব্দীর ইতিহাসের ধারাকে যাহা খণ্ডিত করিবে না; ভৌগোলিক অবস্থান যাহা অস্বীকার করিবে না; বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশরক্ষা ব্যাপারকে অসম্ভব না করিলেও অশেষ কষ্টসাধ্য করিয়া তুলিবে না; বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রগুলির স্কন্ধে এরূপ গুরুভার স্থাপন করিবে না—যাহা বহন করিতে তাহারা অক্ষম, নবগঠিত রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করিবে না; হিন্দু ও মুসলমান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একে অপরের নিকট স্বধর্মাবলম্বীদিগের প্রত্যর্পণ সমস্যার সৃষ্টি করিবে না এবং বিদ্বেষপ্রসূত প্রস্তাবরূপে যাহা হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে না।

তিন

মুসলমান—এক স্বতন্ত্র জাতি

ভারত বিভাগের যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে হইলে, হিন্দু ও মুসলমান যে এক জাতি নয় শুধু ইহা দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে না, আরও দেখাইতে হইবে যে, মুসলমানগণ এক পৃথক জাতি এবং সেইজন্যই তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে মিঃ দুরাণীর অভিমত অতি সুস্পষ্টঃ তিনি বলেন, "প্রাচীন হিন্দুগণ জাতি ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন জনসমষ্টি বা সংহতি মাত্র।

'ভারতের মুসলমানগণও তাহা হইতে উন্নততর পর্যায়ে পেঁাছান নাই। ইসলাম বাস্তবিকপক্ষে তাহার প্রবতকের জীবিত কালেই রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া উঠে। ইহার রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিশিষ্ট ধরণের, বরঞ্চ আমি বলিব, ইসলাম স্বয়ং এক রাজনৈতিক দর্শন।

...আমার ইহা আদৌ বক্তব্য নয় যে, ইসলাম ধর্মানুশাসিত রাষ্ট্র। ইহা গণতন্ত্র এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব ইহাকে রক্ষা করা। মহাত্মা ওমর বলিয়াছেন, 'সঙ্ঘবদ্ধ সমাজ ব্যতিরেকে ইসলামের অস্তিত্ব অসম্ভব।'

দুর্ভাগ্যবশতঃ ইসলাম রাষ্ট্র দীর্ঘকাল টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। ওমায়া ও আব্বাসিগণ ইহাকে ধ্বংস করিয়া বংশগত উত্তরাধিকার আশ্রিত স্বৈরাচারীর সাম্রাজ্যে পরিণত করে। এই দুই স্বৈরতন্ত্রের শাসনকালেই ধর্মতত্ত্ব ও সুফীবাদ মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার রাজনৈতিক জীবন কলুষিত ও বিষাক্ত করিয়া তুলে।

......এই দুই তত্ত্বের অনিষ্টকর প্রভাবে ইসলামের বিবেক পর্যন্ত দূষিত হইয়া উঠিল এবং নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন দেখিতে দেখিতে ধর্মতত্ত্বে রূপান্তরিত হইয়া গেল। রাজনৈতিক অপপ্রচারকগণ ইহার নাম দিল, উপাস্য ও উপাসকের মাঝখানে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ। মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষ জয় করেন, তখন সমগ্র মুসলমান জগতে ধর্ম হইতে রাজনীতির স্বাতন্ত্র্য সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ যাঁহারা জয় করেন, তাঁহারা কোন জাতীয় রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী ছিলেন না, ছিলেন স্বৈরাচারী সম্রাটের বেতন-ভোগী সৈন্যদল। ভারতবর্ষে তাঁহারা যে রাষ্ট্র গঠন করিলেন, তাহা জাতীয় রাষ্ট্র নয়, তাহা শাসিত, সংরক্ষিত ও শোষিত হইত সেই স্বৈরতন্ত্রী শাসক ও তাঁহার পারিষদবর্গের ব্যক্তিগত স্বার্থে। ভারত সাম্রাজ্যকে মুসলিম সাম্রাজ্য বলা হইত শুধু এই অর্থে যে, রাজমুকুট যে-ব্যক্তি শিরে ধারণ করিতেন, তিনি ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তাঁহাদের সুদীর্ঘ শাসনকালের মধ্যে মুসলমানগণের কি জাতীয়তাবোধ কোন-দিন গড়িয়া উঠে নাই।......কাজেই জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় অনুভূতিবর্জিত হিন্দু ও মুসলমান দুইটি সম্প্রদায় একই সম্রাটের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনাধীনে পাশাপাশি বাস করিত।

'হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার ও আচার-ব্যবহারের মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য বিধান যে অসম্ভব সে সম্বন্ধে বহুবারই বলা হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও, তাহাদের পারস্পরিক ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে কোনও এমন একটা কিছু রহিয়া গিয়াছে, যাহার জন্য সৌহার্দ্য ও সদ্ভাবের সহিত বহু শতাব্দী ধরিয়া একত্র বসবাস করিতে তাহারা সক্ষম হইয়াছিল। বৃটিশ শাসনাধীনে তাহারা যাহা শিখিয়াছে ও ভুগিয়াছে, সে সমস্ত তাহাদের মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা যদি সম্ভব হইত এবং তাহাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মবিশ্বাস দ্বারা পুনরায় যদি তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে পারা যাইত, তাহা হইলে এক রাষ্ট্রের নাগরিক-রূপে আজও তাহারা পরম প্রীতিপূর্ণ প্রতিবেশীর জীবনযাপন করিতে পারিত। তাহাদের উভয়ের মধ্যস্থ সেই সাধারণ বন্ধন হইতেছে, উভয় ধর্মের অন্তর্নিহিত পরমতসহিষ্ণুতার শিক্ষা। যদি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সম্প্রীতির সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিত, তাহা হইলে কালক্রমে মনে-প্রাণে মিলিত এক অখণ্ড জাতির উদ্ভব সার্থক হইত এই ভারতের মৃত্তিকাতেই। কিন্তু সেসব দিন কি আবার ফিরিয়া আসা সম্ভব?" ১

'সেই জন্যই শতাব্দীব্যাপী সাহচর্য ও সহানুভূতিপূর্ণ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও হিন্দু এবং মুসলমান স্বতন্ত্র রহিয়া গেল, উভয় ধারার সম্মিলন সম্ভবপর

1. F. K. Khan Durrani: The Meaning of Pakistan—Pp. 34-44.

হইল না। ফলে তাহারা দুই স্বতন্ত্র জাতি রহিয়া গেল এবং উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য গড়িয়া উঠিল তাহা এত গভীর ও ব্যাপক যে, যদি কোন সময়ে তাহাদের মধ্যে সেই ভাবোচ্ছ্বাস জাগ্রত ও সক্রিয় হইয়া উঠে—রাজনৈতিক দর্শনের পরিভাষায় যাহার নাম জাতীয় চেতনা, তাহা হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া পৃথক না হইয়াই পারিবে না, দুই স্বতন্ত্র জাতিরূপে গড়িয়া উঠা ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর থাকিবে না। কারণ জাতিত্ব বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধের সক্রিয় স্বরূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। হিন্দু ও মুসলমানগণের সম্বন্ধে ঘটিয়াছেও ইহাই।'২ 'দুই সম্প্রদায় জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ দুই জাতিতে পরিণত হইয়াছে এবং এই নবচেতনার আলোকে যতক্ষণ তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নূতন করিয়া নির্ধারিত না হয়, ততক্ষণ উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হওয়া অসম্ভব।'৩

এই চূড়ান্ত বিচ্ছেদের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া মিঃ দুরাণী বলেন, 'এক কথায় বলিতে গেলে, এক সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করিয়া অপর সম্প্রদায়কে তুষ্ট করিবার যে বৃটিশ ভেদনীতি—ইহা তাহারই প্রত্যক্ষ ফল।'

'হিন্দু ও মুসলমানদের এই জাতীয়তাবোধ এত ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে যে, কবে তাহা পরিপূর্ণ আকারে প্রকাশ পাইল, তাহার সঠিক তারিখ নির্ণয় করা কঠিন। ইহা প্রথমে পরিস্ফুট হয় অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার আকারে, বিশেষ করিয়া সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে; ইহার পরবর্তী রূপ প্রকাশ পায় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা রূপে এবং সর্বশেষে ইহা জাতীয় বিদ্বেষে পরিণত হয়।' ৩

বৃটিশ শাসনকালে যে সমস্ত কারণে মুসলমানগণ নিগৃহীত ও সর্বস্বান্ত হইয়াছে, মিঃ দুরাণীর মতে নিম্নলিখিতগুলি তাহাদের মধ্যে অন্যতমঃ (ক) বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যের বিনাশ; (খ) বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত,—যাহার ফলে ছোট ছোট হিন্দু রাজস্বআদায়কারিগণ হইল জমিদার এবং বড় বড় মুসলমান কর্মচারিগণকে আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের স্থলে নিয়োগ করা হইল ইউরোপীয় কর্মচারী; (গ) যে নিষ্কর ভূমি বন্দোবস্ত প্রথার উপর মুসলমান শিক্ষাপদ্ধতি নির্ভরশীল ছিল তাহার পুনঃপ্রবর্তনের ফলে শিক্ষাপদ্ধতির অধোগতি; (ঘ) তাহাদের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার ফলে মুসলমানগণ সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্র হইতে ধীরে ধীরে বহিষ্কৃত হইতে লাগিল এবং তথায় প্রতিষ্ঠিত হইল হিন্দুদের একাধিপত্য; অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর শঠতা ও ষড়যন্ত্র দ্বারা এই একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখিবার চেষ্টা হইয়া আসিয়াছে; সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে এই সাম্প্রদায়িক বৈষম্য একদিকে যেমন ভারতের রাজনৈতিক জটিলতা অশেষরূপে বৃদ্ধি করিয়াছে. অপর দিকে তেমনি সাম্প্রদায়িক সম্পর্কও অতিশয় তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

ইহারই পাশাপাশি হিন্দুদের আক্রমণাত্মক মনোভাব যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে ঠিক সেই অনুপাতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ও পারস্পরিক অবিশ্বাস বাড়িয়া চলিয়াছে—বিশেষ করিয়া বাংলা ও উত্তর ভারতে তাহার সমধিক প্রকোপ পরিলক্ষিত হয়। তাহার লক্ষণঃ (ক) বন্দে মাতরম সঙ্গীতের

---

2. Ibid.—Page 47.
3. Ibid—Page 48.

অন্তর্নিহিত অর্থ; (খ) ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মন-কষাকষি। এই বিদ্রোহের প্রধান উদ্যোক্তা হিন্দুরাই, মুসলমানগণ তাহাদের সহিত সহযোগিতাসূত্রে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল মাত্র। কিন্তু বিদ্রোহ দমিত হইবার পর হিন্দুরা তাহাদের এককালীন সহব্রতীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরাজের গুপ্তচর হইয়া দাঁড়াইল, ফলে গভর্ণমেণ্টের সমস্ত আক্রোশ আপতিত হইল মুসলমানগণের উপর; বিদ্রোহ দমিত হইবার পর সহস্র সহস্র মুসলমান নির্বিচারে নিহত হইল, তাহাদের বিষয়সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল, তাহাদের অনাথ শিশু সন্তানদিগকে খৃষ্টান মিশনারীদের হাতে অর্পণ করা হইল; (গ) এতাবৎকাল উর্দুই সমগ্র ভারতের সাধারণ ভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু ১৮৬৭ সালে বারাণসীর কতিপয় বিশিষ্ট হিন্দু নেতা এই উদ্দেশ্যে এক আন্দোলন আরম্ভ করিলেন যে, অতঃপর উর্দু ভাষার স্থলে ব্রজ ভাষা ও আরবী হরফের পরিবর্তে দেবনাগরী অক্ষর ব্যবহার করিতে হইবে। তাহার ফলে বিগত পঁচাত্তর বৎসর ধরিয়া উর্দু ভুলিবার ও হিন্দুস্থানী শিখিবার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। এই জাতীয় ব্যাপারে হিন্দুদের মনের কথা মিঃ গান্ধী যেমন খোলাসা করিয়া বলেন, অপর আর কেহ তেমন পারেন না। তিনি অতি সম্প্রতি নির্লজ্জভাবে বলিয়াছেন, "যে-সমস্ত শব্দ ভারতে একদা মুসলমান শাসনের কথা, এমনকি তাহাদের অস্তিত্বের কথা পর্যন্ত স্মরণ করাইয়া দিতে পারে সেগুলি নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে হইবে;" ৪ (ঘ) 'মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুগণের মন বিষাক্ত করিবার দুরভিসন্ধিবশেই বৃটিশ সিভিলিয়ান ও খৃষ্টান মিশনারিগণ যে ঐতিহাসিক পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহা হইতেই হিন্দুরা তাঁহাদের অতীত ইতিহাসের সেই সাধারণ স্বার্থের অতি প্রয়োজনীয় উপাদানটী আহরণ করিয়াছেন, তাহা না করিলে হিন্দু সংহতি এত দ্রুত জাতিতে পরিণত হইতে পারিত না;'৫ (ঙ) 'কংগ্রেসের পুরোভাগস্থানীয় নেতা [illegible]-শিবাজী মন্ত্রের উদ্গাতা, ধর্মোন্মাদ মারাঠি বালগঙ্গাধর তিলক কর্তৃক গো[illegible]বিরোধী আন্দোলন প্রবর্তন।'৬

'এই সমস্ত কারণেই স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ কংগ্রেস হইতে দূরে থাকিবার নীতি নির্ধারণ করিতে ও তাঁহার স্বধর্মাবলম্বীদিগকে তাহা অনুসরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে বাধ্য হন। অবশ্য বাংলার হিন্দু সংবাদপত্রসমূহের মনোভাবও এই নীতি নির্ধারণের অনুকূলে কম কার্যকরী হয় নাই; তাহারা মুসলমানদিগকে বিদ্রোহীরূপে চিত্রিত করিয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল যে এই কারণে সরকারী চাকুরীতে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।'৭

এইরূপে ১৮৫৭ সাল হইতে আজ পর্যন্ত কি হিন্দু, কি মুসলমান কেহই একদিনের জন্য কল্পনা করিতে পারে নাই যে, তাহারা এক জাতি। 'এইজন্যই স্যার সৈয়দ আহম্মদ সরকারকে ও জনসাধারণকে জানাইয়াছিলেন, প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান কেবল সেই দেশেই চলিতে পারে, যে দেশের অধিবাসিগণ এক জাতীয়;

4. Durrani, op. cit.—Page 67.
5. Ibid—Page 68.
6. Ibid—Page 74.
7. Ibid—Page 70.

পক্ষান্তরে যে দেশের জনসংখ্যা বহু জাতির সমবায়, সেখানে পার্লামেণ্টারী প্রথার প্রবর্তন সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক দিয়া গুরুতর বিঘ্নসংকুল।'৮ কিন্তু ১৯০৬ সালে যখন জানা গেল, জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক পরিষদ গঠিত হইতে চলিয়াছে, তখন এক মুসলিম প্রতিনিধি দল গভর্ণমেণ্টের নিকট গিয়া তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবী করিলেন এবং তাহা পাইলেনও।

'পৃথক নির্বাচন না থাকিলেই এক জাতি গঠিত হইত ইহা কদাচ সত্য নয়। বরঞ্চ তাহার ফলে মুসলমানগণের উপর হিন্দু-প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হইত।'৯

যদিও হিন্দুদের জাতীয় জাগরণ তাহাদের রাজনৈতিক চেতনার অগ্রজ তথাপি ১৯০৬—৭ সাল পর্যন্ত গান্ধীবাদসম্মত অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধ তাহাদের মধ্যে জাগ্রত হয় নাই। তখন পর্যন্ত কোন ব্যক্তি হিন্দু বা মুসলমানরূপে নিজের পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করিত না, কারণ 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দটী তখনও আজিকার মত ঘৃণার্হ হইয়া উঠে নাই; কি হিন্দু, কি মুসলমান প্রত্যেকেই পরস্পরকে সৌহার্দ, সহানুভূতি ও সহনশীলতার সহিত বুঝিতে চেষ্টা করিতেন এবং তদনুযায়ী একে অপরের সহিত আচরণ করিতেন। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ও ১৯০৭ সালে হিন্দু মহাসভার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় পাঞ্জাবে এবং পরে তাহা নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে প্রসার লাভ করে। সে সময় পযন্ত এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও এই মনোভাবই প্রতিফলিত হইত।

'স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁনের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত মুসলিম নীতির উদ্ভব বৃটিশের নির্যাতন-ভীতি হইতে, কাজেই তোষামোদ ও রাজানুগত্যই ছিল তাহার প্রধান লক্ষ্য। যে অবস্থা হইতে এই নীতির জন্ম, আজ যদিও তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত নাই, তথাপি 'আলিগড়-ভাবকেন্দ্র' উত্তরাধিকারসূত্রে এই ঐতিহ্যেরই অধিকারী।'১০ মুসলিম রাজভক্তি আহত ও সচকিত হইয়া উঠে নিম্নলিখিত ঘটনা-পরম্পরার আঘাতেঃ (১) ১৯১১ সালে ইতালি কর্তৃক ত্রিপলি আক্রমণ ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের তাহাতে অংশ গ্রহণ, (২) ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ আইন রদ, (৩) ১৯১২ সালের শরৎ-কালে বলকান রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক তুরস্ক আক্রমণ ও বৃটেনের তাহাতে পরিপূর্ণ নৈতিক সমর্থন, (৪) কাণপুরে এক পথ প্রস্তুত পরিকল্পনায় বাধা দান করিবার অপরাধে মুসলমানগণের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এই ঘটনাসমূহের প্রভাবেই মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হইল এবং ঘোষিত হইল--দায়িত্বশীল স্বায়ত্ত-শাসন অর্জনই তাহার রাজনৈতিক লক্ষ্য। ফলে আদর্শের ক্ষেত্রে লীগ ও কংগ্রেস প্রায় সমপর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন হইতে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত উভয় প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশন একই স্থানে হইয়া আসিয়াছে। বিখ্যাত 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' সম্পাদিত হয় এই সালে এবং পরে তাহা ১৯১৯ সালের 'ভারত গভর্ণমেণ্ট আইনে'র অঙ্গীভূত হয়। এই চুক্তির দ্বারা মুসলিম স্বার্থের প্রতি বিশেষ সুবিচার করা না হইলেও, ইহার ফল হইল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারীঃ কারণ 'এই চুক্তি দ্বারা স্বীকার করিয়া লওয়া

---

8. Durrani op. cit.—Page 78.
9. Ibid—Page 79.
10 Ibid—Page 83.

হইল যে, হিন্দু ও মুসলমান দুই স্বতন্ত্র জাতি এবং ইহাও স্বীকৃত হইল যে, কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং মুসলিম লীগ প্রতিনিধিত্ব করে মুসলমান সম্প্রদায়ের। কংগ্রেস আজ সেই অবস্থা হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিত্বের দাবী করিতেছে।'১১

প্রথম মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল কোন কোন জাতির অত্যুগ্র জাতীয় ভাবাবেগের ফলে এবং তাহার প্রত্যক্ষ পরিণামস্বরূপ একদিকে যেমন সে ভাবোচ্ছ্বাস প্রবলতর আকারে আত্মপ্রকাশ করিল, অপরদিকে তেমনি এতদিন পর্যন্ত যাহারা এই ব্যাধির বিষময় প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল তাহারাও ইহার দ্বারা সংক্রামিত হইয়া পড়িল। "ইহার ফলে বৈদেশিক শাসনপাশ হইতে মুক্ত হইবার যে উৎকট আকাঙ্ক্ষা ভারতীয়গণের মধ্যে জাগরিত হয় তাহার দরুণই ১৯১৯ সাল হইতে ১৯২২ সাল পর্যন্ত—এই সময়ের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্ভবপর হইয়াছিল।"১২ "কিন্তু মিঃ গান্ধী ও তাঁহার সহকর্মিগণ ভৌগোলিক জাতীয়তার মনোরম সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়লেন। কংগ্রেসী পণ্ডিতগণ ঘোষণা করিলেন, ধর্ম এবং রাজনীতির একত্র সংমিশ্রণ নিষিদ্ধ। ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এক অখণ্ড ভারতীয় জাতি গঠনের কল্পনায় তাঁহারা বিভোর হইয়া পড়িলেন। বস্তুতঃ তাঁহারা ধরিয়াই লইলেন, তাঁহাদের পরিকল্পিত জাতির অস্তিত্ব যেন বাস্তব ও বিদ্যমান। তাঁহাদের ধারণা ছিল অমূলক ও ভিত্তি ছিল ভ্রান্ত; ফলে যে জাতীয় সৌধ নির্মাণের জন্য তাঁহারা ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিন বৎসর যাইতে না যাইতে তাহা একেবারে ধূলিসাৎ হইল। মহাত্মা জেলে যাইবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের মায়া-মরীচিকা অন্তর্হিত হইল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য জেল হইতে বাহির হইয়াই মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্লজ্জ প্রচারকার্যের অভিযান আরম্ভ করিয়া দিলেন। ১৯[illegible] সালে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা পুনর্গঠিত হইল। ১৯০৭ ও ১৯১৫ সালে হিন্দু মহাসভার যে নীতি বিঘোষিত হয় তাহার মর্ম ছিল, অপর কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করিয়া হিন্দুস্বার্থ রক্ষা করা। এখন হইতে সে নীতি পরিত্যক্ত হইল এবং তৎপরিবর্তে যাহা গড়িয়া উঠিল তাহার বক্তব্য বিষয় হইল, ভারতবর্ষ হিন্দুদের পবিত্র জন্মভূমি, হিন্দুগণ স্বাধিকারের বলেই এমন এক স্বতন্ত্র জাতি যে, মুসলমান, খৃষ্টান অথবা পাশীদের জন্য তাহার মধ্যে কোন স্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে না এবং সর্বশেষে, হিন্দুরাজ্য স্থাপনই হিন্দুদের চরম রাজনৈতিক লক্ষ্য।"১৩

লালা হরদয়াল কর্তৃক লিখিত 'মেরে বিচার' নামক একখানি পুস্তক ১৯২৫ সালে ভারতে আসিয়া পৌঁছে এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু পত্রিকাসমূহে তাহা বহুলভাবে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তকের লেখকের মতে এই বইখানি তাঁহার রাজনৈতিক জীবন-বেদ। মিঃ ইন্দ্রপ্রকাশ ও ডাক্তার আম্বেদকর এই গ্রন্থ হইতে 'Where We Differ' ও 'Thoughts on Pakistan' নামক তাঁহাদের

11. Ibid—Pp. 84-85.
12. Durrani, op. cit.—Page 90.
13. Ibid—Pp. 91-93.

স্বরচিত পুস্তকদ্বয়ে যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহারই কিয়দংশ মিঃ দুরাণী কতৃক তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার বক্তব্য বিষয়টি মূল পুস্তকের নিজস্ব ভাষায় সংক্ষেপে বলিতে গেলে দাঁড়ায় এইরূপঃ রাষ্ট্র থাকিবে হিন্দুদের অধিকারে এবং মুসলমানগণ হইবে তাহার অধিবাসী মাত্র; রাষ্ট্র কেবলমাত্র মুসলিম বা হিন্দু-মুসলমানের যৌথ নিয়ন্ত্রণাধীন মিলিত রাষ্ট্র হইবে না; আমরা হিন্দুরা মনে করি যে. স্বরাজ অর্জনের জন্য মুসলমানদের সাহায্য অনাবশ্যক এবং যুক্ত-রাষ্ট্র গঠন করা অবাঞ্ছনীয়।

...হিন্দুস্থান ও পাঞ্জাবের হিন্দুগণের ভবিষ্যৎ নিম্নলিখিত চারিটি স্তম্ভের উপর নির্ভরশীলঃ (১) হিন্দু-সংগঠন, (২) হিন্দুরাজ, (৩) মুসলমানদের শুদ্ধি, (৪) আফগানিস্থান ও সীমান্ত অঞ্চলের শুদ্ধি ও বিজয়।১৪ ১৯২৩ সাল হইতে অদ্যাবধি হিন্দু মহাসভা যে এই নীতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য মিঃ দুরাণী মিঃ সাভরকরের বহু উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন; যথা ঃ "ভারতবাসিগণকে আজ আর এক ও অখণ্ড জাতিরূপে ধরিয়া লওয়া চলে না; বস্তুতঃ তাহারা হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটী প্রধান জাতিতে বিভক্ত।"...... "মিঃ সাভরকরের সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক ঘটনা ও রাজনৈতিক চিন্তাধারাসম্মত, কাজেই তাহার সহিত বিরোধ করা চলে না। কিন্তু বিরোধ অনিবার্য হইয়া উঠে তখনই. যখন তিনি নিজের সিদ্ধান্তের সহিত নিজেই সঙ্গতি রক্ষা করিতে অক্ষম হন। রাজনীতিক বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই কথাই বলিবেন যে, এদেশের হিন্দু ও মুসলমানগণের মত দুইটী সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি দুই স্বতন্ত্র জাতীয়তা-বোধ জাগিয়া উঠে, সে ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ আক্রোশ, গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি উৎপাত এড়াইবার জন্য কর্তব্য হইবে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং স্ব স্ব স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা। নিখিল ভারত মুসলিম লীগেরও বক্তব্য ইহাই। মিঃ সাভরকর পরম পাণ্ডিত্যের সহিত জাতির আঞ্চলিক ভিত্তি অস্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত ভৌগোলিক তাৎপর্যে গিয়া বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ভারতবর্ষকে হিন্দুদের পবিত্র তীর্থভূমিরূপে বর্ণনা করিয়া দাবী করিয়াছেন যে, ইহা তাহাদেরই উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি। সেইজন্য সমগ্র ভারত তিনি এমন এক শাসন-যন্ত্রের অধীনে আনিবার কল্পনা করিয়াছেন. যাহার মধ্যে হিন্দু প্রাধান্যই হইবে মুখ্য বস্তু এবং মুসলমানগণের স্থান হইবে অতি গৌণ। অর্থাৎ, হিন্দুরাই হইবে শাসক জাতি এবং মুসলমানগণ হইবে শাসিত।"১৫

নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার অবস্থা ইহা হইতে আদৌ উন্নততর নয়। "জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হিন্দু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনের পরিণত ফলস্বরূপ। বস্তুতঃ, ইহাকে কংগ্রেসের জন্ম না বলিয়া হিন্দু জাতির জন্ম বলিলেও চলে। ইহা সত্য যে, কংগ্রেসের শৈশব জীবনে জনকয়েক মুসলমানও ইহার সহিত জড়িত ছিলেন। কোন এক সংক্ষিপ্ত কালের কথা বাদ দিলে, কোন সময়ে সে তাহার

14. Speech of Mr. V. D. Savarkar at the Ahmedabad Session of the Hindu Mahasabha in 1937.
15. Durrani, op. cit.—Page 105.

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই এবং আজ পর্যন্ত কোন চিহ্ন যদি তাহার মুখাবয়বে সুস্পষ্টরূপে অংকিত রহিয়া থাকে, তবে সে তাহার জন্ম-ইতিহাসের ছাপ।"১৬ ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ-চুক্তি সম্পাদনের সময় কংগ্রেস একথা সরলভাবেই স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। যে সংক্ষিপ্ত সময়ের কথা মিঃ দুরাণী উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতেছে মহাত্মা গান্ধী ও আলি-ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের কাল। কিন্তু সে আন্দোলন এক বিরাট ব্যর্থতায় পরিণত হয় এবং তাহার ফলে মুসলমানগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় অপূরণীয়রূপে। এমন কি সেকালেও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভিতে ফাটল পরিলক্ষিত হইত। 'হিন্দু মনস্তত্ত্বের ক্রিয়া সম্বন্ধে মিঃ গান্ধীর জ্ঞান অত্যন্ত গভীর।...হিন্দুরা অন্যায় করিতেছে জানিয়াও হিন্দু জনসাধারণের অভিমতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে তিনি কখনও সাহসী হন নাই। তাঁহার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন লোক গো-পূজার মত অতি সাধারণ স্তরের হিন্দু-সংস্কারের প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা পোষণ করিতে পারেন না, তথাপি হিন্দু মনোভাবের তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁহাকে একাধিকবার ঘোষণা করিতে হইয়াছে যে, স্বরাজ শাসনে গো-হত্যা যদি নিবারিত না হয়, তাহা হইলে সে-স্বরাজ লাভের অযোগ্য।'১৭

হিন্দু মহাসভার পুনঃ সংগঠনের পর ১৯২৩ সালে হিন্দু স্বরাজ অর্জনের জন্য ত্রিবিধ উপায়-সম্বলিত এক কার্যক্রম রচিত হয়। 'মুসলমানগণ যদিও সংখ্যা লঘিষ্ঠ, তথাপি সামরিক শক্তির জন্য তাহারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ; তাই সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও হিন্দুগণ তাহাদের তুলনায় মেষ-শিশুর মত।'১৮ '১৯২৩ সালে নূতন কার্যক্রম গৃহীত হইবার পর হিন্দু মহাসভা হিন্দুগণকে আক্রমণোদ্যোগী করিবার জন্য ও তাহাদের চিত্ত হইতে মুসলমান ভীতি দূর করিবার জন্য এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিল। পর পর কতকগুলি সুপরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দেশময় সৃষ্টি করিয়া তোলা হইল; বড় বড় নগরীর রাজপথসমূহে যুদ্ধক্ষেত্র রচিত হইল হিন্দুদিগকে মুসলমান-দের সম্মুখীন হইবার ও শোণিতপাতের শিক্ষায় অভিজ্ঞ করিয়া তুলিবার উদ্দেশে।...হিন্দুরা যতদিন মুসলমান ভীতি পোষণ করিবে, ততদিন পর্যন্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে তাহারা সাহস পাইবে না। তাই হিন্দুদিগকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য দাঙ্গার প্রয়োজন। এই সব দাঙ্গা সংগঠন করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব যে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের, তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহার তৎকালীন সফর তালিকা হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে। 'কোন একটি সহরে পণ্ডিত মালব্যের আগমনের পক্ষকাল মধ্যে সেই স্থানে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সুরু হয়।'১৯ তৎকালীন কোন এক সংবাদপত্র হইতে এই অংশটী উদ্ধৃত। 'মিঃ গান্ধী ১৯২৪ সালে জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলেন, সমগ্র দেশ পণ্ডিত মালব্যের এই রাজনৈতিক গুণ্ডামীর কবলে পতিত; কিন্তু অবস্থার সম্মুখীন হইতে তিনি সাহসী হইলেন না। আগুন নিভাইবার জন্য মহাত্মার পক্ষ হইতে কোন আগ্রহই পরিলক্ষিত

16. Ibid—Page 109.
17. Ibid—Pp. 110-111.
18. Ibid—Page 113.
19 Durrani, op. cit.—Page 114.

হইল না, ফলে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া হিন্দু ভারতের রাজনৈতিক জীবন পণ্ডিতজীর পৈশাচিক প্রভাবের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হইল।'২০ হিন্দুগণ সাইমন কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন এবং স্থির করিলেন, বর্জন যখন করাই হইবে, তখন হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে তাহা করাই কর্তব্য। তদনুযায়ী হিন্দু নেতৃবর্গ তাঁহাদের অভ্যাসমত যেই এক গোপন সভায় মিলিত হইয়া মুসলিম-বিরোধী সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন প্রত্যাহার করা স্থির করিলেন, অমনি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ আকস্মিকভাবে থামিয়া গেল।'২১ 'মিঃ গান্ধী কিন্তু এ বিষয়ে তখনও সম্পূর্ণ নীরব; পণ্ডিত মালব্য, লালা লাজপত রায় ও অন্যান্য হিন্দু মহাসভাপন্থিগণ দেশময় হত্যার যে মহোৎসব চালাইয়াছেন, তাহা নিবারণ করিবার জন্য তিনি অংগুলি মাত্র উত্তোলন করিলেন না। অবশেষে ১৯২৮ সালে তিনি যখন বিরাম সম্ভোগের পর বাহির হইয়া আসিলেন, তখন তিনি আর তাঁহার জেল ও বিরাম-জীবনের পূর্ববর্তী যুগের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতা নন, কেবলমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের নায়ক। হিন্দু জাতীয়তা ও হিন্দু স্বরাজ্যের মালবীয় আদর্শে মহাত্মার দীক্ষা সমাপ্ত হইবার পর, পণ্ডিত মালব্য স্বয়ং রঙ্গমঞ্চ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে গার্হস্থ্য আশ্রমে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিলেন। তখন হইতে মিঃ গান্ধী যে কেবলমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারূপে পরিগণিত, একথা তিনি নিজেই বহুবার স্বীকার করিয়াছেন; এবং কংগ্রেসও সেই অবধি তাহার নীতি ও সভ্য-সংখ্যায় হিন্দুদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান-রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে।'২২ কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে সভ্য বিনিময় বিধি-সম্মত। ১৯২৮ সালে নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার বোম্বাই অধিবেশনে এই বিনিময়-প্রথা বিধিবহির্ভূত ঘোষণা করিবার পক্ষে যে প্রস্তাব আসে, তাহা প্রত্যাখ্যাত হয়; 'অথচ মুস্লিম লীগ সম্বন্ধে যে নিষেধ বিদ্যমান ছিল, তাহা পূর্ববৎ বহালই রহিয়া যায়।'২৩ '১৯২৪ সাল হইতে ২৮ সাল পর্যন্ত যে সময়—ইহাই হইতেছে তাঁহার মানসিক প্রস্তুতির কাল। ইহার পরেই তিনি (মিঃ গান্ধী) বিশুদ্ধ হিন্দু নেতা-রূপে বাহির হইয়া আসিলেন।'২৪ অতঃপর তিনি আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন এবং মুসলমানগণ সম্প্রদায় হিসাবে তাহার সংস্পর্শ হইতে দূরে রহিল। ১৯৩১ সালে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবার জন্য যাত্রা করিবার পূর্বে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আপোষ-রফা করিবার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল বটে, কিন্তু মিঃ গান্ধীর অপকৌশলে তাহা পণ্ড হইয়া যায়ঃ তিনি প্রস্তাব করিলেন, মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে যে দাবী আসিবে, তাহা সর্বসম্মত হওয়া চাই। যে কয়জন মুসলমান তাঁহার পকেটস্থ হইয়া আছেন, তাঁহারা ইহাতে রাজী হইবেন না জানিয়াই মিঃ গান্ধী এরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। ২৪

'১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হইবার পর মুসলিম লীগ মনস্থ করিলেন, কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতায় তাঁহারা নূতন শাসন সংস্কার আইন

20. Ibid—Pp. 115-116.
21. Ibid—Page 116.
22. Ibid—Page 117.
23. Ibid—Page 118.
24. Ibid—Page 120.

কার্যকরী করিবেন এবং এ বিষয়ে লীগ ও কংগ্রেসের মতৈক্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মিঃ জিন্না আশা করিয়াছিলেন, নির্বাচনে লীগপ্রার্থীদিগকে কংগ্রেস বাধা দিবে না। কিন্তু কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করিলেন, কংগ্রেস ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট—এই দুই দল ছাড়া ভারতে তৃতীয় কোন দলের অস্তিত্ব নাই এবং সেই যুক্তিতে লীগপ্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান প্রার্থী দাঁড় করাইয়া কংগ্রেস লীগকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করিল। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস অভূতপূর্ব জয় অর্জন করিয়াছিল সত্য, কিন্তু সে কেবল হিন্দু নির্বাচকমণ্ডলীতে। ৪৮২টী মুসলমান আসনের জন্য কংগ্রেস মাত্র ৫৮জন প্রার্থী দাঁড় করাইবার দুঃসাহস করিয়াছিল এবং তাহার মধ্যেও তাহাকে হারাইতে হইয়াছিল ৩২টী। এই বিজয়গর্বে অতি মাত্রায় স্ফীত হইয়া তাহারা দাবী করিতে লাগিল, হয় মুসলিম লীগকে পাততাড়ি গুটাইতে হইবে, নয়তো রাজনৈতিক দল হিসাবে তাহার কার্যকারিতা একেবারে বন্ধ করিতে হইবে। সুরু হইল মুসলিম গণ-সংযোগ আন্দোলন এবং মুসলমানদের নিকট প্রচার করা হইতে লাগিল, তাহারা যেন তাহাদের অঙ্গ হইতে সাম্প্রদায়িক ছাপ মুছিয়া ফেলিয়া ব্যক্তি হিসাবে কংগ্রেসে যোগদান করে। এ আবেদন কেবলমাত্র মুসলমানদের উদ্দেশে, হিন্দুদের পক্ষে একই সঙ্গে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সভ্য হইবার কোন বাধা নাই। ২৫ কংগ্রেস বলিল, 'সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থ রক্ষার জন্য বর্তমান শাসন সংস্কারের বিধান বলে প্রাদেশিক গভর্ণরদের হস্তে যে বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত আছে তাহা প্রয়োগ করা হইবে না—গভর্ণরগণ যদি এই প্রতিশ্রুতি না দেন, তাহা হইলে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে তাঁহারা মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন না।'২৬ আসন্ন সংগ্রামের আশঙ্কায় গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের নিকট আত্মসমর্পণের বিনিময়ে শান্তি ক্রয় করিলেন এবং কংগ্রেসের দাবী মানিয়া লইয়া মুসলিম স্বার্থকে আর একবার বঞ্চনা করিলেন। কার্যভার গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস ঘোষণা করিলেন, তাঁহাদের গঠিত মন্ত্রিসভায় মুসলমান মন্ত্রী গ্রহণ করিবার পক্ষে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা তাঁহাদের নাই। তদনুযায়ী উড়িষ্যার মন্ত্রিসভায় কোন মুসলমান সদস্য লওয়া হয় নাই এবং মধ্যপ্রদেশে যে একজন মাত্র মুসলমান মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহাকেও বহিষ্কৃত করিবার পথ খুঁজিতে বিলম্ব হইল না। কংগ্রেসের তৎপরবর্তী ঘোষণার দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইল, মন্ত্রিসভায় মুসলমান সদস্য শুধু এই সর্তেই লওয়া যাইতে পারে যে, দল হইতে পদত্যাগ করিয়া তাঁহাকে কংগ্রেস প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে।'২৭

'মোটের উপর কংগ্রেস শাসনকালে মুসলমানগণ যে অবিচার ও অত্যাচার ভোগ করিয়াছেন, তাহা অনস্বীকার্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের হিন্দুগণ ভাবিতে লাগিলেন, হিন্দুরাজ বুঝি সত্য সত্যই আসিয়া গিয়াছে। কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী আদেশ দিলেন, প্রত্যেক সরকারী ভবন ও বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইবে। হিন্দু সাম্রাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা পোষণ—ইহাই

25. Durrani, op. cit.—Pp. 123-124.
26. Ibid—Page 126.
27. Ibid—Pp. 127-128.

হইল বন্দে মাতরম সংগীতের মর্ম কথা, তাহা সত্ত্বেও প্রত্যেক সাধারণ সভায় সেই গান গীত হইবার নির্দেশ প্রদত্ত হইল। এমনকি, কোন কোন আইন পরিষদে পর্যন্ত বন্দে মাতরম সংগীত দ্বারা সভা উদ্বোধন করিবার প্রথা প্রবর্তিত হইল।'২৮ ১৯২৩ সাল হইতে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত মুসলমান জনসাধারণের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিবার জন্য পণ্ডিত মালব্য যে আন্দোলন চালাইয়াছিলেন তাহা পুনঃ প্রবর্তিত হইল।' দুই খণ্ড শরীফ বিবরণী, মিঃ ফজলুল হকের বিবৃতি ও কে, এস, আব্দুল রহমান খাঁর বিবরণী হইতে এই সমস্ত সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের বিস্তৃত কাহিনী পাওয়া যাইবে। ২৯

নিম্নলিখিত দ্বিবিধ কৌশলের দ্বারা কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট হিন্দু অপরাধকারীদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেনঃ (১) হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিকট হইতে ক্ষমা প্রার্থনা ও গো-হত্যার অধিকার প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া আপোষ-রফা করিবার জন্য অধঃস্তন কর্মচারীদিগকে প্রশ্রয় দান; (২) পুলিশকে অনুসন্ধান বিলম্বিত করিবার নির্দেশ দিয়া সাক্ষী প্রমাণের অভাবে অপরাধীকে বে-কসুর খালাস পাইবার সুযোগ প্রদান; বিচারকারী ম্যাজিস্ট্রেটের বদলী ও মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে পিটুনী পুলিশ নিয়োগও এই কৌশলের অংগীভূত ছিল।

যে চাঁন্দুর-বিশ্ব মামলায় একজন হিন্দুকে হত্যা করিবার অপরাধে কয়েক-জন মুসলমান প্রাণদণ্ডে ও আরও জন কয়েক যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়, মিঃ দুরাণী অতঃপর তৎসংক্রান্ত হাইকোর্টপ্রদত্ত রায় হইতে বহুলাংশ উদ্ধৃত করিতে আরম্ভ করেন। ঘটনাক্রমে বিচারকারী সেসন জজ ছিলেন একজন ইংরাজ। সে সম্বন্ধে মিঃ দুরাণীর মন্তব্য ইহাইঃ 'মধ্য প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীর যদি বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ থাকিত, তাহা হইলে তিনি আত্মহত্যা করিতেন, অন্ততঃপক্ষে রাজনৈতিক জীবন হইতে চিরদিনের মত অবসর গ্রহণ করিতেন। মিঃ ইয়ুসুফ এমন একজন কয়েদীকে মুক্তি দিয়াছিলেন, যে তাহার দণ্ডকালের অধিকাংশ সময় জেলে অতিবাহিত করিয়াছে এবং মাত্র এই অপরাধে তিনি চাকুরী হইতে বরখাস্ত হন। অথচ প্রধান মন্ত্রী মিঃ শুক্লা নাগরিকদের জীবন হরণের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও, কংগ্রেস তাঁহার নিকট কৈফিয়ৎ পর্যন্ত তলব করিল না।.........কংগ্রেসের একাধিনায়ক ও মিঃ শুক্লার পৃষ্ঠপোষক মিঃ গান্ধীর মুখে সত্য, অহিংসা ও বিবেক-বাণীর বুলি অহরহঃ লাগিয়াই আছে। আমার কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাস, সর্বশক্তিমান ভগবান এই ভণ্ডের মুখ দিয়া তাঁহার বাণী কখনই প্রেরণ করেন না এবং মিঃ গান্ধী যাহা বিবেকের বাণী বলিয়া প্রচার করেন, তাহা বস্তুতঃ বিবেকের নয়, অন্য কাহারও। সে যাহাই হোক, এইরূপ সুশাসন ও সুবিচারের দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া মুসলমানগণ কোনরূপেই হিন্দুর অধীনতা মানিয়া লইতে সম্মত হইতে পারে না।'৩০

অতঃপর কংগ্রেস গভর্নমেণ্টের অত্যাচার প্রসংগে তিনি আরও বলেন,

---

28. Ibid—Pp. 129-30.
29. Ibid—Page 131.
30 Durrani, op. cit.—Pp. 134-35.

'কোন কোন স্থানে আজান দেওয়া ও খাদ্যের জন্য গোহত্যা করা মুসলমানদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। তাহাদের মসজিদ ও গোরস্থান এরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল যে, তাহাদের পুনর্নির্মাণ একরূপ অসম্ভব। কিন্তু মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অ-মুসলমান করিয়া তুলিবার জন্য সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও সুচিন্তিত ষড়যন্ত্র হইতেছে ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা। কথা হইয়াছিল, এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা-পদ্ধতি ভারতের ভাবী কংগ্রেস শাসনের আমলে সকলের উপর সমভাবে প্রযুক্ত হইবে। মধ্য প্রদেশের বিদ্যামন্দির পরিকল্পনা তাহারই প্রারম্ভিক উদ্যোগ মাত্র।'৩১ এই সমস্ত ঘটনাপরম্পরার দরুণ মুসলমানগণ কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের পদত্যাগে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তাহার পর আসিল ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও ক্রীপস্ প্রস্তাব। উক্ত প্রস্তাবের প্রতিশ্রুতিসমূহ মোটের উপর সহৃদয়তাপূর্ণ হইলেও তাহাতে একটিমাত্র ত্রুটি ছিল এবং তাহা হইতেছে সেই ধারা, যাহার বলে মুসলমানগণ ইচ্ছা করিলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিতেন। কেবলমাত্র এই ত্রুটিটুকুর জন্যই কংগ্রেস সে প্রস্তাব গলাধঃকরণ করিতে সম্মত হইল না।

'১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক প্রকাশ্য বিদ্রোহের যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা কার্যতঃ ভারত সীমান্তে অপেক্ষমান জাপানী বাহিনীকে দেশ আক্রমণ ও অধিকার করিবার জন্য আমন্ত্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দৃষ্টিকোণ হইতে নিরীক্ষণ করিলে আগষ্ট-প্রস্তাব ভারতের প্রতি, বিশেষভাবে মুসলমানদের প্রতি জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা রূপেই বিবেচিত হইবে, কারণ জাপানের প্রতি হিন্দুদের মত কোনরূপ মমত্ববোধ মুসলমানগণ পোষণ করেন না।'৩২ 'লর্ড লিংলিথগোর সুদীর্ঘ শাসনকালের মধ্যে কোন কাজ যদি ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহা হইতেছে এই ব্যাপারে ত্বরিত হস্তক্ষেপ। তাহার ফলে মিঃ গান্ধীর করুণ নাট্যের প্রথম দৃশ্যেই যবনিকাপাত হইল এবং মুসলমানগণ হিন্দু রাজের কৃপা-পাত্রে পরিণত হওয়া হইতে আর একবার অব্যাহতি লাভ করিল।'৩৩

'ইসলামীয় দর্শন ধর্মনীতি ও রাজনীতির সমবায় সম্বল হইলেও ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা অতিশয় দুর্বল। কিন্তু তাহাদের পরিবেশ তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দিল না; ইসলামের বিরুদ্ধে ঘোষিত হিন্দুদের সার্বিক সংগ্রাম তাহাদিগকে প্রবলভাবে নাড়া দিল। তাই ১৯৩৭ সালে আমরা দেখি, মুসলমানগণ কিছুটা বিস্মিত ও বিচলিত। ১৯৩৮ সালে তাহাদের মধ্যে চৈতন্যের সঞ্চার পরিলক্ষিত হয়; তখন তাহারা সবেমাত্র বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাতির মধ্যে তাহাদের স্থান হইবে না। ওই সালেরই শেষ দিকে ভারতব্যাপী গুঞ্জন শ্রুত হইতে লাগিল, ভারতবর্ষ

---

31. Ibid—Pp. 135-36.
32. Ibid—Pp. 139-40.
33. Durrani, op. cit.—Page 141.

দুই জাতির বাসস্থান এবং মুসলমানগণ স্বাধিকার বলেই এক স্বতন্ত্র জাতি।'৩৪ সুতরাং পাকিস্থান তখন হইতেই হইয়া উঠিয়াছে মুসলমানদের রাজনৈতিক আদর্শ এবং ১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ কর্তৃক পাকিস্থান প্রস্তাব গ্রহণ 'পূর্ব-গঠিত আদর্শেরই স্বীকৃতি ও অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।'৩৫ অতএব মিঃ দুরাণীর মতে ১৯৩৮ সালেই মুসলমানগণ তাঁহাদের স্বতন্ত্র জাতিত্ব সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সচেতন হইলেন এবং পাকিস্থান প্রস্তাবের তড়িৎ স্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া তাহার অর্জনে আত্মনিয়োগ করিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহারা স্বপ্নাতীত, বিচিত্র ও অপরিমিত সম্ভাবনা দেখিতে পান। পাকিস্থান বলিতে তাঁহাদের কল্পনায় এমন এক স্বর্গরাজ্য ভাসিয়া উঠে, যেখানে মানুষ সকল প্রকার অবিচার, অত্যাচার ও শোষণ হইতে মুক্ত হইবে। যেখানে লোভ, স্বার্থপরায়ণতাও দূরীভূত হইবে এবং ইসলাম রাষ্ট্র হইলেও বরঞ্চ তাহা হইবার দরুণই তাহার অধিবাসীদের নাগরিক অধিকার ও অর্থনৈতিক সুখ-সুবিধা সম্ভোগ ব্যাপারে মুসলমান-অমুসলমানের কোন পার্থক্য রক্ষিত হইবে না। তাঁহারা ইহার নাম দিয়াছেন, হুকুমৎ-ই-ইল্লাহি—অর্থাৎ ভগবানের রাজ্য। অজ্ঞতাবশতঃ কেহ কেহ ইহাকে ধর্মরাজ্যরূপে অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু ইসলাম রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে ঈশ-তন্ত্র নয়; ইহা এরূপ এক গণতন্ত্র যে, 'আমরাই রাষ্ট্র'—এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার ও ঘোষণা করিবার অধিকার তাহার নাগরিকদের আছে।'৩৬

মিঃ দুরাণীর যুক্তি ও সিদ্ধান্তসমূহের অনেকগুলিই হাস্যকর এবং কতকগুলি জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। কাজেই তাহা স্বীকার করিয়া লওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তথাপি তাঁহার লেখার এত বহু বিস্তৃত অংশ উদ্ধৃত করিলাম কেবলমাত্র এই কারণে যে, 'দুই জাতি' তত্ত্বের ক্রমবিকাশের একটি আনুপূর্বিক ধারা তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দাবী করিয়াছেন, হিন্দু ও মুসলমান যে দুই সম্প্রদায় নয়, স্বতন্ত্র দুইটি জাতি সে সম্বন্ধে তত্ত্বমূলক গ্রন্থের প্রথম প্রণেতা তিনি। এই 'দুই জাতি' তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কেবলমাত্র চুক্তির সাহায্যেই দুই স্বতন্ত্র জাতির মধ্য হইতে এক সাধারণ জাতি উদ্ভূত হইতে পারে না, সুতরাং হিন্দু-মুসলমান সমস্যার স্বাভাবিক ও যুক্তিসম্মত সমাধান হইতেছে, হয় এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে পরিপূর্ণরূপে আত্মস্থ করিয়া লইবে, নয় ক্ষতি করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ সামর্থ্যহীন করিয়া ফেলিবে। মুসলিম সমাজের সদস্যরূপে তাই তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, ইসলামের জন্য ভারতবর্ষ পুনরায় জয় করাই হইবে মুসলমানদের রাজনৈতিক লক্ষ্য। তিনি এখনও সেই মতই পোষণ করেন এবং বিশ্বাস করেন, ভারতের ভাবী মুক্তি ইসলামের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।'৩৭

34. Ibid—Pp. 153-54.
35. Ibid—Page 157.
36. Ibid—Pp. 158-59.
37. Ibid—Page 146.

(চার)

এক জাতি ও বহু জাতি

মুসলমানগণ ১৯৩৮ সাল হইতে প্রথম উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করেন যে, তাঁহারা এক স্বতন্ত্র জাতি—তর্কের খাতিরে যদি এই তথ্য সত্য বলিয়া মানিয়াও লওয়া যায়, তথাপি হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দ্বারা সে সমস্যার সমাধান হইবে কি না এবং তদ্দ্বারা জাতীয় রাষ্ট্রদ্বয়ের অন্তর্গত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অবস্থার আদৌ কোন উন্নতি হইবে কিনা—ইহাই আমাদের আশু আলোচ্য বিষয়। এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য দেশসমূহের ইতিহাস পাঠ করিয়া সেখানকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী হইতে যদি আমরা শিক্ষালাভ করি, উপকৃত হইব সন্দেহ নাই। সকলেই জানেন, বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের পর মধ্য-ইউরোপীয় সাম্রাজ্যসমূহের ধ্বংসাবশেষ হইতে কতকগুলি নূতন রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল এবং সেই রাষ্ট্রগুলিকে এক জাতি সম্বলিত জাতীয় রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া তুলিবার পক্ষে চেষ্টার কোনরূপ ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু তাহার ফল হইল এই যে, যুদ্ধ-পূর্ববর্তী যুগে যে সমস্ত জাতি যে স্থানে সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিল, তাহারাই তথায় হইয়া উঠিল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়, রাষ্ট্রের নামকরণ হইল তাহাদেরই জাতীয় নামানুসারে এবং অতীতের কর্তিত-অঙ্গ রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় নবগঠিত জাতীয় রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় নিগৃহীত হইলে বিশ্ব-শান্তির বিঘ্ন ঘটিবে—এই আশঙ্কার দরুণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি আচরণের মান নির্ধারণ আন্তর্জাতিক দায়িত্বরূপে পরিগণিত হইল, প্রত্যেকটি জাতীয় রাষ্ট্রকে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য স্বতন্ত্র চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে হইল। এই সমস্ত চুক্তিই 'মাইনরিটি ট্রিটি' নামে পরিচিত এবং তাহা রক্ষার ভার ন্যস্ত হইল আন্তর্জাতিক মহাসভার হাতে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে গঠিত জাতীয় রাষ্ট্রগুলির অনুকরণে ভারতকে বিভক্ত করিয়া হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা হইবে এই উদ্দেশ্যে যে, উভয় সম্প্রদায় যাহাতে তাহাদের স্ব স্ব রাষ্ট্রের অধীনে থাকিয়া আপন আপন সামর্থ্য ও প্রতিভা অনুযায়ী প্রত্যেকের বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার অনুশীলন দ্বারা নিজ নিজ জাতীয় ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। এ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকিতেই পারে না—অবশ্য তাহা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা যদি বিদ্যমান থাকে। হিন্দু ও মুসলমান এত বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এমন ওতপ্রোত-ভাবে পরস্পরের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে যে, দেশের কোন অঞ্চলে হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের জন্য এমন বিশিষ্ট রাষ্ট্র গঠিত হইতেই পারে না, যাহার মধ্যে অপর সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘু শ্রেণী সৃষ্ট না হইবে। বিশেষভাবে ও প্রকাশ্যভাবে অধিকসংখ্যক অধিবাসীর ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া যে রাষ্ট্র গঠিত

হইবে—তাহা হিন্দুরই হোক অথবা মুসলমানেরই হোক, জাতীয় রাষ্ট্র হইতে বাধ্য; এবং তাহা যদি হয়, তাহা হইলে জাতীয় রাষ্ট্রের চারিত্রিক ও মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্য বর্জন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। ম্যাক্‌কার্টনের ভাষায় বলিতে গেলে, 'যতক্ষণ সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিসমূহ (ভারতে মুসলিম রাষ্ট্রে হইবে মুসলমানগণ ও হিন্দু রাষ্ট্রে হইবে হিন্দুরা) রাষ্ট্রীয় শাসন ভার গ্রহণ করিবার পর রাষ্ট্রগুলিকে স্ব স্ব জাতীয় আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিবার তত্ত্বের দিক দিয়া অবাস্তব ও কার্যকারিতার দিক দিয়া অসম্ভব নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবেন, ততক্ষণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা এরূপ অসহায় রহিবে যে, তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার আন্তর্জাতিক কোন প্রতিশ্রুতিই কার্যকরী হইবে না।'১ জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয় সংখ্যালঘুত্ব পরস্পর-বিরোধী বস্তু। এই সমস্যার সমাধান দ্বিবিধ উপায়ে হইতে পারে ঃ হয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঘটিত সমস্যা নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়া, নয় পরিবর্তিত ভিত্তির উপর রাষ্ট্রকে অ-জাতীয় বা বহু জাতীয় রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া তুলিয়া।২ প্রথমোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে দুইটি উপায়ে, (ক) রাষ্ট্রের সীমা এমনভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আদৌ উদ্ভব না হয়, (খ) জনসংখ্যার বিনিময় দ্বারা।

কিন্তু জনসংখ্যার বিনিময় দ্বারা এক-জাতিত্ব বিহিত হওয়া কি সম্ভবপর? ডাঃ এস, এ, লতিফ ও ডাক্তার আম্বেদকর ছাড়া এরূপ প্রস্তাব অন্য কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে মিঃ জিন্না বলিয়াছিলেন, 'ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অধিবাসী বিনিময়ের কথা আমাদিগকে চিন্তা করিতেই হইবে।'৩ স্থানান্তরযোগ্য অধিবাসীদের প্রভূত সংখ্যাধিক্য, তজ্জনিত অপরিমেয় ব্যয়-বাহুল্য ও অসুবিধা, সর্বোপরি যাহারা স্থানান্তরিত হইবে, তাহারা হিন্দুই হোক, আর মুসলমানই হোক—ভিটা ও ভূমির প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় আসক্তি ইত্যাদি ব্যাপার বিবেচনা করিয়া অন্যান্য অনেকে এরূপ প্রস্তাব কার্যতঃ অসম্ভব বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে ইউরোপের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

শান্তি-চুক্তি অনুযায়ী স্বেচ্ছাসম্মত ও বাধ্যতামূলক উভয় প্রকার লোক-বিনিময়ই পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল। ম্যাক্‌কার্টনে বলেন, 'সত্যসত্যই স্বেচ্ছায় স্থানান্তরিত হইতে চায় এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত বিরল এবং কন্‌ভেনসনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পারস্পরিক বা স্বেচ্ছাসম্মত বিনিময় যদি আদৌ

---

1. C. A. Macartney: National States and National Minorities, (1934)—Page 421.
2. Dr. Ambedkar's Pakistan or the Partition of India—Chapter VI, Sections 2 and 3. Pp. 95-107.
3. Speeches and Writings of Mr. Jinnah, (Third Edition)—P. 158,

কোথাও ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা অত্যন্ত স্বল্প আয়তনেই সম্ভবপর হইয়াছিল।'৪ ভারতবর্ষে যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে—এমন কথা মনে করিবার যুক্তিসংগত কোন কারণ নাই। গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে বাধ্যতামূলক লোক-বিনিময় চালাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ম্যাক্‌কার্টনে সে সম্বন্ধে নিজের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতে গিয়া বলেন, 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানকল্পে এইরূপ লোক-বিনিময় সম্বন্ধে আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি তাহা এই পরীক্ষা বিষয়ে পুনঃপ্রচেষ্টার উৎসাহ বর্ধন করে না। হয়তো প্রত্যুত্তরে যুক্তি দেখান হইবে যে, যুদ্ধোত্তর যুগে তুরস্ক ও বল্কান রাষ্ট্রগুলির অবস্থা ছিল অস্বাভাবিক, অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় অনুরূপ দৈহিক শান্তি বা অর্থনৈতিক দুর্দশা বিদ্যমান থাকিবে না। এরূপ যুক্তির উত্তরে শুধু এই কথাই বলা যাইতে পারে যে এ সিদ্ধান্ত অতিশয় উগ্র ও অনুমানসিদ্ধ। অবস্থা যদি শান্তিপূর্ণ হয় এবং সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সম্পর্ক যদি বন্ধুত্বপূর্ণ হয়, সে ক্ষেত্রে বিনিময় একেবারে অনাবশ্যক এবং স্বেচ্ছাসম্মত বিনিময়ের জন্য আবেদন প্রচার করা হইলেও, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলির পক্ষ হইতে কোন সাড়াই আসিবে না। পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে বর্বরোচিত। পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে, বিনিময় কুত্রাপি স্বেচ্ছাসম্মতভাবে সংঘটিত হয় না এবং যে ক্ষেত্রে হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়া থাকে, সেখানেও এরূপ অবস্থাধীনে তাহা সম্ভবপর হইয়াছে যে, নামতঃ যাহাই হোক, কার্যতঃ সে বিনিময় বাধ্যতামূলকই। অতএব দেখা যাইতেছে, বিনিময়-ব্যবস্থা কার্যকরী করিতে গেলে, তজ্জনিত দুঃখ-দুর্দশা অবশ্য স্বীকার্য। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই দুর্ভোগ তাহাদের স্কন্ধে আমরা চাপাইয়া দিব সুস্থ মস্তিষ্কে, না অপ্রকৃতিস্থ মেজাজে?'৫

অতএব ম্যাক্‌কার্টনের সিদ্ধান্ত হইল, 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিলোপ ঘটাইয়া তৎসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। ইহা হইতে এই অনুমান হয় যে, বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্র তাহার অভ্যন্তরস্থ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নিয়ত চাপের ফলে নিজেকে তাহার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে বাধ্য হইবে। বর্তমান যুগের যাহা কিছু গোলযোগ, আমাদের জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা হইতেই সে সকলের উদ্ভব; আমরা চাই, রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক আদর্শের সহিত সমস্ত অধিবাসীবৃন্দের আদর্শগত একত্ব বিধান করিতে—এই প্রচেষ্টা হইতেই যত কিছু অঘটনের জন্ম। এই দুইটী পরস্পর-বিরোধী বস্তু সম্বন্ধে ধারণাগত ভ্রান্তি যদি একবার বিদূরিত হয়, তাহা হইলে একই রাষ্ট্রের অধীনে বহু বিভিন্ন জাতির পরম ঐক্যের সহিত একত্র বসবাস করা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবার কোন হেতুই থাকিবে না; শুধু তাহাই নয়, বর্তমান যুগের জাতীয় রাষ্ট্রে অধিকাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে নৈতিক লাঞ্ছনা বহন করিতে বাধ্য হন, এক্ষেত্রে তাহা তাঁহাদিগকে স্পর্শমাত্র করিবে

4. Macartney, op. cit.—Pp. 440-1.
5. Ibid—Pp. 448-9.

না। এমন কি এখনকার দিনেও ইউরোপে এমন কয়েকটী রাষ্ট্র আছে, যাহারা আপনাদিগকে জাতীয় রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে নাই, ফলে সত্যকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঘটিত সমস্যা বলিতে যাহা বুঝায়, সেখানে তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত নাই।'৬ দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া তিনি বলেন, 'এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, কেবলমাত্র ভারতের বৃটিশ শাসকবর্গই নহেন, ভারতের অধিবাসিগণও ইউরোপের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংক্রান্ত বিরোধের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইতে তাঁহারা উপকৃত হইবেন। ভারতবর্ষে সম্প্রতি দুইটী স্বতন্ত্র দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছেঃ একটী ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে এবং অপরটী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে (অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংহতি সম্বন্ধীয় জটিলতার কথা উল্লেখ না করাই ভাল)। যেহেতু ভারতীয় ইংরাজগণ এক বৈদেশিক শাসক জাতির প্রতিনিধিমাত্র, দেশস্থ সম্প্রদায় হিসাবে কোন মুখ্য স্থান তাঁহাদের নাই, সেইজন্য প্রথমোক্ত দ্বন্দ্ব অনেকটা হাপ্‌সবার্গ রাজবংশের সহিত মাগয়ারদের বিরোধের অনুরূপ; এবং এই সংগ্রামে বৃটিশ শাসনের অনুকূলে মুসলমানদের সহায়তা দান জার্মাণ, হাপস্‌বার্গ ও হাঙ্গারীয় ক্রোট্‌সদের পারস্পরিক সহযোগিতার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ঠিক হাপ্‌সবার্গরা যতদিন না হাঙ্গারীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত হন, ততদিন মাগয়ার্সদের সহিত হাঙ্গারীর অন্যান্য জাতিগুলির বিরোধ চরমে আসিয়া উপনীত হয় নাই, ভারতে ইংরাজদের উপস্থিতিও তেমনি তত্রত্য অধিবাসী জাতিগুলির মধ্যে প্রকৃত সংঘর্ষের পথে অন্তরায়স্বরূপ অবস্থান করিতেছে। স্বায়ত্তশাসনের পথে ভারতবর্ষ যতই অগ্রসর হইবে, পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির মত তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব ততই তীব্র হইয়া উঠিবে; সেইজন্যই সনির্বন্ধ অনুরোধ, কেবলমাত্র ইতিহাস পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না, তাহা হইতে শিক্ষাগ্রহণ করুন।'৭ এইরূপ একটি শিক্ষার কথা পুস্তকের প্রারম্ভেই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন এবং ভারতবাসীরূপে আমাদের কর্তব্য নিজেদের কল্যাণের জন্যই তাহা স্মরণ করিয়া রাখা। মাগায়ারদের সহিত হাপ্‌সবার্গের প্রকাশ্য সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিলে ক্রোট ও অন্যান্য সমস্ত জাতি রাজশক্তির পার্শ্বে গিয়া দাঁড়ায়, ফলে মাগায়াররা পরাভূত হয়। ভিয়েনা হইতে এক কেন্দ্রীয় জার্মাণ আমলাতন্ত্র হাঙ্গারীর শাসনকার্য পরিচালন করিতে থাকে এবং সেই শাসনব্যবস্থা না হইল মাগায়ারদের মনঃপুত, না হইল শ্লাভদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুকূল। এই ব্যাপারকে উপলক্ষ করিয়া এক রসিক মাগায়ার ভদ্রলোক তাঁহার জনৈক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, 'আমরা দণ্ডরূপে যাহা পাইলাম, আপনাদের তাহাই প্রাপ্য হইল পুরস্কারস্বরূপ।'৮

এরূপ ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের পথ সন্ধান করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না,

---

6. Ibid—Page 450.
7. Macartney, op. cit.—Page 480-81.
8. Ibid—Page 118.

কারণ এই ধরণের প্রতিটি রাষ্ট্রের মধ্যে অপর সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘিষ্ঠতা প্রচুর পরিমাণে রহিয়াই যাইবে। তৎপরিবর্তে ভারতবর্ষের এখনকার মতই অ-জাতীয় রাষ্ট্ররূপে রহিয়া যাওয়াই অধিকতর বাঞ্ছনীয় নহে কি? মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের বাসনা লীগের মনে জন্মলাভ করিয়াছে মাত্র ছয় বৎসর পূর্বে, অথচ এই শিশু-বাসনাই ছয় শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাসের ধারা খণ্ডিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রতি মনোযোগী হওয়া আমাদের উচিত হইবে না। আমাদের লক্ষ্য হইবে, অ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যের যাহা কিছু বিঘ্ন সে সমস্ত দূরে অপসারণ করিয়া বর্তমান অ-জাতীয় রাষ্ট্রকেই আরও শক্তিশালী করিয়া তোলা।

লর্ড অ্যাক্টনের যে উদ্ধৃতির উল্লেখ করিয়া ম্যাক্‌কার্টনে তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন, তাহাই পুনরুদ্ধৃত করিয়া বর্তমান আলোচনার আমি উপসংহার করিতে চাইঃ 'স্ব স্ব কর্তব্য স্বচ্ছন্দে সম্পাদন করিবার স্বাধীনতা প্রদানই যদি সভ্যসমাজের চরম উদ্দেশ্যরূপে পরিগণিত হয়, তাহা হইলে, স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে রাষ্ট্রের মধ্যে আদৌ নিগৃহীত না হইয়া বহু জাতি বন্ধুত্ব-পূর্ণভাবে একত্র বসবাস করিতে পারে, তাহাই ত্রুটিহীন আদর্শ রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্রের ভিতর বহু বিভিন্ন সংহতির সমবায় ঘটে নাই তাহা অসম্পূর্ণ, এবং যেখানে তাহা ঘটাইবার চেষ্টা পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা জরাজীর্ণ। যে রাষ্ট্র বিভিন্ন সংহতির সন্তোষ বিধানে অসমর্থ, তাহা রাষ্ট্র নামের অযোগ্য; যে রাষ্ট্র তাহাদিগকে নিষ্ক্রিয় করিতে, আত্মস্থ করিতে অথবা বহিষ্কৃত করিতে প্রয়াসী হয়, সে নিজের জীবনীশক্তিরই ক্ষয় সাধন করে; যে রাষ্ট্রের ভিতর বহু বিভিন্ন সংহতির অন্তর্ভুক্তি ঘটে নাই, তাহা স্বায়ত্তশাসনের মৌলিক ভিত্তি বর্জিত।'৯

(পাঁচ)

অন্য দৃষ্টি-কোণ হইতে ছবির দৃশ্য

হিন্দু ও মুসলমান যে দুই স্বতন্ত্র জাতি এবং তাহাদের মিলন যে একেবারে অসম্ভব—এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে বহু যুক্তি আমরা ইতিপূর্বে শুনিয়াছি; এইবার অন্য দৃষ্টি-কোণ হইতে চিত্রটী অবলোকন করিবার চেষ্টা করা যাক।

জুলিয়ান হাক্‌সলী বলেন, 'আমরা যে বিরাট সংশ্লেষকে 'জাতি' আখ্যা দিয়া থাকি তাহা বহুবিধ মানবিক কার্যতৎপরতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভাবাবেগের সমবায়ে গঠিত; ভাষা, ধর্ম, শিল্প, বিধান—এমন কি, খাদ্য, হাবভাব, আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ ও খেলাধূলা পর্যন্ত তাহার গঠনে আপন আপন অংশ গ্রহণ

৯. Ibid—Page 501.

করে।'১ সুতরাং "বিশেষ ধরণের যে সংহতি-চেতনাকে আমরা 'জাতি' নামে অভিহিত করিয়া থাকি, তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার ভিত্তি দেহগত আত্মীয়তা হইতে উদারতর, অথচ অস্পষ্টতর কোন এক ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা আবেষ্টিত কোন এক দেশে বসবাস, তথাকার আবহাওয়ার প্রভাবে গঠিত বিশেষ এক প্রকারের জীবনযাত্রা-প্রণালী, একই সাধারণ ঐতিহ্য ও সংস্কারের উত্তরাধিকার, সাধারণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংঘ, সাধারণ ধর্মানুষ্ঠান, এমন কি সাধারণ ব্যবসা ও বৃত্তি—যে সমস্ত অসংখ্য উপাদানের সাহায্যে জাতীয় চেতনা অল্প-বিস্তর গড়িয়া উঠে এইগুলি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ইহাদের মধ্যে ভাষার গুরুত্বই অত্যন্ত অধিক, কেননা, শোণিত সম্পর্কের কাল্পনিক বিশ্বাস ইহা হইতেই সঞ্জাত হয়। কিন্তু যে সমস্ত ভাবাবেগ এই সংহতিগত ঐক্য রক্ষার অনুকূল, তাহাদের মধ্যে বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা প্রবলতম, এমনকি শোণিত ও ইতিহাসগত ধারাবাহিক আত্মীয়তা অপেক্ষাও ইহা অধিকতর শক্তিশালী। সংহতি-চেতনার সৃজন ও সম্বর্ধনে ইহার কার্যকারিতাই সর্বাপেক্ষা সমধিক। জাতি নির্মাণ কার্যে বহিরাগত চাপই বোধহয় একক হিসাবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।"২

উল্লিখিত উপাদানসমূহ হইতে কয়েকটি বাছিয়া লইয়া আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিব, ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানগণের উপর তাহাদের প্রভাব কি পরিমাণ কার্যকরী হইয়াছে।

(১) ধর্ম্ম

ধর্ম লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করা যাক। ভারতীয় মুসলমানগণ বিভিন্ন ধর্মের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং তাহাদের সমাজ-জীবন এই সমস্ত ধর্মের প্রভাবে গঠিত। ইহাও সত্য যে, ধর্ম সম্বন্ধীয় কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান এবং সে পার্থক্য এত গভীর যে, দৃশ্যতঃ মনে হয়, তাহাদের মধ্যে কোন সঙ্গতি স্থাপন করা সম্ভবপর নয়। অথচ অধিকতর না হইলেও, অনুরূপ পরিমাণ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এক ধর্মভুক্ত এমন অনেক সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা ব্যাপক অর্থে এক জাতির অন্তর্ভুক্ত রহিয়াও পারস্পরিক শান্তি ও সৌহার্দ্যের সহিত একত্র বসবাস করিতেছেন। মুসলমান মসজিদের সহিত হিন্দু মন্দিরের তুলনামূলক বিচার করিতে গেলে, উভয়ের আসবাব ও আয়োজনগত পার্থক্য স্বতঃই চোখে পড়ে। মসজিদের অভ্যন্তরস্থ অনাড়ম্বর সরলতার মধ্যে প্রার্থনার মাদুর ও জলের পাত্র ছাড়া অন্য কোন সামগ্রীর স্থান নাই। পক্ষান্তরে হিন্দু মন্দিরের অভ্যন্তরে সুসজ্জিত দেব-বিগ্রহ ও তাঁহার পূজার অশেষবিধ উপকরণের অত্যধিক বিলাস-বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রোটেস্টান্ট ও রোমান ক্যাথলিক গির্জার মধ্যেও তো এমনি পার্থক্যই বিদ্যমান : প্রথমোক্ত গির্জার মধ্যে আসবাব

---

1. Julian Huxley: Race in Europe—Page 3.
2. Ibid—Page 15.

বলিতে উপাসনার আসন ও প্রচারকের মঞ্চ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না; অথচ শেষোক্ত গির্জায় চিত্র, মূর্তি, বর্তিকা প্রভৃতি অসংখ্য উপকরণ সহ সাজসজ্জার কি প্রচুর ঘটা! শুধু তাহাই কেন, নৈষ্ঠিক সুন্নী সম্প্রদায় হিন্দুদের দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনের আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রা যেরূপ বিস্ময় ও বিভীষিকার সহিত লক্ষ্য করে, সিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত মহরমের জৌলুসে তাজিয়া ও তাবুত, সিপার ও আলম, পাইক ও বাহিস্তী প্রভৃতি শোভা বর্ধনের সামগ্রীসম্ভার কি অনুরূপ মনোভাব লইয়া নিরীক্ষণ করে না? কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এমন কথা তো কেহ বলে না যে, ইংলণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক এক জাতি নহেন, কিম্বা সিয়া এবং সুন্নী সম্প্রদায় দুইটি স্বতন্ত্র জাতি। হিন্দুদের মধ্যেও এমন অনেক সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা হিন্দুমন্দিরের বিগ্রহ ও বিলাস-ঐশ্বর্য সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন,—তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা হিন্দুই।

আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা-পদ্ধতি, পূজা-অর্চনার বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি ধর্মের বাহ্য লক্ষণ ও আঙ্গিকের কথা ছাড়িয়া দিলেও, উভয় ধর্মের মধ্যেই এমন বহু দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা জন্ম-মৃত্যু ও জন্মান্তর রহস্যের গভীরতর প্রদেশে অবগাহন করিয়া একই তত্ত্ব আহরণ করিয়া আনিয়াছেন; তাঁহারা সমস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, আত্মা অবিনশ্বর, পার্থিব বস্তু বিনাশশীল, অধ্যাত্ম সম্পদ অমর। হিন্দুদের বেদান্ত দর্শন ও মুসলমানদের সুফীবাদ, একে অপরের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করুক বা না করুক, শাশ্বতের সন্ধানে তাহাদের চরম অভিজ্ঞতা একই সাধারণ উৎস হইতে সংগৃহীত হোক বা না হোক, একত্র মিলিত হইবার জন্য একই সাধারণ বিন্দুর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। ডাক্তার ভগবান দাসের ন্যায় উভয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি এই দুই ধর্মশাস্ত্র হইতে এমন অনেক অনুচ্ছেদ আহরণ করিতে পারেন, যাহা ভাবে ও ভাষায় প্রায় অনুরূপ।

তারাচাঁদের 'Influence of Islam on Indian Culture' নামক গ্রন্থে ডাক্তার ভগবান দাস বলিতেছেন, 'মুসলিম রহস্যবাদের তৃতীয় বৈদেশিক উৎস ভারতবর্ষ।' পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে, পারস্য উপসাগরের পথে ভারতের সহিত ইরাণের বাণিজ্যগত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং বাণিজ্য দ্রব্যের সহিত ভাবের আদান প্রদানও যে ঘটিত ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভারতীয় ইস্পাত ও তরবারি, স্বর্ণ ও হীরা-জহরতের মত নিত্য ব্যবহার্য বস্তু, চিত্রিত খিলান ও গম্বুজের মত কারু-শিল্প যদি পারস্য ও ইরাকে প্রবেশের পথ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতীয় দার্শনিক তত্ত্বও যে অনায়াসে তথায় প্রবেশলাভ করিয়াছিল—ইহা অনুমান করিয়া লওয়া অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। আদি উমায়াদদের রাজত্বকালে বহু ভারতীয় বাসরার অর্থ-নৈতিক বিভাগে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কথিত আছে, খলিফা মুয়াইয়া নাকি সিরিয়া, আণ্টিওক, হাজাজ ও কাসগড়ে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপন করেন। খলিফার রাজধানী ও অন্যান্য নগরীসমূহের রাজপথে ঈষৎ গৌর ও কৃষ্ণ চক্ষুতারকা বিশিষ্ট হিন্দুগণ মুসলমানদের সহিত পাশাপাশি ও ঘেষাঘেষি হইয়া চলা-ফেরা করিত। খোরাসান, আফগানিস্থান, সিস্তান ও বেলুচিস্থান প্রভৃতি সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলসমূহ

ধর্মান্তরিত হইবার পূর্বে বৌদ্ধ ছিল।' বাল্খে এক প্রকাণ্ড বৌদ্ধ-বিহার ছিল এবং তাহার পরিদর্শক বারমাক নামে পরিচিত ছিলেন। ইঁহারই বংশধরগণ আব্বাসী খলিফাদের আমলে বারমাকী উজির রূপে খ্যাতিলাভ করেন।

'আরবের অধিবাসিগণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। 'কিতাবল-বুধ্' ও 'বিলাওয়াহর-ওয়া-বুদাসিফ' নামক দুইটি পুস্তক হিজ্রি দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাঁহাদের কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ; জ্যোতিষ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রে 'সিন্দ্-হিন্দ্' (সিদ্ধান্ত) শশ্রুদ (শুশ্রুত) ও স্রাক (চরক); গল্প সাহিত্যে 'কালিলাহ দামনাহ' (পঞ্চতন্ত্র), কিতাব সিন্দাবাদ; নীতিশাস্ত্রে 'শ্যানক' (চাণক্য), বিদ্পা (হিতোপদেশ) প্রভৃতি পুস্তক এবং তাহা ছাড়াও ন্যায়শাস্ত্র ও সামরিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক হিন্দু গ্রন্থ হইতে অনূদিত হয়।

'যে সমস্ত জাতির সংস্পর্শে ইঁহারা আসিতেন তাহাদের আচার-ব্যবহার, বিজ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য ইঁহাদের কৌতুহলের অবধি ছিল না। আল-কিন্দী ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং সুলেমান ও মাসুদী তাঁহাদের ভ্রমণ হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতা গ্রন্থ-রচনার উপকরণ রূপে ব্যবহার করেন। আল-নাদিম, আল-আশারী, আল-বিরূণী সাহরাস্তানি ও আরও অন্যান্য অনেকে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।'

'বুদ্ধের কাহিনী মুসলমান সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল এবং বুদ্ধদেব সেথায় চিত্রিত হইয়াছেন ঋষি-কল্প মহাপুরুষ রূপে। বৌদ্ধ-জাতক সম্বন্ধে ইবুন আদামের লিখিত গল্পগুলি মুসলমান যাজক সম্প্রদায়ের সমাদর লাভ করিত। যে সব হিন্দু সন্ন্যাসী যুগলে দেশ পর্যটন করিতেন এবং কোন স্থানে দুই রাত্রির অধিক অবস্থান করিতেন না—মুসলমান ধর্মার্থীদের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপিত হইত এবং এই পর্যটক সন্ন্যাসীদের নিকট হইতেই তাঁহারা পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা, সত্য ও দারিদ্র্যের ব্রত চতুষ্টয় গ্রহণ করিতেন। জপ-মালার ব্যবহার ইঁহাদের নিকট তাঁহারা শিক্ষা করেন। সুতরাং নির্বাণ সম্বন্ধে ধারণা, যোগশাস্ত্র সম্মত অষ্টবিধ আত্মসংযম অভ্যাস, যৌগীক শক্তির অর্জন প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া যে তানা, তারিগা অথবা সালুক, মোরাগাবাহ, এবং কারামৎ বা মুজিজা নামে ইসলামের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।'[৩]

'কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহার নির্ভীক ধর্মমতের দ্বারা ইসলাম জগতে প্রবলতম আলোড়ন তুলিতে সক্ষম হন তাঁহার নাম হুসেন-বিন-মনসুর-অল্-হাল্লাজ।...তিনি বহু দেশ পর্যটন করেন এবং সেই সূত্রে ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার কার্যতৎপরতা এত আপত্তিজনক হইয়া উঠে যে, ৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি ধৃত

---

3. Dr. Bhagwan Das quoted in Tarachand's *Influence of Islam on Indian culture,* Pp. 67-7.

ও বন্দী হন।' ৪ কবির, দাদু, নানক ও অন্যান্য ভারতীয় সন্ন্যাসিগণ মুসলিম সুফীবাদের বাণীই প্রচার করিতেন।

পরবর্তী যুগে মনসুরের ধর্মতত্ত্ব ইবন-অল্-আরাবী ও আবদুল করিম জিলির প্রবর্তিত ধর্ম-পদ্ধতিতে রূপ পরিগ্রহ করে। এই নূতন ধর্মতত্ত্ব ইবন-অল-ফরিদ ও আবুরি সৈয়দ ইবন আবুল খায়েরের কাব্যের ভিতর দিয়া বহু দূর-দূরান্তর ছড়াইয়া পড়ে এবং ভারতেও তাহার রেশ আসিয়া পেঁছায়।

'হিন্দু ধর্মের সহিত জিলির পরিচয় ছিল। তিনি যে দশটি সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ব্রহিমা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ তাহাদের একটি। তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি বলেন, ইঁহারা গুরু বা অবতার অস্বীকার করিয়া সরাসরি পরম ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহার মতে, ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্র ভগবানের নিকট পান নাই, পাইয়াছিলেন আব্রাহাম, অর্থাৎ ব্রহ্মার নিকট হইতে। এই ধর্মগ্রন্থ আবার পাঁচখণ্ডে বিভক্ত এবং পঞ্চম খণ্ড তাহার তত্ত্বগত দুরূহতা ও বিশালতার জন্য অধিকাংশ লোকের নিকটই অপরিচিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, যিনিই ইহা পাঠ করিতেন তিনিই মুসলিম-ভাবাপন্ন না হইয়া পারিতেন না। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, জিলির উল্লিখিত এই পঞ্চম গ্রন্থটি বেদান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। বেদান্তের প্রচারিত একেশ্বরবাদই জিলির চক্ষে ইহাকে ইসলাম হইতে অভিন্নরূপে প্রতিভাত করিয়াছিল।' ৫ 'যে মুসলিম রহস্য-বাদী ভগবানের সহিত নিজেকে যুক্ত করা (ওয়াসল্) বা তাঁহার মধ্যে আপনাকে বিলীন করার (ফানা) সাধনায় অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক, তাঁহার পক্ষে দীক্ষাগুরু লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। এই পথ-প্রদর্শক বা দীক্ষা-গুরু, ইসলাম ধর্মে যিনি পীর বা শেখ নামে পরিচিত, সুফীবাদ সম্মত সমগ্র সাধন পদ্ধতির প্রাণকেন্দ্র। মুরশেদকে সর্বদা স্মরণ রাখা, প্রতিনিয়ত ধ্যান-ধারণার দ্বারা আপনাকে তাঁহার মধ্যে লয় করিয়া দেওয়া, সমস্ত বস্তু ও ব্যক্তির মধ্যে তাঁহারই স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা এবং নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত একেবারে বিলীন করিয়া দেওয়া সাধকের জীবন-সাধনার ইহাই হইবে লক্ষ্য। মুরশেদের মধ্যে এইরূপ আত্ম-বিলয় সাধিত হইলে, গুরু তাঁহাকে অবস্থা-পরম্পরার ভিতর দিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন চরম নির্বাণের অভিমুখে। ভগবান বা ইসলামের নিকট আত্ম-নিবেদন মহম্মদের শিক্ষা, আর সুফীবাদ শিক্ষা দেয় ভগবানের প্রতিনিধি গুরুর নিকট আত্মোৎসর্গ করিতে।' ৬

হাজি ওয়ারিশ আলি শাহ ছিলেন উত্তর ভারতের এক সুফী সন্ন্যাসী। বড়াবাঙ্কি জেলায় দেওয়া-শরিফে তাঁহার সমাধিস্থান আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার অসংখ্য শিষ্য-সামন্ত রহিয়াছেন এবং আজও তাঁহারা নামের পশ্চাতে 'ওয়ারিশী' উপাধি বহন করিয়া থাকেন। সুফীবাদের সাধনার মর্মকথা তিনি যে কয়েক ছত্র কবিতার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল:—

---

4. Ibid—Pp. 69—70.
5. Ibid—Pp. 77—8.
6. Tarachand, Op. cit.—P. 81.

আমি বলি, পীরই আমার ভগবান। মুনাকির, অর্থাৎ অবিশ্বাসীর সম্মুখে এ কথা বলা ভুল। মানুষ ভাই, আমি একটিমাত্র তোমাদের নিকট প্রশ্ন করিব; বিশ্বাসী বন্ধুগণ, তাহার জবাব দাও। কাঠ যখন আগুনে পুড়িয়া যায়, তখন তাহাকে কি বলিব, কাঠ, না আগুন? সুতা দিয়া যখন কাপড় বোনা হইয়া যায়, তখন তাহাকে কি বলিব, সুতা, না কাপড়? ঠিক তেমনিভাবে পীর যখন ভগবানে বিলীন হইয়া যান, তখন তাঁহার মানবিক সত্তার অস্তিত্ব লয় পায়, থাকেন মাত্র পরিপূর্ণ ভগবান। তাই আমি প্রতি মুহূর্তে তাঁহারই চরণে মাথা নোয়াই, তাঁহারই সাধনায় নিজেকে সমর্পণ করি। প্রেমই পার্থিব বস্তুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সামগ্রী, কারণ প্রেমই মিলাৎ, অর্থাৎ ভগবৎ ভক্তি।

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রসমূহেও গুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধনার সুকঠোর দুর্গম পথে গুরু একমাত্র পথপ্রদর্শক, তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে সে পথে এক পদও অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ
গুরুদেবঃ পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।—

এই গুরু-প্রণাম হিন্দুর নিত্য পূজায় অবশ্য উচ্চার্য মন্ত্র। সদ্‌গুরু লাভ ও তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য প্রত্যেক হিন্দু সর্বান্তঃকরণে কামনা করিয়া থাকেন।

'কবীরপন্থীরাও সুফীদের মতই গুরুবাদের সমর্থক। সুফীরা যেমন বলিয়া থাকেন, গুরুর পূজা করিলেই ভগবানের পূজা করা হয়, কবীরও তেমনি বলিয়াছেন, 'গুরুকেই গোবিন্দজ্ঞান করিবে'; 'হরি রুষ্ট হইলেও পরিত্রাণের আশা আছে, গুরুর রোষ সর্বনাশের হেতু।' সুফীবাদের মত কবীরপন্থেও কথিত হয়, 'গুরুর মূর্তি ধ্যান করাই প্রকৃত আরাধনা; গুরুর চরণ পূজা করাই সত্যকার পূজা। গুরুবাক্যই ভব-নদী পার হইবার তরণী, কারণ তাহাই একমাত্র সত্য বাক্য।' 'ত্রিসংসার ও নব ধর্মের মধ্যে গুরুর সমতুল্য আর কেহ নাই।' ৭

'সুফীবাদের মত নানকের নীতিও বলে, 'ভগবানের উদ্দেশে আত্মার যাত্রা-পথে গুরুই তাহার একমাত্র পথ প্রদর্শক।' কবীর-পন্থীদের মত নানক-পন্থীরাও গুরুকে সমান শ্রদ্ধার আসন দান করিয়া থাকেন।'৮

উত্তর ভারতের প্রতিটি অধিবাসী—তিনি হিন্দু বেদান্ত শাস্ত্রেই আস্থাবান হোন, অথবা ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসীই হোন, সমান প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত কবীর ও নানকের নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কবীর দাসের দোহা ও অন্যান্য ভক্তিমূলক সঙ্গীত হিন্দুর গৃহে গৃহে সান্ধ্য ও প্রভাতকালীন প্রার্থনার সময় পরম সমাদরের সহিত আজিও গীত হয়।

'এইরূপে কবীর এমন এক উদার ও বিশ্বজনীন ধর্মের দিকে ভারতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন, যেপথে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি হাঁটিয়া যাইতে পারে। হিন্দু বা মুসলমান কাহারও এই ধর্মের বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই নাই। কবীরের জীবন-ব্রতের ইহাই হইল গঠনমূলক দিক। কিন্তু ইহার

7. Tarachand, Op. cit. P. 158.
8. Ibid—P. 176.

একটা ধ্বংসাত্মক দিকও আছে। প্রাচীন পথ-রোধ করিয়া যে বন-জঙ্গল গজাইয়া উঠিয়াছে, তাহা নিঃশেষে নির্মূল করিতে না পারিলে নূতন পথ নির্মাণ করা অসম্ভব। যে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের অন্তরালে সত্য আচ্ছন্ন রহিয়াছে, উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের মাঝখানে যাহা অন্তরায় স্বরূপ দণ্ডায়মান—কবীর অত্যন্ত নির্ভীকভাবে ও নিষ্ঠুর ভাষায় তাহার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়াছেন, হিন্দু বা মুসলমান কেহই সে আক্রমণের আঘাত হইতে অব্যাহতি পান নাই।

'ধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বর, পশুবলি, বুজরুকীর মোহ, প্রাণহীন মন্ত্রোচ্চারণ, উপাসনার গতানুগতিক আবৃত্তি, তীর্থযাত্রা, ব্রত-উপবাস, দেব-দেবীর মূর্তি পূজা, ব্রাহ্মণপ্রাধান্য, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও আহার্য সম্বন্ধে অন্ধ সংস্কার প্রভৃতি পরিহার পক্ষে বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য ধর্ম সংস্কারকদের মত তিনিও জোর দিয়া গিয়াছেন। আর মুসলমানদিগকে বলিয়াছেন, তাহাদের বর্জনমূলক মনোভাব, এক ধর্মগুরু ও তাঁহার গ্রন্থে অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মাচরণ সম্বন্ধে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, হজ-যাত্রা, উপবাস, নিয়মিত প্রার্থনা, আউলিয়া, পীর ও পয়গম্বরদের উপাসনা প্রভৃতি বর্জন করিতে।'

'তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, জীব মাত্রকেই শিবজ্ঞান করিতে, শোণিতপাত হইতে বিরত থাকিতে, আভিজাত্যের দম্ভ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা পরিহার করিতে, কঠোর আত্ম-নিগ্রহ ও ঘোরতর বিষয়বুদ্ধির দুই চরম পন্থা পরিত্যাগ করিতে এবং জীবনকে ভগবানের সেবায় উৎসর্গীকৃত সামগ্রীরূপে গ্রহণ করিতে। তিনি পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন যে, হিন্দু ও মুসলমান এক, এবং তাহারা একই পরম পিতার সন্তান, একই ভগবানের উপাসক এবং একই শোণিতে তাহাদের দেহ গঠিত।'৯

গুরু নানকের ধর্মশিক্ষা উভয় ধর্মের মূল নীতিগুলির সংশ্লেষ ছাড়া যে আর কিছুই নয়—একথা তো সর্বজনবিদিত। 'হিন্দু ও মুসলমানের মিলন-সাধনই ছিল নানকের জীবন-সাধনা। সমাজের ক্ষত নিরাময় করিতে গেলে ধর্মের সংঘাত নিবারণ করা যে অপরিহার্য—এ সত্য তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন।'১০ 'নানকের নিজের সম্বন্ধেও বিশেষ মমত্ব বোধ ছিল না, কাজেই অপরকে আক্রমণ করিবার সময় কোমল হস্তে তাহা করিতে পারিতেন না। সৎ ও অসতের মধ্যে পার্থক্যবোধ তাঁহার অতিশয় সুস্পষ্ট, প্রখর ও তীব্র, কাজেই হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর ও অন্ধ সংস্কারকে তিনি যখন আক্রমণ করিতেন, তখন তীব্রভাবেই তাহা পরিচালিত হইত।'১১ কবির ছিলেন মুসলমান ও নানক হিন্দু, তথাপি বাহ্যিক ভেদ-বিবাদের অন্তরালে মিলনের যে অলক্ষ্য ক্রিয়া চলিতেছিল—তাঁহারা তাহারই প্রত্যক্ষ ফল।

কেবল যে ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রেই এই মিলন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইত তাহা নয়। মুসলমান নরপতিগণ কর্তৃক মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা, হিন্দুশাস্ত্রে

9. Tarachand, Op. cit. Pp. 163—65.
10. Ibid—P. 168.
11. Ibid—P. 172.

সুপণ্ডিত ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে জায়গীর দানের বহু দৃষ্টান্ত বাস্তব ক্ষেত্রেও উল্লেখ করা যাইতে পারে। মুসলমান শাসকগণ দ্বারা হিন্দু মন্দির ধ্বংস ও অপবিত্র করিবার দৃষ্টান্তসমূহ যেমন সযত্নে আহরণ করা হইয়াছে, তেমনি ইতিহাসজ্ঞ কোন ব্যক্তি যদি হিন্দুদের বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাদের অজস্র ও অসংখ্য দানের দৃষ্টান্তগুলি সংগ্রহ করিয়া একত্রিত করেন, তাহা হইলে দেশের ও সমাজের অশেষ কল্যাণ তিনি সাধন করিবেন।

'কৃষ্টিগত পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকাই যদি নিয়মরূপে স্বীকৃত হইত, তাহা হইলে হিন্দু ও মুসলমান রাজাগণ অন্য সম্প্রদায়ের ধর্ম প্রতিষ্ঠান-সমূহের জন্য সনদ দান করিতেন কেন? দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাস যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, আদিলশাহী, কুতুবশাহী ও আসফশাহী বংশের রাজাগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণদিগকে এরূপ দানের অসংখ্য দৃষ্টান্তের সহিত তাঁহারা নিশ্চয়ই পরিচিত। মারাঠা রাজগণও তেমনি দিল্লীর বাদশাহের সহিত বিরোধ ও সংগ্রাম সত্ত্বেও, মুসলিম ধর্ম প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য মুক্ত হস্তে সাহায্য বিতরণ করিতেন।'১২ দৃষ্টান্তস্বরূপ বিহারের দুইটি ঘটনার উল্লেখ আমি করিতে ইচ্ছা করি। বোধ-গয়ার মোহান্তের জমিদারীর আয় বর্তমানে বহুলক্ষ টাকা ও আয়তন বহু বিস্তীর্ণ, অথচ যে ভূসম্পত্তিটুকু কেন্দ্র করিয়া তাহার এই প্রসার সেই মস্তিপুর তারাদি গ্রামখানি উক্ত মঠের চতুর্থ মোহান্ত লালগিরিকে দিল্লীর বাদশাহ মোহম্মদ শা' কর্তৃক এক ফরমান বলে প্রদত্ত হয়। আবার ভারতের বৃহত্তম জমিদারী দ্বারভাঙ্গা এষ্টেট তাহার বর্তমান ব্রাহ্মণ মালিক রাজাধিরাজের পূর্বপুরুষ তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও ধর্মমত্তার জন্য মোগল সম্রাট আকবরের নিকট হইতে জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হন। 'হিন্দু প্রজাসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য শের শাহ ওয়াকফ্ দান করিতেন এবং তাহা দেখা-শোনা ও পরিচালনার সম্পূর্ণ অধিকার হিন্দুদের হাতেই ন্যস্ত থাকিত। তাঁহার এই উদার শাসননীতির জন্য জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত প্রজাই তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন।' ১৩

সৈয়দ মামুদ কর্তৃক প্রদত্ত আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে ঃ—

কাশ্মীরের সুলতান জৈনুলবদীন প্রায়ই অমরনাথ ও সারদা দেবীর মন্দির পরিদর্শন করিতে যাইতেন। যাত্রীদের সুখ-সুবিধার জন্য তিনি সেখানে গৃহাদি নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

১৫৮৮ সালে গুরু অর্জুনদেব অমৃতসরে এক পুষ্করিণী খনন করান এবং সেই বৎসরেই সেখানে এক মন্দির নির্মাণ করিতে মনস্থ করেন। তদনুযায়ী হর-মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা কার্য সুসম্পন্ন হয় এবং তাহা করেন মিয়া পীর, ওরফে বালা পীর নামক এক মুসলমান ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি।

উপরোক্ত ঘটনা সর্দার উধাম সিং রচিত 'The History of the Durbar of Amritsar' নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

12. Atulananda Chakravarty: Call It Politics? P. 44.
13. Iswari Prasad: History of Muslim Rule in India. P. 339.

আলমগীরের শাসনকালের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বাতালার মুনসী সুজান রায় তাঁহার 'খুলাসতুল তোয়ারিখ' নামক স্বরচিত ইতিহাস গ্রন্থে কালানুরের নিকটবর্তী দীপালিবাল নামক এক গ্রামের কথা উল্লেখ করেন। এই স্থানেই শাহ শামসুদ্দীন দারীয়াইয়ের সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই সমাধিস্থান দেখিবার জন্য বহু দর্শনার্থীর ভীড় হইয়া থাকে। তিনি বলেন, 'শাহ শামসুদ্দীনের উপর হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সমান আস্থা পোষণ করেন। কিন্তু দীপালি নামক এক হিন্দু ভক্তের প্রগাঢ় ভক্তির নিকট আর সকলের শ্রদ্ধা পরাজয় মানে। দীপালি নিজে ইসলাম ধর্মবিশ্বাসী না হইলেও, শাহ দারীয়াইয়ের মৃত্যুর পর হিন্দু ও মুসলমানের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি সমাধি-মন্দিরের রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক মনোনীত হন। কিছুদিন পূর্বে মুসলমানগণ হিন্দু পরিদর্শকদিগকে সরাইবার চেষ্টা করেন এবং তদুদ্দেশ্যে ধর্মগত যুক্তির আশ্রয় লন। কিন্তু আলমগীর সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে সে আন্দোলন ব্যর্থ হয়। এই গ্রন্থ প্রণয়নের সময়ে আলমগীরের শাসনকালের তৃতীয় বৎসর পর্যন্ত হিন্দুরাই এই সমাধি-মন্দিরের রক্ষকরূপে নিযুক্ত রহিয়াছেন।'

এমন কি বর্তমান সময়েও হায়দ্রাবাদে এক প্রসিদ্ধ পীরের দরগার মুতওয়ালী এক ব্রাহ্মণ পরিবার। নিজাম সরকার এই দরগার জন্য এক বিপুল জায়গীর দান করিয়াছেন; তাহা ছাড়া, জনসাধারণের প্রদত্ত পূজা হইতেও ইহার প্রচুর আয় হইয়া থাকে। মুসলমানগণ হিন্দু মুতওয়ালীকে সরাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু নিজাম সরকারের অসম্মতির দরুণ তাহা সম্ভব হয় নাই।

বর্তমান কালেও হায়দ্রাবাদ সহরের সীতারামের মন্দির ও মাহোরের অপর এক হিন্দু মন্দিরের জন্য নিজাম সরকার কর্তৃক যে ভূসম্পত্তি প্রদত্ত রহিয়াছে, তাহার বার্ষিক আয় অন্যূন পঞ্চাশ হইতে ষাট হাজার টাকা। ন[illegible]রের শিখ গুরুদ্বারের জন্য প্রদত্ত নিজাম সরকারের জায়গীরের আয়ও বা[illegible] প্রায় কুড়ি হাজার টাকা।

পার্শী ভাষায় লিখিত কয়েকটি সনদের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা আহম্মদ শাহ বাহাদুর গাজী কর্তৃক হিজরি ১১৬৭ সালে প্রদত্ত হয়।

'আকবরাবাদ' জেলার অন্তর্গত কস্‌বা আকনেরা গ্রামের জমিদার ও কৃষকদের অবগতির জন্য এতদ্দ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, সতর বিঘা নিষ্কর জমি 'পুণ্যার্থ'স্বরূপ শীতল দাস বৈরাগীকে প্রদত্ত হইল, যাহাতে করিয়া ইহার আয় হইতে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরজির ভোগ, নৈবেদ্য ও অন্যান্য পূজা-পার্বণের ব্যয়ভার নির্বাহ করিতে পারেন।'

'আকনেরা বাজারের চৌধুরীর অবগতির জন্য ঘোষণা করা যাইতেছে যে, তিনি প্রতিদিন শ্রীঠাকুরজির নিত্য পূজার জন্য কুড়ি 'ভাঁড়' করিয়া শস্য প্রদান করিবেন। উপরোক্ত বৈরাগী কোনদিন ইহা হইতে বঞ্চিত হইবে না। তারিখ ৩রা রমজান, ১১৩৯ ফস্‌লী।'

নিম্নলিখিত সনদটি চিণ্ডাবাদের প্রসিদ্ধ গণেশ মন্দিরের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য সাহাবুদ্দীন খাঁন কর্তৃক জায়গীর দান উপলক্ষে প্রদত্ত:

'পরগণা পুণার অন্তর্গত চিঞ্চাবাদ গ্রামের মুরত গোসাঁইয়ের পক্ষ হইতে থাঁন-ই হিকমৎ নিশান নাহার খাঁন জানাইতেছেন যে, উক্ত গোসাঁই দান-কোবালা পাইবার জন্য প্রার্থী, তজ্জন্য এই লিখিত হুকুমনামার দ্বারা তাঁহাকে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনসহ উক্ত গ্রামে বসবাস করিবার ও শস্য উৎপাদন করিবার অধিকার দান করা যাইতেছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর কৃপায় তিনি নির্বিঘ্নে ভোগ-দখল করিতে থাকুন। এতদুদ্দেশ্যে ১৩২৬ হিজরি সালের ১২ই জেকাদ তারিখে এই কোবালা-নামা প্রদত্ত হইল।'

এলাহাবাদে এইরূপ আরও দুইটি দান-কোবালার ফার্মান দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি আওরংজেব কর্তৃক বিখ্যাত মহেশ্বরনাথ মন্দিরের পূজারি-গণের অনুকূলে প্রদত্ত।

আওরংজেব বারাণসী জেলার বস্তী মৌজার অন্তর্গত সাকিন গ্রামের যোগজীবনের পুত্র গিরিধর ও হাভেলী পরগণার মহেশপুর গ্রামের যদু মিশ্র ও পণ্ডিত বালভদ্র মিশ্র—এই পূজারীত্রয়কে ভূসম্পত্তি প্রদান করেন।

আওরংজেব মুলতান জেলার তুতলামী মন্দিরের পূজারী মিশ্রকল্যাণ দাসকে মাসিক একশত টাকা আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ করিয়াছিলেন। উক্ত মন্দির আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে—অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার হুকুমচাঁদ কর্তৃক রচিত মুলতান জেলার সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।

মহাকালের মন্দিরের নিত্য আলোক সজ্জার জন্য সুলতান মহম্মদ মুরাদ বক্স উজ্জয়িনীর ভাণ্ডার হইতে প্রতিদিন চারি সের করিয়া ঘৃত দান করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে মুসলমান নরপতিগণের মধ্যে অনেকেই বিশেষ-রূপে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং তাঁহারা যে কেবলমাত্র আরবী ও পার্শী ভাষার শিক্ষা বিষয়েই উৎসাহ দিতেন তাহা নয়, ভারতীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানও তাঁহাদের নিকট হইতে সমান উৎসাহ লাভ করিত। ভারতে শিক্ষার বিস্তারকল্পে তাঁহাদের অবদান এত অজস্র যে, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করাও অসম্ভব। 'সম্রাটের পৃষ্ঠ-পোষকতায় বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ পার্শী ও আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। তাহা ছাড়াও, মুসলিম সর্দার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন এবং সর্বান্তঃকরণে তাহার পঠন-পাঠনে উৎসাহ দান করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হিন্দুশাস্ত্রকে মুসলিম জগতের নিকট পরিচিত করাইবার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ পার্শী ভাষায় অনুবাদ করিতেন এবং অপরকে তাহা করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেন। অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু ছাত্রদের অধ্যয়নের জন্য সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হইত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সকল প্রকারে ও সর্বপ্রযত্নে সংস্কৃত শিক্ষার উৎসাহ দান করা হইত।' ১৪ 'মুসলমান বাদশাহ ও শাহজাদাগণ নিজেরাই ছাত্ররূপে হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে অত্যন্ত মনোযোগী ও কৌতূহলী ছিলেন। রাজপুত চিত্রশিল্পের সহিত মোগল চিত্র-শিল্পের মত হিন্দু সাহিত্যের সহিত মুসলিম সাহিত্যের অবাধ মিশ্রণ সংঘটিত

14. S. M. Jaffar: Education in Muslim India. P. 15.

হইত। হিন্দু মহাকাব্য পার্শী ভাষায় অনূদিত হইত এবং তাহার ফলে পারসীক সংস্কৃতির প্রভাব হিন্দু সংস্কৃতির উপর বহুল পরিমাণে পতিত হইত।' ১৫

আজিও মুসলমান পীরের দরগায় হিন্দু দর্শনার্থীর সমাগম মুসলমানদের সমসংখ্যক; রাজপুতনায় আজমীর শরীফ, বিহারে বিহার শরীফ, মানের শরীফ, ফুলওয়ারী শরীফ প্রভৃতি মুসলমান পর্ব মেলায় হিন্দু ও মুসলমান যাত্রীর সমান ভীড় পরিলক্ষিত হয়। মুসলমান সাধু-ফকিরদের সহিত আজিও অনেক হিন্দুর গুরু-শিষ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

সমগ্র উত্তর ভারতের হিন্দুগণ মুসলমানদের মহরম পর্বে আজিও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। অনতিদূর অতীতে এমন দিনও গিয়াছে, যখন মহরম উৎসবে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা অধিক দেখা যাইত, তাহার কারণ হিন্দুরাই সে অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। হিন্দুরা যে কেবল মহরম শোভাযাত্রাতেই যোগ দিত তাহা নয়, মুসলমানদের মত প্রতি হিন্দু গৃহেই তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য অনুষ্ঠানও যথারীতি প্রতিপালিত হইত; শোকের দিন হিসাবে কোন হিন্দু বাড়ীতে তখন বিবাহ, গৃহ-প্রবেশ বা অন্য কোন শুভকার্য অনুষ্ঠিত হইত না। বহু হিন্দু তাঁহাদের আপন আপন তাজিয়া ও সিপার নির্মাণ করিতেন; হিন্দু বালকগণ মহরমের সবুজ বর্ণ পোষাক ও পরিচয়-চিহ্ন ধারণ করিয়া পাইক ও বাহিস্তী সাজিয়া জলের মশক বহন করিয়া চলিত। হিন্দু ও মুসলমান আখড়াগুলির মধ্যে তরবারি, লাঠি ও গদকা চালনার নৈপুণ্যের প্রতিযোগিতা চলিত। আবার অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইত, এই সমস্ত আখড়া হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, উভয় সম্প্রদায়ের এজমালি প্রতিষ্ঠান।

মহরমের শোভাযাত্রা মহা কোলাহলে মসজিদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেও, তখনকার দিনে কোন পক্ষ হইতে কোনরূপ প্রতিবাদ উঠিত না, কিম্বা আজকাল হিন্দু শোভাযাত্রা যাইতে চেষ্টা করিলে যেমন মাথা ফাটাফাটি কাণ্ড ঘটিয়া থাকে, সেরূপ কোন ব্যাপার সংঘটিত হইত না। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, যে হিন্দু শোভাযাত্রা মসজিদের সম্মুখ দিয়া যাইতে দিতে মুসলমানগণ আপত্তি করেন, তাহার বাদকদল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুসলমান। অনুরূপভাবেই বকরীদ উপলক্ষে মুসলমানগণ গো-কোর্বাণী করিলে হিন্দুরা ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া উঠেন, অথচ ভারতের প্রত্যেক বড় বড় নগরে, বিশেষ করিয়া ক্যান্টনমেণ্ট সহরগুলিতে খাদ্য ও চামড়ার জন্য দৈনন্দিন গো-হত্যার বহর দেখিয়াও তাঁহাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। তাহা ছাড়া, ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যে গরুটি মুসলমান কোর্বাণী দিতেছে, তাহা হয়তো কোন হিন্দুরই ছিল, মুসলমানের হাতে গেলে কোন কার্যে তাহা ব্যবহৃত হইবে সে কথা ভালভাবে জানিয়াও, অর্থের বিনিময়ে মুসলমানের নিকট তাহা বিক্রয় করিতে হিন্দু মালিক কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। পক্ষান্তরে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয় যে, বাবর হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী অনেক মুসলমান নরপতি হিন্দু মনোভাবের প্রতি সহানুভূতি পরবশ হইয়াই গো-হত্যা আইনতঃ নিষিদ্ধ না করিলেও, তাহা হইতে যথাসম্ভব বিরত থাকিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ জোর দিয়া গিয়াছেন। এমন বহু সম্ভ্রান্ত

15. Ibid—P. 15, quoted from *Eastern Times*, dated 7-6-1935.

মুসলমান পরিবার এদেশে আছেন, যাঁহারা হিন্দু প্রতিবেশীদের সংস্কারের প্রতি শ্রদ্ধা বশেই গো-মাংস আহার করেন না। 'দেখা যায়, ঈদ্ উপলক্ষে গো-কোর্বাণী দেওয়া হইত না, কারণ এইরূপ বিহিত ছিল যে, ঈদ্ উপলক্ষে আপন আপন সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজের নিজের বাড়ীতে একটি করিয়া ছাগ-কোর্বাণী দিবে।' ১৬

এই প্রসঙ্গে জাহিরুদ্দীন মহম্মদ বাদশা গাজি (বাবর) কর্তৃক তাঁহার পুত্র শাহজাদা নসীরুদ্দীন মহম্মদ হুমায়ুনের অনুকূলে সম্পাদিত গোপন উইলের অংশ-বিশেষ এই স্থানে উল্লেখযোগ্যঃ

'হে পুত্র! ভারত সাম্রাজ্য বহু বিভিন্ন ধর্মের আবাস-ভূমি। ভগবানের অনুগ্রহে তুমি ইহার অধীশ্বর হইয়াছ। তোমার পক্ষে একান্ত কর্তব্য হইবে, ধর্মগত সংস্কারের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া সকল ধর্মসম্মত উপায়ে ন্যায় বিচার বিধান করা। ভারতবাসীর হৃদয় যদি জয় করিতে চাও, রাজশক্তির সহিত তাহার বাধ্যবাধকতার নিবিড় যোগাযোগ যদি তুমি কামনা কর, তাহা হইলে গো-হত্যা হইতে বিশেষভাবে বিরত থাকিবে।

'সরকারী আইনানুগ কোন সম্প্রদায়ের দেব মন্দির বা দেব বিগ্রহ ধ্বংস করিবে না। এরূপভাবে ন্যায়-বিচার বিধান করিয়া চলিবে যাহার ফলে রাজা ও প্রজার মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পীড়ন অপেক্ষা প্রীতির দ্বারাই ইসলামের সমধিক সেবা সম্ভবপর।

'সিয়া ও সুন্নীর বিভেদ উপেক্ষা করিয়া চলিবে, অন্যথায় ইসলামের দুর্বলতা অপরিহার্য।

'দেহ গঠনের বিভিন্ন উপাদান চতুষ্টয়ের মত বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী প্রজা সাধারণ একত্র সংহত ও সুসংগত হোক, তবেই রাষ্ট্রীয় দেহযন্ত্র অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে। তৈমুর ছিলেন এই মহামিলনের মন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ; রাজ্য শাসন ব্যাপারে যদি দক্ষতা অর্জন করিতে চাও, তাঁহার জীবন-কথা সর্বদা চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া রাখিবে। পয়লা জমাইদিউলাওয়াল, ৯৩৫ এ, এইচ।' ১৭

ডাঃ সৈয়দ মামুদ প্রদত্ত আরও কয়েকটি মুসলিম সহনশীলতার উদাহরণ এই স্থানে উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজনঃ

প্রসিদ্ধ পোর্তুগীজ ঐতিহাসিক ফারি সোজা তাঁহার 'Dakkhan-ki-Halat' নামক স্বরচিত গ্রন্থে লিখিতেছেন, 'হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের প্রতি সেবাপরায়ণ ছিল এবং মুসলমান শাসকগণ হিন্দুদিগকে সরকারী উচ্চপদে নিযুক্ত করিতেন ও সামাজিক উচ্চ মর্যাদায় মণ্ডিত করিতেন।' অর্থাৎ হিন্দুদের জন্য কোন স্বতন্ত্র বিরুদ্ধ ব্যবস্থা বিহিত ছিল না এবং নিজেদের ধর্মানুষ্ঠানের পক্ষে অবাধ অধিকার তাহারা সম্ভোগ করিত। হিন্দু-মনোভাবের প্রতি মুসলমান শাসকগণ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন।

16. Iswari Prasad: A short History of Muslim Rule in India P.—738, quoting Pelsaret—P. 74.
17. Translation of the will of Babar, a copy of which was in possession of Dr. Balkrishna, Principal, Rajaram College, Kolahpur, published in 'Searchlight', dated 30-5-1926.

ও শোভাযাত্রার আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর, মহিলাদের সঙ্গীত ও উপহারের আয়োজন, রঙ্গ-রসিকতা ও অন্যান্য লঘু হাস্য-পরিহাস—উভয় ক্ষেত্রেই একই প্রকারের পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম ধর্মে আড়ম্বর মাত্রই নিষিদ্ধ। হিন্দুধর্মে তাহা নিষিদ্ধও নয়, বিহিতও নয়; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিবাহ-ব্যাপারে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সমস্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ চলিতে দেখা যায়, তাহাদিগকে সাম্প্রদায়িক সীমা-রেখা দ্বারা পৃথক করা অসম্ভব।

একটু বিস্তৃততর বিবরণ কৌতূহলোদ্দীপক হইবে। বিহার প্রদেশে মুসলমানদের বিবাহানুষ্ঠানে যে সমস্ত প্রথা ও পদ্ধতির প্রবর্তন দেখা যায়, তদুপলক্ষে ওই প্রদেশের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব তাহাদের উপর সুস্পষ্ট। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মুসলিম বিবাহের মুখ্য অংশ 'নিকাহ' এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উৎসব-অনুষ্ঠানের গৌণ অংশ 'সাধি'র সহিত ইহা একত্র নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আবার কখন কখন 'সাধি'-কার্য অন্যত্র ও অন্য সময়েও অনুষ্ঠিত হয়। 'সাধি'র সময়ে বরযাত্রী তাঁহাদের সামাজিক সঙ্গতি ও পদ-মর্যাদা অনুযায়ী বিলাস ও আড়ম্বরের সহিত কন্যাপক্ষের গ্রামে আসিয়া থাকেন, কিন্তু কন্যার পিতৃগৃহে না উঠিয়া অন্য কাহারও বাড়ীতে বা তাঁবু খাটাইয়া তথায় আশ্রয় লন। বরযাত্রী রওয়ানা হইবার কয়েকদিন পূর্ব হইতে বর ও কন্যার গৃহে কোন কোন আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একটি হইতেছে 'রাত-জাগা'; এইদিন বাড়ীর মহিলাগণ রাত্রি জাগরণ করেন ও একপ্রকার পায়স প্রস্তুত করেন। অপর আর একদিন অনুষ্ঠিত হয় 'মণ্ডপ নির্মাণ' পর্ব। এইদিন বাড়ীর উঠানে বাঁশের খুঁটির উপর মণ্ডপ তৈয়ারী হয়। তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানের নাম 'কান্দুরি'; এইদিন অন্ন প্রস্তুত করিয়া মৃত ব্যক্তিদের নামে তাহা বিতরণ করা হয়। সৈয়দ রমণীরা ছাড়া এই অন্ন অন্য সকলের পক্ষে গ্রহণ নিষিদ্ধ। নির্দিষ্ট দিনে বরযাত্রীরা রওয়ানা হইয়া কন্যার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। বিবাহের কয়েকদিন পূর্বে কন্যাকে 'মাজুন' বা 'মাঞ্জন' নামক আর একটি আচরণ প্রতিপালন করিতে হয়। এই সময়ে কন্যাকে কয়েকদিনের জন্য এক কক্ষে আবদ্ধ থাকিতে হয়, গৃহের জনকয়েক নির্বাচিত মহিলা ছাড়া অন্য কেহ তাঁহাকে দেখিতে পর্যন্ত পান না। এই কয়দিন তাঁহাকে হরিদ্রা ও আরও কয়েকটি দ্রব্যসহযোগে প্রস্তুত 'উবটন' নামক একরূপ প্রসাধন মাখান হয় এবং বিবাহের নির্ধারিত দিনে নির্জন কক্ষ হইতে তিনি বাহির হইয়া আসেন।

হিন্দুদের মধ্যেও 'মণ্ডপ নির্মাণ' কার্য নিষ্পন্ন হয় বিবাহের দুই-একদিন পূর্বে এবং নবনির্মিত মণ্ডপের নিম্নেই বিবাহ-কার্য সমাধা হইয়া থাকে। পরলোকগত পূর্বপুরুষদিগকে বিবাহ-বাসরে উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ করিবার ও নব-দম্পতিকে গোত্রভুক্ত করিয়া লইবার পক্ষে তাঁহাদের সম্মতি গ্রহণ করিবার উদ্দেশে বিশিষ্ট একপ্রকার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। হিন্দু কুমারীদেরও গাত্র-হরিদ্রা হইয়া থাকে। এই উৎসব হিন্দু-নারীর জীবনে শাস্ত্রসম্মত উপায়ে একবার মাত্রই হইতে পারে, অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যু হইলে দ্বিতীয় বিবাহ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। এই দিক দিয়া বিচার করিলে গাত্র-হরিদ্রা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ

অনুষ্ঠান। তাহার পক্ষেও কয়েকদিন নির্জন কক্ষে বাসের বিধি আছে। এই কয়দিন বাহিরের লোকের সহিত তাহার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে না। অংশতঃ অঙ্গ-প্রসাধনের দরুণ এবং কতকটা স্নানাদি না করার ফলে এই কয়দিন তাহাকে কিছুটা রুগ্ন ও অপরিচ্ছন্ন দেখায়। বিবাহের দুই-একদিন পূর্বে শাস্ত্রসম্মত উপায়ে তাহার স্নানানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানেই ব্রাহ্মণভোজনের বিধি ভারতের সর্বত্র প্রচলিত আছে। আড়ম্বরের দিক দিয়া হিন্দু ও মুসলিম বিবাহের শোভাযাত্রার মধ্যে কোনই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না; উভয় ক্ষেত্রেই হাতী, ঘোড়া ও আজকাল মোটরের শ্রেণী এবং রাত্রিকাল হইলে আলোকসজ্জার সমারোহ; তাহা ছাড়া বাদ্যভাণ্ডের আয়োজন তো আছেই। হিন্দু ও মুসলমান উভয় বরযাত্রীর দলই কন্যার পিতৃগৃহে না উঠিয়া অন্য কাহারও বাড়ীতে অথবা তাঁবুতে আশ্রয় লন; ইহার কারণ হয়তো তথায় এতগুলি লোকের স্থান সংকুলান হইবার মত জায়গার অভাব।

বিহার প্রদেশের হিন্দুদের প্রথা অনুযায়ী বরযাত্রী কন্যা-গৃহে উপস্থিত হইলে, বাড়ীর মহিলাগণ বরের মস্তকে চাল ও জল ছিটাইয়া, ললাটে তিলক অঙ্কিত করিয়া এবং সম্মুখে আলোক আন্দোলন দ্বারা আরতি করিয়া বর বরণ করেন। কন্যার পিতাও উপহারসহ তাঁহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বর্ধিত করেন। বরযাত্রীদিগকে আহার্য ও পানীয় দানে আপ্যায়িত করা হয়। অতঃপর বরযাত্রীর দল তাহাদের বাসার অভিমুখে অগ্রসর হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম 'পরিচাওন'। কিছুক্ষণ পরেই কন্যাপক্ষের গৃহ হইতে কয়েকজন স্ত্রীলোক খাদ্য ও পানীয়সহ বরযাত্রীদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং কন্যার পিত্রালয়ে নৈশ ভোজনের জন্য তাঁহাদিগকে যথারীতি নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন। পাত্রের গুরুজনদিগকে এই সময় উপহার প্রদত্ত হয়। এই অনুষ্ঠানকে 'ধুরচাক্' বলা হয়।

অতঃপর বরযাত্রীর দল শোভাযাত্রাসহ কন্যা-গৃহের অভিমুখে রওয়ানা হন। তাঁহারা সেখানে উপনীত হইলে কন্যাকে মণ্ডপে আনয়ন করা হয়। মন্দিরের আকারের ন্যায় প্রশস্ত তলদেশ ও উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট এক পাত্রে বস্ত্র, অলঙ্কার, অঙ্গ-প্রসাধন ও সন্দেশ প্রভৃতি উপহারের বিবিধ বস্তু সজ্জিত থাকে। বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কন্যাকে সেই সকল দ্রব্য উপহার প্রদান করেন। ইহার পর হইতেই ভ্রাতৃ-বধূর দর্শন বা স্পর্শন বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পক্ষে চিরতরে নিষিদ্ধ হয়। এই অনুষ্ঠান 'কন্যা-নিরীক্ষণ' নামে পরিচিত। ইহার পরেই বিবাহের মূল অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পারস্পরিক উপঢৌকনের বস্ত্র-অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া বর ও কন্যা মণ্ডপে আনীত হয় এবং পূজা-অর্চনার পর যথাবিধি কন্যা-সম্প্রদান কার্য সমাধা হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে উভয়পক্ষের নিকট আত্মীয়-কুটুম্বগণ উপস্থিত থাকেন। বিহারে পর্দা-প্রথার কঠোরতার দরুণ বরপক্ষের পুরোহিত ও বিবাহ-ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন এরূপ দুই-একজন আত্মীয় ব্যতিরেকে অন্য কোন পুরুষকে সেখানে উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হয় না, কারণ কন্যাপক্ষের মহিলাগণের উপস্থিতি তথায় প্রয়োজন। বিবাহ-বাসরে যাঁহারা উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা সকলেই এই শুভকার্যের সাক্ষীরূপে গণ্য হন; চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণও

উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ করিবার জন্য আহূত হন; বর ও বধূ মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা শপথ করেন, আজীবন পরস্পরের প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকিবেন। অতঃপর বর-কন্যা যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণ করেন; সর্বশেষে বর কর্তৃক বধূর সীমন্তে সিন্দূর-রেখা অঙ্কিত হইলে পর শুভকার্য সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ-ব্যাপারে ইহারই নাম 'সিন্দূর দান'। সীমন্তে সিন্দূর-রেখা রমণীর সৌভাগ্যের চিহ্ন এবং যতদিন স্বামী জীবিত থাকেন, ততদিন তিনি ইহা ধারণ করেন।

মুসলমানদের মধ্যেও বরযাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলে 'বারি' নামক এক প্রকার অনুষ্ঠানের বিধি আছে। এই উপলক্ষে বরপক্ষ হইতে লোকজন নানারূপ খাদ্যদ্রব্য লইয়া বাদ্য-ভাণ্ড সহকারে কন্যাপক্ষের বাসার অভিমুখে রওয়ানা হয়। তাহাদের পুরোভাগে আহার্য ও প্রসাধনদ্রব্যপূর্ণ এক ঝুড়ি থাকে, ইহাকে 'সোহাগপুরা' বলা হয়। ইহার আকার ঠিক হিন্দুদের পাত্রের অনুকরণে মন্দিরের মতই প্রশস্ততল ও উচ্চচূড়। এই সকল উপহার গ্রহণ করিবার পর কন্যাপক্ষ আবার বস্ত্রাদি উপহার দান করেন। এই অনুষ্ঠান 'খিলাত' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যদি 'নিকাহ' নামক বিবাহের মুখ্য অঙ্গ ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত না হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে এই সময়ে তাহার অনুষ্ঠান হয়। হিন্দু পাত্র যেমন কন্যার সীমন্তে সিন্দূর-রেখা আঁকিয়া দেন, মুসলমান বরও তেমনি বধূর ললাটে চন্দন প্রলেপ মাখাইয়া দেন। এই অনুষ্ঠানের নাম 'মঙ্গভারি'। এই সময়ে ক্ষেত্রোপযোগী কবিতা আবৃত্তি করা অথবা গান গাওয়া হইয়া থাকে। হিন্দুদের মধ্যেও 'ধুরচাক' বা 'কন্যা নিরীক্ষণে'র সময় যুবকদের মধ্যে ব্যঙ্গ-কৌতুকপূর্ণ এবং পণ্ডিতগণের মধ্যে গাম্ভীর্যপূর্ণ কবিতার বাদ-প্রতিবাদ করিবার প্রথা আছে। প্রতিটী ক্ষেত্রেই হিন্দু ও মুসলমান মহিলাগণ যে সঙ্গীত গান করেন, তাহার সুর ও সারমর্ম [illegible]তে প্রায় অনুরূপ।

সাধারণতঃ কন্যা-গৃহে একদিন অবস্থানের পর বরপক্ষ প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় দিন পাত্রকে মণ্ডপে লইয়া যাওয়া হয় এবং বাড়ীর মহিলাগণ কর্তৃক এই সময়ে কতকগুলি স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এগুলি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান নয়; কাজেই স্থানভেদে ইহাদের প্রকার-ভেদ হইয়া থাকে। *এই সময়ে হিন্দু পাত্রকে 'উবটন' মাখাইবার চেষ্টা হইয়া থাকে, কিন্তু সে তাহাতে ততক্ষণ সম্মত হয় না যতক্ষণ না কোন উপহারের প্রতিশ্রুতি সে আদায় করিতে পারে।* রাত্রিকালে পাত্রকে কন্যার কক্ষে লইয়া গিয়া যে সমস্ত আচার-আচরণ অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম 'কোহবর'। বরপক্ষ যাত্রা করিবার পূর্বে 'মুহদেখি' অর্থাৎ মুখ দেখার পালা সমাধা হয়। বর-কন্যাকে একত্র বসাইয়া বরপক্ষীয় ব্যক্তিগণ কন্যার মুখ দেখেন ও উপহার দান করেন। সর্বশেষ অনুষ্ঠানের নাম 'বিদাই' অর্থাৎ বিদায়। এই উভয় অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তীকালে বরযাত্রীরা কন্যাপক্ষের গৃহে ভোজন সমাধা করিয়া লন। মুসলমান-গণের মধ্যেও বরকে মণ্ডপে লইয়া যাওয়ার প্রথা আছে। তথায় গিয়া বর ও বধূ দর্পণে পরস্পরের মুখ দেখিয়া থাকেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিদায়ের সময় পাত্র ও কন্যা পাল্কীতে রওয়ানা হন। তাঁহাদের সঙ্গে চলে বিবাহের

যৌতুকস্বরূপ প্রদত্ত বস্ত্র, বাসন ও সংসারের নিত্যব্যবহার্য আরও নানা প্রকারের তৈজসপত্র। হিন্দুদের মধ্যে গো-দানের প্রথা আছে। অবশ্য সামর্থ্য অনুযায়ী কেহ ঘোড়া, কেহ হাতী এবং আজকাল মোটর গাড়ীও দিয়া থাকেন।

মুসলমানরা পাত্রীকে সরাসরি পাত্র-গৃহে লইয়া যান না। গ্রামস্থ কোন দরগায় বা ওই জাতীয় অপর কোন স্থানে তাঁহাকে লইয়া অপেক্ষা করেন। পাত্র-গৃহের মহিলাগণ জল ও আম্রশাখা লইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন ও কতকগুলি স্ত্রী-আচার পালন করেন। বর-কন্যা পাত্র-গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলে, বরের ভগ্নীপতি তাঁহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়ান এবং উপহারের প্রতিশ্রুতি না দিলে গৃহে প্রবেশ করিতে দেন না। হিন্দুদের মধ্যেও পাত্রের ভগ্নীপতি কর্তৃক এইরূপ পথ-রোধের ও উপহারের প্রতিশ্রুতি আদায়ের প্রথা আছে। অতঃপর বর-বধূকে গ্রামের কালীস্থান অথবা অন্য কোন দেবতার স্থানে লইয়া যাওয়া হয়।

হইতে পারে এই সব আচার-অনুষ্ঠান ইসলামের হাদিস-সম্মত নয়, এমনকি, গোঁড়া মুসলমানগণের চক্ষে ইহা হাদিস-বিরুদ্ধ বলিয়াও মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আচার-আচরণগত নিগূঢ় সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, হিন্দুধর্ম অনুযায়ী বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইবার নয়, জীবনে তো নয়ই, এমনকি মৃত্যুর পরেও নয়। কাজেই হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহের প্রশ্নই উঠে না। ইসলাম ধর্মে এরূপ কোন নিষেধ নাই, শুধু তাহাই নয়, তাহার অনুকূলে সর্বোচ্চ সমর্থন বিদ্যমান, কারণ স্বয়ং ধর্মগুরু মহম্মদ বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন। তথাপি হিন্দু প্রথা ও পরিবেশ মুসলমান সমাজের উপর এরূপ গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, অন্ততঃপক্ষে উত্তর ভারতে মুসলমান সমাজে বিধবা-বিবাহ কি সামাজিকভাবে, কি ধর্মের দিক দিয়া যদিচ নিষিদ্ধ নয়, তথাপি সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই স্ব স্ব শাস্ত্রসম্মত উপায়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন। শব কবরস্থ করিবার পূর্বে মুসলমানগণ প্রার্থনা করেন এবং পরেও মৃত্যুর তৃতীয়, চতুর্থ, দশম ও চতুর্দশ দিনে পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা ও দরিদ্রদিগকে খাদ্য-বিতরণের প্রথা প্রচলিত আছে। জানিনা মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে এরূপ অনুষ্ঠানের কোন বিধান আছে কিনা, তবে প্রত্যক্ষতঃ হিন্দুদের পারলৌকিক কৃত্যের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়, কারণ হিন্দুরাও মৃত্যুর দ্বিতীয়, সপ্তম, দশম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও ত্রিংশৎতম দিবসে স্বর্গত আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, পিণ্ডদান ও দরিদ্রদিগকে অন্ন বিতরণ করিয়া থাকেন।

এমনকি, মুসলমানগণ জাতিভেদ-প্রথার প্রভাব হইতেও নিজদিগকে মুক্ত রাখিতে সক্ষম হন নাই। সৈয়দ, শেখ, পাঠান, মালিক, মোমীন, মনসুর, রায়িন, কসাব, রাকি, হাজাম, ধোবী প্রভৃতি আরও অনেক নাম মুসলমান সমাজে জাতিগত স্তরভেদের কথাই ব্যক্ত করে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বৃত্তিগত ও কতকগুলি বংশ ও জন্মগত। বিধবা-বিবাহের মত এই সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক বৈবাহিক

সম্বন্ধ স্থাপন কি ধর্মের দিক দিয়া, কি সামাজিকভাবে কোনরূপেই নিষিদ্ধ নয়; তথাপি অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদের পরিণয়-সম্পর্ক আপন আপন শ্রেণীগত গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। বিবাহের কথা ছাড়িয়া দিলেও, যাঁহারা এই সম্প্রদায়সমূহের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস ও চলাফেরা করেন, তাঁহারাই উপলব্ধি করিবেন, হিন্দুদের বিভিন্ন স্তরের সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্যের মত ইহাদের মধ্যেও অনুভবগম্য অথচ প্রকাশের অযোগ্য এক অতি সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য-চেতনা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। এ সম্পর্কে কেবলমাত্র মুসলমান ভাঙ্গির কথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবেঃ মুসলমান সমাজে তাহাদের সামাজিক মর্যাদা হিন্দু ভাঙ্গিদের অপেক্ষা আদৌ উন্নততর নয়। ইহার অর্থ এ নয় যে, ইস্লাম এইরূপ জাতিভেদ-প্রথা সমর্থন করে; ইহার দ্বারা এই কথাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতীয় মুসলমানগণ পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব হইতে আপনাদিগকে মুক্ত রাখিতে সক্ষম হন নাই।

এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দুসমাজ হইতে যাহারা ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে, মুসলমান সমাজে এক বিরাট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহারাই এবং দীক্ষালাভের পূর্বে হিন্দুসমাজ হইতে তাহারা যে আচার-আচরণ সাথে করিয়া লইয়া গিয়াছিল, এই দীর্ঘকাল পরেও আজিও তাহারা সযত্নে সে সমুদয় রক্ষা করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'মালকানা রাজপুতদের' কথা উল্লেখ করা যাইতে পারেঃ প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে ইহাদিগকে হিন্দুধর্মে পুনর্দীক্ষিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল; তাহা সার্থক তো হইলই না, বরঞ্চ সে প্রচেষ্টার ফলে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য অতি মাত্রায় সৃষ্ট হয়। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত এই মালকানা সম্প্রদায় আজিও হিন্দুসমাজের আচার-অনুষ্ঠান যথারীতি পালন করিয়া আসিতেছে। ইহারা ছাড়াও আরও অন্যান্য অনেক সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের পুরাতন প্রথা আজও পরিহার করেন নাই।

আবার ইহাও সর্বজনবিদিত যে, ইসলামের নিজস্ব বিধান থা[illegible] সত্ত্বেও বহু সম্প্রদায় মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইবার পূর্বে যে উত্তরাধিকার আইনের অধীন ছিল, দীক্ষার পরেও তাহারা তাহাই অনুসরণ করিয়া চলিত। খোজা, কুচি মেমন ও বোহারাগণ বোম্বাইয়ের সংগতিসম্পন্ন মুসলমান সম্প্রদায়। তাঁহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যে কেবলমাত্র ভারতেরই সর্বত্র ব্যাপ্ত তাহা নয়, দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকা, আরব, পারস্য ও মালয়ের সহিতও তাঁহাদের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ বিদ্যমান। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই সে দিন ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত কেবলমাত্র হিন্দু রীতিনীতিই অনুসরণ করিয়া চলিতেন না, হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের অনুশাসনও মান্য করিয়া চলিতেন। অনুরূপভাবে বেলুচী ও কোন কোন পাঞ্জাবী মুসলমান সম্প্রদায় নিজস্ব প্রথাপদ্ধতি পালন করিয়া থাকেন। মোপলাগণ 'মারুমাক্কাথায়াম' আইন দ্বারা অনুশাসিত। ১৯৩৭ সালে মুসলমানদের পক্ষে কেবলমাত্র সরিয়তের প্রয়োগ বিহিত করিয়া এক আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহার দ্বারা ঘোষিত হয়, সরিয়ৎ-বিরোধী যে কোন প্রথা বা পদ্ধতি প্রচলিত থাকুক না কেন—তাহা অগ্রাহ্য হইবে।

হিন্দুরা সকল সময়েই মুসলমানদের সহিত একত্র পানাহার করিতে অস্বীকার

করিয়াছে, ইহা অতি সত্য কথা। এই নিষেধ যে কেবল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেই বিদ্যমান তাহা নয়, হিন্দুসমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়সমূহের ভিতরেও ইহার প্রভাব পূর্বেও ছিল এবং বর্তমানেও আছে। এইজন্যই কোন ব্রাহ্মণ রাজপুতের সহিত ভোজন করে না, আবার রাজপুত বেনিয়া অথবা কায়স্থের সহিত আহার করে না। এমন কি ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যেও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের পক্ষে সরযূপারীর সাথে, অথবা দাক্ষিণী ব্রাহ্মণের পক্ষে বাঙ্গালী কিম্বা মৈথিলী ব্রাহ্মণের সঙ্গে একত্র পানাহার করা নিষিদ্ধ। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যেখানে নাই—সরযূপারী ব্রাহ্মণ-গণ সেরূপক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যেও খাদ্য পানীয়ের আদানপ্রদান করেন না। অনুরূপ-ভাবে শ্রীবাস্তব কায়স্থের পক্ষে অম্বস্থ অথবা কর্ণ কায়স্থের সহিত পংক্তি ভোজন নিষিদ্ধ! কোন অ-হিন্দু যদি বিধি-নিষেধের এই বিচিত্র রাজ্যে প্রবেশ করেন, অগণিত গণ্ডীর গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়া তিনি দিশেহারা হইয়া পড়িবেন। এই বিধি-নিষেধ যে কেবলমাত্র বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাহা নয়, ইহার প্রভাব বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য এবং তাহার রন্ধন প্রণালীর উপরেও প্রযুক্ত হয়। বিহারে ঘৃত-পক্ক লুচি অপরে স্পর্শ করিলেও খাওয়া চলিতে পারে, কিন্তু রুটী অচল; বাংলায় এরূপ কোন প্রথার প্রচলন নাই। কোন কোন তরকারি লবণ ব্যতিরেকে রন্ধন করিলে আহার্য হয়, কিন্তু লবণ সহযোগে রাঁধা হইলে তাহা আর খাওয়া চলে না। প্রদেশ, জাতি ও এমন কি খাদ্যবস্তু ভেদে এই বিধিনিষেধের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। এই সামাজিক পরিবেশের মধ্যে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে এই বিধিনিষেধসমূহের সহিত সম্যক্‌ভাবে পরিচিত হওয়াই অসম্ভব, তাহাদের নৈতিক যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা তো বহু দূরের কথা। এইজন্যই রাজপুত ও কায়স্থ একে অপরের আহার্য গ্রহণে অসম্মত হইলে কেহ যদি অপমান বোধ না করেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই থাকে না। ইহা তাঁহাদের পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার, কাজেই অপমান বা হীনতার কোন প্রশ্নই তাঁহাদের মনে জাগে না। এমন কি তথাকথিত অস্পৃশ্যরা এই সেদিন পর্যন্ত তাহাদের অবস্থাকে বিদ্বেষ ও বেদনাবিমুক্তচিত্তে অদৃষ্টলিপি বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। আমার উপরি-উক্ত বক্তব্য কেবলমাত্র হিন্দু জনসাধারণের পক্ষেই প্রযোজ্য; যাঁহারা আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, কিম্বা ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের সংস্কার আন্দোলনের আওতায় আসিয়াছেন, অথবা মহাত্মা গান্ধীর একীকরণ প্রভাবের পরিধির মধ্যে পড়িয়াছেন, তাঁহারা ইহার আমলে আসেন না। এই সমস্ত শিক্ষিত সংস্কারমুক্ত হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই এই জাতীয় বিধিনিষেধের প্রভাব পরিহার করিয়াছেন এবং যাঁহারা তাহা এখনও কোনক্রমে পালন করিয়া চলিতেছেন মাত্র, তাঁহারাও এ সবের অনুকূলে কোন নৈতিক অথবা বুদ্ধিগত সমর্থন সক্রিয়ভাবে দান করেন না।

যে সব মুসলমান হিন্দু ও তাহাদের জাতিভেদপ্রথাশাসিত সমাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারাই এই বিধিনিষেধগুলিকে সহানুভূতির চক্ষে না দেখিয়া পারেন নাই; তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের হীনতা প্রতিপাদনের প্রয়াস নয়, পুরুষানুক্রমে অনুসৃত ও স্বীকৃত প্রথা মাত্র; তাই ইহাদের প্রতি তাঁহারা

কোনরূপ বিদ্বেষ বা বিরাগ পোষণ করেন না। সেইজন্যই নিমন্ত্রিত হইলে হিন্দুদের বিবাহ ও সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে তাঁহারা স্বচ্ছন্দচিত্তে যোগ দিয়াছেন এবং হিন্দুদিগকেও অনুরূপ অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিজেদের গৃহে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। হৃদ্যতাপূর্ণ সামাজিক সম্পর্কের পথে আহার্য কোনদিন অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় নাই। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই পরস্পরের সামাজিক সংস্কার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একে অপরকে অতিথিরূপে আপ্যায়িত করিয়াছেন। এক্ষেত্রেও আমি যাহা বলিলাম, তাহা সরল গ্রাম্য মুসলমান জনসাধারণের পক্ষেই প্রযোজ্য, আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমানদের সম্বন্ধে নয়। আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য এ নয় যে, জাতিভেদ-প্রথা আমি সমর্থন করিতেছি অথবা তজ্জনিত অকল্যাণের দীর্ঘজীবন আমি কামনা করিতেছি। বস্তুতঃ যাহা ঘটিয়াছে, আমি শুধু তাহারই উল্লেখ করিলাম মাত্রঃ কিন্তু সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে এবং তৎসহ লোকের দৃষ্টিভঙ্গী এবং মনোভাবও বদলাইয়াছে। এই সমস্ত প্রভেদ ও পার্থক্যমূলক প্রথাগুলিকে ঘৃণা করেন এরূপ লোকের সংখ্যা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে, এদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সে সমস্ত যতদূর সম্ভব ও যত সত্বর সম্ভব দূরীভূত হয়, তাহার জন্য সচেষ্ট হওয়া একান্ত কর্তব্য; তাই বলিয়া সেই পার্থক্যসমূহের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া, কি অতীতে, কি বর্তমানে সাম্প্রদায়িক মিলনের পথে তাহাদিগকে অন্তরায়-স্বরূপ স্থাপন করিবার চেষ্টাও যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

হিন্দু ও মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামসমূহে হয়তো কোথাও হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যাধিক, আবার অন্যত্র হয়তো মুসলমান সমাজই সংখ্যাগুরু, তাহা সত্ত্বেও একে অপরের সহিত ভাই, চাচা, কাকা প্রভৃতি মধুর সম্পর্ক স্থাপন করিয়া পারস্পরিক সম্প্রীতিতে বাস করিতেছে এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রতিনিয়ত সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়। এমন কি উভয় সম্প্রদায়ের নিম্নস্তরে নামগত ঐক্যের দৃষ্টান্তও নিতান্ত দুর্লভ নয়; কোন কোন ব্যক্তি হয়তো মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইবার পরেও তাহার পূর্বের হিন্দু নাম এখনও বহন করিতেছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু হয়তো মুসলমান নাম গ্রহণ করিয়াছে। ইহা যে কেবল বৃত্তি, উপাধি বা পদজ্ঞাপক পদবীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তাহা নয়, ব্যক্তির সত্যকার নামকরণের ক্ষেত্রেও এইরূপ ঘটিয়া থাকে। মানুষ ছাড়াও, গ্রাম, সহর, পুষ্করিণী—এক কথায় নামধেয় যাহা কিছু থাকা সম্ভবপর সে সমস্তই অধিকারী ও অধিবাসীনির্বিশেষে কোথাও পুরোপুরি হিন্দু নাম, কোথাও বা গোটাগুটি মুসলমান নাম, আবার অন্য কোথাও বা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কিন্তু অতীতের সেই পুরাতন গ্রাম্যজীবন আজ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বিহারের এক গ্রামে আমার জন্ম, গ্রামের সহিত নাড়ীর যোগ আজিও আমার ছিন্ন হয় নাই—এই হেতুতে অল্প কিছুদিন পূর্বেও আমার কৈশোরে গ্রাম্যজীবনের যে স্বরূপ আমি দেখিয়াছি এবং আজিও যাহার চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই—সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার আমার অধিকার আছে বলিয়া বিশ্বাস করি। প্রত্যেকটি গ্রামই অল্পাধিকতর এক একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ইউনিট ছিল। প্রত্যেক গ্রামেরই

নিজস্ব আবাদী জমি, গোচারণ-ক্ষেত্র আপন আপন শ্রমিক, শিল্পী ও অন্যান্য বৃত্তিজীবী সম্প্রদায় ছিল। এই কারণে একটি আদর্শ গ্রাম্য সমাজজীবনে কৃষক ও শ্রমিক, জমিদার ও ব্রাহ্মণ এবং বহুক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান একত্র বসবাস করিত। প্রত্যেক গ্রামেরই আপন আপন ছুতোর ও কামার, নাপিত ও ধোপা, কুমোর ও চুড়িওয়ালা, ভেলেরি ও তিলি, মেথর ও ঝাড়ুদার, চামার ও ডোম থাকিত। গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইহাদের প্রত্যেকেরই বিশিষ্ট কার্যকারিতা ছিল এবং গ্রামস্থ কৃষকগণ ফসলের সময় শস্য দিয়া তাহাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক প্রদান করিত। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারের আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করণীয় কর্তব্য থাকিত এবং কর্মকর্তারা তাঁহাদের সামাজিক মর্যাদা বা আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী তাহাদিগকে পারিশ্রমিক বা পুরস্কার দিয়া তুষ্ট করিতেন। অনেক ক্ষেত্রে কর্মকর্তারা হয়তো মুসলমান হইতেন, কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুদের অপেক্ষা তাঁহারা যে কম সেবা পাইতেন এরূপ কখনও ঘটিত না। হিন্দুদের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে নাপিতের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে চূড়াকরণ অনুষ্ঠানের কথা; উচ্চবর্ণীয় হিন্দু বালকদের উপনয়নের সঙ্গে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং এক্ষেত্রে নাপিতকেই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। বিবাহ প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাহার কিছু না কিছু কর্তব্য রহিয়াই যায়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারেও সকল শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেই খেউরীর প্রথা আছে। কাজেই এই উপলক্ষে এবং শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান প্রভৃতি অন্যান্য ব্যাপারেও নাপিত অপরিহার্য। অনেক গ্রামে হয়তো হিন্দু নাপিত নাই; সেক্ষেত্রে মুসলমান হাজামই কেবলমাত্র আহার্য ও পানীয় পরিবেষণ ছাড়া হিন্দু নাপিতের করণীয় অন্যান্য সমস্ত কর্তব্যই সম্পাদন করে। বলা বাহুল্য, এই কার্যগুলি নিঃসন্দেহে ধর্মমূলক, কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দু কর্মকর্তা মুসলমান হাজামের নিকট হইতে কাজ লইতে কোনদিন অসম্মতি জ্ঞাপন করেন নাই; অথবা করণীয় কার্যগুলি স্পষ্টতঃ ইসলাম ধর্মশাস্ত্র বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান নাপিত কোনদিন তাহা করিবার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে নাই। হিন্দু সধবা নারীদের পক্ষে চুড়ি পরা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু বিবাহ ব্যাপারে বা অন্যান্য শুভকার্যে চুড়ি পরিবার যখন প্রয়োজন হয়, তখন তাহা পরাইবার জন্য পর্দানসীন সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের অন্দর মহল পর্যন্ত যাহারা অবাধে প্রবেশলাভ করে, সমস্ত ক্ষেত্রেই তাহারা মুসলমান রমণী। অনুরূপভাবে হিন্দু ও মুসলমান ঝাড়ুদার এবং রজক সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলকে তাহাদের দৈনন্দিন ও আনুষ্ঠানিক পরিচর্যা দ্বারা সমভাবে পরিতুষ্ট করিয়া থাকে। মালী নামে আর এক শ্রেণী আছে, যাহারা ফুলের চাষে ও মালা রচনায় সিদ্ধহস্ত, তাহাদের কার্য প্রাত্যহিক ও পার্বণসংক্রান্ত প্রত্যেক ধর্মমূলক ব্যাপারে ফুল সরবরাহ করা। ইহারাও হিন্দু-মুসলমান অবিভেদে নিজেদের করণীয় কর্তব্য নিষ্পন্ন করে। কোন হিন্দুই দেবার্চনার জন্য মুসলমান মালীর নিকট হইতে ফুল লইতে অস্বীকার করে না অথবা মুসলমান মালীও মন্দিরের দেব-বিগ্রহের অর্চনার জন্য কিম্বা অপর কোন ধর্মানুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য ফুল দিতে অসম্মত হয় না। এই পারস্পরিক আদান-

প্রদান শত শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং উভয় সম্প্রদায়ের নিগূঢ় সংস্পর্শের ফলেই তাহা যে সম্ভবপর হইয়াছে একথা অনস্বীকার্য।

পোষাক

পরিধানকারী যে-স্থানের অধিবাসী তাহারই আবহাওয়ার উপর পোষাকের প্রকার অনেকাংশে নির্ভর করে। সেইজন্যই ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে ও বহুল পরিমাণে পরিধানকারীর অবস্থাভেদে পোষাকের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সমাজের নিম্নতম স্তরের দরিদ্রদের মধ্যে যেমন পোষাকগত বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না, উচ্চতম স্তরের ধনীদের মধ্যেও তাহাই। পার্থক্য যেটুকু পরিস্ফুট হয়, তাহা নিঃস্ব ও সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের ভিতরেই। কোন বৈদেশিকের চক্ষেই পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, ডাক্তার সচ্চিদানন্দ সিংহ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, বিহার প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি কুমার গঙ্গানাদ সিংহ, মুসলিম লীগের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কদ্বয় নবাব মহম্মদ ইসমাইল ও চৌধুরী খালিকুজ্জমান, স্যার আলি ইমাম এবং এমন কি কায়েদ-ই-আজম জিন্না সাহেব প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পোষাকগত কোনরূপ পার্থক্যই ধরা পড়িবে না। ঠিক তেমনি ভাবেই, যদিও সর্দার শার্দুল সিং কবিশের ও সর্দার মঙ্গল সিং শিখ সম্প্রদায়ের, তথাপি তাঁহাদের ও মৌলানা জাফর আলি এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মধ্যে একমাত্র টুপির পার্থক্য ছাড়া, বেশগত অন্য কোন বিভিন্নতা নাই। আবার সেই বৈদেশিক যদি বিহার, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ অথবা পাঞ্জাবের কোন গ্রামে গিয়া কৃষিকার্যরত কোন মুসলমান চাষীকে দেখেন, হিন্দু চাষীর সহিত তাহার পোষাকগত কোন পার্থক্য তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইবে না। ফেজটুপি আমি গণনার মধ্যে আনিতেছি না, কারণ তাহা অভারতীয়। তাহা ছাড়া, এদেশে তাহার প্রচলন অতি আধুনিক ব্যাপার এবং তুরস্ক তাহা পরিত্যাগ করিলেও তাহার অনুকরণে কোন কোন মুসলমান, বিশেষ করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহা পরিধান করিয়া থাকেন।

অবশ্য হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানগণের মধ্যেই পায়জামার প্রচলন অধিক, এই যুক্তিতে কেহ কেহ হয়তো দেখাইতে চাহিবেন, স্থান বিশেষে পায়জামা মুসলমানগণের নিজস্ব পরিধেয়; কিন্তু হিন্দুদের মধ্যেও পায়জামার ব্যবহার নিতান্ত কম নয় এবং অধিকাংশ মুসলমানের পক্ষেও ইহা নিত্যপরিধেয় পোষাক নয়। ধুতি শব্দটি সংস্কৃত মূল হইতে উৎপন্ন এবং বিশিষ্টরূপে ইহা হিন্দু পরিচ্ছদ। তাহা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলমানই ইহা কোন না কোন আকারে পরিধান করিয়া থাকেন। ভারতের গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে ইহার অসংখ্য প্রমাণ প্রতিদিন প্রত্যক্ষগোচর হইবে।

ব্যক্তিগত ব্যবহারের বিলাসদ্রব্য উভয় সম্প্রদায়ের পর্দা ঠেলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এমন বহু অলঙ্কার আছে যাহার ব্যবহার হিন্দু ও মুসলমান মহিলাগণের মধ্যে সমভাবে প্রচলিত। তাহাদের কোনটি হয়তো হিন্দু নামে, আবার কোনটি মুসলমান নামে পরিচিত। তাহা সত্ত্বেও, হিন্দু ও

মুসলমান মহিলাগণ নাম-নিরপেক্ষভাবে সমান সমাদরের সহিত তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। শাড়ীও তেমনি ভারতীয় মহিলাগণের সাধারণ পরিচ্ছদ। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মহিলা মাত্র ইহা পরিধান করিয়া থাকেন। অবশ্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও অন্যান্য কোন কোন স্থানে মহিলাদের মধ্যে পায়জামার ব্যবহারও প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাহা কেবলমাত্র মুসলমান মহিলাগণের মধ্যেই নয় হিন্দু এবং শিখ রমণীগণও তাহা ব্যবহার করেন। পাহাড় অঞ্চলে শীতের আতিশয্যের জন্য পায়জামা সর্বসাধারণের নিত্যব্যবহার্য পরিচ্ছদ।

পর্দা

এখানকার যে সামাজিক প্রথাটী বৈদেশিক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে—তাহা হইতেছে পর্দাপ্রথা; স্থানে স্থানে ইহা "গোশা' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা বিশুদ্ধ ইসলামীয় প্রথা, যদিও ভারতীয় পরিবেশের ভিতরে ইহা এক বিশিষ্ট আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। শরিয়তের বিধান অনুযায়ী নাকি মহিলাদের বাড়ীর বাহির হওয়া নিষিদ্ধ নয়; বাহিরে যাইতে হইলে, দেহের অন্যান্য অংশের মত মুখও বোর্‌কা অথবা অন্য কোন অবগুণ্ঠনের সাহায্যে আবৃত করিয়া যাইতে হইবে. ইহাই নাকি শরিয়তের বিধান। ভারতে কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহাদিগকে বাড়ীর বাহির হইতে দেওয়া হয় না। অবশ্য ইহা তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভব যাঁহাদের সংগতিতে ইহার সংকুলান হয়। দরিদ্রের পক্ষে ইহা সাধ্যাতীত; নানাবিধ কার্যে বাড়ীর বাহির তাহাদিগকে হইতেই হয়।

প্রাচীন হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা পর্দা-প্রথা সমর্থন করে না। হিন্দু মহিলাগণ গার্হস্থ্য পরিবেশের বাহিরে আসিয়া তাঁহাদের স্বামীদের সহকর্মিণী হইয়াছেন—এরূপ দৃষ্টান্ত সংস্কৃত সাহিত্যে অজস্র দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান যুগের পর্দাপ্রথা মুসলমানদের নিকট হইতেই গৃহীত এবং যে সমস্ত স্থান ইস্‌লাম প্রভাবের পরিধির মধ্যে আসিয়াছে সেই সেই ক্ষেত্রে এই প্রথা নিরতিশয় কঠোরতার সহিত পালিত হয়। উত্তর ভারতের মত দক্ষিণ ভারতে মুসলিম প্রভাব অত অধিক পরিমাণে প্রবেশলাভ করে নাই বলিয়া সেখানে পর্দাপ্রথার প্রচলন নাই; অবশ্য কেহ কেহ যে তাহা না মানেন এমন নয়; তবে যাঁহারা পর্দাপ্রথা পালন করেন, তাঁহারা মুসলমানদের অনুকরণেই তাহা করিয়া থাকেন। আজ পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে যে অভিযান চলিয়াছে, হিন্দুদের মধ্যে তাহার পরিচালনা যত যত সহজভাবে সম্পন্ন হইতেছে, মুসলমানদের মধ্যে তাহা নয়; তাহার কারণ হিন্দুশাস্ত্রে ইহার সমর্থন নাই, কিন্তু ইস্‌লাম শরিয়ত দ্বারা ইহা সমর্থিত।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, উভয় সম্প্রদায়ই পরস্পরের দ্বারা প্রচুরভাবে প্রভাবিত। তাহাদের মধ্যে ধর্মগত পার্থক্য বিদ্যমান—ইহা অতি সত্য কথা এবং তাহার ফলে তাহাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারে গড়িয়া উঠিয়াছে—ইহাও অবশ্য স্বীকার্য, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা পরম শান্তি ও সৌহার্দ্যের সহিত পাশাপাশি বাস করিয়া আসিয়াছে।

ইহাও সত্য যে, তাহারা কখনও মিলিত হইতে বা একে অপরকে পরিপূর্ণরূপে আত্মস্থ করিতে সক্ষম হয় নাই। এরূপ ঘটিবে—সে আশাও অবশ্য কেহই পোষণ করিত না। ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি ভারত হইতে বহুদূরবর্তী এক দেশের স্বতন্ত্র পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে; ধর্মাবলম্বিগণের জীবন নিয়ন্ত্রণ ও অনুশাসনের জন্য তাহার নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; এরূপ-ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের মধ্যে ইহাকে গ্রাস করিয়া লওয়া বা হিন্দুধর্ম ইহার মধ্যে অবলুপ্ত হওয়া—উভয়ই অসম্ভব। হিন্দু সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শন অতি উচ্চাঙ্গের; কোটি কোটি লোক তাহার প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত। যত বিরোধী মতবাদ ভারতের মাটিতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কালক্রমে সে সমস্তই হিন্দু-ধর্মের মধ্যে তাহাদের সত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছে। অধ্যাপক রাইস ডেভিস বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সম্পর্ক বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মের মধ্যে হিন্দুধর্মই স্বাধীন মত ও চিন্তা প্রকাশের প্রশস্ততম অধিকার প্রদান করে।' ১৮ বেদ ও উপনিষদের যুগ হইতেই এই ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে এবং এত বিভিন্ন প্রকারের দর্শন ও চিন্তাধারার উৎপত্তির মূলগত কারণও ইহাই। সেইজন্যই কোন একটি বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাসের গ্রহণ কোন হিন্দুর পক্ষেই বাধ্যতামূলক নয়। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনযাপন সম্পর্কে এমন কতকগুলি অনুশাসন হিন্দুধর্মে বিহিত আছে, যাহা স্থান ও কাল ভেদে প্রয়োজনমত পরিবর্তনসাপেক্ষ। এই কারণেই হিন্দুদের মধ্যে সংস্কারের ক্ষেত্র অতিশয় প্রশস্ত এবং হিন্দুধর্ম তাহার এই অন্তর্নিহিত স্থিতি-স্থাপকতার গুণে একদিকে যেমন পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিকের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিয়াছে, অপরদিকে তেমনি যে সমস্ত ধর্মবিশ্বাসের পশ্চাতে দীর্ঘকাল অনুসৃত অনুরূপ দার্শনিক বা ধর্মগত ভাবধারার ঐতিহ্য ছিল না—[illegible]দিগকে সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছে। চিন্[illegible] ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা ও সামাজিক সামঞ্জস্য বিধানের এই সামর্থ্য তাহার নিজের মধ্য হইতে উৎপন্ন বিরুদ্ধ মতবাদসমূহকে আপনার মধ্যে মিলাইয়া লইবার পক্ষে প্রচুর সাহায্য করিয়াছে, এমনকি সেই সব বিরোধী সম্প্রদায়ের প্রবর্তকগণকে পর্যন্ত অবতাররূপে গ্রহণ করিয়া লইতে দ্বিধাবোধ করে নাই: দৃষ্টান্তস্বরূপ বৌদ্ধধর্মের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বুদ্ধ হিন্দুধর্মে অবতাররূপে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা সত্ত্বেও হিন্দুধর্মশাস্ত্রে বৌদ্ধ মতবাদের বিরুদ্ধ সমালোচনার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এই ভাব-সংঘাত পরিপাককালীন আভ্যন্তরীণ সংঘাতের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কিন্তু আজ বৌদ্ধ মতবাদ ও তদনুমোদিত নীতি ও অনুশাসন হিন্দুধর্মের মধ্যে এমন পরিপূর্ণরূপে গৃহীত ও একীকৃত হইয়া গিয়াছে যে, বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষে বৌদ্ধ মতবাদের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই শাখা এবং তাহার সমগ্র দার্শনিক পটভূমি কি উপলব্ধি, কি প্রকাশভঙ্গী সর্বদিক দিয়াই একান্তভাবে হিন্দুভাবাপন্ন। এই কারণেই ভারতে হিন্দুধর্মের সহিত তাহা অতি সহজেই একীভূত হইয়া গেল: কিন্তু বহির্ভারতের অন্যান্য যে সমস্ত দেশে গিয়া

18. Rhys Davids: Buddhist India, P. 258.

সে প্রতিষ্ঠা ও প্রসারলাভ করিল, সেখানে অন্য ধর্মকে নিজের মধ্যে লয় করিয়া লওয়া, অথবা অন্য ধর্মের মধ্যে নিজেকে বিলীন করিয়া দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে, হিন্দুধর্ম যে ইসলামকে আপনার মধ্যে একীকৃত করিতে পারিল না, বা ইসলামের মধ্যে নিজে একীভূত হইল না—তাহাতে বিস্ময় বোধ করিবার কোন হেতুই থাকে না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের উভয়ের সাধারণ কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহারা পাশাপাশি বসবাস করিয়াছে ও বর্ধিত হইয়াছে। তাহাদের স্বাতন্ত্র্য সপ্রমাণের জন্য সুদীর্ঘ সাহচর্যের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে সংঘাত ও সংঘর্ষের দৃষ্টান্তসমূহ আহরণ করিয়া আনিলে, তাহার ফলে বিরোধ-বিদ্বেষই সৃষ্টি করা হইবে, অন্য কোন মহদুদ্দেশ্য সাধিত হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। তাহা অপেক্ষা বরঞ্চ ইহাই প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করা শ্রেয়স্কর ও সম্মানজনক যে, অতীতে অধিকাংশ সময়ই তাহারা সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সহিত একত্র বসবাস করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও তাহা করা ছাড়া উভয়ের পক্ষে গত্যন্তর নাই।

এ সম্পর্কে যে দুইজন ইতিহাসের অধ্যাপকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিতে চাই, তাঁহাদের মধ্যে একজন হিন্দু—ডাঃ তারাচাঁদ, ইঁহার কথা ইতিপূর্বেও আমরা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি এবং অপরজন মুসলমান—মিঃ সালাহুদ্দীন খোদাবক্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্‌লামীয় আইন ও ইতিহাসের অধ্যাপক।

ডাঃ তারাচাঁদ বলেন, 'ভারতীয় জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইসলামের প্রভাব এত অধিক যে, তাহা অতিরঞ্জিত করা একরকম অসম্ভব বলিলেও চলে। প্রথা-পদ্ধতি, গার্হস্থ্য জীবনের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি ব্যাপার, সঙ্গীত, পোষাক-পরিচ্ছদ, রন্ধন-প্রণালী, বৈবাহিক অনুষ্ঠান, মেলা-মহোৎসব এবং সর্বশেষে মারাঠা, রাজপুত ও শিখ রাজন্যবর্গের দরবারী-আদব-কায়দা ও অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাহা সর্বাপেক্ষা অধিক সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট। বাবরের শাসনকালে হিন্দু এবং মুসলমানের জীবনযাপন ও চিন্তা প্রণালী এমন অবিকল অনুরূপ ছিল যে, তাহার বিশিষ্ট 'হিন্দুস্থানী ধরণ' তাঁহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণ এই ঐতিহ্যের সমাদর ও সমৃদ্ধি সাধন করিয়া যে গৌরবময় উত্তরাধিকার আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার জন্য গর্ববোধ না করিয়া পারি না।' ১৯

মিঃ সালাহুদ্দিন খোদাবক্স বলেন, 'একটা কথা প্রায়ই বলিতে শোনা যায় যে আর্য ও সেমিটিক জাতির মধ্যে যতখানি প্রভেদ, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য তাহা হইতে কম গভীর নয়; সে পার্থক্য জীবনের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত; সামাজিক আচার-ব্যবহার, মানসিক গঠনভঙ্গী ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ভিতর সে পার্থক্য এমন মৌলিক ও এত পরিস্ফুট যে, তাহাদের পারস্পরিক সংমিশ্রণ সম্পূর্ণ অসম্ভব, এমন কি অবাস্তব স্বপ্নবিলাস বলিলেও চলে: এ যুক্তির সারবত্তা আমি স্বীকার করি না। একথা যদি স্বীকার করিয়া লওয়াও হয় যে,

19. Tarachand: Op. cit.—Pp. 141—42.

বিদেশ হইতে আগত বিজয়ী জাতিরূপে মুসলমানগণ হিন্দু হইতে ঠিক ততখানিই পৃথক্—হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সহিত বৃটিশের পার্থক্য যে পরিমাণ; তথাপি ভুলিলে চলিবে না যে, বহু শতাব্দী ধরিয়া তাহারা পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছে, অবাধ মেলামেশার ফলে একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, স্থানীয় আচার-ব্যবহারের সহিত ভারতীয় রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং সর্বশেষে স্থানীয় বিশিষ্ট প্রথা ও পদ্ধতির প্রভাব তাহাদের অস্থিমজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ইহার অকাট্যতম প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় বিবাহ-অনুষ্ঠানের মধ্যেঃ এই সংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে হিন্দু প্রথাসম্মত, যথা, সধবার চিহ্নস্বরূপ সিন্দুর ধারণ, বিধবাদের আহার্য ও পরিচ্ছদ বিষয়ে বিধিনিষেধ, বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে আপত্তি, এমন কি আক্রমণ প্রভৃতি ছোটখাটো আরও অসংখ্য স্ত্রী-আচার। এই সব হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় জনসাধারণের প্রধান দুইটি অংশের মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা নিতান্ত অগভীর নয়। ইহা হইতেও স্পষ্টতর প্রমাণের সন্ধান মিলিবে ভাষা ও পরিচ্ছদগত সাদৃশ্যের মধ্যে। তাহা ছাড়া আপনারা যাহাই বলুন, বস্তুতঃ মুসলমান জনসংখ্যার অধিকাংশই হিন্দু সম্প্রদায় হইতে ধর্মান্তরিত। হিন্দু ও মুসলমান প্রভাব যে পরস্পরের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করিয়াছে, একের সামাজিক অনুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক চিন্তা অপরের বিশিষ্ট বর্ণে বিচিত্র ও অনুরঞ্জিত হইয়াছে ইহা অমূলক অনুমান নয়, বাস্তব ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত সত্য। উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহ এই সত্যেরই আনুকূল্য করে এবং সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, মুসলমান বিজয়ের পর হইতে হিন্দু ও মুসলমানের যুগল জীবনধারা দুইটি নদীর মত পাশাপাশি ভারতের বক্ষে বহিয়া আসিতেছে।[২০]

বহু শতাব্দী ধরিয়া স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে অসংখ্য হিন্দু এবং মুসলমান সজ্ঞানে হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, আমাদের সমাজ-জীবনের যে বিচিত্র কারুকার্যখচিত বস্ত্রখানি টানা ও পোড়েনে নিবিড় করিয়া বুনিয়া গিয়াছেন, অজ্ঞ ও অন্ধ রাজনীতির নিষ্ঠুর আক্রমণে তাহা কি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইবে?

(৩) ভাষা

যে কোন নামেই অভিহিত হোক না কেন, উত্তর ভারতের কথ্যভাষা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টার ফল না হইলেও, উভয়ের প্রভাবের দ্বারা যে পুষ্ট একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে সংস্কৃত ভাষা ও তাহার শাখা প্রাকৃত ও পালির মধ্যে প্রবেশ করা প্রয়োজন; কেননা, জনসাধারণের কথ্য হিসাবে সংস্কৃতের প্রচলন পরিত্যক্ত হইলে, তাহার স্থান গ্রহণ করে ইহারাই। মুসলমান আক্রমণকারী ও বিজেতৃগণের ভাষা গোষ্ঠী ও সংহতি ভেদে বিভিন্ন হইত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আরবী ও পারসীর প্রভাব তাহাদের উপর পরিলক্ষিত হইত সমধিক। মুসলমান শাসনকালে পারসীই দরবারী ভাষায় পরিণত হয় এবং উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের, বিশেষ করিয়া শাসনকার্য ও শাসক সম্প্রদায়ের সহিত

20. Quoted by Dr. Sachchidananda Sinha in his 'Some Eminent Bihar Contemporaries',—P. 185—6.

ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ইহার পঠন-পাঠন বহুল পরিমাণে প্রচলিত হয়। কিন্তু জনসাধারণের কথ্যভাষারূপে তাহা কোনদিনই গৃহীত হয় নাই এবং তাহা সম্ভবও ছিল না। যেহেতু অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমানেরই জন্মভূমি ভারতবর্ষ, সেইজন্য, এমন কি, তখনকার দিনেও মুসলমান জনসাধারণ পর্যন্ত তাহাকে আপনাদের কথ্যভাষারূপে গ্রহণ করিয়া লইতে পারে নাই। সেই কারণেই এদেশের হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এমন একটি ভাষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইল, যাহা বৈদেশিক মুসলমান শাসকবর্গের সহিত তাহাদের পারস্পরিক ভাববিনিময়ের বাহনরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। উভয় সম্প্রদায়ই সেই ভাষার উদ্ভাবন করিবার প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল এবং তাহার ফলে তাহা এত দ্রুত সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়া উঠিল যে আমীর খুসরু তাঁহার শাসনের অতি দূর অতীতকালেই এই ভাষাই তাঁহার কাব্য রচনার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন; তাঁহার রচিত সেই সব কবিতা জনসমাজে আজিও সমাদৃত। উর্দু ও হিন্দী স্বতন্ত্র ভাষারূপে স্বীকৃত হইলেও, উভয় ভাষার সমর্থকগণ ভাষাদ্বয়ের পুষ্টি ও প্রসারের পক্ষে হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত অবদানের কথা অস্বীকার করেন না। ধর্মপ্রেরণা লাভ করিবার জন্য, হিন্দুরা অধ্যয়ন করিত সংস্কৃত এবং মুসলমানগণ পাঠ করিত আরবী ও পারসী, কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের উভয়ের ব্যবহার্য সাধারণ ভাষার কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, ওই দুই ভাষা হইতে তাহার জন্য শব্দ চয়ন করিয়া আনিবে ইহা তাহাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। হিন্দী ও উর্দু নামে অধুনা পরিচিত ভাষাদ্বয়ের গঠনভঙ্গী তাই অনেকখানি অনুরূপ—পার্থক্য যাহা কিছু, তাহা শব্দ সঞ্চয়ের অংশ-বিশেষের মধ্যে পরিলক্ষিত। এইজন্যই উত্তর ভারতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বোধ্য ও কথ্য একটি মাত্র ভাষার প্রচলন আছে; অবশ্য শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের প্রাপ্ত শিক্ষা অনুযায়ী আরবী, পারসী বা সংস্কৃত শব্দ কম বেশী তাহার মধ্যে ব্যবহার করিয়া থাকেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, হিন্দু ও মুসলমানের এই সাধারণ উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

আমীর খুসরুর আমল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত হিন্দী ভাষার পুষ্টি ও ক্রম-পরিণতির পক্ষে মুসলমানদের যে দান, উক্ত ভাষার সমর্থকগণের পক্ষে তাহা বিস্মৃত হওয়া বা উপেক্ষা করা অসম্ভব। পণ্ডিত রামনরেশ ত্রিপাঠী কর্তৃক সংগৃহীত 'কবিতা কৌমুদী' নামক মুসলমান কবিদের লিখিত কাব্য-সংকলনখানি খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাহার মধ্যে তাঁহারা যে শুধু হিন্দী ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নয়, তাঁহাদের রচিত ভক্তিমূলক সংগীতগুলির বিষয়বস্তু পর্যন্ত হিন্দুভাবাপন্ন। হিন্দু সাহিত্যের অধিকাংশই যে সীতারাম ও রাধাকৃষ্ণের লীলা সম্বলিত, একথা সর্বজনবিদিত। কেবলমাত্র মুসলমান কবিদের রচিত ভক্তিমূলক যে সংগীতসমূহ গোরক্ষপুরের গীতা প্রেস কর্তৃক পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে ভক্ত-হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও অনুপ্রাণিত না হইয়া পারে না। গিরিধরের 'সওয়াইয়া'র মত রহিমণের দোহাও তাহার রস ও জ্ঞানগর্ভতার গুণে সমগ্র উত্তর ভারতের নিত্য ব্যবহার্য গার্হস্থ্য সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে। ভক্ত-সাধক কবীর বেদান্ত ও উপনিষদের দুরূহ তত্ত্বসমূহকে তাহাদের সুউচ্চ অবস্থান

হইতে নামাইয়া আনিয়া গ্রাম্য জনসাধারণের বোধগম্য করিয়াছেন; যোগী ও ঋষিদের নিভৃত আশ্রম কুটীর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া পল্লী কৃষকের পর্ণকুটীরে ছড়াইয়া দিয়াছেন। ভক্তিতত্ত্বকে জনপ্রিয় করিবার জন্য উত্তর ভারতে তুলসীদাস ও বাংলায় এবং উড়িষ্যায় মহাপ্রভু চৈতন্য যাহা করিয়াছেন, বেদান্ত ও যোগশাস্ত্রকে জনসাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য উত্তর ভারতে কবীরের কীর্তি কেবল তাহারই সহিত তুলনীয়।

ঠিক তেমনিভাবেই, উর্দু সাহিত্যের প্রসার ও পুষ্টিকল্পে হিন্দুদের অবদান কে অস্বীকার করিতে পারে? এমন কি আজও উর্দু ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহারা আগ্রহ পোষণ করেন, কে না জানে তাঁহাদের অধিকাংশই হিন্দু? এই কারণেই ভাষাকে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বিষয়বস্তু করিয়া তোলা কেবল যে ইতিহাস-বিরুদ্ধ তাহাই নয়, দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাসমূহেরও তাহা সম্পূর্ণ বিরোধী।

কিন্তু মুসলমান শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য শুধু হিন্দী ও উর্দু সাহিত্যই যে ঋণী তাহা নয়, অন্যান্য আরও অনেক প্রাদেশিক ভাষাও তাঁহাদের প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভে কৃতার্থ হইয়াছিল। উত্তরে হিন্দী, পশ্চিমে মারাঠী ও পূর্বে বাংলা ভাষা সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হইয়াছিল এবং এই উন্নয়নের গৌরব হিন্দু ও মুসলমানের সমভাবে প্রাপ্য। সর্বোপরি, ভাষাগত এক অভিনব সংশ্লেষণ সংঘটিত হইয়াছে: মুসলমানগণ তাঁহাদের তুর্কী ও পারসী ভাষা পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুদের ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন এবং স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের মত প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্তন সাধন করিয়া তাহাকে উর্দু ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছেন। আবার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ইহাকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিয়া লওয়ার ফলে এক বিচিত্র অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে; ভাবপ্রকাশের ভঙ্গী ভেদে কখন হিন্দী আবার কখন উর্দু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সৃজনী প্রবৃত্তি যখন একই খাতে প্রবাহিত হয়, তখন ব্যবহৃত হয় হিন্দী এবং অন্য প্রণালীপথে প্রবাহিত হইলে ব্যবহার হইয়া থাকে উর্দুর। হিন্দী ভাষার উপর মুসলিম প্রভাব এত গভীর যে, তাহার শব্দ বিন্যাসে ও ব্যাকরণে, ছন্দে ও উপমায় এক কথায় সমগ্র প্রকাশ-ভঙ্গীতে তাহার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট। হিন্দীর পক্ষে যাহা সত্য, মারাঠী, বাংলা, পাঞ্জাবী বা সিন্ধীর ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।২১

'বাংলার মুসলমান শাসকগণের প্রচেষ্টা যে কেবলমাত্র মুসলমান শিক্ষাপদ্ধতির প্রসারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নয়, তাঁহাদের বিদ্যোৎসাহিতা এমন এক নূতন প্রণালীপথে পরিচালিত করিয়াছিলেন, যাহার সম্বন্ধে বাংলা ভাষাভাষী ব্যক্তি মাত্রই অত্যন্ত আগ্রহশীল। বাংলা ভাষাকে সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করিবার কৃতিত্বের গৌরব যদি কাহারও প্রাপ্য হয়, তবে তাহা মুসলমানদের, তাঁহাদের নয়—একথা ভাবিতে বাংলাভাষাভাষী জনসাধারণ বিস্ময় বোধ করিতে পারেন। রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্যের প্রতি মুসলমান নরপতিগণের

21. Tarachand: Influence of Islam on Indian Culture, Pp. 139—140.

দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহাদেরই নির্দেশক্রমে তাঁহাদেরই বাসভূমি বাংলার নিজস্ব ভাষায় ওই গ্রন্থ দুইখানি অনূদিত হয়। মহাভারতের প্রথম বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হয়, নাজির শাহের আমলে (১২৮২—১৩৮৫ খৃষ্টাব্দ), বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি প্রাদেশিক ভাষার এই পরম উৎসাহদাতা নৃপতির উদ্দেশে তাঁহার একটি সঙ্গীত উৎসর্গ করিয়া তাঁহাকে অমরতা দান করিয়া গিয়াছেন। বাংলার কোন মুসলমান বাদশা অথবা হিন্দু রাজা কংসনারায়ণ—কে যে কৃত্তিবাসকে রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন সে বিষয়ে এখনও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। যদি রাজাই এ বিষয়ে উৎসাহ দান করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, মুসলমান নরপতিগণের দৃষ্টান্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি তাহা করিয়াছিলেন। সম্রাট হুসেন শাহ ছিলেন বাংলা ভাষার একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারই নিয়োগক্রমে হলধর বসু ভাগবত পুরাণের বঙ্গানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ ও তাঁহার এক পুত্র ছুটী খাঁ মহাভারতের বঙ্গানুবাদের সহিত নিজেদের নাম যুক্ত করিয়া অমরতা অর্জন করিয়া গিয়াছেন।"২২

ভাষা সম্বন্ধে অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গী হইতেও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। দুই জাতি-তত্ত্বের যাঁহারা পক্ষপাতী, ভাষা-তত্ত্বের এইদিক হইতে তাঁহারা স্বপক্ষে কোনই সমর্থন পাইবেন না। ভাষার পার্থক্য ঘটে স্থান ভেদে, সম্প্রদায় ভেদে নয়। এই কারণেই বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মাতৃভাষা বাংলা, গুজরাটে গুজরাটী, পাঞ্জাবে পাঞ্জাবী এবং একদিকে বাংলার প্রান্ত হইতে পাঞ্জাবের সীমান্ত ও অপরদিকে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের মারাঠা এবং তেলেগুভাষা-ভাষী প্রদেশসমূহ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সমগ্র উত্তর ভারত অঞ্চলের অধিবাসীদের একটি মাত্র ভাষা আছে—তাহাকে হিন্দী, উর্দু বা হিন্দুস্থানী যে কোন নামেই অভিহিত করা হোক না কেন। তেলেগু, তামিল, কানাড়ী ও মালয়ালম প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলির এই ভাষাসমূহের মধ্যেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এবং স্থান ভেদে ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন কথ্য ভাষার আকার গ্রহণ করে। ধর্ম ও ভাষার ভিত্তিতে সুস্পষ্ট অঞ্চল বিভাগ ভারতের কোন অংশে দেখা যায় না। ভাষা বিভিন্ন হয় স্থানভেদে, সম্প্রদায় ও ধর্ম ভেদে নয়। ভারতের উত্তর-পূর্বস্থিত মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একমাত্র ভাষা বাংলা, তেমনি পাঞ্জাবের হিন্দু, শিখ ও মুসলমানগণের সাধারণ ভাষা পাঞ্জাবী; কিন্তু উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যে চার পাঁচটি বিভাগ আছে তাহাদের সমগ্র অধিবাসীদের জন্য কথ্য ভাষারূপে ব্যবহৃত হইবার মত কোন একটি সাধারণ ভাষার প্রচলন নাই। অথচ এই অঞ্চলটিকেই উত্তর-পশ্চিম পাকিস্থানের কুক্ষিগত করিবার প্রস্তাব হইয়া থাকে। বাংলার সহিত হিন্দীর পার্থক্য যতখানি, পাঞ্জাবীর সহিত পুস্তু সিন্ধি অথবা বালুচীর প্রভেদ তদপেক্ষা কম নয়। আবার সিন্ধি বা কাশ্মীরীর সহিত পুস্তুর পার্থক্যও প্রায়

22. N. N. Law: Promotion of Learning in India during Muhammadan Rule, Pp. 107—110.

সমপরিমাণ। সুতরাং যদি ভাষার ভিত্তিতে জাতি নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালী মাত্রই এক জাতি, কারণ তাহারা এক ভাষা-ভাষী, পক্ষান্তরে সেই যুক্তিবলেই পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধি ও বালুচী কোনক্রমেই এক জাতিভুক্ত হইতে পারে না, যেহেতু তাহাদের পরস্পরের ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে পার্থক্য ঠিক ততখানিই গভীর—বাংলার সহিত তাহাদের পার্থক্যের গভীরতা যে পরিমাণ।

হিন্দু ও মুসলমানগণের ধর্মশাস্ত্রসমূহ সংস্কৃত ও আরবী ভাষার উৎসমূলে হইতে প্রেরণার প্রবাহ লাভ করিয়া থাকে। আবার বাংলাভাষা-ভাষী হিন্দী ও তামিল বা সিন্ধি ভাষা-ভাষী হিন্দু উভয়েই ধর্ম-প্রেরণা আহরণ করে সংস্কৃত ভাষার সাধারণ উৎস হইতে। ঠিক অনুরূপ ভাবেই দক্ষিণ ও পূর্বের মুসলমানগণের মত পাঞ্জাবীভাষা-ভাষী মুসলমানরাও আরবী ভাষার সাধারণ সূত্র হইতেই ধর্ম-প্রেরণা লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, হিন্দু এবং মুসলমান এমন দুইটি বিভিন্ন ভাষার উৎস হইতে তাহাদের স্ব স্ব ধর্ম ও আদর্শগত অনুপ্রেরণা আহরণ করিয়া থাকে, যাহা এতদ্দেশের কোন অঞ্চলেরই সাধারণের কথা ভাষা নয়; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রদেশে প্রদেশে তাহাদের পারস্পরিক সংমিশ্রণ ও ভাব-বিনিময়ের জন্য সাধারণ এক একটি কথা ভাষা প্রচলিত আছে। অবশ্য তাহাদের সমৃদ্ধি ও প্রসারের পরিমাণ ধর্মনিরপেক্ষভাবেই স্থান ভেদে বিভিন্ন।

যদি ধরিয়া লওয়া যায়, হিন্দী ও উর্দু হিন্দু ও মুসলমানের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র ভাষা এবং হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে ভারতবর্ষ বিভক্ত হইবার পর প্রত্যেকটি অঞ্চল সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও তৎসহ ভাষা রক্ষার সর্তে যদি আত্মবিকাশের স্বাধীন ও সচ্ছন্দ অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উর্দু ভাষার ভাবী উন্নতির সম্ভাবনা কি আশাপ্রদ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে! অথচ ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, উর্দু কোনও মুসলমানপ্রধান অঞ্চলের ব্যবহার্য ভাষা হইতে পারে না। উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের কথা ভাষা না হওয়ার ফলে বহিরাগত বৈদেশিক ভাষারূপে সেখানে তাহার লালনপালন প্রয়োজন হইবে; আবার অ-মুসলমানপ্রধান অঞ্চল হিসাবে মধ্য ভারতের স্বতন্ত্র ভাষা আছে একথা পূর্বেই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, কাজেই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভাষারূপে সেখানেও তাহার সংরক্ষণ আবশ্যক।

আর তাহারা যদি সত্য সত্যই স্বতন্ত্র ভাষা হয়, তাহাদিগকে স্ব স্ব বিশিষ্ট পথে প্রসার ও পুষ্টি লাভ করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত—যাহাতে শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে যে কোন একটি সংস্কৃত, আরবী অথবা পারসী ভাষামূলক শব্দ বাহুল্য বর্জিত হইয়া সমৃদ্ধ জাতীয় ভাষারূপে গড়িয়া উঠিতে পারে।

(৪) শিল্প

শিল্পকলাসমূহের মধ্যে স্থাপত্য বিদ্যা, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত ও নৃত্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃত ও অন্যান্য কোন কোন প্রাদেশিক ভাষার মত ইহাদেরও প্রত্যেকটি মুসলমান আগমনের পূর্বেই ভারতে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এই কারণেই প্রায় সমপরিমাণ উন্নত মুসলমান শিল্পের মধ্যে তাহারা

আত্মবিলয় করিবে এরূপ আশা করা অন্যায় এবং বাস্তবিকপক্ষে ঘটিয়াছিলও তাহাই। ইসলামী শিল্পের মধ্যে যাহা উপযোগী ও গ্রহণযোগ্য, হিন্দু শিল্প তাহা গ্রহণ করিল এবং তাহার সংশ্লেষণে উত্তর ভারতের ভাষার মত এমন এক অভিনব শিল্প গড়িয়া তুলিল, পরবর্তীকালে ইসলামীয় কৃষ্টির উপর তাহার প্রভাব বড় অল্প নয়।

স্থপতি

ভারতীয় ইতিহাসে ইসলামীয় স্থপতির সহিত হিন্দু বা বৌদ্ধ স্থপতির প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এমন কথা বলা চলিবে না যে, ইহা একটা বৈদেশিক বস্তু—বাহির হইতে আমদানী করিয়া অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে রোপণ করা হইয়াছে। একথা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য যে, তাজমহল নির্মাণে সুদক্ষ হিন্দু স্থপতি শিল্পীদের কোনই হাত ছিল না, কিম্বা মুসলমান শাসনকালে নির্মিত হিন্দুদের মন্দিরসমূহের গঠন ব্যাপারে মুসলমান শিল্পীরা সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত ছিল। আজিও উত্তর ভারতে হিন্দুদের বাস-ভবন ও এমনকি দেব-মন্দির নির্মাণে বহু মুসলমান মিস্ত্রী নিযুক্ত হইয়া থাকে। স্থপতিবিদ্যা-বিশেষজ্ঞগণ দেখাইয়াছেন, মুসলমান শাসনকালের কোন কোন প্রসিদ্ধ স্থপতি শিল্পের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান আর্ট কিরূপ অপূর্ব সামঞ্জস্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া রহিয়াছে।

'সামরিক প্রয়োজনে, ধর্মগত উদ্দেশ্যে অথবা বসবাসের জন্যই হোক, মুসলমানদের নির্মিত গৃহসমূহ যেমন সম্পূর্ণরূপে সিরিয়া-মিশর-পারস্য অথবা মধ্য এসিয়ার ইসলামী ঢংএ তৈয়ারী হয় নাই, হিন্দু ভবন, দেব-মন্দির, প্রাসাদ ও স্মৃতিস্তম্ভসমূহও তেমনি বিশুদ্ধ হিন্দু কেতায় নির্মিত হয় নাই। মুসলমান স্থাপত্য শিল্পের অনাড়ম্বর রূঢ়তা যেমন কিছুটা কমনীয় হইয়াছিল, অপরদিকে হিন্দু স্থাপত্যের সাড়ম্বর কমনীয়তা কিছু পরিমাণে সংযত হইয়াছিল। শিল্প-কলা, প্রসাধন-প্রাচুর্য ও আঙ্গিকের দিক দিয়া তাহা রহিয়া গেল হিন্দু এবং তাহার উপর আরোপিত হইল মুসলমান শিল্পসম্মত অর্ধবৃত্ত আকার, অনাড়ম্বর গম্বুজ, অলঙ্কারহীন প্রাচীর-গাত্র ও প্রশস্ত অভ্যন্তরভাগ। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে যে সমস্ত গৃহ তৈয়ারী হইয়াছে—তাহা হিন্দুর হোক অথবা মুসলমানেরই হোক, একই পদ্ধতিতেই নির্মিত, স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ভেদে উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আঙ্গিকের কিছু কিছু পার্থক্য ঘটিয়াছে এই মাত্র!

'"ফারগুসান সাহেব দিল্লী, আগ্রা, আজমীর, গৌড়, মালয়া, গুজরাট, জৌনপুর ও বিজাপুর প্রভৃতি স্থানের ভারতীয় মুসলমান স্থপতি শিল্পের গঠনগত শ্রেণী বিভাগ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "সেগুলি আরব, পাঠান, তুর্ক, পারসিক, মোগল অথবা ভারতীয় যে কোন দেশীয় বা জাতীয় সুলতানের শাসনকালেই তৈয়ারী হইয়া থাকুক না কেন, সেইসব স্থানের মসজিদের গম্বুজের আকৃতি ও গঠন-পদ্ধতি, হিন্দু প্রতীক-চিহ্নশোভিত সমাধি-মন্দির ও প্রাসাদ; হিন্দু দেব-মন্দিরের ব্যবহার্য মিহরাব, হিন্দু পদ্ধতিতে নির্মিত খিলান, গঠন ও অঙ্গসৌষ্ঠব সম্বন্ধীয় বিশিষ্ট

চিহ্ন বা প্রতীকসমূহের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই কথাই মনে হয় যে, যে সমস্ত গুণ বা ধর্মের সমবায়ে হিন্দু ও মুসলমান শিল্পের সংশ্লেষণ ঘটিয়াছে, ভারতীয় শিল্পীদের পক্ষে মহম্মদ প্রচারিত মক্কার ধর্ম মতবাদ তন্মধ্যে প্রধান নয়, একটি মাত্র। ধর্মগতভাবে হয়তো তাঁহারা নৈষ্ঠিক মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শিল্প-বোধের দিক দিয়া তাঁহারা হিন্দুই।" ২৩ হ্যাভেল সাহেব তাঁহার ভারতীয় *শিল্প-সম্বন্ধীয় গ্রন্থে এই তত্ত্বটি এমন দক্ষতার সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সে সম্বন্ধে আর অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।'* ২৪ 'অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই পদ্ধতির প্রভাব সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; এমনকি সুদূর নেপাল পর্যন্ত তাহার সংক্রমণ হইতে অব্যাহতি পায় নাই।' ২৫ 'ঊনবিংশ শতাব্দীর তৈয়ারী প্রাসাদ, স্মৃতিস্তম্ভ ও দেব-মন্দির প্রভৃতি পশ্চিমে জামনগর বা পূর্বে কলিকাতাতেই নির্মিত হোক, অথবা পাঞ্জাবের শিখগণ কর্তৃক বা মধ্যভারতের জৈনদের দ্বারাই তৈয়ারী হোক—গঠন-পদ্ধতিতে তাহারা হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্য শিল্পেরই অনুগামী।' ২৬ 'এই হিন্দু-মুসলিম স্থপতি-শিল্পের প্রভাব যে কেবল মাত্র স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নয়, বাসভবন, পথ, ঘাট প্রভৃতি ব্যবহারিক বস্তু নির্মাণেও তাহার কার্যকারিতা প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।' ২৭ প্রাদেশিক আবহাওয়া ভেদে কিছুটা পার্থক্য ঘটিলেও, হিন্দু ও মুসলমান বসতবাটীর মধ্যে গঠন-সম্বন্ধীয় পরিকল্পনার দিক দিয়া কোনই প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয় না।

ভাস্কর্য

হিন্দুদের মধ্যে দেব-বিগ্রহ ও মূর্তিপূজা প্রথার প্রচলন থাকার জন্য ভাস্কর্যবিদ্যা ভারতবর্ষে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে বিগ্রহ ও মূর্তিপূজা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে ভাস্কর্য শিল্প মুসলমান-অধ্যুষিত দেশসমূহে প্রসার ও উন্নতি লাভে আদৌ সমর্থ হয় নাই। কাজেই ভারতীয় ভাস্কর্যের উপর তাহার প্রভাবের কোন প্রশ্নই আসে না। 'অবশ্য পারস্য দেশীয় রাজন্যবর্গের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ভারতীয় মুসলমান নৃপতিগণ, বিশেষ করিয়া মোগল সম্রাটগণ তাঁহাদের প্রাসাদ, বাসভবন ও প্রমোদাগারসমূহের শোভা ও সৌন্দর্য সম্পাদনের জন্য ভাস্কর্যশিল্পের সহায়তা যে প্রয়োজন হইলে গ্রহণ না করিতেন, এমন নয়।'২৮

চিত্র-শিল্প

চিত্র ও সঙ্গীতবিদ্যা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ না হইলেও, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবারও বিশেষ কোন বিধান নাই। তথাপি ইসলামের প্রত্যক্ষ

23. Havell: Indian Architecture, P. 101.
24. Tarachand: Op. cit. Pp. 243—4.
25. Ibid—P. 255.
26. Ibid: P. 256.
27. Ibid—P. 257.
28. S. M. Jaffar: Cultural Aspects of Muslim Rule in India, P. 110.

বিরোধিতা না হইলেও নিষ্ক্রিয় উদাসীনতা সত্ত্বেও এই চিত্র এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই হিন্দু ও মুসলমান আর্টের সুদূরপ্রসারী সংমিশ্রণ সংঘটিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে মিঃ জাফর তাঁহার গ্রন্থে বলিয়াছেন, 'ভারতে মুসলমান শাসনের গোড়ার দিকে মুসলমান নরপতিগণের নিকট হইতে চিত্র-বিদ্যা অন্যান্য আর্টের মত সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে নাই। তাহার প্রধান কারণ, মূর্তিপূজার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার ফলে তৎকালীন ইসলাম ধর্মে এই বিদ্যার অনুশীলন নিষিদ্ধ ছিল। মাঝে মাঝে কোন কোন মুসলমান বাদশাহ বিধিনিষেধের গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া এই আর্টের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন ও তাহার চর্চা করিতেন। তাহা ছাড়া, এমন অনেক হিন্দু চিত্র-শিল্পী ছিলেন যাঁহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবার পরেও এই শিল্পের প্রতি আকর্ষণ ও তাহার চর্চা পরিহার করেন নাই। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন মুসলমানগণ চিত্র-শিল্পের যতখানি অনাদর করিতেন বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারা সে পরিমাণ করিতেন না। এই নূতন মুসলমান সম্প্রদায় ও তাঁহাদের বংশধরগণের অনেকেই যে এই আর্টের অনুশীলন করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই এবং যে সকল মুসলমান পারস্যের আদর্শ ও ধারণা লইয়া বাহির হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও তাঁহাদের হিন্দু সমসাময়িক শিল্পী ভ্রাতৃবৃন্দের মত আদর্শনিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত না হইলেও, চিত্র-শিল্পের চর্চা যে করিতেন সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ইহা হইতে এই কথাই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, শাসকবর্গ বিরূপ না হইলেও উদাসীন ছিলেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জনসাধারণের মধ্যে চিত্র-শিল্পের বহুল চর্চা প্রচলিত ছিল।

মোগলগণ কিন্তু অবস্থিত ছিলেন স্বতন্ত্র ভিত্তি-ভূমির উপর। আর্ট সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজস্ব একটা ধারণা ছিল এবং তদনুযায়ী তাহার বিভিন্ন প্রকারের বিকাশের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতা সমভাবে প্রদর্শিত হইত। চিত্র-শিল্পের প্রতি অনুরাগ ও তাহাতে পারদর্শিতা সম্বন্ধে তৈমুরগণের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। বাবর এদেশে আসিবার সময় তাঁহার পূর্বপুরুষীয় তৈমুরদিগের চিত্র-সঞ্চয়ন হইতে বাছিয়া বাছিয়া সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। মোগল বাদশাহগণ এই চিত্র-সঞ্চয়নগুলি মহামূল্য উত্তরাধিকাররূপে সযত্নে সংরক্ষণ করিতেন।'২৯

'হিন্দু বৌদ্ধ অথবা জৈন যে কোন পদ্ধতিতেই অঙ্কিত হোক না কেন, ভারতের প্রাগ-মুসলমান যুগীয় চিত্র-শিল্পের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী ছিল। বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহাদের সচেতন ও সতর্ক দৃষ্টিই ছিল তাঁহাদের শিল্পগত অনুপ্রেরণার মূল উৎস এবং ইহাই তাঁহাদের শিল্প সৃষ্টিকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করিত। এই শিল্প সৃষ্টি এমন এক সাংস্কৃতিক সৌন্দর্যবোধের অভিব্যক্তি, যাহা উদ্ভূত হইয়াছে সংহতিগত সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা হইতে, যাহা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে সুখ ও দুঃখ, ব্যথা ও আনন্দ, কৃতকার্যতা ও অকৃতকার্যতা, ইহলোক ও লোকান্তর, জীবনের প্রতি অনুরাগ ও বিরাগ, ইন্দ্রিয়ের সেবা ও সংযম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সক্রিয়তা,

29. Jaffar: Op. cit. Pp. 125—6.

ভাবাতিশয্য, পরিতৃপ্তি, শান্তি ও সহনশীলতা প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী ও বিচিত্র প্রবৃত্তিসমূহের মধ্যে সংশ্লেষণ ও সামঞ্জস্য বিধানের ভিতর দিয়া। অতীত যুগে ভারতের যে চিত্র-বিদ্যার প্রচলন ছিল, একমাত্র অজন্তাই তাহার সাক্ষীরূপে আজিও বিদ্যমান। পণ্ডিতগণ খৃষ্ট-পূর্বাব্দের সাহিত্য 'বিনয় পিটক' হইতে ও তৎপরবর্তী কালের মহাভারত, রামায়ণ, শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ হইতে এই শিল্প-সংক্রান্ত বহু উদ্ধৃতি উদ্ধার করিয়াছেন। বিভিন্ন গিরিগুহায় অতীত যুগের চিত্র-শিল্পের বহু নিদর্শন আজিও বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তৎকালীন শিল্পগত ভাব-ব্যঞ্জনার দিক দিয়া অজন্তাই সর্বাপেক্ষা সার্থক ও সবল। গিরিগাত্র খোদাই করিয়া যে মন্দির নির্মিত হইয়াছে, এই চিত্রসম্পদ তাহারই অঙ্গশোভার অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত। এগুলি খোদিত হইয়াছিল খৃষ্টীয় প্রথম হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে। উচ্চাভিলাষ ও ধর্মস্পৃহা চরিতার্থ করিবার মানসে এই শিল্প সৃষ্টির অনুকূলে শ্রেষ্ঠী ও শাসকবর্গের আর্থিক অবদান অজস্র ধারায় বর্ষিত হইয়াছিল।'৩০

'বাবর যখন ভারত জয় করেন, বিহজাদের গৌরব-সূর্য তখন আকাশের তুঙ্গশীর্ষে, তাঁহার অঙ্কন-পদ্ধতি তখন নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গরূপে স্বীকৃত। কাজে-কাজেই শিল্পানুরাগীরূপে বাবর ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণ এবং হুমায়ুনের পারস্য-নির্বাসন হইতে ভারতে প্রত্যাগমনের পর চাঘতাইবংশীয় আমীর-ওমরাহগণ ভারতীয় চিত্র-শিল্পীদিগের সম্মুখে অনুসরণযোগ্য আদর্শরূপে বিহজাদের অঙ্কন-পদ্ধতি স্থাপন করেন। এইরূপে বিহজাদ ও তাঁহার মতানুবর্তী শিল্পিগণের শিল্পকলা ভারতীয় শিল্পীদের আদর্শস্থানীয় হয় এবং এইরূপেই অজন্তার ঐতিহ্যের ভিতর তৈমুরীয় অঙ্কনশিল্প অনুপ্রবিষ্ট হয়। প্রখর ব্যক্তিত্ববোধই এই আর্টের বৈশিষ্ট্য। জনসমাবেশ বা অন্য কোনবিধ সমবায়ের প্রতি ইহা আদৌ আকৃষ্ট নয়। ইহা প্রত্যেকটি বস্তু বা ব্যক্তিকে তাহার পারিপার্শ্বিক হইতে পৃথক করিয়া স্বাতন্ত্র্যের সুস্পষ্ট আলোকে তাহাকে নিরীক্ষণ করে। জীবনের উদ্দাম বেগ ইহা গভীরভাবে উপলব্ধি করে এবং যাহা কিছু অঙ্কন করে, তাহারই ভিতর এই নিরতিশয় আবেগ সুস্পষ্টভাবে রূপায়িত হইয়া উঠে।' ৩১ 'অজন্তার আর্টের মত ইহাও রেখার মধ্য দিয়া আপনাকে ব্যক্ত করে; তাহা সত্ত্বেও রেখাদ্বয়ের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য কত গভীর! যে উপাদানসমূহের সাহায্যে এই চিত্র অঙ্কিত হয়, তাহা অজন্তার ব্যবহৃত উপাদান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।'৩২ 'মোগল সম্রাটগণ কর্তৃক এই স্বতন্ত্র শিল্প-চেতনার সযত্ন সমবায়ের ফলে এক অভিনব অঙ্কন-পদ্ধতির উদ্ভব হইল। অজন্তার নমনীয় শিল্পকলার উপর আরোপিত হইল হীরাট ও সমরখন্দ হইতে আনীত অঙ্গসৌষ্ঠব, সমপাত ও সংস্থাপনের নূতন নীতি। নূতন ঐশ্বর্যের অবদানে অতীতের আড়ম্বর সমৃদ্ধতর হইল; নিয়ম-শৃঙ্খলার নির্দিষ্ট অনুশাসনে জীবনের সহজ ও স্বচ্ছন্দভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত হইল। তাহার ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই কর্মোদ্যম ও জীবনাবেগ কিছুটা পরিমাণে সংযত হইল বটে;

30. Tarachand: Op. cit. Pp. 258—9.
31. Tarachand: Op. cit. Pp. 265—6.
32. Ibid—P. 268.

কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব বর্ণসম্পদ ও রৈখিক সূক্ষ্মতাকে আশ্রয় করিয়া এক অভিনব শৃঙ্খলা ও সম্ভ্রমবোধ জাগরিত হইয়া উঠিল। এই নূতন অঙ্কন-পদ্ধতির ক্রমবিকাশ অতি দ্রুত। সম্ভবতঃ বাবরই 'হিন্দু শিল্পপদ্ধতির মধ্যে তৈমুরীয় প্রথার প্রথম প্রবর্তন করেন আগ্রাতে।

মিঃ ক্লার্ক যে অঙ্কন-পদ্ধতিকে 'হুমায়ূনী প্রথা' আখ্যা দিয়াছেন—এমন কি সেই প্রাচীনতম পদ্ধতির মধ্যেও ভারতীয় ভাবধারার অভ্রান্ত বিকাশ লক্ষ্য করিলে কৌতুকাবিষ্ট হইতে হয়। ফারুক কালমাক, সিরাজের আবদুস সামাদ, তাব্রিজের মীর সৈয়দ আলী ও মিস্‌কিন নামীয় যে চারিজন মুসলমান শিল্পাচার্যের নাম আবুল ফজল উল্লেখ করিয়াছেন, আকবরের শাসনকালীন শিল্পিগণ সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই পরিচালনাধীনে এই পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করিতেন। সনাতনী প্রথায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু ছাত্রগণ অন্ততঃপক্ষে ততটুকু পরিমাণ খ্যাতি ও কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন—যাহার দরুণ সম্রাটের দরবারে হাজির হইবার জন্য তাঁহাদের আহবান আসিতে পারে। তাঁহাদের কর্তব্য হইল, নূতন আচার্যগণের সেবায় তাঁহাদের প্রতিভা নিয়োজিত করিয়া তাঁহাদের সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত চিত্র অঙ্কন করা। ইহা হইতেই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে, আকবর-শাসনের সুদূর অতীত যুগেও হিন্দু-মুসলমানের মিলিত অঙ্কন-পদ্ধতি পরিপূর্ণ আকারে কেন বিকাশ লাভ করে। দাসবন্ত, বসবান, কেসোলাল, মুকুন্দ, মাধো, জগন্নাথ, মহেশ, খেমকরণ, তারা, সেনওয়ালা, হরিবংশ ও রাম প্রভৃতি শিল্পিগণের নাম 'আইন-ই-আকবরী'তে লিপিবদ্ধ আছে। ইহা ছাড়াও আরও বহু শিল্পীর নাম তৎকালে অঙ্কিত চিত্রসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঁকিপুরের খোদাবক্‌স লাইব্রেরীতে যে সব পাণ্ডুলিপি আজিও সংরক্ষিত আছে, সে সমূহে তুলসী, সুরজন, সুরদাস, ঈশ্বর, শঙ্কর, রামাসর, বনোওয়ারী, নন্দ, নান্না, জগজীবন, ধর্মদাস, নারায়ণ, ছত্রমান, সুরেষ, দেওজীব, সরণ, গঙ্গাসিং, পরাশ, ধন্না, ভীম প্রভৃতি শিল্পীদের নাম উল্লিখিত আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পীরা যে দেশ হইতে আগত তাহার নামও লিখিত আছে, কিন্তু কৌতূহলের ব্যাপার হইতেছে এই যে, সেরূপ ক্ষেত্রে কেবল মাত্র গোয়ালিয়র, গুজরাট ও কাশ্মীরের নামোল্লেখই দৃষ্ট হয়। মধ্যযুগের প্রথম দিকে এই সমস্ত স্থানই হিন্দু-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং আকবরের দরবারে শিল্পী সমাগম হইত এই সকল স্থান হইতেই। এই ঘটনার দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, অজন্তার পরেও হিন্দু-শিল্পের ক্রম-বিকাশ অব্যাহত ছিল এবং ইহাও প্রমাণিত হয় যে, মোগলশিল্প মধ্য-এসিয়ার পারস্য-পদ্ধতির শাখা বিশেষ নয়, নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত প্রাচীন পদ্ধতির ক্রম-বিবর্তন মাত্র।'৩৩

'হিন্দু-মুসলমানের এই মিলিত শিল্পকলা একদিকে যেমন অজন্তার প্রাচীর-চিত্রের সহিত সম্পর্কিত, অপর দিকে তেমনি সমরখন্দ্ ও হীরাটের ক্ষুদ্রাবয়ব চিত্রাঙ্কনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত; এতদুভয়ের মধ্যে বহু শাখা-প্রশাখা বিদ্যমান এবং তাহাদের ভঙ্গীগত বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে এক বা অপরের অভিমুখীনতার উপর। জয়পুর ও কাংদার রাজপুত পাহাদী-প্রথা ও

33. Tarachand: Op. cit. Pp. 268—71.

হিমালয় সন্নিহিত হিন্দুরাজ্যসমূহের অঙ্কনভঙ্গী প্রাচীন হিন্দু-পদ্ধতির প্রতিই সমধিক প্রবণতাসম্পন্ন; পক্ষান্তরে দাক্ষিণাত্য, লক্ষ্ণৌ, কাশ্মীর, পাটনা প্রভৃতি স্থানের 'কালাম' মুসলিম পদ্ধতিরই অধিক অভিমুখী; শিখ কালাম এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ইহাদের প্রত্যেকেই দিল্লী বা আগ্রার বাদশাহী দরবারের মূল কাণ্ড হইতে নিঃসৃত এক একটি শাখাপদ্ধতি।' ৩৪

পাটনার মিঃ পি, সি, মানুকের ভারতীয় চিত্র-সংগ্রহ গর্ব করিবার মত এক অমূল্য সম্পদ; তাহা ছাড়া, তিনি নিজেও শিল্প বিচারের একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত। মিঃ মানুক ভারতীয় চিত্রশিল্প সম্বন্ধীয় এক কাগজে মোগলযুগীয় শিল্পপদ্ধতির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলেন, 'মনুষ্য-অবয়ব, আরও সাধারণভাবে বলিতে গেলে যে কোন জীবিত প্রাণীর প্রতিকৃতি অঙ্কন করা নৈষ্ঠিক মুসলমানের পক্ষে সরিয়ৎ অনুযায়ী পাপকার্য বলিয়া নিষিদ্ধ। "তোমরা নিজের প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করিবে না"—ইহাই ছিল মূষা প্রবর্তিত প্রাচীন ধর্ম-শাস্ত্রের নির্দেশ; মুসলমানগণ অতি উৎকট নিষ্ঠাসহকারে এই নির্দেশ অনুসরণ করিয়া চলিতেন। ইহা অতি সত্য কথা যে, সুশিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত পারস্যের শাহ আব্বাস ও মোগল সম্রাটগণের শাসনকালে মহম্মদের ধর্ম-শিষ্যগণ এই নিষেধের গণ্ডী লঙ্ঘন করেন, কিন্তু তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্র সুদৃশ্য ও নয়নাভিরাম হইলেও, অন্তর স্পর্শ করে না। তাঁহাদের হিন্দু-শিষ্য ও সহকর্মিগণের এরূপ কোন নিষেধাত্মক নির্দেশ বিদ্যমান ছিল না; দেব-দেবীগণ তাঁহাদের নিকট কাল্পনিক ছবি নহেন, যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহকারী বাস্তব সত্তা। এই কারণেই বোধ হয় হিন্দু শিল্পিগণের শিল্পসৃষ্টি অন্তর স্পর্শ করিতে পারিত এবং শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের সর্বোচ্চ পরীক্ষা যে ইহাই, তাহা অনস্বীকার্য। একথা স্মরণ রাখা অবশ্য কর্তব্য যে ধর্ম এবং শিল্প যুগ যুগ ধরিয়া পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন-যুগের চিত্রাবলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ গ্রীস ও রোমের পুরাণ-বর্ণিত ধর্ম সম্বন্ধীয় ঘটনা অবলম্বনেই অঙ্কিত।'৩৫

সঙ্গীত

আধুনিক ভারতীয় সংগীত ইসলাম প্রভাব ও অনুপ্রেরণার নিকট কম ঋণী নয়। মুসলমান আগমনের পূর্বেও ভারতীয় সংগীত যদিও কলা হিসাবে সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং নৈষ্ঠিক ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী যদিও ইহাকে অনুমোদন ও অনুপ্রেরণা দান সরিয়তবিরোধী, তথাপি ভারতীয় সংগীতের সৌধ হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত অবদানে গঠিত; ইহার ভিত্তি ভারতীয়, কিন্তু অলঙ্কার ও অংগসজ্জা উভয়বিধ আর্টের সংশ্লেষণের ফল। এদেশের অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব ও ক্রম-বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার যদি চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে দেখা যাইবে যে, তাহাদের বর্তমান পরিণতি হিন্দু ও

34. Ibid—P. 272.
35. Searchlight: Anniversary Number, 1926, P.15.

মুসলমানের মিলিত চেষ্টার ফল; অনেক ক্ষেত্রে মুসলমান প্রভাবের পরিমাণ অত্যধিক, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা ঐকান্তিক। ঠিক অনুরূপভাবেই ভারতীয় রাগ ও রাগিণীর ক্রম-বিকাশ হিন্দু ও মুসলমান সংগীত-শিল্পীদের সমবেত সাধনার ফলেই সম্ভব হইয়াছে।

'যুক্তি যদিও উভয়ক্ষেত্রে এক নয়; তথাপি চিত্র-শিল্পের চর্চার মত সংগীতানুশীলনও ইসলামের আদি যুগে অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। সংগীত-সাধনা নিষিদ্ধ করিবার পক্ষে সম্ভবতঃ যুক্তি ছিল ইহাই, সংগীতের অনুশীলন এমন অনন্যমন সাধনাসাপেক্ষ যে, মন একবার যদি তাহাতে আবিষ্ট হয়, অন্য কোন কথা ভাবিবার অবকাশ পর্যন্ত থাকে না। সংগীতের এই অত্যধিক আকর্ষণ-শক্তির জন্যই হয়তো গোড়ার দিকে তাহার উৎসাহদান নিষিদ্ধ ছিল। এই নিরুৎসাহমূলক নীতির প্রবর্তন সত্ত্বেও মানব-প্রকৃতি তাহার প্রভাব অস্বীকার করিয়া চিত্র-শিল্পের চর্চার মত সংগীত সাধনাতেও সোৎসাহে আত্মনিয়োগ করিল। ইরাণে সংগীত-বিদ্যা বিশেষ জনপ্রিয়; অপরদিকে সুফী সম্প্রদায় আত্মার উন্নয়ন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের পক্ষে সংগীতের কার্যকারিতা স্বীকার করেন। এতদুভয়ের সহিত ইসলাম সংযুক্ত থাকার ফলে সংগীত সম্বন্ধে মুসলমানগণের দৃষ্টিভংগী বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয় এবং পরিশেষে তাহার অনুশীলনের বিরুদ্ধে আরোপিত বিধি-নিষেধের বিলোপ ঘটে। ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার পর মুসলমানগণ যখন দেখিলেন হিন্দুদের সমাজ ও ধর্মজীবনে সংগীতের স্থান অতি উচ্চে, তখন অবস্থা আরও সহজ হইয়া আসিল। তাহার ফল হইল এই যে, মসজিদের প্রার্থনা যদিও নৈষ্ঠিক পদ্ধতি মতেই যন্ত্র বা কণ্ঠ কোনরূপ সংগীতের সহযোগিতা ব্যতিরেকে পরিচালিত হইতে থাকিল, তথাপি সংগীতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সংগে সংগে সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ সামাজিক সকল প্রকার উৎসব-অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতে লাগিলেন। সুফী সম্প্রদায়ের সংগীতানুরাগের দরুণ ধীরে ধীরে এমন সব অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে লাগিল, যাহা পরিপূর্ণরূপে না হইলেও, আংশিকভাবে ধর্মগত। এই সকল অনুষ্ঠানে কোয়াল নামক সংগীত বৃত্তি-জীবিগণ কোয়ালী নামে পরিচিত একপ্রকার ভক্তিমূলক সংগীত গান করিতেন।'[36] 'মুসলিম ভারতে সংগীতের জনপ্রিয়তার পরিমাণ সম্বন্ধে আমাদের যাহা ধারণা, প্রকৃতপক্ষে তাহার মাত্রা তাহা হইতে বহু অধিক ছিল। এই জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ সম্ভবতঃ ইহাই যে, মুসলমানদের মধ্যে অধিকসংখ্যকই হিন্দু বা হিন্দুর সন্তানসন্ততি ছিলেন বলিয়া মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইবার পরেও সংগীতের প্রতি আগ্রহাতিশয্য তাঁহারা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, তাহার ফলে সংগীতের প্রভাব মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃতি লাভ করিয়া অচিরে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করিল। এ স্থানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, অন্যান্য চারুশিল্পের মত সংগীতও ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে পারস্পরিক সংমিশ্রণের এক নূতন যোগসূত্র স্থাপন করিল। ভারতে মুসলমান আগমনের আদিম যুগ হইতেই এই সহযোগিতা ও পারস্পরিক সংমিশ্রণের সূত্রপাত হয় এবং তদবধিই উভয় সম্প্রদায় স্ব স্ব

---

36. Jaffar, op. cit., pp. 155—6.

মূল্যবান সঞ্চয়ের পারস্পরিক আদান-প্রদানে সমৃদ্ধি অর্জন করিতে আরম্ভ করে।'৩৭

'সম্রাটের নিকট হইতে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া সঙ্গীতশিল্পও তাঁহার শাসনকালে সবিশেষ উন্নতি লাভ করে। হিন্দু, ইরাণী, তুরাণী, কাশ্মিরী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির বহু গায়ক ও গায়িকা তাঁহার দরবারে স্থান লাভ করেন। বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ মিয়া তানসেন ছিলেন তাঁহার দরবারের নবরত্নের অন্যতম রত্ন। ইনি জাতিতে হিন্দু হইলেও, পরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার সমাধি-মন্দির ভারতীয় গায়কগণের তীর্থস্থানরূপে আজিও গোয়ালিয়রে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সময়েই তানসেন ও রামদাসের গুরু প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য হরিদাসের উদ্ভব হয়। লক্ষ্ণৌ হইতে আগমন করিয়া ইনি দ্বিতীয় তানসেনরূপে পরিচিত হন এবং কথিত আছে, পারদর্শিতার পুরস্কারস্বরূপ খান-ই-খান্নানের নিকট হইতে এককালীন এক লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। আকবরের শাসনকালেই সঙ্গীতশিল্পের গৌরবসূর্য মধ্যগগনে আরোহণ করে। অনুশীলন অভাবে অধুনা-বিস্মৃত বহু রাগরাগিণী-সমন্বিত কণ্ঠ-সঙ্গীত এবং বহুবিধ বাদ্যযন্ত্র সম্বলিত যন্ত্র-সঙ্গীত সমভাবে শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করিত। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় পারস্পরিক আদান-প্রদান দ্বারা কেমন করিয়া একে অপরকে সমৃদ্ধ করিত তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় বিশেষ করিয়া সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। এই দান-প্রতিদানের পালা আকবরের শাসনকালেই প্রথম সুরু হয় নাই, ইহার সূচনা তাহারও বহু পশ্চাতে। মুসলমান আগমনের পরবর্তী যুগে সঙ্গীত-বিদ্যার ক্রমবিকাশের ধারা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা এবং সংমিশ্রণের ক্রমিক ইতিহাস মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ খেয়াল ও ধ্রুপদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। একদিকে সুলতান হুসেন স্যারকী জৌনপুরের আবিষ্কৃত খেয়াল আজ হিন্দু সঙ্গীতের যেমন বিশেষ অঙ্গরূপে পরিগণিত, অপরদিকে তেমনি ধ্রুপদের আসন মুসলমান সঙ্গীতের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত। অতীত যুগ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রম-বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করিলে এই কথাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, পারস্পরিক সংমিশ্রণের এই যৌগিক প্রক্রিয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া সংঘটিত হইয়া আসিতেছে।

কেবলমাত্র সম্রাট ও প্রাদেশিক সামন্তগণই যে এই চারুশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন তাহা নয়, অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও সপরিবারে ইহার রস উপভোগ দ্বারা অবসর ও চিত্তবিনোদন করিতেন।'৩৮ 'সম্রাট সাজাহান সঙ্গীত-বিদ্যার বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ নিজেও ভাল গায়ক ছিলেন। রামদাস ও মহাপাত্র তাঁহার দরবারের দুইজন প্রসিদ্ধ ওস্তাদ।'৩৯

সঙ্গীত-বিদ্যায় জীবিত বিশেষজ্ঞগণের একটি পরিপূর্ণ তালিকা যদি

37. Ibid., pp. 164—5.
38. N. N. Law: Promotion of Learning in India during Muhammadan Rule pp. 155—58.
39. Ibid., p. 183.

প্রস্তুত করা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে, মুসলমান ওস্তাদগণের সংখ্যা মোট জনসংখ্যায় তাহাদের আনুপাতিক হার অপেক্ষা অনেক অধিক, এমন কি, আইন পরিষদে তাহাদের নির্দিষ্ট আসন অপেক্ষা গানের দরবারে অধিকৃত আসন বহুগুণ বেশী। গান ও ভারতীয় জীবিত গায়কদের সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান আছে—এমন ব্যক্তিদের দ্বারা আহূত যে কোন সংগীত সম্মেলনে উপস্থিত হইলে ভারতীয় সংগীতের মধ্যে ভারতীয় সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের এই সুস্পষ্ট বিকাশ অতিবড় অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতেও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে এবং সাম্প্রদায়িক বা ধর্মগত সংগীত বলিতে কোন বস্তুর অস্তিত্ব ভারতে কোথাও যদি আদৌ থাকিয়াও থাকে, তাহা হইলে তাহার সহিত এই ভারতীয় সংগীতের পার্থক্য প্রকট হইয়া ধরা পড়িবে।

হিন্দু-মুসলমান সংমিশ্রণের এই সুদীর্ঘ ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া মিঃ এস, এম, জাফর তাঁহার 'Some Cultural Aspects of Muslim Rule in India' নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন, 'মুসলমানগণ ভারতে আসিয়া স্থায়ী অধিবাসীরূপে এই দেশেই বসবাস করিতে লাগিলেন। হিন্দুদের চির-শত্রুরূপে হিন্দুস্থানে বাস করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। একত্র বসবাসের ফলে পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদান চলিতে থাকে। কালক্রমে অবস্থার চাপে পড়িয়া বন্ধু ও প্রতিবেশীরূপে একত্র বসবাস করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে তাঁহারা বাধ্য হইলেন। ফলে সংস্কৃত ও পারসী ভাষার টানা-পোড়েনের সাহায্যে গড়িয়া উঠিল এক নূতন ভাষা; তখন হইতে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতি পুরাতন খাত পরিত্যাগ করিয়া উর্দু ভাষার নূতন প্রণালীপথে প্রবাহিত হইতে থাকে। এইভাবে যে সংস্কৃতির উদ্ভব হইল, তাহা বিশিষ্টভাবে হিন্দুও নয়, একান্তভাবে মুসলমানও নয়, হিন্দু ও মুসলমানের মধুময় মিলন প্রসূত। মুসলমান সামন্ত ও নরপতিগণ হিন্দু শিল্প ও সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বার শ্রেণী, সম্প্রদায় ও ধর্মনির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত হইল। সাধু ও ফকিরদের মত তাঁহারাও আপন আপন ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের সন্নিকর্ষ সাধনের জন্য সচেষ্ট হইলেন। তাহার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য সাধিত হয়। কাজেই হিন্দুরা যদি মুসলমানদের দরগায় সিন্নী দিয়া থাকে, দৈববাণীরূপে কোরাণের বিধান চাহিয়া থাকে, অমঙ্গল নিবারণের জন্য গৃহে কোরাণ রাখিয়া থাকে, মুসলমানদের পর্বানুষ্ঠান পালন করিয়া থাকে এবং মুসলমানগণও যদি তাহার প্রত্যুত্তরে হিন্দুদের অনুরূপ অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশই হিন্দু সম্প্রদায় হইতে ধর্মান্তরিত, কাজেই তাহাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতির সহসা আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল না, ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। তাহারা নূতন ধর্ম গ্রহণ করিল সত্য, কিন্তু পুরাতন প্রথা ও পদ্ধতি পরিহার করিতে পারিল না। ধর্ম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সামাজিক পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক পরিবর্তিত হইল না, তাহা পূর্বে যেমন কুসংস্কার, জাতিভেদ ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার দ্বারা জর্জরিত ছিল, এখনও তেমনিই রহিয়া গেল।

তাহার ফলে, হিন্দুদিগের বহু সামাজিক প্রথা ভারতীয় মুসলমান সমাজে সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিল।'৪০

কৃষ্টি অতিশয় জটিল বস্তু, জাতির মতই তাহার সংজ্ঞা নিরূপণ করা দুরূহ। তথাপি কোন এক বিশিষ্ট সংস্কৃতির মধ্যে যে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, অন্য কোন সংস্কৃতির সহিত তাহার নিজস্ব সংস্কৃতির পার্থক্য সে উপলব্ধি না করিয়াই পারে না। আবার একই জাতীয় সংস্কৃতির পরিধির মধ্যে বহু বিভিন্ন সংহতি থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা একই সংস্কৃতির অধীনরূপে পরিগণিত হয়।

যে সংস্কৃতি সামাজিক, ধর্মগত ও অন্যান্য প্রকারের বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ উপাদানের সমবায়ে গঠিত, তাহার মধ্যে এইরূপ শাখা ও সংহতি না থাকিয়াই পারে না। কিন্তু তাহার দরুণ সাধারণ সংস্কৃতির সর্বব্যাপিত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। এক সংস্কৃতির সহিত অপর সংস্কৃতির তুলনা করিবার সঠিক বিধান হইল উভয় সামগ্রিক সংস্কৃতির মধ্যে তুলনা করা, তাহাদের অভ্যন্তরস্থ শাখা বা সংহতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা বিধেয় নয়। তাহাদের নিজেদের মধ্যে হয়তো বহু পার্থক্য বিদ্যমান, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের ভিতর এমন কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ থাকে, যাহার দরুণ অন্য কোন সংস্কৃতির সহিত তাহাদের পার্থক্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, পারসী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বহু বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে এমন কতগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে, যাহা তাহাদের সহিত একজন ইউরোপীয় অথবা অন্য যে কোন বৈদেশিকের স্বাতন্ত্র্য সপ্রমাণ করে। একথার সত্যতা সম্বন্ধে যিনি সন্দিহান, বৃটিশের অধীনস্থ ও আশ্রিত উপনিবেশ ও ডমিনিয়নসমূহের প্রতি তাঁহাকে দৃষ্টি ফিরাইতে বলিঃ হিন্দু ও মুসলমান দুই স্বতন্ত্র জাতি—এই যুক্তির অসারতার পক্ষে বহু অকাট্য প্রমাণ সে সকল স্থানে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইবে। ইউরোপীয় মাত্রই—তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা অথবা কেনায়া—যে কোন দেশের অধিবাসীই হোন—হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী প্রভৃতি সম্প্রদায়নির্বিশেষে ভারতীয় মাত্রেরই সম্বন্ধে এই মত পোষণ করেন যে, ভারতীয়গণের সাহচর্যে যাহাতে ইউরোপীয় কৃষ্টি কলুষিত না হয়, ইউরোপীয়গণের জীবনযাত্রা প্রণালীর মান অবনমিত না হয়, তজ্জন্য তাহাদিগকে তাহাদের জন্য নির্দিষ্টস্থানে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। পরাধীনজাতি হিসাবে কেবল যে ভারতীয়গণ সম্বন্ধেই এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাহা নয়, স্বাধীন চীন, এমন কি, গত মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত যে জাপানীগণ শ্রদ্ধা না হইলেও, সুবিবেচনা পাইবার অধিকারীরূপে বিবেচিত হইত—তাহারা পর্যন্ত এই উভয় গোলার্ধের ইউরোপীয় কৃষ্টি ও জীবনযাপন মানের ধারক ও বাহকদের হস্তে অনুরূপ লাঞ্ছনা হইতে অব্যাহতি পাইত না। এই ভেদ-বিচার ইউরোপীয় ও এসিয়ার সংস্কৃতিগত পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা হইতে এই কথাই সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রদায়গত বহু পার্থক্য

40. Jaffar, op. cit., pp. 206—7.

থাকা সত্ত্বেও, তাহাদের উভয়ের সমবেত সাধনায় যে সাধারণ ভারতীয় সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা, প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য অপর যে কোন দেশ হইতে আগত, কিম্বা প্রাচীন অথবা নবীন জগতের যে কোন মহাদেশ হইতে উদ্ভূত সংস্কৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কি সংগ্রামের সঙ্কটকালে, কি শান্তির স্বাভাবিক সময়ে সুদীর্ঘকালব্যাপী ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও কর্মতৎপরতার ভিতর দিয়া যে ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বাভাবিক পরিণতি ইহা না হইয়া পারে না। যদি দুইটি বিভিন্ন প্রকারের আমের চারা একত্র করিয়া কলম বাঁধা হয়, তাহার ফলে যে নূতন বৃক্ষ জন্মলাভ করিবে, তাহার ফল উন্নততর হইতে বাধ্য। তাহাদিগকে বলপ্রয়োগের দ্বারা পুনরায় পৃথক্ করিবার চেষ্টা ভ্রান্তি ও নিষ্ঠুরতাপ্রসূত! তাহা ছাড়া, একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ইতিমধ্যে সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ভিতর বহু ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করিয়া যাহারা বর্ধিত হইয়াছে, বলশালী হইয়াছে, নিবিড়তরভাবে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে—চেষ্টা করিলেও তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা সহজসাধ্য হইবে না।. সে চেষ্টা যদি সফলও হয়, তাহা হইলে উভয়েরই অবস্থা দুর্বলতর হইবে, চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত ও বিপর্যস্ত হইবার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইবে।

(৫) এক দেশ

ভারতবর্ষ উত্তরে তুষারমণ্ডিত হিমালয় পর্বতমালা হইতে দক্ষিণে প্রায় বিষুব রেখার সমীপবর্তী স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিরাট দেশ। তাহার মধ্যে আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থার কি বিপুল বৈচিত্র্য! তাহার একদিকে যেমন সমুদ্র হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন বহু বিস্তীর্ণ অভ্যন্তর ভাগ, অপরদিকে তেমনি প্রায় চারি হাজার মাইলব্যাপী দীর্ঘ উপকূল; একদিকে রাজপুতানা ও সিন্ধুর মরু অঞ্চল, অপরদিকে বাংলা ও আসামের চিরশ্যাম প্রান্তর; একদিকে আসাম প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দক্ষিণ-পশ্চিমে আস্তৃত সানুদেশে প্রচুর বারিপাত, অন্যদিকে সিন্ধু, রাজপুতানা ও অন্ধ্র অঞ্চলে অনাবৃষ্টি। অভ্যন্তরভাগের স্থানে স্থানে, বিশেষ করিয়া পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুর প্রচণ্ডতা, আবার দক্ষিণের উপকূলভাগ অঞ্চলে তাহাদের অস্তিত্বেরই একরূপ অভাব। অন্যান্য আরও বহু ব্যাপারের মত এই আবহাওয়া ও প্রকৃতিগত বিভিন্নতা কোন ক্ষেত্রেই জনসমষ্টির ধর্ম ও সম্প্রদায়গত পার্থক্য অনুসরণ করিয়া চলে না। উত্তর-পশ্চিমের শীতপ্রধান, শুষ্ক মরু অঞ্চলের সহিত উত্তর-পূর্বের ঝটিকাবিক্ষুব্ধ শ্যামল সিক্ততার আবহাওয়া ও প্রকৃতিগত পার্থক্য প্রচুর, তথাপি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার যুক্তিতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া ভারত বিভাগের যে দাবী উত্থিত হইয়া থাকে, সে পরিকল্পনায় এতদুভয় অঞ্চল একই অংশের অঙ্গীভূত।

এই আবহাওয়া ও প্রকৃতিগত পার্থক্যের বিচিত্র প্রভাব বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসিগণের উপর পতিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে তাহাদের স্ব স্ব গৃহনির্মাণ-পদ্ধতি, সামাজিক আচার-ব্যবহার, এমন কি, সাধারণভাবে সমগ্র জীবনযাপন-প্রণালীর

মধ্যে পার্থক্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষ সামগ্রিকভাবে একটি স্বতন্ত্র দেশ—পর্বত ও সমুদ্রের অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক ব্যবধান দ্বারা অন্যান্য দেশ হইতে পরিপূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ও পৃথকীকৃত। হিন্দু অথবা মুসলমান যে কোন শাসনকালেই হোক, প্রত্যেক আক্রমণকারী, বিজেতা ও সম্রাট সেইজন্য সচেষ্ট হইয়াছেন দেশব্যাপী এক অখণ্ড সাম্রাজ্য গঠন করিতে, অবশ্য সে ব্যাপারে কৃতকার্যতার পরিমাণ সকল ক্ষেত্রে সমান নয়। প্রত্যেক শাসনকর্তাই চাহিয়াছেন সমগ্র দেশকে তাঁহার প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে না হইলেও, প্রভাবের পরিধির মধ্যে লইয়া আসিতে। তাহা সত্ত্বেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের একটি বিশিষ্ট অঞ্চল চিরদিনই বে-ওয়ারিশ রাজ্য রহিয়া গিয়াছে, ঘন ঘন হাত-পরিবর্তনের ভিতর দিয়া কখনও বা সে আসিয়াছে ভারতীয় শাসনকর্তার অধীনে, আবার কখনও বা অভারতীয় শাসকের আমলে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট হিন্দু রাজচক্রবর্তী ও মুসলমান বাদশাহগণের যুগ-জীর্ণ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াই নিখিল ভারতীয় অখণ্ড সাম্রাজ্য খণ্ডনে প্রয়াসী হইয়াছেন। বর্তমান যুগের প্রদেশগুলির মত অতীতেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য রহিয়া গিয়াছে এবং তাহারা পরস্পরের মধ্যে বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু সেই সব অঞ্চলের অধিবাসিগণ অথবা নৃপতিবর্গ নিজদিগকে ভারতবাসী অথবা স্ব স্ব রাজ্যসমূহকে চীন, পারস্য, তুর্কিস্থান, আরব, এমন কি, ব্রহ্মদেশ হইতে স্বতন্ত্র ভারতবর্ষের অংশবিশেষ মনে করিতেন না—এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে প্রত্যেক হিন্দু সন্ধ্যা-আহ্নিক করিবার সময় যে সংকল্প বাক্য উচ্চারণ করেন, তাহার ভিতর দিয়া সমগ্র ভারতের একটি অখণ্ড ছবি তাঁহার ধ্যানে ফুটিয়া উঠে; সিন্ধু, গঙ্গা, কাবেরী প্রভৃতি সপ্ততীর্থের সলিল তাঁহার আহ্নিকের ক্ষুদ্র পঞ্চপাত্রে আসিয়া সম্মিলিত হয়। ইহ যে কেবল হিন্দু রাজচক্রবর্তীদের সার্বভৌম শাসনকালেই হইয়াছে তাহা নয়, যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত, তখনও এইভাবেই আহ্নিক কৃত্য সমাপ্ত হইয়াছে; এমন কি মুসলমান শাসনকালেও দিল্লীর সিংহাসনে যখন বাদশাহ অধিষ্ঠিত এবং অন্যত্র স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান রাজাগণ রাজত্ব করিতেছেন, তখনকার দিনেও এই প্রথাতেই আহ্নিক কার্য পরিচালিত হইয়াছে। আজ যখন সমগ্র দেশ বৃটিশ সার্বভৌমত্বের অধীন তখনও সেই প্রাচীন প্রথার পরিবর্তনহীন পুনরাবৃত্তি চলিতেছে। ভারতের চারিটি তীর্থস্থান চারি 'ধাম' নামে পরিচিত, এই তীর্থস্থান সমূহের দর্শন হিন্দুদের নিকট শ্রেষ্ঠ পুণ্য কার্যরূপে পরিগণিত। ভারতের চারিপ্রান্তস্থ এই চারিটি তীর্থস্থানের মধ্যে দক্ষিণের শেষ প্রান্তে রামেশ্বরম, প্রায় পনর হাজার ফিট উচ্চে গভীর পার্বত্য অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত বদরিকাশ্রম, উড়িষ্যার পূর্ব উপকূলে জগন্নাথ পুরী এবং পশ্চিমের সমুদ্র উপকূলবর্তী কাথিয়াওয়াড়ে দ্বারকা। শাসক ও শাসনকার্য-সংক্রান্ত রাজনৈতিক বিভাগ নির্বিশেষে হিন্দুগণ যে চিরদিন ভারতবর্ষকে আজিকার মতই সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়া দেখিয়া আসিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মুসলমান ও বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থা ভারতের এই সীমান্ত নির্ধারণ পদ্ধতিই অবিকলভাবে মানিয়া লইয়াছে।

পক্ষান্তরে দুইজাতি তত্ত্ব ঘোষিত হইবার পূর্বে এই সেদিন পর্যন্ত মুসলমানগণ ভারতের অভ্যন্তরস্থ যে কোন স্থানকে ভারতেরই অংশবিশেষরূপে গণ্য করিয়া আসিয়াছেন। কোন মুসলমান নরপতিই ভারতের অংশবিশেষ খণ্ডিত করিয়া, যে দেশ হইতে তিনি আসিয়াছেন, তাহার সহিত সংযোজিত করিবার কল্পনা করেন নাই। যাঁহারই সাধ্যে কুলাইয়াছে, তিনিই এই দেশে স্থায়ীরূপে বসবাস করিয়া তাঁহার অধিকারবহির্ভূত স্থানসমূহকে আপনার আধিপত্যের অধীনে আনিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন। সীমান্তবর্তী কোন কোন স্থান হয়তো কখনও এই প্রকৃতিনির্ধারিত ব্যবধানরেখার বাহিরে গিয়াছে, আবার কখনও বা তাহার ভিতরে আসিয়াছে; কিন্তু তাহার জন্য উপরি-উল্লিখিত উক্তির সত্যতা অস্বীকৃত হইতে পারে না।

কি স্বাধীন শাসকরূপে, কি বৃটিশশাসিত রাজ্যের প্রজারূপে বৃটিশ ও দেশীয় নরপতিগণের শাসনাধীন ভারতের যে কোন স্থানকে এই সেদিন পর্যন্ত মুসলমানগণ ভারতের অংশবিশেষ ছাড়া অন্য কোন কিছু জ্ঞান করেন নাই। যে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল লইয়া মুসলিম লীগ স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য গঠন করিতে চান, জানি না, তাহা ভারতের বহির্ভূত অথবা অন্তর্ভুক্ত। আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মতে পাকিস্থান জাতীয় আন্দোলনের প্রবর্তক ও সভাপতি মিঃ সি. রহমৎ আলিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছেন, "ভারতের অখণ্ডতা স্বীকার করিয়া লইবার অর্থই হইবে, 'মিলাত'কে 'ভারতীয়তা'র স্বৈরশাসনের অধীন করা।" এই যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি স্বধর্মাবলম্বীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন, "ভারতকে খণ্ডিত করিয়া, 'মিলাত'কে 'ভারতীয়তা'র আক্রমণ করা এবং তদ্দ্বারা 'ইসলাম-প্রসার' আন্দোলনকে বলশালী করিয়া তোলাই হইবে তাঁহাদের জীবন-ব্রত।"৪১ এমন কি লীগ প্রতিষ্ঠানের 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' এই নাম সম্বন্ধেও তাঁহার ঘোরতর আপত্তি; তিনি বলেন, 'এই নামের মধ্যেও ভারতীয়তার গন্ধ ভুড়ভুড় করিতেছে এবং তাহার ফলে ভারতীয়তার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে। নামের কার্যকারিতার গুরুত্ব আমরা যেন লঘু করিতে চেষ্টা না করি, কারণ নামই হইতেছে সেই বিশিষ্ট লক্ষণ, যাহা নামধারীর স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিতরূপে নির্দেশ করে। তাহা ছাড়াও, নাম হইতেছে নৈতিক প্রতীক চিহ্ন এবং তজ্জন্য সমস্ত অনুপ্রেরণার উৎসমূল। এই ভুলের জন্য আমাদিগকে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হইয়াছে; ইহা আমাদের দেহে ভারতীয় ছাপ অঙ্কিত করিয়া, আমাদের জাতীয় সত্তাকে সংশয়ান্বিত করিয়াছে। 'ভারতীয়'— এই শব্দটিই দোষদুষ্ট এরূপ অর্থে একথা আমি বলিতেছি না; অন্য যে কোন নামের মতই 'ভারতীয়' নামটিও বিশিষ্ট মর্যাদাসূচক। আমি বলিতেছি এইজন্য যে, আমরা যখন ভারতীয় নই, তখন নিজদিগকে অথবা নিজেদের প্রতিষ্ঠানসমূহকে 'ভারতীয়' আখ্যায় আখ্যাত করা স্বধর্মদ্রোহিতা ছাড়া আর কিছু নয়।' ৪২ এই উপলব্ধির পর মিঃ রহমৎ আলি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ইসলামীয় অঞ্চলকে

---

41. The Millat of Islam and the Menace of "Indianism", p. 7.
42. Ibid., p. 15.

পাকিস্থান নামে সর্বপ্রথম অভিহিত করেন ১৯৩২ সালে এবং তৎপর ১৯৩৭ সালে বাংলা-আসাম ও হায়দরাবাদ-দাক্ষিণাত্য এই দুইটি অঞ্চলকেও যুক্তিহীন যথেচ্ছচারিতার সহিত দুই-জাতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া প্রথমটির নাম দেন বঙ্গ-ই-ইসলাম ও দ্বিতীয়টি আখ্যাত করেন উসমানিস্থান নামে। এই অঞ্চলত্রয় তাঁহার মতে ইসলামীয় অধিকারের সুরক্ষিত দুর্গবিশেষ।'৪৩ কাজেই দেখা যায়, ১৯৩৩ সাল হইতে ভারতবর্ষ মিঃ রহমৎ আলি ও পাকিস্থান আন্দোলন কর্তৃক বহু দেশের সমবায়ে গঠিত এক খণ্ড-মহাদেশরূপে পরিগণিত হইতেছে। আজ পর্যন্ত অন্য কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি বা সংহতি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। শাসন-ব্যবস্থার সুবিধার জন্য এরূপ বিভাগ বিহিত হইতে পারে, তাহা ছাড়া অন্য কোন কারণে মানুষ যে এরূপভাবে তাহার খুসীখেয়াল মত কোন দেশের অংশবিশেষ কাটিয়া লইয়া, নূতন দেশ সৃষ্টি করিতে পারে—একথা আমার ধারণাতীত। ইউরোপে যখনই কোন দেশকে খণ্ডিত করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে, তখনই তাহার ফলে সঞ্জাত হইয়াছে ঘৃণা ও তিক্ততা এবং সেই বিদ্বেষের পরিণতি ঘটিয়াছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে। সর্বধ্বংসী বিগত বিশ্ব-যুদ্ধও তাহারই ফল। এই দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া সতর্ক হওয়া আমাদের কর্তব্য।

(৬) এক ইতিহাস

নবম শতাব্দীতে মহম্মদ বীন কাসিম যেদিন সিন্ধুর উপকূলে প্রথম অবতরণ করেন, সেইদিন হইতেই ভারতে মুসলমান আক্রমণের সূত্রপাত। এই আক্রমণপরম্পরার পরিসমাপ্তি ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আহম্মদ শা আবদালির সর্বশেষ আক্রমণে। এই আক্রমণসমূহের কোন একটিও কোন ধর্মোন্মাদ মুসলমান-কর্তৃক ইসলামের প্রসারের উদ্দেশ্যে জেহাদরূপে পরিচালিত হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর সব আক্রমণের মত এগুলির পশ্চাতেও ধর্মগত অনুপ্রেরণা অপেক্ষা পার্থিব ও বাস্তব স্বার্থবুদ্ধির প্রভাবই সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। আদি আক্রমণগুলির সময়ে হিন্দুগণই এদেশের একমাত্র অধিবাসী ছিল বলিয়া আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তাহারাই অগ্রসর হয়; এই আক্রমণে সে যুদ্ধ আপাত-দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষেরই আকার পরিগ্রহ করে। কিন্তু সেই আদি যুগ হইতেই এই সব আক্রমণকারিগণ ভারতবর্ষে স্থায়ীরূপে বসবাস করিবার উচ্চাশা পোষণ করিতেন। একাদশ শতাব্দীতে সাহাবুদ্দীন ঘোরীর সময় হইতে বহিরাগত প্রত্যেক মুসলমান আক্রমণকারী, তিনি তাতার, তুর্কী, মোগল অথবা আফগান যে কোন জাতীয়ই হোন না কেন, প্রথমে ভারতের অংশবিশেষের উপর আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তাহার পর ধীরে ধীরে তাহা আরও প্রসারিত করিয়াছেন। রাজ্যের পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর রাজধানী হইতে সমগ্র রাজ্য শাসন করা অসম্ভব না হইলেও, যেমন কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তেমনই দূরবর্তী

43. Rahmat Ali, op. cit., pp. 1 and 16.

প্রদেশসমূহের জন্য শাসনকর্তা নিযুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন। এই শাসনকর্তাগণ কেন্দ্রীয় শাসন-যন্ত্রের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া, যে প্রদেশে তাঁহারা নিযুক্ত, তৎপরতার সহিত সেই প্রদেশের স্বাধীন রাজা-রূপে নিজদিগকে ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সুদীর্ঘ মুসলমান শাসনকালে যে সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়াছে তাহা দুই শ্রেণীর। প্রথমতঃ মুসলিম অধিকার-সীমা সম্প্রসারণের যুদ্ধ; গোড়ার দিকে এই সকল যুদ্ধ পরিচালিত হইয়াছে হিন্দুদের বিরুদ্ধে, কারণ যে অঞ্চলগুলি দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা হইয়াছে, সেগুলির মালিক ছিল হিন্দুরাই। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতে যে দ্বিতীয়প্রকারের সংগ্রাম ও অভিযান সুরু হইল, তাহা হিন্দুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় নাই, হইয়াছিল মুসলমান নৃপতি, অথবা সেই সব বিদ্রোহী মুসলমান শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে, যাঁহারা স্ব স্ব শাসনাধীন অঞ্চলে আপনাদিগকে স্বাধীন রাজারূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত সংগ্রামে হিন্দুগণ যুদ্ধরত হইয়াছিল উভয় পক্ষেই। ঘোরীদের পর হইতে যে সব মুসলমান আক্রমণকারী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথ দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাঁহাদিগকে মুসলমান রাজাই আক্রমণ করিতে হইয়াছে এবং দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় মুসলমান নরপতির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালন করিয়া যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিতে হইয়াছে। তৈমুর ও নাদিরশাহের আক্রমণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় নাই, হইয়াছিল মুসলমানগণের বিরুদ্ধে এবং তাহা প্রতিরোধ করিয়াছিল মুসলমানগণই। পাণিপথের যুদ্ধে যাঁহাকে পরাজিত করিয়া বাবর ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি হিন্দু ছিলেন না, ছিলেন মুসলমান—দিল্লীর অধিপতি ইব্রাহিম লোদী। মেবারের রাণা সঙ্গ বাবরের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করেন, তাহাতে তিনি যে কেবল রাজপুতদেরই সাহায্য লাভ করেন তাহা নয়, মেওয়াতের হাসান খাঁ এবং সিকন্দর লোদীর এক পুত্র মহম্মদ লোদীও এ যুদ্ধে তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করেন। ১৫২৭ সালে কানোয়ার যুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের এই মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করিবার পর ভারতবর্ষে তাঁহার সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাবরের পুত্র হুমায়ুন মুসলমান পাঠান শেরশাহের নিকট পরাজিত হইবার পর কিছুদিনের জন্য রাজ্য তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। শের শাহের মৃত্যুর পর তাহা পুনর্বিজিত হইলে, আকবর মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করিয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। আকবর হইতে আরম্ভ করিয়া আওরংজেব পর্যন্ত মুসলমান সম্রাটগণের বেশীর ভাগ সময় এবং শক্তি ব্যয়িত হইয়াছিল স্বাধীন মুসলমান ও বিদ্রোহী মুসলমান শাসন-কর্তাদের দমন ও দলিত করিবার চেষ্টায়। আওরংজেবকে যে গোলকোণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য জয় করিবার জন্য দীর্ঘদিন দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতে হয় এবং অবশেষে সেইখানেই দেহরক্ষা করিতে হয় ইহাতো ইতিহাস-বিদিত ঘটনা। এই সমস্ত অভিযানের অধিকাংশই পরিচালিত হয় আকবরের সময়ে মানসিংহ ও ভগবান দাস এবং আওরংজেবের সময়ে জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহের ন্যায় হিন্দু সেনাপতি-দিগের নেতৃত্বাধীনে এবং এই সকল অভিযান যাঁহাদের বিরুদ্ধে তাঁহারা যে সব সময় মুসলমান নরপতিই হইতেন তাহা নয়; তখনও স্থানে স্থানে বিদ্যমান হিন্দু-

রাজাগণও ইহার লক্ষ্যবস্তু হইতেন। ইহা হইতে এই কথাই সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, আবহমানকাল হইতে পৃথিবীর সমস্ত বিজয় ও বিগ্রহের মূলে যে বাস্তব ও বিষয়-বুদ্ধির অনুপ্রেরণা ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে, সুদীর্ঘ মুসলমান শাসনকালে ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত সংগ্রামসমূহের পশ্চাতে তাহারই কার্যকারিতা বিদ্যমান এবং তাহা হইতেছে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বংশগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত ও সুদৃঢ় করিবার আগ্রহ ও যুদ্ধজয় ও সাম্রাজ্য অর্জনজনিত খ্যাতি ও গৌরবের সম্ভোগ-লিপ্সা।

অতএব দেখা যাইতেছে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কুতুবুদ্দীন আইবাকের রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি পত্তন অবধি এই ছয়শত বৎসরব্যাপী ভারতের ইতিহাস হিন্দু ও মুসলমানের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস নয়। বরঞ্চ এই সময়ের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ অপেক্ষা মুসলমান ও মুসলমানের মধ্যে সংঘটিত সংগ্রামের সংখ্যা বহুগুণে অধিক। কিন্তু সে কথা প্রমাণ করিবার মত উপযুক্ত ক্ষেত্র ইহা নয় এবং পর্যাপ্ত স্থানও এখানে নাই। মাত্র সংক্ষিপ্ত একটুকু আলোচনার চেষ্টা করা যাক।

এই কালটিকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে; প্রথমটি, দিল্লীর সুলতানদের শাসনকাল এবং দ্বিতীয়টি মোগল শাসনকাল। প্রথম কাল-বিভাগের মধ্যে কেবল যে ভারতে মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও হিমাচল হইতে রামেশ্বর এবং পশ্চিম সীমান্ত হইতে পূর্বে উড়িষ্যা ও বাঙ্গলার উপকূল পর্যন্ত তাহার প্রসারই সম্ভবপর হইয়াছিল তাহা নয়, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন মুসলমান রাজ্যেরও উদ্ভব হইয়াছিল। রাজবংশের পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনও এই যুগের আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। দিল্লীর সুলতানদের অধিকাংশ সময় ও শক্তি শুধু হিন্দু-অধিকৃত রাজ্যজয়েই ব্যয়িত হয় নাই; কখনও তাহাদের অধীনস্থ মুসলমান শাসক-বর্গের বিদ্রোহ দমন আবার কখনও বা তাঁহাদের আক্রমণ হইতে স্বনাদের সিংহাসন রক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে নিরন্তর বিব্রত থাকিতে হইয়াছে। ১১৯৩ হইতে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পাঁচটি বিভিন্ন রাজবংশের প্রায় পঁয়ত্রিশজন সুলতান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। এই রাজবংশের প্রত্যেকটিই ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং যাঁহাদের আক্রমণে এগুলির পতন ঘটে তাঁহারাও মুসলমান। পঁয়ত্রিশজন সুলতানের মধ্যে কমপক্ষে উনিশজন যাহাদের হস্তে প্রকাশ্যে বা গোপনে নিহত হন তাহারা কেহই হিন্দু নয়, প্রত্যেকেই মুসলমান।

এইসব স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে বাঙ্গলা, জৌনপুর, গুজরাট, মালোয়া, খান্দেশ এবং বেরার, আহম্মদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও বিদার এই পঞ্চরাজ্যে বিভক্ত বাহমনী রাজ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের প্রত্যেকটিরই এক একটি স্বাধীন ইতিহাস আছে এবং তাহা হইতেই পার্শ্ববর্তী মুসলমান রাজ্য-সমূহের ও দিল্লীর সুলতানের সহিত সংগ্রামের ইতিহাস; অবশ্য মাঝে মাঝে তখনও স্থানে স্থানে বিদ্যমান হিন্দু রাজ্যের সহিতও যে যুদ্ধ না হইয়াছে এমন নয়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথ দিয়া ভারতের উপর মাঝে মাঝে যে মুসলমান আক্রমণ আসিত তাহা প্রতিরোধ করিবার দায়িত্বও ছিল দিল্লীর বাদশাহদিগের হস্তে

এবং তাহার জন্য আলাউদ্দীনের সময় হইতেই ঐ অঞ্চলে রক্ষা-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া বাবর যখন মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি পত্তন করিলেন, এমন কি, তাহার পরেও দিল্লীর সিংহাসন তাঁহার বংশধরগণের পক্ষে নিষ্কণ্টক হয় নাই। তাঁহার এক পুত্র কামরাণ কাবুল ও কান্দাহার লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, লাহোর অধিকার করিয়া বসিলেন; এই কারণে তাঁহার আর এক পুত্র হুমায়ুনকে আপন ভ্রাতার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হয়। হুমায়ুনকে তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা হিন্দল ও মীরজা আসকারীর সহিতও যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। হিন্দল এক যুদ্ধে নিহত হন; কামরাণকে বন্দী করিয়া তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করা হয় এবং আসকারী ধৃত ও কামরাণের মত মক্কায় প্রেরিত হন।

উত্তর ভারতে নিজের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য হুমায়ুনকে নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে। তিনি গুজরাটের বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালন করিয়াছেন, কিন্তু বিহারের আফগান সর্দার শের খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা করাতে গুজরাট নিজের অধিকারে রাখিতে অসমর্থ হন এবং শেষ পর্যন্ত শের খাঁর হস্তে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হইয়া ভারত হইতে পলায়ন করেন ও পারস্যের শাহের আশ্রয়প্রার্থী হন।

শের শাহের পর তাঁহার পুত্র সালিম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। আফগান সামন্তদিগকে আয়ত্তে রাখিতে না পারিয়া তিনি তাহাদের কয়েকজনকে হত্যা করেন। পাঞ্জাবের বিদ্রোহী শাসনকর্তা পরাজিত হইয়া কাশ্মীরে পলায়ন করেন ও তথায় নিহত হন।

সালিম শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ফিরোজ খাঁ রাজা হন, কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতে তাঁহার মাতুল মুবারিজ খাঁ তাঁহাকে হত্যা করিয়া মহম্মদ শা নাম ধারণ পূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজকার্য পরিচালনের ভার ন্যস্ত ছিল হিমু নামক এক হিন্দুর উপর। এই বিদ্রোহ ব্যাপক আকারে দেখা দেয়, ইব্রাহিম সুর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন এবং পরে সিকন্দর সুরের নিকট তিনি পরাজিত হন। এদিকে হুমায়ুন সুযোগের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি সসৈন্যে ভারত অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে সিরহিন্দের যুদ্ধে সিকন্দর শাহকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন পুনরধিকার করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কাবুল তখনও নামে মাত্র হিন্দুস্থানের অধীন রাজ্যরূপে পরিগণিত হইলেও কার্যতঃ তাহা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদ হাকিমের অধিকারভুক্ত ছিল। আকবর তখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বের অধীন। তিনি সর্বপ্রথম যে সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হইলেন তাহা আসিল সুরদের পক্ষ হইতে। সুর রাজবংশের হিন্দুমন্ত্রী হিমু দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং মোগল সেনাপতি ফরিদ

বেগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। পরে অযোগ্যতার অপরাধে বৈরাম খাঁ কর্তৃক তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই বিজয়ে উৎসাহিত হইয়া হিমু বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করেন এবং সাম্রাজ্যগঠনে সচেষ্ট হন; কিন্তু পাণিপথের যুদ্ধে বৈরাম খাঁর হস্তে পরাজিত হইয়া প্রাণ হারান। অতঃপর সিকন্দর শাহ আত্মসমর্পণ করিলে, ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে সুর রাজবংশের পতন ঘটে।

আকবর এতদিনে বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন; এই অসহিষ্ণুতার আগুনে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন তাঁহার মাতা হামিদা বেগম, বিমাতা মাহাম আনকাহ ও বৈমাত্র ভ্রাতা আধাম খাঁ। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে বৈরাম আকবর কর্তৃক পদচ্যুত হন এবং সে আদেশ মানিয়া লইয়া মক্কা যাত্রা করেন। তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারেন, এই আশংকায় তাঁহার যাত্রা ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে আকবর পীর মহম্মদের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এইরূপে উত্যক্ত হইয়া বৈরাম সত্য সত্যই বিদ্রোহী হইলেন এবং পাঞ্জাব অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আকবর স্বয়ং তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে বৈরাম তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং আকবর তাঁহার অতীত সেবার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার অপরাধ মার্জনা করিলেন ও পুনরায় মক্কা যাত্রা করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। পথিমধ্যে গুজরাটের অন্তর্গত পাতান নামক স্থানে এক গুপ্ত ঘাতকের হস্তে তিনি নিহত হন।

আকবরের সেনাপতি পীর মহম্মদ ও আধাম খাঁ অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সহিত মালোয়ার মুসলমান রাজাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া উক্ত রাজ্য অধিকার করেন।

আকবরকে যাঁহাদের বিদ্রোহ দমন করিতে হয়, তাঁহাদের মধ্যে মালোয়ার আবদুল্লা খাঁ উজবেগ, জৌনপুরের খাঁ জামান এবং তাঁহার আপন ভ্রাতা মীরজা হাকিম প্রধান। মীরজা হাকিম উজবেগীদের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া সিংহাসন দাবী করিলে আকবর পাঞ্জাব অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু হাকিম সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ না হইয়া দ্রুত পলায়ন করিলেন। খাঁ জামান যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন এবং তাঁহার ভ্রাতাকে বন্দী করিয়া শিরশ্ছেদ করা হয়। অন্যান্য বিদ্রোহিগণও নিষ্ঠুরভাবে নিপীড়িত হন।

আকবর ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে মুজাফর খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া গুজরাট-বিজয় সমাপ্ত করেন এবং উহা তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই সময়টি আকবরের শাসন-ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ যুগ।

শের শাহের শাসনকালে বাঙলা ছিল আফগান সামন্তদিগের অধীনে। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে বিহারের সুলেমান খাঁ গৌড় অধিকার করিয়া উভয় প্রদেশের অধীশ্বর হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বায়াজিদ সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাঁহার মন্ত্রিগণ বিদ্রোহী হন এবং বায়াজিদকে হত্যা করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দাউদকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু দাউদ জামানিয়া দুর্গ অধিকার করিয়া অচিরে সম্রাটের বিরাগভাজন হইলেন। আকবর তাঁহার সেনাপতি মুনিম খাঁ সমভিব্যাহারে স্বয়ং দাউদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে

তাঁহাকে এক যুদ্ধে পরাজিত করিয়া নিহত করিলেন। অতঃপর বাঙগলা ও বিহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। উড়িষ্যা-বিজয় সম্পন্ন হয় তাহারও অনেক পরে।

মুজাফর খাঁ তুরবাতি বাঙগলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, কিন্তু তাঁহার রাজস্ব আদায় সম্বন্ধীয় অবিচারমূলকনীতি স্থানীয় সামন্তগণের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। ধর্ম সম্বন্ধে আকবর-প্রবর্তিত বিশ্বজনীন সহনশীলতার নীতি মুসলমান জনসাধারণের বিরাগ উৎপাদন করে; এই গণবিক্ষোভের সুযোগ লইয়া ক্রুদ্ধ উলেমা জৌনপুরের কাজির সমর্থনক্রমে এই মর্মে এক ফতোয়া জারী করিলেন যে, সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা আইনসিদ্ধ। তদনুযায়ী চাগতাই বংশীয় কাকশালগণ বাবা খাঁর নায়কতায় গৌড় আক্রমণ করিলেন। শান্তিস্থাপনের জন্য আকবর হিন্দু-সেনাপতি টোডরমল্লকে বাঙগলায় প্রেরণ করেন। যুদ্ধে মুজাফর খাঁ নিহত হন এবং সমগ্র বিহার ও বাঙগলা বিদ্রোহী কাকশালদের হস্তগত হয়। পরিশেষে অবশ্য বিদ্রোহ ব্যর্থ ও দমিত হয়।

হাকিম পুনরায় পাঞ্জাব আক্রমণ করেন এবং আকবরের নিকট পরাজিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে কাবুল দিল্লীর শাসনাধীনে আসে এবং তাহার শাসনভার ন্যস্ত হয় হিন্দু-সেনাপতি মানসিংহের উপর। সীমান্তের উপজাতীয় দলও দমিত হয় এই সময়ে। কাশ্মীরের রাজা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন এবং কাশ্মীর রাজ্য দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। সিন্ধুর মুসলমান শাসনকর্তা মীরজা জানীর নিকট হইতে উক্ত প্রদেশ কাড়িয়া লওয়া হয়। কান্দাহার সাম্রাজ্যভুক্ত হয় ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে।

এইরূপে সমগ্র হিন্দুস্থান ও হিন্দুকুশ পর্বতমালার অপর প্রান্তস্থিত আফগান অঞ্চল অধিকার করিয়া আকবর দাক্ষিণাত্যের দিকে মনোযোগ নিবিষ্ট করিলেন। বুরহান নিজাম শাহের ভগ্নী বীরাঙগনা চাঁদ সুলতানার দুর্জয় প্রতিরোধ চূর্ণ করিয়া আকবর আহম্মদনগর অধিকার করিলেন ১৬০০ খৃষ্টাব্দে। অতঃপর তিনি বুরহানপুর আক্রমণ করেন এবং খান্দেশের শাসনকর্তা মিরান বাহাদুরকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ১৬০১ খৃষ্টাব্দে আসিরগড় অধিকার করেন।

দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করিবার পূর্বে আকবর তাঁহার পুত্র সেলিমের হস্তে রাজধানীর ভার অর্পণ করিয়া যান এবং নির্দেশ দিয়া যান, মানসিংহ ও শাহ কুলিখাঁর সহযোগিতায় মেবারের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালন করিতে। কিন্তু শাহজাদা সেলিম বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া আকবর দেখেন, সেলিম এলাহাবাদে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া বসিয়া আছেন। সেলিম অবশ্য তাহার পর পিতার নিকট মার্জনা ভিক্ষা করেন এবং পিতা-পুত্রের মধ্যে পুনরায় সম্প্রীতি স্থাপিত হয়। সেলিমকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র খসরুকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য সামন্ত ও সেনাপতিগণের মধ্যে এক ষড়যন্ত্র গড়িয়া উঠে; কিন্তু সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় এবং আকবরের মৃত্যুর পর সেলিম জাহাঙগীর উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

জাহাঙ্গীরকে সর্বপ্রথম যে বিদ্রোহীর দমনের জন্য তৎপর হইতে হয় তিনি তাঁহার আপন পুত্র খুসরু। খুসরু আগ্রা হইতে পলায়ন করিয়া কতিপয় ওমরাহের সাহায্যে সাহসী হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন; কিন্তু তিনি পরাজিত হন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় সম্রাটের সম্মুখে নীত হন। তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার অনুচরবর্গকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া পুনরায় জনকয়েক সেনাপতি ও সামন্ত তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সম্রাটের হত্যা ও তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপনের ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। কিন্তু সে ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং খুসরুর চক্ষু উৎপাটন করিয়া কয়েক বৎসর তাঁহাকে এক নির্জন কারাকক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে তাঁহার ঘোরতর শত্রু আসফ খাঁর হস্তে অর্পণ করা হয়। আসফ খাঁ আবার তাঁহার ভ্রাতা সাজাহানের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলে, সাজাহানের আদেশে ১৬২২ খৃষ্টাব্দে তিনি নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পিতা অনুতপ্ত হইয়া এলাহাবাদে তাঁহাকে যেস্থানে সমাধিস্থ করেন, আজিও সে স্থানটি খুসরুবাগ নামে পরিচিত। সাজাহানের আর একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জীবিত রহিলেন, তিনি হইতেছেন নূরজাহানের জামাতা সারিয়ার। সাজাহানও তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন এবং ১৬২২ খৃষ্টাব্দ হইতে পিতার প্রায় জীবিতকাল অবধি পিতৃদ্রোহী রহিয়া যান। বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইবার পর তিনি আত্মসমর্পণ করেন এবং স্বীয় পুত্র দারা ও আওরংজেবকে প্রতিভূস্বরূপ দরবারে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। জাহাঙ্গীরকে বাঙ্গলার আফগান বিদ্রোহীদিগের ও তাঁহার আপন সেনাপতি মহবৎ খাঁর বিদ্রোহও দমন করিতে হয়। এই মহবৎ খাঁর হস্তেই একবার তিনি ও তাঁহার মহিষী নূরজাহান বন্দী হন। জাহাঙ্গীর হিন্দুদের বিরুদ্ধে যে দুইটি বিজয় লাভ করেন তাহাদের একটি হইতেছে ১৬২০ খৃষ্টাব্দে কাংড়া বিজয় ও অপরটি, যে মেবার আকবরের শাসনকাল হইতে মোগল আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া আসিতেছিল তাহার আত্মসমর্পণ। পারসিকগণ দীর্ঘ অবরোধের পর কান্দাহার অধিকার করিলে উক্ত রাজ্য সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্যুত হইয়া যায়।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সারিয়ার সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করা হয় এবং তৎপরে সাজাহান তাঁহার শ্বশুর আসফ খাঁর সাহায্যে তাঁহাকে নিহত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। সারিয়ার ছাড়াও রাজপরিবারের আরও বহু ব্যক্তি এই আসফ খাঁর হস্তে নির্দয়ভাবে নিহত হন এবং বহু মহিলা আত্মহত্যা করিয়া অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পান। সাজাহানের আসল নাম শাহজাদা খুরাম। দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্যসমূহের বিরুদ্ধে অভিযানে সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপ সাজাহান উপাধিতে তিনি ভূষিত হন। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরই সাজাহানকে বিদ্রোহী বুন্দেলা সর্দারের সম্মুখীন হইতে হয়; অবশ্য সে বিদ্রোহ সহজেই দমিত হইয়া যায়। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা খাঁ জাহান লোদী বিদ্রোহী হইলে সাজাহান তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ঘোষণা করেন; বিদ্রোহ দমিত হইলে শতাধিক অনুচরসহ খাঁ জাহান লোদীর শিরশ্ছেদ করা হয়।

আকবর ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে খান্দেশ ও ১৬০০ খৃষ্টাব্দে আহম্মদনগর জয় করেন বটে, কিন্তু আহম্মদনগর কোনদিনই পরিপূর্ণরূপে তাঁহার আয়ত্তে আসে নাই। মালিক অম্বরের প্রতিরোধের দরুণ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেও অবস্থার কোন উন্নতিবিধান সম্ভব হয় নাই। সাজাহানের বিজয়ও সাময়িক, সুতরাং দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণ কার্যতঃ অবিজিতই রহিয়া যান। আহম্মদনগর রাজ্যের পতন ঘটে ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে। বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা অপরাজিতই রহিয়া গেল। প্রথমতঃ বিজাপুর রাজ্য আহম্মদনগরকে সম্রাটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহায্য করেন এবং দ্বিতীয়তঃ শাহজী নিজাম-শাহী বংশের এক বালককে আহম্মদনগরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সমস্ত কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিলেন। বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিল। অতঃপর আওরংজেব দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। ক্ষণস্থায়ী বিরতির পর পুনরায় সংগ্রাম সুরু হইল। বিজাপুর রাজ্য গুলবার্গের যুদ্ধে পরাজিত হইল ও অবরোধের পর ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে কল্যাণী দুর্গ অধিকৃত হইল। রাজনৈতিক কারণ ব্যতীতও এই যুদ্ধের অপর এক কারণ ছিলঃ দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণ ছিলেন সিয়া; তাঁহাদের দমনের জন্য সুন্নী সম্রাটের ব্যগ্রতার ইহাও অন্যতম হেতু।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেই পারসিকগণ কান্দাহার অধিকার করে। সাজাহানের শাসনকালে ইহার পুনরুদ্ধারের জন্য পুনঃ পুনঃ অভিযান প্রেরিত হইয়াছে। পারস্যের শাহ তদানীন্তন পারসিক শাসনকর্তার আচরণে সন্দেহ-পরবশ হইলে শাসনকর্তা তাহা বুঝিতে পারেন এবং গোপন ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করিয়া দিল্লীর সম্রাটের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। অতঃপর সম্রাটের বাহিনী অগ্রসর হইয়া অতি সহজে কান্দাহার অধিকার করে। পারসিকগণ কান্দাহার পরিত্যাগ করিল বটে, কিন্তু আশা পরিত্যাগ করিল না, ফলে ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে কান্দাহার তাহাদের দ্বারা পুনরধিকৃত হইল। ইহার পরেও সম্রাট কান্দাহার বিজয়ের জন্য বহু অভিযান প্রেরণ করেন; কান্দাহার অবরুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু বিজিত হইল না। এই ব্যর্থ সামরিক অভিযানসমূহের জন্য রাজকোষ হইতে বার কোটি টাকা ব্যয়িত হয়।

সাজাহান বাল্‌খ ও বাদাক্‌শান জয় করিবার চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে শাহজাদা মোরাদের অধীনে এক বাহিনী প্রেরিত হয়। বোখারার শাসনকর্তা নাজ মহম্মদ ও তাঁহার বিদ্রোহী পুত্রগণের মধ্যে বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া মোরাদ ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে বিনাবাধায় বাল্‌খে প্রবেশ করেন এবং নাজ মহম্মদ পলায়ন করিলে পুনরায় হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন। দ্বিতীয় অভিযান প্রেরিত হয় আওরংজেবের শাসনকালে। এই অভিযানের প্রথম দিকে কোন পক্ষই সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইল না; অবশেষে মোগল ও রাজপুতের মিলিত অগ্নিবর্ষণের সম্মুখে দাঁড়াইতে না পারিয়া উজবেগীগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল এবং

আওরংজেব মহাসমারোহে বাল্খে প্রবেশ করিয়া উক্ত রাজ্যের শাসনভার মাধুসিং হাদা নামক এক রাজপুত সামন্তের হস্তে অর্পণ করিলেন। অতঃপর আওরংজেব আরও অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বহু বাধা ও বিপদের সম্মুখীন হইয়া সে সংকল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ফিরিবার পথে তাঁহার সৈন্যবাহিনী অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পতিত হয় এবং পশ্চাতে অবস্থিত রাজপুত সৈন্যদল আশ্রয় ও আহার্য অভাবে মৃত্যুবরণ করে। চার কোটি টাকা ব্যয়ে পরিচালিত এই অভিযান শোচনীয়রূপে ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হয়।

সাজাহান পীড়িত হন ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে। এই সংবাদকে আশ্রয় করিয়াই চারিদিকে তাঁহার মৃত্যুর জনরব মুখর হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে জনমত বিক্ষুব্ধ হয় ও উত্তরাধিকারের সংগ্রাম সুরু হইয়া যায়। দারা, সুজা ও মোরাদ এই ভ্রাতৃত্রয়ের শোণিতে স্নাত হইয়া আওরংজেব যে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন—ইহাতো ইতিহাসবিদিত ঘটনা। তাঁহাকে যে বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সংগ্রাম পরিচালন করিতে হয়—সে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অবশেষে এই রাজ্য দুইটি দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে, তাহাদের আড়াইশত বৎসরব্যাপী ঘটনাবহুল জীবনেতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই সমস্ত সংগ্রামে আওরংজেব যেমন হিন্দু সেনাপতিদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, শিবাজীও তেমনি বহু মুসলমান সামরিক কর্মচারীকে তাঁহার সৈন্যবিভাগে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেইসব উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের মধ্যে সেনাপতি সিদ্দী হুল্লাল ও নূর খাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিবাজীর নৌবাহিনীতে অন্ততঃপক্ষে তিনজন মুসলমান সেনাপতি নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায়, তাঁহারা হইতেছেন সিদ্দি সম্বল, সিদ্দি মিস্‌রী এবং দৌলত খাঁ।' ৪৪

মুসলমান শাসনকর্তাগণ কেবল আত্মকলহ ছাড়া আর কিছুই করেন নাই—এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই ঐতিহাসিক আলোচনার এই দীর্ঘ প্রসঙ্গের আমি অবতারণা করি নাই। বস্তুতঃপক্ষে ইহা ছাড়া আরও বহু কার্য তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন। সাম্রাজ্য গঠন করিয়া তাঁহারা তাহাকে গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহেই চারুশিল্প বিকাশলাভ করিয়াছে; তাঁহাদের নিমিত্তই জাতীয় রাষ্ট্র গড়িয়া উঠা সম্ভবপর হইয়াছে। সে যুগের যুদ্ধ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অপেক্ষা মুসলমানে ও মুসলমানেই বেশী হইয়াছে, এই কথা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যেই এই দৃষ্টান্তসমূহের উল্লেখ প্রয়োজন হইল। দীর্ঘ ছয়শত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা হিন্দুদের বিরুদ্ধেই অবিশ্রান্তভাবে সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহাদিগকে নিগৃহীত ও নিপীড়িত করিয়াছেন এবং তাহার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ঘৃণা ও তিক্ততার সঞ্চার হইয়াছে তাহার প্রভাব বিস্মৃত হওয়া বা মন হইতে মুছিয়া ফেলা অসম্ভব—এই ধারণা যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী একদেশদর্শী।

সাম্প্রতিককালেও বৃটিশ বাহিনীর অন্তর্গত ভারতীয় সৈন্যদল বৃটিশ সাম্রাজ্যিক স্বার্থে যুদ্ধ করিবার জন্য পূর্বে চীন, মালয়, ব্রহ্মদেশ এবং পশ্চিমে

44. Mehta and Patwardhan : The Communal Triangle, P. 18.

আরব, পারস্য, আফগানিস্থান, মিশর, তুরস্ক, সাইরেনাইকা, ত্রিপলী,—এমনকি ইউরোপেও প্রেরিত হইয়াছে। এই সকল রাজ্যের অনেকগুলিই মুসলমান অধিকৃত, তাই বলিয়া ভারতীয় সৈন্যদলের যুদ্ধযাত্রার পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হয় নাই। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই, কেননা, ভারতের বাহিরে অবস্থিত মুসলমান রাজ্য ও রাজাসমূহের মধ্যে সংগ্রাম ও জয়-পরাজয়ের দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পত্রে পত্রে ও ছত্রে ছত্রে ছড়ান রহিয়াছে।

হজরত মহম্মদের নির্দেশ ছিল, মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করিবে না। তাঁহার জীবিতকালে নিম্নলিখিতরূপ ঘটনা একাধিকবার ঘটিয়াছেঃ হয়তো যুদ্ধ চলিতে থাকাকালে কোন ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলিয়া স্বীকার করিল, অথচ তাহার স্বীকৃতির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার হেতু বিদ্যমান; সেরূপ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিল, যুদ্ধে তাহাকে বধ করা হইবে কিনা। হজরত মহম্মদ এরূপক্ষেত্রে নির্দেশ দিয়াছেন, সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, লোকটি যখন স্বীকার করিয়াছে সে মুসলমান, তখন সে অবধ্য, তাহার প্রাণ বাঁচাইতেই হইবে। কিন্তু তাঁহার পরলোকগমনের পরেই, যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন—এমনকি, তাঁহারা পর্যন্ত হজরতের এই নির্দেশ বিস্মৃত হইলেন। হজরত মহম্মদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও জামাতা তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান বিদ্রোহী মুসলমানদের হস্তে নিহত হন। হজরতের খুল্লতাত পুত্র ও জামাতা চতুর্থ খলিফা হজরত আলিও হজরতের বিধবা পত্নী হজরত আয়েশার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হন ও হজরত ওসমানের মত মুসলমানদের হস্তে প্রাণ হারান। হজরত আলির পুত্রগণ ওমায়াদ ইয়েজিদদের খেলাফতের দাবীর সমর্থনকারী মুসলমানদের দ্বারা নিহত হন। অথচ এই হজরত আলিই ছিলেন সর্বপ্রথম যুবক যিনি সাক্ষাৎ হজরতের নিকট হইতে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন, শুধু তাহাই নয়, তিনি ছিলেন তাঁহার আজীবন সহচর। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিতকাল পরেই তাঁহার আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ পারিষদবর্গের অবস্থা যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে পরবর্তী মুসলমানগণ যে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন—ইহা সহজেই অনুমেয়।

আদি যুগের এইসব যুদ্ধবিগ্রহের কথা ছাড়িয়া দিলেও, পরবর্তীকালে মুসলমানদের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংগ্রামসমূহের সহিত, ভারতের বিরুদ্ধে অথবা অভ্যন্তরে পরিচালিত যুদ্ধগুলির মতই ইসলামধর্ম বা তাহার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের অতি অল্পই সম্পর্ক ছিল। যুদ্ধে জয়লাভ ও নিজের অধিকার সুদৃঢ় করিবার পরই প্রত্যেক শাসনকর্তা, তিনি রাজাই হোন, অথবা সম্রাটই হোন, বিজিত দেশ ও তাহার অধিবাসিগণের অবস্থা অনুযায়ী নিজের সুবিধা ও নিরাপত্তার নীতিতে পৃথক পৃথকভাবে শাসনকার্য পরিচালন করিতেন। তবে ইসলাম যে শাসক এবং শাসিত উভয় জাতির জীবনই প্রভাবিত করিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা হইল এক কথা এবং ভারতস্থ ও তাহার বাহিরের শাসকগণ কেবলমাত্র ইসলামের প্রচার ও পুষ্টির উদ্দেশ্যেই শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন—তাহা হইল সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের মুসলমান

শাসনকর্তাগণ, এমন কি সমস্ত মুসলমান জনসাধারণ আপনাদিগকে এমন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছিলেন যাহাদের আয়তন নব নব সংযোগের সাহায্যে নিত্যবর্ধনশীল। যেসব মুসলমান বিজেতৃরূপে এদেশে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিলেন তাঁহাদের সংখ্যা অ-মুসলমান জনসাধারণের সহিত সংখ্যাগত তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। আজিকার এই ভারতীয় মুসলিম সংহতির বিরাটতর অংশ গঠন করিয়াছেন সেইসব হিন্দুগণ যাঁহারা হয় নিজেরাই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, নয় ধর্মান্তরিত হিন্দুদের সন্তান-সন্ততি।

সামরিক কার্যকলাপের মধ্যেই যদি এতখানি সৌহার্দ্য, সহযোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরতা বিদ্যমান থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে অসামরিক শাসনকার্য পরিচালনে ও জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাপনে তাহা যে আরও বহুল পরিমাণে বিদ্যমান ছিল—এরূপ আশা করা যুক্তিসংগত এবং এই প্রত্যাশা ঐতিহাসিক ঘটনার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

'প্রয়োজনের বশেই তাঁহারা রাজকার্যে হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন। গজনীর মামুদের বাহিনীতে বহু হিন্দু সৈনাদল ছিল এবং তাঁহার হিন্দু-সেনাপতি তিলক তাঁহার মুসলিম সৈন্যাধ্যক্ষ নিয়ালতাগীনের বিদ্রোহ দমন করেন। কুতুবুদ্দীন যখন ভারতে অবস্থান করাই সাব্যস্ত করিলেন, তখন স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে অভিজ্ঞ হিন্দু কর্মচারীদিগকে স্বপদে বহাল রাখা ছাড়া তাঁহার আর গত্যন্তর রহিল না, কারণ এইসব কর্মচারীর সাহায্য ব্যতিরেকে রাজস্ব আদায়, এমন কি সমগ্র শাসনব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবার আশঙ্কা তিনি অনুভব করিলেন। মুসলমানগণ ভারতের বাহির হইতে কারিগর, কেরাণী ও হিসাবরক্ষক সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন নাই। হিন্দু মিস্ত্রিগণই পুরাতন কলা-কৌশলের সহিত নূতনের সমন্বয় সাধন করিয়া তাঁহাদের গৃহনির্মাণ করিত্‌ল, তাঁহাদের মুদ্রা প্রস্তুত করিত হিন্দু স্বর্ণকার, হিসাব রক্ষা করিত হিন্দু কেরাণী। ব্যবহার-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ হিন্দু আইনঘটিত ব্যাপারে রাজাকে পরামর্শ দিতেন, হিন্দু জ্যোতিষগণ সাধারণ করণীয় ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।' ৪৫ 'প্রথম ইব্রাহিম আদিল শাহের শাসনকালের (১৫৩৪-১৫৫৭ খৃষ্টাব্দ) অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে পারসীর পরিবর্তে হিন্দী ভাষায় হিসাব রক্ষা করিবার প্রথা প্রবর্তন। এই কার্যের জন্য যেসব ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, অচিরে তাঁহারা রাজসরকারে প্রভূত প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ইয়ুসুফ আদিল শাহের রাজত্বকালেও হিন্দুগণ তাঁহার রাজস্ব বিভাগে প্রভুত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ পদ অধিকার করেন।' ৪৬

'সুলতান মহম্মদ তুগলকের অধীনেও বহু হিন্দু কর্মচারী কার্য করিতেন। তাঁহার রাজস্ব বিভাগের অন্যতম প্রধান কর্মচারী ছিলেন রতন নামীয় জনৈক হিন্দু। আকবরের রাজস্ব-সচিব রাজা টোডরমল্ল তৎকালীন শাসনব্যবস্থার দূরপ্রসারী পরি-

45. Tarachand: Influence of Islam on Indian Culture, Pp. 136-7.
46. N. N. Law: Promotion of Learning in India during Muhammedan Rule, P. 93.

বর্তন সাধন করেন। সর্বোচ্চ রাজপুরুষদের মধ্যে অন্যতমরূপে তিনি পরিগণিত হইতেন। আওরংজেবের রাজস্ব-সচিবও ছিলেন হিন্দু রঘুনাথ।'৪৭

আজও ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহে হিন্দু ও মুসলমান জাতিধর্ম-নির্বিশেষে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে হায়দরাবাদের মহারাজা স্যার কিষণ প্রসাদ ও মহীশূরের এবং সম্প্রতি জয়পুরেরও স্যার মহম্মদ ইসমাইলের নাম উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

বৃটিশের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টার ফল। দিল্লীর নামে মাত্র সম্রাট বাহাদুর শাহের অধীনে তাহারা একত্র সম্মিলিত হয়। এ বিদ্রোহ যদি সার্থক হইত, তাহার ফলে বাহাদুর শাহের সাম্রাজ্য দৃঢ়তর ভিত্তির উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইত—ঠিক যেমন তাহার ব্যর্থতার ফলে বাহাদুর শাহ ধৃত ও নির্বাসিত হইলেন এবং ভারতে মোগল রাজবংশের পতন ঘটিল।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের অব্যবহিত পরবর্তী কয়েক বৎসর মুসলমান-দিগকে বৃটিশের হস্তে অশেষরূপে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। উলেমাগণ কোন-দিনের জন্য বটিশ শাসন সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাহাদের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক পটভূমির দরুণ বৃটিশ শাসন অতিশয়ভাবে তাহাদের চিত্তে প্রতিক্রিয়া করিয়াছিল। জুলিয়ান হাক্সলীর পূর্বোদ্ধৃত উক্তির পুনরুল্লেখ করিতে গেলে বলিতে হয়, 'বাহির হইতে প্রযুক্ত এইরূপ চাপই বোধহয় জাতি গঠনের পক্ষে এককরূপে সর্ববৃহৎ উপাদান।' ৪৮ এই সমস্ত ঘটনার সমবায়ের ফলেই যদি ভারতীয় জাতির উদ্ভব হইয়া থাকে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। দুইটি স্বতন্ত্র ধর্ম ও তদবলম্বী বিরাট জন-সমষ্টি থাকা সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমান সমান জোরের সহিত এই জাতীয় অস্তিত্বের কথা স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। এমন কি, মুসলমান জনসাধারণের একটা বিরাট অংশকে কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার জন্য যিনি বিখ্যাত—সেই স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ পর্যন্ত তাঁহার প্রথম জীবনে এই ধারণাই পোষণ করিতেন। তাঁহার বর্ণনা অনুযায়ী হিন্দু ও মুসলমান একটি রমণীর দুই চক্ষু; তাহাদের একটিকে আহত করিয়া অপরটিকে অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট মুসলমানগণের লেখা ও বক্তৃতার অংশসমূহ উদ্ধৃত করা এখানে অনাবশ্যক।

ভারতীয় কয়েকজন মুসলমানের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দুই জাতি তত্ত্বের আলোচনার আমি উপসংহার করিতে চাই। সুলতান আহম্মদ খাঁর উক্তি দ্বারা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া দুইজন প্রসিদ্ধ জীবিত মুসলমানের ভাষণে তাহা শেষ করিব। ১৮৮৫ সালে গুরুদাসপুরের এক জনসভায় স্যার সৈয়দ বলেনঃ—

'কোন একটি দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, বহু প্রাচীনকাল হইতে তাহারা একজাতি-রূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! ভারত ছাড়া

---

47. Mehta and Patwardhan, op. cit., P. 19.
48. Julian Huxley : Race in Europe, P. 3.

আর অন্য কোন বাসভূমি তোমাদের কি আছে? মৃত্যুর পর তোমাদের মৃতদেহ দগ্ধ ও সমাহিত হইয়া একই মাটিতে কি মিশিয়া যায় না? তোমরা যে মাটিতে পা ফেলিয়া হাট এবং যাহার উপর বসবাস কর তাহা কি একই মৃত্তিকা নয়? মনে রাখিবে, হিন্দু এবং মুসলমান এই শব্দ দুইটি ধর্মের বিভিন্নতা মাত্র জ্ঞাপন করে; এই পার্থক্য ছাড়া আর সকল দিক দিয়াই এই দেশের অধিবাসী মাত্রই এক জাতি—ধর্মে তিনি হিন্দু হোন, মুসলমান হোন অথবা খৃষ্টান হোন। একই জাতিভুক্ত এই বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহের কর্তব্য দেশের সাধারণ কল্যাণের নিমিত্ত একীভূত ও মিলিত হওয়া।' ৪৯

আর এক ক্ষেত্রে ঐ একই বিষয় সম্বন্ধে লাহোরে তিনি বলেনঃ 'জাতি বলিতে আমি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই বুঝি, ইহা ছাড়া জাতির অন্য কোন অর্থ আমি উপলব্ধি করিতে পারি না। ধর্মবিশ্বাস আমাদের দৃষ্টিগোচর বস্তু নয়, কাজেই তাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আমি আরোপ করি না। আমরা যাহা চোখে দেখিতে পাই তাহা হইতেছে এই যে, আমরা একই দেশের অধিবাসী, একই *শাসন-ব্যবস্থার অধীন, সুখ-সুবিধার একই উৎস হইতে আমরা উপকরণ আহরণ করি, একই দুর্ভিক্ষের দ্বারা পীড়িত হই, একই দুঃখের দহন সমভাবে সহ্য করি। এই যুক্তিতে আমি উভয় সম্প্রদায়কেই হিন্দু নামে আখ্যাত করি, কারণ তাহারা একই দেশ হিন্দুস্থানের অধিবাসী। আইন-পরিষদের সভ্যরূপে এই জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই আমি সাগ্রহে কামনা করিয়াছি।'* (Indian Nation Builders—Sir Syed Ahmed Khan. PP. 41-2). ৪৯

শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ চক্রবর্তী প্রণীত 'Hindus and Musalmans of India' নামক গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে গিয়া স্যার সাফাৎ আহম্মদ খাঁর ন্যায় প্রথিতযশা ঐতিহাসিক ভারতের যুগ যুগ ব্যাপী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেনঃ—

'আমাদের জাতীয় কর্মতৎপরতার প্রতিটি ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যের পরিমাণ সাধারণতঃ আমরা যাহা অনুমান করিয়া থাকি, বাস্তবিকপক্ষে তাহা তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক ছিল। ভারতীয় সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাসে এই উভয় সম্প্রদায় ও তদন্তর্গত শ্রেণীসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা দেখিতে পাওয়া যায়; ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রচিত মহাকাব্য শ্রেণীর গ্রন্থগুলিতে এই জাতীয় সত্তার যে পরিপূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হয়, এশিয়ার কুত্রাপি অন্য কোন জাতির মধ্যে তাহা দৃষ্ট হয় না। এই পারস্পরিক চিন্তা ও ভাব বিনিময়ের ফলে অভিজাতশ্রেণী ও জনসাধারণের রুচি ও সংস্কারগত পরিশুদ্ধি ঘটিয়াছে এবং তাহার প্রভাব আরও গভীরতর প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া সমগ্র জাতীয় সত্তার সংস্কার সাধন করিয়াছে। রাজনৈতিক মতবাদের বিভিন্নতা বিদ্যমান—ইহা অতি সত্য কথা এবং তাহার গুরুত্ব হ্রাস করিতে আমি অনুমাত্র সচেষ্ট নই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের বুদ্ধির বিকাশভঙ্গীতে, চিন্তার চক্রপরিধিতে, জীবনব্যাপী অভ্যাসে ও আচরণে একটা প্রবল সাংস্কৃতিক ঐক্য যে

49. Quoted in "Pakistan Examined"---by Rezaul Karim, P. 117.

গড়িয়া উঠিয়াছে—একথা অনস্বীকার্য। এই একত্ববোধ সহস্র বৎসরব্যাপী সুদীর্ঘ ইতিহাসের সুখ-দুঃখে বিচিত্র শিল্পশালায় শৈত্য ও উত্তাপের পর্যায়ক্রমিক প্রয়োগে গড়িয়া উঠিয়াছে; কাজেই ইহা অক্ষয় ও অবিনশ্বর।' ৫০ স্যার সাফাতের উক্তি আর একবার উদ্ধৃত করিয়া আমি বলিব, 'যে নিকট-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সামাজিক ঘটনা মাত্রকেই রাজনৈতিক ঘটনারূপে দেখিয়া থাকেন এবং জাতীয় দেহের প্রত্যেক ব্যাধি-লক্ষণকেই রাজনৈতিক পীড়ার উপসর্গ বলিয়া মনে করেন, ভ্রম সংশোধনের জন্য তাঁহার কর্তব্য, হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস গভীরতর মনোযোগের সহিত পাঠ করা এবং আমাদের গৌরবময় অতীতে যে সব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতীয় আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা গড়িয়া উঠিয়াছে, নিবিড়তরভাবে তাহাদিগকে উপলব্ধি করা।' ৫১

এ সম্বন্ধে স্যার সুলতান আহম্মদের উক্তিও কম বলশালী নয়ঃ তিনি বলেন, 'পারস্পরিক সখ্য ও সম্প্রীতির যে ঐতিহাসিক ধারা মোগল আমলে উদ্ভূত হইয়া দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বহিয়া আসিতেছে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে জাগ্রত সাম্প্রতিক বিভেদ আজ তাহাকে ব্যর্থ ও ব্যাহত করিতে উদ্যত। হিন্দুস্থানকে খণ্ডিত করিবার অর্থই হইবে, এ দেশের মুসলমান শাসনকালের একমাত্র গঠনমূলক কার্যকে পণ্ড করা—এই সহজ কথাটি আজ আর কেহ উপলব্ধি করেন না। বর্তমান যুগের ভারতীয়গণ তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানের অধিকারী ইহা নিশ্চিত; কিন্তু যে বিশাল প্রচ্ছদপটের উপর আর্য সারাসেনীয় ঐক্যের সুমহান চিত্র অঙ্কিত, তাহার তুলনায় ইঁহাদের আদর্শের আলেখ্য অতিশয় খর্ব ও ক্ষুদ্রায়তন বলিয়া মনে হয়। সুদূর অতীত যুগের ভারতীয় মনীষী ও নেতৃবৃন্দ চাহিয়াছিলেন, উভয় ধর্মের মাঝখানে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে। শাহজাদা দারাসিকো ইহাদিগকে তুলনা করিয়াছিলেন দুই সঙ্গমে সম্মিলিত তটিনীর সহিত, 'মজমা-উল-বাহরেইন'; কবীর ও নানক তাহাদিগকে একত্র মিলিত করিবার উদ্দেশ্যে রাম ও রহিমের নাম এক সূত্রে সংযোজিত করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান শিল্পাচার্যগণ এমন এক সাধারণ শিল্প সৃষ্টির জন্য সমবেতভাবে সাধনা করেন, যাহা একদিকে যেমন হিন্দু ও মুসলমানের অন্তর স্পর্শ করিবে এবং অপরদিকে তেমনি তাহাদের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন পূর্ণ করিবে। ইহার ফলে উদ্ভূত হইল সৌন্দর্য ও আনন্দবোধের এক সাধারণ সূত্র। ইতিহাস স্বহস্তে যে সৌধ গঠন করিয়াছে, বর্তমান যুগের ভারতীয়গণ তাহা ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর। সে ইতিহাসের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া তাহারা আজ তাহার কুৎসা প্রচারে পঞ্চমুখ।

'হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আশা ও আদর্শগত এতগুলি সাধারণ বন্ধন থাকা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য যে আজ বিচূর্ণ হইতে বসিয়াছে ইহা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। আমাদের কর্তব্য ছিল, এই উপকরণগুলির সাহায্যে

50. Atulananda Chakravarty : Hindus and Musalmans of India, PP. XIX—XX.
51. Ibid, PP. XVI.

মিলনের ভিত্তি প্রশস্ততর করিয়া তোলা। আমরা যে শুধু সংগীত ও সাহিত্য, চিত্র ও স্থাপত্যের সংস্কৃতিগত এক সাধারণ ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকারী তাহা নয়, বহু সংগ্রামে সমবেতভাবে অংশগ্রহণ করার ফলে রাজনৈতিক ভাগ্যসূত্রের এক সাধারণ বন্ধনেও আমরা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছি। সমাজ-জীবনেও উভয় সম্প্রদায় সংস্কার ও আচারগত ঐক্যের সম-বন্ধনে আবদ্ধ। এমন কি, বাবরের শাসনকালেও জীবনযাত্রাপ্রণালীর সাধারণ লক্ষণসমূহ এমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল যে, বাবর তাহার নাম দিয়াছিলেন, 'হিন্দুস্থানী প্রথা'; কারণ হিন্দু ও মুসলমান বৈশিষ্ট্যের ইহা এক সহজ সংমিশ্রণ। ইহার পর সৈন্যশিবিরের কথ্য-ভাষারূপে আবির্ভাব হইল উর্দুভাষার। এমন কি, সে যুগের সর্বাপেক্ষা স্পৃহনীয় সামগ্রী যে ধর্ম—তাহা একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। হিন্দু জনসাধারণের ধর্মজীবনে ইসলাম আনয়ন করিল এক নূতন গতি পরিবর্তন ও নব বর্ণবৈচিত্র্য এবং বিনিময়ে সে নিজেও ধারণ করিল ভারতীয় ভাবধারার ছাপ। এই পরিবর্তন তাঁহার উগ্রপন্থী সহধর্মিগণের দৃষ্টি এড়ায় নাই।

'মুসলমানগণ হইয়া পড়িলেন এই দেশের মাটীর স্নেহের দুলাল। কুতুবুদ্দীন যে মুহূর্তে গজনীর সাম্রাজ্য হইতে দিল্লীর মসনদকে বিচ্ছিন্ন করিলেন, সেই মুহূর্ত হইতেই ইহা হওয়া ছাড়া তাঁহার পক্ষে আর গত্যন্তর রহিল না। মুসলমান নরপতি তাঁহার প্রজাসাধারণের কোন একটি অংশকে অপর অংশ হইতে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিবেন না—ইহাই ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ। কোন এক সম্প্রদায়কে মাতার স্নেহে পালন করিয়া, অপর এক সম্প্রদায়ের প্রতি বিমাতার আচরণ করা অকরণীয় কার্যরূপে পরিগণিত হইত। বাবরের আত্মজীবনীর সহিত আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী তুলনামূলকভাবে পাঠ করিলে ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি প্রীতির এই ক্রম-পরিণতিটুকু সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে। সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা একদা অভিযোগ-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "হায়, হিন্দুস্থানে আনন্দের উপকরণ অতি অল্পই!" কিন্তু আকবর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার চক্ষে আর সে আগন্তুকের দৃষ্টি নাই। তাঁহার ইতিহাস-রচয়িতা হিন্দুস্থানের সৌন্দর্যে বিভোর, শুধু তাহাই নয়, মাতৃভূমির প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণের বশে এই সৌন্দর্য সম্ভোগে যে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তাহার জন্য তিনি অনুতপ্ত।'[৫২]

---

52. Sir Sultan Ahmed : A Treaty between India and the United Kingdom, PP. 60—1.

দ্বিতীয় খণ্ড

সাম্প্রদায়িক ত্রিভুজ

ভূমিকা

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, ভারতের সহিত মুসলিম সম্পর্কের সুদীর্ঘ স্থায়িত্বকালের মধ্যে মুসলমান শাসকবর্গ, শিল্পী, ফকির এবং অন্যান্য আরও সকলে হিন্দু সংস্কৃতি যথাসম্ভব আত্মস্থ করিবার জন্য কিরূপ পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছেন। প্রত্যুত্তরে হিন্দুদের পক্ষ হইতেও মুসলিম সংস্কৃতি গ্রহণের যে ব্যগ্রতা জাগিয়া উঠে তাহার পরিমাণও উপেক্ষণীয় নয়। তাহার ফলে উভয় সংস্কৃতি মিলিত ও একীভূত না হইলেও, তাহাদের পারস্পরিক সংস্পর্শ ও সামঞ্জস্যের সাধারণ যোগসূত্রসমূহের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহারই ভিতর হইতে কালক্রমে হিন্দুস্থানী সংস্কৃতির উদ্ভব ও প্রসার সম্ভবপর হইয়াছে। জাতি বলিতে আধুনিক অর্থে যাহা বুঝায়, রাজনীতিক্ষেত্রে ইহার ফলস্বরূপ সেই জাতির সৃষ্টি না হইয়াই পারে না; বৃটিশ শাসনকালে হিন্দু ও মুসলমান যখন দাসত্বের সম-বন্ধনে আবদ্ধ, তখনই তাহার উদ্ভব অপরিহার্য হইয়া উঠিল। মুসলমান গ্রন্থকার-দের রচিত প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ হইতে উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি যে, উভয় সম্প্রদায়ই ভারতের হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসিগণকে একই জাতির অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য করিতেন। অথচ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও তাহার মুখপাত্রগণ সমপরিমাণ জোরের সহিত আজ ঘোষণা করিতেছেন, মুসলমান হিন্দু হইতে এক স্বতন্ত্র জাতি। এরূপ ঘটিবার হেতু কি? এই প্রশ্নের জবাব দিবার পূর্বে কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

মুসলমান বিজেতৃগণের মনোভাব মোটের উপর সহনশীলই ছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে কেহ কেহ যে উগ্র ধর্মান্ধতা প্রদর্শন না করিয়াছেন তাহা নয়; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেই প্রথম যুগ হইতে হিন্দুদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার প্রচেষ্টা যে আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সেইরূপ একটি পুরাতন দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাক। মহম্মদ বীন কাসিমের দ্বারা ব্রাহ্মণাবাদ বিজিত হইলে, তত্রত্য অধিবাসিগণ তাঁহার নিকট পূজা-অর্চনার স্বাধীনতা ভিক্ষা করে। বীন কাসিম ব্যাপারটা ইরাকের শাসনকর্তা হাজাজের গোচর করিলে তিনি নিম্নলিখিতরূপ জবাব প্রেরণ করেনঃ "হিন্দুরা যখন আত্মসমর্পণ করিয়াছে ও খলিফাকে রাজস্ব দিতে অঙ্গীকার করিয়াছে, তখন তাহাদের নিকট হইতে আর কিছু দাবী করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। তাহারা এখন আমাদের রক্ষণাধীন, কাজেই তাহাদের জীবন ও ধনসম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ আমরা করিতে পারি না। উপাসনার জন্য তাহাদিগকে অনুমতি প্রদান করা হইল। ধর্মপালনে কাহারও পক্ষে কোন নিষেধ বা প্রতিবন্ধক থাকিবে না। তাহাদের গৃহে তাহারা যথেচ্ছভাবে বসবাস

করিতে পারিবে।" ১ এই নীতি ধর্মগুরু মহম্মদের প্রচারিত শিক্ষাসম্মত এবং অমুসলমানগণ বিজিত ও জিজিয়া কর দানে স্বীকৃত হইলে এই নীতির অনুশাসন অনুযায়ীই খলিফাগণ তাঁহাদের প্রতি আচরণ করিতেন।

মুসলমান মোল্লা-মৌলবীগণের বিচার-বিবেচনার অপেক্ষা না রাখিয়াই শাসনকর্তাগণ অচিরে স্ব স্ব স্বাধীন কর্মপন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। ফলে ধর্মের অনুশাসন হইতে মুক্ত হইয়া রাষ্ট্র স্বাধীন সত্তারূপে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণভারতের অধীশ্বর আলাউদ্দীন খিলিজি রাষ্ট্র পরিচালন ব্যাপারে উলেমাদের হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। তিনি এই মর্মে এক আইন বিধিবদ্ধ করিয়া যান যে, রাষ্ট্রশাসন-ব্যাপারে সম্রাটের ইচ্ছাই সার্বভৌম, হজরত মহম্মদের ধর্মনীতির সহিত তাহার কোনই সম্পর্ক নাই। দণ্ডদানের রাজকীয় অধিকার তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং অসাধু ও ব্যভিচারী কর্মচারি-গণকে দণ্ডিত করা কাজীর মতে প্রচলিত নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইলেও, রাজকীয় কর্তব্য পালন হইতে তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। কাজীর সম্মুখে রাজনীতির যে ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্যঃ 'বিদ্রোহ দেখা দিলে তাহার ফলে বহু ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে; সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ও জনসাধারণের কল্যাণের জন্য যে পন্থা অবলম্বিত হওয়া কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি, সেইরূপ নির্দেশই দিয়া থাকি। আমার আদেশ যখন উপেক্ষিত, অবহেলিত ও অবমানিত হয়, তখনই শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য কঠোর হইতে আমি বাধ্য হই। আমি জানি না, তাহা নীতিসম্মত অথবা নীতিবিরুদ্ধ। অবস্থা বিবেচনা করিয়া যে ব্যবস্থা রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া মনে করি, তাহা অবলম্বনের জন্যই আমি আদেশ দিয়া থাকি। চরম বিচারের দিনে আমার দশা কি হইবে, তাহা আমার অজ্ঞাত।'২ সহৃদয় স্বৈরাচারী সম্রাটগণের ইহাই চিরন্তন দাবী এবং সেই দাবী এই কথাই প্রমাণ করে যে, বহুবিধ ধর্মবিশ্বাস ও আচার-ব্যবহারসম্পন্ন প্রজাপুঞ্জের শাসকরূপে রাজার করণীয় কর্তব্য ও বিশিষ্ট কোন এক ধর্মের সেবকরূপে তাঁহার পালনীয় কর্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন সামগ্রী।

রাষ্ট্রশাসন-ব্যাপারে বাবরের নির্দেশাবলী ইতিপূর্বে সবিস্তারে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পরবর্তী মোগল সম্রাটগণ এই নীতির অনুসরণ দ্বারা সাম্রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং এই নীতি লঙ্ঘনের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইল, পরিশেষে তাহাই হইল সাম্রাজ্যের পতনের হেতু। হিন্দু মনোভাবের প্রতি বাবরের শ্রদ্ধা বৈদেশিকগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেঃ জনৈক বৈদেশিক বলেন, 'ঈদ উপলক্ষে মনে হয়, গো-কোরবাণির ব্যবস্থা ছিল না; সাধারণত প্রত্যেকেই স্ব স্ব গৃহে ছাগ কোরবাণি দিয়া আনুষ্ঠানিক প্রথা পালন করিত।'৩ এইভাবে উভয় সম্প্রদায়ই যে স্ব স্ব স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখিয়া পরম সৌহার্দ্যের সহিত বন্ধু-

1. Ishwari Prasad: A short History of Muslim Rule in India, P. 46.
2. Ishwari Prasad, Op. cit. P. 126.
3. Ibid: P. 698, quoting Pelsaert, P. 74.

ভাবাপন্ন প্রতিবেশীর মত পাশাপাশি বসবাস করিত—ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

মিঃ এফ. কে, খান দুরাণী এই অবস্থার যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে বিস্তৃত অংশ উদ্ধৃত না করিয়া পারিতেছি নাঃ

'প্রাচীন হিন্দুগণ জাতি ছিলেন না, ছিলেন সংহতি বা গোষ্ঠী।

'মুসলমানদিগের অবস্থা ইহা হইতে আদৌ উন্নততর ছিল না। ইসলাম বাস্তবিক্ পক্ষে তাহার প্রবর্তকের জীবিতকালেই রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া উঠে। ইহার রাজনৈতিক দর্শন সুস্পষ্ট তত্ত্বসম্বলিত। আমি বলিব, ইসলাম নিজেই এক রাজনৈতিক জীবন-বেদ।...........ইসলাম-রাষ্ট্র এমন এক গণতন্ত্র যাহার রক্ষার জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মুসলমান দায়ী—'লা-ইসলাম-ইল্লা বি জমায়েত-হু' ঃ মহামতি ওমর বলেন, সংঘবদ্ধ সমাজ ব্যতিরেকে ইসলামের অস্তিত্ব অসম্ভব। দুর্ভাগ্যক্রমে ইসলাম-রাষ্ট্র দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ওমায়া এবং আব্বাসিগণ ইহার ধ্বংস সাধন করিয়া ইহাকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত করে। ৪

'মুসলমানগণের ভারত-বিজয়ের পূর্বেই ধর্ম হইতে রাজনীতি যে পৃথক বস্তু, এ তথ্য সমগ্র মুসলিম জগতে স্বীকৃত হইয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষ যাহারা জয় করে, তাহারা কোন মুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয় বাহিনীর সৈনিক নয়, এক স্বৈরাচারী সম্রাটের বেতনভুক্ সৈন্যদল মাত্র। ভারতবর্ষে যে রাষ্ট্র গঠিত হইল, তাহাও মুসলমানদিগের জাতীয় রাষ্ট্র নয়, তাহার অর্জন, রক্ষণ ও শোষণকার্য পরিচালিত হইত সেই স্বৈরতন্ত্রী শাসকের ও তাঁহার উপগ্রহ দলের নিজস্ব স্বার্থে। ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য কেবলমাত্র এই অর্থেই যে, রাজমুকুট যে ব্যক্তি মস্তকে ধারণ করে, সে ইসলাম ধর্মাবলম্বী। সুদীর্ঘ ভারতশাসনকালের মধ্যে মুসলমান-দিগের মনে জাতীয় চেতনা কোনদিন জাগরিত হয় নাই, কারণ সাম্রাজ্যিক নীতি ছিল তাহার জাগরণের পরিপন্থী। ৫

'কাজেই হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা-বিবর্জিত হইয়া একই স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের অধীনে পাশাপাশি বাস করিত।......

'ধর্মবিশ্বাস, আচার-ব্যবহার ও সংস্কারের দিক দিয়া বিচার করিলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন যে অসম্ভব, এ যুক্তির পক্ষে বহু কথাই লিখিত হইয়াছে।...... তথাপি উভয় ধর্মমতের মধ্যে এমন একটা কোন জিনিষ রহিয়া গিয়াছে, যাহার দরুণ বহু শতাব্দী ধরিয়া সম্প্রীতির সহিত একত্র বসবাস করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। বৃটিশ শাসনের কল্যাণে তাহারা যে শিক্ষালাভ করিয়াছে, যে দুঃখ বরণ করিয়াছে, তাহাদের চিত্ত হইতে তাহার স্মৃতি যদি নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়া শতাব্দী পূর্বের তাহাদের পূর্বপুরুষগণের ধর্মানুপ্রেরণা পুনরায় তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে একই রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে পরম শান্তিতে এখনও তাহারা একত্র বসবাস করিতে পারে। সেই সামগ্রীটি হইতেছে উভয় ধর্মের অন্তর্নিহিত পারস্পরিক সহনশীলতা।' ৬

4. F. K. Khan Durrani, The meaning of Pakistan, PP. 34—35.
5. Durrani, Op. cit., PP. 35—36.
6. Ibid. PP. 36—7.

ভেদনীতি সকল দেশের, সকল যুগের চিরন্তন সাম্রাজ্যিক কূটকৌশল, বৈদেশিক শাসনের ন্যায্যতা একবার স্বীকার করিয়া লইলে, বিদেশী শাসক-শক্তির পক্ষে ইহার প্রয়োগে আর কোনই বাধা থাকে না। ইংরাজগণ যদি মুনস্টার্ট এল্‌ফিনস্টোনের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া অন্যান্য বৈদেশিক বিজেতৃগণের ঊর্ধ্বে উঠিতে সক্ষম না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দোষী করা চলে না। এলফিনস্টোন বলেন, 'বিভক্ত করিয়া শাসন কর—এই রোমীয় রাজনীতিই হইবে আমাদের মূলমন্ত্র।' তাহারা যখন বলে, ভারতে তাহারা যাহা কিছু করিতেছে, সুমহান আদর্শবাদিতা ও নিছক নিঃস্বার্থ পরোপকার প্রবৃত্তির বশেই তাহার অনুষ্ঠান, তখনই তাহাদের সেই ভাণ হইয়া উঠে দুঃসহ বিরক্তির কারণ। বর্তমান-কালের হিন্দু-মুসলমানগণের যে আপাত-অনৈক্য দেখা যাইতেছে, তাহা বহুলাংশে এই ভেদনীতির ফলেই সৃষ্ট। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ইংরাজগণ যখন সবেমাত্র এ দেশের শাসকরূপে স্থান গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন হইতেই এই নীতির সূত্রপাত এবং বর্তমান যুগেও ভারতসচিব মিঃ আমেরীর সর্বশেষ বিবৃতিতে ও শাসনবিভাগ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণের কণ্ঠে সেই সুরেই অনুরণিত হইতে শোনা যায়। হিন্দু ও মুসলমানগণের এক রাষ্ট্রের নাগরিক ও একই দেশের অধিবাসীরূপে সম্প্রীতির সহিত কালাতিপাত করিবার পথে ইহাই একমাত্র অন্তরায়।

কাজেই ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা নয়, কারণ তাহারা ইচ্ছা করিলে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী এ সমস্যার সমাধান করিয়া লইতে পারে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এতদুভয়ের মধ্যে তৃতীয় পক্ষ এবং প্রবলতম পক্ষরূপে বিদ্যমান। এই দিক দিয়া দেখিলে ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে যে ত্রিভুজ-রূপে বর্ণনা করা হয়, তাহা সবিশেষ অর্থপূর্ণ: এই ত্রিভুজের হিন্দু ও মুসলমান দুই বাহু এবং বৃটিশ সরকার তাহার ভূমি। এই ভূমি যে পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, ঠিক সেই অনুপাতে বর্ধিত করিয়াছে উভয় বাহুর মধ্যে ব্যবধান।

(সাত)

ভেদনীতি ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের প্রাক্কালে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আপনা-দিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল, তাহারা যখন আত্মকলহ ও যুদ্ধবিগ্রহে জর্জর, সেই অশান্তিপূর্ণ সময়ের সুযোগ লইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন সাম্রাজ্য গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছে। তৎকালীন গভর্ণরদের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারের মূলনীতিই ছিল—এই আত্মকলহের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা এবং যাহাতে বৃটিশের বিরুদ্ধে মিলিত না হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা। কোম্পানীর কর্মচারিগণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল—মারাঠা, নিজাম, কর্ণাটকের নবাব ও পরিশেষে হায়দ্রাবাদ এবং টিপু সুলতান যাহাতে একত্র সম্মিলিত

হইতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। ডবলিউ, এম, টরেন্স ম্যালকমের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন, "হিন্দুস্থানের আপন সন্তানগণের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহাকে জয় করা কোনক্রমেই সম্ভব হইত না। প্রথমে নিজামের বিরুদ্ধে আর্কট ও আর্কটের বিরুদ্ধে নিজাম ও তৎপরে মুসলমানের বিরুদ্ধে মারাঠা ও হিন্দুর বিরুদ্ধে আফগান।" ১ মহারাষ্ট্র দরবারে বৃটিশ ষড়যন্ত্র প্রসার লাভ করার জন্য মারাঠাদিগের আত্মকলহই অনেকাংশে দায়ী। 'মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে দুইটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া মারাঠা সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন সংঘটিত হইয়াছে। শিবাজীর পরাক্রম ও প্রতিভার বলে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং রঘুনাথ রাওয়ের অর্বাচীনতা ও চক্রান্তের ফলে তাহার পতন।' ২

গ্রাণ্ট ডাফ্ লিখিতেছেন, "মারাঠাগণ যাহাতে হায়দার অথবা নিজাম আলির সহিত মিলিত হইতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে তাহাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ জাগাইয়া রাখিবার জন্য বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট মিঃ মষ্টিনকে পুনায় প্রেরণ করেন।" ৩ তিনি রাঘোবার পক্ষাবলম্বন করিলেন, কারণ রাঘোবা তাঁহার হস্তের ক্রীড়নক-স্বরূপ। তিনি তাঁহাকে নিজাম ও হায়দার আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় প্ররোচিত করিলেন, অথচ সে যুদ্ধের ফলে মারাঠা সাম্রাজ্য অণুমাত্র উপকৃত হইল না। নানা ফার্ণভিস্ লক্ষ্য করিলেন, রাঘোবা বোম্বাই সরকারের হাতের যন্ত্রে পরিণত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় তিনি যদি আর অধিক দিন পেশোয়ার পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা হইলে মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন। নানা ফার্ণভিস্ ও অন্যান্য মন্ত্রিগণকে তাঁহার প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন দেখিয়া রাঘোবা গুজরাটে পলায়ন করিলেন এবং তথায় গিয়া বোম্বাই কাউন্সিলের সভাপতির নিকট সাহায্য-প্রার্থী হইলেন। তিনিও সানন্দে এই সাহায্য দানে সম্মত হইলেন, কেন না তিনি দেখিলেন, গৃহযুদ্ধের ফলে একদিকে মারাঠা সাম্রাজ্য যেমন শক্তিহীন হইয়া পড়িবে, অপর দিকে তেমনি ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ বিশেষ করিয়া সল্‌সীট ও বেসিন উপদ্বীপ দুইটি ইজারা লইবার পক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিশেষ সুবিধা করিয়া লইতে পারিবে।

"এই নীতির অনুসরণে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্মগত ভিত্তিতে কোন পার্থক্য স্বীকৃত হইত না। একদিকে মুসলমানগণকে যেমন হিন্দু ও মুসল-মানের বিরুদ্ধে নির্বিচারে প্রয়োগ করা হইত, অপর দিকে তেমনি হিন্দুদিগকে মুসলমান এবং হিন্দুর বিরুদ্ধে নির্বিশেষে নিয়োগ করা হইত। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—একের সাহায্যে অপরকে পরাজিত ও পদানত করা এবং সে কার্য সমাধা হইয়া গেলে সাহায্যকারী পক্ষের সর্বনাশ সাধন করা। ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালে রোহিলাদের প্রতি অনুষ্ঠিত আচরণ এই নীতির এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। রোহিলাদের রাজ্য ছিল অযোধ্যার নবাবের রাজ্যের সীমান্তবর্তী। সামন্ততান্ত্রিক শাসনাধীন হইলেও তাহারা স্বাধীনতা ভোগ করিত একটু অধিক

1. W. M. Torrens : Empire in Asia, P. 19.
2. B. D. Basu : Rise of Christian Power in India, P. 209.
3. Grant Duff : History of the Mahrattas, P. 340.

পরিমাণে। ফলে অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে তাহাদের অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নততর। সুইজারল্যাণ্ডবাসিগণের মত রোহিলাগণও ছিল অতিমাত্রায় শান্তি-কামী। তাহাদের রাজ্য অবস্থিত ছিল একদিকে অযোধ্যা রাজ্য ও অপর দিকে মারাঠাগণ কর্তৃক অধুনা অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে। মারাঠাগণ অযোধ্যার ওয়াজিরের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য বিশেষ কতকগুলি সুবিধার বিনিময়ে রোহিলা রাজ্যের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইবার অবাধ অধিকার দাবী করিলে রোহিলাগণ তাহা দিতে অসম্মত হয়। তাহার কারণ রোহিলাগণ ওয়াজিরের সহিত পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল এবং উক্ত চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল ইংরাজের নির্দেশক্রমে ও সাহায্যের আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া। এই অসম্মতির ফলে রোহিলা রাজ্য মারাঠাগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দেয়। মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত হইবামাত্র গভর্ণর জেনারেল রোহিলা রাজ্য অধিকার করিয়া লইবার জন্য ওয়াজিরের সহিত গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। ওয়াজির যে সৈন্যবাহিনী পোষণ করিতেন, তাহার অযোধ্যায় অবস্থানের আসল উদ্দেশ্য ছিল অযোধ্যা রাজ্যকে বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করা; অথচ হেষ্টিংস ওয়াজিরকে বাধ্য করিলেন সেই সৈন্য দলকে সম্পূর্ণরূপে কোম্পানীর কর্মচারিগণের নায়কতায় পরিপোষিত ও পরি-চালিত হইবার সর্তে স্বীকৃত হইতে। ইহার বিনিময়ে ওয়াজির তাহার ব্যয় বাবদ যে পরিমাণ অর্থ দিতে সম্মত হইলেন, তাহা কোম্পানীর রাজস্ব বৃদ্ধি ও অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। এই আয় বৃদ্ধির বিনিময়েই কোম্পানী রোহিলাখণ্ড রাজ্য ওয়াজিরের নিকট বিক্রয় করিতে সম্মত হইলেন। এতদুদ্দেশ্যে সুবেদার ও গভর্ণর জেনারেলের মধ্যে এই মর্মে এক গোপন চুক্তি সম্পাদিত হইল যে, রোহিলা রাজ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবার সমস্ত ব্যয়ভার ওয়াজির বহন করিবেন ও তদুপরি কোম্পানীকে এককালীন চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন; বিনিময়ে কোম্পানী অজুহাত পাইবামাত্র অথবা না পাইলে তাহা সৃষ্টি করিয়া ওয়াজিরের সৈন্যবাহিনীর সহযোগিতায় রোহিলা রাজ্য আক্রমণ করিবেন এবং তাহা জয় করিয়া অযোধ্যার অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিবেন।"৪ অজুহাতের অভাব হইল নাঃ অশেষ-বিধ অজুহাত উপলক্ষ্য করিয়া রোহিলাখণ্ড আক্রান্ত হইল এবং রোহিলাগণ অপূর্ব বীরত্ব সহকারে সংগ্রাম করিয়াও অবশেষে পর্যুদস্ত হইল। "বিজয়-অর্জিত অধিকারের এরূপ অমানুষিক অসদ্ব্যবহার ইতিহাসে আর কখনও হইয়াছে কি না সন্দেহ। "রোহিলারূপে পরিচিত প্রতিটি ব্যক্তি হয় নিহত হইল, নয় পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল।" কিন্তু এই অমানুষিকতাও সন্ধি-সর্তকে অতিক্রম করিয়া অনুষ্ঠিত হয় নাই। কারণ হেষ্টিংসের স্বহস্তলিখিত পত্র হইতে জানা যায় যে, প্রয়োজন হইলে 'রোহিলা জাতিকে পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে'—এরূপ সর্তও চুক্তিপত্রের অঙ্গীভূত ছিল। চুক্তির ভাষা হেষ্টিংসের নিজস্ব।" ৫ টরেন্সের মতে ইহার ফলে হেষ্টিংস চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিবার পারিশ্রমিক স্বরূপ ব্যক্তিগত উপহাররূপে কুড়ি

4. Adapted from W. M. Torrens: Empire in Asia, PP. 100-101.
5. Ibid : P. 102.

হাজার পাউণ্ড প্রাপ্ত হন এবং সরকারী তহবিলে যে অর্থাগম হয়, তাহার পরিমাণও চারি লক্ষ পাউণ্ড।

তাহার পর নবাব ওয়াজিরের পালা আসিতে বিলম্ব হইল না। আরও অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু নবাব তাহা প্রদানের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। 'আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকিল এবং তাহার ফলে লক্ষ্ণৌ-এর রাজকোষ শূন্য না করিয়াই কলিকাতার তহবিল পূর্ণ করিবার ইতিহাসবিদিত কৌশল উদ্ভাবিত হইল। লর্ড মেকলের ভাষায় "এই কৌশল হইল, গভর্ণর জেনারেল ও নবাব ওয়াজির একত্র মিলিত হইয়া তৃতীয় এক পক্ষকে লুণ্ঠন করিবেন এবং সেই লুণ্ঠনের লক্ষ্যরূপে যাঁহাকে নির্বাচিত করা হইল, তিনি এই দস্যুদ্বয়ের একজনের জন্মদাত্রী।"৬ যাঁহাদের উপর দস্যুতা করা হইবে, তাঁহারা হইলেন পরলোকগত ওয়াজিরের মাতা ও বিধবা পত্নী। তাঁহাদের প্রবাদবিদিত লুণ্ঠিত ঐশ্বর্যের পরিমাণ প্রায় ১২,০০,০০০ পাউণ্ডরূপে নিরূপিত হইয়া থাকে।

ভারতীয় রাজন্যবর্গের নিকট বৃটিশ সৈন্য ভাড়া দিবার প্রথা প্রবর্তন করেন হেষ্টিংস। তৎকালে ইহারা 'সাবসিডিয়ারী' সৈন্যবাহিনীরূপে পরিচিত হইত। এই প্রথা প্রবর্তনের ফলে প্রতিটি ভারতীয় রাজার স্বাধীনতা ও আধিপত্য বহুল পরিমাণে খর্ব করিতে হেষ্টিংস সক্ষম হইলেন। হেষ্টিংস স্থির করিলেন, অযোধ্যায় বৃটিশ সৈন্যদল স্থাপন করিতে পারিলে দেশীয় রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িবে ও বস্তুতঃ তাহা ইংরাজের অধীন রাজ্যে পরিণত হইবে। ইতিহাসের পরবর্তী ঘটনা সপ্রমাণ করে—হেষ্টিংসের দস্যুতার অংশীদার অনতিবিলম্বেই বুঝিতে পারিলেন বমাল সহ তিনি আপনাকে হেষ্টিংসের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন।"৭

একদেশীয় রাজ্যকে অপর দেশীয় রাজ্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা এবং পরিশেষে তাহার ধ্বংস সাধন করার যে নীতি বৃটিশ অনুসরণ করিয়া চলিত, তাহার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। এ নীতি যে কেবল ভারতেই অনুসৃত হইয়াছে, তাহা নয়, ইহার প্রয়োগ সর্বত্রই এবং সর্বস্থলেই তাহার প্রভাব সমভাবে ধ্বংসাত্মক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কেবল যে মোগল রাজশক্তিই খর্ব হইল তাহা নয়। মোগল সাম্রাজ্যের খণ্ডিত অঙ্গ হইতে যে সকল স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইল, হয় সেগুলি নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, নয় এরূপ শক্তিহীন হইয়া পড়িল যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইবার পথে আর কোন অন্তরায় রহিল না। অবশ্য কোন কোন দেশীয় রাজ্য কার্যতঃ অথবা নামতঃ স্বাধীন রহিয়া গেল বটে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা আত্মসমর্পণ না করিল, ততক্ষণ তাহাদের উপর চলিতে থাকিল সেই সনাতন নীতিরই প্রয়োগ পরীক্ষা। এইরূপে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই মারাঠা সাম্রাজ্যের পরিপূর্ণ পতন ঘটিল এবং স্থানে স্থানে যে কয়েকজন মারাঠা রাজা তখনও রাজত্ব করিতে থাকিলেন, তাঁহারাও প্রকৃতপক্ষে পরিণত হইলেন

6. Ibid, P. 116.
7. Torrens, op. cit., P. 101.

সামন্ত রাজায়। অযোধ্যা রাজ্য তখনও নামতঃ স্বাধীন থাকিলেও কার্যতঃ এত দুর্বল যে, বৃটিশ আক্রমণ প্রতিহত করিবার সামর্থ্যমাত্র তাহার রহিল না। কয়েক বৎসর পরেই সে আক্রমণ পরিচালিত হইল এবং অযোধ্যা রাজ্য অন্তর্ভুক্ত হইল বৃটিশ অধিকারের। ইতিপূর্বেই টিপু সুলতান নিহত হইয়াছেন ও তাঁহার রাজ্য অধিকৃত হইয়াছে। নিজাম সরকার বৃটিশের মিত্ররাজ্যে পরিণত হওয়ার ফলে সেদিক হইতেও বিপদ ও দুশ্চিন্তার হেতু বিলুপ্ত। শিখগণ কর্তৃক পাঞ্জাবে ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজ্য সংস্থাপন বৃটিশ সরকার সতর্ক ও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছেন। সংকীর্ণ রাজ্যসীমার মধ্যে মোগল সম্রাট নামে মাত্র বিরাজমান।

(আট)

ওয়াহবী আন্দোলন

দেশের রাজনৈতিক শক্তিরূপে মুসলমানগণ তাঁহদের সত্তা হারাইলেও জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হন নাই। অচিরে তাঁহাদের মধ্যে প্রবল ধর্মবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত সংস্কারকামী ব্যক্তির আবির্ভাব হইল। তাঁহারা প্রচার করিতে লাগিলেন, ইসলামের আদর্শ হইতে পতনই মুসলমানদিগের রাজনৈতিক পতনের মূলীভূত কারণ, সুতরাং ইসলামের দ্বারা অসমর্থিত যে সব প্রথা-পদ্ধতি কালক্রমে মুসলমান সমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছে, সে সমস্ত পরিহার করিয়া পুনরায় ইসলামের শিক্ষার অনুশাসন অনুসরণ করাই তাহাদের আশু কর্তব্য। বাংলার ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বাহাদুরপুরের শারিয়তুল্লা প্রাচীন ধর্মসংস্কারগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি প্রায় বিশ বৎসর আরবে বাস করিবার পর ভারতে ফিরিয়া আসেন ও 'ফ্রাইজী' নামে এক ধর্ম সম্প্রদায় গঠন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দাদুখাঁ পিতার স্থলাভিষিক্ত হইয়া বাহাদুরপুরে তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিলেন এবং কেবলমাত্র যে ধর্মান্দোলনই প্রচার করিতে থাকিলেন তাহা নয়, মুসলমান প্রজাদিগকে জমিদারদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার আন্দোলনও পরিচালন করিতে লাগিলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পর রাইবেরিলীর সৈয়দ আহম্মদ কর্তৃক আর একটি আন্দোলন প্রবর্তিত হয়; এই আন্দোলন দেখিতে দেখিতে সমগ্র ভারতে তাহার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলমানগণের ধর্মজীবনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। তাঁহার জন্ম রাইবেরিলীতে। দিল্লীতে শিক্ষালাভ করিয়া, অগাধ পাণ্ডিত্য ও গভীর ধর্মানুরাগের জন্য তিনি সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তৎকালীন বিশিষ্ট উলেমাগণ তাঁহাকে তাঁহাদের নেতারূপে বরণ করিয়া লইলেন এবং তাঁহারই নায়কতায় মদ্যপান ও গণিকাবৃত্তি প্রভৃতি সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহার শিষ্যবর্গকে সুদূর

দক্ষিণে হায়দ্রাবাদ ও বাংলায় প্রেরণ করেন। পাঞ্জাবের মুসলমানগণ শিখদের দ্বারা নিগৃহীত হইতেছিলেন, তাঁহাদের ধর্মস্থান কলুষিত ও ধর্মাচরণ বাধাপ্রাপ্ত হইতেছিল। সৈয়দ আহম্মদ শিখরাজ্যগুলিকে দারুল-হার্ব আখ্যায় আখ্যাত করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেন। মারাঠাগণও রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা মুসলমানগণের ধর্মগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না; পরন্তু ধর্মাচরণের অবাধ অধিকার প্রদান করিয়া, কাজিদিগকে পর্যন্ত বিচারকার্য পরিচালনার অনুমতি দান করিতেন। মুসলমানগণ এই কারণে মারাঠা ও রাজপুত রাজ্যসমূহকে 'দার-উল-হার্ব'রূপে আখ্যাত না করিয়া, 'দার-উল-ইসলাম'রূপে গণ্য করিতেন। সৈয়দ আহম্মদ শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, লোক ও অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁহার শিষ্যবর্গ প্রেরিত হইলেন দেশ-দেশান্তরে। যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহারও কিছু ছিল, তাই সংগৃহীত সৈন্যবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিলেন নিজের হাতে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তুতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন রহিয়াও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন না, কারণ যে শিখ-শক্তি এই অভিযানের লক্ষ্য, তৎপ্রতি তাঁহারা আদৌ সদিচ্ছাসম্পন্ন নহেন। এই প্রস্তুতি সম্বন্ধে সৈয়দ আহম্মদ খাঁ স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেনঃ—

'তখনকার দিনে মুসলমান জনসাধারণকে প্রকাশ্যভাবেই শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার জন্য উত্তেজিত করা হইত। সেই উদ্দেশ্যে সহস্র সহস্র সশস্ত্র মুসলমান সৈনিক ও অপরিমেয় রণসম্ভার সংগৃহীত হইল। কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট এই সংবাদ অবগত হইবামাত্র তাহা গভর্ণমেণ্টের গোচর করিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে সুস্পষ্টভাবেই নির্দেশ দিলেন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিতে। দিল্লীর জনৈক মহাজন জেহাদের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত অর্থ আত্মসাৎ করিলে গভর্ণমেণ্ট তাহা আদায়ের জন্য ডিগ্রী দেন এবং আদায়ীকৃত অর্থ সীমান্তে প্রেরিত হয়।'১ এই প্রসঙ্গে মহম্মদ জাফর সাহেব তাঁহার 'সাওয়ানাৎ আহমদিয়া' নামক গ্রন্থের ১৩৯ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন, 'সরকার, অর্থাৎ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি সৈয়দ সাহেবের বিরোধিতা করিতেন, তাহা হইলে হিন্দুস্থান হইতে কোনরূপ সাহায্যই সৈয়দ সাহেবের নিকট প্রেরণ করা সম্ভব হইত না। শিখ শক্তি খর্ব হোক—বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইহাই তখন সর্বান্তঃকরণে কামনা করিতেন।'২ ফলে সৈয়দ আহম্মদের নায়কতায় এক সৈন্যবাহিনী সিন্ধু ও বোলান গিরিসংকটের ভিতর দিয়া, আফগানিস্থানে গিয়া উপনীত হইল এবং তথা হইতে খাইবার গিরিসংকটের মধ্য দিয়া ১৮২৪ সালে পাঞ্জাব আক্রমণ করিল। বহু জয়-পরাজয়ের পর সৈয়দ আহম্মদ ১৮৩০ সালে পেশওয়ার অধিকার করিলেন। শিখদের মনোনীত শাসন-কর্তা সুলতান মহম্মদ খাঁ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়া স্বপদে অধিষ্ঠিত

1. Translation of an extract from an article of Sir Syed Ahmed Khan published in the Institute Gazette of 8th September, 1871—Quoted by M. Yufail Ahmad in 'Musalmanon Ka Roshan Mustaqbal,' P. 102.
2. Quoted in Tufail Ahmed, op. cit., P. 103.

রহিয়া গেলেন। কাজি নিযুক্ত হইলেন মৌলবী মজহর আলি। এই উপায়ে সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসিগণের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইল। কিন্তু সুলতান মহম্মদ খাঁ ও কাজি মজহর আলির মধ্যে বহুদিন হইতে বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। সুলতান আহম্মদ পেশওয়ার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, সুলতান মহম্মদের নির্দেশক্রমে কাজি মজহর আলি প্রকাশ্য দরবারে আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন। স্থানীয় সর্দার ও সামন্তদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া সৈয়দ সাহেব কর্তৃক নিযুক্ত রাজস্ব আদায়কারিগণেরও নিধন সাধনে তিনি সক্ষম হন। এই সকল ঘটনার ফলে অতিশয় বিচলিত হইয়া সৈয়দ সাহেব ১৮৩০ সালের শেষের দিকে কতিপয় অনুচরসহ সীমান্ত প্রদেশ পরিত্যাগ করেন এবং পরিশেষে ১৮৩১ সালে পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এক যুদ্ধে নিহত হন।

অতঃপর তাঁহার সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইলেও জেহাদী সৈন্যদল সীমান্তবর্তী সাওয়াত উপত্যকার সিত্তানা নামক স্থানে তাহাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় এবং হিন্দুস্থান হইতে প্রেরিত সাহায্য সম্বল করিয়া ধর্মযুদ্ধ পরিচালন করিতে থাকে। স্যার উইলিয়াম হাণ্টার প্রণীত 'ইণ্ডিয়ান মুসলমান' নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, পাঞ্জাব বিজয় সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই সব ঘটনার পশ্চাতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্ররোচনা বিদ্যমান ছিল! 'পাঞ্জাব বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার পূর্ব পর্যন্ত তাহারা তাহাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার অনুষ্ঠিত করে এবং বৃটিশ-অধিকৃত এলাকা হইতে ধর্মোন্মত্ত মুসলমান সদস্য সংগ্রহ করিয়া প্রতি বর্ষে আপনাদের জনসংখ্যা স্ফীত করিয়া তোলে। এই ধর্মোন্মাদ স্বেচ্ছা সৈনিকদল কতকগুলি উপজাতির সমবায়ে গঠিত; আমাদের প্রতি তাহাদের মনোভাব অত্যন্ত অনিশ্চিত; তাহারা কখনও বা আমাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, আবার কখনও বা বিদ্বেষপরায়ণ। শিখরাই ছিল তাহাদের আক্রোশের লক্ষ্যস্থল, এবং তাহাদের সহিত সংগ্রামেই তাহাদের সঞ্চিত সমগ্র বল ও বিদ্বেষ ব্যয়িত হইয়া যাইত। কাজেই বৃটিশ প্রজাগণের এই ধর্মোন্মাদ সৈনিক শ্রেণীতে সংগৃহীত হইবার পথে আমরা কোনরূপ অন্তরায় সৃষ্টি করিতাম না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এক প্রকাণ্ড নীলের কারখানার মালিক জনৈক ইংরাজ ভদ্রলোক আমাকে বলেন, তাঁহার অধীনস্থ প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের অবশ্যকরণীয় কর্তব্য ছিল, আপন আপন পারিশ্রমিকের কিয়দংশ সিত্তানা সৈন্য শিবিরের জন্য সঞ্চিত রাখা। তাহাদের মধ্যে অতিরিক্ত উৎসাহী ও দুঃসাহসিক ব্যক্তিগণ মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য ধর্মোন্মাদ নেতৃবর্গের অধীনে সংগ্রাম পর্যন্ত করিয়া আসিত। হিন্দু কর্মচারীরা যেমন তাহাদের পিতৃ-পিতামহের সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্য মাঝে মাঝে ছুটির দরখাস্ত করিত, মুসলমান কর্মচারিগণের পক্ষে তেমনি ১৮৩০ সাল হইতে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য বৎসরে কয়েক মাস ছুটির জন্য প্রার্থনা করা একরূপ প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।' ৩ স্যার উইলিয়াম হাণ্টার অতঃপর

3. W. W. Hunter: Indian Mussalmans, P. 20, quoted in Tufail Ahmed, Ibid, P. 110.

আরও বলেন, 'পাঞ্জাব আমাদের অধিকারে আসিলে, শিখ-বিরোধী অন্ধ বিক্ষোভ আসিয়া তাহাদের বংশধরগণের উপর আপতিত হইল। সিত্তানা সৈন্যবাহিনীর চক্ষে হিন্দু এবং ইংরাজগণও সমপরিমাণ দুর্বৃত্তরূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিল; সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল, তরবারির সাহায্যে তাহাদিগকেও নির্মূল করিতে হইবে। শিখ সীমান্তে যে বিশৃঙ্খলা আমাদের চক্রান্তে, অন্ততঃপক্ষে ঔদাসীন্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহাই এক্ষণে আমাদের হাতে আসিল অতিশয় তিক্ত ও অভিশপ্ত উত্তরাধিকাররূপে।'৪ তাহাদের অনুবর্তিগণ বাংলায় রাজসাহী, বিহারে পাটনা, শিখ সীমান্ত প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজদ্রোহ প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। 'ধর্মোন্মাদ মুসলমানগণ সীমান্তবর্তী উপজাতিসমূহকে বৃটিশ রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে সর্বক্ষণের জন্য বিদ্রোহে প্ররোচিত করিয়া রাখিত। সে সম্পর্কে একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিতে গেলে এক বহু-বিস্তৃত ইতিহাস হইয়া পড়িবে। সীমান্তের বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য ১৮৫০ হইতে ১৮৫৭ সালের মধ্যে ত্রিশ হাজার স্থায়ী সৈন্য-সম্বলিত ষোলটি স্বতন্ত্র অভিযান প্রেরণ করিতে আমরা বাধ্য হই এবং ১৮৫৭ হইতে ১৮৬৩ সালের মধ্যে প্রেরিত অভিযানের সংখ্যা বাড়িয়া কুড়িতে গিয়া পেঁছায়; এই অভিযানসমূহে নিযুক্ত স্থায়ী সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ষাট হাজার, এতদ্ব্যতীত বহু অস্থায়ী সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী ইহাতে অংশ গ্রহণ করে।' ৫

মুজাহিদগণের কীর্তিকলাপের আর বিস্তৃততর বিবরণ প্রদান না করিয়া এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সৈয়দ আহম্মদের শিষ্যবর্গ জেহাদী সৈন্য-দলের উদ্দেশ্যে সাহায্য প্রেরণ যথারীতি করিয়াই চলিলেন। পাটনার অধিবাসী ইলায়াত আলি ও এনায়াত আলি নামক দুই ভ্রাতা তৎকালীন প্রধান শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতমরূপে পরিগণিত ছিলেন। পাঞ্জাব বিজয়ের পর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় মুজাহিদদিগকে হিন্দুস্থানে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করেন; ফলে ইলায়াত আলিও অনুচরগণসহ পাটনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি অন্ততঃ কয়েক বৎসরের জন্য সীমান্তে ফিরিয়া যাইবেন না—এই মর্মে এক স্বীকৃতিপত্র লিখিয়া দিতে বাধ্য হন। সর্তের সময় ফুরাইয়া গেলে তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাদের যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া হিজরতের উদ্দেশ্যে সিত্তানা যাত্রা করিলেন এবং তথায় গিয়া হিজরত আন্দোলন প্রবর্তন করিলেন। দীর্ঘকাল স্থায়ী এই আন্দোলন ১৮৫৭ সালের বিপ্লব হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া পুষ্টতর হয়। ১৮৬৪ সালে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সীমান্ত অঞ্চলে অগ্রগমনের নীতি গ্রহণ করিলে ভারতের সহিত সীমান্তের অধিবাসিগণের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৮৬৪ হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে পাঁচটি রাজ-দ্রোহের মামলা দায়ের হয়; এই মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পাটনার আলি পরিবারের কয়েকজন লোক ও তাঁহাদের অনুবর্তিগণ ছিলেন অন্যতম আসামী। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁহারা তাঁহাদের সীমান্তবর্তী আত্মীয়গণের সহিত এখনও যোগাযোগ রক্ষা করিতেছেন ও তাঁহাদের নিকট অর্থসাহায্য প্রেরণ

4. Ibid., PP. 21-2, quoted Do.
5. Hunter: P. 24, quoted in Tufail Ahmed, Op. Cit.

করিতেছেন। আসামীগণের মধ্যে অনেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং পরে সে দণ্ড মকুব করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড প্রদত্ত হয়। এ ক্ষেত্রে বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য ব্যাপার হইতেছে এই যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৮২৪ সাল হইতে সীমান্তের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ও সংগৃহীত অর্থ যথাস্থানে প্রেরণ করিয়া প্রত্যক্ষ প্ররোচনা দানের যে অপরাধ করিয়া আসিয়াছেন, এইসব দণ্ডিত ব্যক্তিগণ তদতিরিক্ত আর কিছুই করেন নাই। সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভি কর্তৃক প্রবর্তিত ও তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় শিষ্য ও অনুচরগণ দ্বারা পরিচালিত এই আন্দোলনই ওয়াহবী আন্দোলন নামে আখ্যাত। ওয়াহবীগণ সামাজিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় সংস্কারের শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জেহাদী নীতিও যথারীতি প্রচার করিতেন। ভারতবর্ষ খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ইংরাজগণের অধিকারে আসায় তাহা দার-উল-হার্বে রূপান্তরিত হইল; ফলে তাহার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা হইয়া দাঁড়াইল বাধ্যতামূলক। 'এই ধর্ম সম্প্রদায়ের সমগ্র সাহিত্যে এই বাধ্যতাবোধ উন্নততর মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্যরূপে কীর্তিত।'৬ জেহাদ যদি সম্ভবপর না হয়, হিজরত তাহার অনুকল্পরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

ওয়াহবী আন্দোলন দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে দ্বিবিধ কর্মপন্থা অনুসরণ করিতে বাধ্য হইতে হইল। একদিকে বিদ্রোহী দেশীয় রাজ্যসমূহের বিচারের ফলে ওয়াহবী আন্দোলন বিশৃঙ্খল ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, অপর দিকে জেহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া সংগ্রহ করিয়া দেশময় তাহা প্রচার করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। [illegible]র উইলিয়াম হাণ্টার বলেন, 'দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ আমাদের স্বপক্ষে ন[illegible] — আমাদের ভারতীয় অবস্থানের ইহা এক অতিশয় বেদনাদায়ক অথচ বিস্ময়ক[illegible]পার।......এই কারণেই বাধ্যতামূলক কার্যক্রম হইতে বিরামহীন বৈরিতার বিদ[illegible]হণ বড় কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইবে না।'৭

এই সমস্ত ঘটনার একমাত্র তাৎপর্য হইতেছে, বৃটিশ 'ভেদনীতি'র সার্থক প্রয়োগ। শিখগণ যতদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারের পথে কণ্টকস্বরূপ ছিলেন, মুসলমানগণকে ততদিন তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায় প্রশ্রয় ও প্ররোচনা দান করা হইয়াছে। যে মুহূর্তে শিখশক্তি পরাজিত ও পাঞ্জাব বিজিত হইল, তখন হইতেই জেহাদিগণ বিদ্রোহীরূপে ঘোষিত হইল। বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অপরাধে তাহারা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে থাকিল এবং পরিশেষে তাহাদের সমগ্র প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা হইল।

---

6. Ibid., PP. 64-5.
7. Hunter, Op. Cit., P. 144.

(নয়)

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর প্রথম জীবন

যে সমস্ত কারণে ১৮৫৭ সালের বিপ্লব সংঘটিত হয়, সেগুলি সক্রিয় ও পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল বহুদিন পূর্ব হইতে। তাহার কারণ বিশ্লেষণ অথবা ধারা অনুসরণ করিবার প্রচেষ্টা এ স্থলে অপ্রয়োজনীয়। তবে একথা নিশ্চিত যে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায় এই বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করে ও দিল্লীর সম্রাটের পতাকাতলে আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বৃটিশের মনোভাব মুসলমানদের বিরুদ্ধেই সমধিক শত্রুভাবাপন্ন ছিল; কারণ তাহাদের নিকট হইতেই দেশের বৃহত্তর অংশ তাহারা অধিকার করে। ১৮৪৮ সালে লর্ড এলেনবরা লেখেন, 'আমরা যখন নিশ্চিতরূপে জানি যে, এক-দশমাংশ লোক আমাদের প্রতি বৈরী-ভাবাপন্ন, তখন অবশিষ্ট বিশ্বাসভাজন নয়-দশমাংশ লোকের সহৃদয় সমর্থন লাভ না করা আমার নিকট অত্যন্ত অবিবেচনার কার্য বলিয়া মনে হয়। এই সম্প্রদায়টি (মুসলমান) যে আমাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বৈরীভাব পোষণ করে—এ বিশ্বাস আমি কোনরূপেই বর্জন করিতে পারি না। সেরূপ ক্ষেত্রে হিন্দুদের তোষণ করার নীতিই গ্রহণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।'১ কিন্তু সে নীতি যে সার্থক হয় নাই তাহার প্রমাণ, মুসলমানগণের মত হিন্দুরাও পূর্ণোদ্যমে ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে দেখা যাইবে যে, এই অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও শাসক সম্প্রদায় তাঁহাদের অনুসৃত নীতির প্রতি বিশ্বাস হারান নাই:

'লর্ড এলেনবরা কর্তৃক লড ক্যানিং-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ছাড়াও কলিকাতার ইউরোপীয় অধিবাসিগণ লর্ড ক্যানিং-এর অপসারণ দাবী করিয়া ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন প্রেরণ করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, সিপাহী বিদ্রোহের পর কলিকাতাস্থ ইউরোপীয়গণ কর্তৃক পরিচালিত মুশ্লিম বিরোধী আন্দোলন তিনি সমর্থন করেন না।' আবেদন যে গৃহীত ও ফলপ্রসূ হয়, সে সম্পর্কে স্যার উইলিয়াম হান্টার লিখিয়া যান, 'বিদ্রোহের পর মুসলমানগণ ইংরাজদের শত্রুরূপে পরিগণিত হইলেন।' প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবসম্পন্ন বহু পরিবার নির্যাতনের রথচক্রে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। সরকারী সেরেস্তার সমস্ত বিভাগে মুসলমান দলনের সুচিন্তিত নীতি অনুসৃত হইতে লাগিল। মুসলমান-গণ যে কেবলমাত্র বেসামরিক বিভাগেই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহা নয়, সামরিক বিভাগের সহিতও তাঁহাদের সম্পর্ক ছিল অতিশয় ঘনিষ্ঠ। বেসামরিক বিভাগ হইতে তাঁহারা অপসারিত হইলেন দুইটি কারণের সংযোগের ফলে। প্রথমতঃ বৃটিশ নীতিই ছিল স্পষ্টতঃ মুসলমানবিরোধী। তদুপরি মুসলমানদের মনোভাব সে নীতিকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিল: মুসলমানগণ তাঁহাদের সদ্যলব্ধ

---

1. Quoted by Atulananda Chakravarty in 'Call it Politics?'. P. 35.

শোচনীয় অভিজ্ঞতার পর বহির্জগৎ হইতে বিমুখ হইয়া আপনাদের শিবিরাভ্যন্তরে আত্মগোপন করিলেন; ফলে-ইংরাজি শিক্ষার সুযোগ লাভ হইতে বঞ্চিত হওয়ার দরুণ সরকারী চাকুরীতে উচ্চপদ অধিকার করা তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল।

১৮৭০ সালে, বিশেষ করিয়া স্যার উইলিয়াম হাণ্টারের উল্লিখিত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার পর সরকারী নীতিতে প্রথম পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি তাঁহার পুস্তকের পরিসমাপ্তিতে লেখেনঃ

'পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি হইতে যে দুইটি ঘটনা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় তাহা হইতেছে, সীমান্তে বিদ্রোহী শিবিরের বিদ্যমানতা ও সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে নিরন্তর ষড়যন্ত্রের সক্রিয়তা। সশস্ত্র বিশ্বাসঘাতকদের সহিত ইংরাজ সরকার কোনরূপ আপোষ-আলোচনা করিতে প্রস্তুত নহেন। যাহারা তরবারির সাহায্য গ্রহণ করে, তরবারির সাহায্যেই তাহাদের সংহার সাধন করিতে হইবে। ......কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করিতে হইবে সত্য, কিন্তু দেখিতে হইবে অসন্তোষের প্রকৃত কারণ যেন কোথাও রহিয়া না যায়। ....বৃটিশ শাসনের অবিচার সম্বন্ধে যে ধারণা মুসলমানদের মনে দীর্ঘদিন ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা দূরীভূত করিয়াই সে কার্য করা সম্ভবপর।' ২

তাহার পর তিনি সবিস্তারে বিবৃত করিতে বসিলেন, কেমন করিয়া বৃটিশ শাসনাধীনে মুসলমানগণ, বিশেষ করিয়া বাংলার মুসলমান কিরূপে নিষ্ঠুর-ভাবে নির্যাতিত হইয়াছে, তাহাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অপহৃত হইয়াছে, তাহারা নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হইয়াছে, সরকারী সাহায্যের অভাবে তাহাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে এবং শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দানসমূহের অপচয় ও অপব্যবহার ঘটিয়াছে—তাহারই অতীত কাহিনী। তিনি তাহাদের প্রতি সুবিচার প্রত্যাশা করিয়াছেন এবং তাহাদের উপযোগী শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন দাবী করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন, 'পরিশেষে মুসলমান যুবকদিগকে আমাদের পরিকল্পিত শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। তাহাদের ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া তাহার অনুশাসন অনুযায়ীই শিক্ষাপদ্ধতি পরিচালন করিতে হইবে; তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ধর্মভাব যাহাতে কম আন্তরিকতাপূর্ণ হয়—অন্ততঃপক্ষে অত্যুগ্র হইয়া না উঠে। তাহা হইলেই উদীয়মান মুসলমান তরুণগণ হিন্দুদের অনুসৃত পথ অবলম্বন করিতে প্রলুব্ধ হইবে না এবং তাহার ফলে পৃথিবীর উগ্রতম ধর্মোন্মাদ এক জাতি বর্তমানকালের হিন্দুদের মতই সহজ সহনশীলতায় অনতিবিলম্বে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে।'৩

সরকারী নীতির আসন্ন পরিবর্তনের ইহাই পূর্বাভাস। আলিগড় শিক্ষাপ্রণালীর পরিকল্পনা এই নীতি হইতেই উদ্ভূত। আলিগড় কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষগণ এই নীতির উৎস হইতেই অনুপ্রেরণা আহরণ করেন এবং শিক্ষায়তনও তাহার পরিপূর্ণ সুযোগ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

2. W. W. Hunter, Indian Musalmans, P. 147.
3. Ibid., P. 214.

১৮৫৭ সালের পূর্ববর্তী যুগের বৃটিশ বাহিনী ছিল এক সার্বজনীন সংঘ—হিন্দু ও মুসলমান, শিখ ও পুরবিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন সংহতি ও সম্প্রদায়ের সমবায়ে তাহা গঠিত। কিন্তু ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সকল সম্প্রদায়ের সংঘবদ্ধ চেষ্টার ভিতর জাতীয়তাবোধের যে প্রথম উন্মেষ দেখা দেয়, তাহা শাসকবর্গের দৃষ্টি অবারিত করিয়া দিল। ফলে তখন হইতে যে নীতি অনুসৃত হইতে থাকিল, তাহার মূল লক্ষ্য হইল, এই জাতীয় ঐক্যবন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা। এই সম্পর্কে স্যার জন লরেন্স লিখিয়াছেন, 'সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ববর্তী যুগের সৈন্যবাহিনী গঠনের মধ্যে স্পষ্টতম ও আমাদের স্বার্থের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক ত্রুটি ছিল বঙ্গীয় বাহিনীর মধ্যে একত্ব ও সম-ভ্রাতৃত্ববোধ। কাজেই বিপরীত পাল্লায় ইউরোপীয় ও দেশীয় সংহতিসমূহকে স্থাপন করিয়া, সমপরিমাণ প্রতিকূলতার দ্বারা ভারসাম্য সংস্থাপন করিতে হইবে।' ৪

ইহার ফলে সৈন্যবাহিনী জাতি, উপজাতি ও ধর্মগত বিভিন্নতার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হইল এবং দলগুলিকে এরূপভাবে সংস্থাপন করা হইল, যাহাতে প্রত্যেকটি দল তাহার সাম্প্রদায়িক ও উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া একে অপরের প্রভাব প্রতিহত করিতে এবং তদ্দ্বারা ভারসাম্য রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। বর্তমান কালে যাহাকে বিহার ও যুক্তপ্রদেশ বলা হয়, সেই সব অঞ্চলের অধিবাসিগণকে লইয়াই তৎকালীন বাংলার বাহিনী গঠিত হইয়াছিল। যেহেতু ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে এই বঙ্গীয় বাহিনীই প্রধান অংশ গ্রহণ করে এবং যেহেতু পাঞ্জাব সেই দুর্দিনে বৃটিশের রক্ষার জন্য অগ্রসর হয়, সেই কারণে সৈন্যবাহিনীর গঠন হইতে পূর্বোক্ত উপাদান দ্রুত অপসারিত করিয়া শেষোক্ত উপাদানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। মিঃ চৌধুরীর লেখা মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া ডাঃ আম্বেদকর ভারতীয় বাহিনীতে ভারতের বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের সংখ্যানুপাতিক যে হিসাব দেখাইয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইলঃ

সাল	উঃ-পূঃ ভারত, পাঞ্জাব, উঃ-পঃ সীমান্ত-প্রদেশ এবং কাশ্মীর	নেপাল, গাড়োয়াল কুমায়ুন	উঃ-পঃ ভারত যুক্তপ্রদেশ, বিহার	দঃ ভারত	ব্রহ্ম
১৮৫৬	দশেরও কম	নগণ্য	৯০এর কম নয়	—	শূন্য
১৮৫৮	৪৭	৬	৪৭	—	—
১৮৮৩	৪৮	১৭	৩৫	—	—
১৮৯৩	৫৩	২৪	২৩	—	—
১৯০৫	৪৭	১৫	২২	১৬	—
১৯১৯	৪৬	১৪·৮	২৫·৫	১·২	১·৭
১৯৩০	৫৮·৫	২২	১১	৫·৫	৩

এখন আমরা শুনিতে পাই, ভারতে কতকগুলি জাতি আছে, যাহারা সামরিক এবং কতকগুলি নাকি বেসামরিক। উত্তর-পশ্চিম ভারতের জাতি ও সম্প্রদায়-

4. Quoted by Mehta and Patwardhan in the 'Communal Triangle', P. 54.

সমূহ সামরিক শ্রেণীভুক্ত এবং বিহার ও যুক্তপ্রদেশের অধিবাসিগণ বেসামরিক-রূপে গণ্য। এই যুক্তি দেখাইবার সময় ভুলিয়া যাওয়া হয় যে, শেষোক্ত প্রদেশ-দ্বয়ের অধিবাসিগণকে লইয়া গঠিত সৈন্যবাহিনীই একদা বৃটিশের স্বার্থে পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ জয় করে এবং তাহাদিগকে সৈন্যবাহিনী হইতে অপসারিত করা হয় ১৮৫৮ সালে গৃহীত নীতির অনুসরণক্রমেই। ১৮৫৭ সালে গৃহীত নীতির আশু ফল হইল, বিহার ও যুক্তপ্রদেশকে সৈন্যবাহিনী হইতে বহুলাংশে বহিষ্কৃত করা এবং তজ্জনিত শূন্যস্থান শিখ, গুর্খা ও গাড়োয়ালীদের দ্বারা পূর্ণ করা।

১৮৫৭ সালে স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ বিদ্রোহীদের হস্তে স্বয়ং নির্যাতিত হন ও বৃটিশকে তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। মুসলমানগণের সমূহ ক্ষতি সাধনের দৃশ্য দেখিয়া তিনি বিচলিত হন। তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে, মুসলমানগণ ইংরাজী শিক্ষার অভাবের দরুণ সরকারী চাকুরী লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। তিনি ছিলেন হিন্দু ও মুসলমানের একজাতিত্বে বিশ্বাসবান জাতীয়তাবাদী; উভয় সম্প্রদায়ই হিন্দুস্থানের অধিবাসী বলিয়া এই মিলিত জাতিকে তিনি হিন্দু জাতিরূপে অভিহিত করিতেন। এই কারণে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাঁহাকে জাতীয়তাবাদী নেতারূপে শ্রদ্ধা করিত এবং তাঁহারও প্রথম জীবনের লেখা ও বক্তৃতার মধ্যে জাতীয় ভাবোদ্দীপনাই প্রকাশ পাইত সমধিক পরিমাণে। কিন্তু মুসলমানদের উন্নতি বিধান ও তাঁহাদের শিক্ষালাভের সুযোগ দান সম্বন্ধে তাঁহার সচেতনতা ছিল অতিশয় প্রখর। তাঁহার কর্মজীবনে চাকুরী-ব্যপদেশে তিনি যেখানে যেখানে বদলি হইয়াছেন—সেই সকল স্থানেই তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে কতকগুলির অস্তিত্ব আজিও বিদ্যমান। তিনি আরও বিশ্বাস করিতেন যে, বৃটিশ শাসন এদেশবাসিগণের পক্ষে কল্যাণকর; ইহাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি যে না আছে এমন নয়, তবে সেগুলির প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে ও তাহাদের সংশোধন ও সংস্কারের জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। এ সম্বন্ধে অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সহিত তিনি একমত, এমনকি নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা যাঁহারা, তাঁহাদেরও রাজনীতিক আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা ইহা হইতে ভিন্ন ছিল না। সরকারী চাকুরী, সামাজিক মেলামেশা এবং রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অধিকারের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ও ভারতীয়গণের মধ্যে জাতি বা বর্ণগত কোনরূপ বৈষম্য বিদ্যমান থাকা উচিত নয়—ইহাই ছিল তাঁহার রাজনৈতিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসবলেই বড়লাটের মন্ত্রী-পরিষদের সদস্যরূপে 'ইলবার্ট বিল' তিনি সমর্থন করেন এবং আগ্রার দরবারে ইউরোপীয়গণের বসিবার আসন এক উচ্চ মঞ্চের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ভারতীয় ও ইউরোপীয়গণের জন্য নির্দিষ্ট আসনের মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়, তাহার প্রতিবাদে এই নীতির অনুসরণক্রমেই তিনি দরবারক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া আসেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-সম্মেলনে হিন্দু, মুসলমান বা ইউরোপীয় নির্বিশেষে সকলেরই সদস্য হইবার ও প্রবন্ধ পাঠ করিবার অধিকার ছিল। তিনি 'তাহজিবুল আখলাখ' লিখিয়া যান :

'শাসিত জাতি যতক্ষণ শাসক জাতির সহিত সমানাধিকার প্রাপ্ত না হয়, দেশীয় শাসন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার উন্নতি অসম্ভব। হিন্দু ও মুসলমানগণ যতক্ষণ কেরাণী বা অনুরূপ কোন নিম্নপদস্থ কর্মচারী মাত্র, ততক্ষণ অন্য কোন জাতি তাহাদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে পারে না। শুধু তাহাই নয়, যে গভর্ণমেণ্ট তাহার প্রজাসাধারণের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠিত, সে নিজেও সাধারণের সম্মান আকর্ষণে সমর্থ হয় না।.. আমার স্বদেশবাসিগণ যখন সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে শাসক জাতির সহিত সমান পদমর্যাদার অধিকারী হইবেন, সম্মান লাভ সম্ভবপর হইবে কেবলমাত্র তখনই। সকল দেশের সব গভর্ণমেণ্টই সরল বিশ্বাস, সহৃদয়তা ও সুবিচারের সহিত জনসাধারণকে এই অধিকার প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতীয়গণের সে অধিকার লাভের পথ বহু বাধা ও বিঘ্নসংকুল। তথাপি ধৈর্য ও দৃঢ়পণ লইয়া আমাদিগকে কর্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, কোনরূপ বিপদ্‌পাতের আশংকাতেই বিচলিত হইলে চলিবে না।' ৫

১৮৫৩ সালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিল যখন পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত, স্যার সৈয়দ আহম্মদ তখন প্রস্তাব করেন, যেহেতু বহু ধর্ম ও আচারব্যবহারসম্পন্ন বহু জাতি এখানে বিদ্যমান, অতএব বোর্ডের কয়েকটি আসন মনোনীত সদস্যদিগের দ্বারা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন; তদনুযায়ী স্থির হয়, মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হইবে। যাহারা বিশেষ কোন শ্রেণী স্বার্থের প্রতিনিধি, অথচ নির্বাচিত হইবার সুযোগ লাভে সমর্থ নয়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে অংশ গ্রহণে তাহাদের যে বাধা বিলে বিদ্যমান ছিল—এই ব্যবস্থার দ্বারা তাহা দূরীকৃত হইল। এস্থানে ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আসন সংরক্ষিত রাখা বা স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করার দাবী তিনি উপস্থাপিত করেন নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে, হিন্দু-মুসলমানের এক-জাতিত্বে যিনি বিশ্বাসবান—এরূপ দাবী উত্থাপন করা যে তাঁহার পক্ষে সম্ভবই ছিল না। তাঁহার রচনার নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে সে কথা সপ্রমাণ হইবেঃ—

'জাতি বলিতে এক দেশের অধিবাসিগণকে বোঝায়। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, হিন্দু ও মুসলমান দুইটি স্বতন্ত্র ধর্মবোধক শব্দ। ইহা ছাড়া অন্য যে কোন অর্থে এই দেশবাসী হিন্দু, মুসলমান—এমনকি, খৃষ্টান পর্যন্ত একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় যখন একই জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকারের উপাদান মাত্র, তখন সমষ্টিগতভাবে সমগ্র জাতির পক্ষে যাহা কল্যাণকর, ব্যষ্টি হিসাবে প্রতিটি শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের পক্ষেও তাহা শুভজনক হইতে বাধ্য।.........ধর্মগত পার্থক্যের ভিত্তিতে একই দেশের অধিবাসিগণকে একাধিক জাতিতে বিভক্ত করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে।' ৬

5. Translation of quotation given by M. Tufail Ahamad in 'Musalmanon Ka Roshan Mustaqbal', Pp. 281-2.
6. Tufail Ahamad : 'Musalmanon Ka Roshan Mustaqbal', P. 283, quoted from Majmua-i-Lectures Sir Syed Ahamad, P. 167,

ক্ষেত্রান্তরে তিনি বলেন, 'আর্যগণ যে অর্থে হিন্দু নামে পরিচিত, সেই অর্থে মুসলমানগণও হিন্দু; কেননা তাঁহারাও হিন্দুস্থানের অধিবাসী।'৭

পাঞ্জাবের হিন্দুগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন, 'হিন্দু শব্দটি আপনারা যে অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমার বিবেচনায় তাহা সঠিক অর্থ নয়; কারণ হিন্দু শব্দটির অর্থ ধর্মজ্ঞাপক নয়। পক্ষান্তরে ভারতের প্রত্যেকটি অধিবাসী আপনাকে হিন্দু আখ্যায় অভিহিত করিবার অধিকারী। আমাকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতে আপনারা সম্মত নহেন দেখিয়া আমি দুঃখিত; কারণ আমিও হিন্দুস্থানের অধিবাসী।' ৮

এই কারণে মুসলমানদের মত হিন্দুরাও যে তাঁহাকে আপনাদের নেতারূপে বরণ করিবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। সিভিল সার্ভিসের যুগপৎ পরীক্ষা ব্যাপারে এক সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে আমন্ত্রণ করিয়া স্বয়ং সেই সভায় তিনি যে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, এই দিক হইতে দেখিলে তাহাও আদৌ বিস্ময়কর বলিয়া বিবেচিত হইবে না। জাতীয় আন্দোলনের অগ্রদূতরূপে বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে তিনি যে শ্রদ্ধা পোষণ করিবেন, তাহাতেই বা বিচিত্র কি!

মিঃ এ, ও, হিউম্ নামক ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জনৈক ইউরোপীয় সদস্য কর্তৃক ১৮৮৫ সালে যে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়, তদ্দ্বারা প্রবর্তিত জাতীয় আন্দোলন হইতে দূরে থাকিবার জন্য মাত্র কয়েক বৎসর পরই তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিত্ব ও মতবাদসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে পরামর্শ দেওয়া যে কিরূপে সম্ভবপর হইল, তাহা এক দুর্বোধ্য ও কৌতুকাবহ সমস্যা। আলিগড় এম, এ, ও, কলেজের ইউরোপীয় অধ্যক্ষগণ যে অসীম আধিপত্যের অধিকারী হ[illegible] তাহার মধ্যেই এই সমস্যার সমাধানের সন্ধান মিলিবেঃ পরবর্তী ১৫ হইতে ২০ বৎসরের মুসলমান রাজনীতির ইতিহাস এই দুরভিসন্ধিপরায়ণ অধ্যক্ষগণেরই কর্মতৎপরতার ইতিহাস; এই সময়ের ভিতর হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে যে ব্যবধান রচনা করিতে তাঁহারা সক্ষম হন, মাঝে মাঝে অল্পবিস্তর ব্যাহত হওয়া সত্ত্বেও তাহাই তদবধি দিনে দিনে বিস্তৃততর হইয়া চলিয়াছে।

---

7. Ibid, P. 283, quoted from Sir Syed Ke Akhri Mozamin, P. 55.
8. Ibid, P. 283, quoted from Safarnama Punjab—Sir Syed Ahamad, P. 139.

(দশ)

আলিগড় কলেজের বৃটিশ অধ্যক্ষগণ ও আলিগড় রাজনীতি

মুসলমানদের ইংরাজি শিক্ষা সম্বন্ধে স্যার সৈয়দ আহম্মদের সাগ্রহ সচেতনতার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে ১৮৭৫ সালে তিনি যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, কালক্রমে তাহাই এ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল কলেজে রূপান্তরিত হইয়া পরিশেষে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণতি লাভ করে। মিঃ বেক্ নামক জনৈক ব্যক্তি ১৮৮৩ সালে ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৯ সালে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহার আগমন ঠিক সময়োচিতই হইয়াছিল। যে ইংরাজী শিক্ষা হিন্দুদের মধ্যে প্রসার লাভ করিতেছিল, তাহা বাহন হইয়া আসিয়াছিল স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক আদর্শের। ঠিক এই সময়ে সে আদর্শ স্থানে স্থানে ভাষায় অভিব্যক্তি লাভ করিতেছে। এদিকে জাতীয়তাবাদও দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। বৃটিশ জাতি উপলব্ধি করিল, এই ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবোধকে প্রতিহত করিতে হইলে বিরাগভাজন মুসলমান সম্প্রদায়কে বক্ষের নিকটে টানিয়া পক্ষপুটে আশ্রয় দান করিতে হইবে। মিঃ বেক্ ব্রতীসুলভ নিষ্ঠা সহকারে এই নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। 'মিঃ বেকের সাধনা হইল, স্যার সৈয়দকে জাতীয়তার ক্ষেত্র হইতে ধীরে ধীরে অপসারিত করা, বৃটিশ উদারনৈতিক দলের প্রতি তাঁহার যে আনুগত্য, রক্ষণশীল দলের অভিমুখে তাহা পরিচালিত করা এবং স্যার সৈয়দের মনে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আপোষ-রক্ষার আগ্রহ জাগাইয়া তোলা। এ সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।'১ বহুদিন হইতে 'ইনষ্টিটিউট গেজেট' স্যার সৈয়দের সম্পাদনায় পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল; মিঃ বেকের প্রধান লক্ষ্য হইল—সম্পাদকীয় পরিচালন ভার স্যার সৈয়দের হস্ত হইতে সুকৌশলে অপহরণ করিয়া আপনার হস্তগত করা। মিঃ বেক্ তাঁহার পূর্ববর্তী অন্যান্য ইউরোপীয় অধ্যক্ষগণের অনুসৃত পথ পরিহার করিয়া মুসলিম ছাত্রদের সহিত অবাধ মেলামেশা আরম্ভ করিলেন এবং অল্প দিনের ভিতরেই তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। অন্যান্য ইংরাজ অধ্যাপকগণও তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিয়া কলেজের অভ্যন্তরে নানাবিধ সঙ্ঘ ও সমিতি গড়িয়া তুলিবার কার্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া জেলার সরকারী কর্মচারিগণও কলেজের খেলাধুলা ও অন্যান্য কার্যতৎপরতার সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করিতে লাগিলেন যে, তদানীন্তন প্রাদেশিক গভর্ণর স্যার অকল্যাণ্ড কল্‌ভিন তাহা দেখিয়া ১৮৮৮ সালে মন্তব্য করেন, আলিগড় কলেজের ছাত্রগণ ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলের ছাত্রদের সহিত তুলনীয়। স্যার সৈয়দ আহম্মদ ছিলেন ইউরোপীয় জীবনযাত্রা প্রণালীর একান্ত অনুরাগী; সেইজন্য কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তিনি এমন এক উচ্চতর জীবনযাত্রার

1. Mehta and Patwardhan, op. cit. P. 58.

মান প্রবর্তন করিতে প্রয়াসী হন যে, তাঁহার সহকর্মিগণের গণনায় দরিদ্র দেশের পক্ষে তাহা অতিশয় মহার্ঘ ও ব্যয়বহুল বলিয়া বিবেচিত হয়। এই ব্যাপারের সহিত ইউরোপীয় অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের সরকারী মহলে প্রতিপত্তি ও সরকারী নীতির সুস্পষ্ট পরিবর্তন মিলিত হইয়া আলিগড় কলেজের ছাত্রদের পক্ষে সরকারী পদ ও চাকুরীলাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। স্যার সৈয়দ আহম্মদের চিত্তে এইসব ঘটনার প্রভাব রেখাপাত না করিয়াই পারে না।

স্যার সৈয়দ আহম্মদ তখন 'ইনষ্টিটিউট গেজেটের' নামে মাত্র সম্পাদক: কার্যতঃ তাহার পরিচালনভার মিঃ বেকের সম্পাদনাধীন। এই অবস্থায় গেজেটের পরিচালন-নীতিতে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। স্যার সৈয়দ সে যুগে বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে অতিশয় শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। 'তখন পর্যন্ত বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে স্যার সৈয়দের শ্রদ্ধাবোধ অত্যন্ত গভীর। তিনি বিশ্বাস করিতেন, শিক্ষার উন্নতি এবং স্বাধীনতা ও স্বদেশপ্রীতির প্রসার লাভ তাহাদের জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে। তিনি প্রায়ই বলিতেন, বাঙ্গালীরাই ভারতীয় সমাজের শিরোমণি এবং সেইজন্যই তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি গর্ববোধ পোষণ করিতেন।'২ 'মিঃ বেক্ বাঙ্গালী সমাজকে ও তাহাদের প্রবর্তিত আন্দোলনকে আক্রমণ করিয়া 'ইনষ্টিটিউট গেজেটে' যে সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন, পাঠক সমাজে তাহা পরিচিত হইতে থাকিল স্যার সৈয়দের লেখারূপে। এই সব প্রবন্ধের উত্তরে বাঙ্গালীরাও স্যার সৈয়দ আহম্মদের বিরুদ্ধ সমালোচনা সুরু করিয়া দিলেন। এইভাবে বাঙ্গালীদের সহিত তাঁহার এক প্রকাশ্য সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিল।'৩ মিঃ বেক্ যখন বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে একটা প্রতিকূল পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন, ঠিক সেই যুগসন্ধিক্ষণে বোম্বাই নগরীতে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার প্রথম অধিবেশন আহূত হইল এবং তাহার সভাপতি নির্বাচিত হইলেন বাঙ্গালী মিঃ ডবলিউ, সি, ব্যানার্জি।

কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের মধ্যে এমন কিছুই ছিল না, যাহার বিরুদ্ধে কোন ভারতীয়ের কোনরূপ প্রতিবাদ উত্থাপন করিবার হেতু থাকিতে পারে। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহাদের দাবী ছিল — ষ্টেট কাউন্সিলের সেক্রেটারী পদ নির্বাচনসাপেক্ষ করা, প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি, পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে অনুরূপ পরিষদের প্রতিষ্ঠা, ভারতে ও ইংলণ্ডে সিভিল সার্ভিসের যুগপৎ পরীক্ষা, সামরিক ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস ও উত্তর ব্রহ্ম অধিকারের পরিকল্পনা পরিহার। উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ও আইন পরিষদের সম্প্রসারণ-সংক্রান্ত প্রস্তাব দুইটি সম্বন্ধে ১৮৮৪ সালে আলিগড়ের যে প্রকাশ্য সভায় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা করেন, স্যার সৈয়দ আহম্মদ স্বয়ং ছিলেন তাহার আহ্বায়ক ও সভাপতি। ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের পক্ষ হইতে যে প্রতিবাদের ঝটিকা প্রবাহিত হয়, মিঃ বেকের লিখিত প্রবন্ধ তাহাতে বেগ সঞ্চার করে। স্যার সৈয়দ আহম্মদ এ

2. Tufail Ahamad, op. cit. P. 291.
3. Ibid, P. 292.

সময়ে নীরব রহিলেন বটে, কিন্তু ১৮৮৬ সালে মুসলিম এডুকেশন্যাল কংগ্রেসের (পরে যাহা এডুকেশন্যাল কনফারেন্স নাম পরিগ্রহ করে) প্রতিষ্ঠা দিবসে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, যাঁহারা বলিয়া থাকেন, রাজনৈতিক আলোচনায় যোগদান দ্বারাই মুসলমান সম্প্রদায় প্রগতিশীল হইতে সক্ষম হইবেন তিনি তাঁহাদের সহিত একমত নহেন; পক্ষান্তরে তাঁহার বিশ্বাস, একমাত্র শিক্ষার পথেই মুসলমানদের অগ্রগতি সম্ভবপর।

১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মিঃ দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে দ্বিতীয় অধিবেশন বসে, তাহাতে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মর্ম ছিল — জুরীর দ্বারা বিচারের দাবী, শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ স্বতন্ত্রীকরণ ও দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন। কংগ্রেসের প্রথম দুইটি অধিবেশনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহাদের কোনটিই মুসলমান স্বার্থের বিরোধী ছিল না। সিভিল সার্ভিসের যুগপৎ পরীক্ষা স্যার সৈয়দ আহম্মদ স্বয়ং সমর্থন করেন। বিচার বিভাগ হইতে শাসন বিভাগের পৃথকীকরণ মুসলিম নীতির সহিত সুসংগত, কারণ মুসলমান শাসনকালেও এই উভয় বিভাগ স্বতন্ত্রই ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বিভাগদ্বয় সর্বপ্রথম সংযুক্ত হয় এবং তৎপরে কিছুদিন বিচ্ছিন্ন থাকিবার পর পুনরায় মিলিত হয় সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালে। আইন পরিষদগুলিতে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং যে সমস্ত প্রদেশে আইন পরিষদের অস্তিত্ব নাই, সেখানে সেখানে পরিষদ গঠনের প্রস্তাবও তাঁহার প্রথম জীবনে তিনি সমর্থন করেন, অবশ্য নির্বাচনের পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার ভিন্ন মত ব্যক্ত হয় ১৮৮৩ সালে। সুতরাং কংগ্রেসের বিরোধিতা করিবার পক্ষে স্যার সৈয়দ আহম্মদের কোন যুক্তিই থাকিতে পারে না। কিন্তু কোন কোন সরকারী কর্মচারী কংগ্রেস-আন্দোলনকে বৈপ্লবিক আন্দোলন বলিয়া মনে করিতেন এবং স্যার সৈয়দ আহম্মদ তাঁহাদের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া পারেন নাই; বিশেষ করিয়া মিঃ বেক্ তাঁহার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল করিয়া দেন যে, মুসলমানদের শিক্ষার মান এখনও সে স্তরে আসিয়া পেঁছায় নাই, যেখানে উপনীত হইলে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে তাহারা অংশ গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহা সত্ত্বেও তাহাদিগকে যদি আলোড়িত করিয়া তোলা হয়, তাহা হইলে তাহাদের অন্তর্নিহিত অসন্তোষ পুনরায় ১৮৫৭ সালের প্রদর্শিত পথেই অভিব্যক্তি লাভ করিবে। এই যুক্তির বলে তিনি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলেন যে, রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ মুসলমানগণের পক্ষে আত্মঘাতী। এই প্রসঙ্গে মিঃ এ, ও, হিউম স্যার সৈয়দ আহম্মদকে যে খোলা চিঠি লেখেন, তাহার উত্তরে স্যার সৈয়দের প্রদত্ত জবাবসহ উক্ত পত্রখানি 'ইনষ্টিটিউট গেজেটের' ১৮৮৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

মিঃ বদরুদ্দীন তায়েবজীর সভাপতিত্বে ১৮৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন আহূত হয়। বহু মুসলমান দর্শকরূপে এই অধিবেশনে যোগদান করেন। উর্ধ্বতন সরকারী কর্মচারিগণ তখনও কংগ্রেসের প্রতি বিশেষ বিরূপ হইয়া উঠেন নাই, তাই মাদ্রাজের গভর্ণর কংগ্রেস প্রতিনিধি-

গণকে এক প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেন। এই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের দাবী ছিল, সামরিক বিভাগের কমিশনপ্রাপ্ত পদে ভারতীয় নিয়োগ, ভারতে সামরিক শিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপন, অস্ত্র আইনের সংশোধন, এক হাজার টাকার কম আয়কে আয়কর হইতে অব্যাহতি দান ও কার্যকরী শিক্ষার উৎসাহ বিধান। কংগ্রেস অধিবেশনের সমসাময়িককালেই লক্ষ্ণৌ সহরে মুসলিম শিক্ষা কংগ্রেসের অধিবেশন বসে এবং অধিবেশন শেষ হইলে এক প্রকাশ্য সভায় স্যার সৈয়দ আহম্মদ সর্বপ্রথম কংগ্রেসবিরোধী বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সভাতেই বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্যার সৈয়দ আহম্মদ বলেন, আইন পরিষদগুলি নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা গঠিত হওয়া উচিত নয়। কেন না, তাহার ফলে সাধারণ স্তর হইতে এমন সব লোক আইন সভায় আসন লাভ করিবার সুযোগ পাইবেন, যাঁহারা শিক্ষাক্ষেত্রে হয়তো বি, এ, অথবা এম, এ, উপাধি অর্জন করিয়াছেন এবং অন্যান্য দিক দিয়াও তাঁহারা হয়তো সম্পূর্ণরূপে সুযোগ্য। তাহা সত্ত্বেও রাজপ্রতিনিধি তাঁহাদিগকে 'মাননীয় সহযোগী' বলিয়া সম্বোধন করিতে এবং ডিউক, আর্ল অথবা অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সামাজিক ভোজসভায় ও অন্যান্য সভাসমিতিতে তাঁহাদের সহিত একাসনে বসিতে কুণ্ঠা বোধ করিতে পারেন। স্যার সৈয়দ আহম্মদ স্বয়ং ভারতীয় ও ইউরোপীয়গণের সমানাধিকার দাবীর সমর্থক হইয়াও কেমন করিয়া যে এই যুক্তির পোষকতা করিলেন, তাহা এক দুর্বোধ্য সমস্যা। তিনি যুগপৎ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষারও বিরোধিতা করিলেন এই যুক্তিতে যে, ইংলণ্ডে যে কোন ব্যক্তি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রার্থী হইতে পারেন, তা তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তানই হোন অথবা দর্জির পুত্রই হোন; ভারতীয়গণ তাঁহাদের কুল-পরিচয় অবগত নহেন বলিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে তাঁহাদের শাসন মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ভারতের সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ব্যক্তিগণ পরিচিত নীচবংশজ ব্যক্তিদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইতে কিছুতেই সম্মত হইবেন না।

মিঃ বদরুদ্দীন তায়েবজী স্যার সৈয়দ আহম্মদকে লিখিয়া জানান যে, মুসলমান প্রতিনিধিগণ যদি কোন বিষয়ে আপত্তি জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে কংগ্রেস কর্তৃক তাহা আলোচিত হইবে না। উত্তরে স্যার সৈয়দ আহম্মদ লিখিয়া পাঠান, যেহেতু কংগ্রেস একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সেই কারণে তাহার আলোচ্য বিষয় মাত্রই রাজনৈতিক এবং এমন কোন রাজনৈতিক প্রশ্ন নাই, যাহা মুসলমান স্বার্থের পরিপন্থী নয়। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্যার সৈয়দ আহম্মদকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত ও স্বমতে দীক্ষিত করিতে মিঃ বেক্ সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পর স্যার থিওডর মরিসন যদি তাঁহার আলিগড় কলেজের ইতিহাসে লিখিয়া থাকেন যে, স্যার সৈয়দ আহম্মদের এই বক্তৃতার ফলে মুসলমানগণ কংগ্রেসের সংস্রব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন ও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান প্রবর্তনের বিরোধিতা করিতে পারেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ১৮৮৮ সালের মার্চ মাসে স্যার অকল্যাণ্ড কলভিন আলিগড় কলেজ পরিদর্শন করিতে গিয়া এক অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে অধ্যাপক ও ছাত্রদের প্রশংসায় এরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন যে, তৎপূর্বে অন্য কাহারও উচ্ছ্বাস অতখানি উচ্চস্তরে

গিয়া পৌঁছায় নাই। পর বৎসর স্যার সৈয়দ আহম্মদ তাঁহার কংগ্রেসবিরোধী দ্বিতীয় বক্তৃতা প্রদান করেন মীরাটে। ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হইবার কথা ছিল এবং স্যার অকল্যান্ড কলভিন ও তাঁহার গভর্ণমেণ্টের যথাসাধ্য বিরোধিতা সত্ত্বেও তাহা নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। এমন কি, যে লর্ড ডাফরিণ একদা মিঃ এ, ও, হিউমকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কার্যে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, তিনিও এখন তাহার বিরোধী হইয়া উঠিলেন।

গো-রক্ষার জন্য এক আন্দোলন গড়িয়া উঠে ঠিক এই সময়ে। সরকার পক্ষীয় মুসলমানগণ তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া এলাহাবাদে এক সভা আহ্বান করিলেন এবং সেই সভায় শুধু গো-রক্ষাবিরোধী বক্তৃতা দিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না, মুসলমানদিগের কংগ্রেসে যোগদানের বিপক্ষেও দারুণ উষ্মা প্রকাশ করিলেন। কোন কোন পক্ষ হইতে কংগ্রেসে যোগদানকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করা হইল। মৌলবী আবদুল কাদির লুধিয়ানী ইহার বিরুদ্ধে লুধিয়ানা, জলন্ধর, হোসিয়ারপুর, কপুরতলা, অমৃতসর, ছাপরা, গুজরাট, জৌনপুর, ফিরোজপুর, কাসুর, মুজাফরনগর, দিল্লী, রামপুর, বেরিলী, মোরাদাবাদ—এমন কি মদিনা-মানুয়ারা ও বোগদাদ শরিফ প্রভৃতি স্থানের উলেমাগণের স্বাক্ষর-সম্বলিত ফতোয়া মুদ্রিত করিয়া বিলি করিলেন। এই স্বাক্ষরকারী উলেমাগণ সকলেই সেকালের প্রতিষ্ঠাপন্ন ধর্মাচার্যরূপে পরিগণিত ছিলেন। এই সমস্ত ফতোয়ার বক্তব্য বিষয় ছিল, পার্থিব ব্যাপারে হিন্দুদের সহিত সহযোগিতায় কংগ্রেসের কার্যে অংশ গ্রহণ করা মুসলমানদের পক্ষে সমর্থনযোগ্য। অতএব দেখা যাইতেছে, এক দিকে যেমন স্যার সৈয়দ আহম্মদের ন্যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান; অপর দিকে তেমনি মিঃ তায়েবজী, আলী মহম্মদ, ভীমজী ও রহম-তুল্লা সায়ানীর নেতৃত্বে বোম্বাই ও মাদ্রাজের মুসলমানগণ তাহার স্বপক্ষে—তদুপরি মুসলমানগণের সক্রিয় সহযোগিতা তৎকালীন বিখ্যাত উলেমাদিগের সমর্থনপুষ্ট।

১৮৮৮ সালে আলিগড়ে যে 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার সভাশ্রেণীভুক্ত ছিলেন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল, (১) ভারতের সকল সম্প্রদায়, অভিজাত ও রাজন্যবর্গ যে কংগ্রেসের পক্ষভুক্ত নয়, বরঞ্চ তাহার বিবৃতির বিরোধী—এই তথ্যটি সংবাদপত্রের মারফৎ ও অন্যান্য সূত্রে পার্লামেণ্ট ও ইংলণ্ডের জনসাধারণের গোচর করা, (২) কংগ্রেসবিরোধী হিন্দু ও মুসলমান প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামত সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট ও ইংলণ্ডবাসিগণকে সচেতন রাখা, (৩) শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কার্যে সাহায্য করিয়া গভর্ণমেণ্টের শক্তি বৃদ্ধি করা এবং কংগ্রেসের আওতা হইতে জনসাধারণকে বাহির করিয়া আনা। সমগ্র পরিকল্পনাটি মিঃ বেক্ ও স্যার সৈয়দের রচনা এবং তাহা কার্যকরী করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। ইংলণ্ডে মিঃ মরিসনের ভবনে ইহার এক শাখা স্থাপিত হয় এবং মিঃ বেকের মৃত্যু হইলে এই মিঃ মরিসনই তাঁহার স্থলে আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সিদ্ধান্ত হইল, প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা সংগ্রহ করিতে হইবে। তদনুযায়ী বহু বড় বড় হিন্দু ও মুসলমান জমিদার এবং অনেক ইউরোপীয়ও

এসোসিয়েশনের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। অযোধ্যার তালুকদার এসোসিয়েশনের সভায় রাজা শিউপ্রসাদ প্রস্তাব করেন, রাজানুগতদের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করা হোক এবং পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশনকে তাহার শাখারূপে গণ্য করা হোক। তিনি আরও প্রস্তাব করেন, ভারতীয় ভাষায় লেখা ও বক্তৃতা দান নিষিদ্ধ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হোক; কেন না, সে সবের ফলে গোলযোগ ও বিদ্রোহ ঘটিবার সম্ভাবনা। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের দমন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট, পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন ও রাজা শিউপ্রসাদের ন্যায় প্রতিপত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির বিরোধিতা সত্ত্বেও কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশন সুসম্পন্ন হয় এবং যে ক্ষেত্রে তৎপূর্ববর্তী অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৬০৭ জন, ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ১,২৪৮ জন প্রতিনিধি এলাহাবাদ অধিবেশনে যোগ-দান করেন। মুসলমান প্রতিনিধিগণ বলিলেন, প্রতিনিধি সংখ্যার এই বৃদ্ধি আলিগড় কর্তৃপক্ষের বিরোধিতার প্রত্যক্ষ ফল। এ স্থলে ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, কংগ্রেসের যে এলাহাবাদ অধিবেশনের বিরুদ্ধে এইরূপ তীব্র প্রতিপক্ষতা প্ররোচিত করিয়া তোলা হইয়াছিল, তাহাতে প্রস্তাব গৃহীত হয়—মদ্যপান নিরোধ, শিক্ষা-খাতে ব্যয়বৃদ্ধি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসার ও লবণ শুল্কের প্রত্যাহার দাবী করিয়া।

১৮৮৯ সালে মিঃ ব্রাড্‌ল ভারতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টে এক বিল আনয়ন করেন। মিঃ বেক্ তাহার বিরুদ্ধে এই মর্মে এক স্মারকলিপি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন যে, যেহেতু ভারত বহু সম্প্রদায়ের বাসভূমি, এই কারণে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সেখানে অচল। এই স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য আলিগড় কলেজের ছাত্রগণ দলে দলে বাহির হইয়া পড়িল। মিঃ বেকের নায়কতায় এমনি একটি দল দিল্লী গমন করে। তিনি স্বয়ং জুম্মা মসজিদের প্রবেশ-দ্বারে বসিয়া রহিলেন এবং ছাত্রগণ তাঁহার নির্দেশক্রমে প্রার্থনার উদ্দেশ্যে সমাগত ব্যক্তিদের নিকট হইতে স্মারকলিপিতে এই বলিয়া স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতে থাকিল যে, হিন্দুরা গো-হত্যা বন্ধ করিতে চায় এবং এই দরখাস্ত তাহারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইবে। ওলায়াত হোসেন সাহেবের প্রদত্ত এই মর্মের বিবৃতি আলিগড়ের কন্‌ফারেন্স গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল। সে যাহা হোক, এই উপায়ে ২০,৭৩৫টি স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া তৎসম্বলিত দরখাস্তখানি ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের নিকট প্রেরিত হয় ১৮৯০ সালে।' ৪

এইরূপে 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন' মুসলমানদের নামে কয়েক বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়া চলিল। অবশেষে ১৮৯৩ সালে 'মহোমেডান অ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল ডিফেন্স অর্গানিজেসন অব্ আপার ইণ্ডিয়া' নামে এক নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল, (ক) গভর্ণমেণ্ট ও ইউরোপীয়গণের সম্মুখে মুসলমানদের অভিমত স্থাপন করা ও তাহাদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করা, (খ) মুসলমানগণের মধ্যে রাজনৈতিক

4.—M. Tufail Ahamad, Op. Cit. Pp. 311—312.

আন্দোলন প্রসারের পথ বন্ধ করা, (গ) বৃটিশ শাসন দৃঢ়তর করিবার, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার এবং জনসাধারণের চিত্তে রাজভক্তির উদ্রেক করিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা। 'পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন' ছিল স্পষ্টতঃ হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত প্রতিষ্ঠান। মিঃ বেক্ কিন্তু বৃটিশ শাসন দৃঢ়তর করিবার কার্যেও তাহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা পরিপাক করিতে পারিলেন না; সেইজন্য নূতন আর একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া মুসলমানদিগকে অন্যান্য ভারতীয় সম্প্রদায়সমূহ হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন এবং প্রতিক্রিয়াশীল ইংরাজ সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদিগকে যুক্ত করিয়া, যৌথ প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করিলেন 'ডিফেন্স এসোসিয়েশন'। ১৮৮৩ সালে রিপণের শাসননীতির বিরুদ্ধে যে 'অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স এসোসিয়েশন' গঠিত হয় এবং করণীয় কার্য সমাধা করিবার পর বিলুপ্ত হইয়া যায়—এই নাম তাহা হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। মিঃ বেক্ হইলেন ইহার সম্পাদক।

এসোসিয়েশনের প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় মিঃ বেক্ বলিলেন, ব্র্যাড্লর বিলের বিরুদ্ধে 'পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন' কর্তৃক স্বাক্ষর সংগৃহীত হওয়া সত্ত্বেও দুইটি মারাত্মক ত্রুটি দরখাস্তের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। ইহা ছিল হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান, তদ্ব্যতীত আরও বহুতর প্রতিষ্ঠান ইহার সহিত যুক্ত ও জড়িত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ইহা প্রকাশ্য সভা আহবান করিয়া গণ-বিক্ষোভ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিত। 'ডিফেন্স এসোসিয়েশন' হইবে হিন্দুসংস্পর্শলেশবর্জিত এমন এক বিশুদ্ধ মুসলমান প্রতিষ্ঠান যাহা অপর কোন প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দান করিবে না, সাধারণ সভা আহবান করিবে না বা জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ প্রচার করিবে না। ইহার মধ্যে একটি কর্ম-পরিষদ থাকিবে এবং এসোসিয়েশনের যাবতীয় কার্যভার ন্যস্ত রহিবে এই পরিষদের হস্তে: সাধারণ সভ্যদের সে বিষয়ে কোন হাত থাকিবে না। মিঃ বেকের উদ্বোধনী-বক্তৃতা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা এস্থলে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হইবেঃ—'বিগত কয়েক বৎসর হইতে এদেশে যে দুইটি আন্দোলন বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিতেছে, তাহাদের একটি হইতেছে জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলন এবং অপরটি গো-হত্যা-বিরোধী আন্দোলন। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি ইংরাজবিরোধী ও দ্বিতীয়টি মুসলমান-বিরোধী। জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হইল, রাজনৈতিক ক্ষমতা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের হাত হইতে হরণ করিয়া একদল হিন্দুর হাতে তাহা হস্তান্তরিত করা, শাসক সম্প্রদায়কে হীনবল করা, জনসাধারণের হস্তে অস্ত্রশস্ত্র তুলিয়া দেওয়া ও সামরিক ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস করিয়া সৈন্যবাহিনীকে দুর্বল করা। গো-হত্যা-বিরোধী আন্দোলনের লক্ষ্য হইল, গো-হত্যা নিবারণ করিয়া ইংরাজ ও মুসলমানগণের গো-মাংস ভক্ষণ বন্ধ করা। এই উদ্দেশ্যে তাহারা তাহাদের প্রতিযোগীকে অনশনক্লিষ্ট করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিতে চায়। ইহার ফলে বোম্বাই, আজমগড় প্রভৃতি স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। মুসলমান ও ইংরাজগণই হইয়াছেন এই আন্দোলনের লক্ষ্যবস্তু। এইজন্যই এই আন্দোলন প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে ইংরাজ ও মুসলমানের মিলিত হওয়া ও এদেশের পক্ষে

সম্পূর্ণ অযোগ্য গণতন্ত্রমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে বাধা দেওয়া একান্ত কর্তব্য। অতএব ঐক্যবদ্ধ কর্মপন্থা ও সত্যকার রাজানুগত্যের অনুকূলে আমাদিগকে প্রচারকার্য চালাইতে হইবে।' ৫

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, মিঃ বেক্ ব্রাড্‌লর বিলের বিরুদ্ধে কুড়ি হাজার স্বাক্ষরসম্বলিত এক দরখাস্ত প্রেরণ করিয়াছেন। অতঃপর যুগপৎ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বিরুদ্ধে বহু মুসলমানের স্বাক্ষরসহ তিনি আর একটি দরখাস্ত পেশ করিলেন। 'ডিফেন্স এসোসিয়েশন' যে মুহূর্তে সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে, তদ্দণ্ডে তাঁহারা এক ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাহা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের গোচর করিলেন ও তৎসহ লিখিয়া পাঠাইলেন, যুগপৎ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হইলে, ভারতে বৃটিশ গভর্মেণ্টের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাহা হানিকর হইত, গভর্ণমেণ্ট হীনবল হইয়া পড়িতেন এবং যে ধন ও প্রাণের নিরাপত্তার উপর ভারতের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি নির্ভরশীল, তাহার সংরক্ষণ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িত।

ভারতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিরুদ্ধেও মিঃ বেক্ সুকৌশলের সহিত বিরোধিতা গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মিঃ বেকের বক্তব্য হইল, মুসলমানগণ কেবলমাত্র রাজানুগত্যের গুণেই সরকারীপদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। 'ডিফেন্স এসোসিয়েশনের' প্রচারকার্য ইংলণ্ড পর্যন্ত প্রসারলাভ করিল এবং মিঃ বেক্ ১৮৯৫ সালে স্বয়ং তথায় গিয়া বক্তৃতা প্রদান করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয় হইল, ইঙ্গ-মুসলিম একতা বরঞ্চ সম্ভবপর, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান ঐক্য অসম্ভব ও অবাস্তব ব্যাপার। তিনি আরও প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন যে, ভারতে পার্লামেণ্টারী প্রথার প্রবর্তন একেবারে অচল। তাহা সত্ত্বেও যদি সে প্রথা প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহার ফলে সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের চাপে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় একেবারে নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইবে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ বেক্ কখনও বা মুসলমান সমাজের পিঠ চাপড়াইলেন, আবার কখনও ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, তাঁহারা যদি তাঁহাদের আচরণ সম্বন্ধে সতত সজাগ না থাকেন ও হিন্দুদের প্রদর্শিত নীতি অনুসরণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহার ফল অতিশয় শোচনীয় হইবে।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই সময়ে সীমান্ত প্রদেশে অগ্রগমন-নীতি অনুসরণ করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। তজ্জন্য সামরিক ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, অথচ কংগ্রেস করিতেছে তাহারই বিরোধিতা। ১৮৯৬ সালে 'ডিফেন্স এসোসিয়েশনের' বার্ষিক বিবরণীতে মিঃ বেক্ বেশ জোরের সহিতই বলেন, গভর্ণমেণ্টের স্থায়িত্বের জন্যই সৈন্য ও নৌবাহিনীর আরও বল বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। এই সভাতেই স্যার সৈয়দ আহম্মদ এই মর্মে এক প্রস্তাব আনয়ন করেন যে, এসোসিয়েশন সামরিক ব্যয়-বরাদ্দ হ্রাস করিবার প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রস্তাব উত্থাপন করিতে গিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাঁহার মতে এদেশে ইংরাজ সৈন্যের সংখ্যা অতিশয় অল্প এবং কোন এক ক্ষেত্রে লর্ড ডাফ্‌রিণকে তিনি

5.—Tufail Ahamad, Op. Cit. P. 315.



বঙ্গদেশ
অমুসলমানপ্রধান জেলাসমূহ।
মুসলমানপ্রধান জেলাসমূহ।
অ.=জেলায় অমুসলমান জনসংখ্যার শতকরা হার
ম.= ” মুসলমান ” ” ”
দার্জিলিং
অ. ৭৭.৩৮
ম. ২.৪২
অ. ৭৬.৯১
জলপাইগুড়ি
ম. ২৩.০৮
ম. ৭১.৪১
রঙ্গপুর
অ. ২৮.৫৮
ম. ৫০.২০
দিনাজপুর
অ. ৪৯.৮০
ম. ৫৬.৭৮
মালদহ
অ. ৪৩.২২
ম. ৮৩.৯৩
বগুড়া
অ. ১৬.০৭
ম. ৭৪.৬৪
রাজসাহী
অ. ২৫.৩৬
ম. ৭৭.০৬
পাবনা
অ. ২২.৯৪
ম. ৭৭.৪৪
ময়মনসিংহ
অ. ২২.৫৬
ম. ৬০.৭১
শ্রীহট্ট
অ. ৩৯.২৭
ম. ৫৬.৫৫
মুর্শিদাবাদ
অ. ৪৩.৪৪
অ. ৭২.৫৯
বীরভূম
ম. ২৭.৪১
ম. ৬১.২৬
নদীয়া
অ. ৩৮.৭৪
ম. ৬৭.২৯
ঢাকা
অ. ৩২.৭১
ম. ৭৭.০৯
ত্রিপুরা
অ. ২২.৯১
পার্বত্য ত্রিপুরা
ম. ৬০.২১
যশোহর
অ. ৩৯.৭৯
ম. ৬৪.৭৮
ফরিদপুর
অ. ৩৫.২২
অ. ৮২.১৯
বর্দ্ধমান
ম. ১৭.৮১
অ. ৯৫.৬৯
বাকুড়া
ম. ৪.৩১
অ. ৮৪.৯৭
হুগলী
ম. ১৫.০৩
অ. ৮০.১২
হাওড়া
অ. ৬৭.৫৩
ম. ৩২.৪৭
২৪ পরগণা
অ. ৭৬.৪১
কলিকাতা
অ. ৫০.৬৪
খুলনা
ম. ৪৯.৩৬
ম. ৮১.৩৫
নোয়াখালী
অ. ১৮.৬৪
ম. ৭২.৭৩
বাখরগঞ্জ
অ. ২৭.৬৭
অ. ৯২.২৭
মেদিনীপুর
ম. ৭.৭৩
চট্টগ্রাম

বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, এখানকার সৈন্যবাহিনী সীমান্ত রক্ষার পক্ষে অপ্রচুর। ৬ পক্ষান্তরে কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করিল, সীমান্ত প্রদেশে গভর্ণমেণ্টের অগ্রগমন-নীতির বিরোধিতা করিয়া। কংগ্রেস দাবী করিল, সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণের সম্বন্ধে বন্ধুত্বপূর্ণ নীতি অনুসরণের ও সোয়াত উপত্যকায় সামরিক ব্যয়ের অত্যধিক গুরুভার লাঘব করিবার; এস্থলে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, গভর্ণমেণ্টের অগ্রগমন-নীতির ফলে যাহাদের ধন-প্রাণ বিনষ্ট হইতেছিল, তাহারা সকলেই মুসলমান, অথচ কংগ্রেস দাঁড়াইল তাহার প্রতিকূলতা করিতে এবং মহোমেডান ডিফেন্স এসোসিয়েশন দাবী করিল তদুদ্দেশ্যে বর্ধিত সামরিক ব্যয়-বরাদ্দ ও বৃহত্তর সৈন্যবাহিনী।

ইহার ফলে অনেক মুসলমানই ব্যাপারটা ভালভাবে তলাইয়া বুঝিতে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহাদের আনুগত্য একদিকে স্যার সৈয়দ ও অপরদিকে মুসলিম স্বার্থ—এতদুভয়ের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত। কয়েক বৎসর পরে এই ভাবদ্বৈধতাকে উপলক্ষ্য করিয়া নবাব ওয়াকার-উল্-মুলক ১৯০৭ সালে লেখেন, 'মুসলিম স্বার্থের প্রতি যাঁহারা অনুরক্ত, এই সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা বিব্রত হইয়া পড়িলেন এবং ইহা লইয়া আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকিল। স্যার সৈয়দ আহম্মদের কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর দেখিলেন, তাঁহাদের নেতা এমন একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক যে, তিনি চলিয়া গেলে মুসলিম সমাজে তাঁহার শূন্যস্থান বহুদিন পর্যন্ত পূর্ণ হইবে না—ইহা অতি সত্য কথা, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পরিশেষে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইতে বাধ্য হইলেন যে, অতঃপর তাঁহাদের বরেণ্য নেতার প্রতি শ্রদ্ধা সসম্মানে সরাইয়া রাখিয়া তাঁহারা সাম্প্রদায়িক স্বার্থেরই সেবা করিবেন। স্থির হইল, লাহোর হইতে প্রকাশিত 'পাইসা ইখবার' নামক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে কতকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে হইবে। প্রবন্ধগুলি বেনামী হইবে না, তাহাতে স্বাক্ষর থাকিবে নবাব মশিন-উল্-মুলক, শামসুল উলেমা মৌলবী খাজা আলতাফ হোসেন আলি প্রভৃতির ন্যায় ব্যক্তিবর্গের ও মাদৃশ অভাজনের। এই ধারাবাহিক প্রবন্ধের প্রথমটি লিখিত হয় আমার দ্বারা এবং লেখা সমাপ্ত হইলে নবাব মশিন-উল্-মুলক বাহাদুর ও শামসুল উলেমা মৌলবী আলি সাহেবের স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য তাহা আলিগড়ে প্রেরিত হয়। এমন সময় সহসা নেতার আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধগুলি ফেরৎ পাঠাইবার জন্য নবাব মশিন-উল্-মুলকের নিকট আমি টেলিগ্রাম করিলাম, কারণ তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মহত্ত্ব ও অতুলনীয় গুণাবলীর কথা ছাড়া অন্য কোন কিছু চিন্তা করা আমাদের পক্ষে গর্হিত। এখন যখন ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিবার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছে ও কাহারও বিরুদ্ধে আমাদের কোনরূপ অভিযোগ পোষণ করিবার আর হেতু নাই, তখন কলেজের কল্যাণের নিমিত্তই এই সমস্ত ঘটনা সাধারণের গোচর করা কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি।' ৭

6. Tufail Ahamad, Op. Cit. P. 330.
7. Extract from Waqar-i-Hayat, P. 420, quoted by Moulvi Tufail Ahamad, op. Cit., P. 334,

১৮৯৮ সালে স্যার সৈয়দের মৃত্যু হইলে, মিঃ বেক্ তাঁহার অবলম্বিত নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিলেন। কিন্তু পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৮৯৯ সালে তাঁহারও মৃত্যু হইল।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার আর্থার স্ট্র্যাচীর ভাষায় বলিতে গেলে, যে সব ইংরাজ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ গাড়িয়া তুলিবার কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, মিঃ বেক্ ছিলেন তাঁহাদিগেরই অন্যতম। প্রকৃত সৈনিকের মত তিনি কর্তব্য সাধনে দেহপাত করিয়াছেন।

মিঃ বেকের মৃত্যুর পর কলেজের অধ্যক্ষ হইলেন মিঃ থিওডোর মরিসন। স্মরণ থাকিতে পারে, লণ্ডনে এই মরিসন সাহেবের গৃহেই 'পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশনের' এক শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়; কাজেই ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, মিঃ বেকের স্থলে তিনি আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবেন এবং শুধু তাহাই নয়, রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন। এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিল, যাহার সুযোগ লইয়া আলিগড় কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষগণ হিন্দুদের নিকট হইতে মুসলমানগণকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিবার কার্যে ব্যাপৃত হইবার সুবিধা পাইলেন। ১৯০০ সালে যুক্তপ্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত এক ইস্তাহারের ফলে উক্ত প্রদেশে উর্দু-নাগরী আন্দোলন জাগিয়া উঠিল। আফিসে ও আদালতে নাগরী অক্ষর প্রচলনের সরকারী উদ্যম হিন্দুদের সমর্থন লাভ করিল ও মুসলমানগণ দাঁড়াইল তাহার বিপক্ষে। হিন্দুগণ বহু পূর্ব হইতেই নাগরী অক্ষর প্রবর্তনের অনুকূলে আন্দোলন করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু স্যার সৈয়দের বিরোধিতার জন্য তাহারা উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য হইতে পারে নাই। ১৯০০ সালে যুক্তপ্রদেশে প্লেগ সংক্রামক আকারে দেখা দিলে গভর্ণমেণ্ট আক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে পৃথক করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তাহার ফলে যে উপদ্রব দেখা দেয়, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমান সমভাবে অংশ গ্রহণ করে। ১৯০০ সালের পয়লা এপ্রিল তারিখে কাণপুর সহরে এইরূপ একটি উপদ্রব সংঘটিত হয়, তাহার ফলে গভর্ণমেণ্ট [illegible] ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। এই ঘটনার এক পক্ষকাল মধ্যে সরকারী আ[illegible]ত ও আফিসসমূহে নাগরী অক্ষর প্রবর্তনের প্রস্তাব গভর্ণমেণ্টসমর্থন-সম্বলিত আকারে বাহির হইয়া আসে। ইহার ফলে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ আসন্ন হইয়া উঠিল। ছত্রীর নবাবের সভাপতিত্বে ১৯০০ সালে আলিগড়ে এক প্রতিবাদ-সভা আহূত হয়। সভায় নবাব মশিন-উল্-মুল্‌ক এক উগ্র অভিভাষণ প্রদান করেন এবং প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার ফলে সভাপতি সরকারের বিরাগভাজন হইয়া পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর নবাব মশিন-উল্-মুলক্ তাহার সভাপতিরূপে এ সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ইহার পরই স্বয়ং লেফ্‌টনাণ্ট গভর্ণর আলিগড় কলেজ পরিদর্শনে যান এবং কলেজের ট্রাষ্টীবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, নবাব মশিন-উল্-মুল্‌কের সম্মুখে দুইটি পথ খোলা রহিয়াছেঃ হয় তিনি উর্দু কন্‌ফারেন্সের সভাপতি থাকিবেন, নয় কলেজের কর্মসচিবের কার্য করিবেন, ইহার যে কোন একটি তাঁহাকে বাছিয়া লইতে হইবে। কারণ, কলেজের কার্যাধ্যক্ষ-

রূপে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালন করিতে তিনি পারেন না। কলেজ সম্বন্ধীয় কার্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া ট্রাস্টীবর্গের চাপের ফলে উর্দু কন্ফারেন্সের সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিতে তিনি বাধ্য হইলেন। 'পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন' ও 'মেহোমিডান ডিফেন্স এসোসিয়েশনের' কার্যসূচী ছিল কংগ্রেসের প্রতিবন্ধকতা করা, ভারতে পার্লামেন্টারী প্রথার প্রবর্তন, যুগপৎ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ব্যবস্থা, সামরিক ব্যয়-বরাদ্দ হ্রাস ও লবণ শুল্কের প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবীর বিরোধিতা করা। কিন্তু এই সমস্ত কার্য ইতিপূর্বে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা-রূপে কোনদিন বিবেচিত হয় নাই; কেবলমাত্র কলেজের কর্মসচিব স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁই নহেন, কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ বেক্ পর্যন্ত এই আন্দোলন পরিচালনের পক্ষে সরকারী প্রশ্রয়, এমনকি প্ররোচনা পর্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নবাব মহিশন-উল্-মুল্কের বেলায় ইহা রাজনৈতিক কর্মতৎপরতারূপে পরিগণিত হইল এবং তাহার ফলে উর্দু কনফারেন্সের সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না। তাহার কারণ, প্রথমটি গভর্ণমেণ্ট স্বার্থের অনুকূল ও দ্বিতীয়টি তাহার প্রতিকূল।

মিঃ মরিসন দেখিলেন যে, মুসলমানদের নাগরী-হরফ-বিরোধী আন্দোলন দমন করা সহজসাধ্য হইবে না; কাজেই কলেজ কর্তৃপক্ষগণকে তিনি পরামর্শ দিলেন যে, কোনরূপ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকাই অবাঞ্ছনীয়। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অনিষ্টকারিতার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ১৯০১ সালের ইনষ্টিটিউট গেজেটে প্রকাশিত এক পত্রে তিনি লিখিলেন, 'এদেশে গণতান্ত্রিক শাসনপ্রথা প্রবর্তিত হইলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা কাঠ-কাটা ও জল-তোলা শ্রেণীর দুর্গত দশায় পরিণত হইবে।' ৮ তিনি আরও বলেন, মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র কোন প্রতিষ্ঠান গড়িবার প্রয়োজন নাই, কারণ বড় বড় ব্যক্তিরা সরকারী অসন্তোষের ভয়ে তাহাতে যোগ দিবেন না, ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হইবে। অতঃপর নিম্নলিখিত উক্তির দ্বারা তিনি তাঁহার বক্তব্যের উপসংহার করেনঃ 'আমার মতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলমান স্বার্থের পরিপোষক না হইয়া প্রতিবন্ধকই হইবে, কারণ বিগত বিশ-পঁচিশ বৎসর ধরিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে নানাভাবে নানারূপ সুখ-সুবিধা দিয়া আসিতেছেন। কংগ্রেসের মত তাঁহারাও যদি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের মারফৎ তাঁহাদের দাবী-দাওয়া উত্থাপন করিতে থাকেন এবং তাহার ফলে পার্লামেণ্ট যদি কমিশন নিযুক্ত করিয়া বসেন, তাহা হইলে স্যার এন্থনি ম্যাকডোনাল্ডের হাতে নিজেদের অদৃষ্ট সমর্পণ করিলে তাঁহারা যে পরিমাণ সুখ-সুবিধা প্রাপ্ত হইবেন, স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের মারফৎ প্রাপ্ত সুখ-সুবিধার পরিমাণ তাহার সমতুল্য হইতেই পারে না।' ৯ তাঁহার মতে, সরকারী কর্মচারিগণ মুসলমানদের প্রতি যে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, রাজনৈতিক দাবী উত্থাপন করিলে তাঁহারা তাহা হইতে বিরত হইবেন। সুতরাং তাঁহার

8. Tufail Ahamad, op. cit., P. 349.
9. Ibid, P. 350.

পরামর্শ হইল, মুসলমানদের সুযোগ্য ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত একটি কাউন্সিল মাত্র থাকিবে এবং তাহার সভাদের কার্য হইবে, রাজনৈতিক তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ সাহিত্যের সাহায্যে আইন-পরিষদের সদস্যদিগকে সুপরামর্শ দেওয়া। তাঁহার সর্বশেষ অভিমত হইল, মুসলমানদের রাজনৈতিক সমস্যা অপেক্ষা অর্থ-নৈতিক সমস্যার প্রতিই অধিকতর মনোযোগী হওয়া কর্তব্য।

কিন্তু অর্থের অভাবে এই প্রস্তাব কার্যকরী করিয়া তোলা সম্ভব হইল না এবং মৌলবী তুফাইল আহম্মদের ভাষায় বলিতে গেলে, মুসলমানদের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক আন্দোলন সাময়িকভাবে সমাহিত হইল।

আলিগড় কলেজের কর্মসচিবের পক্ষে উর্দু-নাগরী বিতর্কে অংশ গ্রহণ করা গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক রাজনৈতিক কারণে নিষিদ্ধ হইলেও, কলেজের ছাত্রদিগকে তদুদ্দেশ্যে ব্যবহার করার দিক দিয়া সরকার পক্ষে কোনরূপে কার্পণ্য ছিল না। তখনকার দিনে প্রতিযোগী রাষ্ট্ররূপে রুশিয়া ও ইংলণ্ড উভয়েই পারস্যের প্রীতি অর্জনের জন্য চেষ্টা করিত। ১৯০২ সালে লর্ড কার্জন পারস্য হইতে একদল যুবককে আনিয়া আলিগড় কলেজে শিক্ষাদান করার উপযোগিতা অনুভব করিলেন। মিঃ মরিসন প্রস্তাব করিলেন, কলেজের পক্ষ হইতে এক প্রতিনিধিদল পারস্যে প্রেরণ করিতে হইবে। নবাব মশিন-উল-মুলক কলেজ-তহবিল হইতে প্রতিনিধি-দলের ব্যয়ভার বহন করিবার প্রস্তাবে আপত্তি করিলে, মিঃ মরিসন তাঁহার উপর প্রভাব প্রয়োগ করেন। ফলে তাঁহাকে সম্মতি দিতে বাধ্য হইতে হয়। যাহা হোক, প্রতিনিধিদল শেষ পর্যন্ত পারস্যে প্রেরিত হয় ও তথাকার সম্ভ্রান্তবংশীয় জনকয়েক যুবক আলিগড় কলেজে অধ্যয়ন করিবার জন্য ছাত্ররূপে আগমন করেন।

মুসলমান মাত্রই মিঃ মরিসনের নেতৃত্ব মানিয়া লইতে সম্মত হইলেন না। ১৯০১ সালে নবাব মশিন-উল্-মুলক 'মেহোমিডান পলিটিক্যাল অর্গানিজেসন' নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন এবং তাহা সার্থক করিয়া তুলিবার পক্ষে আপ্রাণ সচেষ্ট হইলেন। মতবাদ অতিশয় মৃদু ও মোলায়েম থাকা সত্ত্বেও, সরকারী অনুমোদনের অভাবে তাঁহার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে দেখিতে পাইব যে, মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা কেবল তখনই সম্ভব হইল, গভর্ণমেণ্ট যখন নিজের স্বার্থে তাহার প্রয়োজন অনুভব করিলেন।

(এগার)

পৃথক্ নির্বাচন প্রথার উৎপত্তি

সর্বপ্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীনে আসে বাঙ্গলা। এই প্রদেশেই ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত হয় প্রথম এবং বাঙ্গালী হিন্দুগণ ক্ষিপ্রতার সহিত তাহার সুযোগ গ্রহণে সক্ষম হন। গভর্ণমেণ্টের তৎকালীন অনুসৃত নীতি অনুযায়ী মুসলমানদিগকে পশ্চাতে ঠেলিয়া রাখিবার ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা হইত। হিন্দুরা যে কেবলমাত্র সরকারী সেরেস্তার সর্ববিভাগে পদ অধিকার করিয়া বসিলেন তাহাই নয়, তাঁহাদের মধ্য হইতে উদ্ভূত হইলেন শ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক, বিখ্যাত ব্যবহারজীবী, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, বাগ্মী, লেখক ও সেই সব ব্যক্তি, যাঁহারা ইংরাজী সাহিত্যের নির্ঝর হইতে পিপাসার নীর আকণ্ঠ পান করিয়া বৃটিশ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি, বিশেষ করিয়া বৃটিশ শাসনতন্ত্রের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। অগ্রগতিশীল এইরূপ একটি সম্প্রদায় সরকারী চাকুরীর সোপান-শ্রেণীর নিম্নতর ধাপে স্থান পাইয়া সন্তুষ্টচিত্তে অবস্থান করিবেন, এরূপ আশা করাই বিড়ম্বনা। বৃটিশ আদর্শের অনুকরণে প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার আগ্রহ অনেকের মধ্যে উগ্রতর আকারে জাগরিত হইয়া উঠিল। দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে নব জাগরণ আনিবার পক্ষে তাঁহাদের দান প্রচুর এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পক্ষে তাঁহাদের কৃতিত্বের পরিমাণ বড় কম নয় ঃ জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আহূত হয় বাঙ্গালী ডবলিউ, সি, ব্যানার্জির সভাপতিত্বে। এই কারণে প্রগতিশীল ভাবধারার সমর্থক মাত্রেরই শ্রদ্ধা অর্জন করিতে তাঁহারা সক্ষম হইয়াছিলেন এবং পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, স্যার সৈয়দ আহম্মদ ছিলেন এইসব শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু সেই একই কারণে বৃটিশ সরকারী কর্তৃপক্ষগণের চক্ষে তাঁহারা হইয়া উঠিলেন সন্দেহভাজন, অবশ্য সরকারী কর্মচারিগণও যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষ ও বিভীষিকার ভাব গোপন করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিতেন তাহা নয়। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররূপে তাঁহারা যে কর্মকুশলতা ও কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দেন, বাংলার তদানীন্তন লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার এনথনি ম্যাক্ডোনাল্ড তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হইয়া পারেন নাই। লর্ড কার্জনের মত প্রভুত্বপ্রয়াসী ব্যক্তির পক্ষে বাঙ্গালীদের এই ক্রমবর্ধমান প্রভাব পরিপাক করিয়া লওয়া কষ্টসাধ্য হইল। সেইজন্য তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির বিরুদ্ধে তাঁহার প্রথম অভিযান সুরু করিলেন নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা হ্রাস করিয়া। তাহা ছাড়া, তিনি আরও নির্দেশ দিলেন যে, অতঃপর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবেন একজন সরকারপক্ষীয় ব্যক্তি। এইরূপে মিউনিসিপ্যালিটির কার্যও সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনীত হইল। সমগ্র দেশের না হইলেও উত্তর ও পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক চেতনার প্রাণকেন্দ্র এই প্রধান মহানগরীর উপর আক্রমণ স্বভাবতঃই জনসাধারণের চিত্তে ক্ষোভের সঞ্চার করিল। ইহাতে

লর্ড কার্জন আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগকে বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আসামের সহিত যুক্ত করিবার জন্য বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন ১৯০৩ সালে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন উত্থিত হইল। এমনকি ঢাকার নবাব সলিমুল্লা খাঁ পর্যন্ত ইহাকে 'পাশবিক ব্যবস্থা' আখ্যায় অভিহিত করিলেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা দিতে গিয়া লর্ড কার্জন বলেন, প্রাচ্যদেশবাসি-গণ সত্য সম্বন্ধে আদৌ শ্রদ্ধাশীল নহেন। তাঁহার এই মন্তব্যের ফলে ভারতের জনমত তাঁহার বিরুদ্ধে আরও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং স্থানে স্থানে তাহা অভিব্যক্ত হইতে লাগিল প্রতিবাদ-সভায়। চতুর্দিক হইতে উত্থিত অশ্রান্ত প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি লর্ড কার্জনের ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি করিল মাত্র। তিনি ঢাকায় গিয়া এক প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের দ্বারা তিনি যে কেবল বাংলার লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণরের বহু-বিস্তীর্ণ অঞ্চল শাসনের গুরুদায়িত্বই লাঘব করিতে চান তাহা নয়, তিনি আরও চান, এমন একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গঠন করিতে, যেখানে মুসলমানদের দাবীই প্রাধান্য লাভ করিবে। লর্ড কার্জনের এই বক্তৃতার বন্যায় অনেক মুসলমানই ভাসিয়া গেলেন; নবাব সলিমুল্লা ইতিপূর্বে ছিলেন এই ব্যবচ্ছেদ-ব্যবস্থার বিরোধী, এখন তিনিই তাহার উৎসাহী সমর্থক হইয়া উঠিলেন; যদিও তাঁহার ভ্রাতা খাজা আতিকুল্লা রহিয়া গেলেন পূর্বের মতই ইহার বিরোধী। মিঃ গুরুমুখ নিহাল সিং বলেন, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের অব্যবহিত পরেই গভর্ণমেণ্ট নবাব সলিমুল্লাকে কম সুদে এক লক্ষ পাউণ্ড ঋণ দিয়া তাঁহার সমর্থন ক্রয় করেন।১ সমগ্র হিন্দু সমাজের ও মিঃ এ, রসুল এবং খাজা আতিকুল্লা সাহেবের নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলমান সমাজের একটা বৃহৎ অংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রদেশের ব্যবচ্ছেদ-ব্যবস্থা কার্যে পরিণত হইয়া গেল। স্যার হেনরী কটনের ভাষায়ঃ 'এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্য হইল, প্রদেশের একত্ব ও অখণ্ডত্ববোধকে বিধ্বস্ত ও বিক্ষিপ্ত করা। এই পরিকল্পনার পশ্চাতে শাসনব্যবস্থা-সংক্রান্ত কোনরূপ হেতুই বিদ্যমান ছিল না। দেশাত্মবোধ ও তজ্জনিত রাজনৈতিক চেতনা চূর্ণ করিয়া ক্রমবর্ধমান বিরুদ্ধ শক্তিকে সংহত করিবার জন্য লর্ড কার্জন যে বৃহৎ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই অংশবিশেষ।' স্টেটস্‌ম্যানের ভাষায় ইহার লক্ষ্য হইলঃ 'মুসলমান শক্তিকে প্রশ্রয় দিয়া পূর্ববঙ্গে বলশালী করিয়া তোলা, যাহার ফলে দ্রুতবর্ধনশীল হিন্দু-সংহতি সম্ভবতঃ অনেকটা সংযত হইবে।' ২

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদকে কেন্দ্র করিয়া যে তিক্ততম বিরোধ লর্ড কার্জন জাগাইয়া রাখিয়া গেলেন, তাহাতে শুধু বাঙ্গালীরাই নহেন, অন্যান্য প্রদেশবাসিগণও অচিরে জড়িত হইয়া পড়িলেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ক্ষুদ্র মনের পরিকল্পনা প্রায়ই

1. Gurumukh Nihal Sing: 'Landmarks in Indian Constitutional and National Development', P. 319.
2. From 'India in Transition', quoted by Mehta and Patwardhan in 'Communal Triangle', P. 64.

বক্রপথ অনুসরণ করে, ভারতের ক্ষেত্রেও ঘটিল তাহাই। রাজনৈতিক জীবন নিষ্পিষ্ট করিবার জন্য যাহার সৃষ্টি, তাহাই হইয়া দাঁড়াইল রাজনৈতিক প্রেরণার উৎসমূল। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলনের আঘাতে দেশ যেভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল, ১৮৫৭ সালের পর সেরূপ গভীর আলোড়ন সে আর কখনও অনুভব করে নাই।

লর্ড কার্জনের বিদায় গ্রহণের পর ১৯০৫ সালে লর্ড মিণ্টো ভারতের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাকে এমন এক সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইল যে, কার্যভার গ্রহণ করিবার কয়েক মাসের মধ্যেই মিঃ জন মর্লিকে তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন, 'কংগ্রেসের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে, যাহা রাজদ্রোহাত্মক, বিপজ্জনক হইবার ভাবী সম্ভাবনাও তাহার মধ্যে নিহিত; তাহা সত্ত্বেও আমার মনে হয়, কংগ্রেসকে আমাদের স্বীকার করিয়া লওয়া ও তদন্তর্গত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য।...........আমি কিছুদিন যাবৎ কংগ্রেস আদর্শের বিপক্ষে বিরুদ্ধ শক্তি সংস্থাপনের কথা গভীরভাবে চিন্তা করিতেছি। আমার মনে হয়, রাজন্যবর্গের পরিষদে অথবা ঐ আদর্শে গঠিত অপর কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বর্তমান সমস্যার প্রয়োজনীয় সমাধানের সন্ধান মিলিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—দেশীয় রাজন্যবর্গ ও তৎসহ আরও জনকয়েক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে লইয়া একটি প্রিভি কাউন্সিল গঠন করা হইল এবং বৎসরে একবার সপ্তাহ অথবা পক্ষকালের জন্য তাহার অধিবেশন আহবান করা হইতে থাকিল মনে করুন দিল্লীতে। আলোচ্য বিষয় এবং কার্যক্রম অতিশয় সতর্কতার সহিত রচনা করিতে হইবে এবং আমাদের উদ্দেশ্য হইবে কংগ্রেস আদর্শের ঠিক বিপরীত। ভারতের সুশাসনের সহিত যাঁহাদের স্বার্থ নিবিড়ভাবে জড়িত, তাঁহারাই হইবেন এই ভাবধারার উৎসমূল।' ৩

মিঃ মর্লি লর্ড মিণ্টোর পত্রের উত্তরে ৬ই জুন তারিখে লিখিয়া পাঠান, 'ভারতে এক নূতন চেতনার উদ্ভব ও প্রসার সম্বন্ধে সকলেই আমাদিগকে সতর্ক করিতেছেন। লরেন্স, চিরোল, সিডনী লো—সকলের কণ্ঠেই সেই একই সুর : 'সনাতন পদ্ধতিতে তোমরা আর ভারত শাসন করিতে পারিবে না: কংগ্রেস পার্টি ও তাহার নীতি সম্বন্ধে তোমরা যাহাই মনে কর না কেন, তাহার সহিত বোঝাপড়া তোমাদিগকে করিতেই হইবে। মুসলমানগণও যে অচিরে তোমাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইবে—ইহা ধ্রুব সত্য' ইত্যাদি আরও কত কি।'৪

বিশেষভাবে কংগ্রেসের ও সাধারণভাবে জাতীয়তাবোধের অভ্যুত্থানমাত্রেরই বিরুদ্ধে রাজন্য-পরিষদকে বিরোধী শক্তিরূপে সংস্থাপন করিবার পরিকল্পনা সে সময়ে সার্থক হইয়া উঠিল না বটে, কিন্তু তাহা হইতেও অধিক কার্যকরী একটি উপায় আবিষ্কৃত হইল। সপরিষদ লর্ড মিণ্টো এমন একটি শাসন-সংস্কারের খসড়া রচনায় মনোনিবেশ করিলেন, যাহা তাঁহাদের মতে ভারতের নরমপন্থী রাজনীতিকগণের সন্তোষ বিধান করিতে সমর্থ হইবে। এ সম্বন্ধে একদিকে

3. Lady Minto: 'India Minto and Morley', PP. 28-9,
4. Ibid., P. 30,

যেমন শাসন-সংস্কারের পরিকল্পনা রচনার কার্য চলিতে থাকিল, অপর দিকে তেমনি চেষ্টা চলিতে লাগিল মুসলমানগণকে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে বিযুক্ত করিবার চেষ্টা। মৌলবী সৈয়দ তুফাইল আহম্মদ মাঙ্গালোরী লিখিতেছেন, 'আলিগড়ের রইস্ হাজী মহম্মদ ইসমাইল খান সাহেব একজন সরকারী সেরেস্তায় অবাধ গতিবিধিসম্পন্ন ব্যক্তি; ১৯০৬ সালের ৩০শে জুলাই তারিখে নৈনীতাল হইতে আলিগড় কলেজের কর্মসচিব নবাব মশিন-উল্-মুল্‌ক বাহাদুরের নিকট তিনি এই মর্মে আবেদনপত্রের এক পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করেন যে, মুসলমানগণও তাহাদের স্বতন্ত্র দাবী উত্থাপন করিবে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, সমগ্র শিক্ষিত মুসলমান সমাজের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল এই পাণ্ডুলিপির প্রতি। আলিগড় কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মিঃ আর্চবোল্‌ড সে সময় দীর্ঘ অবকাশ উপলক্ষে সিমলায় ছিলেন। ঊর্ধ্বতন সরকারী কর্তৃপক্ষের সহিত সেখানে তাঁহার প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হইত। প্রস্তাবিত এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ সম্বন্ধে বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীর সহিত তাঁহার আলাপ-আলোচনা হয়। এই আলোচনার পর ১৯০৬ সালের ১০ই আগষ্ট তারিখে মিঃ আর্চবোল্‌ড নবাব মশিন-উল্-মুল্‌কের নিকট যে পত্র লিখিয়া পাঠান, তাহা মুদ্রিত করিয়া প্রতিনিধি দলের মধ্যে বিতরণ করিবার ব্যবস্থা হয়। উক্ত পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে যে, আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষগণই ছিলেন মুসলিম রাজনীতির নিয়ন্তা ও বস্তুতঃ আলিগড়ের গভর্ণমেণ্ট রেসিডেণ্ট। নিম্নে পত্রটির সারাংশ প্রদত্ত হইল। তাহার প্রত্যেকটি শব্দ সতর্কতার সহিত প্রণিধানযোগ্য।

'কর্ণেল ডানলপ্ স্মিথ (ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী) আমাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন, বড়লাট মুসলমান প্রতিনিধি দলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত, তবে সে সম্বন্ধে যথারীতি আবেদন করিতে হইবে। এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনাসাপেক্ষঃ—

"প্রথমতঃ দরখাস্ত প্রেরণ করিতে হইবে। আমার মতে, কয়েকজন মুসলমান নেতার (তাঁহারা নির্বাচিত না হইলেও চলিবে) স্বাক্ষর ইহাতে থাকা উচিত। দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন হইতেছে, এই প্রতিনিধি দলের সদস্য হইবেন কাহারা? প্রদেশসমূহের প্রতিনিধিরূপে তাঁহাদের আসা উচিত। তৃতীয় প্রশ্ন হইতেছে, সম্ভাষণের বক্তব্য বিষয় কি হইবে? এ বিষয়ে আমার অভিমত এই যে, রাজানুগত্য প্রকাশ করিতে হইবে এবং ভারতীয়গণের পক্ষে রাজসরকারে উচ্চপদ লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া, নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে হইবে। কিন্তু নির্বাচন-প্রথার প্রবর্তনের ফলে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থহানি ঘটিবে এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করা কর্তব্য; সঙ্গে সঙ্গে এ আশাও প্রকাশ করিতে হইবে যে, নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তন করিবার কালে অথবা ধর্মগত ভিত্তিতে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করিবার সময় মুসলমান সম্প্রদায়ের মতামতের উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব অবশ্যই অর্পণ করা হইবে। ভারতের ন্যায় দেশে জমিদারগণের মতামতের উপরেও গুরুত্ব আরোপ করা যে প্রয়োজন—এ অভিমতও প্রকাশ করা কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি।

"আমার ব্যক্তিগত অভিমতের কথা বলিতে হইলে আমি বলিব, মনোনয়ন-প্রথা সমর্থন করাই মুসলমানদের কর্তব্য এই কারণে যে, নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তনের সময় এখনও আসে নাই। তাহা ছাড়া নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তিত হইলে, তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ হিসাবমত বুঝিয়া পাওয়া তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে।

"কিন্তু সমস্ত ব্যাপারে আমি থাকিব নেপথ্যে এবং যাহা কিছু করণীয়, তাহা আপনারাই মুখপাত্ররূপে করিবেন। মুসলমানদের কল্যাণের জন্য আমি কি পরিমাণ ব্যগ্র তাহা আপনারা জানেন এবং সেই আন্তরিক আগ্রহের বশেই সানন্দে সকল প্রকারে সাহায্য করিতে আমি প্রস্তুত। আপনাদের পক্ষ হইতে আমি সম্বর্ধনার খসড়া প্রস্তুত করিয়া দিতে রাজি আছি। যদি বোম্বাইয়ে ইহা রচিত হয়, তাহা হইলেও আমি তাহা দেখিয়া-শুনিয়া দিতে পারি, কারণ ভাষাগত সৌষ্ঠবের সহিত আবেদন রচনার কৌশল আমার জানা আছে। কিন্তু নবাব সাহেব! একথা স্মরণ রাখিবেন যে, স্বল্প সময়ের মধ্যে যদি কোন বৃহৎ ও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চান, তাহা হইলে সে বিষয়ে আপনাদিগকে ত্বরান্বিত হইতে হইবে।" ৫

লেডী মিণ্টোর ভাষায় বলিতে গেলে, নবাব মহসিন-উল্-মুল্‌ক তদনুযায়ী মুসলমান প্রতিনিধিদল গঠন কার্য 'সুকৌশলে সম্পন্ন করিলেন'। ৬ সম্ভাষণপত্র রচিত হইল এবং ১৯০৬ সালের পয়লা অক্টোবর তারিখে মহামান্য আগা খাঁর নেতৃত্বে মুসলমান প্রতিনিধিদল বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। লেডী মিণ্টো তাঁহার পত্রিকার উক্ত তারিখের সংখ্যায় লিখিতেছেনঃ—

"আজিকার দিনটি বিশেষ ঘটনাপূর্ণঃ কে যেন আমাকে বলিতেছিলেন, 'অদ্যকার দিন ভারতীয় ইতিহাসে এক যুগ-পরিবর্তন সূচনা করে।' আমরা জানি, ভারতব্যাপী অশান্তির কথা; জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের কথাও আমরা অবগত আছি। ভারতের ছয় কোটী কুড়ি লক্ষ মুসলমান রাজার প্রতি চিরদিন একান্ত আনুগত্যসম্পন্ন; যথারীতি প্রতিনিধিত্ব না পাওয়ার দরুণ তাহারাও আজ ক্ষুব্ধ ঃ তাহাদের অভিযোগ, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া হিন্দুদিগকে অধিকতর সুখ-সুবিধা দেওয়া হইয়া থাকে। আন্দোলনকারিগণ এই অসন্তোষ সযত্নে পোষণ করিয়া থাকেন এবং ইহা সম্বল করিয়াই বিরাট মুসলমান সমাজের সহযোগিতা অর্জনে সচেষ্ট হন। যুবকগণ তখনও অব্যবস্থিতচিত্ত, কংগ্রেস আন্দোলনকারীদের সহিত মিলিত হইবার দিকেই তাহাদের মন অধিকতর অভিমুখী। এই অবস্থায় তাহাদের পক্ষ হইতে ধ্বনি উঠিল, রাজানুগত মুসলমানদিগকে সমর্থন করা হইবে না; আন্দোলনের সাহায্যেই আন্দোলনকারিগণকে দাবী পূরণের জন্য যত্নবান হইতে হইবে। মুসলমানগণ স্থির করিলেন, কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পূর্বে তাঁহারা তাঁহাদের অভিযোগসমূহ সম্ভাষণপত্র আকারে বড়লাটের নিকট উপস্থাপিত করিবেন। অদ্য সাক্ষাতের দিন ধার্য হইয়াছে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে

---

5. M. Tufail Ahamad: Roshan Mustaqbal, PP. 360-61.
6. Minto, op. cit., 56

প্রায় পঁচাত্তর জন প্রতিনিধি আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। অদ্য বল্-রুমে সাক্ষাৎ-পর্ব সমাধা হইল। সভার আলোচনা শুনিবার জন্য আমি আমার কন্যাগণসহ পার্শ্ববর্তী দরজা দিয়া বল্-রুমে প্রবেশ করিলাম, এমন সময় সপারিষদ মিণ্টো আসিয়া মঞ্চের উপর আসন গ্রহণ করিলেন। আগা খাঁ খোজা সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। তিনি নিজেকে আলির বংশধর বলিয়া দাবী করেন এবং সেই অধিকারবলেই তিনি উক্ত সম্প্রদায়ের রাজ্যহীন রাজা। সম্ভাষণ পাঠ করিবার জন্য নির্বাচিত হইলেন *এই আগা খাঁ। মুসলমান সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অভাব-অভিযোগের বিস্তৃত বিবরণসহ সম্ভাষণ-পত্রখানি দীর্ঘ হইলেও বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছিল।* অতঃপর মিণ্টো তাহার প্রত্যুত্তরে তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন; 'ইউরোপীয় আদর্শের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান যে এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন এবং তাহার প্রবর্তন যে সবিশেষ সতর্কতা ও বিচার-বিবেচনাসাপেক্ষ—একথা বলিবার জন্য আমার নিকট আপনাদের মার্জনা চাহিবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রাচ্য জাতিসমূহের পুরুষানুক্রমে অর্জিত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মধ্যে প্রতীচ্যের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রবর্তন আমি আদৌ কামনা করি না। আপনাদের সম্ভাষণ পাঠে আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহা হইতে মনে হয়, আপনারা এই কথাই বলিতে চান যে, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড, আইন-পরিষদ অথবা প্রতিনিধিমূলক যে কোন প্রতিষ্ঠান প্রবর্তিত বা প্রসারিত করিতে হইলে, মুসলমানগণ সেখানে সম্প্রদায় হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করিবেন। আপনারা ইহাও দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে যেভাবে গঠিত, তাহাতে মুসলমান নির্বাচন প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচিত হওয়া দুষ্কর এবং কোন ক্ষেত্রে দৈবাৎ যদি কেহ হনই, তাহা হইলেও সেই নির্বাচিত মুসলমান সদস্য আপন সম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী এমন এক সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের নিকট স্বমত বলি দিতে বাধ্য হইবেন, যাঁহারা কোন ক্রমেই তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবী করিতে পারেন না। আপনাদিগকে কেবলমাত্র জনসংখ্যার দিক দিয়া বিচার না করিয়া, আপনাদের সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক মতামতের গুরুত্ব ও সাম্রাজ্যের কল্যাণে আপনাদের সেবার পরিমাণের কথা বিবেচনা করিবার জন্য আপনারা যে দাবী জানাইয়াছেন, তাহার ন্যায্যতা আমি স্বীকার করি এবং সে বিষয়ে আপনাদের সহিত আমি একমত। আপনাদের মত আমিও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এখানকার নির্বাচকমণ্ডলী যে সমস্ত সম্প্রদায় লইয়া গঠিত, তাঁহাদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ভোটাধিকার দান করিতে গেলে, সেই প্রতিনিধিমূলক অনিষ্টকর নির্বাচনপদ্ধতি ব্যর্থ হইতে বাধ্য'।"৭

সেইদিনেই লেডী মিণ্টো তাঁহার পত্রিকায় আরও লিখিতেছেন, 'আজ সন্ধ্যাবেলায় জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি পাইলাম : 'মাত্র কয়েকটি ছত্র লিখিয়া আজ আপনাকে জানাইতে চাই যে, অদ্য একটি বিরাট ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটি হইল এমন একটি রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—যাহা বহু বৎসর পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসকে প্রভাবিত করিবে।

7. Minto, op. cit., PP. 45-7.

ছয় কোটি কুড়ি লক্ষ লোককে বিদ্রোহী ও বিরুদ্ধপন্থী দলের প্রভাব হইতে টানিয়া বাহির করা হইয়াছে—ইহাই হইল সদ্য সংঘটিত ঘটনাটির সার কথা।' এ সম্পর্কে হোয়াইট হলের মনোভাবও প্রায় অনুরূপ। সভার কার্যবিবরণী পাইবার পর মিঃ মর্লি লেখেন : মর্লির নিকট হইতে মিণ্টোর কাছে '২৬শে অক্টোবর—মুসলমানদের সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতিশয় কৌতূহলপ্রদ; আমার দুঃখ হইতেছে যে, আপনার উদ্যানভোজে অদৃশ্য রহিয়া আশেপাশে বিচরণ করিয়া ফিরিতে পারি নাই। সমস্ত ব্যাপারটি নিখুঁতভাবে সম্পাদিত হইয়াছে এবং তাহার উপর আপনার পদমর্যাদা ও ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের ছাপ সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত। আপনার বক্তৃতার অন্যান্য বহু সুফলের মধ্যে অন্যতম হইল ইহাই যে, তাহার আঘাতে এখানকার সমালোচনাপন্থীদের সমগ্র কার্যক্রম ও কলা-কৌশল একেবারে বানচাল হইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ, ভারতীয় সমস্যাকে ভারত গভর্ণমেণ্ট বনাম ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিরোধরূপে চিত্রিত করা অতঃপর তাহাদের পক্ষে আর সম্ভব হইবে না। আমি আশা করি,উৎকটতম উদারপন্থীও এখন উপলব্ধি করিবেন যে, সমস্যাটা যত সহজ বলিয়া মনে হইয়াছিল বস্তুতঃ উহা তত সরল নয়'।" ৮

লর্ড মিণ্টোর জীবনী-লেখক বুকান বলেন, "বক্তৃতার ফলে মুসলমানগণের দলভুক্তির দরুণ রাজদ্রোহীদের সংখ্যাবৃদ্ধির পথ যে রুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; আসন্ন গোলযোগের সময়ে ইহা হইতে অশেষ সুবিধা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।" ৯ ইহাকে তিনি মুসলিম স্বার্থের সনদরূপে বর্ণিত করিয়াছেন।

মৌলবী তুফাইল আহম্মদ লিখিয়াছেন, বিলাতী সংবাদপত্রসমূহে ব্যাপারটি যাহাতে বহুলভাবে প্রচারিত হয়, সে ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। বড়লাটের সহিত প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ হইবার কথা ছিল ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে এবং সেই দিনেই মুসলমানগণের বিচক্ষণতার প্রশংসাসূচক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ 'লণ্ডন টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিত হয়, মুসলমান ইউরোপীয় আদর্শের প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্রের পক্ষপাতী কোনদিনই ছিলেন না, কারণ ইংলণ্ডের মত জাতি বলিতে কোন কিছুর অস্তিত্ব ভারতে নাই, তাহা ছাড়া বহু ধর্মের প্রচলন সেখানে বিদ্যমান—ইত্যাদি, ইত্যাদি। অন্যান্য পত্রিকাতেও অনুরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'এই সমস্ত প্রবন্ধ হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, ভারতের এক-জাতিত্বের বিরুদ্ধে বিলাতী পত্রিকাসমূহ কিরূপ উৎকট উষ্মা ও অন্তর্দাহ পোষণ করিত, তাহা ভগ্ন ও খণ্ডিত হইতে দেখিলে তাহারা কিরূপ সন্তোষলাভ করিত এবং ধর্মকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদের একটিকে অপরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া চিরস্থায়ী ভেদ-বিরোধ জাগাইয়া রাখিতে পারিলে তাহারা কিরূপ গর্ববোধ করিত।' ১০ এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে কিছু সময় লাগিয়াছিল এবং বড়লাট ও ভারতসচিবের মধ্যে বহু পত্র-বিনিময়ের পর পরিশেষে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী স্থাপনের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়।

---

8. Minto, Op. Cit. PP. 47-8.
9. Buchan: Lord Minto, P. 244, quoted by G. N. Singh, Op. Cit.
10. M. Tufail Ahamad, Op. Cit. P. 363.

(বারো)

মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ও লক্ষ্ণৌ চুক্তি

বড়লাটের সহিত মুসলিম প্রতিনিধিদলের সাক্ষাতের পরই নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯০৬ সালের ৯ই নভেম্বর তারিখে নবাব সলিমুল্লা সাহেব এই মর্মে এক ইস্তাহার জারি করিলেন যে, 'অল্ ইণ্ডিয়া মুসলিম কন্‌ফিডারেসী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা কর্তব্য। তদনুযায়ী পরবর্তী ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় এক সম্মেলন আহূত হইল এবং উক্ত সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু প্রতিনিধি ও নেতা সমবেত হইলেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করিলেন নবাব ওয়াকার-উল্-মুল্‌ক এবং সেইখানেই মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন হইল। নবাব ওয়াকার-উল্-মুল্‌ক তাহার সম্পাদক ও নবাব মশিন-উল্-মুলক তাহার সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সহ-সম্পাদকের মৃত্যু হয়। গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে একটির দ্বারা বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ব্যবস্থার সমর্থন ও বয়কট আন্দোলনের বিরোধিতা জ্ঞাপন করা হয়। লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকা সদ্যপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের উদ্দেশে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়া পাঠান। বিস্ময়ের ব্যাপার হইতেছে এই যে, হিন্দু মহাসভাও প্রতিষ্ঠিত হয় সেই একই বৎসরে। মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার 'Awakening of India' নামক গ্রন্থে এ ব্যাপারে সরকারী কর্মচারিগণের কৃতিত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য করেন : 'মুসলমান নেতৃবর্গ কতকগুলি ইঙ্গ-ভারতীয় রাজকর্মচারীর নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। এই কর্মচারিগণই লণ্ডন ও সিমলা হইতে সঙ্গোপনে পুতুল-নাচের দড়ি টানিয়াছেন এবং মুসলমানদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়া হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অভিসন্ধিপূর্ণ বিদ্বেষ ও বিভেদের বীজ বপন করিয়াছেন।'[1] স্বতন্ত্র-নির্বাচন-প্রথার ফলে ব্যবধান কেবলমাত্র সৃষ্টই হয় নাই, ক্রমশঃ বিস্তৃতও হইয়াছিল।

এখন হইতে বৎসরে বৎসরে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন আহূত হইতে থাকিল; তাহাতে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের উদ্দেশ্য হইল, বঙ্গ-ভঙ্গ ব্যবস্থা সমর্থন করা, আইন-পরিষদে ও অন্যান্য গণ-প্রতিষ্ঠানে পৃথক-নির্বাচন দাবী করা ও সরকারী চাকুরী ছাড়াও প্রিভিকাউন্সিলে পর্যন্ত স্বতন্ত্র মুসলমান প্রতিনিধিত্বের অধিকার অর্জন করা। ১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসে আহূত লাহোর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মহামান্য আগা খাঁ। প্রবর্তিত শাসন সংস্কারের জন্য সভাপতির অভিভাষণে সন্তোষ প্রকাশ করা হইলেও, মাননীয় আগা খাঁ শ্রোতৃবর্গকে সতর্ক করিয়া দেন, মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে যেন

1. Quoted by Mehta and Patwardhan: The Communal Triangle, P. 66.

ইহার বিরোধিতা করা না হয়, কারণ সে ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট হয়তো তাহা প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারেন। এই সময়ে এমন এক ঘটনা সংঘটিত হয়, যাহা তৎকালীন সরকারী নীতির উপর প্রচুর পরিমাণে আলোকপাত করে। স্মরণ থাকিতে পারে, স্যার এনথনী ম্যাকডোনাল্ডের শাসনকালে আলিগড় কলেজের তদানীন্তন কর্ম-সচিব নবাব মশিন-উল্-মুল্‌ক তৎকালীন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণরের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া হিন্দী, উর্দু বিতর্ক পরিহার করিতে ও 'আঞ্জুমান-হিমায়াত-উর্দু' নামক প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এই অজুহাতে যে, কলেজের কর্মসচিবের পক্ষে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকা নিষিদ্ধ। এমন কি, লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর এরূপ আদেশ দিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই যে, নিজাম সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নবাব উপাধি তিনি সরকারী চিঠি-পত্রের আদান-প্রদানে ব্যবহার করিতে পারিবেন না। অবশ্য মুসলিম প্রতিনিধিদল গঠনের পক্ষে তাঁহার গোপন কর্মতৎপরতা অথবা আলীগড় কলেজের কর্মাধ্যক্ষ থাকা কালেই মুসলিম লীগের যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হইবার বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের লেশমাত্র প্রতিবাদ ছিল না। যে ঢাকা সম্মেলনে মুসলিম লীগের স্থাপনা হয়, নবাব ওয়াকার-উল-মুল্‌ক তাহার সভাপতিত্ব করেন; শুধু তাহাই নয়, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তাহা সত্ত্বেও নবাব মশিন-উল্-মুল্‌কের মৃত্যুর পর তাঁহার আলীগড় কলেজের কর্মসচিব নিযুক্ত হইবার পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হয় নাই। অতঃপর মুসলিম লীগের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হইল আলীগড়ে এবং ১৯১০ সাল পর্যন্ত তাহা সেই স্থানেই অবস্থিত রহিল। নবাব ওয়াকার-উল্-মুল্‌কও এতাবৎকাল মুসলিম লীগ রাজনীতির সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত রহিলেন। এই সময়ে নবাব ওয়াকার-উল্-মুল্‌ক ও আলীগড় কলেজের ইংরাজ-অধ্যক্ষের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মতানৈক্য প্রকট হইয়া উঠে। এই বিরোধে গভর্ণর অধ্যক্ষের পক্ষ অবলম্বন করেন। অপর দিকে নবাব ওয়াকার-উল্-মুল্‌কের পক্ষ সমর্থন করিয়া মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রবল আন্দোলন জাগিয়া উঠে। তাহার ফলে লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিয়া লইলেন বটে, কিন্তু পরাজয় স্বীকার করিলেন না। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার সুযোগ অচিরে আসিল। মুসলিম লীগের তদানীন্তন সভাপতি মাননীয় আগা খাঁ মুসলিম লীগের প্রধান কর্মকেন্দ্র আলীগড় হইতে লক্ষ্ণৌএ স্থানান্তরিত করিলেন এবং তাহার অপ্রত্যাশিত ফল হইল, আলীগড় কলেজের অধ্যক্ষগণের কবল হইতে মুসলিম লীগ রাজনীতির মুক্তিলাভ।

১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত দিল্লীর দরবারে বঙ্গ-ভঙ্গ আইন রদ করিয়া এক রাজকীয় ঘোষণা প্রচারিত হয়। ইহাতে অনেক মুসলমানই নিদারুণভাবে বিচলিত হন; বিশেষ করিয়া নবাব সলিমুল্লা সাহেব এমন গভীরভাবে মর্মাহত হন যে, ১৯১২ সালে মুসলিম লীগের কলিকাতা অধিবেশনের সভাপতি-রূপে অতঃপর সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা হইতে অবসর গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আরও অন্যান্য এমন অনেক ঘটনা ঘটিতেছিল যাহার দ্বারা মুসলমানগণ

প্রভাবিত না হইয়া পারেন নাই। মৌলবী শিবলি নৌমানি তৎকালীন উচ্চতম শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমানগণের মধ্যে অন্যতমরূপে পরিগণিত। তাঁহার প্রণীত ধর্মগুরু মহম্মদের জীবনী উর্দু সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে গণ্য; সৈয়দ আহম্মদ খাঁর জীবনীর রচয়িতাও তিনি। তাঁহার মৃত্যুর পর আজমগড়ের যে পুস্তক প্রকাশালয় হইতে মৌলবী সুলেমান নাদ্‌ভীর পরিচালনাধীনে অমূল্য ঐতিহাসিক গ্রন্থরাজি প্রকাশিত হইত, তিনিই ছিলেন তাহার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি স্যার সৈয়দ আহম্মদের আজীবন সহকর্মী ছিলেন সত্য, কিন্তু জীবনের শেষদিকে স্যার সৈয়দের নীতির যৌক্তিকতা ও কংগ্রেসের প্রতি তাঁহার মনোভাবের সার্থকতা সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত হইয়া পড়েন। ভারতীয় স্বাধীনতার মূল প্রশ্নের দিকে তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন এবং বলিতেন, কেবলমাত্র কংগ্রেসের সমালোচকের ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিয়া নিরস্ত থাকা অর্থহীন। ১৯১৭ সালের ৯ই অক্টোবর তারিখের 'মুসলিম গেজেটের' এক সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে তিনি লেখেন, 'বৃক্ষের বিচার নির্ভর করে তাহার প্রদত্ত ফলের উপর। আমাদের রাজনীতির মধ্যে যদি আন্তরিকতা থাকিত, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে তাহা জাগাইয়া তুলিত সংগ্রামের স্পৃহা এবং আদর্শের জন্য আত্মদানের ও দুঃখবরণের প্রস্তুতি।' ২

অন্যান্য ঘটনার প্রভাবও মুসলমানগণের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। 'নূতন শাসন-সংস্কার অনুযায়ী গঠিত আইন-পরিষদসমূহের কার্যাবলীর মধ্যে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থগত সামঞ্জস্য ও নিখিল ভারতীয় ঐক্যের আভাস ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল, সর্বোপরি দূরবর্তী অন্যান্য দেশসমূহের বিশেষ করিয়া তুরস্ক ও পারস্যের জাতীয় আন্দোলন ভারতের মুসলিম যুব-চিত্তে জাতীয়ভাবের উদ্দীপনা আনিয়া দিয়াছিল। ত্রিপোলি ও বল্‌কান যুদ্ধে তুরস্ক সম্বন্ধে অনুসৃত বৃটিশনীতি বৃটেনের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয় ও তাহার বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতির অসারতা ও অগভীরতা মুসলমানদের চক্ষে সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে তুরস্কের প্রতি ইউরোপীয় শক্তিবর্গের দুর্ব্যবহারের ফলে ভারতীয় মুসলমানগণের মনে যে আঘাত লাগে, এ দেশের জাতীয় সংবাদপত্রসমূহ তাহার জন্য সমবেদনায় ব্যাকুল হইয়া উঠে; ভ্রাতৃসুলভ এই সহানুভূতি মুসলমানদের অন্তর স্পর্শ না করিয়া পারে নাই।' ৩ ১৯১২ সালে ডাক্তার এম্. এ. আনসারি একটী মেডিক্যাল মিশন সহ তুরস্ক যাত্রা করেন। 'জমিদার' পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা জাফরালি তুরস্কের রেড্-ক্রিসেন্টের সাহায্যার্থে সংগৃহীত অর্থ লইয়া কনষ্টান্টিনোপ্‌লের ওয়াজিরের হাতে উপঢৌকন দিবার জন্য স্বয়ং তুরস্ক অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক 'আল্-হিলাল' পত্রিকা প্রকাশিত হয় এই সময়ে; তাহার অনুপ্রাণনামূলক

2. Tufail Ahamad : Roshan Mushtaqbal, P. 389; and Mehta and Patwardhan, Op. Cit. P. 30.
3. Gurumukh Nihal Sing : 'Landmarks in Constitutional and National Development', Pp. 490-1.

লিখিবার ভঙ্গী এবং জাতীয়তাবোধ, স্বাধীনতা ও আত্মত্যাগের সুমহান আদর্শ সাধারণের চিত্তে যে সংবেদন সৃষ্টি করিল, কোন উর্দু পত্রিকার পক্ষে ইতিপূর্বে তাহা করা সম্ভব হয় নাই। তখন মৌলানা মহম্মদ আলির সম্পাদনায় ইংরাজি পত্রিকা 'কম্‌রেড' ও উর্দু পত্রিকা 'হামদাদ' প্রকাশিত হইতেছে; পত্রিকা দুইটি জাতীয়তাবোধের বন্যাপ্রবাহে বিপুলতর বেগ সঞ্চার করে। এই সকল ঘটনার দ্বারা লীগ প্রভাবিত না হইয়া পারিল না, ফলে স্যার ইব্রাহিম রহিমুতুল্লার সভাপতিত্বে ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত লাহোর অধিবেশনে তাহার গঠনতন্ত্র সংশোধিত হয়। লীগের লক্ষ্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আরও অন্যান্য নানা বিষয়ের সহিত নিম্নলিখিত সর্তগুলিও সংশোধনী প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ হয়ঃ ভারতীয়গণের চিত্তে জাতীয় ঐক্যবোধ ও জনসেবার বৃত্তি জাগরিত করিয়া, বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার ক্রমিক সংশোধন দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এমন এক স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহা ভারতীয় অবস্থার অনুকূল; এতদুদ্দেশ্যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহযোগিতা অর্জন কর্তব্য হইবে। এইরূপে লীগের লক্ষ্য কংগ্রেস আদর্শের সহিত সমভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল; ফলে মিলিত কর্মপন্থা অচিরে সেই পথ বাহিয়া আসিয়া উপনীত হইল।

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল ১৯১৪ সালে। ভারতীয় গণচিত্ত প্রবল উত্তেজনায় উদ্বেল হইয়া উঠিল। এই সময়ে স্বাধীন ভারতীয় গণতন্ত্র গঠনের উদ্দেশ্যে যে দুঃসাহসিক পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়, তাহার রচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেন মুসলমানগণ। মৌলানা হুসেন আহম্মদ নাদভী ও মৌলবী আজিজ গুল্ নামক দুইজন বিশ্বস্ত সহকর্মী সহ শেখুল-হিন্দ্ মৌলানা মহম্মদুলহাসান সাহেব ধৃত ও মাল্‌টায় অন্তরীণ হইলেন। মৌলানা মহম্মদ আলি, শৌকত আলি, মৌলানা আজাদ ও হজরত মোহানী প্রভৃতি সকলেই মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানকারী তুরস্কের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করিবার ও জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিবার অপরাধে অন্তরীণ হইলেন। ১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে লীগ এবং কংগ্রেস উভয় প্রতিষ্ঠানেরই অধিবেশন আহূত হইল বোম্বাইয়ে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেসনেতৃবর্গ লীগের বোম্বাই অধিবেশনে যোগদান করেন। মহামান্য আগা খাঁ এই অধিবেশনেই তাঁহার স্থায়ী সভাপতির পদে ইস্তফা দেন। কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতায় ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জন্য লীগ একটি কমিটি নিযুক্ত করিলেন। লক্ষ্ণৌয়ে একই সময়ে ও একই স্থানে কংগ্রেস এবং লীগের বার্ষিক অধিবেশন আবার আহূত হইল। লীগ কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি বোম্বাই ও লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের মধ্যবর্তীকালে প্রস্তাবিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের মধ্যে প্রায় নয় বৎসর পূর্বে সুরাটে যে ব্যবধান সৃষ্ট হয়, তাহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবার ফলে কংগ্রেস অধিকতর শক্তিশালী হইলঃ স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, এমনকি, বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমুখ নরমপন্থী দলের নেতৃবর্গ

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে আসিয়া যোগদান করিলেন। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের ফলে মুসলমানদের পৃথক-নির্বাচনের দাবী মানিয়া লওয়া হইল এবং পাঞ্জাব ও বাংগলা ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রদেশে তাঁহাদের জনসংখ্যার আনুপাতিক হার অপেক্ষা অনেক অধিক আসন তাঁহাদের জন্য নির্দিষ্ট হইল। ইহাও সাব্যস্ত হইল যে, প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় যে কোন পরিষদের কোন বে-সরকারী সদস্য যদি উভয় সম্প্রদায়ের যে কোন একটির স্বার্থ-সম্পর্কিত কোন বিল আনয়ন করেন এবং উক্ত পরিষদের সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য যদি উক্ত বিলের অথবা তদন্তর্গত কোন ধারা বিশেষের বিরোধিতা করেন, তাহা হইলে তাহা পরিত্যক্ত হইবে। এই চুক্তি ব্যতীত, শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার একটি বিস্তৃত খসড়াও রচিত হইল এবং তদ্দ্বারা দাবী করা হইল, পরিকল্পনানুযায়ী স্বায়ত্ত শাসন সম্বলিত শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করিবার জন্য নিশ্চিত ব্যবস্থা অবিলম্বে অবলম্বন করা হোক এবং ভারতকে তাহার বর্তমান অধীন অবস্থা হইতে উত্তোলন করিয়া সাম্রাজ্যিক পুনর্গঠনে স্বায়ত্তশাসনশীল অন্যান্য উপনিবেশসমূহের সহিত সমমর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হোক। লীগের এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন মিঃ এম, এ, জিন্না এবং লোকমান্য তিলক প্রভৃতি কংগ্রেসপক্ষীয় নেতৃবৃন্দ সম্পাদিত চুক্তি অনুমোদন করিলেন। অধিবেশনের অন্যান্য প্রস্তাবও কংগ্রেসের আদর্শ অনুসরণেই রচিত হয় এবং মনে হয়, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে বুঝি বা একটা ঘনিষ্ঠ সংগতি স্থাপিত হইল।

এইরূপে মুসলিম লীগ্ হইয়া উঠিল কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থার উৎসাহী সমর্থক। এই নব চেতনার প্রথম সঞ্চার পরিস্ফুট হইয়া উঠিল পরবর্তী অধিবেশনেঃ মৌলানা মহম্মদ আলি অন্তরীণে আবদ্ধ থাকাকালেই সে অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। পূর্ববর্তী দুইটি অধিবেশনের মত বর্তমান অধিবেশনও কংগ্রেসের সহিত একই স্থানে ও একই সময়ে কলিকাতায় আহূত হইল ১৯১৭ সালে। মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু লীগ অধিবেশনে যোগদান করিয়া আলি-ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তিদাবীর অনুকূলে উত্থাপিত প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

(তেরো)

খিলাফত আন্দোলন ও তাহার পর

১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস ও লীগের পরবর্তী অধিবেশন বসিল দিল্লীতে। ইতিমধ্যে এদেশে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। মিঃ মণ্টেগু ভারত পরিদর্শনে আসিয়াছেন এবং ১৯১৭ সালের আগষ্ট মাসে ঘোষিত বৃটিশ নীতি অনুযায়ী তদানীন্তন বড়লাট লর্ড চেমস্ফোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্বন্ধীয় বিবৃতি প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন। যুদ্ধে মিত্রশক্তিবর্গ জয়লাভ করিয়াছেন এবং জার্মাণী ও

তুর্কী পরাজিত হইয়াছে। তুর্কীর পরাজয়ের ফলে এমন কতগুলি সমস্যা মাথা চাড়া দিয়া উঠিল যাহাদের সহিত ভারতীয় মুসলমানগণের স্বার্থ নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। যুদ্ধ চলিতে থাকাকালে বৃটিশের মুখপাত্রস্থানীয় ব্যক্তিগণ আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ শেষ হইলে তুরস্কের প্রতি সুবিচার করা হইবে এবং এমন কিছুই করা হইবে না যাহার দ্বারা আরব ও মেসোপোটেমিয়ার মুসলিম পবিত্র স্থানগুলির মর্যাদা অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। তুরস্কের উপর যে সকল সর্ত আরোপিত হইবে তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে সঠিক কোন ধারণা না থাকিলেও আরবে সংঘটিত ঘটনাপরম্পরায় ভারতীয় মুসলমানদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিল; বৃটিশের দ্বারা প্ররোচিত হইয়াই আরবের মুসলমানগণ তুর্কীর অধিকার হইতে মুক্তি পাইবার দাবীতে আন্দোলন আরম্ভ করিল। ইহা ছাড়াও, কঠোর হস্তে কাণপুরের উপদ্রব দমন, লীগের দিল্লী অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে ডাক্তার এম, এ, আন্সারির অভিভাষণ বাজেয়াপ্ত করা প্রভৃতি ঘটনার আঘাতে মুসলিম-গণচিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ফলে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে উলেমাগণ পুনরাবির্ভূত হইলেন এবং রাজনীতিক আন্দোলন পরিচালনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। লীগ ভারতের পক্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করিল।

খলিফা, তাঁহার রাজ্য ও রাজাধিকার সম্বন্ধে বৃটিশের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সন্ধিপত্রের সর্তাবলির দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল। খিলাফত-প্রভুত্ব খর্ব হইবার ফলে ইসলামের পবিত্র স্থানগুলি অমুসলমান অধিকারে আসিয়া পড়িল। ভারতের খিলাফত আন্দোলন গড়িয়া উঠিল মিত্রশক্তিবর্গের—বিশেষ করিয়া বৃটিশের কার্যের প্রতিবাদে ও খলিফার সমর্থনে। মহাত্মা গান্ধীর নায়কতায় হিন্দুগণ খিলাফত আন্দোলনের সাহায্যকল্পে সর্বান্তঃকরণে অগ্রসর হইয়া আসিল। বৃটিশের তুরস্ক-বিরোধী নীতির ফলে, এমনকি, মিঃ মণ্টেগু পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন এবং বড়লাট লর্ড রিডিং তারযোগে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌ল পরিত্যাগ করিতে, পবিত্র স্থানসমূহের উপর খলিফার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে ও অটোমান সাম্রাজ্যভুক্ত থ্রেস ও স্মার্ণা প্রত্যর্পণ করিতে। আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকাকালে এই টেলিগ্রামটি প্রকাশিত হইয়া যায় এবং তাহার ফলে মিঃ মণ্টেগু পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এদিকে ভারতীয় মনোভাব উত্তরোত্তর তিক্ততর হইয়াই চলিল; সমগ্র ব্যাপারটির উপর নিগূঢ় মনোযোগ নিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি খোলা হইল এবং তাহার শাখা সংস্থাপিত হইল সমগ্র দেশ জুড়িয়া। মৌলানা মহম্মদুল হাসান শেখুল-হিন্দের নেতৃত্বে জমিয়ত-উল-উলেমা-ই-হিন্দ্ প্রতিষ্ঠিত হইল। খিলাফতের অনুকূলে ভারতীয় মুসলমানগণের সমর্থনের শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষকে সচেতন করিবার জন্য একটি প্রতিনিধিদল ইংলণ্ডে প্রেরিত হইলঃ তাহার উদ্দেশ্য হইল, এমন কোন কাজ করা হইতে বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করা—যাহার দ্বারা খিলাফতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ ও অধিকার খণ্ডিত করা হইবে এবং তাহার ফলে ইসলামের পবিত্র স্থানগুলি রক্ষা করিবার মত সামর্থ্য পর্যন্ত তাঁহার থাকিবে না। প্রতিনিধিদলের

ব্যর্থতা ও সন্ধিসর্তের আলোচনার ধারা নির্ভুলভাবে প্রমাণ করিয়া দিল যে, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের পূর্বপ্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও ভারতীয় মুসলমানগণের মনোভাব সমভাবে উপেক্ষা করিয়া তুরস্কের উপর কঠোর সন্ধিসর্ত আরোপ করিতে বদ্ধপরিকর। তাহার ফলে দেশব্যাপী আলোড়ন অপরিহার্য হইয়া উঠিল। খিলাফত কন্‌ফারেন্স ও জমিয়ত-উল-উলেমা-ই-হিন্দ্ এখন হইতে কয়েক বৎসরের জন্য মুসলমানগণের সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ও শক্তিশালী সংগঠনরূপে তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে থাকিল। কংগ্রেসের সহিত একই স্থানে ও একই সময়ে লীগের অধিবেশন পাশাপাশি বসিত এবং সে সকল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতেন হাকিম আজমল খাঁ, ডাক্তার এম, এ, আন্‌সারি ও মৌলানা হজরত মোহানী প্রমুখ শ্রেষ্ঠতম প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ।

খিলাফত আন্দোলন অচিরে 'রাওলাট বিল' বিরোধী আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইয়া পড়িল। এই বিল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহা বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে সমগ্র দেশে সম্প্রদায় নির্বিশেষে ইহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, স্যার সিড্‌নী রাওলাটের সভাপতিত্বে যে 'সিডিস্যান কমিটির' বৈঠক বসে, এই বিলটি তাহারই সুপারিশের ফল। যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যাইবার ফলে ভারতরক্ষা বিধানের যে ক্ষতিকর ধারাগুলি বাতিল হইয়া যাইবার প্রয়োজন দেখা দেয়, সংক্ষিপ্ত ও সংশোধিত আকারে সেগুলিকে চালু রাখাই হইল বিলটির উদ্দেশ্য। ইহার ফলে দেশব্যাপী এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয়; এমনকি, পাঞ্জাব, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা পর্যন্ত ঘটিয়া গেল। দমন-ব্যবস্থা কঠোরতর আকারে অবলম্বিত হইল এবং পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি হওয়ার ফলে অমৃতসরে যে শোচনীয় দুর্ঘটনা সংঘটিত হইল, ইতিহাসে তাহাই জালিয়ানওয়ালা-বাগ হত্যাকাণ্ড নামে কুখ্যাত। সামরিক আইন দ্বারা অনুষ্ঠিত এই অত্যাচার-কাহিনী অনুষ্ঠানের বহুদিন পরে জনসাধারণের গোচরে আসে; বিশেষ করিয়া, লর্ড হাণ্টারের সভাপতিত্বে গঠিত সরকারী তদন্ত কমিটি যখন এ ব্যাপারে ব্যাপৃত, তখনই জনসাধারণ তাহা অবগত হইবার সুযোগ পায়। কংগ্রেসের পক্ষ হইতেও স্বতন্ত্র তদন্ত কমিটি গঠিত হইল। উভয় কমিটির তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে দেশব্যাপী ক্রোধ ও ঘৃণা উগ্রতর আকারে উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল। ইহার সহিত খিলাফত সমস্যা সংক্রান্ত উষ্মা মিলিত হওয়ার ফলে, একদিকে কংগ্রেস ও অপরদিকে মুসলমান প্রতিষ্ঠানসমূহ একত্রিত হইয়া যুক্ত কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে সক্ষম হইল। অহিংস অসহযোগ নীতির উপর ভিত্তি করিয়া অচিরে মিলিত কর্মসূচী রচিত হইল। জমিয়ত-উল-উলেমা এই নীতির সমর্থনে ৯২৫ জন প্রসিদ্ধ মুসলমান ধর্মযাজকের স্বাক্ষরিত এক ফতোয়া জারি করিলেন। তাহার ফলে বহু উলেমা ধৃত ও কারাগারে বন্দী হইলেন। উত্তেজনা এরূপ উগ্র হইয়া উঠিল যে, বহুসংখ্যক মুসলমান হিজরত গ্রহণ করিয়া অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা বরণ করিলেন।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে

অহিংস-অসহযোগ নীতির অনুকূলে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা সমর্থিত হইল পরবর্তী ডিসেম্বরের নাগপুর অধিবেশনে। ১৯২১ সাল এক অতিশয় কর্মব্যস্ততা ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অভূতপূর্ব পারস্পরিক সহযোগিতার বৎসর। এই বৎসরই স্বরাজ অর্জন এবং পাঞ্জাব ও খিলাফতের প্রতি অনুষ্ঠিত অনাচারের প্রতিবিধানের জন্য সম্মিলিত কর্মপন্থা রচিত হয়। আইন-অমান্য ও খাজনা-বন্ধ আন্দোলনের পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পূর্বেই সকল সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র নরনারী কারারুদ্ধ হইলেন। মৌলানা মহম্মদ আলি, সৌকত আলি, হুসেন আহম্মদ, আবুল কালাম আজাদ, দেশবন্ধু দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, লালা লাজপত রায় প্রমুখ কংগ্রেস ও খিলাফত নেতৃবর্গ কারাগারে বন্দী হইলেন বৎসরের শেষ দিকে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশন অভূতপূর্ব উদ্দীপনার মধ্যে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত হইল। আইন-অমান্য ও খাজনা-বন্ধ আন্দোলনের অনুকূলে প্রস্তাব গৃহীত হইল এই অধিবেশনেই। কিন্তু আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্বেই চৌরিচৌরায় এক ভীষণ দাঙ্গা সংঘটিত হইল এবং তজ্জন্য নির্ধারিত কর্মসূচী আর কার্যে প্রযুক্ত হইল না। ইহার পরেই মহাত্মা গান্ধী ধৃত ও ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। অতঃপর আন্দোলন থামিয়া যায় ও তাহা পুনর্গঠিত করিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ বৈঠকই বোধ হয় সর্বশেষ অধিবেশন—যাহা কংগ্রেসের সহিত একস্থানে ও একই সময়ে আহূত হয়। যদিও হজরত মোহানী সে অধিবেশনের সভাপতি, তথাপি সভার কার্যবিধি দেখিয়া মনে হইল, কংগ্রেস, খিলাফত কমিটি ও জমিয়ত-উল-উলেমার সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া লীগ আর চলিতে পারিতেছে না। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের মত লীগ অধিবেশনে আইন-অমান্য আন্দোলনের স্বপক্ষে কোন প্রস্তাব গৃহীত হইল না। দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া লীগ একই পথ অনুসরণ করিয়া কংগ্রেসের সহিত একত্র চলিয়া আসিয়াছে ও প্রয়োজনমত তাহার গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করিয়াছে; কিন্তু যে মুহূর্তে আইন-অমান্য আন্দোলন প্রবর্তিত হইল, তখন হইতেই কংগ্রেস, খিলাফত কমিটি ও জমিয়ত-উল্-উলেমার সহিত লীগের সমস্থানীয় ও সমসাময়িক অধিবেশন বন্ধ হইয়া গেল।

মৌলবী সৈয়দ তুফাইল আহম্মদ লিখিতেছেন, 'এখন প্রশ্ন হইতেছে, কেন মুসলিম লীগ অন্যান্য সমসাময়িক প্রতিষ্ঠান হইতে পশ্চাতে পড়িয়া রহিল?' এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে মৌলানা শীবলির রচনার মধ্যে; নিম্নে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইলঃ "সিমলা প্রতিনিধিদল প্রেরণই মুসলিম লীগের প্রথম ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা, কাজেই ভবিষ্যতে তাহাকে যে কোন আকারই দেওয়া হোক না কেন, যে মনোভাব হইতে সিমলা প্রতিনিধিদল গঠনের উদ্ভব, তাহা তাহার অন্তর্নিহিত রহিয়া যাইবেই। লীগের প্রথম ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছিল ভুলভাবে, সুতরাং ভুল ভিত্তির উপর যে কোন ইমারতই গড়িয়া উঠুক না কেন, তাহার গঠন ভ্রমাত্মক হইতে বাধ্য। যে কোন অধিকার অথবা আসন হিন্দুরা অর্জন করুন

না কেন, মুসলমানদের জন্য তাহাতে অংশ নির্দিষ্ট রাখিতে হইবে —ইহাই হইল লীগ-রাজনীতির মূল কথা। ইহা সত্যকার রাজনীতি নয়। গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জনসাধারণের দাবীকে ব্যক্ত ও বলশালী করিয়া তোলাই হইল প্রকৃত রাজনীতির কাজ; এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাজনীতি ধর্মনীতির মতই সমশক্তিসম্পন্ন মতবাদ। মুসলিম লীগের মধ্যে এই শক্তির অভাব এবং তজ্জনাই সে নিজের মধ্যে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, দুর্জয় সাহস অথবা দুঃখবরণ করিবার প্রবৃত্তির সন্ধান পায় না।" ১

উদ্দীপনার আগুন অনির্দিষ্টকালের জন্য অনির্বাণ জ্বলিতে পারে না; তাই আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত ও মহাত্মা গান্ধী দণ্ডিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে দুর্বলতা ও ব্যর্থতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ইহার আঘাতে সর্বাপেক্ষা আহত হইল মুসলিম লীগ এবং তাহার ফলে ১৯২৩ সালের লক্ষ্ণৌ অধিবেশন কোরামের অভাবে পরিত্যক্ত হইল। ১৯২৪-২৫-২৬ সালের পরবর্তী অধিবেশনগুলি হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল যে, কংগ্রেস ও লীগের মাঝখানে ব্যবধান ক্রমশঃ বর্ধিততর হইয়া চলিয়াছে।

১৯২১ সালে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক যখন মধুরতম, বকরিদ উপলক্ষে মুসলমানগণ বহু স্থানে স্বেচ্ছায় গো-কোর্বাণী বন্ধ করিয়াছেন এবং খিলাফত আন্দোলনে হিন্দুদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের ফলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য যখন প্রতিষ্ঠিত-প্রায়, ঠিক সেই সময়ে এমন কতগুলি ঘটনা ঘটিল যাহা আপাতঃ-প্রতীয়মান ঐক্যতান মঞ্চে অনৈক্যের একটা সূক্ষ্ম সুর ধ্বনিয়া তুলিল। খিলাফত আন্দোলন অতিশয় প্রবল আকার ধারণ করে মালাবার জেলায়; সেখানকার মুসলমান অধিবাসিগণকে মোপলা বলা হইয়া থাকে। অন্যান্য স্থানের হিন্দুদের মত মালাবারের হিন্দুরাও খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য স্থানের অধিবাসীরা অহিংস নীতি সম্বন্ধে যেটুকু শিক্ষালাভ করিয়াছিল, মালাবারবাসিগণ তাহাও পায় নাই। ফলে আন্দোলন হিংস পথে পরিচালিত হইল। মৌলানা মহম্মদ আলি মালাবার যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাকে তথায় যাইতে দেওয়া হইলে, তিনি নিঃসন্দেহে অবস্থা আয়ত্তে আনিতে পারিতেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পথিমধ্যে বন্দী করিলেন এবং অন্যান্য নেতাগণকেও তথায় যাইবার অনুমতি দিলেন না। অনিয়ন্ত্রিত জনসাধারণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল এবং সেরূপ ক্ষেত্রে যাহা ঘটা স্বাভাবিক, ঘটিলও তাহাইঃ সরকারী দমননীতি চলিতে থাকিল নিদারুণ ও নির্বিচারভাবে। স্থানীয় হিন্দু নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকে মোপলাদের মতই কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও মোপলাগণ সন্দেহ করিল, হিন্দুরা সরকারপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, অন্ততঃ তাহাদের পক্ষ ত্যাগ করিয়াছে; সংবাদ আসিতে লাগিল, এই সন্দেহের বশবর্তী হইয়া মোপলারা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিতেছে। এরূপ অভিযোগও উত্থাপিত হইল যে, বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হইতেছে। এই সমস্ত ঘটনার অতিরঞ্জিত বিবরণ পাঠ করিয়া, এমনকি, উত্তর ভারতের হিন্দুগণ পর্যন্ত

1. M. Tufail Ahamad : Roshan Mustaqbal, P. 410.

বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু যতদিন নেতৃবর্গ, বিশেষ করিয়া মহাত্মা গান্ধী কারাগারের বাহিরে ছিলেন ততদিন পর্যন্ত অবস্থা আয়ত্তাধীন রহিল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম নেতা; তিনি তাঁহার নির্ভীকতা ও দুঃসাহসিকতার গুণে মুসলমানদের এরূপ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠেন যে, তাহারা একদা তাঁহাকে দিল্লীর জুম্মা মসজিদে অভিভাষণ দিবার জন্য আহ্বান করে। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনার আঘাতে স্বামীজী এরূপ গভীরভাবে আলোড়িত হন যে, মুক্তিলাভের পর তিনি শুদ্ধি আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিলেন।

জাতীয়তাবাদীদের ও মুসলমানদের পক্ষ হইতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রবর্তিত শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা উত্থিত হইল। আন্দোলনের সময়োপযোগিতা সম্বন্ধে যাহা বলা হয় হোক, কিন্তু খৃষ্টান অথবা মুসলমানগণ ইহার বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ যে কিরূপে করিতে পারেন তাহা বুঝা দুষ্কর। তাঁহারা নিজেরাই অন্য ধর্মের লোককে তাঁহাদের নিজদের ধর্মে দীক্ষা দিবার কার্যে ব্রতী এবং হিন্দুদিগকে প্রায়শঃই ধর্মান্তরিত করিয়া থাকেন। হিন্দুরাও যদি অপর ধর্মের লোককে তাঁহাদের স্বধর্মে আনয়ন করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে অহিন্দুদের আপত্তি করিবার কোন হেতুই থাকিতে পারে না—বিশেষ করিয়া তাঁহারা স্বয়ং যখন সে কার্যে লিপ্ত। আর সকলের মত হিন্দুরাও তাঁহাদের ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতালাভের অধিকারী। কিন্তু মানুষ সকল সময় ন্যায়, নীতি ও যুক্তির অনুবর্তী হইয়া চলে না। তাই শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে, বিশেষ করিয়া ব্যক্তিগতভাবে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের বিরুদ্ধে মুসলমানদের তীব্র অসন্তোষ জাগিয়া উঠে এবং তাহার ফলে কিছুদিন যাইতে না যাইতে স্বামীজী মুসলমান আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন। অপরদিকে মুসলমানগণও তবলিগ ও তাঞ্জিম আন্দোলন সুরু করিয়া দিলেন।

১৯২২ সালের শেষের দিকে মুলতানে কতকগুলি দারুণ সাম্প্রদায়িক অশান্তি সংঘটিত হয়। তাহার ফলে বহু হিন্দুগৃহ দগ্ধ, হিন্দু-সম্পত্তি লুণ্ঠিত ও হিন্দুদের মন্দির কলুষিত হইল। ইহার পর দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া যে সাম্প্রদায়িক উপদ্রব দেশের প্রায় সর্বত্র উৎকট আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, মুলতানের অশান্তি তাহারই সূচনা। কংগ্রেস ও খিলাফত কর্মিগণ এবং হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিমাত্রই ইহাতে অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া উঠিলেন। উপদ্রব উপশমনের জন্য তাঁহারা আপ্রাণ সচেষ্ট হইলেন, কিন্তু সে কার্যের পক্ষে আপনাদের অসহায় অবস্থার কথা উপলব্ধি করিতে তাঁহাদের বিলম্ব হইল না। অদৃশ্য শক্তি নেপথ্য হইতে যে ক্রিয়া করিতেছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। পাকিস্থানপন্থী মুসলমানগণ হিন্দুদের আগ্রহাতিশয্যকেই এসবের জন্য দায়ী করিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার এরূপ মতও প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, হিন্দুগণ মুসলমানদের সম্মুখে এতদিন মেষ-শিশুর মত অবস্থান করিত; অন্য কোন কারণে না হইলেও কেবলমাত্র এই কারণে হিন্দুরা যাহাতে সাহসের সহিত মুসলমানদের সম্মুখীন হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারে—সেই উদ্দেশ্যে হিন্দুনেতাগণ অন্তরাল হইতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সংগঠন করিতেন।

ইহার দ্বারা সমস্যা অতি সরল হইয়া যায় এবং পাকিস্থানের অনুকূলে যে যুক্তির শৃঙ্খল রচিত হইয়া থাকে, ইহা তাহারই একটি গ্রন্থির কাজ করে। তাহা ছাড়া, এই যুক্তির অন্য কোনরূপ ভিত্তি নাই। বিগত ত্রিশ বৎসরের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ইতিহাস যদি সংস্কারবিমুক্ত মন লইয়া পাঠ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সংকটতম মুহূর্তে আবির্ভূত হইবার কৌশল তাহাদের যেন আয়ত্ত। বৃটিশ-হস্ত হইতে ভারতীয় হস্তে ক্ষমতা প্রত্যর্পণের দাবী যখনই জোরাল ও জরুরী আকারে দেখা দিয়াছে এবং ভারতের প্রধান দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আদর্শ ও কার্যগত ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তখনই তাহাদের আবির্ভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপিত হইবার ফলে হোমরুল আন্দোলন কিরূপ বলশালী হইয়া উঠে। ঠিক ইহারই অব্যবহিত পরে ১৯১৭ সালের শেষ দিকে বিহারের শাহাবাদ অঞ্চলে ভীষণ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে এবং তাহার ফলে মুসলমানগণ হিন্দুদের হাতে যে পরিমাণ নিগৃহীত হয়, গভর্ণমেণ্টের হাতে হিন্দুদের নিগ্রহ তাহা হইতে বহুগুণে অধিক নিদারুণ। তৎপর বৎসর ১৯১৮ সালেও যুক্তপ্রদেশের কাটারপুর এলাকায় যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সংঘটিত হয় তাহার পরিমাণ ও পরিণামও পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে অভিন্ন। ১৯১৯ সাল হইতে ১৯২২ সালের ভিতরে খিলাফত আন্দোলন ও পাঞ্জাবের অত্যাচারের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় পরিপূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২২ সালে যে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়, তাহার স্থায়িত্বকাল তাহার পরেও কয়েক বৎসর অবধি ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। গুরুতর পীড়ার দরুণ মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ছয় বৎসরের পূর্ণ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই ১৯২৪ সালে মুক্তিলাভ করিলেন। বাহিরে আসিয়া সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের প্রকোপ ও তজ্জনিত ধন ও প্রাণের ব্যাপক হানি লক্ষ্য করিয়া তিনি অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং পূর্ব অভ্যাসমত একুশ দিন ব্যাপী অনশন আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন, দ্রুত অধোগতিশীল সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের প্রতি হিন্দু ও মুসলমানগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আত্মঘাতী ভ্রাতৃবিরোধ হইতে নিরস্ত হইবার জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করিতে। কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলির নেতৃত্বে অবিলম্বে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলন আহূত হইল। সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয় এই অর্থে যে, বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের অধিকার ও দায়িত্বের সীমা সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করিয়া দিয়া কয়েকটি ন্যায় ও নীতিসম্মত প্রস্তাব ইহাতে গৃহীত হইল এবং যে অবস্থার উদ্ভব হওয়ার ফলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে, তাহা আয়ত্ত করিবার পক্ষে কর্মপন্থা রচিত হইল। আশা করা হইল, ইহার দ্বারা অবস্থার অনেকখানি উপশম সাধিত হইবে। সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি যদি যথারীতি প্রচারিত হইত এবং আন্তরিকতা সহকারে কার্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করা হইত, তাহা হইলে অবস্থা যে অনেক পরিমাণে আয়ত্তাধীনে আসিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা যে সম্ভব হয় নাই—তাহার দায়িত্ব কোন একটি সম্প্রদায়বিশেষের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে

না। আসল ব্যাপারটা হইতেছে এই যে, অনেক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মূলে ধর্মান্ধতা আপাতদৃশ্য কারণরূপে বিদ্যমান রহিলেও, তাহার প্রকৃত পটভূমি রাজনৈতিক। সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব একবার সংঘটিত হইলে তাহার ফলে পারস্পরিক সংশয় ও সংক্ষোভ স্বতঃই সৃষ্ট হয় এবং তাহাই পরবর্তী সংঘর্ষের হেতু হইয়া উঠে। আবহাওয়া এরূপ বিষাক্ত হইয়া উঠে যে, অতিশয় সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষে মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করা অথবা ঘটনার সত্যকার হেতু সম্বন্ধে সন্ধান করিয়া আপোষমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয় না। দাঙ্গার ফলে যে ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান হয় তাহা এমনই ভয়াবহ যে, সে অবস্থায় আপোষরফার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, অনেক সময়ে তাহার মর্ম ভুলভাবে গৃহীত ও ব্যাখ্যাত হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই প্রশ্ন সম্বন্ধে যাঁহারাই অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়াছেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন, দাঙ্গার হেতু অবলম্বনে বিষময় বিতর্ক বিলম্বিত করিয়া অথবা তাহার তিক্ত স্মৃতি সঞ্জীবিত রাখিয়া কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। পুলিশ তদন্ত সচরাচর দীর্ঘই হয়, সময় সময় তাহা কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিতে থাকে। ফলে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ উপশমিত হইবার অবকাশ পায় না ঃ কেবল যে দাঙ্গাকারী পক্ষদ্বয়ই সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় তাহা নহে, এমন কি, সাক্ষীরা পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া উভয়পক্ষে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং আপন আপন সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রতিভূ ও পৃষ্ঠপোষকরূপে পুরোভাগে অগ্রসর হইয়া আসে। তথাপি বেসরকারী পক্ষ হইতে আপোষরফার চেষ্টা হইলে অথবা মামলা প্রত্যাহার করাইবার প্রয়াস হইলে, দুর্বৃত্তদিগকে রক্ষা করিবার কৌশলরূপে তাহা নিন্দিত হইয়া থাকে। অথচ ব্যাপারটা হয় এই যে, যে সকল দুর্বৃত্ত পশ্চাতে রহিয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উস্কাইয়া তোলার ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হয়, দাঙ্গার আঘাত এবং পুলিশ ও আদালতের বিড়ম্বনা হইতে অক্ষুণ্ণ দেহে অব্যাহতি লাভ করিবার কৌশলে তাহারা সিদ্ধহস্ত। সহজ, সরল ও অশিক্ষিত জনসাধারণই আসামীরূপে এই সমস্ত মামলার মধ্যে জড়িত হইয়া পড়ে, সাময়িক উত্তেজনার বশে তাহারা যাহা করে, উত্তেজনা প্রশমিত হইয়া গেলে তাহারা অচিরে তাহার জন্য অনুতপ্ত হয়। এই সমস্ত লোককে রক্ষা করিবার চেষ্টা নৈতিক অথবা অন্য কোন দিক দিয়া অন্যায় নয়, বিশেষ করিয়া তাহার দ্বারা সৌহার্দ ও সম্প্রীতি যদি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হয়। তথাপি যথাযোগ্য গাম্ভীর্যের সহিত বলা হইয়া থাকে, ইহা হিন্দুদের আত্মরক্ষার এক অপকৌশল মাত্র। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ আপোষরফামূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করেন, তাঁহারা কোন দল বা সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষ হইতে করেন না, করেন উভয়পক্ষেরই তরফ হইতে। তাহা ছাড়া, এইরূপ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ব্যাপারে এক পক্ষ হইতে মামলা রুজু হইলে অন্য পক্ষ হইতেও পাল্টা মামলা দায়ের হইয়া থাকে। কাজেই সেরূপ ক্ষেত্রে আপোষরফার ফলে যদি কোন সুখ-সুবিধা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কোন পক্ষবিশেষের একচেটিয়া সামগ্রী হয় না, সকল সম্প্রদায় সমভাবে তাহার ফলভোগ করিয়া থাকেন। এই জাতীয় কোন কোন উপদ্রবের হেতু সম্বন্ধীয় তদন্তের রিপোর্ট

হইতে জানা যায় যে, গভর্নমেণ্ট দৃঢ়হস্তে অবস্থা আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করিলে দাঙ্গা যে শুধু নিবারিতই হইত তাহা নয়, দাঙ্গা কার্যতঃ আরম্ভ হইয়া গিয়া থাকিলে, তাহার গতি ব্যাহত পর্যন্ত হইতে পারিত। বোম্বাইয়ে যে গুরুতর সংঘর্ষ সংঘটিত হয় তাহার ফলে ৮৯ জন হিন্দু, ৫৪ জন মুসলমান, ১ জন ইউরোপীয় ও ১ জন পার্শি নিহত হন এবং আহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪৩ জন। যথারীতি অনুসন্ধানের পর দাঙ্গা তদন্ত কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে লিখিলেন, 'যাঁহারা বলিয়া থাকেন, পুলিশ কমিশনারের আরও পূর্বে সামরিক সাহায্য আহ্বান করা উচিত ছিল, আমাদের মনে হয়, তাঁহাদের সে বক্তব্যের পশ্চাতে যথেষ্ট যুক্তিবল বিদ্যমান। সাম্প্রতিক হাঙ্গামার অভিজ্ঞতা হইতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, হাঙ্গামার সূত্রপাতেই শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী আহ্বান করা ও অন্যান্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য।

১৯৩১ সালে কাণপুরে যে গুরুতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দেয়, তাহার হেতু সন্ধানের জন্য নিযুক্ত তদন্ত কমিটি নিম্নলিখিতরূপ বিবৃতি দান করেন—জনৈক সাক্ষী আমাদের সম্মুখে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলেন, "জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল যে, কাণপুরের ব্যবসায়ীমহল কংগ্রেস কার্যতৎপরতায় সহায়তা করার দরুণ স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন; সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁহাদের ধন-প্রাণ নিরাপদ নয়—ব্যবসায়িগণের নিকট এই কথা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যেই স্থানীয় সরকারী কর্মচারিগণ দ্রুততার সহিত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনে বিরত থাকেন।" দাঙ্গা চলিতে থাকাকালে পুলিশের এই মনোভাব সর্বথা নিন্দনীয় ও মার্জনার অযোগ্য। সম্প্রদায় ও শ্রেণীনির্বিশেষে সকল সাক্ষীই অন্ততঃ এই বিষয়ে একমত যে, অনেক ক্ষেত্রে উপদ্রব দমনে পুলিশ নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন ছিল: ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণ, সকল প্রকার মতবাদসম্পন্ন হিন্দু ও মুসলমান, সামরিক কর্মচারিগণ, উত্তর ভারতের চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি, ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়—এমনকি, ভারতীয় সরকারী কর্মচারিগণ পর্যন্ত যে সাক্ষ্য সম্বন্ধে একমত, তাহার শক্তি অস্বীকার করা অসম্ভব। দাঙ্গার প্র[illegible] তিন দিন পুলিশ যে তাহাদের কর্তব্যপালনে যথোপযুক্ত যত্নবান্ হয় নাই সে সম্বন্ধে সন্দেহের লেশমাত্র আমরা পোষণ করি না। বহু সাক্ষী এরূপ উদাহরণেরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, চোখের সম্মুখে অতিশয় গুরুতর অপরাধ অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াও পুলিশ তাহা প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হয় নাই। বহু সাক্ষী, এমন কি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত তাঁহার সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলেন যে, তৎকালে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতা সম্বন্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এই সমস্ত অভিযোগের উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। ২

---

2. K. B. Krishnan: 'The Problem Of Minorities', Pp. 272-3.

(চৌদ্দ)

ত্রিভুজের ভূমি দীর্ঘায়িত

১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের গৌহাটী অধিবেশনের ঠিক প্রাক্কালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যখন রোগশয্যায় শায়িত, জনৈক ধর্মান্ধ মুসলমান সেই সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী হয় এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে, বিনা উত্তেজনায় নৃশংসভাবে তাঁহাকে নিহত করে। তাহার ফলে দেশময় এক বিদ্বেষ ও বিভীষিকার তরঙ্গ খেলিয়া যায় এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মগত মতবিরোধ মীমাংসিত করিবার প্রয়োজনীয়তা পুনরায় প্রবলভাবে অনুভূত হয়। এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯২০ সালে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হইলে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটি তাহা বর্জন করে এবং ১৯২০ সালের নির্বাচনে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করা হইতে বিরত হয়। ১৯২২ সালে আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইলে, উভয় প্রতিষ্ঠানের নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটে, ফলে বর্জন-সিদ্ধান্ত প্রত্যাহৃত হয়। অতঃপর কংগ্রেস ও খিলাফত কর্মিগণ ১৯২৩ সালের শেষদিকে অনুষ্ঠিত নির্বাচনদ্বন্দ্বে ও তৎপরবর্তী নির্বাচনসমূহে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। কংগ্রেস তাহার আইন-পরিষদের কার্য পরিচালন করিতেছিল স্বরাজ্য পার্টির মারফতে। স্বরাজ্য পার্টি শাসন-সংস্কার চালু করিতে চাহে নাই, চাহিয়াছিল ব্যবস্থাপরিষদের মারফৎ তাহার সহিত অসহযোগিতা করিতে। কংগ্রেসী সদস্যগণ সেই উদ্দেশ্যে শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে পুনরালোচনার দাবী জানাইয়া কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রস্তাব আনয়ন করিলেন এবং রাজস্ব বিল অগ্রাহ্য করিয়া অর্থলাভের জন্য আইন-পরিষদের দ্বারা অনুমোদিত প্রকাশ্য পথ এরূপভাবে বন্ধ করিয়া দিলেন যে, বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করা ছাড়া বড়লাটের পক্ষে আর উপায়ান্তর রহিল না। পরিষদের বহু মুসলমান সদস্য কংগ্রেস-সভ্য না হইয়াও, এ ব্যাপারে কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। ইহা হইতে সুস্পষ্টরূপে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, মনোমালিন্য থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় পরিষদের হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের মধ্যে কিছুটা পরিমাণ সহযোগিতার ভাব বিদ্যমান ছিল।

শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে প্রগতিমূলক প্রতিটি প্রস্তাব বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এতদিন দৃঢ়তার সহিত প্রতিরোধ করিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু এইবারে ভাবে বোধ হইল, আর অধিক দিন এই বিরোধিতা চালাইতে গভর্ণমেণ্ট সক্ষম হইবেন না এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান যদি না হয়, তাহা হইলে অণুমাত্র অগ্রগতিও সম্ভব হইবে না। এতদুদ্দেশ্যে গৌহাটী কংগ্রেস হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পুঞ্জীভূত শোচনীয় মনোমালিন্য দূরীকরণের উপায় নির্ধারণকল্পে হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবর্গের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবার অধিকার ওয়ার্কিং কমিটির হস্তে ন্যস্ত করিলেন। তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি শ্রী শ্রীনিবাস

আয়েঙ্গারের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলমান নেতৃবর্গ ও কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যদিগকে লইয়া একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। ১৯২৭ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে জনকয়েক প্রখ্যাতনামা মুসলিম জননায়ক দিল্লীতে সম্মিলিত হইয়া যে কয়েকটি প্রস্তাব রচনা করেন, তাহাই পরবর্তী ইতিহাসে মুসলিম-প্রস্তাব নামে পরিচিত। তাঁহারা নিম্নলিখিত সর্তে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদে যৌথ-নির্বাচনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেনঃ

(ক) সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশ করিতে হইবে; (খ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানকে অন্যান্য প্রদেশের সহিত সমমর্যাদা দান করিতে হইবে; (গ) পাঞ্জাবে ও বাংলায় মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা তাহাদের মোট জনসংখ্যার অনুপাতে স্থিরীকৃত হইবে; এবং (ঘ) কেন্দ্রীয় পরিষদের মুসলমান সদস্যদের সংখ্যা মোট সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কম হইবে না। পরবর্তী মে ও অক্টোবরে অনুষ্ঠিত পর পর দুইটি অধিবেশনে কংগ্রেস মুসলিম-প্রস্তাবে সম্মতিসূচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল এবং সামাজিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধানের জন্য কয়েকটি নীতিও নির্ধারিত করিয়া দিল। কংগ্রেসের পরবর্তী বার্ষিক অধিবেশন বসিল মাদ্রাজে এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পূর্ববর্তী অধিবেশনে অনুসৃত নীতি অনুযায়ী একটি প্রস্তাব তাহাতে গৃহীত হইল। আর একটি প্রস্তাব দ্বারা ওয়ার্কিং কমিটিকে অধিকার দেওয়া হইল অপরাপর সঙ্ঘ কর্তৃক অনুরূপ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটিসমূহের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতে এবং Declaration of Rights এর ভিত্তিতে ভারতীয় স্বরাজ শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করিয়া কংগ্রেসের আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক বিশেষ অধিবেশনে অন্যান্য সঙ্ঘের নেতৃবর্গ ও প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে। সেই সপ্তাহেই মুসলিম লীগের অধিবেশন বসিল কলিকাতায়; লীগ কমিটিও তাহার কাউন্সিলকে একটি সাব্-কমিটি গঠন করিবার অধিকার দান করিলঃ উক্ত সাব-কমিটির কার্য হইবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ভারতীয় শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করা এবং কংগ্রেস কর্তৃক প্রস্তাবিত জাতীয় 'কন্‌ভেন্‌সানে' অংশ গ্রহণ করা। পূর্বোল্লিখিত মুসলিম দাবীসমূহ পুনরুত্থাপন করিয়া ঘোষণা করা হইল, উল্লিখিত দাবীসমূহ মানিয়া লওয়া হইলে মুসলিম লীগ পৃথক্-নির্বাচন ব্যবস্থা পরিহার করিতে প্রস্তুত। ইহা ছাড়াও, বিবেক-বুদ্ধির স্বাধীনতা, ধর্ম সম্বন্ধীয় আইন প্রণয়ন, গোহত্যা, মস্‌জিদের সম্মুখে গীতবাদ্য ও ধর্মান্তরিত করা সম্পর্কে মাদ্রাজ কংগ্রেসের মীমাংসা প্রস্তাব লীগ কমিটি আপন আলোচ্য বিষয়ের অঙ্গীভূত করিয়া লইল। এস্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মতদ্বৈধতার ফলে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এই সময়ে দ্বিধাবিভক্ত, তাই কলিকাতায় যখন এক অংশের অধিবেশন চলিতেছিল, তখন অপর অংশ স্যার মিয়া মহম্মদ শফির সভাপতিত্বে অধিবেশন আহ্বান করিল লাহোরে। মৌলবী মহম্মদ ইয়াকুবের সভাপতিত্বে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনে উপরি উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়; মিঃ এম, এ, জিন্না ছিলেন এই অধিবেশনের নায়ক ও পরিচালক।

লীগের মধ্যে ভাঙ্গন ও তাহার অংশবিশেষের সহিত কংগ্রেসের আপোষ-রফার আলোচনা যেসব কারণে সম্ভবপর হইয়াছিল, এস্থলে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রতিটি প্রস্তাবের গভর্ণমেণ্ট বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছেন। সে সময়ে ভারতসচিব ছিলেন লর্ড বার্কেনহেড। ১৯২০ সালের ভারত শাসন আইনে বিধিবদ্ধ ছিল যে, উক্ত আইন প্রবর্তনের তারিখ হইতে দশ বৎসরের শেষে একটি ষ্ট্যাটুটারী কমিশন গঠন করিয়া উহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে তদন্ত করিতে ও রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে। লর্ড বার্কেনহেড তদানীন্তন বড়লাট লর্ড রিডিংকে উক্ত তারিখ ত্বরান্বিত করিবার জন্য নির্দেশ দিয়া পাঠান। নিম্নে তাঁহার পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইলঃ

'ষ্ট্যাটুটারী কমিশনকে টোপস্বরূপ সম্মুখে রাখিয়া দর-কষাকষির দ্বারা স্বরাজ্য দলের মধ্যে বিভেদ বর্ধিততর করিবার পক্ষে সুযোগ-সুবিধা লাভ করা যায় কিনা—সে সম্বন্ধে আপনার পরামর্শ প্রার্থনা করি। যদি তারিখ আগাইয়া দিবার ফলে দর-কষাকষির দিক দিয়া কোনরূপ সুবিধা হইবে বলিয়া আপনি মনে করেন, তাহা হইলে তাহার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করুন; জানিয়া রাখুন, গভর্ণমেণ্টের সমর্থন আপনার পশ্চাতে রহিয়াছে।'১

ইংলণ্ডের অবস্থার চাপে পড়িয়া ১৯২৭ সালে তিনি ত্বরিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। 'ইংলণ্ডে আসন্ন নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল আশঙ্কাজনক। শ্রমিক দলীয় গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবার সম্ভাবনা সম্মুখে; এরূপ ক্ষেত্রে ১৯২৮ সালের কমিশন গঠনের দায়িত্ব আমাদের উত্তরাধিকারী কর্ণেল ওয়েজউড্ ও তাঁহার সহকর্মিগণের হস্তে ন্যস্ত করিবার ঝুঁকি লইতে তিনি আদৌ প্রস্তুত নহেন। কারণ তদ্দ্বারা তাঁহার স্বরাজ্য দলের বিভেদ বর্ধিততর করিবার পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।'২

১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে ষ্ট্যাটুটারী কমিশন গঠন সম্বন্ধীয় নির্দেশ কমিটি গঠিত হইবে এবং তাহাতে কোন ভারতীয় সদস্য থাকিবেন না। একটি জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি গঠন করিয়া তাহার মারফৎ তাহার অভিমত কমিশনের বিবেচনার জন্য তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে কেন্দ্রীয় পরিষদকে আমন্ত্রণ করা হইবে। সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় সদস্য বর্জিত কমিশন গঠনের প্রস্তাব ভারতীয়গণের চক্ষে অত্যন্ত অবহেলা ও অপমানজনক বলিয়া বোধ হইল, ফলে কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল কেবলমাত্র কংগ্রেস কর্তৃক নয়—কংগ্রেস-বহির্ভূত বহু মুসলমান প্রতিষ্ঠান ও খিলাফত কমিটির দ্বারা; এমনকি, যে উদারনৈতিক দল রাজনৈতিক মতবাদের মৃদুতার জন্য সর্বজনবিদিত এবং কংগ্রেস কর্তৃক মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার বর্জিত হইবার পরেও রাজ-

1. Birkenhead—'The Last Phase', Vol. II, P. 25, quoted by K. B. Krishnan in his 'Problem of Minorities', P. 307.
2. Ibid. P. 250—1, quoted by Atulananda Chakravarty in his 'Call It Politics?', P. 58.

নৈতিক দলরূপে যাঁহারা এককই উক্ত সংস্কার কার্যকরী করিবার জন্য সচেষ্ট হন, তাঁহারা পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিলেন। এই কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত ও পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাবকে আশ্রয় করিয়াই নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। ভারতের বিভিন্ন দল ও উপদলের মধ্যে মতদ্বৈধতার মূল্য লর্ড বার্কেনহেড সম্যকরূপেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই ভারতসচিবরূপে তিনি নিম্নলিখিত নির্দেশ প্রেরণ করেনঃ "এই বিরোধিতা যতই গভীরতর হইবে এবং যতই অধিকতর জনসংখ্যা ও ব্যাপকতর স্বার্থ ইহার দ্বারা আহত হইবে, ততই স্পষ্টতররূপে প্রমাণিত হইবে যে, এই বিরোধের নিষ্পত্তি কেবলমাত্র আমাদের মধ্যস্থতার দ্বারাই সম্ভব।"৩ ভারতীয়গণ কর্তৃক সাইমন কমিশন বর্জিত হইলে, তিনি পুনরায় লর্ড আরউইনের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন—'বর্জন-ব্যবস্থাকে *বিপর্যস্ত করিবার পক্ষে আমরা সব সময়েই নির্ভর করিয়াছি বর্জন-বিরোধী* মনোভাবসম্পন্ন মুসলমানগণের উপর, অনুন্নত ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উপর এবং অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট শ্রেণীর উপর। এমনকি, পরিদর্শনকালের মধ্যেও এই প্রতিরোধ-গাত্রে কোথাও ফাটল সৃষ্টি করিতে পারা যায় কিনা তাহার বিচারের ভার আপনার ও সাইমনের উপর ন্যস্ত রহিল।'৪

ইহার কয়েকদিন পরেই ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি পুনরায় বড়লাটের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন, 'সাইমনের নিকট আমার অনুরোধ, তিনি যেন আলোচনার প্রতিটি পর্যায়ে মুসলমান ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের বর্জন-বিরোধী ব্যক্তিবর্গের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিস্থানীয় মুসলমান নেতৃবর্গের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের সংবাদ যাহাতে যথারীতি প্রচারিত হয় সে ব্যবস্থা আমি করিব। আমাদের সমগ্র নীতিটি নির্ভর করিবে নিম্নলিখিত সূত্রের উপরঃ কমিশন মুসলমানদের দ্বারা প্রভাবিত হইলে এমন রিপোর্ট পেশ করিবে, যাহা হিন্দু স্বার্থের পক্ষে সম্পূর্ণ বিপজ্জনক—এই আশঙ্কা হিন্দু-জনসাধারণের মনে জাগাইয়া তুলিতে হইবে; তাহার দ্বারা একদিকে যেমন মুসলমান সমর্থন লাভের পক্ষে সুবিধা হইবে, অপর দিকে তেমনি জিন্নাকে, তরঙ্গের ঊর্ধ্বে নিরাপদ অবস্থানে সংস্থাপিত করা সম্ভব হইবে।' ৫

এইদিকে দৃষ্টি রাখিলে, ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে কলিকাতায় যখন-লীগের অধিবেশন চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে লাহোরে স্যার মহম্মদ শফির সভাপতিত্বে লীগের স্বতন্ত্র অধিবেশনের অনুষ্ঠান বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইবে না।

১৯২৮ সালের প্রথম দিকে ভারতীয় শাসনতন্ত্র রচনার জন্য কংগ্রেস, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমবেত প্রচেষ্টা সম্ভবপর হইয়াছিল দুইটি কারণেঃ সাইমন কমিশন নিয়োগের দ্বারা ভারতের জাতীয় সত্তার অপমান এবং সকলের গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র রচনার জন্য লর্ড বার্কেনহেড কর্তৃক ভারতবর্ষকে

3. Ibid., Pp. 245—6, quoted Do. P. 57.
4. Ibid., P. 254, quoted Do.
5. Birkenhead, Op. cit, Vol. II, P. 255, quoted by Krishnan, Op. cit, P. 308.

দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান। পূর্বোল্লিখিত প্রস্তাবানুযায়ী আহূত সর্বদলীয় সম্মেলন শাসনতন্ত্র রচনার কার্যে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে গঠিত অপর এক কমিটির হস্তে অবশিষ্ট কার্যভার অর্পণ করিলেন। উক্ত কমিটি কর্তৃক রচিত রিপোর্টই নেহরু কমিটি রিপোর্ট নামে পরিচিত। লক্ষ্ণৌ-এর সর্বদলীয় সম্মেলনে উহা আলোচিত ও সংশোধিত আকারে গৃহীত হইবার পর, ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বদলীয় সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশনে উহা উপস্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে অন্যান্য শক্তির ক্রিয়া সুরু হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে মুসলিম লীগ প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা দিয়াছে। এই মতবিরোধ গড়িয়া উঠিল মূলতঃ তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়াঃ (১) কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কম হইবে না; (২) নেহরু রিপোর্টে প্রস্তাবিত প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই ভোটাধিকার স্বীকৃত না হইলে পাঞ্জাবে ও বাঙলায় মুসলমান আসনের সংখ্যা তাহাদের জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী চূড়ান্তরূপে নির্ধারিত হইবে এবং দশ বৎসর পরে আর তাহা পুনর্বিচারাধীন হইবে না; (৩) 'রেসিডিউয়ারী' ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় পরিষদের হস্তে ন্যস্ত না হইয়া, প্রদেশসমূহের উপর অর্পিত হইবে। এই সর্তগুলিই মিঃ জিন্না প্রস্তাবাকারে সম্মেলনের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। সর্তগুলি তদুদ্দেশ্যে গঠিত একটি কমিটি কর্তৃক সবিস্তার সমস্ত রাত্রি ধরিয়া আলোচিত ও বিবেচিত হইল, কিন্তু কোনরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়া পেঁছান যখন সম্ভব হইল না, তখন সম্মেলন কর্তৃক তাহা অগ্রাহ্য হইল। ইহার পর হইতেই লীগ কার্যতঃ সর্বদলীয় সম্মেলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইল এবং অবস্থার পুনর্বিবেচনার জন্য সময়ান্তরে পুনরায় সম্মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা অধিবেশন মুলতুবী রহিল।

অপরদিকে লাহোর অধিবেশনের উদ্যোক্তা লীগের অন্য শাখাও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বসিয়া ছিল না। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী অগ্রাহ্য করিয়া, লীগের লাহোর অধিবেশনে ব্যাখ্যাত নীতি অনুযায়ী ভারতীয় শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ইহা এক কমিটি নিযুক্ত করিল; স্থির হইল, উক্ত কমিটি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতায় শাসন-পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া ষ্ট্যাটুটারী কমিশনের সম্মুখে তাহা উপস্থাপিত করিবেন। মুসলমানদের ভিতর বিভিন্ন ও বিরোধী মতবাদসমূহের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে মুসলমানগণের এক গোল টেবিল বৈঠক আহ্বানের অধিকারও ইহা সভাপতির হস্তে অর্পণ করে। তদনুযায়ী ১৯২৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে মুসলমানদের এক সর্বদলীয় সম্মেলন দিল্লীতে আহূত হইল। ১৯০৬ সালে লর্ড মিণ্টোর সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী মুসলিম প্রতিনিধিদলের নেতা মহামান্য আগা খাঁ এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইলে তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। সর্বদলীয় সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশনে অনুসৃত কার্যক্রম দেখিয়া অনেক মুসলমান বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ, বিশেষ করিয়া মহম্মদ আলি ও মৌলবী শফী দাউদী প্রভৃতির ন্যায় প্রখ্যাত নেতৃবর্গ এই সম্মেলনে

যোগদান করিলেন। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কলিকাতা শাখা সর্বদলীয় মুসলমান সম্মেলনে উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াও তাহা গ্রহণে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেন। সম্মেলনে নিম্নলিখিত মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হইল ঃ (ক) কেবল মাত্র সেই প্রকার যুক্তরাষ্ট্রই ভারতীয় পরিবেশের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে—যাহার দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির পরিপূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবে এবং 'রেসিডিউয়ারী' ক্ষমতাসমূহ তাহাদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে; কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের হাতে সাধারণ স্বার্থসম্মত মাত্র সেইসব অধিকারই অর্পিত হইবে—শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যাহা তাহার ন্যায্য প্রাপ্যরূপে নির্ধারিত; (খ) আন্তঃসাম্প্রদায়িক কোন বিল, প্রস্তাব, আবেদন বা সংশোধনী প্রস্তাব কেন্দ্রীয় অথবা কোন প্রাদেশিক আইন পরিষদে আলোচিত বা গৃহীত হইতে পারিবে না—যদি সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের সদস্যসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ তাহার বিরোধিতা করে; (গ) মুসলমানগণ স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার দ্বারাই ব্যবস্থা পরিষদে ও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনশীল অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তাহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে এবং তাহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে তাহাদের সে অধিকার কখনও হরণ করা হইবে না; কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহের মন্ত্রিসভায় তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ তাহারা প্রাপ্ত হইবে; যে সব প্রদেশে জনসংখ্যার দিক দিয়া তাহারা সংখ্যাগুরু, সেইসব প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টে তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ করা হইবে না এবং যে সকল স্থানে তাহারা সংখ্যালঘু, সেখনেও বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী তাহারা যতগুলি আসন লাভের অধিকারী, কোন ক্ষেত্রেই তাহার সংখ্যা হ্রাস করা হইবে না এবং কেন্দ্রীয় পরিষদে তাহাদের সদস্যসংখ্যা মোট সদস্যসংখ্যার শতকরা ৩৩রূপে নির্দিষ্ট হইবে; (ঘ) সিন্ধুকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিতে হইবে এবং (ঙ) ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তিত হইবে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের পক্ষেও তাহা প্রযোজ্য; সরকারী চাকরীতে তাহাদিগকে যথাযোগ্য অংশ প্রদান করিতে হইবে; মুসলিম কৃষ্টি, শিক্ষা, ধর্ম, ভাষা, ব্যক্তিগত আইন, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও সরকারী সাহায্যের যথাযোগ্য অংশ পাইবার অধিকার রক্ষাকল্পে যথোপযুক্ত রক্ষা-ব্যবস্থার বিধান করিতে হইবে।

প্রস্তাবে ইহাও অত্যন্ত জোরের সহিত বলা হইল যে, শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের কাঠামো যাহার দ্বারাই পরিকল্পিত ও রচিত হোক না কেন, এই প্রস্তাবের নীতির সহিত সঙ্গত না হইলে, তাহা ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

মুসলিম লীগের উভয় শাখা ও মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য মিঃ জিন্না সচেষ্ট হইলেন। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত আলাপ-আলোচনার পর তিনি আপোষ-রফা প্রস্তাবের এক খসড়াপত্র রচনা করিলেন। ইহাই মুসলমান স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহার চৌদ্দ দফা সর্ত-সম্বলিত খসড়াপত্ররূপে পরিচিত। দফাগুলির সারাংশ নিম্নলিখিতরূপঃ—

(১) ভারতের ভাবী শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা হইবে এমন এক যুক্তরাষ্ট্র যাহাতে 'রেসিডিউয়ারী' ক্ষমতা প্রদেশসমূহের হস্তেই ন্যস্ত রহিবে।

(২) প্রদেশসমূহে সমপরিমাণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রবর্তন।

(৩) প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহে ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব এরূপভাবে নির্ধারিত করিতে হইবে যে, তাহার ফলে কোন প্রদেশে কোন সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘু অথবা সমসংখ্যক সম্প্রদায়ে পরিণত হইতে পারিবে না।

(৪) কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা মোট সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কম হইবে না।

(৫) সাম্প্রদায়িক দলগুলি পৃথক নির্বাচনের দ্বারাই তাহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে, কিন্তু যে কোন দল যে কোন সময়ে যৌথ-নির্বাচনের অনুকূলে যাহাতে প্রয়োজনমত পৃথক নির্বাচন পরিহার করিতে পারে, তাহার পথ উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

(৬) পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠতা যাহার দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এমন কোন প্রাদেশিক পুনর্বিভাগের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারিবে না।

(৭) সকল সম্প্রদায়কে ধর্মবিশ্বাস, পূজা-অর্চনা, আচার-অনুষ্ঠান, প্রচার ও সাহচর্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিতে হইবে।

(৮) কোন বিল, প্রস্তাব বা তাহার অংশবিশেষ কোন আইনপরিষদে অথবা যে কোন প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে গৃহীত হইতে পারিবে না—যদি সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য তাহাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের পক্ষে হানিকর হিসাবে তাহার বিরোধিতা করে।

(৯) সিন্ধুকে বোম্বাই প্রদেশ হইতে পৃথক করিতে হইবে।

(১০) অন্যান্য প্রদেশের মত বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করিতে হইবে।

(১১) যোগ্যতার বিচারসাপেক্ষরূপে সরকারী চাকুরিতে মুসলমানদের যথাযোগ্য অংশ ধার্য করিতে হইবে।

(১২) মুসলিম কৃষ্টি, শিক্ষা, ভাষা, ধর্ম, ব্যক্তিগত বিধান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও সরকারী সাহায্যের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ পাইবার অধিকার রক্ষার জন্য যথাযোগ্য রক্ষা-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(১৩) কেন্দ্রে অথবা প্রদেশে এমন কোন মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারিবে না, যাহাতে মুসলমান মন্ত্রীর সংখ্যা মোট মন্ত্রী-সংখ্যার অন্ততঃপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নয়।

(১৪) কেন্দ্রীয় পরিষদ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী বিভিন্ন রাষ্ট্র-গুলির সম্মতি ব্যতিরেকে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে না।

এস্থলে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে এই যে, মুসলিম লীগের যে শাখার সভাপতি ছিলেন মিঃ জিন্না, তাহাতে জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। শফী-লীগ লাহোর প্রস্তাবের একনিষ্ঠ সমর্থকরূপে মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলনের অঙ্গীভূত হইয়া রহিল। চৌদ্দ দফা সর্ত-সম্বলিত

মিঃ জিন্নার রচিত প্রস্তাবই জাতীয়তাবাদী মুসলমানদলের বহির্ভূত মুসলিমগণের দাবী হইয়া দাঁড়াইল। এই চৌদ্দ দফা সর্তের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কারণ মিঃ ম্যাকডোনাল্ড এই সর্তাবলীকে পুরাপুরিভাবে অবলম্বন করিয়াই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্ত রচনা করেন। নেহরু রিপোর্টকে কেন্দ্র করিয়াই জাতীয়তাবাদী মুসলমান ও মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলনের মধ্যে মতবিরোধ গড়িয়া উঠেঃ জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ ছিলেন তাহা গ্রহণ করার একান্ত পক্ষপাতী।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হইল যে, ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই এক বৎসর সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দিবার পক্ষে নেহরু রিপোর্টের যে দাবী, গভর্ণমেণ্ট যদি তাহা পূরণ না করেন, তাহা হইলে কংগ্রেস সে রিপোর্ট পরিহার করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করিবে। ১৯২৯ সাল এক বিপুল গণ-জাগরণের বৎসর। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আরউইন ভারতীয় অবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য ইতিমধ্যে বিলাত ঘুরিয়া আসিয়াছেন। ১৯২৯ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখে তিনি ঘোষণা করিলেন, সাইমন কমিশন যখন তাহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, সেরূপ ক্ষেত্রে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করেন, বৃটিশ ভারত ও রাজন্যবর্গ-শাসিত ভারতের সমস্ত দল ও স্বার্থকে ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্যে একটি গোল টেবিল বৈঠকে সম্মিলিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ করিতে। ঘোষণাপত্রে আরও প্রচারিত হয়, 'আমি একথাও সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছি যে, তাঁহাদের বিচারে ১৯১৭ সালের ঘোষণাবাণীর অন্তর্নিহিত অর্থই হইতেছে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনই ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক প্রগতির স্বাভাবিক পরিণতি।' ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে গোলটেবিল সম্মেলন আহূত হইবে কিনা সে সম্বন্ধে ঘোষণাপত্রের এই অংশটুকু অত্যন্ত অস্পষ্ট থাকায়, ঘোষণাপত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য দিল্লীতে এক নেতৃ-সম্মেলন আহ্বান করা হইল; সম্মেলন গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অস্পষ্ট অংশটুকু স্পষ্টতর ব্যাখ্যা চাহিয়া পাঠাইলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের ঠিক প্রাক্কালে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, রাষ্ট্রপতি প্যাটেল, স্যার তেজ-বাহাদুর সপ্রু ও মিঃ জিন্না এই প্রসঙ্গে বড়লাটের সহিত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে সাক্ষাৎ করিলেন। ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যেই যে সম্মেলন আহূত হইবে, সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দিতে বড়লাট কিন্তু সম্মত হইলেন না। কংগ্রেস তাহার কলিকাতা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ঘোষণা করিল, কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের প্রথম ধারায় উল্লিখিত 'স্বরাজ' শব্দের অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ইহাও ঘোষিত হইল যে, অতঃপর সমগ্র নেহরু রিপোর্টটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। খাজনা বন্ধ আন্দোলনসহ আইন অমান্য আন্দোলনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে অধিকার প্রদান করা হইল। আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হইল পরবর্তী মার্চ মাসে এবং তাহার স্থায়িত্বকাল হইল পূর্ণ এক বৎসরব্যাপী। সাইমন কমিশন রিপোর্ট পেশ হইল ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি এবং

প্রথম গোল টেবিল বৈঠক লণ্ডনে আহূত হয় পরবর্তী শরৎকালে। এ অধিবেশনে কংগ্রেস অনুপস্থিত রহিল এবং যাঁহারা সম্মিলিত হইলেন, তাঁহারা বৃটিশ ভারত ও রাজন্যবর্গশাসিত ভারতের প্রতিনিধি। বৃটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ ও যোগ-দানেচ্ছু এক বা একাধিক দেশীয় রাজ্যকে লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত ইহাতে গৃহীত হয়। তাহা ছাড়া, সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের আওতায় আসিয়া পড়িল। পৃথক ও যৌথনির্বাচন সম্বন্ধে মতামত যাচাই করিবার পর স্থির হইল, পৃথক-নির্বাচন-প্রথাই প্রবর্তিত রহিবে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সম্মতি ব্যতিরেকে তাহা প্রত্যাহৃত হইবে না। যুক্তরাষ্ট্র ও তদন্তবর্তী ইউনিটসমূহের অধিকার এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পর সেগুলিকে পৃথক পৃথক তালিকাভুক্ত করা হইল; কিন্তু 'রেসিডিউয়ারী' ক্ষমতা ও যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা নির্ধারণ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল না।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে লর্ড আরউইন এবং কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধী সাময়িক সংগ্রাম বিরতির এক পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন, ফলে ১৯৩১ সালের শরৎকালে যে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসিবার কথা, কংগ্রেসের তাহাতে যোগ দিবার পথ প্রশস্ত হইল। ঠিক এই সময়ে বেনারস, কাণপুর ও অন্যান্য স্থানে সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। জাতীয়তাবাদী মুসলিমগণ ইতিমধ্যে জাতীয়তাবাদী মুসলিম কন্‌ফারেন্স-রূপে আপনাদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন; অপরদিকে মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলন মুসলিম লীগ ও খিলাফত কন্‌ফারেন্সের কর্মপন্থা কার্যতঃ আত্মস্থ করিয়া লইয়াছেন। এই উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য কেবলমাত্র নির্বাচন-সংক্রান্ত প্রশ্ন লইয়াঃ জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ যৌথ-নির্বাচন-প্রথার পক্ষপাতী এবং মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলন পৃথক-নির্বাচন-প্রথার সমর্থক। ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে স্যার আলি ইমামের সভাপতিত্বে জাতীয়তাবাদী মুসলিম কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন আহূত হইল লক্ষ্ণৌয়ে। এই সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন, রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়া যদিও একদা তিনি সেই দলেরই সভ্য ছিলেন পৃথক নির্বাচনের প্রতি যাঁহাদের পক্ষপাতিত্ব অতিশয় প্রবল এবং যদিও সেই মতের সমর্থকরূপে ও প্রতিনিধিমণ্ডলীর অন্যতমরূপে তিনি একদা লর্ড মিণ্টোর সাক্ষাৎপ্রার্থী হন, তথাপি গভীর অভিনিবেশসহকারে এই প্রশ্নটি আলোচনা করিবার পর তিনি এই সিদ্ধান্তেই আসিয়া উপনীত হইয়াছেন যে, পৃথক নির্বাচন যে শুধু ভারতের জাতীয়তাবাদেরই অস্বীকৃতি তাহা নয়, পরন্তু মুসলমান স্বার্থেরও সবিশেষ পরিপন্থী। সম্মেলনে নিম্নলিখিতরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার সহিত মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে একটি ঘোষণা সন্নিবদ্ধ থাকিবে; কৃষ্টি, ভাষা, ব্যক্তিগত বিধান প্রভৃতি সংরক্ষণ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দান করিতে হইবে; ভারতীয় শাসনতন্ত্রের কাঠামো হইবে যুক্তরাষ্ট্রিক এবং 'রেসিডিউয়ারী' ক্ষমতা যোগদানকারী ইউনিটগুলির হাতে অর্পণ করিতে হইবে; সরকারী চাকুরীর যথাযোগ্য অংশ হইতে যাহাতে কোন সম্প্রদায় বঞ্চিত

না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া 'পাবলিক সার্ভিস কমিশন' নিম্নতম যোগ্যতার ভিত্তিতে লোক নির্বাচন করিবেন; সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিতে হইবে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থানেও একই শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রে ও প্রদেশসমূহে প্রতিনিধি প্রেরণের প্রথা ও পরিমাণ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা এই যে, প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই সর্বজনীন ভোটাধিকার, যৌথ-নির্বাচন-প্রথা, মোট জনসংখ্যার শতকরা ত্রিশভাগের কম লোকসমষ্টি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র আসন সংরক্ষণ এবং প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত আসনের জন্যও তাহাদের প্রতিযোগিতা করিবার অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলন ও জাতীয়তাবাদী মুসলিম সম্মেলনের মধ্যে মীমাংসা বিধানের জন্য চেষ্টা হয় বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। আপোষ-রফার বিভিন্ন প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সিমলাতে উভয় দলের এক মিলিত সম্মেলনের অধিবেশন হইল ১৯৩১ সালের ২২শে জুন তারিখে। এ সম্বন্ধে প্রকাশ্য বিবৃতি প্রচার করিয়া ডাক্তার এম, এ, আনসারী বলিলেন, 'সিমলায় আসিয়া আমাদের মনে হইল, এখানকার আবহাওয়া আপোষ-রফার পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল। আমাদের সে আশঙ্কা অচিরে রূঢ় সত্যে পরিণত হইল। সিমলার শোচনীয় পরিবেশ ও প্রভাব ইতি-মধ্যেই সর্বসাধারণের বিদিত হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই সে বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একতা বিধানের জন্য যাঁহারা যত্নবান, সিমলার প্রভাব ও পরিবেশ তাঁহাদের তুলনায় অতিশয় বলশালী; তাই উভয়পক্ষের মিলনের অনুকূল সর্ত সন্ধানের সকল চেষ্টা তাহাতে আহত হইয়া ব্যর্থ হইয়া গেল।' ৬

কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে মহাত্মা গান্ধী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবার জন্য বিলাত যাত্রা করিলেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ ভারত হইতে যে সব ব্যক্তিকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করেন, তাঁহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়; কিন্তু ডাক্তার আনসারীকে আমন্ত্রণ করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অগ্রাহ্য করিলেন। গোলটেবিল বৈঠকের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য কমিটির মধ্যে 'মাইনরিটিজ কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা আলোচনার ভার অর্পিত হয় তাহার উপর। কিন্তু কমিটি সে সম্বন্ধে কোন সর্ব-সম্মত সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইতে পারিলেন না। কাজেই দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় সমস্যা এবং তৎসংশ্লিষ্ট আরও অন্যান্য বহুতর সমস্যা অমীমাংসিতই রহিয়া গেল। অবশ্য এই ব্যর্থতার দরুণ কোন ভারতবাসীই বিস্ময় বোধ করেন নাই; কারণ তাঁহারা জানিতেন, নেপথ্যে রহিয়া যে শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তাহার প্রভাব অগ্রাহ্য করিয়া কোনরূপ মীমাংসায় সম্মত হওয়া অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে মিঃ এডওয়ার্ড টম্সন লিখিতেছেন, 'গোলটেবিল বৈঠক চলিতে থাকাকালে একদিকে আপোষবিরোধী মুসলমান সম্প্রদায় এবং অপরদিকে গণতন্ত্রবিরোধী বৃটিশ রাজনীতিক মহল—এই উভয়

6. Annual Register for 1931, P. 305.

পক্ষের মধ্যে স্পষ্টতঃই একটি গোপন চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই ভারতবর্ষে প্রায়ই বলা হইয়া থাকে, ভারতীয় প্রগতির পথে ইহাই একমাত্র অন্তরায়। আমার বিশ্বাস, এই উক্তি যে অনেকাংশে সত্য, তাহা সপ্রমাণ করিতে আমি সক্ষম। ভারতশাসন ব্যাপারে আমরা অতীতেও যে যথেচ্ছভাবে ভেদনীতি অনুসরণ করিয়াছি, তাহা অস্বীকার করা চলে না। ওয়ারেণ হেস্টিংসের আমল হইতে আজ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষরূপ কৌতুকের প্রতি কোনদিন আমাদের অরুচি জন্মায় নাই। এমন কি, এলফিনস্টোন, ম্যালকম ও মেটকাফের ন্যায় ব্যক্তিরাও বৃটিশ স্বার্থের পক্ষে তাহার উপযোগিতার কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।' ৭

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার উপসংহার করিতে গিয়া প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ঘোষণা করিলেন, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আসন-সংরক্ষণ ও রক্ষাব্যবস্থার সর্তাধীনে দায়িত্বশীল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপদ্ধতিই অস্থায়ীভাবে সমর্থন করেন; গভর্ণরের অধীন প্রদেশসমূহে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও, বাহিরের নির্দেশ ও হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত হইয়া আপন আপন ক্ষেত্রে স্ব স্ব নীতির অনুসরণে তাহারা সর্বোচ্চ পরিমাণ স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবে; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গভর্ণরশাসিত অন্যান্য প্রদেশের সহিত সম-মর্যাদাসম্পন্ন প্রদেশে পরিণত হইবে এবং যথোপযুক্ত আর্থিক আনুকূল্য লাভ সম্ভব হইলে সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে গঠন করা হইবে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, সাম্প্রদায়িক অচল অবস্থা যদিও ভারতীয় প্রগতির পথে এক প্রবল অন্তরায়, তথাপি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর যে, ভারতীয় অগ্রগতিকে সে অন্তরায় দ্বারা ব্যাহত হইতে তাঁহারা দিবেন না। ইহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট আপনাদের হইয়া কেবল যে আপনাদের প্রতিনিধি প্রেরণের সমস্যারই সমাধান করিয়া দিবেন তাহা নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কর্তৃক গণতান্ত্রিক নীতির নিরংকুশ ও অত্যাচারমূলক অপপ্রয়োগ হইতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার জন্য কোথায় কি সংযম ও সমভার-প্রতিকূলতা সংস্থাপন করা প্রয়োজন, তাহাও অতিশয় বিচক্ষণতা ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত তাঁহারা নির্ধারণ করিয়া দিবেন।'৮

এই ঘোষণা-বাণীর স্বাভাবিক পরিণতিরূপে ১৯৩২ সালের আগষ্ট মাসে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্ত প্রদত্ত হইল। এই পরিকল্পনার পরিধি ইচ্ছা করিয়াই বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক প্রাদেশিক আইনসভাসমূহে প্রতিনিধি প্রেরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হইল। কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারের সহিত দেশীয় রাজন্যবর্গের সমস্যা জড়িত, কাজেই তাহা বিস্তৃততর আলোচনাসাপেক্ষরূপে উপস্থিতের মত স্থগিত থাকিল। আশা করা হইল, প্রতিনিধি প্রেরণের মূলনীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে একবার যখন ঘোষণা বাণী প্রচারিত হইয়াছে, তখন সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানকল্পে সম্প্রদায়সমূহ নিজে নিজেই একটা সুষ্ঠু উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইতে সক্ষম হইবেন। নূতন ভারত-

7. Edward Thompson: 'Enlist India for Freedom', P. 50.
8. Annual Register, Vol. II, 1931, P. 446.

শাসন আইন বিধিবদ্ধ হইয়া যাইবার পূর্বেই গভর্ণমেণ্ট যদি বুঝিতে পারেন যে, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়সমূহ পারস্পরিক আলোচনার সাহায্যে অপর কোন একটি অনুকল্প ব্যবস্থায় সম্মত হইতে পারিয়াছেন, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্তের স্থলে সেই অনুকল্প পরিকল্পনাটিই যাহাতে গৃহীত হয়, তজ্জন্য পার্লামেণ্টের নিকট তাঁহারা সুপারিশ করিবেন। সিদ্ধান্তের দ্বারা মুসলমান, ইউরোপীয় ও শিখ সম্প্রদায় পৃথক নির্বাচনের সাহায্যে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার লাভ করেন। মারাঠাগণের জন্য বোম্বাই প্রদেশের স্থানে স্থানে সাধারণ নির্বাচনকেন্দ্রে কিছু আসন সংরক্ষিত থাকে। অনুন্নত শ্রেণী সম্বন্ধে ব্যবস্থা হয়, তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত আসন তাঁহাদের নিজস্ব নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা পূর্ণ করিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীতেও তাঁহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। ভারতীয় খৃষ্টান ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা বিহিত হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহিলাগণের জন্য কিছুসংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকে। শ্রমিক সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত আসন কয়েকটি শ্রমিক নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারাই পরিপূরণীয়। শিল্প ও ব্যবসায়, খনি এবং চা-করদের জন্য নির্ধারিত আসনগুলি পূর্ণ করিবে চেম্বার অব্ কমার্স এবং অন্যান্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠান। জমিদারদিগের জন্য নির্দিষ্ট আসনগুলি জমিদার নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারাই পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, 'ভারতের বিশাল জনসমষ্টিকে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংহতিতে বিভক্ত করিবার যে নীতি মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কারে গৃহীত হয়, তাহা ব্যাপকতায় ও বিস্তৃতিতে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারকেও অতিক্রম করিয়াছে। ১৯১৯ সালে নির্বাচকমণ্ডলী দশ ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়; এক্ষণে তাহা সতেরটি অসম অংশে খণ্ডিত। মহিলা ও ভারতীয় খৃষ্টানদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা তাহাদের স্কন্ধে বলপূর্বক চাপাইয়া দেওয়া হয়। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র আসন ছাড়িয়া দিবার ফলে হিন্দু-সংহতি অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়ে। ধর্ম, বৃত্তি ও চাকুরীভেদে বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। খণ্ডকে খণ্ডিত করিবার সর্ববিধ সম্ভব উপায় অবলম্বনে কোনরূপ ত্রুটি হয় নাই।'৯

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আসন বণ্টনের ব্যবস্থাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে প্রতিটি আলোচনায় বাঙলা এবং পাঞ্জাব আসিয়া দাঁড়াইত দুরূহ সমস্যারূপে। এই উভয় প্রদেশই মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু সে গরিষ্ঠতার পরিমাণ অত্যন্ত কম; শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ মাত্র। মুসলমানগণ যদিও এই দুই প্রদেশে সংখ্যাগুরু-সম্প্রদায়, তথাপি তাঁহারা আপনাদের জন্য পৃথক নির্বাচন ও সংরক্ষিত আসনের দাবী করিলেন। ইউরোপীয় সম্প্রদায়কে অতিরিক্ত 'ওয়েটেজ্' দিবার সরকারী সিদ্ধান্ত বাঙলার অবস্থাকে আরও জটিল করিয়া তুলিল। অথচ পাঞ্জাবে অ-মুসলমান সম্প্রদায়কে হিন্দু ও শিখ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ফেলা হইল। শিখগণ জেদ ধরিলেন, যদি পৃথক নির্বাচন ও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাই গৃহীত হয়, তাহা হইলে মুসলমানগণ যে সব প্রদেশে সংখ্যা-

9. Mehta and Patwardhan : The Communal Triangle, P. 72.

লঘু সেখানে তাঁহারা যে 'ওয়েটেজ' ভোগ করিয়া থাকেন, অন্যতম সংখ্যালঘু-সম্প্রদায় হিসাবে পাঞ্জাবে তাঁহারাও তাহাই দাবী করিবেন। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের ফলে মুসলমানগণ যত সংখ্যক আসন লাভ করিয়াছিলেন, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা কিছু ইতরবিশেষ করিয়া বাঙলা ও পাঞ্জাব ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশে তাঁহাদিগকে প্রায় সমসংখ্যক আসনই প্রদান করিল। বাঙলায় হিন্দুগণ সমগ্র জনসমষ্টির শতকরা ৪৪·৮ ভাগ হিসাবে সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়। অথচ তাহাদিগকে দেওয়া হইল মোট ২৫০টি আসনের মধ্যে ৮০টি, অর্থাৎ সমগ্র আসনসংখ্যার শতকরা ৩২ ভাগ। মুসলমানগণ মোট জনসংখ্যার ৫৪·৮ ভাগ; কিন্তু তাহারা অধিকার করিল ১১৯টি আসন, অর্থাৎ মোট আসনসংখ্যার শতকরা ৪৭·৬ ভাগ। আবার ইউরোপীয়গণ মোট জনসংখ্যার শতকরা ·০১ ভাগ এবং তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদের জন্য আসনসংখ্যা নির্ধারিত হইল ২৫টি, অর্থাৎ মোট আসনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘুত্বে পরিণত করিয়া ও সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ অপহরণ করিয়া ইউরোপীয়দিগকে ২,৫০,০০০ গুণ অধিক 'ওয়েটেজ' দিবার ব্যবস্থা কায়েম করা হইল। এ স্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই আসনসংখ্যা হ্রাস করা হইল বটে, কিন্তু হ্রাসপ্রাপ্ত হিন্দু-আসনের সংখ্যাই হইল অধিকতর। প্রকারান্তরে ব্যাপারটা দাঁড়াইল এই যে, অন্যান্য প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে 'ওয়েটেজ' দেওয়া হইয়া থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অংশ হইতে আসন কাটিয়া লইয়া; কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা দেওয়া হইল অপর আর এক সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অংশ হইতে অপহরণ করিয়া; অথচ যাহাদিগকে 'ওয়েটেজ' দিবার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর ত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য করা হইল, যে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মত তাহারা নিজেরাই 'ওয়েটেজ' পাইবার অধিকারী—দিবার নয়। পাঞ্জাবেও শিখদিগকে 'ওয়েটেজ' দিবার জন্য হিন্দুগণকে নিজেদের প্রাপ্য আসনের অংশ ছাড়িয়া দিতে হইল। অথচ ন্যায়-নীতির দিক হইতে বিচার করিলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে তাহারাই 'ওয়েটেজ' পাইবার দাবীদার। এ স্থলে ইহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যদিও মুসলমানগণ এতদুভয় প্রদেশের আইন-পরিষদসমূহে একক সর্ববৃহৎ দল এবং যদিও পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলীর দ্বারা পরিপূরণীয় কিছুসংখ্যক আসন এখনও তাঁহাদের জন্য সংরক্ষিত; তথাপি মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা এরূপভাবে হ্রাস করিয়া ফেলা হইল যে, তাহার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পরিণত হইয়া গেল সংখ্যালঘু দলে। যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠতা ও গরিষ্ঠতা নির্বিশেষে হিন্দুদিগকে প্রত্যেক প্রদেশেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল, বিশেষ করিয়া বাঙলায় যে ব্যবস্থার দ্বারা তাহাদের উপর আরোপিত ক্ষতির পরিমাণ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত ক্ষতি অপেক্ষা বহু বেশী—প্রায় দ্বিগুণ, সমগ্র হিন্দু সমাজ যদি তাহার উপর বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। গভর্ণমেণ্ট বিরোধিতার আশংকা করিয়াছিলেন, সেই কারণেই এই প্রসঙ্গে প্রচারিত সরকারী বিবৃতিতে লিখিত হইলঃ 'যেহেতু বিবদমান প্রতিটি পক্ষই এত অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি দাবী

করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতিপক্ষ তাহাতে কোনক্রমেই সম্মত হইতে পারেন না, সেইজন্যই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সর্ত সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষার পক্ষেই অপরিহার্যরূপে অসন্তোষজনক হইতে বাধ্য। বস্তুতঃ, বাঁটোয়ারা যে পরিমাণে সমতাসম্পন্ন হইবে, সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের হতাশা ঠিক সেই পরিমাণে বর্ধিত হইবে। কিন্তু স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কল্যাণে এই দুরূহ সমস্যার যাহাতে সন্তোষজনক সমাধান হয়, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহার জন্য নিঃস্বার্থভাবে নিরতিশয় যত্নবান; সেইজন্যই আশা করা যাইতেছে, যে মনোভাবের বশে এই বাঁটোয়ারা রচিত, ভারতবাসিগণ তৎপ্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হইয়া ইহা গ্রহণ করিবেন ও কার্যকরী করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইবেন। পরিশেষে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন, ভারতসচিব এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, ভারতশাসন আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ফলে যদি কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইতে সমর্থ হন, ভারতসচিব তাহা সানন্দে গ্রহণ করিয়া লইবেন।'

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোভাব নিঃসন্দেহেই নিঃস্বার্থ! এই নিঃস্বার্থ কল্যাণ কামনার বশেই হিন্দুদিগকে সর্বত্রই দণ্ডিত করিবার আয়োজন; ইহারই অনুপ্রেরণায় বাঙ্গলার হিন্দুগণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের প্রতিনিধি সংখ্যা হ্রাস করিয়া—সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় অপেক্ষা বহু অধিক সংখ্যায় হ্রাস করিয়া ইউরোপীয়গণকে ২,৫০,০০০ গুণ 'ওয়েটেজ' দিবার ব্যবস্থা! পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর সুবিধাপ্রাপ্ত মুসলমান-সম্প্রদায় প্রত্যেক প্রদেশে 'ওয়েটেজ' পাইয়াছেন। এমন কি, যে সমস্ত প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানেও তাঁহাদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত; অথচ এই নিঃস্বার্থ পরহিতৈষণা দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়াই পাঞ্জাবে শিখদিগকে মুসলমানদের সমপরিমাণ 'ওয়েটেজ' লাভের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল। গভর্ণমেণ্ট স্বহস্তে সর্বপ্রকার আপোষ-রফার প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করিবার পর প্রতিশ্রুতি দিলেন, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়সমূহ যদি কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইতে সক্ষম হন, তাঁহারা সানন্দে সে সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইবেন!

বৃটিশ ভারত ও রাজন্যবর্গ শাসিত ভারতের প্রাপ্ত সুখ-সুবিধার তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যাইবে, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন প্রথমোক্ত পক্ষের প্রাপ্য অংশ অপহরণ করিয়া শেষোক্ত পক্ষের অঞ্চলে মুক্তহস্তে ঢালিয়া দিয়াছে। রাজন্যবর্গশাসিত ভারতের অধিবাসী-সংখ্যা সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার শতকরা তেইশ ভাগ, অথচ যুক্তরাষ্ট্রের নিম্ন-পরিষদে রাজন্যবর্গের প্রতিনিধির সংখ্যা শতকরা ত্রিশ এবং উচ্চ-পরিষদে চল্লিশ। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার কেবলমাত্র দেশীয় রাজন্যবর্গের, দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের নয়। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় নিম্ন-পরিষদে রাজন্যবর্গের মনোনীত সদস্যদের জন্য শতকরা ত্রিশটি আসন সংরক্ষিত করা হইল। এক হস্তে প্রদত্ত দান অপর হস্তে অপহরণ করিবার ইহা হইতে সূক্ষ্মতর কৌশল বোধ করি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে প্রমাণিত হইবে যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা রচিত

হইবার পরেও ভারতবর্ষে আর একবার আপোষ-নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হয় এবং যখন তাহা সার্থকতার সমীপবর্তী হইয়াছে ঠিক সেই মুহূর্তে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপের ফলে তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়, ১৯৩২ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে। মহাত্মা গান্ধীর প্রায়োপবেশন ও তাহার ফলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার অন্তর্গত অনুন্নত শ্রেণীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট অংশ কিয়ৎ পরিমাণ সংশোধিত হইবার পর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও মৌলানা শৌকত আলি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিবর্তে নূতন কোন এক পরিকল্পনা রচনার প্রচেষ্টায় আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রারম্ভিক উদ্যোগ-আয়োজন আশাপ্রদ বলিয়াই মনে হইল। মৌলানা শৌকত আলি ১৯৩২ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখে বড়লাটের নিকট এই মর্মে আবেদন করিলেন যে, হয় মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দেওয়া হোক, নয় আপোষ-আলোচনার অনুকূলে সহায়তা লাভের জন্য তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হোক। ১৯৩২ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলনের সভাপতির পক্ষ হইতে যে বিবৃতি প্রচারিত হয় তাহার মর্ম হইল এইরূপঃ পৃথক ও যৌথ নির্বাচনের প্রশ্ন পুনরুত্থাপনের পক্ষে বর্তমান সময় আদৌ অনুকূল নয়; মুসলমান সম্প্রদায়ও তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সংরক্ষণ-ব্যবস্থা পরিহার করিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন। তবে প্রতিটি প্রধান সমস্যা সংশ্লিষ্ট কোন সুস্পষ্ট প্রস্তাব যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উদ্যোগে বিরচিত হয়, তাহা হইলে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তাঁহারা প্রস্তুত। ৯ই আগষ্ট তারিখে বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী মৌলানা শৌকত আলির আবেদনের উত্তরে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম প্রেরণ করিলেনঃ 'আপনি যে কার্যে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহার পশ্চাতে সাধারণভাবে মুসলমান সমাজের সমর্থন আছে কিনা, তাহা নির্ণয় করাই আপনার প্রথম কর্তব্য। মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলনের সভাপতি এবং আরও অপরাপর কর্তৃক ৭ই আগষ্ট তারিখে যে বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে—এই প্রসঙ্গে তৎপ্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি।'১০ মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলনের সভাপতির বিবৃতি যতক্ষণ না সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী যে মৌলানা শৌকত আলির আবেদনের উত্তর দানে বিরত ছিলেন—একথা অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন; কারণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ৭ই আগষ্ট তারিখে প্রচারিত বিবৃতির কথা ৯ই আগষ্ট তারিখের টেলিগ্রামে উল্লিখিত। মৌলানা শৌকত আলি তাঁহার দ্বিতীয় আবেদন প্রেরণ করিলেন ২৬শে অক্টোবর তারিখে, এই আবেদনে বড়লাটকে তিনি অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন, সর্বসাধারণের কল্যাণে শান্তি সংস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের উপর তিনি যেন তাঁহার প্রভাব প্রয়োগ করেন। ২৭শে অক্টোবর তারিখে ত্বরিত উত্তর আসিল, মহাত্মা গান্ধী যতক্ষণ না আইন অমান্য আন্দোলনের সহিত তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করিতেছেন, ততক্ষণ এ অনুরোধ রক্ষিত হইবে না। গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাতের জন্য পুনরায় আবেদন করা হইলে,

10. Mitra's Annual Register, 1932, Vol. II. P. 281—82.

জবাবে জানান হইল, সাক্ষাতের অনুমতি যে মিলিবে না—এই কথা জ্ঞাপন করাই ছিল ২৭শে তারিখের পত্রের তাৎপর্য।

সরকারী মনোভাবের দরুণ নিরুৎসাহ না হইয়া ১৬ই অক্টোবর তারিখে লক্ষ্ণৌয়ে এক মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলনের অধিবেশন আহূত হইল। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ইতিপূর্বে প্রস্তাব করেন, হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবার জন্য সম্মেলনের পক্ষ হইতে একটি কমিটি গঠন করা হউক। তদনুযায়ী সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য কার্যতঃ একটি কমিটি গঠিতও হইয়াছিল। মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলনের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের এই প্রস্তাবকে সম্বর্ধিত করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৩২ সালের ৩রা নভেম্বর তারিখে এলাহাবাদে 'ইউনিটি কন্‌ফারেন্সের' অধিবেশন আরম্ভ হইল; এই অধিবেশনে ৬৩জন হিন্দু, ১১জন শিখ, ৩৯জন মুসলমান ও ৮জন ভারতীয় খৃষ্টান প্রতিনিধি সম্মিলিত হন। সম্মেলন ১০জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠন করিলেনঃ কমিটির কাজ হইবে, আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা করা ও তাঁহাদের কার্যের ফলাফল সম্মেলনের গোচর করা। দিনের পর দিন সম্মেলনের অধিবেশন চলিতে থাকে এবং যে সকল বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়াছিল অথবা দিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাদের অধিকাংশ সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এমন কি বাংলা ও পাঞ্জাব সম্বন্ধীয় অতিশয় তিক্ত ও বিরক্তিকর প্রশ্নেরও অন্ততঃ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা মীমাংসা হইয়া গেলঃ যৌথ-নির্বাচন দ্বারা পরিপূরণীয় মুসলমানদের জন্য শতকরা একান্নটি সংরক্ষিত আসনের দাবী হিন্দুগণ মানিয়া লইলেন। 'রেসিডিউয়ারী' ক্ষমতা কেন্দ্রে অথবা প্রদেশসমূহে ন্যস্ত থাকিবে—সে সম্বন্ধেও একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। অপর আর একটি সিদ্ধান্তের দ্বারা যৌথ-নির্বাচন-প্রথা গৃহীত হইয়া গেলঃ সাব্যস্ত হইল, প্রত্যেক প্রার্থীকে তাহার স্ব সম্প্রদায়ের মোট ভোট-সংখ্যার শতকরা অন্ততঃপক্ষে ত্রিশটি আপন অনুকূলে পাইতে হইবে এবং তাহা যদি না পান, তাহা হইলে সর্বোচ্চসংখ্যক ভোট যাঁহারা পাইবেন তাঁহারাই নির্বাচিত হইলেন বলিয়া গণ্য হইবেন। ইহাও সাব্যস্ত হইল যে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মুসলমানগণ শতকরা বত্রিশটি আসন অধিকার করিবেন। উভয়পক্ষই কোথাও বা ক্ষতি স্বীকার করিলেন আবার কোথাও বা লাভবান হইলেন।

কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্মতি পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইল না এবং তাহা হইল বাংলায় ইউরোপীয়দিগের বিপুল 'ওয়েটেজ' লাভ। চুক্তি অনুযায়ী স্থির হইয়াছে, হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিগণ মোট আসনসংখ্যার শতকরা ৯৫·৭ ভাগ আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইবেন, কাজেই ইউরোপীয় সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বলে তাঁহাদের প্রাপ্য শতকরা দশটি আসন অধিকার করেন কোথা হইতে? সুতরাং সাব্যস্ত হইল, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই কলিকাতাস্থ ইউরোপীয়গণের সহিত এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিবেন। অতঃপর সম্মেলনের এলাহাবাদ অধিবেশন মুলতুবী হইল।

স্মরণ থাকিতে পারে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলমান প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন পরবর্তী আলোচনাসাপেক্ষরূপে স্থগিত রাখা হয় এবং সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, প্রয়োজনানুরূপ আর্থিক সংগতি লাভের সর্তাধীনে। ইউরোপীয়দিগের সহিত তাহাদের 'ওয়েটেজ' সম্বন্ধে আলোচনার জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য যখন মুসলমান প্রতিনিধিবর্গ সমভিব্যাহারে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, তখন স্যার স্যামুয়েল হোর অগ্রিম ঘোষণা করিয়া বসিলেন যে, সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, কেন্দ্রীয় পরিষদে মোট বৃটিশ ভারতীয় আসনের শতকরা ৩৩⅓ ভাগ মুসলমানদিগকে দেওয়া হইবে এবং সিন্ধুকে যে শুধু স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা হইবে তাহাই নয়, তাহার জন্য প্রয়োজনানুযায়ী অর্থসাহায্যও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে যাহাতে প্রদত্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। ঐক্য সম্মেলন কয়েক সপ্তাহ ব্যাপী কঠোর প্রচেষ্টার পর হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানে সক্ষম হইলেন; তাঁহাদের পরিশ্রমলব্ধ ফল যখন পরিণত ও পরিপক্ক আকারে তাঁহাদের করতলগত হইবার জন্য উদ্যত, ঠিক সেই মুহূর্তে স্যার স্যামুয়েল হোরের এই ঘোষণার নিষ্ঠুর আঘাতে তাহা ভূপাতিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল, চুক্তি সর্ত যতই ন্যায় ও নীতিসঙ্গত হউক না কেন, তাহাতে আপত্তি করিবার মত দল বা উপদলের অস্তিত্ব যতক্ষণ বিদ্যমান রহিবে এবং চুক্তির ফলে প্রাপ্য সুখ-সুবিধা হইতে অধিকতর লোভনীয় আশ্বাস লইয়া অগ্রসর হইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যতক্ষণ প্রস্তুত রহিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সর্বোচ্চ মূল্যে আত্মবিক্রয় করিবার মত দল বা উপদলের অভাব হইবে না। সেরূপ ক্ষেত্রে সকল সম্প্রদায়ের মিলিতভাবে সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশা নিতান্ত দুরাশা মাত্র।

(পনেরো)

পার্থক্যের কোন বর্দ্ধিততর

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার দ্বারা অনুন্নত সম্প্রদায়কেও পৃথক্ নির্বাচক মণ্ডলী ও সংরক্ষিত আসন দান করা হয়। পুণা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় মহাত্মা গান্ধীর প্রায়োপবেশনের ফলে; সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কল্যাণে অনুন্নত সম্প্রদায় তাহাদের বিশিষ্ট নির্বাচন প্রথার সাহায্যে যতসংখ্যক আসন পাইতে পারিত, এই চুক্তির দ্বারা বাঁটোয়ারা কিয়ৎ পরিমাণে সংশোধিত হওয়ার দরুণ তাঁহারা তদপেক্ষা অনেক অধিকসংখ্যক আসনের অধিকারী হইলেন। নূতন শাসনতন্ত্র বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ যদি কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে সম্মত হইতে পারেন, তাহা হইলে বাঁটোয়ারার পরিবর্তে তাহাই গৃহীত হইবে বলিয়া বৃটিশ যে প্রতিশ্রুতি দেন, তদনুযায়ী এই সংশোধন সম্ভবপর হইয়াছিল। ঠিক অনুরূপভাবে একদিকে মুসলমান ও অপরদিকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে চুক্তি

সম্পাদন করিয়া, বাঁটোয়ারার পরিবর্তে তাহাই গ্রহণ করাইয়া লইতে হইবে—ইহাই ছিল এলাহাবাদ ঐক্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও উদ্যম। সে সাধনার সিদ্ধি যখন প্রায় করতলগত, ঠিক সেই মুহূর্তে স্যার স্যামুয়েল হোর কিরূপে তাহা পণ্ড করিয়া দেন, তাহাও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু ইহার দ্বারা হিন্দু ও শিখদের প্রতিরোধ প্রতিনিবৃত্ত হইল না। এদিকে শাসনসংস্কার-সংক্রান্ত প্রস্তাব যখন তাহার অন্তহীন আলোচনার পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, এই প্রতিরোধ তখন দিনে দিনে প্রসার ও পুষ্টি লাভ করিতেছে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বলিয়াছিলেন, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে অনৈক্যকে শাসনসংস্কার প্রবর্তনের পথে অন্তরায় হইতে দিবেন না এবং তদনুযায়ী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন ১৯৩২ সালের আগষ্টে। কিন্তু এই বিল পাশ করাইয়া লইতে তাঁহাদের তিন বৎসর লাগিয়া যায়, উহা বিধিবদ্ধ হয়, ১৯৩৫ সালের জুন মাসে। কংগ্রেস ইতিমধ্যে আর একবার অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশন আহূত হয় ১৯৩৪ সালের অক্টোবরে; এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে এ অধিবেশনে সে তাহার স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করিতে পারিত, বাঁটোয়ারা বর্জিত অথবা গৃহীত হইবে—সে সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মতদ্বৈধতা থাকার দরুণ তাহা করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ইহার কয়েক সপ্তাহ পরেই কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচন হইয়া গেল; এই নির্বাচনে অন্যান্য আরও অনেক বিষয় সহ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কংগ্রেসের নিরপেক্ষ নীতিও হইল প্রতিপক্ষদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অধিকাংশ প্রদেশেই কংগ্রেস জয়ী হইল; কেবলমাত্র বাংলার নির্বাচিত সদস্যগণ অন্য সকল বিষয়ে কংগ্রেসের আনুগত্য মানিয়া লইলেও, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহাদের বিশিষ্ট পথ অনুসরণ করিবার অধিকার দাবী করিলেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও বৃটিশ ভেদনীতির বিরুদ্ধে উত্থিত প্রবল বিরোধ ও বিতর্ক ফলপ্রসূ হইল এবং সেই ফল হইল প্রবাদ-বিদিত 'কলহের কনক আপেল'। ১৯৩৫ সালের প্রথম দিকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই উভয় প্রতিষ্ঠানের সভাপতিদ্বয়ের মধ্যে আপোষ-রফার আর একবার চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহাও সার্থক হইল না।

ভারতশাসন আইন বিধিবদ্ধ হইল ১৯৩৫ সালের জুন মাসে এবং নির্বাচন-পর্ব নিষ্পন্ন হইল ১৯৩৬—৩৭ সালের শীতকালে। ভারতীয় জনসাধারণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলপূর্বক তাহাদের স্কন্ধে শাসনসংস্কার আরোপ করিবার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' ১৯৩৬ সালের বোম্বাই অধিবেশনে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে; তদন্তর্গত প্রাদেশিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে স্বমত ব্যক্ত করিতে গিয়া বলা হয়, ইহার মধ্যে আপত্তিজনক এমন কতকগুলি অংশ আছে, যাহার দরুণ ব্যবস্থাপকসভা—তথা মন্ত্রী-পরিষদের হস্তে প্রকৃত দায়িত্ব বলিতে কিছুই অর্পিত হইবে না ইহা সত্য, তথাপি যতটুকু সম্ভব তাহাকে কাজে লাগাইবার জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য; পরিশেষে নিখিল ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশপ্রসঙ্গে বলা হইল, ইহা পূর্ণমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল, প্রতীপগতিপরায়ণ, দেশীয় রাজ্যের তুলনায় বৃটিশ ভারতের মূল স্বার্থের পক্ষে

অধিকতর মারাত্মকরূপে হানিকর, ভারতের কাম্যতম লক্ষ্য পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনে পৌঁছাইবার প্রয়াস অনির্দিষ্টকালের জন্য বিলম্বিত করিবার উদ্দেশ্যে রচিত এবং ভারতীয় স্বার্থের কল্যাণে গ্রহণের একান্ত অযোগ্য। এ স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা নিন্দিত ও ধিকৃত হইল, তাহা মুসলিম স্বার্থের প্রতিকূল বলিয়া নয়, হইল এই কারণে যে, ভারতের কাম্যতম লক্ষ্য স্বায়ত্তশাসনে পৌঁছাইবার প্রয়াস অনির্দিষ্টকালের জন্য বিলম্বিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহা রচিত এবং সেইজন্যই ভারতীয় স্বার্থের কল্যাণে তাহা গ্রহণের একান্ত অযোগ্য। মুসলিম লীগ কর্তৃক গঠিত পার্লামেণ্টারী বোর্ড নির্বাচননীতি নির্ধারণ করিয়া এক নির্বাচনী ইস্তাহার প্রচারিত করিলেন। ইহাতে লিখিত হইলঃ 'বিভিন্ন আইনসভায় আমাদের প্রতিনিধিগণ নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবেন, (১) প্রস্তাবিত প্রাদেশিক আইন-পরিষদ ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের স্থানে অবিলম্বে পরিপূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত করিতে হইবে; (২) ইতিমধ্যে মুসলিম লীগের প্রতিনিধিগণ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসাধারণের উন্নতির জন্য বর্তমান শাসনসংস্কার হইতে যতটুকু সুখ-সুবিধা আহরণ করা সম্ভব, বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভার মারফৎ তাহা করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন। পৃথক্-নির্বাচন-প্রথা যতক্ষণ বলবৎ রহিবে, মুসলিম লীগ দলের অস্তিত্ব ততক্ষণ উপপাদিত সত্যরূপে অপরিহার্য; কিন্তু যে দল বা দলসমূহের লক্ষ্য এবং আদর্শ লীগের লক্ষ্য এবং আদর্শের অনুরূপ তাহার বা তাহাদের সহিত সহজ স্বচ্ছন্দ সহযোগিতা করিতে হইবে।' নির্বাচনী ইস্তাহারে যে কার্যক্রম প্রচারিত হয়, তাহার মাত্র দুইটি ধারায় মুসলমানদের বিশিষ্ট স্বার্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, (ক) মুসলমান-গণের ধর্মগত অধিকার রক্ষা করা এবং (খ) মুসলমানদের সাধারণ অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য উপায় উদ্ভাবন করা। অবশিষ্ট ধারাগুলি ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে সর্বসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট; যথাঃ দমনমূলক আইন প্রত্যাহার, যে সমস্ত বিধান ভারতীয় স্বার্থের তথা জনসাধারণের স্বাধীনতার মৌলিক প্রশ্নের প্রতিকূল এবং যদ্দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক শোষণ সম্ভবপর হইবে—তাহাদের প্রত্যাখ্যান; দেশ-শাসন ও সামরিক-বিভাগ সংক্রান্ত ব্যয়ভার হ্রাস, জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র অর্থ-তহবিল গঠন, শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রসার, দেশের স্বার্থে কারেন্সী ও এক্সচেঞ্জ নিয়ন্ত্রণ এবং পল্লী-উন্নয়ন প্রভৃতি। নির্বাচনের সময় মুসলিম লীগ হয় প্রদেশ-সমূহের প্রতিটি মুসলমান আসনের জন্য প্রার্থী দাঁড় করান নাই, নয় করিয়া থাকিলেও, সবগুলি আসন অধিকার করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে কংগ্রেস সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রের প্রতিটি আসনের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করিলেও মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্রের মাত্র কয়েকটির জন্য প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছিলেন। নির্বাচনের ফল দাঁড়াইয়াছিল নিম্নলিখিতরূপঃ—

২নং ছক

১৯৩৭-এর সাধারণ নির্বাচনের ফল

প্রদেশসমূহ	মোট আসন-সংখ্যা	কংগ্রেস অধিকৃত আসন-সংখ্যা	মোট মুসলমান আসন-সংখ্যা	লীগ অধিকৃত আসন-সংখ্যা	অন্যান্য মুসলিম দল কর্তৃক অধিকৃত আসন-সংখ্যা
মাদ্রাজ ...	২১৫	১৫৯	২৮	১১	১৭
বোম্বাই ...	১৭৫	৮৬	২৯	২০	৯
বাঙলা ...	২৫০	৫৪	১১৭	৪০	৭৭
যুক্তপ্রদেশ ...	২২৮	১৩৪	৬৪	২৭	৩৭
পাঞ্জাব ...	১৭৫	১৮	৮৪	১	৮৩
বিহার ...	১৫২	৯৮	৩৯	—	৩৯
মধ্যপ্রদেশ ...	১১২	৭০	১৪	—	১৪
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৫০	১৯	৩৬	—	৩৬
আসাম ...	১০৮	৩৩	৩৪	৯	২৫
উড়িষ্যা ...	৬০	৩৬	৪	—	৪
সিন্ধু ...	৬০	৭	৩৬	—	৩৬
মোট	১৫৮৫	৭১৪	৪৮৫	১০৮	৩৭৭

দেখা যাইতেছে, কংগ্রেস পাঁচটি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল। বোম্বাই ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে স্বতন্ত্র টিকিটে নির্বাচিত প্রার্থিগণ আসিয়া কংগ্রেসদলভুক্ত হন। ফলে ঐ দুই প্রাদেশিক আইন-সভার কংগ্রেসদল সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া নিজস্ব মন্ত্রিসভা গঠন করিতে সক্ষম হয়। বাঙলা, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রভৃতি যে সব প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিদ্যমান, এমন কি, সে সব প্রদেশেও মুসলিম লীগ সংখ্যাগুরুত্ব লাভ করিতে পারে নাই; শুধু তাহাই নয়, এই প্রদেশসমূহের কোনটিতেই লীগ অধিকাংশ মুসলমান আসন পর্যন্ত অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। কাজেই অপরাপর মুসলমান ও অমুসলমান দলের সাহায্য ব্যতিরেকে একক কোথাও লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। প্রদেশ-সমূহের মধ্যে চারটিতে কোন আসনই তাহার অধিকারে আসে নাই এবং পাঞ্জাবে অধিকার করিয়াছিল মাত্র একটি আসন। মন্ত্রিসভা গঠনের প্রশ্ন উঠিলে কংগ্রেস তাহা করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল এই যুক্তিতে যে, 'গভর্নর তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না, বা নিয়মতান্ত্রিক ব্যাপারে মন্ত্রিসভার পরামর্শ উপেক্ষা করিবেন না—পরিষদের কংগ্রেসী দলের নেতৃবর্গ যতক্ষণ না এ বিষয়ে নিশ্চিত হইতে পারিতেছেন ও প্রকাশ্য বিবৃতির দ্বারা সে কথা জনসাধারণের গোচর করিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ কংগ্রেসের পক্ষে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা অসম্ভব।' গভর্নরগণ সে নিশ্চয়তা দিতে অসমর্থ হইলেন, কাজেই কংগ্রেসও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিল না। কংগ্রেস নিশ্চয়তা চাহিয়াছিল কেবলমাত্র গভর্নরদের বিশেষ দায়িত্বের ক্ষেত্র সম্বন্ধে, অর্থাৎ কেবলমাত্র সেই সব ব্যাপার সম্বন্ধে, যে সকল বিষয় গভর্নরগণ মন্ত্রিসভার মতামত যাচাই না করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত কার্য করিতে পারেন, কিম্বা অভিমত যাচাই করিবার পরেও তাহা গ্রহণ না করিয়া আপনাদের স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে পারেন। 'স্যার স্যামুয়েল হোর একদা বলিয়াছিলেন, বিশেষ দায়িত্বের সুদীর্ঘ তালিকা শাসন-ব্যবস্থার সর্ববিভাগ ব্যাপিয়া বিরাজমান: প্রদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের গুরুতর সম্ভাবনা প্রতিরোধ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত অধিকার-রক্ষা, সরকারী কর্মচারী ও তাঁহাদের অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থরক্ষা তাহার অর্থ যাহাই হোক না কেন, শাসন বিভাগীয় কার্যে প্রতিবন্ধকতার প্রতিরোধ, ইংরাজ এবং ইংরাজ-পরিচালিত শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে পার্থক্যপূর্ণ নীতির নিয়ন্ত্রণ, অংশতঃ বর্জিত এলাকার শান্তি ও সুশাসন, দেশীয় রাজ্য ও রাজন্যবর্গের স্বার্থরক্ষা এবং বড়লাটের স্বেচ্ছা-প্রদত্ত আদেশ ও নির্দেশ প্রতিপালন। বিশেষ দায়িত্বের ক্রমপর্যায়ে পুঞ্জীভূত ফল স্যার স্যামুয়েল হোরের এই উক্তির সত্যতা সপ্রমাণ করে।' ১

লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে সমস্ত ব্যাপার শাসন-বিভাগের সর্বক্ষেত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা তাহাদের অন্যতম এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বলিতে মুসলমান ও আরও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত ইংরাজদিগকেও

1. Chintamani and Masani: India's constitution at work, Pp. 91—2.

বুঝায়। তথাপি গভর্নরগণ তাঁহাদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তা চাওয়া হইলে, ভারতসচিব লর্ড জেটল্যান্ড বলেন, শাসনতন্ত্রের সংশোধন ব্যতিরেকে সেরূপ নিশ্চয়তা দেওয়া যাইতে পারে না; কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী কার্য করিতে উদ্যত হইলে যে অবস্থার উদ্ভব হইবে তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'মন্ত্রিসভা যদি ইচ্ছা করেন, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমাইতে হইবে, কংগ্রেস-মন্ত্রিমণ্ডলী অনায়াসে তাহা আপনাদের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারেন এবং তাহা লইলে, তাঁহাদের সে কার্যকে বিধিসঙ্গত নিয়মতান্ত্রিক কর্মতৎপরতা ছাড়া অন্য কোন আখ্যা দেওয়া চলিবে না। সেরূপ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা ব্যাপারে গভর্নমেণ্ট স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। নিয়মতান্ত্রিকতার গণ্ডী লঙ্ঘন না করিয়াও এরূপ ঘটনা যে ঘটিতে পারে সেই আশঙ্কাতেই পার্লামেণ্ট রক্ষাব্যবস্থার বিধান করিয়াছেন।' ২ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্বন্ধে উল্লেখের তাৎপর্য এখানে সুস্পষ্ট এবং তাহা ক্রিয়াও করিয়াছিল সঠিকভাবে।

এ নিশ্চয়তা কংগ্রেস কেবল তাহার নিজস্ব মন্ত্রিসভার জন্যই চাহে নাই; অন্যান্য প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলিও স্বচ্ছন্দে এই দাবী কংগ্রেসের সহিত সমবেতকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারিতেন এবং সে দাবী স্বীকৃত হইলে, মন্ত্রী-পরিষদগুলিকে বাহিরের আক্রমণের আশঙ্কা হইতে মুক্ত করিয়া শাসনযন্ত্রকে কিছুটা পরিমাণ সচল করা সম্ভব হইত। কিন্তু তাঁহারা তাহা করিলেন না এবং নিশ্চয়তার দাবী উত্থাপন না করিয়াই মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিলেন। এদিকে কংগ্রেস অপেক্ষা করিতে থাকিল। পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে অন্ততঃ এইটুকু পরিষ্কার-ভাবে বুঝা গেল যে, কংগ্রেস-মন্ত্রিসভার নিয়মতান্ত্রিক কর্মতৎপরতার পথে প্রতিবন্ধক যদি বা আসেও, তবে তাহা কারণে অকারণে ঘন ঘন আসিবে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক সময় বহু বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়, তন্মধ্যে যুক্তিহীনতার জয়যাত্রা একটি। কংগ্রেসের এই দাবী জনপ্রিয় সকল মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে উত্থিত হইলেও তাহার ব্যাখ্যা হইল এই যে, ইহার দ্বারা কেবলমাত্র কংগ্রেস-মন্ত্রিমণ্ডলীই উপকৃত হইবে। ভারত সচিব কংগ্রেস-মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর দোষারোপ করিলেন যে, তাঁহারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন এবং মুসলিম লীগ তাহারই ধুয়া ধরিয়া বলিলেন, কংগ্রেস সেই উদ্দেশ্যেই নিশ্চয়তা লাভের জন্য এত ব্যগ্র হইয়াছে। লীগ এইখানেই ক্ষান্ত হইল না; তাহার সমর্থকগণ স্পষ্ট করিয়াই প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা যাহাতে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর অবাধে অত্যাচার চালাইতে পারে, তজ্জন্যই কংগ্রেসের পক্ষে নিশ্চয়তা লাভ একান্ত প্রয়োজন। যে সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রটুকুর জন্যই এই দাবীর নিশ্চয়তা চাওয়া হইয়াছিল, বহু বিস্তীর্ণ শাসনবিভাগের কতটুকু স্থানই বা তাহা জুড়িয়া আছে! অথচ এই স্বল্প-পরিসর স্থানটুকুর জন্য লীগ সমর্থকদল বিভাগীয় অবশিষ্ট বিপুল অঞ্চল সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন রহিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ ঘটিয়াছে কি? কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা

2. Ibid., p. 106.

বহুক্ষেত্রে পদত্যাগের ভীতি প্রদর্শন করিয়া আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যতঃ পদত্যাগ করিয়া গভর্নরদিগকে তাঁহাদের মতে আসিতে বাধ্য করিয়াছেন; কিন্তু এরূপ ঘটনা একটিও সংঘটিত হয় নাই, যে ক্ষেত্রে কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ ক্ষুন্ন করিতে উদ্যত হইবার দরুণ গভর্নর-গণের হস্তক্ষেপ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

ইতিমধ্যে যে সব আলাপ-আলোচনা হইয়া গিয়াছে তাহার ফলে ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনে সম্মত হয়। তখন প্রশ্ন উঠিল, কংগ্রেস লীগের সহিত কোয়ালিশন-মন্ত্রিসভা গঠন করিবে কি না। বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি যে সব স্থানে লীগ দলের কোন সদস্যই ছিলেন না, সেখানে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের কথা অবান্তর। যুক্তপ্রদেশে ও বোম্বাইয়ে সেদিক দিয়া চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই। কংগ্রেস ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবেশ করিয়াছে একটি সুস্পষ্ট কর্মপন্থা লইয়া ও সুনির্দিষ্ট একটি নীতির অনুসরণে; কাজেই কংগ্রেস কর্মপন্থা এমন কোন সাম্প্রদায়িক নীতির উপর নির্ভর করিয়া এরূপ কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রী-পরিষদে গ্রহণ করিলে, নির্বাচকমণ্ডলীকে প্রতারিতই করা হইবে। কার্যক্রম যেভাবে রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সাম্প্রদায়িক যুক্তিতে তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ উত্থিত হইবার অবকাশ মাত্র সেখানে ছিল না; অবশ্য সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায় হইতে বিশিষ্ট কোন একটি শ্রেণীর লোক যে তাহার কোন কোন ধারার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিতে না পারিতেন তাহা নয়। কাজেই কংগ্রেস কর্মপন্থা এমন কোন সাম্প্রদায়িক নীতির উপর নির্ভর করিয়া রচিত হয় নাই, বিশেষ করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত যাহার মতবিরোধ ঘটিতে পারে। সে কার্যক্রম ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, কাজেই যে সব মুসলমান তাহা গ্রহণ করেন, তাঁহারা তজ্জন্য অমুসলমান হইয়া যান নাই। যাঁহারা উহা গ্রহণ করিলেন না তাঁহাদের অপেক্ষা গ্রহণ যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি কংগ্রেসের অনুরাগ যে সমধিক হইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। কংগ্রেস এই কারণে সুপরিচিত ও সুস্পষ্ট নিয়মতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী একদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন, অবশ্য মুসলমানগণও যে তাহার অন্তর্ভুক্ত রহিবেন সে কথা বলাই বাহুল্য। তদনুযায়ী কংগ্রেসের যাঁহারা সদস্য, সেই সব মুসলমানকেই মন্ত্রী-পরিষদের জন্য নির্বাচন করা হইল। ইহাই কংগ্রেসের একমাত্র অপরাধ। লর্ড জেটল্যাণ্ড আভাসে-ইঙ্গিতে যে কথা বলিতে চাহিয়া-ছিলেন, মুসলিম লীগ তাঁহাদের দলীয় প্রচারকার্যের জন্য পূর্ণমাত্রায় তাহার সুবিধা গ্রহণ করিলেন।

মন্ত্রীনিয়োগ-ব্যাপারে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মন্ত্রিসভায় তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ হইতে অধিক আসন লাভ করেন। এগারটি প্রদেশের একাত্তরজন মন্ত্রীর মধ্যে ছাব্বিশজন হইলেন মুসলমান, দশজন অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং পঁয়ত্রিশজন হিন্দু; 'হিন্দু কংগ্রেস প্রদেশের' ৩৫ জন মন্ত্রীর মধ্যে ছয় জন মুসলমান এবং পাঁচজন অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের। ইহার কিছুদিন পর কংগ্রেস উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও

আসামে কোয়ালিশন-মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং তাহার ফলে মুসলমান মন্ত্রীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে চারিজন মন্ত্রীর মধ্যে প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার খান সাহেবকে লইয়া তিনজনই মুসলমান এবং আসাম মন্ত্রি-সভায় ছিলেন পাঁচজন অমুসলমান ও তিনজন মুসলমান মন্ত্রী। লীগপন্থিগণ কর্তৃক উচ্চারিত উদ্ভট ও উদ্ধত অভিযোগ এই হিসাবের দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়।'[3]

কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিল ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি এবং তাহার কার্যকাল মাত্র আটমাস পূর্ণ হইতে না হইতে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলে' নিম্নলিখিত মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইলঃ যেহেতু কংগ্রেসশাসিত প্রদেশসমূহে মুসলমানদের প্রতি, বিশেষ করিয়া মুসলিম লীগের কর্মীদের উপর অনুষ্ঠিত অশেষবিধ অত্যাচার, অবিচার ও অপমানের বিবরণ কেন্দ্রীয় অফিসে আসিয়া পেঁাছাইতেছে, অতএব এই কাউন্সিল প্রস্তাব করিতেছে যে, এই ব্যাপার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য ও সে সম্বন্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হউক; উক্ত কমিটি মাঝে মাঝে কাউন্সিলের সম্মুখে তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিবেন। পীরপুরের রাজার সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি ১৯৩৮ সালের ১৫ই নভেম্বর তারিখে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিলেন। পীরপুর রিপোর্টে উল্লিখিত অভিযোগসমূহের বিস্তৃত বিবরণ এস্থলে দেওয়া অসম্ভব। এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা অভিযোগসমূহ সম্বন্ধে যথারীতি অনুসন্ধান করিয়া, তাহার উত্তরে বিস্তৃত বিবৃতি প্রচার করেন। কোন কোন অভিযোগ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদেও আলোচনা হইয়াছিল। অভিযোগ-গুলি কোনদিন নিরপেক্ষ তদন্তের পরীক্ষাধীনে আসে নাই। মিঃ ফজলুল হক তৎকালে লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম; তিনি অভিযোগসমূহের সত্যতা সপ্রমাণ করিবেন বলিয়া পণ্ডিত নেহরুকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তদুত্তরে পণ্ডিত নেহরু জানাইয়া পাঠাইলেন যে, তিনি মিঃ হকের সহিত একত্রে তদন্তে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত; মিঃ হক কিন্তু সে চুক্তি রক্ষা করিলেন না। এই গ্রন্থের লেখক কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতিরূপে ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে মিঃ জিন্নার নিকট লিখিয়া পাঠান যে, অভিযোগগুলি সম্বন্ধে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া কর্তব্য এবং তদুদ্দেশ্যে ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস্ গয়ারের নামও তদন্তকারীরূপে প্রস্তাবিত হয়। মিঃ জিন্না এই প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন—'বিষয়টি বর্তমানে বড়লাট বাহাদুরের বিচারাধীন আছে এবং যে সমস্ত প্রদেশ কংগ্রেস-মন্ত্রিসভার শাসনাধীন, তথায় নিরাপত্তা সম্বন্ধে প্রত্যয় ফিরাইয়া আনিবার জন্য আমাদের প্রয়োজনমত যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পক্ষে তিনিই যোগ্যতম ব্যক্তি।' কিন্তু বড়লাট, অথবা কংগ্রেসশাসিত কোন প্রদেশের কোন লাট, এমন কি ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড পর্যন্ত কংগ্রেস-মন্ত্রিসভার সমগ্র কার্যকালের

3. Mehta & Patwardhan: The Communal Triangle, P. 114.

মধ্যে কেহ কোনদিন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম অথবা অন্য যে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পীড়নের অভিযোগ উত্থাপন করেন নাই। মিঃ জিন্নার উপরি-উদ্ধৃত উত্তরে বড়লাট কর্তৃক যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা উল্লিখিত হইয়াছেঃ সেরূপ কোন ব্যবস্থা বড়লাট কোনদিন অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নই এবং মিঃ জিন্নাও এই ব্যাপার লইয়া যে বড়লাটের সহিত আর অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, এমন কথাও আমাদের জানা নাই। কিছুদিন পরে মিঃ জিন্না অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য 'রয়াল কমিশন' নিয়োগের দাবী লইয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু গভর্নমেণ্টের নিকট তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায় বিষয়টি সেইখানেই পরিত্যক্ত হইল। কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিবার পূর্বে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড প্রত্যেক কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়া পাঠান, কংগ্রেসশাসিত প্রদেশসমূহে তাঁহাদের অনুসৃত নীতি বা কৃত কার্যের ফলে কোথাও কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, বিশেষ করিয়া মুসলমানদের কোনরূপ স্বার্থ যদি ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে, তাঁহারা যেন স্ব স্ব প্রদেশের গভর্ণরকে অনুরোধ করেন, সেই ঘটনাগুলি অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দিবার জন্য। কোন গভর্ণর কোন একটি ক্ষেত্রেও সেরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে পারেন নাই। যুক্তপ্রদেশের তদানীন্তন গভর্ণর স্যার হ্যারী হেগ্ কংগ্রেসের প্রতি অণুমাত্র অনুরক্ত —তাঁহার বিরুদ্ধে এমন দুর্নাম কেহ উচ্চারণ করিতে পারিবেন না অথচ অবসর গ্রহণ করিবার পর সেই স্যার হ্যারী হেগ্ বলিয়াছিলেন, কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা অতিশয় সযত্ন ও সতর্ক আয়াসে মুসলমানদের প্রতি ন্যায় ও নীতিসম্মত আচরণ করিতেন। কাজেই অত্যাচারের কাহিনীসমূহ ফরিয়াদীপক্ষের অপ্রমাণিত ও অসিদ্ধ অভিযোগ রূপেই পত্রস্থ রহিয়া গেল। তাহা সত্ত্বেও তাহারা লীগ অপপ্রচারের প্রধান মঞ্চ-রূপেই আজ পর্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

অভিযোগগুলির মধ্য হইতে কয়েকটি প্রধান প্রধান দফা এস্থলে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত প্রধান দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষের হেতুরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। স্মরণ থাকিতে পারে, সঙ্গীতটি রচিত হইয়াছিল গত শতাব্দীর অষ্টম দশকে এবং তদবধি কেবল বাঙ্গলায় নয়, অন্যান্য প্রদেশেও জনপ্রিয় সঙ্গীতরূপে তাহা কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইয়া আসিতেছে। তখন হইতে অদ্যাবধি তাহা কংগ্রেস ও অন্যান্য সভা-সমিতির অধিবেশনে নিয়মিতরূপে গীত হইয়া থাকে। মিঃ জিন্না স্বয়ং পনেরো বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান সদস্য ছিলেন; সেই সময়েও কংগ্রেসমঞ্চে এই গান যথারীতি গীত হইয়াছে, কিন্তু মিঃ জিন্না কোনদিন মুসলিম মনোভাবের দিক দিয়া তাহার মধ্যে আপত্তিজনক কোন কিছু খুঁজিয়া পান নাই। কংগ্রেস-পরিচালিত সংগ্রাম যখন মুসলিম সমর্থন লাভে সর্বাপেক্ষা পুষ্টতম—সেই খিলাফত আন্দোলনের যুগেও এ সঙ্গীত অসংখ্য অধিবেশনে ধ্বনিত হইয়াছে; কিন্তু কোনদিন তাহার বিরুদ্ধে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই। তথাপি কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা গঠিত হইবার পরই সে সঙ্গীত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের হেতুরূপে পরিগণিত হইল; শুধু তাহাই নয়, পীরপুর রিপোর্টের অভিযোগের তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করিল। কংগ্রেস

কার্যকরী সভা ভ্রান্তি ও আপত্তি নিরসনের জন্য নির্দেশ দিলেন, গানের প্রথম দুইটি কলি মাত্র গীত হইবে। তাহার দ্বারা ধর্মগত বিচারের দিক দিয়া আপত্তিজনক অংশটুকু অপসারিত হইল বটে, কিন্তু মুসলমানগণ ধুয়া তুলিলেন, যে পরিপ্রেক্ষিতে গানটি রচিত, তাঁহারা তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন না। বাঙ্গলার বাহিরে হাজারে একজন লোকও যে সে কাহিনীর সহিত পরিচিত ছিলেন না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়; পরে অবশ্য গানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যুক্তিসম্মত করিবার উদ্দেশ্যে আখ্যানভাগ সর্বত্র আমদানী করা হয়।

অভিযোগের দ্বিতীয় দফা হইল ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা। খিলাফত আন্দোলনের যুগে কংগ্রেসের পশ্চাতে মুসলমান সমর্থন যখন সর্বাধিক, তখনই এই পতাকা প্রাধান্য লাভ করে। তৎকালেই ইহা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক জাতীয় পতাকারূপে গৃহীত হয়। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের মত এই নিশানও বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিরাগ উদ্রেক করে; গভর্নমেণ্ট এই উভয় বস্তুকেই বিপ্লবের প্রতীকরূপে মনে করিতেন ও তাহাদিগকে দমিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইতেন। তাই এই পতাকার মর্যাদা রক্ষাকল্পে কত হিন্দু ও মুসলমান কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন, লাঠির আঘাত সহ্য করিয়াছেন, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিয়াছেন। কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা যতদিন গঠিত হয় নাই, ততদিন পর্যন্ত ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ উত্থিত হয় নাই। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইহা হিন্দু-পতাকা নয়।

গণসংযোগ কংগ্রেস-কার্যক্রমের অন্যতম ধারা; মুসলমানগণ মনে করিলেন, ইহা তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযান। সত্যাগ্রহ আন্দোলনগুলি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, অন্ততঃপক্ষে বিগত পঁচিশ বৎসর হইতে কংগ্রেস ধীরে ধীরে গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। জনসাধারণ তাহার আহ্বানে স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অশেষ দুঃখকষ্ট বরণ করিয়াছে। এই সমস্ত আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ এস্থলে অনাবশ্যক। মুসলমানগণও এইসব আন্দোলনে যোগ দিয়া দুঃখ বরণ করিয়াছেন। কংগ্রেসের পক্ষে মুসলিম জনসাধারণের সহিত সংযোগ স্থাপন করা যে কিরূপে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে তাহা দুর্বোধ্য; অবশ্য মুসলিম লীগ যদি মনে করেন, মুসলমান জনসাধারণের সহিত বাক্যালাপ করিবার কিম্বা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা সাধারণ স্বার্থগত অন্য যে-কোন ব্যাপার লইয়া তাহাদের সমীপবর্তী হইবার অধিকার কোন হিন্দু, মুসলমান বা অন্য কাহারও নাই, আছে একমাত্র লীগের তাহা হইলে সে স্বতন্ত্র কথা। স্বাধীন দেশ-মাত্রেই প্রত্যেক দল এবং ব্যক্তির আপন আপন আদর্শ ও কর্মপন্থা জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার অধিকার আছে ও থাকা কর্তব্য। সুতরাং আশা করা যায়, এমন কি পাকিস্থানেও নাগরিকদিগকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। কংগ্রেস—শুধু কংগ্রেস কেন, জাতীয়, সাম্প্রদায়িক, ধর্মগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা অন্য যে-কোন প্রতিষ্ঠান তাহার এই ন্যায়সঙ্গত অধিকার পরিহার করিতে পারে না; ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি ও আস্ফালন বক্তৃতা ও সাহচর্য বিষয়ে স্বাধীনতার মূলনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতাই প্রকাশ করে। সম্প্রদায়গত পৃথক নির্বাচন

প্রথার দ্বারা সম্প্রদায়সমূহ ধর্মগত ভিত্তিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মগত বিভেদ বৃদ্ধি পাইয়াছে। একথা মুসলমানগণও স্বীকার করেন এবং এই প্রশ্ন লইয়াই একদা মুসলিম লীগদলে মতদ্বৈধতার সৃষ্টি হয়, তখন পৃথকনির্বাচন-বিরোধীদলের নেতা ছিলেন মিঃ জিন্না। কিন্তু আর সকলে তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া লইতে সম্মত না হওয়ায়, স্বমত পরিত্যাগ করিতে তিনি বাধ্য হন। কিন্তু কংগ্রেস যদি আজও সেই মত পোষণ করে এবং বলে, সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা নীতিগতভাবে নিকৃষ্ট ও কার্যতঃ ক্ষতিকর, তাহা হইলে তাহাকে দোষী করা চলে কি? অথচ আজ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে কি? সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক-নির্বাচন-প্রথা চলিবে, এক সম্প্রদায়ের ভোটদাতাগণ অপর সম্প্রদায়ের নির্বাচনপ্রার্থীকে ভোট দিতে পারিবেন না, এক ধর্মবিশ্বাসসম্পন্ন নির্বাচনপ্রার্থীর পক্ষে ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসসম্পন্ন নির্বাচকমণ্ডলীর ভোট গ্রহণ নিষিদ্ধ। এসব তো অতি সনাতন কথা; আজ দাবী উঠিয়াছে, বে-সরকারী কোন প্রতিষ্ঠান মুসলমান জনসাধারণের সহিত সংযোগ মাত্র স্থাপন করিতে পারিবেন না। এই দাবীর দ্বারা যে কেবলমাত্র পৃথক-নির্বাচন-প্রথার ক্ষতিকর প্রভাবের পরিধি নির্বাচন-সংক্রান্ত ব্যাপারের বহির্ভূত অঞ্চল অবধি বিস্তৃত করিল তাহাই নয়, মুসলমানগণের পক্ষে অপর যে কোন সম্প্রদায়ের সাহচর্যলাভ পর্যন্ত অসম্ভব করিয়া তুলিল। এ অবস্থা অচিরে বর্জিত হওয়া প্রয়োজন।

বনিয়াদি শিক্ষার ওয়ার্ধা পরিকল্পনার বিরুদ্ধেও মুসলিম লীগের সমালোচনা অতিশয় তীব্র। শিক্ষা পুস্তকের মারফৎ না দিয়া, হাতের কাজের ভিতর দিয়া দিতে হইবে—ইহাই হইল উক্ত পরিকল্পনার মূলনীতি। পাশ্চাত্য-দেশের মনস্তত্ত্ববিদ্ ও শিক্ষাব্রতিগণ এই শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় 'সার্জেণ্ট পরিকল্পনা' মূলতঃ এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছে। যে কমিটি ওয়ার্ধায় বসিয়া এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন, তাহার সভাপতি ছিলেন ডাক্তার জাকির হোসেন; শিক্ষাব্রতী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি উপেক্ষার বস্তু নয়। সহকারীরূপে তাঁহার কার্যে সহায়তা করেন খাজা জি, সৈয়েদাইন; ইঁনি একদা আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং পরে কাশ্মীর রাজ্যের 'ডিরেক্টার অব্ পাবলিক ইনষ্ট্রাকসান' পদে নিযুক্ত হন। দুইজন মুসলমান 'শিক্ষাধুরন্ধর' কর্তৃক যে পরিকল্পনা রচিত হইল, তাহা মুসলিম স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য হিন্দু-চক্রান্তরূপে কেমন করিয়া চিত্রিত হইতে পারে তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। মহাত্মা গান্ধী এই আদর্শ জনসাধারণের সম্মুখে স্থাপন করেন এবং তাঁহার দ্বারা আহূত কমিটি ইহা প্রণয়ন করেন—ইহাই বোধ হয় পরিকল্পনার একমাত্র ত্রুটি। ডাক্তার জাকির হোসেনের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় দিল্লীর 'জামে-মিল্লিয়া' কর্তৃক এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত ও কার্যে পরীক্ষিত হইতেছে। আমি জানি না, অন্য কোথাও অধিকতর সাফল্যের সহিত ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে কিনা; তথাপি কংগ্রেস-কার্যক্রমে ইহা অন্যতম উৎপীড়নমূলক ধারারূপে পরিগণিত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মধ্যপ্রদেশের 'বিদ্যামন্দির পরিকল্পনার' বিরুদ্ধেও গুরুতর আপত্তি উত্থিত হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী

তারিখে উক্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী প্রাদেশিক আইনসভার মুসলমান সদস্যদের এক সভা আহবান করিলেন এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্পাদক নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ সে সভায় উপস্থিত হইলেন আমন্ত্রিত অতিথিরূপে। প্রধানমন্ত্রী এই পরিকল্পনার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিলেন, জাতিধর্মনির্বিশেষে পল্লী-জনসাধারণের অশিক্ষা দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই ইহা রচিত এবং ইহার ব্যয়ভার নির্বাহ হইবে জনসাধারণের প্রদত্ত ভূসম্পত্তি ও আর্থিক আনুকূল্য দ্বারা। এই উদ্দেশ্যে একটি প্রাইভেট এসোসিয়েশন গঠিত হইবে এবং সেই এসোসিয়েশনের মারফৎ সরকারী সাহায্য লাভ করিয়া বিদ্যামন্দিরের নিজস্ব অর্থ-তহবিল সমৃদ্ধতর হইবে। তিনি ইহাও বলিলেন, মুসলমানগণ যদি স্বতন্ত্রভাবে অনুরূপ একটি এসোসিয়েশন গঠন করিতে চান, তিনি সানন্দে সে প্রচেষ্টায় সম্মতি দিবেন। উত্তরে নবাবজাদা বলিলেন, মুসলমানগণ চান, উক্ত এসোসিয়েশনের নাম 'মদিনাতউল্-ইলম্' রাখা হউক এবং পরিকল্পনাটি 'মদিনাতউল্-ইলম' পরিকল্পনা নামে আখ্যাত হউক। প্রধানমন্ত্রী সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং উভয় প্রতিষ্ঠানকে সমপরিমাণ অর্থসাহায্যদান করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। 'বিদ্যামন্দির পরিকল্পনা' ও আরও অন্যান্য বিষয়-সংক্রান্ত সকল অভিযোগ সবিস্তারে আলোচিত হইবার পর, প্রাদেশিক আইনসভার মুসলমান সদস্যদিগের ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগ সম্পাদকের পক্ষে সম্পূর্ণ সন্তোষ-জনকভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার ভিতর সকল সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন প্রধানমন্ত্রী ও নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ। জনকয়েক মুসলমান দ্বারা প্রবর্তিত • সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও তাহার আনুষঙ্গিক মামলা-মোকদ্দমা প্রত্যাহৃত হইল। ১৯৩৯ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এ সম্বন্ধে একটি সরকারী বিবৃতি প্রচারিত হয়। এসব সত্ত্বেও 'বিদ্যামন্দির পরিকল্পনার' দফাটি কংগ্রেস কর্তৃক অনুষ্ঠিত অত্যাচারের তালিকা হইতে বাদ পড়িল না। মিঃ ফজলুল হক পুনরায় ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলে গভর্ণমেণ্ট নবাবজাদার সম্মতিক্রমে প্রধানমন্ত্রী শুক্ল ও নবাবজাদা লিয়াকৎ আলির স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া দিলেন—এই প্রসঙ্গে ১৯৩৯ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে নাগপুর হইতে প্রকাশিত 'হিতবাদ' পত্রিকা দ্রষ্টব্য। এই ঘটনা ঘটে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পদত্যাগের প্রায় একমাস পরে।

হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আনীত অপর আর একটি অভিযোগ। দুর্ভাগ্যবশতঃ কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা গঠিত হইবার পূর্বে এবং ভাঙ্গিয়া যাইবার পরেও এই জাতীয় সংঘর্ষ দেশে সংঘটিত হইয়াছে। মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারের ফলে পৃথক-নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তিত হইবার পর হইতেই তাহার পৌনপুন্য যে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে একথা অস্বীকার করা চলে না। এই সমস্ত দাঙ্গা সম্বন্ধে একটি একটি করিয়া আলোচনা করা অসম্ভব, তবে তাহাদের মধ্যে যেগুলি আদালত পর্যন্ত গড়াইয়াছিল, সেগুলি যথাস্থানে ও যথাযোগ্যভাবে আলোচিত হইয়া থাকিবে। মিঃ দুরাণী বেরারে সংঘটিত একটি মামলার উপরেই সর্বাধিক জোর দিয়া থাকেন; সেই প্রসঙ্গে হাইকোর্টের রায় হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া সেই প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার কর্তব্য, হয় আত্মহত্যা করা,

নয় রাজনৈতিক জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করা। এইজন্যই সেই মামলা সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। দাঙ্গার ফলে জনৈক বিশিষ্ট হিন্দু নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হন। মিঃ বি, জি, টেলার নামক জনৈক ইউরোপীয় ডি, আই, জি'র তত্ত্বাবধানে তদন্ত পরিচালিত হয়। আসামীর অনুরোধক্রমে বিচার-কার্য জেলা আদালত হইতে নাগপুরে স্থানান্তরিত হইল। মামলার বিচার করিলেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জনৈক সদস্য সেসন-জজ মিঃ এম, এন, ক্লার্ক। অল্প-দিনের মধ্যেই তিনি হাইকোর্টের বিচারক পদে উন্নীত হন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, বিচারক হিসাবে তিনি অভিজ্ঞ। বিচারকার্য সমাধা হয় কংগ্রেস-মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর এবং সেসন-আদালতের ও হাইকোর্টের রায় প্রকাশিত হইল তাহারও কয়েকমাস পরে। জজের রায় আপীল আদালতের বিচারে বাতিল হইয়া যাওয়া আদালতের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা এবং এক্ষেত্রেও ঘটিয়াছিল তাহাই। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি কথাকে অতিশয় ফলাও করিয়া তোলা হইয়াছে। তাঁহার প্রদত্ত একটি বক্তৃতার দ্বারা তদন্ত-কার্য নাকি প্রভাবিত হয়। আইনসভায় একটি মুলতুবী প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে ঘটনার বিবরণ তিনি বিবৃত করেন। বিতর্ক উত্থাপন করা হয় ঘটনার তিনদিন পরে এবং তখন পর্যন্ত ব্যাপারটা আদালতের গোচরে আসে নাই। গুরুতর সাম্প্রদায়িক অশান্তির সংবাদ পাইয়া প্রধানমন্ত্রী প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক কে, এস, আবদার রহমান খাঁ ও অপর দুইজন আইনসভার মুসলমান সদস্য সমভিব্যাহারে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গমন করেন। খামগাঁওয়ে একটি প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা পর্যন্ত তিনি দিয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, ঘটনাটি যখন তদন্তাধীন তখনই উল্লিখিত বিতর্ক ও বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি তাহাকে সুকৌশলে পরিকল্পিত ও অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সহিত অনুষ্ঠিত অপরাধরূপে বর্ণনা করেন। পরিষদের মুসলমান সদস্যগণও বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তাহাকে নরহত্যা আখ্যায় আখ্যাত করেন ও তীব্র ভাষায় তাহার নিন্দা করেন। বিতর্ককালীন বক্তৃতাপ্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আচরণ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সহিত মিঃ কে, এস, আবদার রহমান খাঁ বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খামগাঁও বক্তৃতা শুনিয়া আমি সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। আশা করি, আমার বন্ধুগণ তাঁহার উদারতা উপলব্ধি করিবেন ও প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিবেন।'[4] ঘটনার তদন্তের ধারা সম্বন্ধে হাইকোর্ট বিরুদ্ধ মন্তব্য করিলে, গভর্ণমেণ্ট বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি জাষ্টিস এ, এস, আর ম্যাকলিনকে এতৎসম্পর্কে নিযুক্ত করিলেনঃ তিনি ঘটনা সম্বন্ধে পুলিশ তদন্তের ধারা পরীক্ষা করিবেন, মামলাটিকে বিচারযোগ্য করিয়া আদালতে প্রেরণ করিবেন এবং তদন্ত সম্বন্ধে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকিলে তাহার জন্য দায়ী ব্যক্তিদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন। সম্ভবতঃ মুসলমানদের প্রতি দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল; মিঃ জাষ্টিস্ ম্যাকলিন সে সম্বন্ধে বলেন, দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উত্থাপিত হইবামাত্র মধ্যপ্রদেশের গভর্নমেণ্ট তৎপ্রতি অবহিত হইলেন ও অবিলম্বে তদন্তের আদেশ দিলেন; তদন্তের পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিল্ রিপোর্ট করিলেন,

4. C. P. Legislative Assembly Proceedings, 1939, Pp. 307—8.

অভিযোগসমূহ একেবারে ভিত্তিহীন। দুর্ব্যবহারের অভিযোগ যে সত্য নয়, সে সম্বন্ধে জাষ্টিস্ ম্যাক্‌লিনও নিঃসন্দেহ হইলেন। তিনি আরও প্রমাণ পাইলেন যে, মামলা সম্বন্ধে মিথ্যা সাক্ষী আনিবার দোষে পুলিশ দোষী নয়, কাজেই সে সম্বন্ধীয় সকল অভিযোগ হইতে তিনি তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন। নিম্ন-আদালতের রায় উচ্চ-আদালত কর্তৃক বাতিল হইয়া গেলেই তাহার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে যদি দায়ী হইতে হয়, তাহা হইলে শাসনকার্য পরিচালন অসম্ভব হইয়া উঠে। বিচার চলিতে থাকাকালে সেসন-জজ যে প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এরূপ ইঙ্গিত কোনদিক হইতে পাওয়া যায় না, আর পদত্যাগের পর প্রধান মন্ত্রীতো সাধারণ নাগরিক মাত্র।

হিন্দী-উর্দু বিতর্ক কংগ্রেস অত্যাচারের আর একটি দৃষ্টান্ত। এ বিতর্কের উদ্ভব অতি প্রাচীন কালে এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত ইহা চলিয়া আসিতেছে। কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা এমন কিছুই করেন নাই, যাহার দরুণ অন্ততঃ মুসলিম স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে তাহার তিক্ততা বৃদ্ধি পাইতে পারে। তাঁহারা যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যই করিয়াছেন। কিন্তু কার্যকরী কোন পন্থা অবলম্বিত হইবার পূর্বেই তাঁহারা পদত্যাগ করেন।

ইহার পর হইতে আপোষ-রফার জন্য কংগ্রেসের ব্যগ্রতা যতই বৃদ্ধি পাইয়াছে, লীগের দাবীর মাত্রা সেই পরিমাণে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট সে দাবীর কখনও বা প্রশ্রয় দিয়াছেন, কখনও বা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; ফলে দেশ 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় অচল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ১৯৩৭ সালের পর হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ইহাই হইল সাম্প্রতিক ইতিহাস। অত্যাচারের বিভীষিকা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়, তাহা আমরা দেখিয়াছি।* ১৯৩৮ সালে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু একবার জানিবার চেষ্টা করেন—কি হইলে লীগ সন্তুষ্ট হইতে পারে; তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, দাবীর বহর জানিতে পারিলে দেশ তাহা বিচার করিয়া দেখিবে ও সম্ভব হইলে তাহা পূর্ণ করিবে। গভর্ণমেণ্ট মিঃ জিন্নার চৌদ্দ দফা দাবী কার্যতঃ মানিয়া লইয়াছেন এবং তাহা ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন-আইনের অংগীভূত করিয়া লইয়াছেন। এই কারণেই এবম্বিধ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৩৫ সালে ভারতশাসন-আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে তৎকালীন কংগ্রেস-সভাপতি এই গ্রন্থকারের সহিত যে আপোষ-আলোচনা চলে, তাহা পরিচালিত হইয়াছিল যৌথ-নির্বাচন প্রণালীর ভিত্তিতে। ভারতশাসন-আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর কংগ্রেসকে কেবল যে পৃথক-নির্বাচনই মানিয়া লইতে হইল তাহা নয়, আরও অন্যান্য অনেক বিষয়ে সম্মতি দিতে হইল; কারণ লীগ যে পৃথক-নির্বাচন দাবী প্রত্যাহার করিতে সম্মত হইবে অথবা অন্য কোন বিষয়ে অণুমাত্র সুবিধা ছাড়িয়া দিবে, এরূপ আশা করিবার মত তখন আর কোনই হেতু ছিল না। লীগ যে কোন রক্ষা-ব্যবস্থা দাবী করিয়াছে, তাহাই পাইয়াছে; পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বাঙ্গলা এবং মাঝে মাঝে আসামেও লীগ মন্ত্রিসভা শাসন-কার্য পরিচালনা করিয়াছেন; তৎসত্ত্বেও লীগের বিশ্বাস, মুসলমানগণ সর্বত্র

নির্যাতিত। এই কারণেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সর্বপ্রকার রক্ষা-ব্যবস্থা এবং গভর্ণরগণের বিশেষ ক্ষমতাবলে আরও ব্যাপকতর রক্ষাকবচ দিবার প্রতিশ্রুতি—কোন কিছুই লীগের বিশ্বাস উৎপাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণে নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। হয় লীগের সিদ্ধান্ত সঠিক, নয় তাহার অবিশ্বাস ও অত্যাচার-বিভীষিকা অমূলক—এই দুইটির যে কোন একটি সত্য। যদি প্রথমটি সত্য হয়, তাহা হইলে মুসলমান সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, এমনকি যে সব প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেগুলিকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করিলেও মুসলমানদিগকে তাহা নির্ভরযোগ্য রক্ষাকবচরূপে আশ্বস্ত করিতে পারিবে না। আর যদি দ্বিতীয়টি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার কোন প্রতিষেধ নাই। একমাত্র কালপ্রবাহেই সে অবিশ্বাস ধুইয়া মুছিয়া যাইতে পারে। এদিকে লীগ তাহার দাবীর সুর ক্রমশঃ এমন চড়াইয়া তুলিয়াছে যে, কোনরূপ আপোষ-নিষ্পত্তির চেষ্টা তখন একেবারে নিষ্ফল। একদিকে মহাত্মা গান্ধী, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং অপর দিকে মিঃ জিন্নার মধ্যে যে সুদীর্ঘ পত্র-ব্যবহার ও আলাপ-আলোচনা চলে, তাহা উভয় পক্ষের নথিপত্র পরীক্ষার পর্যায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। মিঃ জিন্নার দাবী হইল, লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে এবং কংগ্রেস কথা কহিবে কেবলমাত্র হিন্দুদের পক্ষ হইতে। কংগ্রেস এই দুইটি সর্তের একটিতেও সম্মত হইতে পারিল না — পারা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। আলাপ-আলোচনার ফলে মুসলিম লীগের দাবীগুলি তালিকাবদ্ধ পর্যন্ত করা সম্ভব হয় নাই।

একথা ভুলিলে চলিবে না যে, দেশে আরও অনেক মুসলমান-প্রতিষ্ঠান আছে, যাহারা লীগের দাবী মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। যে সব জাতীয়তাবাদী মুসলমান এক এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আপনাদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথাই ধরা যাউক ঃ অহ্‌র দল—ইঁহারা দুঃখবরণে দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন; জমিয়ত-উল-উলেমাগণ জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বারবার অংশ গ্রহণ করিয়া অশেষ দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তাহা ছাড়া মুসলমান ধর্ম ও শিক্ষা আন্দোলনের নেতারূপে সমাজে তাঁহারা একটি বিশিষ্ট স্থান অর্জন করিয়াছেন; সিয়া সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্মেলন আছে। মিঃ জিন্না প্রমুখ লীগের আরও জনকয়েক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সিয়াগণ, এমন কি মুসলিম লীগের আক্রমণ হইতেও আত্মরক্ষার জন্য রক্ষাকবচ দাবী করিয়া থাকেন; মোমিন সম্প্রদায় মুসলমান সমাজের সর্ববৃহৎ অংশ না হইলেও একটা বিরাট অংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের নিজস্ব পৃথক জমিয়ত আছে এবং মুসলিম লীগের দাবী মানিয়া লইতে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ অস্বীকার করিয়াছেন; বেলুচিস্তানের খুদ্দম-এ-ওয়াতান নামক জাতীয়তাবাদী মুসলিম সংঘ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খুদাই-খিদমতগার দল, বাঙ্গলার কৃষকপ্রজা পার্টি এবং সর্বশেষে আল্লামা মাশরিকীর নেতৃত্বে পরিচালিত খাক্‌সার দল লীগ দলের সহিত বহু বিষয়ে তাঁহাদের মতদ্বৈধতা পোষণ করেন। এই সমস্ত দলের শক্তির পরিমাণ

সঠিকভাবে নির্ণীত না হইলেও তাঁহাদের সমর্থকগণ লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবী অস্বীকার করিয়া আপনাদিগকেই সংখ্যাগুরু দলরূপে সপ্রমাণ করিয়া থাকেন।

কংগ্রেস কোনমতেই নিজেকে হিন্দু-প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। কেননা, তাহা করিতে গেলে নিজের অতীতকে অস্বীকার করিতে হয়, ইতিহাস মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় ও ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিতে হয়। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে কংগ্রেস ভারতের সকল সম্প্রদায় ও সব ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিয়া আসিয়াছে। মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত হিন্দুর সাম্প্রদায়িক স্বার্থ যেখানে সংঘাতশীল, সে ক্ষেত্রে কংগ্রেস হিন্দুর প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান নয়। কাজেই কেবলমাত্র হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হইবার অবস্থা কংগ্রেস কোনমতেই মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। সেরূপ অবস্থা স্বীকার করিয়া লওয়া কংগ্রেসের পক্ষে কেন অসম্ভব, তাহার অনুকূলে বহু ঘটনা বিবৃত হইল। এসব সত্ত্বেও কংগ্রেস জ্ঞাপন করিল, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের পথ সন্ধানের উদ্দেশ্যে লীগের সহিত আলাপ-আলোচনায় সে প্রস্তুত। কিন্তু মিঃ জিন্না তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। ফলে আলাপ-আলোচনা-পর্ব সূচনাতেই সমাপ্ত হইয়া যায়।

এই অবস্থার অনুকূলে কয়েকটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ১৯৩৮ সালের ৩রা মার্চ তারিখে মিঃ জিন্না মহাত্মা গান্ধীকে এক পত্র দ্বারা জানাইলেন, 'আমরা যে পর্যায়ে আসিয়া উপনীত হইয়াছি, সেখানে কোনরূপ সংশয়ের জন্য স্থান সংকুলান হওয়া উচিত নয়। আপনাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, মুসলিম লীগই ভারতীয় মুসলমান সমাজের একমাত্র প্রতিনিধি-স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং আপনি প্রতিনিধিত্ব করিবেন কংগ্রেসের ও তাহার বহির্ভূত অন্যান্য হিন্দুগণের। সমস্যা সমাধানের পথ সন্ধানের জন্য একমাত্র এই ভিত্তিতেই আমরা অতঃপর অগ্রসর হইতে পারি।' ৫ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর সহিত আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ জিন্না নিম্নলিখিতরূপ প্রস্তাবের আভাস দেন: 'ভারতীয় মুসলমান সমাজের একমাত্র দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানরূপে মুসলিম লীগ ও সমগ্র হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠানরূপে কংগ্রেস ভারতীয় প্রধান দুইটি সম্প্রদায়ের মুখপাত্ররূপে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত সর্তে সম্মত হইল।' পুনর্বিবেচনার পর এই অংশটিকে তিনি নিম্নলিখিত আকারে পরিবর্তিত করিলেন:

'একদিকে কংগ্রেস ও অপর দিকে ভারতীয় মুসলমানগণের একমাত্র দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানরূপে লীগ হিন্দু-মুসলমান বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে রচিত এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতেছে।' নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কার্যকরী সভা কর্তৃক নিম্নলিখিত মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইল: 'মুসলিম লীগই ভারতীয় মুসলমানগণের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান — কেবলমাত্র এই স্বীকৃতির

5. Unity talks, p. 28.

ভিত্তি ছাড়া অন্য কোন যুক্তিতে কংগ্রেসের সহিত মুসলিম লীগের পক্ষে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করা অসম্ভব।' ১৯৩৮ সালের ২রা আগষ্ট তারিখে মিঃ জিন্না শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে তাঁহার দাবীর পরিসর আরও কিছুটা বিস্তৃততর হয়। তিনি লেখেনঃ 'কাউন্সিল এই মত পোষণ করে যে, যেহেতু কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে গঠিত হইবে, সেই কারণে উক্ত কমিটিতে কোন মুসলমান সদস্য গৃহীত হওয়া অবাঞ্ছনীয়।' স্যার তেজ-বাহাদুর সপ্রু ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মিঃ জিন্নার নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন—হিন্দু-মুসলমান বিরোধ মীমাংসার জন্য মহাত্মা গান্ধীর সহিত মিলিত হইয়া তাহার একটা উপায় উদ্ভাবন করা কর্তব্য। তাহার উত্তরে মিঃ জিন্না লিখিলেন, 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানকল্পে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী বা অন্য যে কোন হিন্দুনেতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমি সব সময় প্রস্তুত।'

এই দাবী ইতিপূর্বে আর কখনও উত্থাপিত হয় নাই, এইবারই ইহা সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিল। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসকে যথাক্রমে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত না করিয়াই লক্ষ্মৌ-চুক্তি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা পরিচালিত হইয়াছিল। ১৯৩৫ সালে তদানীন্তন কংগ্রেস-সভাপতির সহিত মিঃ জিন্নার এই আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে সে দাবী উত্থাপিত হয় নাই; বরং মিঃ জিন্না এই কথাই বলেন যে, হিন্দুমহাসভার পক্ষ হইতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য যদি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর না করেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের সহিত চুক্তি সম্পাদনে তিনি অসমর্থ। মিঃ জিন্নার এই দাবীর ফলেই আলোচনা-প্রচেষ্টা পণ্ড হইয়া যায়, কারণ হিন্দুমহাসভার সমর্থন লাভের প্রস্তাব কংগ্রেস-সভাপতি মানিয়া লইতে সম্মত হইলেন না।

উল্লিখিত উদ্ধৃতি হইতে প্রমাণিত হয় যে, লীগ কেবলমাত্র নিজের উপর মুসলমান প্রতিনিধিত্বের ও কংগ্রেসের স্কন্ধে হিন্দু প্রতিনিধিত্বের অধিকার আরোপ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে লীগ প্রতিনিধির সহিত আলাপ-আলোচনার জন্য যে-কোন কমিটি কংগ্রেস গঠন করিবে, লীগ দাবী করিল, তাহার সদস্য নির্বাচনের দায়িত্বও তাহার। মিঃ জিন্নার সহিত আলোচনা করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে সঙ্গে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মিঃ জিন্না তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মিঃ জিন্নার সহিত তাঁহার সুদীর্ঘ আলোচনা ও পত্রালাপ প্রসঙ্গে বার বার জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন, মুসলিম লীগের বিবেচনায় কোন্ কোন্ বিষয় আলোচনা ও নিষ্পত্তির যোগ্য; কিন্তু তাঁহার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। অতঃপর তিনি সে বিষয়ে আলোকপাতের জন্য একটি আন্তরিকতাপূর্ণ আবেদন প্রচার করিলে মিঃ জিন্না তাহার উত্তরে ১৯৩৮ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে লিখিত এক পত্রে জানাইলেন, 'আশা করি আপনি চৌদ্দদফা সর্তের কথা অবগত আছেন।' এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯৩৮ সালের ১২ই জুলাই তারিখে 'ষ্টেটস্‌ম্যান'

পত্রিকায় প্রকাশিত 'Through Muslim eyes' নামক এক প্রবন্ধ ও ১৯৩৮ সালের ১২ই জুলাই তারিখে 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত অপর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিলেন, আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য কোন্ কোন্ বিষয় আলোচনা-সাপেক্ষ। ১৯৩৮ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু উক্ত পত্রিকা দুইখানিতে উল্লিখিত প্রশ্নগুলির কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া মিঃ জিন্নার নিকট প্রেরণ করিলেন। তাহার উত্তরে মিঃ জিন্না ১৯৩৮ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে লিখিত এক পত্র দ্বারা জানাইলেন, 'আপনার পত্রে আপনি নিজে কতগুলি প্রস্তাব রচনা করিয়াছেন এবং চাহিয়াছেন, আমি সেগুলিকে আমার প্রস্তাবরূপে স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহাদের ভিত্তিতেই আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করি।' আলোচনার এইখানেই উপসংহার হইল এবং সুদীর্ঘ পত্রালাপের পরেও লীগের কোন্ কোন্ প্রস্তাব কংগ্রেসের বিবেচ্য, সে সম্বন্ধে উভয়পক্ষই—যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই রহিয়া গেলেন।

যুদ্ধ ঘোষিত হইবার পর ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আর একবার আপোষ-মীমাংসার জন্য উদ্যোগী হন, কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া যায়। অবশেষে হতাশ হইয়া পণ্ডিত নেহরু ১৯৩৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে লিখিলেন, 'দুর্ভাগ্যবশতঃ অগ্রিম পূরণীয় সর্তরূপে কতকগুলি সমস্যা অন্তরায়স্বরূপ পথে আসিয়া দাঁড়াইতেছে বলিয়া আমরা সমস্যাগুলির সমীপবর্তী হইতেই পারিতেছি না। ....আগত অন্তরায়গুলি রহিয়াই যাইতেছে, তদুপরি নব নব অন্তরায় আসিয়া তাহাদের দল পুষ্ট করিতেছে। ইহা হইতে আমি এই কথাই ধরিয়া লইতে বাধ্য হইতেছি যে, পার্থক্য যাহা কিছু—তাহা আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই নিহিত।'

লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে যে যে বিষয়ে পার্থক্য, কংগ্রেসের সহিত আলোচনার জন্য সেগুলি যথাযথভাবে নির্ধারণ করিবার পক্ষে লীগ ও তাহার সভাপতির অনিচ্ছা পরিলক্ষিত হইলেও, বড়লাটের সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে সেগুলি সময়ে সময়ে খোলাখুলিভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও সেই পার্থক্যসমূহের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন এবং লীগকে শক্তিশালী করিবার জন্য মুক্তহস্তে সহায়তা দান করিয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে, মুসলমান সর্বদলীয় সম্মেলনই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রথম প্রস্তাব আনয়ন করেন। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন-আইন যখন সেই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা লইয়া সমুপস্থিত হইল, তখন লীগের, বিশেষ করিয়া মিঃ জিন্নার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তাই ভারতশাসন-আইনের যুক্তরাষ্ট্রিক পরিকল্পনার অংশটুকু লীগের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হইয়া দাঁড়াইল। ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে বড়লাট ঘোষণা করিলেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের উদ্যোগ-আয়োজন যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য স্থগিত থাকিবে। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কার্যকরী সভায় বড়লাটের এই ঘোষণাবাণীকে সম্বর্ধিত করিয়া

একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং আশা প্রকাশ করা হইল যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা একেবারে পরিত্যক্ত হইবে। ভারতীয় ভাবী শাসনতন্ত্র রচনার সমগ্র সমস্যাটিকে নূতন করিয়া আমূল পর্যালোচনার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া, এ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা প্রার্থনা করা হইল যে, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সমর্থন ব্যতিরেকে ভারতীয় শাসনতন্ত্র সংস্কার সম্বন্ধীয় কোন ঘোষণা প্রচারিত হইবে না এবং যে শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা মুসলিম লীগের পূর্বাহ্নে সমর্থন ও অনুমোদন লাভ করে নাই, তাহা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক চূড়ান্তভাবে রচিত ও গৃহীত হইবে না।

তদুত্তরে লর্ড লিনলিথগো ১৯৩৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে জানাইলেন, 'ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিবর্তনের স্থায়িত্ব ও সার্থকতার পক্ষে মুসলমান সমাজের সন্তুষ্টির গুরুত্ব যে কতখানি, সে সম্বন্ধে সম্রাটের সরকার কোনরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন না। সুতরাং আপনাদের সমাজ ভারতীয় জনমতের ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহা অণুমাত্র লাঘব করা হইবে—এরূপ আশঙ্কা আপনারা মনেও স্থান দিবেন না।' কিন্তু ইহাতেও মুসলিম লীগ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন নাঃ মিঃ জিন্না লীগের কার্যকরী সভার মনোভাবের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া ১৯৪০ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বড়লাটের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন, 'অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, মুসলিম লীগের দাবীর পক্ষে ইহা পর্যাপ্ত নয়, কারণ ইহার দ্বারা নয় কোটি জনসংখ্যা সম্বলিত একটি সমাজকে কেবলমাত্র মন্ত্রণা ও পরামর্শদানের পর্যায়ে ফেলিয়া রাখিয়া, বৃটিশ ভারতের ভাগ্যনির্ণয়ের চূড়ান্ত দায়িত্ব ও অধিকার বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছে। গভীর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই অবস্থা মানিয়া লইতে আমরা আদৌ প্রস্তুত নই।' যে ধ্রুব নিশ্চয়তাটুকু পাইবার জন্য তিনি দাবী করিতেছিলেন, তাহা হইতেছে এইঃ 'আমাদের সম্মতি ও সমর্থন ব্যতিরেকে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে অথবা মধ্যবর্তীকালীন যে-কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে অপর কোন দলের সহিত কোনরূপ চুক্তিবদ্ধ হওয়া চলিবে না।' বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বড়লাটের মারফৎ লীগ-তোষণের চেষ্টায় আর একবার প্রবৃত্ত হইলেনঃ ভারত-সচিব ১৯৪০ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে হাউস অব্ লর্ডসে যে বিবৃতি প্রদান করেন, বড়লাট তাহাই স্বতন্ত্র পত্রাকারে মিঃ জিন্নার নিকট প্রেরণ করিলেন। বিবৃতিটি নিম্নলিখিতরূপ ঃ 'ভারতের সমস্ত দল ও স্বার্থের প্রতিনিধিবর্গের সহিত পরামর্শক্রমে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সমগ্র ক্ষেত্রটি পুনরায় পর্যালোচনা করিবার পক্ষে সম্রাটের গভর্নমেণ্ট যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহার মর্ম নির্দেশাত্মক নয়, মন্ত্রণামূলক। অখণ্ড ভারতের যে স্বপ্ন শত শত ভারতীয় ও ইংরাজগণকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে তাহা যদি সার্থক করিতে হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ সংগতি নিঃসন্দেহে প্রয়োজন; আমার বিশ্বাস হয় না যে এদেশের কোন গভর্ণমেণ্ট অথবা পার্লামেণ্ট কোন সম্প্রদায়ের উপর, ধরিয়া লওয়া যাক—আট কোটী সভ্যসম্বলিত মুসলমান সমাজের উপর বলপূর্বক

এরূপ শাসনতন্ত্র আরোপ করিতে পারেন—যাহার মধ্যে তাহাদের শান্তি ও সন্তোষপূর্ণ জীবনযাত্রা নির্বাহ করা অসম্ভব হইবে।' এই স্পষ্টোক্তিও লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সন্তোষ-বিধানে সমর্থ হইল না। মিঃ জিন্না ১৯৪০ সালের ২৫শে জুন তারিখে বড়লাটের সহিত আর একবার সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলেন এবং ১৯৪০ সালের ১লা জুলাই তারিখের পত্রে বড়লাটের সহিত তিনি যে বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন, তৎসংক্রান্ত একটি নোট তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উক্ত নোটের অন্তর্ভুক্ত ছিলঃ

(১) ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে মুসলিম অধিকৃত অঞ্চল গঠন করিবার যে প্রস্তাব লীগের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে, তাহার মূলনীতির বিরুদ্ধ কোন ঘোষণা অথবা বিবৃতি সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট প্রচার করিবেন না।

(২) মুসলিম ভারতের সম্মতি ও সমর্থন পূর্বাহ্নে সংগ্রহ না করিয়া ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয় অন্তর্বর্তীকালীন অথবা চূড়ান্ত কোনরূপ পরিকল্পনাই গৃহীত হইবে না—সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে।

(৩) কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে গভর্ণমেণ্ট মুসলিম নেতৃত্বকে যদি সমমর্যাদাসম্পন্ন সহযোগীরূপে গ্রহণ করেন, তবেই যুদ্ধোদ্যম দ্রুততর ও তীব্রতর করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সামর্থ্য ও সংগতি সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হওয়া সম্ভব।

(৪) যুদ্ধকালীন অবস্থায় সাময়িকভাবে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে হইবেঃ

(ক) বর্তমান শাসনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে বড়লাটের শাসন-পরিষদ সম্প্রসারিত করিতে হইবে; উল্লেখ থাকে যে, কংগ্রেস যদি শাসন-পরিষদে প্রবেশ করে, তাহা হইলে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধি সমসংখ্যক হইবে, আর কংগ্রেস যদি না আসে, তাহা হইলে অতিরিক্ত সদস্যসংখ্যার মধ্যে মুসলমান সদস্যই হইবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, কেননা সেক্ষেত্রে শাসনকার্য পরিচালনের প্রধান দায়িত্ব আসিয়া পড়িবে মুসলিম লীগের উপর।

(খ) অনূন ১৫ জন সদস্য লইয়া একটি সমর-পরিষদ গঠন করিতে হইবে এবং তাহার সভাপতি হইবেন স্বয়ং বড়লাট। এক্ষেত্রেও কংগ্রেস আসিলে হিন্দু ও মুসলমান সদস্যের সংখ্যা হইবে সমান সমান এবং কংগ্রেস যদি না আসে, মুসলমান প্রতিনিধিত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবে।

(গ) সর্বশেষে, প্রস্তাবিত সমর-পরিষদে, বড়লাটের শাসন-পরিষদে ও বড়লাটের অতিরিক্ত উপদেষ্টাগণের মধ্যে যেসব মুসলমান সদস্য লওয়া হইবে তাঁহারা নির্বাচিত হইবেন মুসলিম লীগ দ্বারা।

বড়লাটের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, এই দাবীর অর্থ মুসলিম লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই ১৯৪০ সালের ৬ই জুলাই তারিখে মিঃ জিন্নার নোটের উত্তরে তিনি জানাইলেন, মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব

করিবার জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক মুসলমান প্রতিনিধি প্রেরণের গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেন, কিন্তু সে প্রসঙ্গে বিশেষ কোন একটি সম্প্রদায়ের উপর বেশী অথবা কম দায়িত্ব অর্পণের প্রশ্ন অবান্তর; তাঁহার মতে, 'দায়িত্ব হইবে সমষ্টিগতভাবে সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের। বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্যরূপে কে কে গৃহীত হইবেন, বড়লাটের সহিত পরামর্শক্রমে ভারতসচিব তাহা স্থির করিবেন—ইহাই হইল প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার বিধি ও প্রথা; কাজেই তাঁহারা কোন রাজনৈতিক দলের মনোনীত হইতে পারেন না—সে রাজনৈতিক দল যত বৃহৎ ও বলশালীই হোক না কেন।' তিনি আরও বলিলেন, 'আমি একথা স্পষ্ট করিয়াই বলিতে চাই যে, বড়লাটের সম্প্রসারিত শাসন-পরিষদে অথবা তাঁহার বেসরকারী উপদেষ্টারূপে যেসব মুসলমান সদস্য গৃহীত হইবেন, তাঁহাদের মনোনয়নের দায়িত্ব মুসলিম লীগের উপর অর্পণ করা নিয়মতান্ত্রিকতার দিক দিয়া অসম্ভব। কিন্তু প্রয়োজনবোধে কাহারও নাম যদি আপনি প্রস্তাব করেন, তাহা যথাযোগ্য গুরুত্বের সহিত বিবেচিত হইবে না—এরূপ আশংকা করিবার কোন হেতু নাই।'

১৯৪০ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে বড়লাট গভর্ণমেণ্টের নীতি ঘোষণা করিয়া একটি বিবৃতি প্রচার করিলেন। ১৯৩৫ সালের সমগ্র ভারতশাসন আইনটি ভারতীয় গঠনতান্ত্রিকতার দিক হইতে পুনঃ পরীক্ষা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যে ঘোষণা প্রচার করেন, তাহার উল্লেখ করিয়া বড়লাট বলিলেন, ভারতের জাতীয় জীবনের একটা বিরাট ও বলশালী অংশ যে শাসন-ব্যবস্থার বিরোধী, তাহার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা কিংবা অনিচ্ছুক জনসমষ্টিকে তাহার নিকট আত্মসমপণ করিতে বাধ্য করার কথা গভর্ণমেণ্ট কল্পনাও করিতে পারেন না। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের কাঠামো রচনার জন্য ভারতের জাতীয় জীবনের প্রধান প্রধান অংশগুলির প্রতিনিধিদিগকে লইয়া একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে। সামরিক পরামর্শ-পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে বড়লাটের শাসন-পরিষদে যোগ দিবার জন্য কতিপয় প্রতিনিধিস্থানীয় ভারতীয়কে আহ্বান করি রার সরকারী ইচ্ছাও তিনি জ্ঞাপন করিলেন। 'হাউস্ অব্ কমন্সে' বড়লাটের এই প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে আলোচনাকালে মিঃ আমেরী ভারতীয় মত-বিরোধের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিলেন, 'ভারতের শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার জন্য ঐক্যবদ্ধ বিভিন্ন বিরোধী দলগুলির সহিত গভর্ণমেণ্টের সংঘর্ষ ততখানি দায়ী নয়, যতখানি দায়ী ভারতের জাতীয় জীবনের প্রধান অংশ-গুলির মধ্যে অন্তর্বিরোধ। কাজেই এই অচল অবস্থার সমাধান ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের সহিত সম্রাটের গভর্ণমেণ্টের চুক্তি সম্পাদনের সহজ পন্থা দ্বারা সাধিত হইবে না, তাহার জন্য এমন বহু বিভিন্ন দলের ভিতর চুক্তি সম্পাদন করার প্রয়োজন হইবে, সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট যাহাদের মধ্যে অন্যতম সংশ্লিষ্ট পক্ষমাত্র।' অন্যান্য পক্ষসমূহের মধ্যে তিনি নাম উল্লেখ করিলেন মুসলমান ও তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের এবং ভারতীয় রাজন্যবর্গের। তৎসহ তিনি ইহাও বলিলেন যে, ভারতবর্ষ ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা সুস্পষ্টীকৃত এমন একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ দেশ, যাহার যুগ-যুগান্তবাহী ইতিহাসের সাধারণ ধারা আছে, গর্ব করিবার মত প্রাচীন

ঐতিহ্য আছে। ইহা হইতেই আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি, ত্রিভুজের তৃতীয় বাহু ধীর মন্থরগতিতে হইলেও, ক্রমে ক্রমে দীর্ঘায়িত হইতেছে। একদিকে গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি মৌখিক শ্রদ্ধা নিবেদন, অপরদিকে কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন ও সুবিধামত 'ভারতের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন উপাদানগুলির' কখনও পৃষ্ঠে, কখনও বা মুখে করাঘাত; একদিকে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঐক্যবদ্ধতার দাবী করা হইতেছে, অপরদিকে ভারতীয় অচল অবস্থার জন্য দায়ী করা হইতেছে বৃটেন ও ভারতের মধ্যে বিরোধকে নয়, ভারতের বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে বিদ্যমান অন্তর্বিরোধকে। মুসলীম লীগ যখন দাবী করিতেছে, কোনরূপ শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করিবার পূর্বে তাহার সম্মতি ও সমর্থন সংগ্রহ করা প্রয়োজন এবং যে কোন প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের জন্য মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচনের দায়িত্ব কেবলমাত্র তাহার, তখন একটি সাধারণ ঘোষণা প্রচারের দ্বারা প্রথম দাবীটিকে এড়াইয়া যাওয়া হইতেছে এবং সুস্পষ্ট অসম্মতির দ্বারা দ্বিতীয়টিকে অস্বীকার করা হইতেছে। ভারতকে খণ্ডিত করিয়া উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে মুসলমান অধিকৃত অঞ্চল গঠন করিবার দাবী উত্থিত হইবামাত্র স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে, ভারতবর্ষ ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা সুস্পষ্টীকৃত এমন একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ দেশ—যাহার যুগ-যুগান্তবাহী সাধারণ ইতিহাসের ধারা আছে, গর্ব করিবার মত প্রাচীন সভ্যতা-সম্পদ আছে। লীগ ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটের ঘোষণাবাণী বিশেষভাবে আলোচনা করিবার পর অভিমত প্রকাশ করিলেন, ঘোষণাপত্রের মধ্যস্থিত ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র রচনা সম্পর্কিত অংশটুকু সন্তোষজনক, কিন্তু বড়লাটের শাসন-পরিষদ সম্প্রসারণ সম্বন্ধে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত অসন্তোষকর। বড়লাটের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শাসন-পরিষদের জন্য লীগ প্রস্তাবিত চারিজন সদস্যের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন দুইজনঃ বড়লাটের এই প্রতিশ্রুতি ও উপদেষ্টামণ্ডলী সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রতিশ্রুতি লীগের মনঃপূত হইল না। এ বিষয়ে পুনরায় নূতন করিয়া আলাপ-আলোচনা চলিল, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। অবশেষে ১৯৪০ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে মিঃ জিন্না নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে বিবৃতি দান প্রসঙ্গে বলিলেন, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার কোনরূপ আগ্রহ আছে বলিয়া মনে হইতেছে না; নয় কোটি সভ্য সম্বলিত বিরাট মুসলমান জাতির ভাগ্য লইয়া তাঁহারা ছিনিমিনি খেলিতেছেন! এইরূপে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও মুসলিম লীগের মধ্যে মিঃ জিন্না-কথিত সমরকালীন চুক্তি সম্পাদনের প্রচেষ্টা সাময়িকভাবে পণ্ড হইয়া গেল।

বাক্-স্বাধীনতা নাগরিক অধিকার সপ্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস বৎসরের শেষ দিকে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিল। স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে, এই আন্দোলনের সহিত মুসলমানদের অথবা লীগের কোনই সংস্রব ছিল না এবং যে অধিকার অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে ইহা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা করায়ত্ত হইলে আর সকলের মত মুসলমানগণও তদ্দ্বারা উপকৃত হইতেন। মুসলিম লীগ কিন্তু তথাপি বলিলেন, মুসলমানগণকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা

পরিচালিত। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল নিম্নলিখিত মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেনঃ 'মিঃ গান্ধী যে উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া পরম উৎসাহ-সহকারে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রবর্তন ও পরিচালন করিতেছেন, তাহা সন্দেহাতীত-রূপে স্পষ্ট। ইহার প্রতি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়া রাখা কর্তব্য যে, কংগ্রেসকে যদি এরূপ কোন সুখ-সুবিধা দেওয়া হয়—যাহা মুসলিম দাবীর বিরোধী অথবা তাহার স্বার্থের সহিত সংঘাতশীল, তাহা হইলে মুসলিম লীগ তাহার সর্বশক্তি দ্বারা তাহা প্রতিরোধ করিবে; মুসলীম লীগ একথাও জানাইয়া রাখিতে চায় যে, এদেশের মুসলমানগণের দাবী ও স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে প্রতিরোধ-সংগ্রামে সে তাহার যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।'

১৯৪১ সালের লীগের পরবর্তী অধিবেশন আহূত হইল মাদ্রাজে; এই অধিবেশনে লীগের প্রতিজ্ঞাপত্রে পাকিস্থান অর্জনের শপথ সন্নিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে লীগের গঠনতন্ত্র প্রয়োজনানুযায়ী সংশোধন করা হইল।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও মুসলিম লীগের মধ্যে দর-কষাকষির পরবর্তী পর্যায় আরম্ভ হইল ক্রীপস্ প্রস্তাবকে আশ্রয় করিয়া। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে বৃটেনের সমর-পরিষদের অন্যতম সদস্য স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতি ও প্রস্তাব সম্বন্ধীয় ঘোষণা লইয়া ভারতে আগমন করেন। ইহার দ্বারা এমন এক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পিত হয়, যাহার ফলে ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক মর্যাদার মানদণ্ডে সমমর্যাদাসম্পন্ন উপনিবেশে পরিণত হইবে। এই প্রস্তাবে নূতন শাসনতন্ত্র কিভাবে রচিত হইবে, তাহার ধারাও বর্ণিত হয় এবং সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট এই সর্তে তাহা গ্রহণ ও প্রবর্তন করিতে সম্মত হন যে, বৃটিশ ভারতের অন্তর্গত কোন প্রদেশ যদি নূতন শাসনতন্ত্রের মধ্যে আসিতে অস্বীকৃত হয়, সে তাহার বর্তমান শাসনতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখিতে পারিবে এবং যদি কোনদিন সে ইহার মধ্যে আসিতে মনস্থ করে, তজ্জন্য তাহার প্রবেশের পথ উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। উপরন্তু, নূতন শাসনতন্ত্রের আওতায় আসিতে অনিচ্ছুক প্রদেশসমূহকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশসমূহের সহিত সমমর্যাদাদান করিতেও সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট প্রস্তুত। ভারতীয় নেতৃবর্গকে উদ্দেশ্য করিয়া ঘোষণায় এই আবেদন প্রচারিত হয় যে, তাঁহারা যেন পরামর্শ-পরিষদে আসিয়া যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন এবং ইহাও বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হয় যে, দেশরক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন-ভার ভারত গভর্ণমেণ্টের হস্তেই ন্যস্ত থাকিবে।

যে-কোন প্রদেশকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার প্রদান করিয়া, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে লীগের দাবীই কার্যতঃ স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। এই প্রস্তাবের দ্বারা ভারতীয় ঐক্য খণ্ডিত হইতেছে—এই যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া কংগ্রেস কার্যকরী সভা ইহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিত, কিন্তু তাহা করিল না। পক্ষান্তরে

কার্যকরী সভা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিল, 'কোন অঞ্চল বা এলাকাকে তাহার অধিবাসিগণের ঘোষিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবার জন্য বাধ্য করা যেমন কল্পনাতীত, তেমনি একথাও সত্য যে, এই খণ্ডন-ব্যবস্থার ফলে সকলেই সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।' কংগ্রেস কার্যকরী সভা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল বটে, কিন্তু অন্য যুক্তিতেঃ দেশরক্ষা-সংক্রান্ত-ব্যবস্থা পরিষদের দায়িত্বের বহির্ভূত বিষয়রূপে পৃথক করিয়া রাখিবার ফলে সমগ্র ব্যাপারটি একটি পরিহাসে ও পণ্ডতায় পরিণত হইয়াছে—ইহাই হইল তাহার প্রত্যাখ্যানের যুক্তি। এদিকে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস কার্যকরী সভার সিদ্ধান্ত প্রকাশের পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে এবং যে মুহূর্তে তাহা প্রকাশিত হইল, তদ্দণ্ডেই সে প্রস্তাব গ্রহণ করিল যে, বর্তমান আকারে এ প্রস্তাব গ্রহণের অযোগ্য। অন্ততঃ আভাসে-ইঙ্গিতেও পাকিস্থানের সম্ভাবনা স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ করা হইল এবং বলা হইল, মুসলিম লীগ বিশ্বাস করে যে, হিন্দু ও মুসলমান দুইটি স্বতন্ত্র জাতির সহযোগে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিবার পরিকল্পনা যুক্তিসঙ্গতও নয় এবং সর্বসাধারণের স্বার্থ ও সুখশান্তির পক্ষে সহায়কও নয়; অথচ প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্যরূপে ব্যক্ত হইয়া উঠিতে চাহিয়াছে ইহাই এবং একাধিক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা সুদূর স্বপ্নলোকের কুহেলিকার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে। গণপরিষদ গঠনের পদ্ধতি সম্বন্ধেও আপত্তি উত্থাপিত হইল এই মর্মে যে, পৃথক-নির্বাচকমণ্ডলীর সাহায্যে আপনাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের মুসলমানদের যে ন্যায়সঙ্গত অধিকার—তাহা ইহার দ্বারা অস্বীকৃত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবার পক্ষে ও বিপক্ষে প্রদেশ-সমূহের অভিমত সংগ্রহ করিবার ধারার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জ্ঞাপিত হইল। লীগের বক্তব্য হইল, যে সমস্ত প্রদেশ মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই সেই স্থানে গণভোট সংগ্রহ করিবার সময় বয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই ভোট গৃহীত হইবে না, হইবে কেবলমাত্র মুসলমান অধিবাসীদের, অন্যথায় আত্মনিয়ন্ত্রণের সহজ অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যখন প্রদেশসমূহকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে অবস্থান করিবার অধিকার প্রদান করিতেছেন এই সর্তে যে, তাহা উক্ত প্রাদেশিক আইন-পরিষদের ষাটটি ভোটের সংখ্যাধিক্যের দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই এবং যেখানে সেরূপ সংখ্যাধিক্য লাভ করা সম্ভব হইবে না, সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রস্তাবক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই গণভোট দ্বারা তাহা সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন; লীগ তখন বলিতে চাহিতেছে, আইন-পরিষদের সদস্যগণের ভোট সেই প্রদেশের মুসলিম অভিমত নির্ণয়ের পক্ষে সঠিক মাপকাঠি হইতে পারে না এবং এই যুক্তিতে সে দাবী করিতেছে—গণভোট কেবলমাত্র মুসলমানগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে; সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যদি বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের মত শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ হয়, তাহা হইলেও তাহারা উপেক্ষিত হইবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ স্মরণাতীতকাল হইতে যেসব দেশের সহিত নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে, যে খণ্ডনব্যবস্থার ফলে তাহাদিগকে তথা হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে—সে ব্যবস্থা প্রবর্তিত

হওয়া উচিত কিনা সে সম্বন্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করিবার অধিকার তাহাদের থাকিবে না।

ক্রিপস্ দৌত্য ব্যর্থ হইলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি তাহার ৭ই, ৮ই ও ৯ই আগষ্ট—এই দিবসত্রয়ব্যাপী বোম্বাই অধিবেশনে সেই স্মরণীয় প্রস্তাব গ্রহণ করিল, ইতিহাসে যাহা 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব নামে বিখ্যাত। পূর্ববর্তী অন্যান্য আরও অনেক ক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও অধিবেশনের ঠিক প্রাক্কালে কংগ্রেস এই মর্মে ঘোষণা প্রচার করিল যে, কংগ্রেস ক্ষমতা অধিকার করিতে চায় তাহার নিজের জন্য নয়, ভারতের জনসাধারণের জন্য এবং প্রকৃত ক্ষমতা হস্তগত করিয়া মুসলিম লীগ যদি পরিষদে প্রবেশ করে, কংগ্রেস তাহাতে সন্তুষ্টই হইবে। কিন্তু ১৬ই হইতে ২০শে আগষ্ট অবধি লীগ অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা নিম্নলিখিতরূপঃ—

'ওয়ার্কিং কমিটির সুচিন্তিত অভিমত এই যে, এই আন্দোলন পরিচালনের উদ্দেশ্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে জনকয়েক হিন্দুর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে বাধ্য করা; শুধু তাহাই নয়, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন সময়ে মুসলমানদের ও অন্যান্য ভারতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিকট যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছেন, তাহা পূরণ করিবার নৈতিক দায়িত্ব যাহাতে তাঁহারা পালন করিতে না পারেন সেদিকেও ইহার লক্ষ্য আছে; মুসলমানদিগকে কংগ্রেস-প্রদত্ত সর্ত ও নির্দেশের নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য করাও ইহার অন্যতম লক্ষ্য।' মুসলমানদের দাবী যদি মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে সমমর্যাদার ভিত্তিতে লীগ শাসন-দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত—বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিবার পর লীগ ওয়ার্কিং কমিটি মুসলমান সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া পরামর্শ দিলেন কংগ্রেস প্রবর্তিত আন্দোলনের সহিত ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলিতে। ইহার পর হইতেই প্রচার করা হইতে লাগিল, লীগকে লক্ষ্য করিয়াই আন্দোলন পরিচালিত। তখন হইতেই লীগ প্রচারকগণ আগষ্ট-প্রস্তাব প্রত্যাহারের দাবী পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করিয়া আসিয়াছেন; এমনকি, কংগ্রেস-কর্মিগণ যখন কারাগারে এবং অচল অবস্থা দূরীকরণের জন্য আলাপ-আলোচনা যখন আরম্ভ পর্যন্ত হয় নাই, তখনও এ দাবী তাঁহারা বারবার উত্থাপন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসকে জাপ-সহযোগিতার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিবার পরেও মুসলিম লীগ পুনঃপুনঃ অভিযোগ করিয়াছেন, কংগ্রেস জাপানের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

১৯৪৪ সালে মিঃ জিন্নার সহিত মহাত্মা গান্ধীর সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনাও ফলপ্রসূ হইল না; এমনকি, মিঃ জিন্নার নিকট হইতে তাঁহার পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় তাহার সীমান্ত কোন্ সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত, তাহার
পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় তাহার সীমান্ত কোন্ সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত, তাহার
পরিকল্পিত শাসনতন্ত্রের মোটামুটি চেহারা কিরূপ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য তাহাতে কোন্ কোন্ রক্ষাকবচের বিধান থাকিবে।

ওয়াভেল-প্রস্তাব প্রকাশিত হইল ১৯৪৫ সালের জুন মাসে; তাহার

উদ্দেশ্য ছিল, ভাবী শাসনতন্ত্ররচনা যুদ্ধসমাপ্তি পর্যন্ত স্থগিত রাখা এবং বর্তমানে তাহার উল্লেখ মাত্র না করিয়া, আপাততঃ অন্তর্বর্তীকালীন শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করা। বড়লাটের শাসন-পরিষদে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়বিযুক্ত হিন্দু-দিগের সহিত মুসলমানগণের সংখ্যাসাম্য রক্ষিত হইবে—ইহাই ছিল প্রস্তাবের অন্যতম বক্তব্য বিষয়। লীগ এতদিন ইহাই দাবী করিয়া আসিতেছিল, এইবার সে দাবী স্বীকৃত হইল। ১৯৩৭ সাল হইতে মিঃ জিন্না তথা মুসলিম লীগ ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে আপনার পক্ষপুটে সযত্নে আশ্রয় দিয়াছেন। নিজেদের দাবী প্রতিদিন উচ্চতর কণ্ঠে ঘোষণা করার সংগে সংগে একথা প্রচার করিতেও ভুলেন নাই যে, তাঁহার প্রদত্ত আখ্যা অনুযায়ী 'হিন্দু অভিমতের একমাত্র দায়িত্বশীল ও প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস' সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে দমন ও দলন করিতে উদ্যত। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়কে তাঁহারা হিন্দুসমাজ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিয়াছেন ও প্রচার করিয়াছেন, তাহারা তাঁহাদের আশ্রয়প্রার্থী। ভারতের যে ক্রম-বর্ধমান গণশক্তি কংগ্রেসের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে, তাহার সমভার প্রতিকূলতা সংস্থাপনের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট লীগকে সযত্নে আপনাদের দক্ষিণে রাখিয়াছেন এবং তাহার ক্রম-পরিসর দাবীর বহর মিটাইবার জন্য একের পর এক সুখ-সুবিধা দিয়া চলিয়াছেনঃ *তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়বিযুক্ত হিন্দুসমাজের সহিত মুসলমানদের সংখ্যাসাম্য তাঁহাদের এই তোষণ-নীতির সর্বশেষ দান; কিন্তু অন্যান্য বারের মত এবারেও তাঁহারা মিঃ জিন্নার সন্তোষবিধানে অসমর্থ হইলেনঃ* পরিষদে সমস্ত মুসলমান সদস্য মনোনয়ন করিবার পক্ষে মিঃ জিন্নার অনমনীয় দাবীই ওয়াভেল-প্রস্তাবের ব্যর্থতার হেতু হইল; লর্ড ওয়াভেল অবশ্য অকৃতকার্যতার সকল দায়িত্ব আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইলেনঃ সত্যকথা বলিতে গেলে, সে দায়িত্ব ন্যায়তঃ তাঁহারই। কিন্তু সিমলা আলোচনার ব্যর্থতার ফলে আর একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা সংঘটিত হইলঃ মুসলিম লীগ যে নবতর দাবী লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন, তাহার মর্ম কার্যতঃ দাঁড়ায় এই যে, মুসলিম লীগ কেবলমাত্র তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়বিযুক্ত হিন্দুসমাজের সহিতই সংখ্যাসাম্য দাবী করে না, হিন্দুসমাজযুক্ত আর সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সহিত সমসংখ্যক প্রতিনিধিত্বেরই তাহারা দাবীদার। সিমলা বৈঠকের পর ১৯৪৫ সালের ১৪ই জুন তারিখে এক সাংবাদিক-সম্মেলনে মিঃ জিন্না নিম্ন-লিখিতরূপ ভাষণ প্রদান করিলেনঃ

'তাহার পর প্রস্তাবিত শাসন-পরিষদে আমাদিগকে এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যালঘুত্বে পরিণত হইতে হইবে। তপশীলী, শিখ, খৃষ্টান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আদর্শের দিক দিয়া কংগ্রেসেরই অনুবর্তী; সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে তাঁহাদের অভিযোগ আছে সত্য, কিন্তু তাঁহাদের আদর্শ ও লক্ষ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আর কিছুই নয়। নৃতত্ত্ব ও সংস্কৃতির দিক দিয়া হিন্দুসমাজের সহিত তাঁহারা নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের প্রতি ন্যায়-বিচারের বিরোধী আমি নই; তাঁহারা যে-কোন অঞ্চলেই অবস্থিত থাকুন না কেন, সংরক্ষণব্যবস্থা ও রক্ষাকবচ লাভের তাঁহারা সম্পূর্ণ অধিকারী। কিন্তু প্রয়োজনের

সময় কার্যতঃ তাঁহাদের ভোট আমাদের বিরুদ্ধে যাইবেই এবং সেক্ষেত্রে বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন রক্ষাকবচ আমাদের অনুকূলে থাকিবে না। কিন্তু নিয়মতন্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, দৈনন্দিন কার্যনির্বাহ ব্যাপারে যেখানে গভর্ণমেণ্টের নীতি ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে হয়, দেশশাসন ও আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়, সেখানে লঘুভাবে সে বিশেষ ক্ষমতা যখন-তখন ও যত্র-তত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে না।' সুতরাং সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল এই যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সংখ্যাগরিষ্ঠতায়, অন্ততঃপক্ষে অবশিষ্ট আর সকলের সহিত সমসংখ্যায় পরিণত করা ছাড়া সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের আত্মরক্ষার আর অন্য কোন উপায় নাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে, মিঃ জিন্না এইক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ষকের ভূমিকা পরিহার করিয়াছেন এবং বলিতেছেন, কংগ্রেসের লক্ষ্য ও আদর্শেই তাঁহারা অনুপ্রাণিত এবং কার্যকালে তাঁহাদের ভোট প্রদত্ত হইবে কংগ্রেসেরই অনুকূলে ও লীগের বিরুদ্ধে। মুসলিম স্বার্থরক্ষার পক্ষে বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা অকর্মণ্য ও অবাস্তব। লীগ ভারতের কোন সম্প্রদায়ের সাহায্য ও সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে পারেন না—এমন কি, লীগ-বহির্ভূত মুসলমানগণের উপরে পর্যন্ত নয়, লীগ নীতি ও আদর্শের বিরুদ্ধে ইহা হইতে তীব্রতর নিন্দাসূচক প্রস্তাব কল্পনা করাও অসম্ভব।

(ষোল)

দ্বিতীয় খণ্ডের সার সংক্ষেপ

ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে সাধারণভাবে এবং মুসলিম স্বার্থ-সংশিলষ্ট অংশটুকু সম্বন্ধে বিশেষভাবে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি এবং দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি, সে নাটকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কোন্ ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন। আমরা সেই বিস্তৃত বিবরণ কয়েকটি অংশে বিভক্ত করিয়া সংক্ষেপে পুনরালোচনা করিব।

প্রথম যুগঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া ভারতে বৃটিশ-প্রভুত্ব গড়িয়া তুলিতেছে। রাজনীতিক্ষেত্রে চিরাচরিত ভেদনীতিই তখন তাহার অনুসরণীয় নীতিঃ সেই নীতির সাহায্যে পর্যায়ক্রমে একজন দেশীয় নৃপতিকে আর একজন দেশীয় রাজার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া, বিদেশী কোম্পানীর বিরুদ্ধে তাঁহাদের সম্মিলিত হইবার সম্ভাবনাকে প্রতিহত করিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক শেষ হইতে না হইতে ভারতীয় রাজন্যবর্গের প্রায় সকলেই হয় পরাজিত হইলেন, নয় সন্ধিসর্তে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইলেন এবং মোগল

বাদশাহ কোম্পানীর ক্রীড়নকরূপে দিল্লীর সিংহাসনের শোভাবর্ধন করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট যাঁহারা রহিলেন, তাঁহাদেরও বিলয়প্রাপ্ত হইতে বিলম্ব হইল না।

দ্বিতীয় যুগঃ কোন না কোন ছলে বহু দেশীয় রাজ্যের কোম্পানীর রাজত্বের অন্তর্ভুক্তি ও কোম্পানীর শাসনের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা। বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গভীর ও গুরুতর বিক্ষোভ জাগিয়া উঠিয়াছে। মুসলমানগণ দেখিলেন, তাঁহারা কেবল রাজকীয় শক্তি ও সম্মানই হারান নাই, আর্থিক সম্পদও হারাইয়াছেন। শাসন-সংস্কারের জন্য একটি আন্দোলন প্রবর্তিত হইল বটে, কিন্তু অচিরে তাহা শিখ-বিরোধী জেহাদে রূপান্তরিত হইল। শিখগণ যতক্ষণ বৃটিশরাজ্য-সীমার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে স্বাধীন রাষ্ট্রশক্তিরূপে দণ্ডায়মান, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ততক্ষণ এই জেহাদকে প্রকাশ্যতঃ উৎসাহ না দিলেও, প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিয়াছেন। কিন্তু যে মুহূর্তে শিখদিগকে পরাজিত করিয়া পাঞ্জাব বিজয় সমাপ্ত হইল, জেহাদ তদ্দণ্ডে দমিত হইল কঠোর হস্তে।

ধূমায়মান বিক্ষোভ-বহ্নি সহসা বিদ্রোহ আকারে জ্বলিয়া উঠিল ১৮৫৭ সালেঃ এই বিদ্রোহে হিন্দু এবং মুসলমান মিলিত শক্তি লইয়া সমবেত হইল দিল্লীর বৃদ্ধ বাদশাহের পতাকাতলে। বিদ্রোহ ব্যর্থ হইল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সার্বভৌমত্ব স্থানান্তরিত হইল ইংলণ্ডের রাণীর করতলে। বিদ্রোহ ব্যর্থ হইবার পর যে কঠোর দমনমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইল, তাহার প্রচণ্ডতম আঘাত আপতিত হইল মুসলমান সমাজের উপরে। বিদ্রোহোত্তরকালের দলন-জনিত ক্ষয়-ক্ষতি সামলাইয়া লইয়া, আত্মস্থ হইতে দেশের কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল।

হিন্দুগণ নবপ্রবর্তিত ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অগ্রবর্তী হইলেন এবং মুসলমানগণ তাহা না পারায় পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। স্যার সৈয়দ আহম্মদ মুসলমানদের শিক্ষাপ্রসারে ব্রতী হইয়া আলিগড় কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজনীতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস ভূমিষ্ঠ হইল ১৮৮৫ সালে; তদবধি ভারতের সকল প্রদেশের ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে জনসাধারণের স্বার্থ সম্বন্ধীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের আলোচনার জন্য ইহাই হইয়া উঠিল একমাত্র মঞ্চঃ এখান হইতেই অভাব-অভিযোগ দূরীকরণের জন্য প্রস্তাবাবলী গৃহীত ও গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইত। মিঃ বেক্ নামক জনৈক ভদ্রলোক আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন এবং কেবলমাত্র শিক্ষাদানের নয়, মুসলিম রাজনীতি পরিচালনের সমস্ত দায়িত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ মুসলমানদিগকে কংগ্রেস হইতে দূরে থাকিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। তাহা সত্ত্বেও বহু মুসলমান কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিলেন বটে, কিন্তু অনেকেই আলিগড় কলেজের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া, মুসলিম অগ্রগতির জন্য ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলের সহিত সখ্য সংস্থাপন করিবার ও স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করিবার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষদ্বয় মিঃ বেক্ ও মিঃ (পরবর্তীকালে স্যার) থিওডোর মরিসনের প্রভাবে

'পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন' ও 'মহোমেডান ডিফেন্স এসোসিয়েশন' নামে দুইটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল এবং পরিচালিত হইতে থাকিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে লর্ড কার্জন একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রদেশ গঠন করিবার উদ্দেশ্যেই বাংলাকে খণ্ডিত করিলেন। ইহার ফলে প্রবল আন্দোলন উত্থিত হইল এবং বহু বিশিষ্ট মুসলমান এই ব্যবচ্ছেদ-ব্যবস্থার বিরোধী থাকা সত্ত্বেও বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে তিক্ততার সঞ্চার হইল। লর্ড কার্জন অবসর গ্রহণ করিলে, তাঁহার স্থলে লর্ড মিণ্টো রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন এবং ভারতসচিব লর্ড মর্লির সহিত সহযোগিতায় তিনি একটি শাসন-সংস্কারের পরিকল্পনা প্রণয়ন করিলেন। সম্ভাব্য শাসনসংস্কার-প্রস্তাবের বক্তব্য বিষয় পূর্বাহে্ন অনুমান করিয়া, আলিগড় কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মিঃ আর্চবোল্ড একটি মুসলিম প্রতিনিধিদল গঠন করিলেনঃ প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ থাকে যে, এই মিঃ আর্চবোলড নামক ভদ্রলোকটি বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। মাননীয় আগা খাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত এই প্রতিনিধিদলের সহিত সাক্ষাতের ফলে বড়লাট মুসলমানদের বিশেষ দাবী মানিয়া লইলেন এবং আইন-পরিষদে তাঁহাদের প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য পৃথক-নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তিত করিলেন। এদেশের ও ইংলণ্ডের ইংরাজ মহল সোল্লাসে প্রচার করিতে লাগিলেন, এই ব্যবস্থার দ্বারা বড়লাট মুসলমান সমাজের পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, কেননা ইহার ফলে মুসলমানদিগের পক্ষে রাজদ্রোহিগণের দলভুক্ত হইবার সম্ভাবনা নিঃশেষে নিবারিত হইবে। এইরূপে যে বীজ সেদিন বপন করা হইয়াছিল, আজ তাহা কালক্রমে ভারতবর্ষের পক্ষে বিষময় ও বৃটেনের পক্ষে কল্যাণকর বিরাট মহীরূহে পরিণত হইয়াছেঃ সুদূরপ্রসারী শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া ও দেশের মাটির গভীরতম প্রদেশে মূল প্রবিষ্ট করিয়া, ভারতীয় স্বাধীনতার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধারূপে তাহা আজ দণ্ডায়মান।

অনিচ্ছাসত্ত্বে হইলেও, কংগ্রেস যে কেবলমাত্র পৃথক-নির্বাচন-প্রথা স্বীকার করিয়া লইল তাহা নয়, সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহে মুসলমানদিগকে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে তাহাদের প্রাপ্য আসন হইতে অনেক অধিকসংখ্যক প্রতিনিধিত্ব প্রদান করিল। একদিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও অপরদিকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ—এই উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লক্ষ্ণৌ-চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং সেই চুক্তির বলে দুইটি পৃথক অংশ-সম্বলিত এক মিলিত দাবী গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করা হইলঃ অংশদ্বয়ের একটিতে লিপিবদ্ধ হইল পৃথক-নির্বাচন ও আইন-পরিষদসমূহে মুসলমান আসন সম্বন্ধীয় দাবী এবং অপরটিতে ব্যক্ত হইল দেশশাসনব্যাপারে জনসাধারণের প্রাপ্য অংশ-সম্বন্ধীয় অতিশয় মৃদু রাজনৈতিক দাবী। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় জনসাধারণের দ্বারা ধাপে ধাপে প্রাপ্য স্বায়ত্তশাসনাধিকারের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করিলেন। ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু ও বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ডের নামের শীল-মোহরাঙ্কিত শাসন-সংস্কারের দাবীর প্রথম অংশে উল্লিখিত পৃথক-নির্বাচন ব্যবস্থার প্রস্তাবটি সমগ্রভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল, কিন্তু দ্বিতীয় অংশের রাজনৈতিক দাবী রক্ষিত হইল না;

তৎপরিবর্তে যাহা প্রদত্ত হইল, প্রাদেশিক দ্বৈতশাসন নামে তাহা প্রখ্যাত।

ইউরোপে ও ভারতে সংঘটিত ঘটনা-পরম্পরার আঘাতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতীয় জনগণের মধ্যে এক নবজাগরণের সঞ্চার স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। পাঞ্জাবের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ও খিলাফতের প্রতি অনুষ্ঠিত অত্যাচারের ফলে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে এক প্রচণ্ড গণ-বিক্ষোভ জাগিয়া উঠিল; কংগ্রেস, খিলাফত কমিটি, জমিয়ত-উল-উলেমা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান একযোগে এক কর্মপন্থা অনুসরণ করিয়া চলিলেন এবং লর্ড লয়েডের ভাষায় বলিতে গেলে সফলতার উপকণ্ঠে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। বড়লাট 'বিভ্রান্ত ও ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।' বহু বিখ্যাত হিন্দু ও মুসলমান নেতা কারারুদ্ধ হইলেন; কিন্তু জনতা কর্তৃক পুলিশবাহিনী আক্রান্ত হইবার ফলে আইন-অমান্য-আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইল। ইহার পরেই হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ সুরু হয় এবং বহু বৎসর ধরিয়া ভারতের সমাজদেহ তাহার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকে। ভ্রাতৃসুলভ সহযোগিতা ও সমবেদনার অনুপ্রাণনামূলক দৃশ্য কোথায় অন্তর্হিত হইল এবং তাহার স্থান আসিয়া গ্রহণ করিল শোচনীয় ভ্রাতৃ-বিরোধ ও গৃহযুদ্ধ। কংগ্রেস ও মুসলমান প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে গৃহীত অহিংস অসহযোগ কর্মপন্থা দিনে দিনে দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়া অবশেষে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল।

গৌহাটী কংগ্রেসের পর হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নামক নবোদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য একটা প্রচেষ্টা হয়। ১৯২৭ সালের গোড়ার দিকে হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবর্গের মধ্যে পারস্পরিক ভাববিনিময় হয় এবং তাহার ফলে বিশিষ্ট মুসলিম নেতাগণ যে প্রস্তাব রচনা করেন, আপোষ-আলোচনার ইতিহাসে তাহাই মুসলিম প্রস্তাব নামে পরিচিত। এই প্রস্তাব চারিটি সর্ত-সম্বলিত। চিন্তাশীল ভারতীয় মুসলমানেরা পৃথক নির্বাচনের অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাই মুসলিম প্রস্তাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল, নিম্নলিখিত চারিটি সর্ত যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে পৃথক-নির্বাচন-প্রথা পরিত্যক্ত হইবেঃ (১) সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিতে হইবে; (২) অন্যান্য প্রদেশের মত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও বেলুচিস্থানে শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করিতে হইবে; (৩) বাংলা ও পাঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানদিগকে আসন প্রদান করিতে হইবে এবং (৪) কেন্দ্রীয় পরিষদে তাহাদের আসনসংখ্যা মোট আসনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কম হইবে না।

আরও পরামর্শ ও পর্যালোচনার ফলে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে চুক্তি যখন সম্পাদিত হয়, এমন সময় ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন বসিল।

১৯২০ সালে প্রবর্তিত শাসনসংস্কার কোন পক্ষের সন্তোষ বিধানে সমর্থ হয় নাই। কংগ্রেস ও মুসলিম প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহা বর্জন করিল এবং কেবলমাত্র নরমপন্থী রাজনীতিকগণই তাহা চালু করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। এই শাসন সংস্কার পুনঃ পরীক্ষার জন্য যতবার দাবী উত্থিত হইয়াছে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ততবার

তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অবশেষে ১৯২৭ সালে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, শাসন সংস্কারের কৃতকার্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট পেশ করিবার জন্য একটি ষ্ট্যাটুটারী কমিটি গঠন করা হইবে। তদনুযায়ী কমিটি গঠিত হইল; কিন্তু তাহাতে কোন ভারতীয় প্রতিনিধির জন্য স্থান রচিত হইল না। এই অপমানে আহত হইয়া কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, উদারনৈতিক ও অন্যান্য সমস্ত দল সমভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। কংগ্রেস ও উদারনৈতিক দল কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। পৃথক-নির্বাচন-প্রথা পরিহার ও কমিশন বর্জনের প্রশ্ন লইয়া লীগ-অভিমত দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী গঠিত একটি কমিটি দ্বারা ভারতীয় শাসনতন্ত্রের যে খসড়া রচিত হইল, তাহাই নেহরু রিপোর্ট নামে পরিচিত; এই রিপোর্টটি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে উপস্থাপিত হইল। লীগের পক্ষে এই মর্মে কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হইল যে, কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা মোট সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কম হইবে না; প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রের ভোটাধিকার প্রদত্ত না হইলে বাংলায় ও পাঞ্জাবে মুসলমানগণ জনসংখ্যার অনুপাতে আসন লাভ করিবেন এবং 'রেসিডিউয়ারী' ক্ষমতা কেন্দ্রে ন্যস্ত হইবে। এই দাবী স্বীকৃত না হওয়ায় লীগ সম্মেলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। অতঃপর মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলন গঠিত হয় ও কালক্রমে লীগের দুইটি অংশ তাহার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। তদবধি মিঃ জিন্নার চৌদ্দ দফাই মুসলমানগণের দাবী হইয়া দাঁড়ায়।

মুসলিম দাবীর দুইটি প্রধান সর্ত ছিল এই যে, ভারতীয় শাসনতন্ত্রের কাঠামো হইবে যুক্তরাষ্ট্রিক এবং প্রত্যেক প্রদেশের আইন পরিষদ ও অন্যান্য নির্বাচন-মূলক প্রতিষ্ঠানগুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহকে পর্যাপ্তসংখ্যক আসন দিবার সুস্পষ্ট নীতির উপরেই গঠিত হইবে। অথচ তাহার দ্বারা কোন সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সংখ্যালঘুতায়, এমন কি সংখ্যাসাম্যে পরিণত হইবে না। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। মাইনরিটী কমিটি কোনরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছাইতে অসমর্থ হইলে মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন; ইহার দ্বারা মিঃ জিন্নার চৌদ্দ দফা সর্তের প্রায় সবগুলি দাবীই মানিয়া লওয়া হইল; কেবলমাত্র কেন্দ্রে মুসলমান প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি ভবিষ্যৎ আলোচনার জন্য স্থগিত রাখা হয় এবং সিন্ধু সম্বন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, আত্মনির্ভরতার পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণ আর্থিক আনুকূল্য লাভ করা সম্ভব হইলে তাহাকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা হইবে। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের উপর অবিচার করা হইল। মুসলমানগণ যে সব প্রদেশে সংখ্যালঘু, এই বাঁটোয়ারার দ্বারা সেখানে তাহাদের জন্য 'ওয়েটেজে'র ব্যবস্থা হইল। অথচ বাংলায় যেখানে হিন্দুগণ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৪·৮, সেখানে তাঁহাদের জন্য আসন নির্দিষ্ট হইল মাত্র শতকরা বত্রিশটি এবং তাঁহাদিগকে 'ওয়েটেজ' দেওয়া দূরে থাক তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ হইতে আসন ছিনাইয়া লইয়া ইউরোপীয় সম্প্রদায়কে মাত্রাতিরিক্ত 'ওয়েটেজ' দিবার ব্যবস্থা হইল; অথচ ইউরোপীয়গণ মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ০·০১ ভাগ।

ইহার জন্য মুসলমানদের প্রাপ্য আসনের সংখ্যাও কর্তিত যে না হইল তাহা নয়; তবে তাহা হিন্দুদের বঞ্চনার তুলনায় মাত্রায় অল্প। পাঞ্জাবেও শিখদিগকে 'ওয়েটেজ' দিবার জন্য হিন্দুগণকে আইনসম্মত প্রাপ্য অংশ হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। আবার শিখগণও যে 'ওয়েটেজ' পাইলেন, তাহা অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানগণ কর্তৃক প্রাপ্ত 'ওয়েটেজে'র তুলনায় অতিশয় অল্প। এই কারণে হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায় বাটোয়ারার বিরুদ্ধতা করিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অংগীভূত হইয়া গেল। ইহার অনুকল্প ব্যবস্থা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য এলাহাবাদ ঐক্য সম্মেলন আহূত হইল এবং প্রচেষ্টা যখন সার্থক হয় হয়, ঠিক সেই সময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অপকৌশলে তাহা পণ্ড হইয়া গেল। এইরূপে সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল হইয়া যায়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর মুসলিম লীগ এক দফা ডিগবাজী খাইয়া লইলেনঃ যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার জন্য লীগ অন্যান্য মুসলমান দলগুলির সহিত মিলিত হইয়া মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলনে পুনঃ পুনঃ দাবী করিয়াছেন এবং যাহা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, আজ তাহারই বিরোধিতা করিবার জন্য মুসলিম লীগ কটিবদ্ধ কষিয়া দাঁড়াইলেন। নব প্রবর্তিত আইনানুযায়ী পরিচালিত নির্বাচনে লীগ ৪টি প্রদেশে কোন আসনই অধিকার করিতে পারিলেন না এবং এমন কি, যেসব প্রদেশ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানেও অধিকাংশ মুসলমান আসন পর্যন্ত লীগের অধিকারে আসিল না। সেইজন্য অন্যান্য দলের সহিত মিলিত না হইয়া কোন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করা লীগের পক্ষে সম্ভব হয় নাই এবং কংগ্রেসের পক্ষেও অন্যান্য প্রদেশে তাহার সহিত কোয়ালিশন গঠন করা সম্ভব হইল না এই কারণে যে, কতকগুলি প্রদেশে লীগের কোন প্রতিনিধিই ছিলেন না এবং একটি মাত্র প্রদেশ ব্যতিরেকে অন্য কোথাও অধিকাংশ মুসলমান আসন পর্যন্ত তাহার আয়ত্তে আসে নাই। ইহাই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লীগের বিরাগ উদ্রেকের কারণ এবং এই বিরাগ কালক্রমে তিক্ত বিরোধিতায় পরিণত হয়। কংগ্রেস মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ করিতে না করিতে লীগ কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মুসলমানদের উপর অনুষ্ঠিত নির্যাতন-নিপীড়নের সুদীর্ঘ অভিযোগ তালিকা সহ সর্বসমক্ষে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এ স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে গভর্ণরগণের উপর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত, কংগ্রেস কর্তৃক অনুরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কোন দিন কংগ্রেস মন্ত্রিসভার কার্যকলাপে অথবা তাহার পদত্যাগের পর কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট দ্বারা অনুষ্ঠিত কোন অনাচার ও অবিচারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে পারেন নাই; বরঞ্চ তাঁহারা কংগ্রেস শাসনের সুখ্যাতিই করিয়াছেন। কংগ্রেস অভিযোগসমূহের তদন্তের ভার ভারতের প্রধান বিচারপতির ন্যায় একজন নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির উপর অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিলে মিঃ জিন্না তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। লীগ ও কংগ্রেসের ভিতর মতবিরোধের সূত্রগুলি নির্ধারণ ও নিষ্পত্তির জন্য কংগ্রেস পুনরায় চেষ্টা করে;

কিন্তু লীগের অযৌক্তিক দাবীর জন্য তাহা সূচনাতেই সমাপ্ত হইয়া যায়। লীগ দাবী করিল: মুসলিম লীগকে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। সে দাবী কংগ্রেস কর্তৃক স্বীকৃত হইলে তাহার ফল দাঁড়াইত এই যে, কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহিরে যে সব জাতীয়তাবাদী মুসলমান রহিয়াছেন, তাঁহাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মানিয়া লইতে হইত যে, কংগ্রেস কেবল হিন্দুদিগের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীসমূহ পদত্যাগ করিলেন এবং মুসলিম লীগ উক্ত দিনটিকে মুক্তি-দিবসরূপে মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করিল। কংগ্রেস তিনটি বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের সুস্পষ্ট অভিমত অবগত হইবার দাবী জ্ঞাপন করিল: যে উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট সংগ্রাম পরিচালন করিতেছেন, ভারতের ক্ষেত্রে তাহার তাৎপর্য, যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে ভারতকে স্বাধীনতা দিবার প্রতিশ্রুতি এবং যুদ্ধকালীন সময়ে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন। গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের এই দাবী সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিলেন বটে, কিন্তু লীগের দাবী মানিয়া লইয়া ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত অংশটুকু মুলতুবী রাখিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ঘোষণা করিলেন যে, রাজন্য-বর্গ, মুসলমানগণ ও তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় প্রভৃতি ভারতের জাতীয় জীবনের বিশিষ্ট অংশসমূহের সমর্থন ও সম্মতি ব্যতিরেকে কোন প্রকার শাসনসংস্কার-পরিকল্পনা প্রস্তাবিত হইবে না। ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালে তাহার লাহোর অধিবেশনে পাকিস্থান প্রস্তাব গ্রহণ করিল ও তাহা লীগের রাজনৈতিক ধর্মবিশ্বাসে পরিণত হইল পর বৎসর মাদ্রাজ অধিবেশনে।

তখন পর্যন্ত অন্যান্য মুসলিম প্রতিষ্ঠানের মত লীগও ভারতীয় মুসলমানগণকে অন্যতম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপেই গণনা করিতেন এবং অনুভব করিতেন, তাঁহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিশেষ রক্ষা-ব্যবস্থা প্রয়োজন। রক্ষা-কবচরূপে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মুসলমানদিগকে আজ পর্যন্ত কি না দিয়াছেন! পৃথক নির্বাচন হইতে আরম্ভ করিয়া 'ওয়েটেজ' ও অবশেষে মিঃ জিন্নার চৌদ্দ দফা অবধি কিছুই দিতে বাকী রাখেন নাই। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব মুসলমানদের পক্ষ হইতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবী; গভর্ণমেণ্ট সে দাবীও স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ সন্তোষ মানিল না; সে দাবী করিল, ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বের মুসলিম-প্রধান অঞ্চলে স্বাধীন মুসলমানরাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সময়ে লীগও গভর্ণমেণ্টের মধ্যে আলাপ- আলোচনা প্রসঙ্গে লীগপক্ষ হইতে দাবী উত্থাপিত হইল নিম্নলিখিতরূপ: (১) পাকিস্থানের দাবী মানিয়া লইতে হইবে এবং মধ্যবর্তীকালে এমন কিছু বলা বা করা চলিবে না, যাহার ফলে গঠনতান্ত্রিক সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের সময় সে দাবীর সার্থকতা অনুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে পারে; (২) মধ্যবর্তী-কালীন বড়লাটের সম্প্রসারিত শাসনপরিষদে কংগ্রেস যোগদান করিলে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধি-সংখ্যা সমান সমান হইবে; আর কংগ্রেস যদি যোগ না দেয়, তবে মুসলমান সদস্য হইবে সংখ্যাধিক; (৩) মুসলিম সদস্যগণ কেবলমাত্র মুসলিম

লীগেরই মনোনীত প্রার্থী হইবেন, অন্য কাহারও নয়। অতঃপর মুসলিম লীগ হিন্দু ও কংগ্রেসের অত্যাচার হইতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে বাঁচাইবার জন্য রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইল। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় তখন তাহার দৃষ্টিতে হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মাত্র। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রদেশসমূহকে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার দিয়া কার্যতঃ লীগের প্রথম দাবী মানিয়া লইলেন এবং দ্বিতীয় দাবী বাক্যতঃ স্বীকার না করিলেও, বস্তুতঃ বড়লাটের শাসন-পরিষদে সমসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান সদস্য গ্রহণ করিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, হিন্দু মহাসভা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাদের মনোনীত সদস্যাদিগকে শাসন-পরিষদে যোগদান করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। লীগের তৃতীয় দাবী মানিয়া লইতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সম্মত হইলেন না, সদস্য-নিয়োগের অক্ষুণ্ণ অধিকার নিজেদের কবলে রক্ষিত রহিল। কংগ্রেসের দাবী হইল, ভারতীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে এবং বর্তমানে যুদ্ধ-পরিচালন ব্যতীত শাসন বিভাগীয় সমস্ত অধিকার ভারতীয়গণের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক এই দাবী প্রত্যাখ্যাত হইবার ফলস্বরূপ রচিত হইল আইন-অমান্য আন্দোলনের সমর্থনে আগষ্ট-প্রস্তাব; তাহাকে অনুসরণ করিয়া আসিল নেতৃবর্গের গ্রেপ্তার ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলী। মুসলিম লীগ সাব্যস্ত করিল, মুসলমান স্বার্থ আগষ্ট-প্রস্তাবের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু এবং সেই জন্য সে তাহার প্রত্যাহার দাবী করিল। অতঃপর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আর এক নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন—ইতিহাসে ইহাই ওয়াভেল-প্রস্তাব নামে পরিচিত। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ যাহাতে এই প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে কারাগার হইতে মুক্তি দেওয়া হইল। লর্ড ওয়াভেল এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন; কংগ্রেস, লীগ ও কেন্দ্রীয় পরিষদের বিভিন্ন দলের নেতৃবর্গ এবং প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রিগণ এই সম্মেলনে উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রিত হইলেন। সম্প্রসারিত শাসনপরিষদে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়বর্জিত হিন্দুদের সহিত মুসলমানদের সংখ্যাসাম্য রক্ষিত হইবে—ইহাই ছিল সম্মেলনের আলোচ্য অন্যতম প্রস্তাব। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, এই সংখ্যা-সমতা ১৯৪১ সাল হইতেই কার্যতঃ অনুসৃত হইয়া আসিতেছিল—বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এতদিনে তাহাকে প্রস্তাবের অপরিহার্য অঙ্গরূপে অঙ্গীকার করিয়া লইলেন। সম্মেলন ব্যর্থ হইয়া গেল। মুসলিম লীগ দাবী করিল, পরিষদের প্রত্যেকটি মুসলমান সদস্য হইবেন তাহারই মনোনীত প্রার্থী। তাহা ছাড়া, আর একটি সম্ভাবনার আশঙ্কাও মিঃ জিন্নাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। মিঃ জিন্না হিসাব করিয়া দেখিলেন, 'প্রস্তাবিত শাসনপরিষদে মুসলমানগণ কার্যতঃ এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যালঘিষ্ঠতায় পরিণত হইবেন, কারণ তপশীলী, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভোট দিবার সময় কার্যতঃ আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধেই ভোট দিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন রক্ষাকবচ আমাদের অনুকূলে থাকিবে না; কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক আইন-কানুন সম্বন্ধে যাঁহাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান আছে, তাঁহারাই জানেন, সে ক্ষমতা যত্র-তত্র লঘুভাবে ব্যবহৃত হইবার বস্তু নয়।' হিন্দু-মুসলমান সংখ্যাসাম্যের দাবী যখন স্বীকৃত ও কার্যে পরিণত

হইল, মিঃ জিন্নার দাবী তখন উচ্চতর গ্রামে গলা চড়াইয়া ঘোষণা করিল, আমরা সংখ্যাসাম্য চাই বটে, তবে তাহা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে নয়। একদিকে মুসলমান ও অপরদিকে হিন্দু এবং তৎসহ সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়—এই উভয় পক্ষের মধ্যে। কিন্তু ইহাই কি নির্ভরযোগ্য রক্ষাকবচরূপে বিবেচিত হইবে? সর্বত্র মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ইহাই হয়তো হইবে লীগের পরবর্তী দাবী।

এইরূপে মুসলিম লীগের দাবী ও বৃটিশ স্বীকৃতির বিবর্তনের ইতিহাসে ১৯৩০ সাল হইতে সুস্পষ্ট তিনটী পর্যায় আমরা লক্ষ্য করিতেছি। প্রথম পর্যায়ে দাবী করা হইল যুক্তরাষ্ট্র ও আইনসভাসমূহে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক আসন। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াইল এই যে, যে সব প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যাগুরু এবং অন্যান্য সম্প্রদায় সংখ্যালঘু, সেখানে সেই 'ওয়েটেজই' তাঁহারা দাবী করিতে পারেন—সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানগণ অন্যত্র যাহার অধিকারী। সেইজন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের পর্যাপ্তসংখ্যক প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব এই সর্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হইল যে, কোন প্রদেশে কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যালঘু অথবা সম-সংখ্যক সম্প্রদায়ে পরিণত হইতে পারিবে না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যুক্তরাষ্ট্রের দাবী মানিয়া লইলেন; মুসলমানগণ যেখানে সংখ্যালঘু সেখানে তাঁহাদিগকে মাত্রাতিরিক্ত 'ওয়েটেজ' প্রদান করিলেন। অথচ বাঙলা ও পাঞ্জাবের সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুগণকে সে 'ওয়েটেজ' দানে তাঁহারা অসম্মত। বাঙলার হিন্দুগণের জন্য যে আসন-সংখ্যা নির্দিষ্ট হইল তাহা তাঁহাদের জনসংখ্যার অনুপাতে ন্যায্য প্রাপ্য আসন-সংখ্যা হইতে অনেক কম; শুধু তাহাই নহে, ইউরোপীয়দিগকে অতিরিক্ত 'ওয়েটেজ' দিবার জন্য তাঁহাদের অংশ হইতে যত আসন কাটিয়া লওয়া হইল, তাহা মুসলমানদের অংশ হইতে গৃহীত আসন অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক অধিক।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, যুক্তরাষ্ট্রের দাবী স্বীকৃত ও তাহার পরিকল্পনা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বিধিবদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগ তাহা প্রত্যাখ্যান করিল এবং দাবী করিল, ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করার। কোন ক্ষেত্রেই সংখ্যাগরিষ্ঠ কোন সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘুতে, এমন কি, সম-সংখ্যকতায়ও পরিণত করা চলিবে না—এ প্রস্তাব মুসলিম লীগেরই প্রদত্ত; অথচ অমুসলমান-প্রধান প্রদেশসমূহ যখন সেই নীতির প্রয়োগ দাবী করিল, নীতি পরিত্যক্ত হইল সেই মুহূর্তে। তৎপরিবর্তে দাবী উঠিল, কংগ্রেস যদি সহযোগিতা করে, তাহা হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের ও সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-সংখ্যা হইবে সমান সমান; আর কংগ্রেস অসহযোগিতা করিলে, প্রতিনিধিত্বের দিক দিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় হইবে সংখ্যালঘু এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় হইবে সংখ্যাগুরু। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা মুলতুবী রাখিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন, মুসলমান সমাজ কর্তৃক সমর্থিত নয়—এমন কোন পরিকল্পনা গৃহীত হইবে না। গভর্ণমেণ্ট হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিত্বের সংখ্যাসাম্য কার্যতঃ স্বীকার করিয়া লইলেন।

তৃতীয় পর্যায়ে, এই সংখ্যা-সমতা শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবের অন্যতম মুখ্য বক্তব্য বিষয়রূপে লিপিবদ্ধ হইল। মুসলিম লীগ তথাপি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল এইজন্য যে, সমস্ত মুসলমান-সদস্য মনোনয়ন করিবার অধিকার তাহাকে দেওয়া হয় নাই; উপরন্তু সে ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করিল যে, তপশীলী, শিখ ও খৃষ্টানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া একযোগে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে এবং সে ক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠতায় পরিণত মুসলমান সমাজের স্বার্থরক্ষার জন্য কোনরূপ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রহিবে না। কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলিম স্বার্থরক্ষা করিতে হইলে, সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়কে সংখ্যাগুরুত্ব দান করিতে হইবে এবং সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা কেবলমাত্র হিন্দু সম্প্রদায় অপেক্ষা হইলেই চলিবে না, হিন্দু সম্প্রদায়যুক্ত অন্যান্য সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমষ্টি ফল হইতে তাহা হইবে সংখ্যাগুরু।

মুসলিম লীগের দাবী ও গভর্ণমেণ্টের দাক্ষিণ্যের মধ্যে দৌড়ের যে প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, তাহাতে দাবী সব সময় দুই পা অগ্রবর্তী। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পর্যন্ত নাই। ইহার ফলে সাম্প্রদায়িক ত্রিভুজের ভূমি যদি দিনে দিনে বর্ধিত হয় ও পার্থক্যের কোণ প্রশস্ততর হয়, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন হেতুই থাকিতে পারে না।

তৃতীয় খণ্ড

ভারত-বিভাগের পরিকল্পনা

হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি, এই মতটিকে আমরা কিছুদূরে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম। ইহাও দেখিলাম, ভারতবর্ষে মুসলমানগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া যে রাজত্ব করিয়াছেন, তাহার আমলেই এদেশে একটা নূতন সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল--এই সংস্কৃতি কেবল হিন্দু বা কেবল মুসলমানের সংস্কৃতি নয়, হিন্দু ও মুসলমানের একটা মিশ্রিত সংস্কৃতি বা "হিন্দুস্থানী সংস্কৃতি"। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সজ্ঞান চেষ্টার ফলে এবং এই সমস্ত সময়টা ব্যাপিয়া যে সকল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মনৈতিক অবস্থা সক্রিয় ছিল, তাহার ফলেই এই মিলিত সংস্কৃতির জন্ম। আমরা ইহাও দেখিয়াছি, হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি--এই মতবাদ আবিষ্কৃত হইয়াছে মাত্র গত কয়েকটি বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্র ও মুসলমান রাষ্ট্রে বিভক্ত করিবার প্রস্তাবকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য, ১৯৪০ সালের পর হইতে নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগ এই বিভাগ কার্যতঃ ঘটাইয়া তুলিবার সংকল্প একাধিকবার প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগ বাস্তবিকই বহুসংখ্যক মুসলমানের প্রতিনিধি। সুতরাং এই প্রস্তাবটির স্বপক্ষে যে যুক্তিগুলি দেখানো হইয়াছে, কেবল সেইগুলিকে বিচার করিলেই হইবে না, প্রস্তাবটির মধ্যে বাস্তবিক সত্যমিথ্যা কতখানি আছে, তাহাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। এই প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু জনে বহু কথা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন। উভয়পক্ষেরই বক্তারা আবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তব্য প্রচার করিয়াছেন, ভাবপ্রবণতা প্রচুর প্রকাশ করা হইয়াছে। ভাবপ্রবণতা ও আবেগের মূল্য নিশ্চয়ই আছে, শুধু হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু সে নয়। খালি গায়ের জোরে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিলেও হইবে না। কিন্তু সত্যমিথ্যার বিচার দিয়া সে আবেগকে যাচাই করিয়া লওয়া এবং কঠিন বাস্তব তথ্যের সহিত মিলাইয়া তাহার মূল্য নির্ণয় করা অবশ্যই সম্ভব; এই বাস্তব তথ্য অত্যন্ত সঙ্গীন মুহূর্তে অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করে এবং তাহাকে উপেক্ষা করিয়া রচিত বহু প্রস্তাব ও সংকল্পকেই মিথ্যা প্রমাণ করিয়া দেয়। এজন্যই আমি এখানে কতকগুলি তথ্য উপস্থাপিত করিতে চাই, সমর্থক হিসাবে বা বিরোধী হিসাবে যাঁহারাই এই সমস্যাটি লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন, তাঁহারা এইগুলিকে বিচার করিয়া দেখুন। কিন্তু তাহারও পূর্বে আমি সাংস্কৃতিক পার্থক্যের ভিত্তিতে ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষকে একাধিক পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত করিবার বা ইহার বিভিন্ন প্রদেশ ও অংশকে নূতন করিয়া গঠন করিবার যে সকল ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব। ইহার প্রয়োজন আছে, কারণ নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগ আজ পর্যন্ত কোন বিস্তৃত কর্মপ্রণালী প্রকাশ করেন নাই, ভারত-বিভাগ কোন্ নীতি অনুসারে করা হইবে তাহার কয়েকটি সাধারণ সূত্র মাত্র প্রদান করিয়া ক্ষান্ত থাকিয়াছেন। এই বিষয়ে

মুসলিম লীগ প্রথম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন লাহোর অধিবেশনে, ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে। তাহার পূর্বে এই সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন প্রস্তাব ও কর্মপন্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন। লীগ সেই সকল পদ্ধতির কোনটিই গ্রহণ করিলেন না, নিজেরও কোন পৃথক কর্মপন্থা খাড়া করিলেন না, কেবল কয়েকটা নীতিমূলক সূত্রের উপরেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া রাখিলেন, বিস্তৃত কর্মসূচী পরে রচিত হইবে বলিয়া। সেই 'মূলনীতি' প্রচারের পর পাঁচ বৎসরকাল অতীত হইয়াছে; আজ পর্যন্ত লীগ কোন কর্মপদ্ধতি প্রকাশ করেন নাই। ইহার ফলে, লীগের প্রস্তাবের দোষ-গুণ বিচার করিয়া যিনি দেখিতে চান, তাঁহাকেই মুস্কিলে পড়িতে হয়—আলোচনার বিষয়বস্তু বলিয়া তিনি পান মাত্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সমিতি যে সকল বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি প্রস্তাব ও প্রকাশ করিয়াছেন সেইগুলিকে; ইঁহাদের কথাই লীগের কথা, এমন দাবী ইঁহারা কেহ করেনও না, করিবার অধিকারও রাখেন না। এইখানে আরও একটি কথা বলিয়া রাখিতে চাই, পরবর্তী আলোচনা হইতেও কথাটি স্পষ্ট হইবে। এখন পর্যন্ত যে সকল প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোনটিই লীগ তাঁহাদের প্রস্তাবে যে মূলনীতিগুলি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত সম্পূর্ণ মিলে না, বা তাহাকে পুরাপুরি কার্যে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবে এমন দাবী ন্যায়তঃ করিতে পারে না। তথাপি এই প্রস্তাবগুলির বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন আছে; ইহার কোন্‌টি কি কারণে লীগের প্রস্তাবিত নীতির সহিত এক হইতে পারিতেছে না, তাহাও দেখাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

এখন পর্যন্ত যে সকল প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলিকে প্রধানতঃ দুইটি দলে ভাগ করা যায়—(১) পরস্পর নিঃসম্পর্ক মুসলিম ও অ-মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের সমর্থক প্রস্তাব এবং (২) সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বিচার করিয়া ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রদেশ ও রাষ্ট্রগুলির পুনর্গঠন বিষয়ক প্রস্তাব। এই দুই প্রকার প্রস্তাবের মধ্যে প্রধান ও মূলতঃ প্রভেদ এইখানে ঃ প্রথমোক্ত প্রস্তাবগুলিতে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক মুসলিম ও অ-মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথাই বলা হইয়াছে, ইহার প্রত্যেক রাষ্ট্রের দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও আভ্যন্তরীণ উন্নতি ব্যবস্থা হইবে সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব ও স্বাধীন, ইহাদের উপরে কোন কেন্দ্রীয় উচ্চতর সরকার থাকিবে এমন কথা কোনখানেই স্বীকার করা হয় নাই। এমনকি, বিভিন্ন অংশগুলির উপর সামান্য পরিমাণ ক্ষমতা রাখিবে এমন কোন কেন্দ্রীয় সাধারণ সরকার রাখিবার প্রস্তাবও ইঁহারা স্পষ্টভাবে পরিহার করিয়াছেন; দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রস্তাবগুলিতে বলা হইয়াছে, প্রত্যেক পৃথক রাষ্ট্রের ও প্রদেশের প্রচুর পরিমাণ স্বকীয় ক্ষমতা থাকিবে, কিন্তু তাহাদের মাথার উপরে সমস্ত ভারতবর্ষকে লইয়া একটি কেন্দ্রীয় বা যুক্ত-রাষ্ট্রীয় সরকারও থাকিবেন—সমগ্র দেশের উপর ইহার ক্ষমতা থাকিবে, হউক সে ক্ষমতার পরিমাণ অল্প।

(সতের)

"ভারতীয় যৌথরাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনাটি "জনৈক পাঞ্জাবী"র রচিত এবং উক্ত নামের একটি পুস্তকে প্রকাশিত; এই পুস্তকে পরিকল্পনাটি অল্পবিস্তর ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, বর্তমান ভারতবর্ষকে নিম্নোক্তরূপে কয়েকটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করিয়া আবার তাহাদিগকে একটি সর্বভারতীয় যৌথরাষ্ট্রের মধ্যে একত্র গাঁথিয়া দেওয়া যাইতে পারে ঃ

(১) সিন্ধু অঞ্চলস্থ যুক্তরাষ্ট্র ঃ পাঞ্জাব (পূর্ব-পাঞ্জাবের হিন্দু অঞ্চলগুলি —আম্বালা বিভাগ, কাজরা জিলা ও হোশিয়ারপুর জিলার উনা ও গড়শংকর তহশীল—বাদে), সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান, বাহাওয়ালপুর, আম্ব, দিব, সোয়াত, চিত্রল, খয়েরপুর, কালাত, লাস বেলা, কপুরতলা ও মালেরকোট্লা—এই কয়টি রাষ্ট্রের সমবায়ে ইহা গঠিত হইবে। সিন্ধু অঞ্চলের এই যৌথরাষ্ট্রের নাম লেখক দিতে চাহিয়াছেন 'সিন্ধু-স্থান'; তাঁহার হিসাব অনুসারে দেখা যায়, ইহার মোট আয়তন হইবে ৩,৯৮,৮৩৮ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ৩,৩০, ০০,০০০ (তিন কোটি ত্রিশ লক্ষের মত), ইহার মধ্যে শতকরা ৮২ জন মুসলমান, ৬ জনের মত শিখ এবং ৮ জনের মত হিন্দু।

(২) হিন্দু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র—ইহার অংগ হইবে, যুক্তপ্রদেশ, বিহার (বংগদেশের কতক অংশ সমেত), উড়িষ্যা, আসাম, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলি—রাজস্থান এবং দক্ষিণ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত দেশীয় রাজ্য কয়টি বাদে। বাঙ্গালার যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য সব অঞ্চলগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যার হিসাব লেখক দেন নাই। সে হিসাব এইরূপ দাঁড়াইবে—

আয়তন—৭,৪২,১৭৩ বর্গ মাইল।
লোকসংখ্যা—২১, ৬০, ৪১, ৫৪১
হিন্দু শতকরা—৮৩·৭২
মুসলমান শতকরা—১১·০০

(৩) রাজস্থান যুক্তরাষ্ট্র—ইহা রাজপুতানা ও মধ্য-ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি লইয়া গঠিত হইবে। ইহার আয়তন ও লোকসংখ্যার হিসাব দাঁড়াইবে এইরূপ ঃ

আয়তন—১,৮০,৬৫৬ বর্গমাইল।
লোকসংখ্যা—১,৭৮,৫৮,৫০২
হিন্দু শতকরা—৮৬·৩৯
মুসলমান—৮·০৯

(৪) দক্ষিণ-ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র : ইহার মধ্যে থাকিবে হায়দরাবাদ, মহীশূর ও বাস্তার রাজ্যগুলি। ইহার আয়তন ও লোকসংখ্যা এইরূপ :

আয়তন—১,২৫,০৮৬ বর্গ মাইল

লোকসংখ্যা—২,১৫,১৮,১৭১

শতকরা হিন্দু—৮৫·২৮

শতকরা মুসলমান—৮·১০

(৫) বঙ্গদেশীয় যুক্তরাষ্ট্র : ইহার অঙ্গ হইবে, পূর্ববঙ্গের বড় বড় মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলি, আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া ও শ্রীহট্ট জিলা, ত্রিপুরারাজ্য এবং যে দেশীয় রাজ্যগুলি এই প্রদেশ দুইটির মধ্যে পড়িয়াছে বা প্রাদেশিক অঞ্চল মধ্যে পড়িবার ফলে হিন্দু-অধ্যুষিত ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ও লোকসংখ্যা হইবে নিম্নলিখিত রূপ :

আয়তন—৭০,০০০ বর্গমাইল

লোকসংখ্যা—৩,১০,০০,০০০

মুসলমান—২,০৫,০০,০০০ বা শতকরা ৬৬·১ জন

হিন্দু—১,০১,০০,০০০ বা শতকরা ৩২·৬ জন

'পাঞ্জাবী' স্বীকার করিয়াছেন, এই অঞ্চলের সম্যক অবস্থা তাঁহার জানা নাই, সুতরাং ইহার সম্বন্ধে তাঁহার প্রস্তাবকে স্থানীয় মুসলমানদের বিচার-বিবেচনা অনুসারে সংশোধন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তিনি যে সকল হিসাব দেখাইয়াছেন, তাহাও সর্বত্র খুব নির্ভুল বলিয়া মনে হয় না, তবু মোটামুটি তাহাতে শতকরা অনুপাতের হিসাবগুলি ভালই দেখানো হইয়াছে। বঙ্গদেশের যে জিলা-গুলিকে তিনি এই যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়াছেন তাহা হইল—দিনাজপুর, রংপুর, মালদহ, বগুড়া, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ, পাবনা, ময়মনসিংহ, নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, বাখরগঞ্জ, খুলনা ও চট্টগ্রাম।

দেখা যাইতেছে, এই প্রস্তাব অনুসারে ভারতবর্ষ পাঁচটি যুক্তরাষ্ট্রে বিভক্ত হইবার কথা, তাহার মধ্যে দুইটি হইবে মুসলমান-প্রজাবহুল মুসলমান যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য তিনটি হইবে হিন্দু যুক্তরাষ্ট্র, ইহাদের প্রজা-সংখ্যা প্রায় সমস্তই হিন্দু। ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে—সিন্ধুস্থান যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দু প্রজা থাকিবে শতকরা ৮ জন, শিখ থাকিবে শতকরা ৬ জন, অর্থাৎ মোটের উপর শতকরা ১৪ জন পরিমিত একটা সংখ্যালঘু দল তাহার মধ্যে রহিয়া যাইবে; এদিকে বঙ্গদেশীয় যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দুদের পরিমাণ থাকিবে· শতকরা অন্যূন ৩২·৬ জন। হিন্দু যুক্তরাষ্ট্র তিনটিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হইবে মুসলমানগণ, তাহাদের আনুপাতিক পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ১১, ৮·০৯ ও ৮·৯জন।

এই পাঁচটি যুক্তরাষ্ট্রকে একত্র করিয়া একটি যৌথরাষ্ট্র গঠিত হইবে। 'এই প্রস্তাবে বর্ণিত ব্যবস্থা অনুসারে একটি ভারতবর্ষীয় যৌথরাষ্ট্র গঠিত হইবে; যে যুক্তরাষ্ট্রগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহাদের প্রত্যেকের একজন করিয়া বড়লাট থাকিবেন, তাহার নীচে থাকিবেন কয়েকজন করিয়া ছোটলাট, ইঁহারা এক একটি প্রদেশের ভার পাইবেন, যৌথরাষ্ট্রের শাসনসংক্রান্ত-ব্যাপারে এবং যুক্তরাষ্ট্রের

অন্তর্ভুক্ত দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজের যে সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব আছে তৎসম্পর্কে এই বড়লাট কেন্দ্রীয় যৌথরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের অধীন হইবেন। সেই যৌথরাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বভার সম্রাটের প্রতিনিধি বা ভাইস্‌রয়ের হাতে দেওয়া যাইতে পারে; ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রগুলি হইতে সভ্য বাছিয়া লইয়া একটি যৌথ-রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠিত হইবে। এই পরিষদ ভাইস্‌রয়কে শাসনব্যাপারে সাহায্য করিবেন। কোন্ যুক্তরাষ্ট্র হইতে কতজন সভ্য লওয়া হইবে তাহা স্থির করা হইবে যুক্তরাষ্ট্রটির মর্যাদা অনুসারে—দেশের মধ্যে তাহার ভৌগোলিক অবস্থান, প্রজা-সংখ্যা, আয়তন, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতির দিক হইতে যৌথরাষ্ট্রের গঠনে তাহার স্থান ও গুরুত্ব দেখিয়াই সেই মর্যাদা নিরূপিত হইবে। বৈদেশিক নীতি, দেশরক্ষা, সকলের পক্ষে সাধারণ ও স্বাভাবিক জলাশয় হইতে জল-আহরণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা এবং (ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলির যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত) দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজের সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব—এইগুলির ভার বড়লাটের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে; বড়লাটগণ ভাইস্‌রয়ের অধীন থাকিবেন। যে যুক্তরাষ্ট্রগুলি এই যৌথরাষ্ট্রে যোগদান করিবে, তাহারা প্রত্যেকে যৌথরাষ্ট্রের রাজস্ব-ভাণ্ডারে নিজ নিজ দেয় পরিমাণ রাজস্ব সরাসরি আদায় দিয়া চলিবে অথবা ইহাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ রাজস্ব আদায়ের কতকগুলি নির্দিষ্ট খাত হইতে প্রাপ্ত টাকার একটা করিয়া অংশ যৌথরাষ্ট্রের ব্যয়-নির্বাহের জন্য আলাদা করিয়া রাখিবে।' ১ বৈদেশিক বাণিজ্যশুল্ক-জাত আয়কে যৌথরাষ্ট্রের রাজস্ব বাবদ হস্তান্তর করিয়া দিতে রাজি হওয়া উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মুসলমানদের পক্ষে কোনক্রমেই সমীচীন হইবে না।' ১

লেখক দুইটি কথা খুব জোর দিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার প্রথম কথা : পাঁচটি অংশ দ্বারা গঠিত এই যৌথরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার অর্থ "ইহা নয় যে, ভৌগোলিক হিসাবে অখণ্ড ভারতবর্ষকে ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা হইবে এবং লোকসংখ্যা ও সংস্কৃতির তারতম্য অনুসারে এক একটি টুকরা এক একটি সম্প্রদায়ের হাতে দিয়া দেওয়া হইবে। ইহার সহজ স্বরূপ এই, যেন একটি যৌথ পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে একটা ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া পৃথক হইয়া যাইতেছেন, অথচ তাঁহাদের পরস্পর আত্মীয়তার সম্পর্কটা বজায় রহিতেছে। সুতরাং এই রাষ্ট্র বিভাগের অর্থ, সংস্কৃতির প্রভেদ অনুসারে এই বৃহৎ দেশের এক একটি অংশ এক একটি সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে, তারপর সেই অংশগুলি আবার পরস্পর মিলিত হইয়া একটি যৌথরাষ্ট্র গঠন করিবে।"২ তাঁহার দ্বিতীয় কথা : 'ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করার পক্ষপাতী মুসলমানদের মধ্যে যাহারা ভারতের বাহিরের অন্য দেশের সহিত একত্রিত হইবার উদ্দেশ্যে ভারত-বিভাগ কামনা করেন, তাঁহাদিগকে আমি একথা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিতে চাই, বিভাগ প্রার্থনা করিবার কালে ভারতের বাহিরে চলিয়া যাইবার পক্ষপাতী কোন আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা বা আত্মীয়তাবোধকে যেন আমরা প্রশ্রয় না দিই। পৃথক হইতে চাহিবার

1. 'Confederacy Of India', by 'A Punjabi', PP. 12-13.
2. Ibid., P. 15.

সংগে সংগে আমরা আবার একত্র হইবারও সংকল্প পোষণ করিব; হিন্দু-ভারত ও মুসলিম-ভারতের মধ্যে যৌথ সম্পর্ক স্থাপনে যদি হিন্দুরা সম্মত না হন তবে আমরা কেবল পৃথক হইতেই চাহিব, শুধু বলিব, আমাদের রাষ্ট্র-এলাকা হিন্দু-ভারত হইতে আলাদা হইয়া যাক; উভয়ের মধ্যে কোনরূপ সম্পর্ক আর থাকিবে না।.........আমাদের মধ্যে বিদেশীয় লোক যে-কয়জন আছে তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। হিন্দুদের মত আমরাও এই দেশেরই সন্তান; আমাদের ভাগ্য ভারতের সহিতই শেষ পর্যন্ত গ্রথিত, ইহার বাহিরে আমাদের স্থান নাই এবং এইজন্যই আমরা 'পাকিস্থান' কথাটি কোথাও বলি নাই, তাহার পরিবর্তে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মুসলমান এলাকা বুঝাইতে 'সিন্ধুস্থান' নামটি ব্যবহার করিয়াছি।' ৩ কিন্তু বিভাগ-ব্যবস্থার চরম উদ্দেশ্য এইখানেই ক্ষান্ত হইবে না, তাহার প্রমাণ পাই এই পুস্তকের শেষ কয়টি পৃষ্ঠায়ঃ "একথা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেওয়া দরকার যে, হিন্দু-ভারত হইতে আমাদের এলাকাগুলিকে কেবল বিচ্ছিন্ন করিয়া আনাই আমাদের চরম উদ্দেশ্য নয়, ইহা একটি বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র—সেই উদ্দেশ্য হইতেছে একটি আদর্শ ইসলামীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। অর্থনৈতিক জীবনে আমরা হিন্দুদের দাস হইয়া আছি, প্রস্তাবিত ভারত-বিভাগের ফলে আমরা নিঃসন্দেহে সেই দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিব। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হইতেছে একটি আদর্শ ইসলামীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, আমাদের পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়োজনও ইহার দ্বারাই সূচিত হইতেছে। সেই স্বাধীনতা যদি লাভ করিতে পারি, তখন দেখা যাইবে, এই অমুসলমান দেশের পরিবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া আমাদের মুসলমানী রাষ্ট্রের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য দীর্ঘকাল টিকাইয়া রাখাও অসম্ভব ব্যাপার। তখন আমরা চাহিব, ইসলামীয় আদর্শ অনুসারে সমস্ত জগতেই একটা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটাইয়া তুলিতে। অতএব দেখা যাইতেছে, আমাদের চরম আদর্শ হইতেছে একটি জগদ্ব্যাপী বিপ্লবায়োজন খাঁটি ইসলামের নীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে। ভারতের বিভাগ, অর্থনৈতিক জীবনে হিন্দুদের দাসত্ব হইতে মুক্তি, রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্রিটিশের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ, এগুলি সমস্তই আমাদের সেই আদর্শ বিপ্লবকে সফল করিয়া তুলিবার পথে কয়েকটি সোপান মাত্র।" ৪ লেখক দুই রাষ্ট্রের মধ্যে প্রজা বিনিময় করিয়া লওয়ার পক্ষপাতী নহেন ঃ "প্রধানতঃ মুসলমান-প্রজাবহুল অঞ্চলগুলিকে হিন্দু-ভারত হইতে আমরা পৃথক করিয়া লইতে চাই; প্রজা বিনিময় করিয়া লইতে চাই না। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আম্বালা প্রদেশ ও পাঞ্জাবের অন্যান্য হিন্দু অঞ্চলগুলি বাদে সমগ্র সিন্ধু এলাকাটিকে এবং পূর্ব-ভারতে বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগ এবং আসামের গোয়ালপাড়া ও শ্রীহট্ট জিলাকে সহজেই ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করিয়া লইয়া দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করা যাইতে পারে। এইভাবে পৃথক করিয়া লইলে তাহার ফলে সিন্ধু অঞ্চলের ২,৫৭,১৪,৬৫৭জন এবং বঙ্গদেশ ও আসামের প্রায় ২,৩০,০০,০০০জন মুসলমান অধিবাসী হিন্দুদের প্রভুত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে; ২,৮৯,৬৩,৩৪৩জন

3. 'A Punjabi', Op. Cit., P. 17.
4. Ibid., PP. 269-70.

মুসলমান তখনও হিন্দু প্রদেশগুলিতে থাকিয়া যাইবে।"৫ অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬৩জন, লেখকের ভাষায় 'হিন্দুদের প্রভুত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে' এবং শতকরা ঠিক ৩৭জনের কিছু বেশী লোক তখনও সেই প্রভুত্বের অধীন হইয়া থাকিবে।

এই পরিকল্পনাটিতে একটি যৌথরাষ্ট্র সংগঠনের কথা বলা হইয়াছে, প্রধানতঃ এইখানেই ইহার সহিত মুসলিম লীগের প্রচারিত প্রস্তাবের তফাৎ। একটি যৌথ-রাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় সরকার থাকিবে, সমস্ত যৌথরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যাপারগুলি তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। "বৈদেশিক নীতি, দেশরক্ষা, সকলের পক্ষে সাধারণ ও স্বাভাবিক জলাশয় হইতে জল-আহরণ ব্যবস্থা এবং দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজের সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব" ইহার অন্তর্গত থাকিবে। ৬ এই পরিকল্পনায় দেখা যায়, মুসলিম অঞ্চলগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হইবে না, দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, যানবাহনাদি, বৈদেশিক বাণিজ্য ও অনুরূপ অন্যান্য ব্যাপারে চরম ক্ষমতা ইহাদের হাতে থাকিবে না। মুখ্যতঃ এই পরিকল্পনাটিতে কতকগুলি নিঃসম্পর্কিত মুসলমান ও অমুসলমান রাষ্ট্র গড়িয়া তোলার কথা বলা হয় নাই; বলা হইয়াছে যে, দেশের বিভিন্ন অংশকে নূতন ভাবে ভাগ করিয়া পাঁচটি পৃথক অঞ্চলে পরিণত করা হইবে, ইহার প্রত্যেকটির মধ্যে আবার কতকগুলি ক্ষুদ্রতর এলাকা থাকিবে। এই ক্ষুদ্রতর অঞ্চলগুলিতে অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে; ইহারা একত্র হইয়া কয়েকটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবে এবং তারপর সেই যুক্তরাষ্ট্রগুলিকে একত্র করিয়া একটি সমগ্র দেশব্যাপী যৌথরাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে।

আমরা পরে দেখিব, মুসলিম লীগের গৃহীত প্রস্তাবে দেশীয় রাজ্যগুলির সম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই। এই পরিকল্পনাটিতে সমস্ত দেশীয় রাজ্যের কথাই ধরা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে কোন না কোন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইহা স্পষ্টই দেখা যায়, ভারতবর্ষ বা তাহার কোন অংশকে বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে মুক্ত করিয়া লইবার কোন সঙ্কল্পই ইহাতে প্রকাশিত হয় নাই; ভাইসরয়, বড়লাট এবং ছোটলাটদের পদগুলি এখনকার মতই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ধরিয়া লইয়া, তাহার উপরেই এই পরিকল্পনাটি খাড়া করা হইয়াছে। "প্রজাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা যেখানে অধিক সেই অঞ্চলগুলিকে—যেমন উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের স্থানগুলি—প্রয়োজনমত সীমানার অদলবদল করিয়া লইয়া" ও একত্রিত করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা হউক, মুসলিম লীগের প্রস্তাবে ইহাই বলা হইয়াছে; এই পরিকল্পনাটিতেও মোটামুটি সেই নীতি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার ফলে পরিকল্পনাটিতে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ হইতে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অল্প, এমন কতকগুলি অংশকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই হিসাব সর্বত্র নির্ভুল হয় নাই; কারণ ঐ একই যুক্তি অনুসারে মুসলিম রাষ্ট্র হইতে আরও কতকগুলি এলাকা বাদ পড়িয়া যায়। যেমন, সিন্ধুস্থান যুক্তরাষ্ট্র হইতে

5. Ibid., P. 204.
6. Ibid., P. 13.

সমগ্র জলন্ধর বিভাগটিকেই বাদ দিতে হইবে, কারণ ইহার প্রত্যেকটি জিলাতেই মুসলমানের সংখ্যা অল্প, হিন্দু ও শিখের সংখ্যা অধিক। এই বিভাগের প্রতিটি জিলায় এই তিনটি প্রধান সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা পৃথকভাবে হিসাব করিলে দেখা যাইবে, কাজ্‌রা ও হোসিয়ারপুর জিলায় হিন্দুর সংখ্যা অন্যদের অপেক্ষা অনেক বেশী, লুধিয়ানা জিলায় মুসলমানের তুলনায় শিখের সংখ্যা অধিক। একমাত্র জলন্ধর ও ফিরোজপুর জিলাতেই মুসলমানের সংখ্যা পৃথকভাবে হিন্দু বা শিখের তুলনায় বেশী; হিন্দু ও শিখকে একত্র ধরিলে মুসলমানের সংখ্যা অল্প। লাহোর বিভাগের অমৃতসর জিলাতেও হিন্দু ও শিখগণ একত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং মুসলমানগণ সংখ্যালঘু; মোটামুটি অমুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫৪, মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৪৬। লেখক গোয়ালপাড়া জিলাকে বঙ্গদেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছেন; ইহাও ঠিক হয় নাই, কারণ এখানেও অমুসলমানের তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা অল্প। ভারত-বিভাগের পরিকল্পনা করা হইতেছে মুসলমান রাষ্ট্র গড়িবার জন্য; সেক্ষেত্রে, অমুসলমানের তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা যেখানে কম, এমন কোন স্থানকে মুসলমান এলাকার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভারতকে বিভক্ত করিবার সমস্ত পরিকল্পনার বিপক্ষেই বহু যুক্তি আছে, তাহার আলোচনা আমরা পরে করিব। কিন্তু তাহা ছাড়াও, 'পাঞ্জাবী' বর্ণিত পরিকল্পনাটির সম্বন্ধে বিশেষ করিয়াই কতকগুলি কথা বলা যায়। ভারতবর্ষকে পাঁচটি যুক্তরাষ্ট্রে বিভক্ত করিবার কথা বলা হইয়াছে, অথচ ইহার মূলে কোন বুদ্ধি-সম্মত যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার একমাত্র যুক্তি, মুসলমান-যুক্তরাষ্ট্র দুইটির অধিকাংশ প্রজা মুসলমান। হিন্দু-যুক্তরাষ্ট্র যেটিকে বলা হইয়াছে, তাহা ছয়টি অঞ্চল লইয়া গঠিত। এই অঞ্চলগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন এবং ইহাদের মাঝখানে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের এলাকা আসিয়া পড়িয়া ইহাদিগের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ এবং ভারতের উত্তর-পূর্ব কোণে চীন সীমান্ত হইতে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত ইহার বিস্তার। ইহার একটি অংশকে অপরের সহিত সংযুক্ত রাখিতে হইলে বহুসংখ্যক যোজক অঞ্চলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরিকল্পনার ব্যবস্থায় অনেকগুলি অঞ্চলকে তাহাদের স্বাভাবিক পরিবেশ ও প্রতিবেশী অঞ্চল হইতে পৃথক করিয়া লইয়া, অন্য অঞ্চলের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—অথচ উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ দূরত্বের ব্যবধান। ভারতে যত রকম ভাষা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে মাত্র সিন্ধী, বেলুচি ও পুস্তু ব্যতীত সমস্ত ভাষাই এই বিশাল ভূখণ্ডের মধ্যে ব্যবহৃত হইতে দেখা যাইবে। সেইরূপ ইহার অধিবাসীদের মধ্যে দেশের প্রত্যেকটি ধর্মই অনুসৃত হইতে থাকিবে, প্রভেদ হইবে মাত্র ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ও আনুপাতিক গুরুত্বের। ইহার মধ্যে বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য উভয়েরই অংশ পড়িবে। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত এই সমস্ত অঞ্চল এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত দুই কোটিরও অধিক মুসলমান—ইহার সমস্তখানিকে একত্রীভূত করিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যদি সম্ভব হইতে পারে, তাহা হইলে একেবারে সমগ্র ভারতবর্ষকে লইয়া একটি অখণ্ড যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইতে

পারিবে না কেন? রাজপুতানা এবং মধ্য-ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি এক যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে; বাস্তার-এর স্বাভাবিক ভাষা ছত্রিশগড় ও উড়িষ্যার রাজ্যগুলির অনুরূপ, তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া হায়দরাবাদ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত করিবার যুক্তি কোথায়? ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন বস্তুতঃ মহীশূরেরই সংলগ্ন স্থান; ইহাদিগকেই বা দক্ষিণ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া হিন্দু-যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া কেন? হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে মারাঠি, তেলেগু ও কানারি এই তিনটি ভাষাই প্রচলিত, ইহার উপর উর্দু আছে, সেটি শাসক সম্প্রদায়ের ভাষা। মহীশূর, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরকে ইহার সঙ্গে যুক্ত করিলে সে যুক্তরাষ্ট্রে একটিমাত্র নূতন ভাষার প্রবর্তন করিতে হইবে, কারণ কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের লোকেরা মালয়ালমে কথা বলে। মহীশূরের ভাষা কানারি।

'ইস্টার্ণ টাইমস' পত্রিকাতে মিঃ এম, আর, টি তাঁহার একটি পরিকল্পনার চুম্বক প্রকাশ করিয়াছিলেন; "India's Problem of her Future Constitution" নামক পুস্তকে ইহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনাটি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই 'পাঞ্জাবী' রচিত ভারত-বিভাগ পরিকল্পনার অনুসরণে গঠিত, সুতরাং এখানে এটিকে পৃথকভাবে উদ্ধৃত করিলাম না।

(আঠারো)

আলিগড়ের অধ্যাপকদ্বয়-কৃত পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি রচনা করিয়াছেন, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ জফরুল হাসান ও মহম্মদ আফজল হুসেন কাদ্রি। ইহাতে ভারতবর্ষকে নিম্নোক্তরূপে কয়েকটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত করার প্রস্তাব করা হইয়াছেঃ

(১) পাকিস্থান ঃ ইহার অন্তর্গত হইবে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্থান প্রদেশ এবং কাশ্মীর ও জম্মু, মাণ্ডি, চাম্বা, সাকিত, সুমিন, কপুরতলা, মালেরকোটলা, চিত্রল, দির, কালাতি, লোহার, বিলাসপুর, সিমলা-শৈলাঞ্চলের রাজ্যগুলি, বাহাওয়ালপুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য।

ইহার লোকসংখ্যা ৩,৯২,৭৪,২৪৪; তাহার মধ্যে মুসলমান ২,৩৬,৯৭,৫৩৮, অর্থাৎ শতকরা ৬০·৩ জন।

(২) বঙ্গদেশ (হাওড়া ও মেদিনীপুর জিলা বাদে), পূর্ণিয়া জিলা (বিহার) ও শ্রীহট্ট বিভাগ (আসাম)।

লোকসংখ্যা ৫,২৫,৭৯,২৩২; মুসলমান ৩,০১,৯৮,১৮৪ অর্থাৎ শতকরা ৫৭ জন।

(৩) হিন্দুস্থান—ইহার অন্তর্গত হইবে ভারতের বাকী সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য (হায়দরাবাদ, পাকিস্থান, বঙ্গদেশ ও তাহার মধ্যস্থিত দেশীয় রাজ্যগুলি বাদে)।
লোকসংখ্যা ২১,৬০,০০,০০০; মুসলমান ২,০৯,৬০,০০০ অর্থাৎ শতকরা ৯·৭ জন।

(৪) হায়দরাবাদ—ইহার মধ্যে থাকিবে হায়দরাবাদ, বেরার ও কর্ণাটক (মাদ্রাজ ও উড়িষ্যা)।
লোকসংখ্যা ২,৯০,৬৫,০৯৮; মুসলমান ২১,৪৪,০১০, অর্থাৎ শতকরা ৭·৫ জন।

(৫) দিল্লী প্রদেশ—ইহার মধ্যে থাকিবে দিল্লী, মীরাট বিভাগ, রোহিলখন্ড বিভাগ ও আলিগড় জিলা (আগ্রা বিভাগ)।
লোকসংখ্যা ১,২৬,৬০,০০০; মুসলমান ৩৫,২০,০০০, অর্থাৎ শতকরা ২৮জন।

(৬) মালাবার প্রদেশ—ইহার মধ্যে থাকিবে মালাবার ও তাহার সন্নিহিত অঞ্চলগুলি—অর্থাৎ মালাবার ও দক্ষিণ কানাড়া।
লোকসংখ্যা ৪৯,০০,০০০; মুসলমান ১৪,৪০,০০০, অর্থাৎ শতকরা ২৭জন।

ইহা ছাড়া, ভারতবর্ষের যে সহরগুলির লোকসংখ্যা ৫০,০০০ বা তাহার বেশী, সেগুলিকে 'বরো' বা 'স্বাধীন নগরী' বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, ইহাদের অনেকখানি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থাকিবে। এইগুলিতে মোট মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা ১৩,৮৮,৬৯৮। হিন্দুস্থানের গ্রামাঞ্চলের মুসলমানগণ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে সর্বত্র ছড়াইয়া আছে, তাহাদিগকে বুঝাইয়া বাধ্য করিতে হইবে যেন তাহারা এইভাবে সংখ্যালঘুদল হিসাবে না থাকিয়া, মুসলমানের সংখ্যা অধিক এমন সকল গ্রামে আসিয়া একত্রিত হয়।

আত্মরক্ষা ও যুদ্ধনীতির দিক হইতে পূর্বোক্ত তিনটি রাষ্ট্র—পাকিস্থান, বঙ্গদেশ ও হিন্দুস্থান পরস্পরের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকিবে। সে সন্ধির নীতি হইবে এইরূপঃ

(১) ইহারা পরস্পরকে স্বীকার করিবে এবং সাহায্য করিবে।

(২) পাকিস্থান ও বঙ্গদেশকে মুসলমানের এবং হিন্দুস্থানকে হিন্দুদের দেশ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; বাহির হইতে নিজের ইচ্ছামত মুসলমানগণ পাকিস্থান ও বঙ্গদেশে এবং হিন্দুরা হিন্দুস্থানে গিয়া বাসস্থাপন করিতে পারিবে।

(৩) হিন্দুস্থানের মুসলমানদিগকে একটি সংখ্যালঘু জাতি এবং পাকিস্থান ও বঙ্গদেশের অধিবাসী একটি বৃহত্তর জাতির অংশবিশেষ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

(৪) হিন্দুস্থানের অধিবাসী সংখ্যালঘু মুসলমান এবং পাকিস্থান ও বঙ্গদেশের অধিবাসী সংখ্যালঘু হিন্দুগণ, (১) লোকসংখ্যা

অনুসারে পরিষদে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন, (২) সকল ব্যাপারে ও সকল অবস্থাতেই পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও পৃথক নির্বাচনের অধিকারী হইবেন; তিনটি রাষ্ট্রেই এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দিগের স্বার্থরক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইবে। তিনটি রাষ্ট্রেই, শিখ, অ-বর্ণ হিন্দু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়গুলিকে লোকসংখ্যার অনুপাতে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

(৫) হিন্দুস্থানের অধিবাসী মুসলমানদের একমাত্র সরকারীভাবে স্বীকৃত প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন একটি সর্বসম্মত মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

পাকিস্থান, হিন্দুস্থান ও বঙ্গদেশ তিনটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, ইহাদের প্রত্যেকে গ্রেট ব্রিটেনের সহিত পৃথকভাবে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকিবে; এই সকল রাষ্ট্রে ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধি যদি থাকেন, তবে সে প্রতিনিধিও এই তিন রাষ্ট্রে পৃথকভাবে তিনজন থাকিবেন। তিন রাষ্ট্রকে লইয়া একটি যৌথভাবে গঠিত সালিশী আদালত থাকিবে; তিন রাষ্ট্রের পরস্পরের মধ্যে বা ইহাদের কাহারও সহিত ব্রিটিশরাজের বিরোধ বাধিলে, তাহার মীমাংসা এই আদালত করিবেন।

হায়দরাবাদের একটি মর্যাদা আছে, যাহা একান্তভাবেই তাহার নিজস্ব। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ইহাকে মিত্ররাজ্য বলিয়া স্বীকার করেন। বাস্তবিক সন্ধির সূত্রানুসারে এটি একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজনে ব্রিটিশ সরকার ইহার হাত হইতে বেরার ও কর্ণাটক অঞ্চল সরাইয়া লইয়াছিলেন, সুতরাং সে দুইটিকে ইহার হাতে ফিরাইয়া দিতে হইবে। এই প্রত্যর্পিত অঞ্চল দুইটি সমেত হায়দরাবাদকে খোলাখুলিই একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, অন্ততঃ নেপালের সমান সার্বভৌম ক্ষমতা ইহার থাকিবে। কর্ণাটক ফিরিয়া পাইলে সমুদ্রের একটি উপকূলভূমিও ইহার আয়ত্তে আসিবে এবং তখন ইহা স্বভাবতঃই মুসলিম ভারতের দক্ষিণকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইবে।

'পাঞ্জাবী' রচিত পরিকল্পনার যে সকল ত্রুটি, তাহার প্রায় সমস্তগুলিই এই পরিকল্পনাটিতেও বর্তমান; অনেক ব্যাপারে এই ত্রুটি আরও অধিক। মুসলিম লীগের মতে মাত্র মুসলমান-প্রজাবহুল অঞ্চলগুলিকেই মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্গত করিবার কথা বলা হইয়াছে। এই পরিকল্পনাটিতে সে নীতিও কিছুমাত্র বজায় রাখা হয় নাই। আম্বালা বিভাগে হিন্দুদের সংখ্যা স্পষ্টতঃই অত্যন্ত বেশী, জলন্ধর বিভাগেও অমুসলমানের সংখ্যাধিক্য সমানই প্রবল; এই দুইটি অঞ্চলকেই পাকিস্থানের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হইয়াছে। পূর্ব অঞ্চলে বঙ্গদেশের কয়েকটি জিলাকে ধরা হইয়াছে, যাহার লোকসংখ্যা প্রধানতঃ হিন্দু; আসামেরও কয়েকটি জিলাকে ধরা হইয়াছে যেখানে অমুসলমানগণই সংখ্যায় অধিক। এমন কি, বিহারের পূর্ণিয়া জিলাটিকে পর্যন্ত পাকিস্থানের মধ্যে ধরা হইয়াছে; অথচ সেখানে হিন্দুদের সংখ্যা মুসলমানের তুলনায় অনেক বেশী।

হায়দরাবাদের সহিত বেরার ও কর্ণাটক অঞ্চল যোগ করিয়া তাহাকে একটি

সার্বভৌম মুসলমান রাষ্ট্র গঠন করা হইয়াছে। এই স্থানের অধিবাসীরা প্রায় সমস্তই হিন্দু, মুসলমান আছে মাত্র শতকরা ১০·৪ জন—তথাপি ইহাকে মুসলমানের দেশ বলিয়া ধরা হইল কোন্ যুক্তিতে, বুঝা যায় না। হায়দরাবাদের রাজা মুসলমান, কেবল এইজন্যই যদি ইহাকে নিঃসন্দেহে মুসলমান দেশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে, তবে কাশ্মীরকেই বা কেন পাকিস্থানের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হইবে? কাশ্মীরের রাজা তো হিন্দু।

ভারতের সর্বত্র বহুসংখ্যক পৃথক ও স্বতন্ত্র 'স্বাধীন নগরী' সৃষ্টি করার কথা বলা হইয়াছে, ইহাতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাগ-ব্যবস্থাটা আরও তীব্রতর হইয়া উঠিবে। লেখকদ্বয় হিন্দু ও মুসলমানদিগকে যথাক্রমে চেক ও সুদেতেন জার্মাণদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই নীতি মানিলে ভারতবর্ষের এই সহরগুলিকে ড্যানজিগের সমপর্যায়ে ফেলিতে হয়। তারপর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটুক, ভারতীয় চেক অর্থাৎ হিন্দুরা ভারতীয় সুদেতেন অর্থাৎ মুসলমানদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতেছে, এই অজুহাত দেখাইয়া ভারতের ড্যানজিগ্ এই তথাকথিত 'স্বাধীন নগরী'গুলিকে অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য এবং ভারতের চেক (হিন্দু) এবং হিন্দুস্থানকে (চেকোশ্লোভাকিয়া) পরাভূত করিবার জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যাক—লেখকদের ইহা অভিপ্রেত নয়, আমরা মাত্র এই আশাই পোষণ করিতে পারি।

লেখকগণ বলিয়াছেন, হিন্দু ও মুসলমান রাষ্ট্রগুলি পরস্পরকে স্বীকার ও সাহায্য করিবে। ইহাদের মধ্যে "আত্মরক্ষা ও আক্রমণমূলক মৈত্রী" কোন্ ভিত্তিতে রচিত হইবে, তাহার সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, হিন্দুস্থানের অধিবাসী মুসলমানদিগকে একটি সংখ্যালঘু জাতি এবং একটি বৃহত্তর জাতির অংশবিশেষ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; কিন্তু পাকিস্থান ও বঙ্গদেশে যে হিন্দুদের বাস, তাহাদিগের বেলায় এরূপ কোন অধিকার দিবার কথা উল্লেখ করেন নাই। তারপর ইহাদের মতে একটি সর্বসম্মত মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্থানের অধিবাসী মুসলমানদের একমাত্র সরকারী প্রতিনিধিরূপে বর্তমান থাকিবেন; অথচ পাকিস্থান ও বঙ্গদেশে যে সকল হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রহিল, তাহাদের সম্পর্কে এরূপ কোন অধিকার ইঁহারা স্বীকার করেন নাই; ইহাদের একমাত্র সরকারী প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন এরূপ কোন নিজস্ব সর্বসম্মত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইঁহাদেরও থাকিতে পারিবে, এমন কথা এই পরিকল্পনায় নাই।

এককথায় বলা যায়, স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এই পরিকল্পনাটি মূলে একটিমাত্র সহজবোধ্য নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত, পরিকল্পনার সর্বত্রই যে নীতিটি পরিস্ফুট হইয়া আছে--হয় তুমি শিষ্যবাড়ী যাও আমি ফলারে যাই, না হয় আমি ফলারে যাই তুমি শিষ্যবাড়ী যাও।

(উনিশ)

রহমৎ আলি-কৃত পরিকল্পনা

তৃতীয় পরিকল্পনাটি প্রকাশ করিয়াছেন চৌধুরী রহমৎ আলি—The Millat of Islam and the Menace of 'Indianism' নামক একটি পুস্তিকায়। এই পুস্তিকাটি ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে লিখিত। লেখক পাকিস্থান জাতীয় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, ১৯৩৩ সালে তিনি ইহার সূচনা করেন। প্রথমতঃ ইঁহারা মাত্র পাকিস্থান-প্রতিষ্ঠার দাবী প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন। ইঁহাদের কথা ছিল, যে পাঁচটি অংশকে লইয়া সম্পূর্ণ 'পাকিস্থান' গঠিত হইবে সেগুলিকে পৃথক করিয়া লওয়া হউক—এই পাঁচটি অংশ হইতেছে পাঞ্জাব, আফগানিয়া (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, ইহার অধিবাসীরা প্রধানতঃ আফগান), কাশ্মীর, সিন্ধু ও বেলুচিস্থান। ১৯৪০ সালে তিনি বলিলেন, তাঁহার পরিকল্পনাটি লোকে যেরূপ উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিয়াছে তাহা দেখিয়া "মাত্র পূর্ববর্ণিত উদ্দেশ্যের জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া নহে, এবার আমাদের কর্মসূচীর দ্বিতীয় অংশটিও প্রকাশ করিতে আমরা ভরসা পাইতেছি—এই অংশে বঙ্গদেশ ও উস্মানিস্থানের (হায়দরাবাদ ও দাক্ষিণাত্য) কথা বলা হইতেছে।"১ "কারণ ইহা ধ্রুব নিশ্চিত, একবার যদি আমরা 'ভারতবর্ষের' মধ্যে থাকিয়া যাইতে স্বীকৃত হই, তবে চিরকালই আমাদিগকে 'ভারতীয়ত্বে'র দাসত্ব করিয়া মরিতে হইবে—এই 'ভারতীয়ত্ব'কে ইহার কূটবুদ্ধিভক্ত ভারতের জাতীয়তাবাদীরা নিষ্ঠাসহকারে একটা নূতন ধর্মমতের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন, ইহার বুদ্ধিহীন ক্রীড়াপুত্তলি মুসলমান 'উন্নতিকামী'রা ইহাকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিতেছেন, এবং ইহার স্বার্থান্ধ পরিপোষক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ইহাকে নিষ্ঠুরভাবে সমর্থন করিতেছেন।"২ 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' নামটি সম্বন্ধে তিনি বিরাগ প্রকাশ করিয়াছেন।—'দীর্ঘকাল অনবহিত থাকিয়া, অবশেষে এখন নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগ বলিতেছেন, মিল্লাতকে 'ভারতীয়'গণ হইতে পৃথক জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; অথচ এখনও ইঁহারা 'ভারত'কে ছাড়িতে পারিতেছেন না, তাহাকে 'উভয় জাতির মাতৃভূমি' বলিয়া অভিহিত করিতেছেন।' ৩ "ভারতবর্ষকে" এক অখণ্ড দেশ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়ার অর্থ, "ভারতীয়ত্বে"র জোয়াল মিল্লাতের স্কন্ধে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখা, তাহার চাপে মিল্লাত নিঃশেষে পিষ্ট হইয়া যাইবে। ৪ তাঁহারা মনস্থির করুন', 'ভারতের মোহ কাটাইয়া উঠুন।' অর্থাৎ 'ভারতের' সহিত সম্পর্ক ছেদন করাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত

---

1. Ch. Rahmat Ali: The Millat of Islam and the Menace of Indianism, P. 1.
2. Ibid., P. 4.
3. Ibid., P. 6.
4. Ibid., PP. 11—12.

হউক, 'ভারতীয়ত্বে'র হাত হইতে মিল্লাতকে বাঁচাইয়া রাখুন, 'প্যাক্স ইসলামিকা'কে বাঁচাইয়া রাখুন।' ৫ লেখকের মতে, পাকিস্থান, বঙ্গদেশ ও উস্মানিস্থান—এই তিনটি সার্বভৌম রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আসাম বঙ্গদেশের সংলগ্ন একটি উপভূমি মাত্র, ইহার নাম হইবে বঙ্গ-ই-ইসলাম। 'আসল কথাটি এইখানে বলিয়া দেওয়াই ভালঃ আন্তর্জাতিক আইনের যে-সকল নীতির বলে অন্যান্য জাতিরা তাহাদের নিজ নিজ দেশে আধিপত্যের অধিকার পাইতেছে, উস্মানিস্থান এলাকায় আমাদের অধিকারও সেই আইনের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। এই অধিকারের মধ্যে তাহার আইনসম্মত সার্বভৌম ক্ষমতাও পড়িতেছে; ব্রিটিশ সরকার ও "বিশ্বস্ত বন্ধু" উসমানিস্থানের আলা হজরতের মধ্যে সন্ধির যে সর্তগুলি গোড়ায় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতেও এই সার্বভৌম ক্ষমতা নিষ্ঠার সহিত স্বীকৃত হইয়াছে; এই অধিকার উসমানিস্থান যেরূপে ও যে পরিমাণে পাইয়াছে, ভারত মহাদেশের আর কোন অঞ্চলই তাহা পায় নাই, এদিক হইতেও ভারতে উসমানিস্থানের মর্যাদা অভিনব।' 'এইটুকু সম্পন্ন হইয়া গেলে আমরা তখন পাকিস্থান, বঙ্গদেশ ও উসমানিস্থান এই তিনটি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ভিত্তির উপরে তিনটি স্বাধীন জাতি গড়িয়া তুলিব—ইহারা এমন বৃহৎ, মহৎ ও শক্তিশালী জাতি হইবে যে, ইতিহাসে আর কখনও তেমন হয় নাই। ৬ যদি "ভারতীয়ত্বে"র হাত হইতে নিজেদের সত্যই আমরা মুক্ত করিতে চাই, ভারত হইতে পৃথক একটি জাতি হিসাবে যদি নিজেদের পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, আমাদের জাতীয় নিবাস অঞ্চলগুলিকে পরস্পর সংবদ্ধ করিয়া যদি 'দক্ষিণ এশিয়া' দেশের পত্তন করিতে চাই, তবে আমাদিগকে তথাকথিত 'নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগ'টিকে বাতিল করিয়া দিতে হইবে এবং তাহার স্থানে পাকিস্থান, বঙ্গদেশ ও উসমানিস্থান এই তিন জাতির একটি মিলিত সংঘ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

কারণ একমাত্র এইভাবেই 'ভারত' হইতে আমাদের পৃথক হইয়া আসা সম্পূর্ণ হইবে, মিল্লাতের কর্মোৎসাহ বর্ধিত হইবে এবং সমগ্র পৃথিবীতে অভূতপূর্ব সাড়া পড়িয়া যাইবে। এইটুকু হইলে বুঝিব আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি ও নিজের কাম্য ফল বাছিয়া লইতে পারিয়াছি, নিজেদের দুর্গাবাসকে সুদৃঢ় করিয়া তথায় আমাদের কল্পনা, কর্ম ও উদ্যমের পরম মিলন ঘটাইতে পারিয়াছি এবং দক্ষিণ এশিয়াতে আমাদের মহতী সাধনা নবীন রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। তখন আমাদের এই ইতিহাস-রচনাকারী উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচল বিশ্বাস ও নিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আমরা "তারকা" শোভিত পতাকার তলে সমবেত হইব এবং আমাদের যুদ্ধে চরম জয়লাভ করিয়া তবেই নিবৃত্ত হইব।' ৭

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, এই লেখক 'দুই জাতি' মতবাদের অত্যান্ত তীব্র সমর্থক, যেখানে সম্ভব সেইখানেই মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার তিনি পক্ষপাতী। এই সকল মুসলিম রাষ্ট্রের এলাকা কি হইবে, ইহাদের মধ্যে যদি অমুসলমান অধিবাসী

5. Ibid., P. 14.
6. Rahmat Ali, op. cit., P. 15.
7. Ibid., P. 16.

কেহ থাকে তাহাদের বা 'ভারতে'র মধ্যে যে সকল মুসলমান থাকিয়া যাইবে, তাহাদের কোন অধিকার থাকিবে কিনা বা থাকিলে কি কি অধিকার থাকিবে, এ সকল খুটিনাটি তত্ত্বকে তিনি আলোচনার যোগ্য মনে করেন না, তাঁহার পুস্তিকাতে ইহার কোন উল্লেখই নাই। তাঁহার দৃষ্টি পয়গম্বরের দৃষ্টি, এ সকল বাজে কথার খুটিনাটি তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। মুসলিম রাষ্ট্র একবার যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সমস্তই ঠিক হইয়া যাইবে; মুসলিম রাষ্ট্র যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে জগতে কোন কিছুই 'ঠিক' নহে।

পাকিস্থান, বঙ্গীস্থান ও উসমানিস্থান প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রচনা করিয়া রহমৎ আলি সাহেবের মন ভরিল না; ১৯৪২ সালে তিনি তাঁহার "পাক-পরিকল্পনার" তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় ঘোষণা করিলেন; "The Millat and The Mission" নামক পুস্তিকায় তাঁহার "সপ্তম মহাদেশ দিনিয়ার" জন্য রচিত ঈশ্বরের সাত আদেশ প্রকাশিত হইল। এই আদেশগুলি হইতেছেঃ

(১) সংখ্যালঘুত্ব পরিহার কর।
(২) জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা কর।
(৩) সংখ্যার অনুপাতে ভূমি দখল কর।
(৪) বিক্ষিপ্ত জাতিগুলিকে একত্র সংবদ্ধ কর।
(৫) ইহাদিগকে একত্র করিয়া "পাক-জাতিসংঘ" গঠন কর।
(৬) ইণ্ডিয়াকে 'দিনিয়া'তে পরিণত কর।
(৭) 'দিনিয়া' ও তাহার অধীনস্থ দেশগুলিকে একত্র করিয়া পাক-এশিয়া গঠন কর।

১। সংখ্যালঘুত্ব পরিহার কর—"এই আদেশের অর্থ, আমাদের কোন সংখ্যালঘু দলকে আমরা হিন্দু এলাকায় ফেলিয়া আসিব না, বৃটিশ ও হিন্দুরা যদি তাঁহাদের জন্য তথাকথিত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করিতে চায়, তবুও না।"

২। জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা কর—"এই আদেশটি পূর্বোক্তটির পরিপূরক, ইহার অর্থ, দিনিয়া ও তাহার অধীনস্থ দেশের হিন্দুবহুল অংশগুলিতে আমাদের যে সকল সংখ্যালঘু দল থাকিয়া যাইবে, তাহাদের পৃথক জাতীয় সত্তা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, এই কথা আমরা জোর গলায় বলিব ও দাবী করিব; পরিবর্তে আমরাও পাকিস্থান, বঙ্গীস্থান ও উসমানিস্থানের অধিবাসী সংখ্যালঘু হিন্দু ও শিখদিগকে অনুরূপ সম্মান দিতে রাজি থাকিব।" এই আদেশটির মূলে রহিয়াছে একটি সত্য—"ব্যষ্টির পক্ষে সাবালকত্বের যে অর্থ, সমষ্টির পক্ষে জাতীয়ত্ব বলিতেও ঠিক তাহাই বুঝায়।" অবশ্য ১৯৪০ সালের পূর্বে এরূপ দাবী উপস্থিত করার পথে বাধা ছিল, তাহাতে ঔপনিবেশিক আইনের জটিলতা দেখা দিত। এখন সে বাধা নাই; পাকিস্থানে শিখগণ পৃথক জাতির সম্মান দাবী করিয়াছেন, তাহার দ্বারাই এই বাধা দূর হইয়া গিয়াছে। অতএব আমরা এখন এই দাবীটিকে যথাসম্ভব কাজে লাগাইয়া লইব। লোকসংখ্যার অনুপাতে ভূমিতে অধিকার, এই নীতি অনুসারে দাবীটিকে যতদূর সম্ভব মিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিব—পাতিয়ালা, নাভা, ও ঝিন্দ এই তিনটি শিখ এলাকায় শিখদের দাবী স্বীকার করিব, একমাত্র

এই সর্তে যে, দিনিয়া ও তাহার অধীনস্থ এলাকার মধ্যে হিন্দুবহুল অঞ্চল সাতটিতে (সিদ্দিকিস্থান, ফারুকিস্থান, হিন্দুস্থান, মোমিনিস্থান, মোপলাইস্থান, সফিইস্থান ও নসরিস্থান) আমাদের যে সকল সংখ্যালঘু দল আছে, তাহাদেরও জন্য অনুরূপ সম্মানের দাবী শিখদের সমর্থকগণ অর্থাৎ ব্রিটিশ ও হিন্দুগণ একসঙ্গে স্বীকার করিয়া লইবে—গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ এই ব্রিটিশ ও হিন্দুগণ, শিখদের তরফ হইতে অনুরূপ দাবী তোলা হইবে, এই ভয় দেখাইয়া আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে আগাগোড়াই দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে।৮

৩। সংখ্যার অনুপাতে ভূমি দখল কর—ইহার ফলে সিদ্দিকিস্থান, ফারুকিস্থান, হিন্দুস্থান, মোমিনিস্থান, মোপলাইস্থান, সফিইস্থান ও নসরিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই আদেশটির অর্থ, "দিনিয়া মহাদেশ ও ইহার অধীনস্থ দেশে আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য আমরা দখল করিব এবং তাহাকে আমাদের জাতির নিজস্ব দেশে পরিণত করিব। যেমন, হিন্দুস্থানে (আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশে) আমরা সংখ্যালঘু, আমাদের আনুপাতিক সংখ্যা মোট লোকসংখ্যার ১৫ শতাংশঃ সুতরাং সেই হিসাবে আমরা ইহার মোট ভূখণ্ডের ১৫ শতাংশ পরিমিত স্থানের অধিকারী। এই স্থানের মোট পরিমাণ প্রায় ১৭,০০০ বর্গ মাইল। এই ভূমি আমরা দখল করিয়া লইব এবং 'হিন্দুস্থানে' পরিণত করিব। মধ্যপ্রদেশ, বুন্দেলখণ্ড ও মালব, বিহার ও উড়িষ্যা, রাজস্থান, বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ও দক্ষিণ ভারত, পশ্চিম সিংহল ও পূর্ব সিংহল, এই সকল স্থানে আমাদের যে সংখ্যালঘু দলগুলি রহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা অনুসারে এই সকল স্থানেরও আনুপাতিক অংশ আমরা আদায় করিয়া লইব এবং সেই ভূখণ্ডগুলিতে যথাক্রমে সিদ্দিকিস্থান, ফারুকিস্থান, মোপলাইস্থান, সফিইস্থান ও নসরিস্থান নামে আমাদের জাতির জন্য কয়েকটি নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিব।৯

৪। বিক্ষিপ্ত জাতিগুলিকে একত্র সংবন্ধ কর—এই আদেশের অর্থ, দিনিয়া ও সিংহলের হিন্দুবহুল এলাকাগুলিতে আমাদের যে সংখ্যালঘু দলগুলি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে এভাবে বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখা বিপজ্জনক; সুতরাং পূর্বোক্ত (৩নং) নীতি অনুসারে আনুপাতিক পরিমাণে ভূমি দখল করিয়া যে রাজ্যগুলি গঠিত হইবে, তাহার মধ্যে ইহাদিগকে আনিয়া একত্র করিতে হইবে ও একজাতি বলিয়া সংবদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে।'১০

৫। জাতিগুলিকে একত্র করিয়া পাক-জাতিসংঘ গঠন কর—ইহার অর্থ, "অন্ততঃ আমাদের এই দশটি রাজ্যকে একত্রিত করিয়া একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে"—দশটি রাজ্য বলিতে বুঝাইতেছে, লেখক দিনিয়াকে যে দশটি স্থানে বিভক্ত করার স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহাদের।

৬। 'ইণ্ডিয়া' মহাদেশকে 'দিনিয়া'তে পরিণত কর—এই আদেশের অর্থঃ ভারতবর্ষের আত্মা ও ভূমি 'ভারতীয়ত্বের' মোহে অভিভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে

8. Rahmat Ali: The Millat and the Mission, PP. 12—13.
9. Ibid, PP. 13—14.
10. Ibid., P. 16

আমরা মুক্ত করিয়া আনিব এবং 'দিনিয়া'ত্বের রাজ্যে উত্তোলিত করিয়া দিব, ইহার ফলে জগতে একদা তাহার যে মৌলিক ও সত্য মর্যাদা ছিল সেই মর্যাদার আসনে ভারতবর্ষ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রাচীনকাল হইতে যে আদর্শে আমরা অনুপ্রাণিত ছিলাম, এইরূপে আবার আমরা সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিব; সেই উৎসর্গের প্রমাণস্বরূপ তিনটি মূল সত্যের দিকে আমাদের মনোযোগ নিবন্ধ করিতে হইবে। প্রথমতঃ, 'ভারতবর্ষ', ভারতীয়ত্বেরই লীলাভূমি, এই কবি-কল্পনাটিকে আমরা ভাঙিয়া লুপ্ত করিয়া দিব—এত বড় মিথ্যা কল্পনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর রচিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, একটি সত্যকে আমরা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিব—"ভারতবর্ষ" 'দিনিয়াত্বের' লীলাভূমি—ইহাই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা গভীর সত্য। তৃতীয়তঃ, পৃথিবীর সমক্ষে আমরা ঘোষণা করিয়া দিব যে, ভারত মহাদেশ বস্তুতঃ 'দিনিয়া' মহাদেশ—ইহার চেয়ে অবিসংবাদী তথ্য আর নাই।১১

৭। 'দিনিয়া' মহাদেশ ও তাহার অধীনস্থ দেশগুলিকে একত্র করিয়া পাক-এশিয়া প্রতিষ্ঠিত কর।

চৌধুরী রহমৎ আলি সাহেব কেবল পাকিস্থান, বঙ্গীস্থান ও উসমানিস্থান এই তিনটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না। হিন্দু এলাকাগুলির মধ্যেও লোকসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানদের জন্য ভূমি আদায় করিয়া সাতটি মুসলিম রাজ্য তিনি প্রতিষ্ঠা করিবেন; তারপর এই সমস্তগুলিকে একত্র লইয়া পাক-জাতিসংঘ গঠন করিবেন। 'ভারতবর্ষ' নামটি পর্যন্ত লোপ করিয়া দিতে হইবে; এই ক্ষুদ্র মহাদেশটির নূতন নামকরণ হইবে 'দিনিয়া'—India কথাটির অক্ষরগুলিকেই উল্টাপাল্টা করিয়া সাজাইয়া এই নূতন নামটি রচিত;—তারপর সেই পাক-জাতিসংঘ বৃহত্তর পাক-এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।

পাকিস্থানের কথা রহমৎ আলি সাহেবই প্রথম বলিয়াছেন, ইহার নামটিও তাঁহারই সৃষ্টি। গোলটেবিল বৈঠকে যে মুসলমান প্রতিনিধিরা গিয়াছিলেন তাঁহারা যুক্তরাষ্ট্রমূলক শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইয়া মিল্লাতের স্বার্থহানি ঘটাইয়াছেন, এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদ হিসাবে তিনিই প্রথম স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার দাবী উত্থাপন করেন। অতএব তাঁহার ধারণা মুসলিম লীগ কিয়ৎ-পরিমাণে তাঁহার মতামতই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কে জানে, তাঁহার পরিকল্পনার অন্যান্য যে সকল অংশ প্রকাশিত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবে, হয়তো কালক্রমে সেগুলিও লীগ গ্রহণ করিয়া লইবে; 'ভারতবর্ষ' নামটাই একদিন লুপ্ত হইয়া যাইবে এবং সমগ্র মহাদেশটি জুড়িয়া মিল্লাতের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহাকে 'দিনিয়া' নামেই অভিহিত করিতে থাকিবে, ভারতবাসীকে হয়তো সেই ভবিষ্যৎ দিনের জন্যই প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

---

11. Rahmat Ali, op. cit., P. 18.

(বিশ)

ডক্টর এস্, এ, লতিফ -কৃত পরিকল্পনা

চতুর্থ পরিকল্পনাটি ডক্টর এস্, এ, লতিফ-এর রচনা; 'The Muslim Problem in India' নামক পুস্তকে তিনি ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে দুইজাতিকে পৃথক করিয়া লইবার কথা বলা হয় নাই, অফুরন্ত-পরিমাণ জটিলতারও অবতারণা করা হয় নাই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক সীমারেখা অনুসারে ভারতবর্ষকে একত্র গ্রথিত করিবার পরিকল্পনাই ইহাতে প্রকাশ করা হইয়াছে, সুতরাং ইহার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপেই ভারতীয়। কানাডাতে দুইটি বিভিন্ন জাতি নিজস্ব দুইটি পৃথক ভূখণ্ডে বাস করিয়া উভয়ে একত্রে একই দেশের উন্নতিকল্পে কাজ করিয়া যাইতেছে; এই পরিকল্পনাতেও ভারতবর্ষকে অন্ততঃ সেইরূপ একটি অখণ্ড জাতিরূপে সংগঠিত করিবার কল্পনা করা হইয়াছে—বিভিন্নরূপ সংস্কৃতি অনুসারে কয়েকটি একধর্মী রাষ্ট্র গঠন করিয়া, তারপর তাহাদের মিলন দ্বারা একটি যুক্তরাষ্ট্র রচনা করাই ইহার অভিপ্রায়। এই পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্য ঐক্যসাধন, বিভেদসাধন নয়।১

এই পরিকল্পনা অনুসারে, ভারতবর্ষকে চারিটি মুসলমান এলাকা ও অন্ততঃ এগারোটি হিন্দু এলাকায় ভাগ করা হইবে—এলাকাগুলি গঠিত হইবে সংস্কৃতির বিশেষত্ব অনুসারে, যেন প্রতিটি এলাকার লোকেরা ঠিক একইপ্রকার সংস্কৃতিসম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে। দেশের সর্বত্র যে দেশীয় রাজ্যগুলি ছড়াইয়া আছে, সেগুলিকেও স্বাভাবিক সংস্কৃতি-সাম্য অনুসারে এই সমস্ত এলাকার সহিত জুড়িয়া দেওয়া যাইবে। এইরূপে গঠিত এলাকার প্রত্যেকটিতে এক একটি একধর্মী রাষ্ট্র স্থাপিত হইবে; যেখানে একই এলাকার মধ্যে একাধিক দেশভাগ একত্রিত হইল সেখানে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত তাহাও হইবে বহুল মাত্রায় বিকেন্দ্রিক; এই সকল রাষ্ট্র অনুরূপ অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রের সহিত একত্র নিবন্ধ হইয়া একটি 'নিখিল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র' রচনা করিবে।২

মুসলিম সংস্কৃতিপ্রধান এলাকাঃ

(১) উত্তর-পশ্চিম এলাকা ঃ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে সিন্ধু, বেলুচিস্থান, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং খয়েরপুর ও বাহাওয়ালপুর এই দুইটি দেশীয় রাজ্য। এই ছয়টি অঞ্চলকে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে একত্র গ্রথিত করিয়া একটি মাত্র স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করা হইবে; আড়াই কোটিরও বেশী মুসলমান এইখানে নিজস্ব একটি স্বাধীন বাসভূমি পাইয়া যাইবে।

---

1. S. A. Latif: Muslim Problem in India, PP. 28—38.
2. Ibid., P. 30.

(২) উত্তর-পূর্ব এলাকা ঃ ইহার মধ্যে থাকিবে কলিকাতা ও আসাম সমেত পূর্ববঙ্গ। এই অঞ্চলের কিঞ্চিদধিক তিন কোটি মুসলমান এখানে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করিতে পারিবে।

(৩) দিল্লী-লক্ষ্মৌ এলাকাঃ উপরি উক্ত দুইটি এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে মুসলমানের সংখ্যা সর্বত্র সমান নয়। এই স্থানের মুসলমানদের মধ্যে যাহারা উক্ত এলাকা দুইটির মধ্যে কোনটির কাছাকাছি বাস করে, তাহাদিগকে এই দুইটির প্রজা করিয়া লওয়া যাইতে পারে—যে এলাকাটি যাহার নিকটে পড়িবে, সে সেই এলাকায় উঠিয়া গিয়া বাস করিবে। অবশ্য বেশীর ভাগ লোকই ইহার বাহিরে পড়িবে, বর্তমানে ইহারা যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের বাসিন্দা, ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১২০ লক্ষ। ইহাদিগকে একটি নূতন সৃষ্ট এলাকাতে একত্রিত করা যাইতে পারে—এই এলাকাটি পাতিয়ালার পূর্ব সীমানা হইতে বরাবর লক্ষ্মৌ পর্যন্ত চলিয়া যাইবে, রামপুরকে ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইবে, আগ্রা, দিল্লী, কাণপুর ও লক্ষ্মৌ ইহার অন্তর্গত হইবে, কিন্তু বারাণসী, হরিদ্বার, এলাহাবাদ, মথুরা প্রভৃতি বড় বড় হিন্দু তীর্থ-স্থানগুলিকে ইহার মধ্যে লওয়া হইবে না।

(৪) দাক্ষিণাত্য এলাকা ঃ ইহার মধ্যে থাকিবে হায়দরাবাদ, বেরার এবং তাহার দক্ষিণে কিছু পুনর্লব্ধ ভূখণ্ড—এই ভূখণ্ডটি কুরনুল, কুদ্দাপ্পা, চিত্তুর, উত্তর আর্কট এবং চিঙ্গলপেট জিলার মধ্য দিয়া মাদ্রাজ সহর পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিবে। এই অঞ্চলটি থাকিবার ফলে সমুদ্র তীরে পৌঁছিবার খানিকটা পথ ইহার পক্ষে খোলা থাকিবে। যুক্তপ্রদেশ, সমগ্র বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী, মহীশূর, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের, অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য-উপদ্বীপের, সমস্ত মুসলমানকে এই এলাকাটিতে আনিয়া একত্রিত করা হইবে। উত্তর-পূর্ব এলাকা এবং দিল্লী-লক্ষ্মৌ এলাকাতে যাহাদের স্থান সংকুলান হইল না, সেই উদ্বৃত্ত মুসলমান প্রজাদেরও এইখানে আনিয়া বসানো যাইতে পারে। এই চারিটি এলাকা গঠিত হউক, ইহা ছাড়া রাজপুতানা, গুজরাট, মালব ও পশ্চিম ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে যে মুসলমানগণ রহিয়াছে, তাহাদেরও একত্রিত করিয়া আনা প্রয়োজন হইবে; ভূপাল, টঙ্ক, জুনাগড়, জাওরা প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান দেশীয় রাজ্যগুলিতে এবং ইহাদের নিকটে নির্মিত আজমীর নগরে একত্রিত করা যাইতে পারে; সন্নিহিত হিন্দু অঞ্চল-গুলির সহিত ইহারা প্রজা বিনিময় করিয়া লইবে।

হিন্দুসংস্কৃতি-প্রধান এলাকাঃ

(১) বাঙ্গালী হিন্দুদের জন্য বঙ্গদেশের খানিকটা অংশ ও বিহারের যে অংশটির বঙ্গদেশের সহিত রীতিনীতিতে মিল আছে, তাহাকে একত্র করিয়া একটি এলাকা গঠিত হইবে।

(২) উড়িষ্যা—সমস্ত ওড়িয়াভাষা-ভাষী প্রজা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৩) পশ্চিম বিহার ও যুক্তপ্রদেশ লইয়া গঠিত একটি এলাকা—ইহার সীমানা লক্ষ্ণৌ-দিল্লী এলাকার সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে, উত্তরে ইহার সীমানা হইবে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত; মধ্য ভারতের দেশীয় রাজ্যেরও কয়েকটি ইহার অন্তর্গত হইবে। এইটিই হইবে আসল হিন্দুস্থান; হিন্দী ভাষাটিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা হইলে তাহার ফলে সম্ভবতঃ ইহার গঠন আরও সহজ হইয়া উঠিবে।

(৪) রাজপুতানার অন্তর্গত রাজপুত রাজ্যগুলি।

(৫) গুজরাট-কাথিওয়াড়ের উল্লেখযোগ্য হিন্দুপ্রধান স্থানগুলি ইহার অন্তর্গত হইবে—এই নামে গুজরাটী সংস্কৃতি তাহার নিজস্ব বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে পারিবে।

(৬) মহারাষ্ট্র

(৭) কানাড়ী, (৮) অন্ধ্র, (৯) তামিল, (১০) মালয়ালি—দ্রাবিড় সভ্যতার এই চারিটি উপদল স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে বাঁচিয়া থাকিবে।

(১১) একটি হিন্দু-শিখ মিলিত এলাকা। কাশ্মীরের খানিক অংশকে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের মধ্যে একটা পারস্পরিক বন্দোবস্ত করিয়া কাশ্মীরের যে জিলাগুলিতে মুসলমান প্রজা অধিক সেগুলিকে পাঞ্জাবের অন্তর্গত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, পরিবর্তে বর্তমান পাঞ্জাব প্রদেশের উত্তর-পূর্বভাগের খানিকটা অংশকে (কাজ্‌রা উপত্যকা) কাশ্মীরের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইবে। সিন্ধু প্রদেশে যে সকল হিন্দুর বাস তাহাদিগকে নিকটবর্তী হিন্দু এলাকা গুজরাট ও রাজপুতানার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। পাঞ্জাব ষ্টেট্‌স্ এজেন্সীর অধীনে বর্তমানে যে অ-মুসলমান রাজ্যগুলি রহিয়াছে, তাহার সমস্তগুলি এবং হিন্দু রাজ্য কাশ্মীরের কতক অংশ লইয়া এই হিন্দু-শিখ এলাকা গঠিত হইবে।

এই পুস্তকে অঞ্চল বিভাগের যে সকল সীমারেখা দেখানো হইয়াছে, তাহা খসড়া প্রস্তাব মাত্র; এই সকল সীমানা যথাযথ স্থির করিবার জন্য একটি রাজকীয় কমিশন নিয়োগ করা যাইতে পারে।

এই পরিকল্পনাতে বলা হইয়াছে, মুসলমান এলাকার অধিবাসী হিন্দু ও হিন্দু এলাকার অধিবাসী মুসলমানদিগকে যথাক্রমে নিকটবর্তী হিন্দু ও মুসলমান এলাকায় স্থানান্তরিত করিয়া লওয়া হইবে, ফলে কতকগুলি মোটামুটি একধর্মী এলাকা গঠিত হইয়া যাইবে। হরিজনদিগকে নিজের ইচ্ছামত হিন্দু বা মুসলমান এলাকায় গিয়া স্থায়ী বাসস্থান স্থাপন করিবার অধিকার দেওয়া হইবে। প্রজা-বিনিময় ও বাস স্থানান্তরিত করা কাজটা ধীরে ধীরে কয়েক বৎসর ধরিয়া সম্পূর্ণ করাই উচিত; প্রজারা স্বেচ্ছায় যে যেখানে যায়, চলিয়া যাউক, প্রথম পরীক্ষা হিসাবে এইরূপে ইহার আরম্ভ করা যাইতে পারে।

শাসনতন্ত্রে নিম্নোক্তরূপ বিধান থাকিবেঃ

(১) ভারতীয় জাতিগুলির সম্পর্কে সাধারণ আইনঃ ভারতে বহু জাতি, যে কোন জাতির যে কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন কারণে এমন কোন এলাকাতে বাস করিতে পারে, সংস্কৃতির দিক হইতে যাহার সে অংগ নয়। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত অঞ্চলের আইনে তাহার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে এবং তাহাকে নাগরিকের সমস্ত অধিকারও দেওয়া হইবে।

(২) ধর্মমন্দির ইত্যাদি : ধর্মমন্দির, মঠ-ও দেউল, সমাধিস্থল প্রভৃতি স্থানগুলিকে প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্র সযত্নে রক্ষা করিবেন, কেন্দ্রীয় সরকারও এ বিষয়ে তাহাদের উপরে দৃষ্টি রাখিবেন।

(৩) খৃষ্টান, বৌদ্ধ, পারসী প্রভৃতি ক্ষুদ্র জাতি ও সম্প্রদায়গুলির নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য যে সকল ধর্ম ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত রক্ষাকবচ প্রয়োজন, প্রত্যেক রাষ্ট্রই সর্বদা তাহার ব্যবস্থা রাখিবেন। ইহারা যদি কখনও পৃথক দল হিসাবে নিজস্ব একটি এলাকাতে থাকিতে চায়, সে দাবী করিবার অধিকার ইহাদের থাকিবে।

(৪) হরিজনগণ ইচ্ছামত যে কোন হিন্দু বা মুসলমান এলাকাতে গিয়া বাস করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবে; এই সকল এলাকাতে তাহারা স্থায়ী বাসস্থান রচনা করিবে এবং নাগরিকের সম্পূর্ণ অধিকার সম্যক্ ভোগ করিতে পাইবে।

লেখক ভারতের শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পরিবর্তে প্রযুক্ত হইতে পারে।

ইহাতে বলা হইয়াছে, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেকটি প্রদেশ যথাসম্ভব সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাইবে; যুক্তরাষ্ট্রের হাতে যে সকল ক্ষমতা থাকিবে তাহার তালিকা যথাসম্ভব অল্প করিয়া ধরা হইয়াছে; ইহার ফলে দেশীয় রাজ্য ও রাজাদের অধিকার যথাসম্ভব রক্ষিত হইবে।

ইহাতে এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত যে সকল এলাকা একত্র সংলগ্ন ও জীবনযাত্রার রীতিনীতিতে ঐক্যসম্পন্ন, তাহারা একত্র মিলিত হইয়া এক একটি চক্র বা মণ্ডল গঠন করিতে পারিবে; সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে সকল ব্যাপার ইহাদের সকলের পক্ষে সমান প্রযোজ্য, তাহার সম্পর্কে এইরূপে ইহারা এক নীতি ও কর্মসূচী রচনা করিতে পারিবে; আবার প্রত্যেকটি প্রদেশও এইরূপে রচিত নীতি অনুসারে নিজের নিজের জন্য প্রয়োজনমত আইনকানুন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ইংরেজরা পার্লামেণ্ট-চালিত শাসনবিভাগ বলিতে যাহা বুঝে, তাহার পরিবর্তে ইহাতে ব্যবস্থা করা হইয়াছে প্রত্যেক প্রদেশে ও কেন্দ্রীয় সরকারে একটি করিয়া সর্বদলের সমন্বয়ে সৃষ্ট স্থায়ী শাসকমণ্ডলী গঠিত হইবেন, ইঁহারা একটি সর্বজনস্বীকৃত নীতি সর্বত্র অনুসরণ করিবেন। কেন্দ্রীয় সরকারে, তথা প্রদেশগুলিতে, সংখ্যালঘু মুসলমান এবং অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক জীবন যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহারও ব্যবস্থা ইহাতে করা হইয়াছে।

এই পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে, ভারতবর্ষে একটি যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হইবে, ইহার অন্তর্গত প্রদেশগুলি যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হইবে; দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, বাণিজ্য, যানবাহন প্রভৃতি যে বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপেই সকলের পক্ষে একনীতি অনুযায়ী চলা প্রয়োজন, মাত্র সেইগুলিরই শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকিবে; অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা থাকিবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

ভারতবর্ষ বহুবিধ সংস্কৃতির দেশ, ইহাদের প্রত্যেকটিকেই অবাধে বাড়িয়া উঠিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের অংগহিসাবে স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে কাজ করিয়া যাইতে পারে, এতটুকু নিরাপত্তার ভরসা ইহাদিগকে অবশ্যই দিতে হইবে। কাহারও সংস্কৃতির উপরে হস্তক্ষেপ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করিতে ব্রতী হইবেন, এমন পরিস্থিতি সর্বথা পরিহার করিয়া চলিতে হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করা হইল, সুতরাং প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের একত্রে ভোগ্য ক্ষমতা-তালিকারও লোপসাধন করা হইল; ইহার ফলে এই উভয়ের মধ্যে সাম্য ও যোগ বজায় রাখিবার মত একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিতেছে। এইজন্যই এক একটি অঞ্চলে এক একটি চক্র বা মণ্ডল গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে; ইহার ফলে এইরূপ মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলি তাহাদের সকলের পক্ষে যে সমস্যাগুলি একরূপ তাহার সম্বন্ধে একরূপ কর্মনীতি নির্ধারণ করিতে পারিবে, আবার এই নীতি অনুসারে প্রত্যেকে—(সে দেশীয় রাষ্ট্র বা প্রদেশ যাহাই হউক)—নিজের মত করিয়া পৃথকভাবে আইনও প্রণয়ন করিয়া লইতে পারিবে। এই সকল মণ্ডল গঠিত হইলে আরও এইরূপ কতকগুলি প্রদেশ লইয়া ক্ষুদ্রতর যুক্তরাষ্ট্র (বৃহত্তর যুক্তরাষ্ট্রের অংগহিসাবে) গঠন করিবার প্রয়োজন হইবে না। এরূপ উপ-যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিলে তাহাতে শাসন ও আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা ও আয়োজনকেই অযথা বাড়াইয়া ভারাক্রান্ত করিয়া তোলা হয়।

একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় অন্যান্য সংখ্যালঘু দলগুলির উপর অত্যাচার না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থাকল্পে এই পরিকল্পনাতে একটি মিশ্রদলীয় অথচ স্থায়ী শাসকমণ্ডলী গঠিত হইবে—ইঁহার মধ্যে সমস্ত দল ও সংঘেরই প্রতিনিধি লওয়া হইবে। ভারতে যতগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে, তাহার প্রত্যেকটির নিখিল ভারত হিসাবে গঠিত এক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থাকিবে; এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা একত্র আলোচনার ও ঐকমত্যের ফলে নানাবিধ মতামতের যে আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হইবেন, সেই মীমাংসা অনুসারেই এই শাসকমণ্ডলীর কর্মনীতি নির্ধারিত হইবে। এই শাসকমণ্ডলী কিন্তু একটি 'কোয়ালিশন' গভর্নমেণ্ট মাত্র হইবেন না, 'কোয়ালিশন' সরকার সর্বদাই স্বল্পক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। এটি হইবে, সর্বদলের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্থায়ী সরকার—আমেরিকায় এইরূপ সরকার বিদ্যমান। আলোচনার বস্তু হিসাবে প্রস্তাব করা হইয়াছে, প্রত্যেক প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী তাহার সমগ্র ব্যবস্থাপক

সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন, এবং উক্ত ব্যবস্থাপক সভার যতদিন আয়ু প্রধান-মন্ত্রীও সেই পর্যন্তই স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি একমত হইয়া নিখিল ভারতীয় সংখ্যার অনুপাতে স্থির করিবেন, শাসন-পরিষদে কোন্ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি কতজন থাকিবেন; সেই অনুপাত অনুসারে শাসন-পরিষদে তাঁহার সহকর্মী মন্ত্রীদের বাছিয়া লইবার স্বাধীনতা প্রধানমন্ত্রীর থাকিবে। নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী এইভাবে মন্ত্রীদিগকে মনোনীত করিবেন; ব্যবস্থাপকসভা অনাস্থা প্রকাশ করিলেও এই মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিতে বাধ্য থাকিবেন না।

এই শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের জন্য নিম্নোক্তরূপ রক্ষাকবচগুলির ব্যবস্থা রাখা হইবেঃ

(ক) ব্যবস্থাপকসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ—

(১) পৃথক নির্বাচন এবং কতকগুলি বিভিন্ন প্রদেশে বর্তমানে মুসলমানদের যে আনুপাতিক হার স্বীকৃত রহিয়াছে, তাহা বজায় থাকিবে।

(২) দেশীয় রাজ্যগুলির তরফ হইতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপকসভায় যথেষ্ট-সংখ্যক মুসলমান প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে, ইঁহাদের সংখ্যা হইবে কেন্দ্রীয় পরিষদের মোট সভ্যসংখ্যার অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ।

(৩) চক্র বা মণ্ডলের পরিষদে মুসলমানগণ পর্যাপ্ত ও কার্যকরী সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পাইবেন—মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন এলাকার ব্যবস্থাপকসভায় মুসলমানদের মোট যে সংখ্যা আছে, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এই প্রতিনিধিদের সংখ্যা স্থির হইবে।

(খ) আইন প্রণয়নঃ মুসলমানদের ধর্ম, ব্যক্তিগত (দেওয়ানী) আইন ও সংস্কৃতি-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার থাকিবে প্রত্যেক এলাকার ব্যবস্থা-পরিষদের মুসলমান সভ্যদের হাতে; ইঁহারা একত্রে এই জন্য একটি বিশেষ কমিটিভুক্ত হইবেন; ইঁহাদের কাজে সাহায্য করিবেন আবার ইহাদেরই এক-তৃতীয়াংশ লোক, মুসলিম আইন ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হইবেন। এই কমিটির সিদ্ধান্তই ব্যবস্থাপক সভা গ্রহণ করিবেন। এইরূপ সিদ্ধান্তের দ্বারা যদি অন্য কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থ-হানির সম্ভাবনা থাকে, তবে ব্যবস্থাপক সভা সমগ্র আইনটিকে পুনর্বিচার করিয়া দেখিতে পারিবেন, কিন্তু ইহাদের মূলনীতিকে ব্যাহত করিতে পারে এমন কোন সংশোধন-ব্যবস্থা প্রণয়ন করা চলিবে না।

(গ) শাসন বিভাগঃ শাসন-বিভাগ গঠিত হইবে একটি মিলিত মন্ত্রী দল সমবায়ে। ইহার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি থাকিবেন। উভয়ের পক্ষে গ্রহণযোগ্য এমন একটি নীতি ইঁহারা একমত হইয়া অনুসরণ করিবেন। ব্যবস্থাপক সভার ইঁহাদিগকে পদচ্যুত করিবার শক্তি থাকিবে না। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের মতই ইঁহারা ব্যবস্থাপক সভার অনধীন হইবেন এবং ব্যবস্থাপক সভার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত ইঁহারা নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইবেন সমগ্র ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক, আমেরিকার মত প্রজা কর্তৃক নয়।

ব্যবস্থাপক সভার সমস্ত দলের মধ্য হইতে তিনি তাঁহার সহকর্মী বা মন্ত্রীদিগকে বাছিয়া লইবেন। মন্ত্রীদের মধ্যে একটা ন্যায়সঙ্গত সংখ্যা পূরণ হইবে মুসলমান সভ্য দিয়া; এই মুসলমান মন্ত্রীগণ ব্যবস্থাপক সভার মুসলমান সভ্যদের আস্থা-ভাজন হইবেন এবং তাঁহাদের মনোনীত একটি নামের তালিকা হইতেই ইঁহাদিগকে বাছিয়া লওয়া হইবে। আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগ এবং শিক্ষা বিভাগে একজন করিয়া মন্ত্রী ও একজন করিয়া সহকারী মন্ত্রী থাকিবেন, ইঁহাদের মধ্যে একজন হইবেন মুসলমান।

(ঘ) পাবলিক সার্ভিস কমিশনঃ যে সকল প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যায় অল্প, সেখানে এই কমিশনের সভ্যদের মধ্যে অন্ততঃ একজন মুসলমান থাকিতে হইবে; সরকারী চাকুরিগুলির মধ্যে মুসলমানদের জন্য যে আনুপাতিক সংখ্যা ধার্য রহিয়াছে তাহা যথাযথ পালিত হইতেছে কি না, সেই দিকে দৃষ্টি রাখাই হইবে ইঁহার কর্তব্যের অন্যতম অঙ্গ।

(ঙ) বিচার বিভাগঃ মুসলমানসমাজ-সংক্রান্ত দেওয়ানী আইনের প্রয়োগ মুসলমান বিচারপতির হাতে থাকিবে।

(চ) শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান সংক্রান্ত মুসলিম বোর্ডঃ এই বোর্ডের কাজ হইবে, মুসলমানদের শিক্ষার সাংস্কৃতিক দিক ও তাহাদের শিল্প-আঙ্গিক শিক্ষার তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাহাদের অর্থনৈতিক ও সমাজ-নৈতিক উন্নতি বিধানের উপায় উদ্ভাবন করা।

(ছ) বিশেষ কর স্থাপনঃ মুসলমানগণ যদি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদের উপরে কর স্থাপন করিতে চাহেন, সেজন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিতে হইবে।

নূতন ব্যবস্থা যতদিন সম্পূর্ণ না হয় ততদিন বাসস্থান বদলাইয়া নিজ নিজ জাতীয় এলাকায় চলিয়া যাওয়াটা প্রজার ইচ্ছাধীন থাকিবে। এজন্য প্রত্যেক এলাকায় প্রযোজ্য আইন প্রণয়ন করিতে হইবে এবং বিভিন্ন এলাকার মধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রজা বদলাইয়া লইবার একটি সুবিধামত কর্মপ্রণালী স্থির করিয়া [illegible]ার জন্য একটি রাজকীয় কমিশন নিয়োগ করিতে হইবে। পরিবর্তনকালীন সাময়িক শাসন-ব্যবস্থা এমনভাবে রচিত হইবে যেন শেষ পর্যন্ত যে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের কথা বলা হইল তাহার সহিত ইহার সামঞ্জস্য থাকে। ইহার জন্য সংস্কৃতি ও ভাষা অনুসারে কয়েকটি নূতন প্রদেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন হইবে; অবশ্য এখনই তাহাদের মধ্যে প্রজা বদলাইয়া লইবার ব্যবস্থা করা হইবে না। এই সকল নূতন প্রদেশ ধীরে ধীরে একে একেও গঠিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার একটি প্রদেশ এখনই গঠন করা প্রয়োজন। বর্তমান যুক্তপ্রদেশের খানিক অংশ লইয়া ইহা গঠিত হইবে। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে বর্তমানে যে মুসলমানগণ রহিয়াছে, তাহাদের সকলের স্থায়ী বাসস্থান হইবে এই প্রদেশটি। এই নবগঠিত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী হইবেন একজন মুসলমান, ইহাকে মুসলমান এলাকা করিয়া গড়িয়া তোলার কর্মনীতিটিকে তিনি পরিচালিত করিবেন।

লতিফ সাহেবের পরিকল্পনাটিতে দুইটি অতি গুরুতর ত্রুটি আছে। ইহা কার্যে পরিণত করিতে হইলে অত্যন্ত বিপুল পরিমাণে প্রজা বিনিময় করিয়া লওয়া প্রয়োজন হইবে; বহুক্ষেত্রে এই প্রজাদের বহু দূরদেশে গিয়া বাসস্থাপন করিতে হইবে; কেবল ব্রিটিশ ভারতের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে নয়, ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যের মধ্যেও এইরূপ প্রজা বিনিময় করিতে হইবে। এই বিনিময়-ব্যাপারে এত প্রচণ্ড পরিমাণ অর্থ ব্যয় ও শ্রম প্রয়োজন যে, কেবল তাহার জন্যই এটা কার্যতঃ অসম্ভব হইয়া উঠিবে, কয়েক বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে সম্পন্ন করিতে গেলেও। পুরুষানুক্রমে যে সকল স্থানে ও (ভৌগোলিক বাহ্যিক ও আবাহিক) পরিবেশে তাহারা বাস করিয়া আসিতেছে, তাহা হইতে বহুসংখ্যক প্রজাকে বিচ্যুত করিয়া লওয়া হইবে এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত অনভ্যস্ত স্থানে লইয়া গিয়া বসাইয়া দেওয়া হইবে—ইহাতে সেই প্রজাদের পক্ষে অপরিমিত কষ্ট ও দুর্যোগের সৃষ্টি হইবেই। বাসস্থান পরিবর্তন করাটাকে প্রথম দিকে প্রজার ইচ্ছাধীন রাখার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু পরবর্তীকালে ইহাকে বাধ্যতামূলক করিয়া তুলিতেই হইবে। প্রজার ইচ্ছাধীন যদি থাকে তবে হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়েরই বেশী লোক এভাবে বাসস্থান পরিবর্তন করিবে বলিয়া মনে হয় না; বাসভূমির প্রতি ইহাদের উভয় জাতিরই সমান মায়া। বাসস্থান পরিবর্তনকে বাধ্যতামূলক যদি করা হয়, তবে তাহার ফলে প্রজার কষ্টও একেবারেই দুঃসহ হইয়া উঠিবে। 'পাঞ্জাবী' তাহার 'Confederacy of India' নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন, ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক এইভাবে বাসস্থান পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইবে। কোটি কোটি লোক এবং লক্ষ লক্ষ বর্গ মাইল পরিমিত এলাকা লইয়া এমন বিপুল পরিমাণে প্রজা-বিনিময়ের সংকল্প ও চেষ্টা ইতিহাসে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, এই পরিকল্পনাতে বলা হইয়াছে, দেশীয় রাজ্যগুলিতে মোটামুটি তাহাদের বর্তমান বাসস্থানটাই স্থায়ীভাবে টিকিয়া থাকিবে এবং ভারতবর্ষেও ব্রিটিশের অধীন একটি যুক্তরাষ্ট্র চিরকাল স্থায়ী হইয়া থাকিবে। হয়তো লেখক শাসক ও শাসিতের মধ্যে কি রাজনৈতিক সম্পর্ক থাকিবে, তাহা লইয়া কথা বলিতে চান নাই। বলিতে চাহিয়াছেন, বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য, উভয়ত্রই প্রজারা সকলে সেটা স্থির করিয়া লউক। কিন্তু দেশের শাসনতন্ত্র রচনা করিতে বসিয়া এত বড় একটা মূল সমস্যার সমাধান নির্ণয় না করিয়া একমাত্র ইহার সাম্প্রদায়িক ব্যাপারটাকে লইয়া আলোচনার পরিসমাপ্তি করা সম্ভব নয়। ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলই তাহাদের স্ব স্ব সংকল্পে একই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ; ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম সম্ভবতঃ উদারপন্থী দল, তাঁহারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে স্বাধীনতার সামিল বলিয়া জ্ঞান করেন। সেইরূপ দেশীয় রাজ্যগুলিতে যে ধরণের স্বৈরতন্ত্রী শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাকে চিরকাল চলিতে দেওয়া অসম্ভব; সে স্বৈরতন্ত্রের পরিবর্তে অবশ্যই গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সে শাসনতন্ত্রে রাজাদের জন্য খুব বেশী হইলে এইটুকু মাত্র ব্যবস্থা থাকিতে পারে যে,

তাহারা ইংলণ্ডের রাজার মত শাসনতান্ত্রিক রাজা হিসাবে বর্তমান থাকিবেন, রাজ্য-শাসনের প্রকৃত ক্ষমতা থাকিবে প্রজাদের প্রতিনিধি-সভার আয়ত্তে।

লেখক বলিয়াছেন, তিনি এলাকাগুলির যে সীমা নির্দেশ করিলেন তাহা খসড়া মাত্র; সীমাগুলি চূড়ান্ত স্থির করার ভার একটি রাজকীয় কমিশনকে বা অন্য কোন সর্বজনস্বীকৃত প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া প্রয়োজন হইতে পারে। অতএব এই পরিকল্পনার কোন সমালোচনা করিতে বসিলে, তাহাও ঠিক সমানই খসড়ামাত্র হইবে। তথাপি একটি কথা বলা যাইতে পারে। হায়দরাবাদ, বেরার এবং দক্ষিণ ভারতে কুরনুল, কুদ্দাপ্পা, চিত্তুর ও উত্তর আর্কট ও চিঙ্গলপেট জিলার মধ্য দিয়া মাদ্রাজ সহর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে একত্র করিয়া একটি দক্ষিণ ভারতীয় এলাকা গড়িবার প্রস্তাব লেখক করিয়াছেন; এই এলাকা গঠনের মূলে কোন যুক্তি আছে বলিয়া মনে করা যায় না। যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী এবং মহীশূর, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সমস্ত মুসলমান প্রজাকে এইখানে আনিয়া ইহার মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বাড়াইয়া তুলিবার পরেও দেখা যাইবে, এই সমগ্র এলাকার মুসলমান অধিবাসীরা সংখ্যার অনুপাতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণ জমি পাইয়া গিয়াছে; অন্যান্য স্থানে অমুসলমান প্রজাদিগকে যে পরিমাণ জমি দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার তুলনাই হয় না। ভাষার দিক হইতেও এটি একভাষা-ভাষী এলাকা হইবে না; মারাঠি, তেলেগু, কানারী এবং কিছু পরিমাণে তামিল ভাষা ইহার মধ্যে প্রচলিত থাকিবে। দেশ ও প্রদেশের এলাকা যদি নূতন করিয়াই গড়িতে হয় তবে বরং হায়দরাবাদের যে সকল অংশে এই ভাষাগুলি প্রচলিত তাহাদেরই সরাইয়া লইয়া, ভারতের অন্য যে সকল স্থানে এই সকল ভাষায় কথা বলিতে অভ্যস্ত লোকের সংখ্যা অনেক বেশী, তাহাদের সঙ্গেই জুড়িয়া দেওয়া কেন হইবে না? ইহার ফলে অবশ্য হায়দরাবাদ রাজ্যটি দ্বিধাবিভক্ত হইবে। সেটা যদি এড়াইতেই হয় তবে তাহারও উপায় আছে, সেজন্য সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিবার প্রয়োজন হয় না—বৃটিশ ভারত হইতে অন্যান্য খানিকটা এলাকা হায়দরাবাদের মধ্যে আনিয়া ফেলিলেই চলে। অন্যান্য স্থান হইতে মুসলমান প্রজা এইখানে আনিয়া একত্রিত করার কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু তাহার পরেও এই অঞ্চলের মুসলমান প্রজারা এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারিবে কি না, এই প্রশ্নেরও উত্তর নিঃসংশয়ে দেওয়া যায় না।

পরস্পর সন্নিহিত কয়েকটি প্রদেশ লইয়া চক্র বা মণ্ডল প্রবর্তন করাটাকেও অনাবশ্যক বাহুল্য বলিয়া মনে হয়। প্রদেশগুলিতে হয় স্বায়ত্তশাসন থাকিবে, না হয় থাকিবে না। তাহাদের এবং কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রের মাঝখানে আবার একটা নূতন কর্তৃপক্ষ খাড়া করিলে তাহাতে অবস্থার কোনই উন্নতি ঘটিবে না। দুই বা ততোধিক প্রদেশের স্বার্থ যাহাতে জড়িত, এমন কোন বিষয় থাকিলে তাহাদের মধ্যে ঘরোয়া বন্দোবস্ত করিয়াই তাহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, যদি দেখা যায় যে, তাহাদের অনুরোধেও কেন্দ্রীয় সরকার এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবে এমন ভরসা করা যাইতেছে না। শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে অন্যান্য যে সমস্ত ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে তাহার খুঁটিনাটি আলোচনা এখানে করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ ইহার অনেক

ব্যবস্থারই বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া লওয়া প্রয়োজন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বা সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র দেখিয়া, তাহার অনুকরণে এবং ভারতের অবস্থা অনুসারে তাহার প্রয়োজনমত অদল-বদল করিয়া ভারতের শাসনতন্ত্র রচিত হইতে পারে, যদি বুঝা যায় তাহাতে মুসলমানগণ প্রসন্ন হইবেন। কিন্তু সেকথা লইয়া আলোচনা করার স্থান এখানে নয়; এলাকার পুনর্গঠন এবং বিপুল পরিমাণে প্রজা-বিনিময়ের প্রশ্ন তাহার সহিত জড়িত হইয়া গিয়া, হয়তো সমস্ত ব্যাপারটিকেই জটিল করিয়া তুলিবে, এই প্রস্তাবের দোষগুণ বিচার করাই কঠিন হইয়া উঠিবে।

(একুশ)

স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ-কৃত পরিকল্পনা

আর একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন স্বর্গত স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ, 'Outlines of a Scheme of Indian Federation' নামক পুস্তিকায়। তাঁহার পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্র কেবল বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলি নয়, দেশীয় রাজ্যগুলিকেও লইয়া গঠিত হইবে।

(১) কতকগুলি এলাকা ভাগ করিয়া লইয়া তারপর তাহাদের একত্র করিয়া যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হইবে; ইহার জন্য ভারতবর্ষকে সাতটি এলাকায় বিভক্ত করা হইবে ঃ

১নং এলাকা—আসাম, বঙ্গদেশ (পশ্চিমবঙ্গের দুই-একটি জিলা বাদে; ইহাতে এলাকাটির আয়তন হ্রাস পাইবে), বঙ্গদেশের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্যগুলি এবং সিকিম।

২নং এলাকা—বিহার, উড়িষ্যা এবং বঙ্গদেশ হইতে যে ভূখণ্ডটি বিচ্ছিন্ন করিয়া উড়িষ্যার সহিত সংলগ্ন করা হইল তাহা।

৩নং এলাকা—যুক্তপ্রদেশ ও তাহার অন্তর্গত দেশীয় রাজ্যগুলি।

৪নং এলাকা—মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর, মাদ্রাজের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্যগুলি, কুর্গ।

৫নং এলাকা—বোম্বাই, হায়দরাবাদ, পশ্চিম ভারতের ও বোম্বাইর অন্তর্গত দেশীয় রাজ্যগুলি, মহীশূর, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্যগুলি।

৬নং এলাকা—রাজপুতানার অন্তর্গত দেশীয় রাজ্যগুলি (বিকানীর ও যশলমীর বাদে), গোয়ালিয়র, মধ্য ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি, বিহার ও উড়িষ্যার অন্তর্গত দেশীয় রাজ্যগুলি, যুক্তপ্রদেশ ও বেরার।

৭নং এলাকা—পাঞ্জাব ও সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, পাঞ্জাবের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্যগুলি. বেলুচিস্তান, বিকানীর ও যশলমীর।

এলাকাগুলির যে সীমা নির্দেশ করা হইল তাহা পরীক্ষামূলক মাত্র, প্রয়োজন হইলে ইহার পরিবর্তন করা চলিবে।

(২) প্রত্যেক এলাকাতে একটি স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভা থাকিবে; এলাকার অন্তর্গত বৃটিশ ভারতীয় অঞ্চল ও দেশীয় রাজ্য, প্রত্যেকের প্রতিনিধি লইয়া এই সভা গঠিত হইবে। প্রত্যেকটি এলাকা হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি পাঠানো হইবে; কাহার কয়জন প্রতিনিধি থাকিবে তাহা স্থির হইবে, ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের অন্তর্গত পরিকল্পনাতে যে প্রদেশকে যত সভ্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেই অনুসারে।

(৩) বিভিন্ন এলাকার ব্যবস্থাপক সভাগুলির নির্বাচিত সভ্যেরা একত্র হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা গঠন করিবেন। এই সভার সভ্য-সংখ্যা হইবে ৩৭৫ জন (ব্রিটিশ ভারত হইতে ২৫০ এবং দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে ১২৫ জন)। নিম্নে ২১নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যবস্থা অনুসারে এই সংখ্যার পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মোট যত জন সভ্য থাকিবে তাহার এক-তৃতীয়াংশ অবশ্যই মুসলমান হইতে হইবে।

(৫) অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির জন্য ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে যেরূপ প্রতিনিধি-সংখ্যা নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা সেই অঙ্ক অনুসারেই প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন।

(৬) প্রত্যেক এলাকার ব্যবস্থাপকসভা, শুধু এলাকার শাসনীয় তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধেই আইন প্রণয়ন করিবেন; কিন্তু এলাকার অন্তর্গত দুইটি বা আরও অধিকসংখ্যক প্রদেশ যদি একত্রে অনুরোধ জানায়, তবে সেই অনুরোধক্রমে প্রদেশের ক্ষমতা তালিকাভুক্ত বিষয়েও তাঁহারা আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন। এলাকার অন্তর্গত কোন প্রদেশে এই আইন প্রচলিত হইতে পারিবে—উক্ত প্রদেশের সরকার তাহা সমর্থন করিলে তবেই। তাহার পর হইতে কিন্তু এই আইন উক্ত প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্যের সরকার কর্তৃক উক্ত বিষয়ে কোন আইন প্রণীত হইয়া থাকিলেও তাহাকে বাতিল করিয়া দিয়া স্বয়ং বহাল হইবে।

(৭) এলাকার অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলির স্বার্থরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে বিধান করা যাইতেছে যে, এলাকার ব্যবস্থাপকসভায়, এলাকার শাসনীয় তালিকাভুক্ত কোন বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে হইলে সভার মোট সভ্য-সংখ্যার অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ লোককে ইহার স্বপক্ষে মত দিতে হইবে, অন্যথা সে আইন কিছুতেই বিধিবদ্ধ হইতে পারিবে না।

(৮) এলাকার তালিকাভুক্ত বা প্রদেশের তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, এলাকাস্থ ব্যবস্থাপকসভাগুলি যথারীতি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপকসভার হাতে তুলিয়া দিতে পারিবে। কিন্তু সাতটি এলাকার মধ্যে অন্ততঃ ৪টি এলাকা ইহার স্বপক্ষে মত প্রকাশ না করিলে এইরূপ ক্ষমতা অর্পণ করা যাইবে না। সাতটি এলাকার মধ্যে প্রত্যেকেরই ব্যবস্থাপকসভা যদি এইরূপ ক্ষমতা অর্পণকে স্বীকার করিয়া না লয়, তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপকসভা কর্তৃক প্রণীত সেই আইন সকলের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না। মাত্র যে এলাকাগুলি এইরূপ আইন প্রণয়নে সম্মত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যেই ইহা প্রযোজ্য হইবে।

(৯) এলাকাগুলির অনুরোধক্রমে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপকসভা কর্তৃক প্রণীত বা প্রদেশগুলির অনুরোধক্রমে এলাকার ব্যবস্থাপকসভা কর্তৃক প্রণীত, যে-কোন আইন, অন্যান্য এলাকা ও প্রদেশের আপত্তির ফলে রদ হইয়া যাইতে পারিবে। অন্ততঃ তিনটি এলাকা আপত্তি জানাইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা-সভাকৃত আইন এবং এলাকার অন্তর্গত প্রদেশগুলির অন্ততঃ অর্ধেকসংখ্যক প্রদেশ আপত্তি জানাইলে এলাকার ব্যবস্থাসভাকৃত আইন অবশ্যই রদ হইয়া যাইবে।

(১০) যুক্তরাষ্ট্রের শাসনপরিষদ এইরূপে গঠিত হইবেঃ সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে ভাইস্‌রয় থাকিবেন, তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন একটি মন্ত্রিসভা—প্রধান মন্ত্রী সমেত এই মন্ত্রীদের মোট সংখ্যা সাতের কম এবং এগারোর বেশী হইবে না।

(১১) যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীকে ভাইস্‌রয় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাসভার মধ্য হইতে বাছিয়া লইবেন। অন্যান্য মন্ত্রীদিগকেও প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে ও ব্যবস্থাপকসভার সভ্যগণের মধ্য হইতেই বাছিয়া লওয়া হইবে; কিন্তু ইঁহাদের নির্বাচন সম্বন্ধে নিম্নোক্ত নীতিগুলি মানিয়া চলিতে হইবে;

(১) প্রত্যেক এলাকার অন্ততঃ একজন প্রতিনিধি মন্ত্রিসভার মধ্যে থাকিবেন।

(২) মোট মন্ত্রিসংখ্যার অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ হইবেন মুসলমান।

(৩) মন্ত্রীদের মোট সংখ্যা নয়জনের অনধিক হইলে অন্ততঃ দুইজন এবং মোট সংখ্যা নয়ের অধিক হইলে অন্ততঃ তিনজন মন্ত্রী লইতে হইবে দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধি যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের মধ্য হইতে।

(২) ও (৩)নং সর্তের যদি একত্র মিশ্রণ হইয়া যায় (অর্থাৎ যদি একই ব্যক্তি দুই সর্ত অনুসারে নির্বাচিত থাকেন) তাহাতে কোন আপত্তি করা হইবে না। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হইতে উপযুক্ত পরিমাণ প্রতিনিধি লইবারও যথাসম্ভব চেষ্টা করা হইবে।

(৪) এই যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে প্রথম ২০ (বা ১৫) বৎসরকাল যাবৎ ভাইস্‌রয় দুইজন মন্ত্রীকে

স্বয়ং মনোনীত করিয়া লইতে পারিবেন; ইঁহাদের হাতে থাকিবে 'দেশরক্ষা' ও 'বৈদেশিক নীতি'র দপ্তর। এই মন্ত্রী-দিগকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের মধ্য হইতে লওয়া যাইবে, সভার বাহির হইতেও লওয়া যাইবে। এই সময়ের পরে সমস্ত মন্ত্রীদিকেই নিযুক্ত করিতে হইবে সভার সভ্যদের মধ্য হইতে।

প্রথম পরীক্ষা হিসাবে মন্ত্রীদের পদবী ও দপ্তরের নাম এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছেঃ (১) যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী, (২) দেশরক্ষা সচিব, (৩) বৈদেশিক নীতির ভারপ্রাপ্ত সচিব, (দেশীয় রাজ্যগুলির সংক্রান্ত ব্যবস্থাও ইহারই হাতে থাকিবে); (৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব সচিব, (৫) স্বরাষ্ট্র সচিব, (৬) যানবাহন সচিব, (৭) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার ভারপ্রাপ্ত সচিব, (৮) পরস্পর সম্পর্ক রক্ষার ভারপ্রাপ্ত সচিব—ইনি সমস্ত এলাকাগুলির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন এবং উভয়পক্ষের স্বার্থ যেখানে একত্রে জড়িত, সেই সকল ব্যাপারে সকল পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক ও সমতা রক্ষা করিবেন। (৯) বাণিজ্য ও শিল্পসচিব।

(১২) (১) মন্ত্রীদের কার্যকালের স্বাভাবিক মেয়াদ হইবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভার আয়ুষ্কালের সমান (অর্থাৎ ১৫ বৎসর)। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা যতদিন, স্বাভাবিক অবস্থায় মন্ত্রীদের কার্যকালও ঠিক ততদিনই স্থায়ী হইবে (অর্থাৎ ৫ বৎসর)।

(২) মন্ত্রীদের কার্যকাল ভাইস্রয়ের ইচ্ছাধীন থাকিবে, অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেই যে কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

(৩) যে মন্ত্রী বিশেষ কোন এলাকার প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিসভায় স্থান পাইয়াছেন, উক্ত এলাকার ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্য তাঁহার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিলে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় যদি মন্ত্রিসভার সম্বন্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয়, তবে সমগ্র মন্ত্রিসভা একসঙ্গে পদত্যাগ করিবেন। ইহার ব্যতিক্রম হইবেন মাত্র ১১ (৪) ধারায় বর্ণিত মন্ত্রিগণ।

(১৩) এলাকাস্থ ব্যবস্থাপকসভার সভ্যরা নিম্নোক্ত প্রণালীতে নির্বাচিত হইবেনঃ

(১) বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলির বেলায় সভ্য নির্বাচিত হইবে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচনের যে প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে তদনুসারে।

(২) দেশীয় রাজ্যগুলির বেলায়, নিম্নে বর্ণিত প্রণালী যতদূর সম্ভব অনুসরণ করা হইবেঃ

(ক) এলাকাস্থ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম প্রতিষ্ঠা যেদিন হইবে, সেইদিন হইতে প্রথম দশ বৎসরকাল যাবৎ, দেশীয় রাজ্যের মোট প্রতিনিধির মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ রাজা স্বয়ং মনোনীত করিয়া দিবেন। রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভা, বা এই উদ্দেশ্যে গঠিত অন্য কোন অনুরূপ প্রতিষ্ঠান, কয়েকজন লোক নির্বাচিত করিবেন, ইঁহাদের মধ্য হইতে বাকী এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ সভ্যকে রাজা মনোনীত করিয়া দিবেন।

(খ) তাহার পরবর্তী ৫ বৎসর যাবৎ, মোট সভ্য-সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশকে রাজা স্বয়ং মনোনীত করিবেন, এক-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত হইবেন পূর্বোক্ত (ক) ধারায় বর্ণিত প্রণালীতে।

(গ) এই ১৫ বৎসরের পরে, এক অর্ধেক তিনি স্বয়ং মনোনীত করিবেন; আর অর্ধেক সংখ্যক সভ্য (ক) ধারায় বর্ণিত প্রণালীতে নির্বাচিত হইবেন।

(ঘ) ২০ বৎসরের পর হইতে চিরকাল, মোট সভ্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ রাজার দ্বারা মনোনীত হইবেন, দুই তৃতীয়াংশ পরিমাণ সভ্য (ক) ধারায় বর্ণিত প্রণালীতে নির্বাচিত হইবেন।

কোন বিশেষ রাজ্য বা রাজ্য-সঙ্ঘের মোট প্রেরিতব্য সভ্যের সংখ্যা যদি ২ হইতে কম হয়, তবে প্রথম ১৫ বৎসর যাবৎ রাজাই সভ্যকে মনোনীত করিয়া পাঠাইবেন; তাহার পর হইতে রাজ্যের প্রতিনিধিরা (ক) ধারায় বর্ণিত প্রণালীতে নির্বাচিত হইবেন।

(১৪) দেশরক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে উপদেশ দিবার জন্য একটি দেশরক্ষা-কমিটি গঠিত হইবে; ভাইস্‌রয় ইহার সভাপতি হইবেন; নিম্নোক্ত ব্যক্তিবৃন্দ ইহার সভ্য থাকিবেনঃ—যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রধান মন্ত্রী, দেশরক্ষা সচিব, বৈদেশিক নীতির ভারপ্রাপ্ত সচিব, রাজস্ব সচিব, যানবাহন সচিব, প্রধান সেনাপতি, নৌসেনার একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বিমানবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সাতটি এলাকার প্রত্যেকটি হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি, ৫ জন সরকারী বিশেষজ্ঞ—ভাইস্‌রয় ইঁহাদিগকে মনোনীত করিয়া লইবেন, দুইজন বে-সরকারী বিশেষজ্ঞ—ভাইস্‌রয় কর্তৃক মনোনীত এবং দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী।

(১৫) বৈদেশিক ব্যাপারাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্যও একটি কমিটি নিযুক্ত হইবে। ভাইস্‌রয় ইহার সভাপতি থাকিবেন, সভ্য থাকিবেন যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রধান মন্ত্রী, বৈদেশিক ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত সচিব, ৭টি এলাকার প্রত্যেকটি হইতে একজন করিয়া লইয়া মোট ৭ জন প্রতিনিধি, প্রতি এলাকার ব্যবস্থাপকসভা হইতে ইঁহাদিগকে ভাইস্‌রয় বাছিয়া লইবেন, ভাইস্‌রয় কর্তৃক মনোনীত দুইজন

সরকারী ও দুইজন বে-সরকারী সদস্য এবং বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত দপ্তরের সেক্রেটারী।

এই কমিটিদ্বয়ের কোনটিতে যদি দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধির সংখ্যা তিনের কম হইয়া যায়, তবে রাজেন্দ্র-সভা হইতে একটি নামের তালিকা প্রস্তুত করা হইবে, ভাইসরয় সেই তালিকা হইতে বাকী কয়জন সভ্য বাছিয়া লইয়া মোট সংখ্যা 'তিন' পুরাইয়া লইবেন।

(১৬) যুক্তরাষ্ট্রীয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষটিকে এমনভাবে গঠন করিতে হইবে যেন সাতটি মাণ্ডলিক এলাকার প্রত্যেকটি হইতে অন্ততঃ একজন প্রতিনিধি ইহার মধ্যে থাকে।

(১৭) শাসনতন্ত্রে নিম্নোক্ত ব্যাপারগুলির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে—

(১) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দিগের ন্যায্য স্বার্থের সংরক্ষণ।

(২) বৃটিশ-জাত প্রজাদের প্রতি জাতি-বৈষম্যমূলক উৎপীড়ন না হয় তাহার প্রতিষেধ-ব্যবস্থা।

(৩) দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে যে সমস্ত সন্ধি করা হইয়াছে এবং সন্ধির সর্ত অনুযায়ী অন্যান্য যে সমস্ত অধিকার তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা ক্ষুণ্ণ না হয় তাহার ব্যবস্থা।

(৪) ব্রিটিশ ভারতের কোন প্রদেশ, বা কোন দেশীয় রাজ্য, কাহারও অস্তিত্ব ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকারে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপরিষদ বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভা বা মাণ্ডলিক এলাকার ব্যবস্থাপক সভা কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে, তাহার ব্যবস্থা।

(৫) বৈদেশিক আক্রমণ হইতে ভারতের নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং সমগ্র ভারতবর্ষ তথা ইহার প্রত্যেক প্রদেশ ও অংশে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার ব্যবস্থা।

(৬) কোন প্রদেশ বা এলাকার অধিবাসীরা অন্য কোন প্রদেশ বা এলাকার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে কোনরূপ গোপন চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র না করিতে পারে তাহার প্রতিষেধ-ব্যবস্থা।

(৭) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির সংস্কৃতি ও ধর্মসংক্রান্ত অধিকার-সমূহ রক্ষার ব্যবস্থা।

(১৮) ভারতীয় সেনাবাহিনী যেরূপে সংগঠিত রহিয়াছে (১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে) তাহার পরিবর্তন করা হইবে না। শান্তির সময়ে ইহাতে যে লোকসংখ্যা বর্তমান, তাহার যদি কোনরূপ হ্রাস বা বৃদ্ধি করা হয়, তবে ১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে সেনাবাহিনীর লোকদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আনুপাতিক পরিমাণ যাহা ছিল, সেই অনুপাতকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই লোকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে হইবে। একমাত্র যুদ্ধের সময়ে, বা সমগ্র দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন হইতেছে এমন কোন গুরুতর সঙ্কটকাল উপস্থিত হইলে, তখনই মাত্র প্রয়োজনবোধে এই নীতির ব্যতিক্রম করা চলিবে।

(১৯) সমগ্র দেশের স্বার্থরক্ষা ও সুশাসনের দিক হইতে শাসন-ব্যাপারের যে বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকা একান্তই আবশ্যক, মাত্র সেইগুলিকেই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে ইহার মধ্যে পড়িবে দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, যানবাহন, বৈদেশিক বাণিজ্য, মুদ্রানির্মাণ ও মুদ্রানীতি প্রভৃতি। বর্তমানে অন্য যে সমস্ত ব্যাপারকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে দিয়া রাখা হইয়াছে, সেগুলি প্রদেশ বা মণ্ডলস্থ সরকারগুলির হাতে চলিয়া আসিবে। যে সকল বিষয়কে স্পষ্ট ভাষায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতাধীন বলিয়া তালিকাভুক্ত করা হয় নাই, তাহার সম্পর্কে সমস্ত অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রদেশগুলির হাতে দিয়া দেওয়া হইবে; যে সকল বিষয় মণ্ডলগুলির আয়ত্ত বলা হইয়াছে, সেগুলিকে মণ্ডলস্থ ব্যবস্থাপকসভার হাতে দেওয়া হইবে।

(২০) কোন্ বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয়, উভয়পক্ষীয়, মাণ্ডলিক বা প্রাদেশিক (বা দেশীয় রাজ্যের) ক্ষমতা তালিকার অন্তর্গত, ইহা লইয়া সংশয় উপস্থিত হইলে, ভাইসরয় নিজের বিচারবুদ্ধি অনুসারে তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবেন, সেই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে।

(২১) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপরিষদে একটি মাত্র সভা থাকিবে। বর্তমানে কতকগুলি বিশেষ দল ও সঙ্ঘকে কাউন্সিল অব্ ষ্টেটে প্রতিনিধি পাঠাইয়া নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের সুযোগ দেওয়া হইতেছে; ইহার পরিবর্তে ব্যবস্থাপকসভার সভ্য-সংখ্যা কিছু বাড়াইয়া ইঁহাদিগকে সেখানে প্রতিনিধি পাঠাইবার সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সভায় এইরূপ নূতন যে সভ্যগুলি লওয়া হইবে, তাহার সংখ্যা সাতটি মণ্ডলের মধ্যে সমান অংশে ভাগ করা থাকিবে।

(২২) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দিগের স্বার্থ যাহাতে সম্যক রক্ষিত হয়, সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার উভয়ত্রই যথোপযুক্ত আয়োজন ও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

ভারতের প্রদেশগুলি ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে দুইটি পৃথক দল হিসাবে এক যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হয় নাই। তাহারা যাহাতে এক একটি মণ্ডল রচনা করিয়া ইহার মধ্যে চলিয়া আসিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার ফলে দেশের এই সকল বিভিন্ন অংশের মধ্যে মৈত্রী ও সংহতি বৃদ্ধি পাইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ভিত্তিও সুপ্রতিষ্ঠ হইবে। ঐ একই কারণে, যে সকল পরস্পরসংলগ্ন অঞ্চলের মধ্যে ভৌগোলিক সান্নিধ্য, ভাষার ঐক্য ও অর্থনৈতিক স্বার্থের ঐক্যের ফলে স্বাভাবিক মৈত্রীবন্ধন গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহারা একত্র হইয়া কাজ করিতে উৎসাহিত হইবে; এবং তাহার ফলে এক একটি মণ্ডলের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশগুলি পরস্পরের সহিত সহযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া লইবে—আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা, শিল্প ও কৃষি সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক গবেষণার আয়োজন ও প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে এক নীতিতে কার্যপদ্ধতি চালাইবার সুযোগ পাইবে। ইহার ফলে ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি বিনা দ্বিধায় ও অসন্দিগ্ধচিত্তে যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে পারিবে। তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার অযথা হস্তক্ষেপ করিবেন, এ ভয়ও তাহাদিগকে করিতে

হইবে না। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার পরিধি থাকিবে সীমাবদ্ধ। ইহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিরাপত্তা রক্ষার ভরসা অনেক বেশী পরিমাণে পাইবে; অপরদিকে প্রদেশগুলির অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা যথোপযুক্তরূপে সংরক্ষিত হইবে।

অপর পক্ষে আবার বলা যায়, এই পরিকল্পনাটিতে প্রকাশ্যতঃই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কিছু রদবদল করিবার প্রয়াস মাত্র করা হইয়াছে; ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন ইহার লক্ষ্য নয়। অন্ততঃ ভবিষ্যতে একদিন দেশীয় রাজ্যগুলিতে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রতিষ্ঠা হইবে, এমন কথাও ইহার কোথাও বলা হয় নাই। ইহার মতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও মাণ্ডলিক ব্যবস্থাপকসভাগুলি সর্বত্রই দুই প্রকার সভ্য লইয়া গঠিত হইবে—ব্রিটিশ ভারতের সভ্যরা আসিবেন প্রজা-সাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া, আর দেশীয় রাজ্য হইতে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা হইবেন রাজাদের দ্বারা মনোনীত সভ্য মাত্র; হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত নামের তালিকা হইতে রাজা ইঁহাদের মনোনীত করিবেন ইহার বেশী নয়। ইহাতে বলা হইয়াছে, প্রজাদের নির্বাচিত নহেন এমন দুইজন সম্পূর্ণ বাহিরের লোককে ভাইস্‌রয় মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিয়া লইতে পারিবেন; দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি—এই দুইটি অতি গুরু বিষয়ের ভার ইঁহাদের হাতে দেওয়া হইবে। মন্ত্রীরা ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের নিজ নিজ মণ্ডলস্থ ব্যবস্থাপক-সভার ইচ্ছাক্রমে পদত্যাগ করিতে বাধ্য থাকিবেন; আবার বাহির হইতে গৃহীত মন্ত্রী দুইজন, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপকসভা তাঁহাদের সম্বন্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করিলেও পদত্যাগ করিবেন না,—ইহার ফলে ব্যবস্থাপকসভার নিকটে মন্ত্রিসভার কোনরূপ যৌথ দায়িত্ব থাকিবে না। মন্ত্রী নির্বাচন করিবার কালে সাম্প্রদায়িক, মাণ্ডলিক ও প্রাদেশিক পরিচয় অনুসারে লোক লইতে হইবে; ইহার ফলে মন্ত্রীর পদে কাহাদের লওয়া যাইতে পারে তাহা বিচারের ক্ষেত্র-সীমা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল পরিচয় এবং কার্যে দক্ষতা একত্র মিলাইয়া পাওয়া কঠিন হইবে; ইহার ফলে মন্ত্রীদেরও একসঙ্গে একাধিক কর্তৃপক্ষকে প্রসন্ন রাখিয়া চলিতে হইবে। এই পরিকল্পনাটির একটি বৃহৎ গুণ, ইহাতে রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক কোন প্রয়োজনের দিক হইতেই ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িক বিভাগের ভিত্তিতে খণ্ডিত করার কথা তোলা হয় নাই। সমগ্র ভারতবর্ষকে এক অখণ্ড দেশ বলিয়াই ধরা হইয়াছে।

(বাইশ)

স্যার আব্দুল হারুণের কমিটি-কৃত পরিকল্পনা

ভারতের শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার সম্বন্ধে যে সকল ব্যক্তি বিভিন্ন পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মুসলিম লীগের বৈদেশিক কমিটি তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ জানান, যেন তাঁহারা লীগের আহুত একটি আলোচনা-সভায় যোগ দিয়া একত্রে সমস্তগুলি পরিকল্পনাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন, সকলগুলির সমন্বয়ে একটি পরিকল্পনা খাড়া করা যায় কিনা। আমন্ত্রিতরা একত্রিত হইয়া একটি কমিটি গঠন করেন এবং ইহাদের পরবর্তী কয়েকটি সভায় আলোচনার ফলে একটি পরিকল্পনা রচিত হয়। বৈদেশিক কমিটির সেক্রেটারী স্যার আবদুল্লা হারুণ, লীগের সভাপতি মিঃ এম এ জিন্নার নিকটে একটি পরিকল্পনার খসড়া উপস্থাপিত করিয়াছিলেন; এই পরিকল্পনা অনুসারেই নিখিল ভারত মুসলিম লীগ তাঁহাদের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবটি রচনা করিয়াছেন। এই শেষোক্ত প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়াই কমিটির পরিকল্পনাটি রচিত। কিন্তু কমিটির পরিকল্পনাতে অ-বৃটিশ ভারতের অধিবাসী মুসলমানদিগকেও একত্র টানিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পাকিস্থান প্রস্তাবে যে পরিকল্পনা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহার তুলনায় এটি অধিকতর পূর্ণাঙ্গ। কমিটি বলেন (১) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে একটি মুসলমান রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে, ইহাতে মুসলমান অধিবাসীর অনুপাত থাকিবে শতকরা ৬৩ জনের কাছাকাছি; (২) দ্বিতীয় মুসলমান রাষ্ট্রটি গঠিত হইবে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে; ইহাতে মুসলমান-প্রজা থাকিবে শতকরা ৫৪ জন।

৩নং ছক

(১) **উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলস্থ রাষ্ট্র বা মণ্ডল** (১৯৩১ সালের আদমসুমারী অনুসারে)

নাম	মোট লোকসংখ্যা	মুসলমান জন-সংখ্যা
পাঞ্জাব	২,৩৫,৮০,৮৫২	১,৩৩,৩২,৪৬০
সিন্ধু	৩৮,৮৭,০৭০	২৮,৩০,৮০০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ... (ব্যবস্থিত অঞ্চল)	২৪,২৫,০৭৬	২২,২৭,৩০৩
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ... (বৃটিশ-শাসিত উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল)	১৩,৬৭,২৩১	১৩,১৭,২৩১
বৃটিশ বেলুচিস্তান	৪,৬৩,৫০৮	৪,০৫,৩০৯
দিল্লী প্রদেশ	৬,৩৬,২৪৬	২,০৬,৯৬০
মোট ...	৩,২৩,৬০,০৬৩ (?)	২,০৩,২০,০৬৩

অর্থাৎ শতকরা ৬২·৭৯ জন

(২) উত্তর-পূর্ব অঞ্চলস্থ মণ্ডল—ইহার মধ্যে থাকিবে আসাম, বঙ্গদেশ (বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলা বাদে) এবং বিহারের পূর্ণিয়া জিলা।

ইহার মোট লোকসংখ্যা ...	৫,৭০,১০,৯৪৬	
মুসলমান ...	৩,০৮,৭৬,৪২১	অর্থাৎ শতকরা ৫৪ জন
অ-মুসলমান...	২,৬১,৩৪,৫২৩	অর্থাৎ শতকরা ৪৬ জন

অ-মুসলমানদের মধ্যে মোটামুটি হিসাবে প্রায় ৮৫,০০,০০ জন, অর্থাৎ শতকরা ৩২ জন লোক তপশীলী জাতিভুক্ত; প্রায় ১৫,০০,০০০ জন, অর্থাৎ শতকরা ৬ জন উপজাতিভুক্ত; প্রায় ৪,০০,০০০ খৃষ্টান এবং বাকী সব বর্ণহিন্দু।

(৩) একটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া তাঁহাদের কমিটি কর্তব্য বলিয়া মনে করেন; অ-বৃটিশ ভারতের যেখানেই কোনরূপে মুসলমানী প্রভাব প্রবল হইয়া রহিয়াছে, সেইখানেই তাহাকে নিশ্চিত ও স্থায়ী করিয়া রাখা, ইঁহাদের নিজেদের এবং অন্যান্য মুসলমানদের—উভয়ের স্বার্থের পক্ষেই অনুকূল হইবে। এই জন্যই আমরা বলিতেছি, ছোট হউক বা বড় হউক যে দেশীয় রাজ্যে মুসলমান-রাজা অধিষ্ঠিত আছেন, মুসলমানদের শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা সফল করিবার জন্য তাহাদের সমস্তগুলিকেই সার্বভৌম মুসলমানরাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই দাবীর উপরে খুবই জোর দিতে হইবে। নিজামের রাজ্যকে আয়তনে আরও বাড়াইয়া এবং সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়া তাহার স্বাধীনতা ও সংহতি রক্ষা করা হউক—এই দাবীটির দিকে অত্যন্ত তীব্র মনোযোগ দেওয়া লীগের পক্ষে খুবই সমীচীন হইবে; কারণ ইহাতে এই রাজ্যের বাহিরে যে মুসলমানগণ আছেন, তাঁহাদেরও শক্তি বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে। হয়তো একদিন ভারতের মুসলমানগণ হায়দরাবাদকেই তাহাদের প্রধান আশ্রয়স্থল এবং তাহাদের শক্তি-বৃদ্ধির প্রধান কেন্দ্র বলিয়া গণ্য করিতে পারিবে।'[১] অতএব এইটিই হইবে মুসলমানী প্রভাবের তৃতীয় ব্যাপক কর্মক্ষেত্র।

যে দেশীয় রাজ্যগুলি মুসলিম রাষ্ট্রসকলের সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত, তাহারা কতকগুলি উদ্দেশ্য একত্রে সাধনের জন্য ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া এক যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করিতে পারে কিনা—এই সম্ভাবনাটি লইয়াও কমিটি আলোচনা করিয়াছেন। এরূপ বন্দোবস্ত যদি করা হয়, তবে অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইবেঃ—

1. The Pakistan Issue, pp. 79—80.

৪নং ছক

মুসলিম রাজ্যের সান্নিহিত দেশীয় রাজ্যগুলির লোকসংখ্যা

উত্তর অঞ্চলের মুসলিম এলাকা

নাম	মোট লোকসংখ্যা	মুসলমান জন-সংখ্যা
ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ—পূর্বে প্রদর্শিত ...	৩,২৩,৬০,০৬৩	২,০৩,২০,০৬৩
সীমান্ত প্রদেশের রাজ্যসমূহ—		
দির, সোয়াত ও চিত্রল	৯,০২,০৭৫	৮,৫২,০০০
বেলুচিস্তানের অন্তর্গত রাজ্যসমূহ—		
কালাত ...	৩,৪২,১০১	৩,৩১,২৩৪
লাস্ বেলা ...	৬৩,০০৮	৬১,৫৫০
সিন্ধুর অন্তর্গত রাজ্যসমূহ—		
খয়েরপুর মিরগুলি ...	২,২৭,১৮৩	১,৮৬,৫৭৭
পাঞ্জাবের অন্তর্গত রাজ্যসমূহ—		
বাহাওয়ালপুর ...	৯,৮৪,৬১২	৭,৯৯,১৭৬
কপূরতলা ...	৩,১৬,৭৫৭	১,৭৯,২৫১
পাতিয়ালা ...	১৬,২৫,৫২০	৩,৬৩,৯২০
নাভা ...	২,৮৭,৫৭৪	৫৭,৩৯৩
ফরিদকোট ...	১,৬৪,৩৬৪	৪৯,৯১২
ঝিন্দ ...	৩,২৪,৬৭৬	৪৬,০০২
মালেরকোটলা ...	৮৩,০৭২	৩১,৪১৭
লোহারু ...	২৩,৩৩৮	৩,১১৯
পতৌদি ...	১৮,৮৭৩	৩,১৬৮
দুজানা ...	২৮,২১৬	৫,৮৬৩
চাম্বা ...	১,৪৬,৮৭০	১০,৮৩৯
মাণ্ডি ...	২,৭০,৪৬৫	৬,৩৫১
সুকেত ...	৫৮,৪০৮	৭০০
কালসিয়া ...	৫৯,৮৪৮	২১,৭৯৭
সিমলা পার্বত্য অঞ্চলস্থ রাজ্যগুলি	৩,৩০,৮৫০	১০,০৯৭
সিরমুর ...	১,৪৮,৫৬৮	৭,০২০
বিলাসপুর ...	১,০০,৯৯৪	১,৪৫৮
কাশ্মীর ...	৩৬,৪৬,২৪৩	২৮,১৭,৬৩৬
বিকানীর ও যশলমীর যদি যোগ দেয়, তবে ইহার সঙ্গে—		
বিকানীর ...	৯,৩৬,২১৩	১,৪১,৫৭৮
যশলমীর	৭৬,২৫৫	২২,১১৬
মোট	৪,৩৫,২৬,১৫১	২,৬৩,০০,১৯০ (শতকরা ৬৯·৪৯ জন)
বিকানীর ও যশলমীরকে বাদ দিলে	৪,২৫,১৩,৬৭৮	২,৬১,৬৬,৫২৬ (শতকরা ৬১·৫৪ জন)

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা কমিটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন। ফলে দেখা গিয়াছে, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বৃটিশ-ভারতের প্রদেশগুলিতে তপশীলী জাতিপুঞ্জ প্রজা আছে ১৪,১৩,৫৩২,

অর্থাৎ শতকরা ৪·৩৬ জন, শিখ ৩১,৩৯,৯৬৪, অর্থাৎ শতকরা ৯·৭০ জন. বর্ণহিন্দু ৭০,১৯,২৭৮, অর্থাৎ শতকরা ২১·৬৯ জন। দেশীয় রাজ্যগুলিতেও অনুরূপ প্রজাদের সংখ্যা হিসাব করা হইয়াছে; ইহাদের পরিমাণ এইরূপ—বর্ণহিন্দু ২৪,৯৪,০৯৩, অর্থাৎ শতকরা ২২·৩৩ জন, শিখ ১০,৫৮,১৪২; অর্থাৎ শতকরা ১০·৪২ জন।

(বিঃ দ্রঃ—দেশীয় রাজ্যগুলিতে বর্ণহিন্দুদের শতকরা অনুপাত কষিতে একটু অঙ্কের ভুল হইয়াছে মনে হয়; সংখ্যাটা শতকরা ২২·৩৩ না হইয়া ২৪·৫৬ হইবে)।

পূর্বাঞ্চলের মুসলমান এলাকার সন্নিহিত নিম্নোক্ত রাজ্যগুলিকে তাহাদের সহিত যোগ দিতে সম্মত করানো যাইতে পারে।

৫নং ছক

পূর্ব অঞ্চলের মুসলিম এলাকার লোকসংখ্যা

	মোট লোকসংখ্যা	মুসলমান জন-সংখ্যা
বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য—		
কুচবিহার ও ত্রিপুরা	... ৯,৭৩,৩১৬	৩,১২,৪৭৬
আসামের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য—		
মণিপুর ও খাসী পর্বত	... ৬,২৫,৬০৬	২৪,৬০০
ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রদেশসমূহ	... ৫,৭০,১০,৯৪৬	৩,০৮,৭৬,৪২১
মোট	... ৫,৮৬,০৯,৮৬৮	৩,১২,১৩,৪৯৭

অর্থাৎ শতকরা ৫৩·১৫ জন

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেগুলি আছে, মোট প্রজাসংখ্যার অনুপাতে তাহাদের শতকরা প্রজাসংখ্যার হিসাব এইরূপঃ—

৬নং ছক

অঞ্চল	বর্ণহিন্দু	তপশীলী জাতি	উপজাতি	খৃষ্টান
ব্রিটিশ-বঙ্গদেশ	২৯·৯	১৩·৭	১·৫	—
বঙ্গদেশস্থ দেশীয় রাজ্যসমূহ ...	৬৪·৯	৩·০	—	—
ব্রিটিশ-আসাম	৩৬·৬	২১·০	৮·২	২·৫
আসামস্থ দেশীয় রাজ্যসমূহ ...	৪৩·৭	—	৪৪·৯	৭·৪

উত্তর অঞ্চলের মধ্যে যে এলাকা পড়িবে, তাহার পরিমাণ এইরূপঃ—

	ব্রিটিশ ভারত (বর্গমাইল)	দেশীয় রাজ্য (বর্গমাইল)	মোট (বর্গমাইল)
পূর্ব অঞ্চল	২২৫,৩৫২	২১৩,৩৭০	৪৩৮,৭২২
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ...	১২৯,৬৩৭	১৭,৭৫৪	১৪৭,৩৯১
দুইটি অঞ্চল একত্রে ...	৩৫৪,৯৮৯	২৩১,১২৪	৫৮৬,১১৩

সমগ্র ভারতের দিক হইতে দেখিলে হিসাবটি এইরূপ দাঁড়ায়ঃ—

সমগ্র ভারতের মোট লোকসংখ্যা	৩৫,০৫,২৯,৫৫৭
মুসলমান জন-সংখ্যা	৭,৭৬,৭৮,২৪৫
(দেশীয় রাজ্য সমেত) পশ্চিম ও পূর্বমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত মুসলমান জন-সংখ্যা	৫,৭৫,৪২,৭৪৭
	অর্থাৎ শতকরা ৭৪·০৭ জন

অতএব এই কমিটির পরিকল্পনাতে মুসলমানদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৪·০৭ জনকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

'এই যে মাণ্ডলিক রাষ্ট্রগুলি গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, ইহারা সৃষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপারের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিবে। লীগের লাহোর প্রস্তাবে এরূপ কোন রাষ্ট্রের কল্পনা করা হয় নাই; বলা হইয়াছে, একটা পরিবর্তন কিছুকাল ধরিয়া ঘটিবে, এই সময়ে এই ক্ষমতাগুলি প্রযুক্ত হইবে সকল পক্ষকে একত্র লইয়া গঠিত কোন একটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা। কেবল পূর্বোক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন ছাড়াও সকলের মধ্যে মৈত্রী বজায় রাখিবার জন্য এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হইবেই; কারণ মুসলমান প্রভাব ও হিন্দু প্রভাবের আয়ত্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এরূপ কোন মৈত্রী সম্পর্ক বজায় না থাকিলে লাহোর প্রস্তাবের তৃতীয় ধারায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের জন্য যে রক্ষাকবচের কথা বলা হইয়াছে, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। মুসলমানগণ যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী নহেন, কারণ তাহাদের ভয়, হিন্দুরা সেখানে নিছক সংখ্যাধিক্যের জোরেই মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব চালাইবে। কিন্তু লাহোর প্রস্তাবের কথাগুলিকে কার্যে পরিণত করিতে হইলেও কোনরূপ একটা মিলিত বন্দোবস্ত একান্তই আবশ্যক; সুতরাং উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এমন একটি কর্মনীতি আবিষ্কার করিতেই হইবে, যাহার বলে মুসলমানগণ অ-মুসলমানদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সমান প্রতিপত্তি লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার চালাইবার ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে পারে।'২

অতএব কমিটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, 'সার্বভৌম' বলিয়া যে রাষ্ট্রগুলি গঠনের কথা বলা হইল তাহারা একত্র চুক্তি করিয়া একটি সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া লইবে। ইহার কাজ হইবে চুক্তির অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলির নামে নিম্নোক্ত বিষয়-গুলির তত্ত্বাবধান করা—(ক) বৈদেশিক সম্পর্ক, (খ) দেশরক্ষা, (গ) যানবাহন, (ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্য-শুল্ক, (ঙ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির রক্ষা-কবচ এবং দেশের মধ্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে বাস পরিবর্তন ইত্যাদি। এ বিষয়ে ইহাকে কয়েকটি ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে হইবেঃ

(ক) দেশরক্ষা—প্রত্যেকটি রাষ্ট্র নিজ ব্যয়ে একটি করিয়া সেনা-বাহিনী রাখিবে; সেনার পরিমাণ নির্ধারিত হইবে,—সমর-নীতির দিক হইতে রাষ্ট্রটির অবস্থানের গুরুত্ব অনুসারে; এইরূপে রক্ষিত বাহিনীর আকার অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার

2. Op. Cit., pp. 87—8.

ইহার ব্যয়ের কতক অংশ বহন করিবেন। সাধারণ অবস্থায় রাষ্ট্রই তাহার সেনার উপরে কর্তৃত্ব করিবে, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে সেনার উপরে পূর্ণ কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে চলিয়া যাইবে;

(খ) নৌবাহিনী সম্পূর্ণরূপেই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন থাকিবে। যে বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, তাহা ব্যতীত শাসনব্যাপারের সমস্ত বিষয়ই থাকিবে রাষ্ট্রগুলির হাতে; ইহা ব্যতীত সমস্ত অবশিষ্ট ক্ষমতাও রাষ্ট্রগুলির স্ব স্ব কর্তৃত্বাধীন হইবে। যুগ্ম-প্রতিষ্ঠানটির শাসন-পরিষদে এবং অন্যান্য সমস্ত বিভাগে, সর্বত্রই মোট সভ্যসংখ্যার অর্ধেক পরিমাণ স্থান মুসলমানদের দখলে থাকিবে।

এই পরিকল্পনাটি যে কমিটি প্রস্তুত করেন, তাহার সভ্য-সংখ্যা ছিল নয়জন। পরিকল্পনার খসড়াটি তাঁহাদের হাতে হাতে ফিরিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ এটি অসময়ে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া যায়। কমিটির একজন সভ্য ছিলেন অধ্যাপক আফজল হুসেন কাদ্‌রি; তাঁহার রচিত অন্য একটি পরিকল্পনার কথা আমরা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি। তিনি দেখিলেন, এই পরিকল্পনাতে দেশীয় রাজ্যগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার কথা বলা হইয়াছে এবং মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সহিত ভারতের বাকী অংশের যোগাযোগ বজায় রাখিবার কথা বলা হইয়াছে। তিনি মনে করিলেন, ইহাতে লাহোর প্রস্তাবকে ঠিকমত অনুসরণ করা হয় নাই। মুসলমানগণ যে রাষ্ট্র স্থাপনের দাবী করিতেছেন, তাহার মধ্যে নামে বা কাজে 'কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান' বা 'কেন্দ্র'-জাতীয় কোন বস্তু প্রবেশ লাভ করিবে—এরূপ কথা তিনি সমর্থন করিলেন না; কারণ ইহার মধ্যে নিখিল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা হিন্দুরাজের গন্ধ থাকিবে। ডক্টর সৈয়দ আবদুল লতিফ পূর্বে আলোচিত আর একটি পরিকল্পনার রচয়িতা। কমিটির রিপোর্টে যেভাবে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন। এই সীমা নির্দেশ করিয়াছিলেন কমিটির পাঞ্জাব, সিন্ধু ও যুক্তপ্রদেশ হইতে গৃহীত সভ্যগণ, তাঁহাদের হাতেই ইহার ভার অর্পিত হইয়াছিল। ডক্টর এস, এ, লতিফ এ বিষয়ে স্যার হারুণকে লিখিলেনঃ লাহোর প্রস্তাবের লক্ষ্য—কতকগুলি একধর্মী ও সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র বা এলাকা গড়িয়া তোলা; ইহার প্রজারা প্রায় সমস্তই হইবে মুসলমান। কিন্তু আপনার কমিটির পাঞ্জাবী ও আলিগড়ী সভ্যগণ সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেছেন, কতকগুলি মূলতঃ অ-মুসলমানী এলাকাকেও তাঁহারা হস্তগত করিতে চান। ইঁহাদের ইচ্ছা একটি বৃহত্তর পাঞ্জাব গঠন করা,—ইহার সীমানা সুদূর আলিগড় অবধি বিস্তৃত হইবে, কাশ্মীর হইতে যশলমীর পর্যন্ত সমস্ত অ-মুসলমান রাজ্যগুলি ইহার অন্তর্গত হইয়া যাইবে। ফলে এই স্থানের প্রজাদের মধ্যে মুসলমানের অনুপাত কমিয়া দাঁড়াইবে শতকরা ৫৫ জনে। সেইরূপ, সমগ্র বঙ্গদেশ, আসাম ও বিহারের

একটি জিলাকে ই'হারা উত্তর-প‍ূর্ব অঞ্চলটির অন্তর্গত করিয়া লইতে চাহিতেছেন; ইহার ফলে এখানে ম‍ুসলমানদের অন‍ুপাত কমিয়া শতকরা ৫৪ জনে দাঁড়াইবে। আমার মনে হয়, এই ধরণের সীমা নির্দেশ করিতে গেলে তাহাতে লাহোর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য এবং ম‍ূলনীতিকেই লঙ্ঘন করা হইবে। তাহার কারণ উত্তর-প‍ূর্ব অঞ্চলে শতকরা ৪৬ জন এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে শতকরা ৪২ জন প্রজা থাকিবে অ-ম‍ুসলমান; এর‍ূপ ক্ষেত্রে এই রাষ্ট্রগ‍ুলিকে কোনক্রমেই ম‍ুসলিম রাষ্ট্র বা ম‍ুসলমানপ্রধান এলাকা বলা চলিবে না। ৩

মিঃ জিন্না এই কমিটিকে স্বীকার করিতে বা ইহার কোন প্রস্তাব ও য‍ুক্তি মানিয়া লইতে একেবারেই রাজি হইলেন না; ব্যক্তি বা সংঘবিশেষ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাব হিসাবে মাত্র এগ‍ুলিকে তিনি স্বীকার করিতে রাজী হইলেন।

এই সম্বন্ধে আরও কয়েকটি পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। একটি ঘোষণা করিয়াছেন স্যার ফিরোজ খাঁ ন‍ুন ১৯৪২ সালে আলিগড়ে প্রদত্ত একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে। আর একটি রচনা করিয়াছেন মিঃ রিজ‍্‌বানউল্লা। আমি এগ‍ুলি পড়ি নাই; এখানে এগ‍ুলি উদ্ধ‍ৃত করাও হইল না।

(তেইশ)

ভারত-বিভাগ ধারণার জন্মকথা

এই পরিকল্পনাগ‍ুলি সমস্তই রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে ১৯৩৯ সালের পর হইতে—কতক ম‍ুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনের প‍ূর্বে, কতক তাহার পরে। অনেকে বলেন, প‍ৃথক ও স্বাধীন একটি ম‍ুসলমান রাষ্ট্রের দাবী প্রথম প্রকাশ করেন পরলোকগত স্যার মহম্মদ ইকবাল; ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে নিখিল ভারতীয় ম‍ুসলিম লীগের অধিবেশন হয়, এইখানে সভাপতিত্ব করিতে গিয়া সভাপতির অভিভাষণে তিনি এই মত ব্যক্ত করেন। স‍ুতরাং এস্থলে এই অভিভাষণ হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধ‍ৃত করিয়া দেওয়া অন্যায় হইবে না: "অতএব দেখা যাইতেছে, ইসলামের মধ্যে যে ধর্মনৈতিক আদর্শ রহিয়াছে, তাহা ইহার স‍ৃষ্ট সমাজ-ব্যবস্থার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়া চলিতে গেলে শেষ পর্যন্ত অন্যটিও বাদ পড়িয়া যাইবে। কাজেই, জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র সংগঠনের অর্থ যদি দাঁড়ায় ইসলামের স‍ৃষ্ট সংহতি-নীতির বর্জন, তবে সে বস্তু ম‍ুসলমানের পক্ষে কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হইবে না।......কাজেই ভারতে এক সংহত জাতি যদি গড়িয়া তুলিতে হয়, তাহা করিতে হইবে বহ‍ুর সহযোগিতা ও পারস্পরিক সমন্বয়ের মধ্য দিয়া, বহ‍ুকে বর্জন বা অস্বীকার করিয়া নহে।......এইদিকে একত্র সংহতির পন্থা আবিষ্কারের উপরেই বস্তুতঃ ভারতের তথা এশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে.........

---

3. Op. Cit., pp. 98—9.

"অথচ আভ্যন্তরীণ সমন্বয় সাধনের একটি নীতি আবিষ্কার করিতে যত চেষ্টা এখন পর্যন্ত আমরা করিয়াছি, সমস্তই বিফল হইয়াছে। ইহা দুঃখের কথা। আমাদের চেষ্টা বিফল হইল কেন? হয়তো ইহার কারণ, আমরা পরস্পরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রত্যেকেই সন্দিহান, মনে মনে প্রত্যেকেই অপরকে নিজের কর্তৃত্বাধীন করিয়া লইবার মতলব রাখি। হয়তো ইহার কারণ, যে সকল একচ্ছত্র ক্ষমতা ঘটনাক্রমে আমাদের কাহারও হাতে আসিয়া পড়িয়াছে, পারস্পরিক সহযোগিতার বৃহত্তর প্রয়োজনেও আমরা তাহা হস্তচ্যুত করিতে প্রস্তুত নহি; জাতীয়তার আবরণে আমরা আমাদের স্বার্থবুদ্ধিকে লুকাইয়া পোষণ করিতেছি; বাহিরে আমরা মহৎপ্রাণ দেশপ্রেমিকের ভাণ করিতেছি, কিন্তু মনে মনে আমরা একটা 'জাতি' বা উপজাতির মতই সংকীর্ণচেতা। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই তাহার স্বকীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসারে স্বাধীনভাবে বাড়িয়া উঠিবার অধিকার আছে, হয়তো একথাটাও আমরা স্বীকার করিতে রাজী নই। কিন্তু আমাদের বিফলতার কারণ যাহাই হউক, আমি এখনও মনে আশা রাখি। আমার মনে হয়, ঘটনাচক্র কোনপ্রকারের একটা আভ্যন্তরীণ সমন্বয় স্থাপনের দিকেই গড়াইয়া চলিয়াছে এবং মুসলমান সমাজের মনোবৃত্তি আমি যতদূর অধ্যয়ন করিতে পারিয়াছি, তাহাতে একথা ঘোষণা করিতে আমার কোনই দ্বিধা নাই, ভারতীয় মুসলমান তাহার নিজের দেশে নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসারে নিজেকে সম্পূর্ণ ও স্বাধীনভাবে বিকশিত করিয়া তুলিবার অধিকারী। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা স্থায়ী মীমাংসার ভিত্তি হিসাবে যদি এই নীতিটিকে মানিয়া লওয়া হয়, তবে ভারতীয় মুসলমানও ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাহার সর্বস্ব উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকিবে। প্রত্যেক সম্প্রদায় তাহার নিজস্ব পদ্ধতিতে স্বাধীনভাবে বাড়িয়া উঠিবার অধিকার পাইবে, এই নীতির মূলে কোনরূপ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার কথা নাই। ....অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায়ের রীতিনীতি, আইন-কানুন, ধর্মনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখি। শুধু তাহাই নয়, প্রয়োজন হইলে তাহাদের উপাসনাস্থানকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করাও আমার কর্তব্য; ইহাই কোরাণ-শরীফের শিক্ষা।

"ইউরোপের দেশগুলিতে যে সব দল লইয়া সমাজ গঠিত হয়, তাহারা বিভিন্ন স্থানের অধিবাসী বলিয়াই পৃথক। ভারতে তাহা নয়। ......সাম্প্রদায়িক দলগুলিই ভারতের বিশেষ লক্ষণীয়, ইহাকে অস্বীকার করিয়া ইউরোপীয় গণতন্ত্রের নীতি এদেশে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। সুতরাং মুসলমানগণ যে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে একটি মুসলিম ভারতবর্ষ সৃষ্টি করিতে চাহিতেছেন, এই দাবী সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত। ......আমার মতে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে একত্রিত করিয়া একটি মাত্র রাষ্ট্রে পরিণত করা উচিত। ...আম্বালা বিভাগ এবং সম্ভবতঃ আরও কয়েকটি অ-মুসলমান প্রজাবহুল জিলাকে ইহা হইতে বাদ দিতে হইবে। তাহাতে ইহার আয়তন হ্রাস পাইবে এবং জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানের আনুপাতিক পরিমাণ বেশী দাঁড়াইবে। ......এইরূপে ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে থাকিয়াও নিজেকে বিকশিত করিয়া তুলিবার পূর্ণ সুযোগ পাইলে

তখন সেই উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানগণই হইবে বৈদেশিক অভিযানের হাত হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার শ্রেষ্ঠ সেনা,—সে অভিযান মতবাদের অভিযানই হউক, আর অস্ত্রের অভিযানই হউক। ......আমার মনে হয়, স্বাধীন ভারতের পক্ষে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা একেবারেই অচল। অবশিষ্ট ক্ষমতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিতে হইবে অভ্যন্তরস্থ রাষ্ট্রগুলির হাতে; ইহারা স্ব স্ব ব্যাপারে স্বাধীন শাসন-ক্ষমতা ভোগ করিবে ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন সম্মতিক্রমে যে ক্ষমতাগুলি স্পষ্ট ভাষায় কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করিবে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার মাত্র সেগুলিরই অধিকারী হইবে।" ১

অতএব দেখা যাইতেছে, স্যার মহম্মদ ইকবাল যে পরিকল্পনার আভাস দিয়াছেন, তাহাতে কোনরূপ সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার না রাখিয়া কেবল একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপনের কথা আদৌ বলা হয় নাই। স্পষ্টই বুঝা যায়, তাঁহার অভিপ্রায়, ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হইবে; ইহার প্রদেশগুলির স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার থাকিবে এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলস্থ প্রদেশগুলির সীমা নূতন করিয়া নির্দেশ করিয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠন করিতে হইবে—ইহাতে মুসলমান অধিবাসীদের আনুপাতিক পরিমাণ অধিকতর হইবে এবং এলাকাটি আরও সহজে শাসন করা যাইবে। ভারতের দেশরক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার এই মতামত, তাঁহার বহুপূর্বে প্রকাশিত মতেরই অনুরূপ : ১৯২৬ সালে 'নেশন' পত্রিকার এক প্রতিনিধিকে তিনি বলিয়াছিলেন, 'হিন্দুদের মধ্যে কিছু ভীতচিত্ত লোক আছেন, তাঁহাদের আশঙ্কা আফগানগণ ভারত আক্রমণ করিলে মুসলমানগণ তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া দেশের স্বার্থহানি করিবে। ভারতের সমস্ত প্রজা যদি একত্র সংঘবদ্ধ হয় এবং পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে পারে, তখন সকলেই একত্র হইয়া যে-কোন আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া দেশকে রক্ষা করিবে—সে আক্রমণকারী মুসলমান বা অ-মুসলমান যাহাই হউক। যে-কোন রাজনৈতিক দস্যু আমার গৃহ, আমার স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করিতে আসিবে আমি অবশ্যই তাহাকে প্রতিহত করিয়া আমার গৃহকে রক্ষা করিব। মুসলমানগণ জেহাদ ঘোষণা করিবে এ আশঙ্কা অমূলক, কারণ 'জেহাদ' বস্তুটা প্রায় সর্বত্রই রাজনৈতিক ক্ষমতা-কামনার বহিরাবরণ মাত্র। আমরা এক—এই চেতনাকে বাড়াইয়া তুলিলে আমাদের সমস্ত সমস্যারই সমাধান হইতে পারে। পারস্পরিক সাহায্য বিনিময় করিবার উদ্দেশ্যে একটি সন্ধি দ্বারা সমস্ত জাতিটাকে আবদ্ধ করিতে পারিলে তাহার ফলে এই ঐক্য-চেতনা অত্যন্ত দ্রুত বাড়িয়া উঠিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।'২

গোলটেবিল বৈঠকের পর পর্যন্তও ভারতের মুসলমানগণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে তাঁহাদের সমস্ত অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা চাহিয়াই ক্ষান্ত

1. Reproduced in F. K. Khan Durrani: The Meaning of Pakistan, pp. 205—213.
2. "Searchlight", 30th April, 1926.

ছিলেন। দুই সম্প্রদায়কে পৃথক করিয়া লইবার বুদ্ধিটা কিরূপে সৃষ্ট হইল, ডক্টর শাওকতউল্লা আনসারী তাঁহার 'Pakistan—The problem of India' নামক পুস্তকে তাহার বিবরণ দিয়াছেন; আমি সেই বিবরণটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

'১৯৩০-৩১ সালে শাসন-সংস্কারের আয়োজন চলিতেছিল; প্রথম ও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে দেখা গিয়াছিল, মুসলমানগণ একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নীতিকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ১৯৩২ সালে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন যখন চলিতেছিল, সেই সময়ে শ্রীযুত জে, কোটম্যান সি, আই, ই একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি লেখেন:

"সমগ্র বৃটিশ-ভারত, সমস্ত দেশীয় রাজ্য এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সীমান্ত প্রদেশকে (ভারতকে এক জাতিতে পরিণত করিতে হইলে ইহাকে ভারতের মধ্যে ধরিয়া লওয়া একেবারেই অত্যাবশ্যক) একত্রিত করিয়া একটি বলশালী অখণ্ড ভারতবর্ষ গড়িয়া তোলা হইবে, এই স্বপ্ন দিন দিন উত্তরোত্তর অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে! মনে হইতেছে, ইহার পরিবর্তে হয়তো কার্যতঃ সৃষ্টি হইবে, উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে একটি শক্তিশালী মুসলমান রাষ্ট্র; ইহার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিবে ভারতবর্ষের প্রতি নয়, বাহিরের যে মুসলমান জগতের সীমানায় ইহার অবস্থান তাহারই প্রতি। ওদিকে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে গঠিত হইবে—কি? একটি হিন্দু-ভারত, একধর্মী ও অখণ্ডিত? হয়তো তাই! অথবা হয়তো দেখিব, সেখানে একটি বিরাট ভূখণ্ড, প্রাচীন ভারতের অসংখ্য নৃপতি ও পরস্পরবিরোধী জাতির বাসস্থান, ইহারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত—অতীতকালে ইহারা এইরূপেই কাল কাটাইয়াছে, ভবিষ্যতেও অতি সহজেই আবার সেই নীতি ইহারা অবলম্বন করিতে পারিবে। খুব সম্ভবতঃ—"

'এই বীজ কয়েকজন তরুণ মুসলমানের মনে পড়িয়া অতি সহজেই অংকুরিত হইয়া উঠিল। ইঁহারা ছিলেন নিখিল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের বিরোধী। ইঁহাদের ধারণা ছিল, শাসনতন্ত্রে যে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হইতেছে, তাহা কোনই কাজে আসিবে না এবং 'হিন্দুদের জাতীয়তার যুপকাষ্ঠে আমাদের বীর অথচ নির্বাক জাতিটিকে বলি দেওয়া হইতেছে।' এতদিন মুসলমানদিগকে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত করা হইত। ১৯৩৩ সালে চৌধুরী রহমত আলী (কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আণ্ডার গ্রাজুয়েট) নামক একজন পাঞ্জাবী মুসলমান প্রথম এই মুসলমান সম্প্রদায়কে একটি 'জাতি' বলিয়া অভিহিত করিলেন। আন্দোলনটিকেও তিনি একটি নির্দিষ্ট রূপ দিয়া গড়িয়া তুলিলেন। তিনি এই মত প্রচার করিলেন যে, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (আফগান প্রদেশ), কাশ্মীর, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে একত্র করিয়া একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করা হউক, ইহার নাম হইবে পাকিস্তান। ডক্টর ইকবাল রচিত প্রস্তাব এবং এই প্রস্তাব এক নয়। ডক্টর ইকবাল বলিয়াছিলেন, এই প্রদেশগুলি একত্রে একটি মাত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইবে এবং সেই রাষ্ট্রটি নিখিল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে। চৌধুরী রহমত আলী বলিলেন, এই প্রদেশগুলি একত্রে

তাহাদের নিজস্ব একটি স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিবে। চৌধুরী রহমত আলী পাকিস্তানের সমর্থনে যুক্তি দেখাইয়া বহু পুস্তিকা বাহির করিলেন এবং পার্লামেণ্টের সভ্যদের মধ্যে ও গোলটেবিল বৈঠকের সভ্যদের মধ্যে সেগুলি বিতরণ করিলেন। কিন্তু হিন্দু বা মুসলমান, কোন ভারতবাসীই এই পুস্তিকাকে কিছুমাত্র আমল দিলেন না। ১৯৩৩ সালের আগষ্ট মাসে Joint Parliamentary Select Committee যে মুসলমানদের সাক্ষ্য লইলেন, তাঁহারা পাকিস্তান পরিকল্পনাটির সম্বন্ধে এইরূপ মতামত ব্যক্ত করেনঃ

এ, ইউসুফ আলী—"আমি যতদূর জানি, এটি একজন ছাত্রের কৃত পরিকল্পনা মাত্র, কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ইহা রচনা করেন নাই।"

চৌধুরী জাফরুল্লা খাঁ—"আমরা যতদূর বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে এটি আজগুবি এবং অসম্ভব বলিয়াই আমাদের ধারণা হইয়াছে।"

ডক্টর খলিফা সুজাউদ্দিন—"সম্ভবতঃ এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আজ পর্যন্ত এরূপ কোন পরিকল্পনার কথা ভাবেন নাই।"

"গোলটেবিলের এই বৈঠকে পাকিস্তান সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা হইয়াছিল, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহা ছাড়া বড় কথা, এই আলোচনা প্রধানতঃ তুলিয়াছিলেন বৃটিশ সভ্যগণ—বৈঠকের বিবরণী দেখিয়া মনে হয়, ইঁহারাই এবিষয়ে বারংবার প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, 'ভারতীয় (মুসলমান) প্রতিনিধিগণ ইহা আলোচনা করিতে কিছুমাত্র আগ্রহ না দেখাইয়া পরবর্তী সমস্যার আলোচনায় চলিয়া যাইতে চাহিতেছিলেন। ......ভারতবর্ষে কেহ পাকিস্তানের নামও শোনে নাই, বলে নাই, বৈঠকের মুসলমান প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাইলেন না, অথচ ওদিকে বিলাতের রক্ষণশীল দলীয় পত্রিকাগুলি এবং চার্চিল-লয়েড প্রমুখ রক্ষণশীল দলীয় নেতৃগণ ইহার প্রশংসায় একেবারে মুখর হইয়া উঠিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহারা অতি মূল্যবান ব্যবস্থার ইঙ্গিত আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন; ফলে পার্লামেণ্টে একাধিকবার ইহা লইয়া আলোচনা উত্থাপিত হইল।"৩

ভারতকে খণ্ডিত করার বুদ্ধি মূলতঃ যেখানেই উদ্ভূত হইয়া থাকুক এবং যেরূপ পরিবেশের ফলেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকুক, ডক্টর আনসারির এই কথাটি নিঃসংশয়ে সত্য যে, ইহার বীজ উর্বর ক্ষেত্রেই পড়িয়াছে এবং সকলের মনোযোগ সবলে আকর্ষণ করিয়াছে।

---

3. Shaukatullah Ansari: Pakistan—The Problem of India, *pp.* 4—7.

চতুর্থ খণ্ড

পাকিস্থান সম্বন্ধে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রস্তাব

(চব্বিশ)

অনিশ্চয়তা ও তাৎপর্য

১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ

(১) নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কার্যকরী সমিতি ও কাউন্সিল ১৯৪০ সালের ৭ই আগষ্ট, ১৭ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২২শে অক্টোবর ও ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখের গৃহীত প্রস্তাবক্রমে শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয় ব্যাপারে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, এই সভা তাহা সমর্থন ও অনুমোদন করিতেছে এবং জোরের সহিত পুনরায় এই অভিমত ব্যক্ত করিতেছে যে. ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের অঙ্গীভূত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা এদেশের বিশেষ অবস্থার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ও অচল এবং মুসলিম ভারতের পক্ষে গ্রহণের একেবারে অযোগ্য।

(২) ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন যে নীতি ও পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত, ভারতের সমস্ত দল, স্বার্থ ও সম্প্রদায়ের সহিত পরামর্শক্রমে তাহা পুনর্বিবেচিত হইবে বলিয়া সম্রাটের গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বড়লাট ১৯৩৯ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে যে ঘোষণা প্রচারিত করেন, এই সভা তাহা আশাপ্রদ বলিয়া মনে করে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে যে, সমগ্র শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাটি যদি নূতন করিয়া আদ্যন্ত পরীক্ষিত না হয়, তাহা হইলে মুসলিম ভারত সন্তুষ্ট হইবে না এবং তাহাদের সমর্থন ও অনুমোদন ব্যতিরেকে রচিত অন্য কোন নূতন পরিকল্পনা তাহাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

(৩) প্রস্তাব করা হইতেছে, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বর্তমান অধিবেশনের সুচিন্তিত অভিমত ইহাই যে, নিম্নলিখিত মৌলিক নীতির উপর নির্ভর করিয়া রচিত নয়—এমন কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা এদেশের পক্ষে কার্যকরী ও মুসলিম ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে নাঃ ভৌগোলিক দিক দিয়া সন্নিহিত অঞ্চলগুলিকে প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস দ্বারা এরূপভাবে পৃথকীকৃত ও গঠিত করিতে হইবে, যাহাতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের মত মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিকে লইয়া এমন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হয় যে, তাহার অন্তর্ভুক্ত উপাদানসমূহের প্রত্যেকটি হইবে স্বায়ত্তশাসনশীল ও সার্বভৌম।

(৪) এই সব অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের ধর্মগত, কৃষ্টিগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শাসন বিভাগীয় ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য তাহাদের সহিত পরামর্শক্রমে শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার মধ্যে যথোপযুক্ত, কার্যকরী ও আদেশাত্মক রক্ষা-ব্যবস্থার বিধান করিতে হইবে; ভারতের অন্যান্য অঞ্চলসমূহে মুসলমানগণ যেখানে সংখ্যালঘু

সে সব স্থানেও বিশেষ করিয়া ১ মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির ধর্মগত, কৃষ্টিগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য তাহাদের সহিত পরামর্শক্রমে যথোপযুক্ত, কার্যকরী ও আদেশাত্মক রক্ষা-ব্যবস্থার বিধান করিতে হইবে।

এই সভা মৌলিক নীতিগুলির উপর ভিত্তি করিয়া এমন এক শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার কাঠামো রচনার জন্য ওয়ার্কিং কমিটিকে অধিকার দিতেছে, যাহার মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলগুলির পক্ষে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, যানবাহন, শুল্ক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সমস্ত বিভাগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিবার বিধান থাকে।

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের অন্তর্গত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাই যে প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয়, ইহা সুস্পষ্ট এবং একথাও পরিষ্কার যে, লীগ অধিবেশনের মতে উক্ত পরিকল্পনা ভারতের বিশেষ অবস্থার অনুপযোগী, কাজেই অচল ও মুসলিম ভারতের গ্রহণের অযোগ্য। সমগ্র পরিকল্পনাটি আদ্যোপান্ত পুনঃ পরীক্ষিত না হইলে ভারতীয় মুসলমানগণ সন্তুষ্ট হইবেন না এবং মুসলমানদের সমর্থন ও সম্মতি ব্যতিরেকে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা রচিত হইলে তাহা তাঁহাদের দ্বারা গৃহীত হইবে না, এই অভিমত দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিবার পর সভা সেই মূলনীতিগুলি ব্যক্ত করিতেছে—কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাকে কার্যকরী ও গ্রহণযোগ্য করিতে হইলে—যাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া তাহা রচিত হওয়া প্রয়োজন। সেই মূলনীতি হইতেছে ঃ ভৌগোলিক দিক দিয়া সন্নিহিত অঞ্চলগুলিকে প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস দ্বারা এরূপভাবে পৃথকীকৃত ও গঠিত করিতে হইবে, যাহাতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের মত মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিকে লইয়া এমন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হয় যে, তাহার অন্তর্ভুক্ত উপাদানসমূহের প্রত্যেকটি হইবে স্বায়ত্তশাসনশীল ও সার্বভৌম। প্রস্তাবের পরবর্তী বক্তব্য হইতেছে, এই সব অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের ধর্মগত, কৃষ্টিগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শাসনবিভাগীয় ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য তাহাদের সহিত পরামর্শক্রমে শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার মধ্যে যথোপযুক্ত, কার্যকরী ও আদেশাত্মক রক্ষা-ব্যবস্থার বিধান করিতে হইবে এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে মুসলমানগণ যেখানে সংখ্যালঘু সেখানেও তাঁহাদের ও অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সর্ববিষয়ক স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। অতঃপর লীগ এই সব মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করিয়া এমন এক শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার কাঠামো রচনার জন্য তাহার ওয়ার্কিং কমিটিকে অধিকার দিতেছে, যাহার মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলগুলির পক্ষে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, যানবাহন, শুল্ক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সমস্ত বিভাগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিবার বিধান থাকে।

---

1. 'Specially' is taken from the resolution as published in 'India's Problem of her future constitution', P. 17. In 'Muslim India' by Mr. M. Noman the word used is 'specifically', P. 404.

প্রস্তাবানুযায়ী কোন পরিকল্পনা অদ্যাবধি ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারা রচিত হয় নাই, অথবা হইয়া থাকিলেও প্রকাশিত হয় নাই। মুসলিম লীগ প্রেসিডেন্ট মিঃ জিন্না মাদ্রাজে নিম্নলিখিতরূপ ঘোষণা বাণী প্রচার করেনঃ

'আমি আপনাদের নিকট স্পষ্টভাষাতেই বলিতে চাই যে, দেশরক্ষা, মুদ্রা-প্রচলন, বিনিময় প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সকল বিভাগের উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্বসহ ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনই মুসলিম লীগের লক্ষ্য। একটিমাত্র কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্বলিত সর্বভারতীয় শাসন-তান্ত্রিক পরিকল্পনা আমরা কোনক্রমেই স্বীকার করিয়া লইতে পারি না।'

কোন্ কোন্ অঞ্চল লইয়া এবং কিভাবে এই পরিকল্পিত রাষ্ট্র গঠন করা হইবে, সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ বিস্তৃত বিবরণ চাওয়া হইলে মিঃ জিন্না তাহা দিতে অস্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, নীতি হিসাবে আগে এই ব্যবস্থা মানিয়া লওয়া হোক, বিস্তৃত বিবরণ তাহার পর প্রস্তুত অথবা প্রচারিত হইবে।

এমন কি, এই সেদিনও ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবে ইউনিয়নিষ্ট মন্ত্রিসভার পরিবর্তে লীগ অথবা লীগ-কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য যখন মিঃ জিন্না ও পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী খিজির হায়াত খাঁর মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল, তখন পর্যন্ত অমুসলমান মন্ত্রিগণ বলিয়াছেন, 'যাহাতে সর্বসাধারণ এই পরিকল্পনার গুণাগুণ ভালভাবে বিচার করিয়া দেখিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ইহার রাজনৈতিক ও গঠনতান্ত্রিক তাৎপর্য সঠিকভাবে ব্যাখ্যাত হওয়া প্রয়োজন এবং পাকিস্থান পরিকল্পনার অধীনে পাঞ্জাবের সীমান্ত কোথায় চিহ্নিত হইবে ও কোন্ নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই বা সে সীমারেখা নির্ধারিত হইবে, তাহাও যতদূর সম্ভব স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হওয়া কর্তব্য।' ইহার উত্তরে মিঃ জিন্না মন্তব্য করিলেন, 'ইহা সর্বভারতীয় ব্যাপার, প্রস্তাবিত কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর।' ২

যদি কোন পরিকল্পনা সত্যসত্যই প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা হইলে লীগ সভাপতির পক্ষে তাহা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার অনিচ্ছার হেতু দুর্বোধ্য। সমগ্র ভারতীয় মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্বের দাবী করেন—এমন একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান যে দেশ-বিভাগের তত্ত্ব উদ্ভাবন করিবেন, অথচ তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিবেন না, পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন অথচ তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রণয়ন করিবেন না—এরূপ ধারণা করা অযৌক্তিক। পক্ষান্তরে লোকে এই আশাই করে যে, লীগ যদি চায়, তাহার পরিকল্পনার গুণাগুণ আর সকলে তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধিমতে বিচার করিয়া গ্রহণ করুক, তাহা হইলে জনসাধারণের অনুরোধে তাহার বিশদ বিবরণ সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করিবার পক্ষে লীগের ব্যগ্রতা না থাকিলেও ইচ্ছা থাকা উচিত। তাহা ছাড়া, লোকে যখন পরিকল্পনা সম্বন্ধে তথ্য ও বিশদ বিবরণ জানিতে চায়, তখন তৎসংক্রান্ত খুঁটিনাটি খবর তাহাদের জ্ঞাতব্য

2. Statement of non-Muslim Ministers, Dtd. 1-5-44 published in A. B. Patrika, 3-5-44.

নয়; তাহারা অবগত হইতে চায় সেই সব মূল তথ্যগুলি—পরিকল্পনাটি বুঝিবার ও বিচার করিবার পক্ষে যাহাদের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা একান্ত অপরিহার্য।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রশ্ন করা যাইতে পারে—লীগ পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন্ অঞ্চলটি পাকিস্থানের অন্তর্গত হইবে এবং কোন্‌টিই বা হিন্দুস্থান গঠন করিবে। অনুরূপভাবে পাকিস্থানের অন্তর্গত অমুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির ও হিন্দুস্থানের অন্তর্ভুক্ত মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আকার কিরূপ হইবে ও স্ব স্ব অঞ্চলে তাহাদের আপন আপন বিশিষ্ট স্বার্থরক্ষার জন্য কি কি রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকিবে, সে সম্বন্ধেও সঠিক ধারণা লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। শুধু একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে না যে, হিন্দুস্থানে মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য যেরূপ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা হইবে, পাকিস্থানের অমুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহ ঠিক অনুরূপ রক্ষাব্যবস্থার অধিকারী হইবেন; কারণ মুসলিম লীগ ছাড়া অন্য কোন দল দেশ-বিভাগের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন নাই, কিম্বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য রক্ষাকবচের প্রতিশ্রুতি প্রদান অথবা আহ্বানও করেন নাই। সেই কারণে আর সকলের, এমনকি, মুসলমানগণের নিজেদের বিচার-বিবেচনার জন্য প্রস্তাব প্রণয়নের দায়িত্ব কেবলমাত্র লীগেরই।

আবার পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিত্তিতেই যদি পরিকল্পনা রচিত হয়, তাহা হইলেও বিভিন্ন অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আকৃতিগত পার্থক্যের দরুণ তাহা কার্যকরী না-ও হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরিয়া লওয়া যাক, এক অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনুপাত যদি তথাকার মোট অধিবাসী সংখ্যার শতকরা ৪০ অথবা ৫০ ভাগ হয় এবং অপর অঞ্চলের হয় শতকরা দশ ভাগ, তাহা হইলে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি কার্যকরী ও বলবৎ করাইয়া লইবার পক্ষে প্রথমোক্ত সম্প্রদায় যে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির বলেই শেষোক্ত সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর সুযোগ প্রাপ্ত হইবে, ইহা তো অতি স্পষ্ট কথা। এমনও হইতে পারে, এক পক্ষের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি যদি অন্য পক্ষের নিকট পণ্যরূপে যথেষ্ট লোভনীয় বলিয়া মনে না হয়, তাহা হইলে পারস্পরিক আদান-প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না।

ব্যাপারটি একটু বাস্তব আকারে উপস্থাপিত করা যাক। মনে করুন, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের, বিশেষ করিয়া পাঞ্জাব ও বাঙ্গলার হিন্দুগণ বলিলেন, তাঁহারা যদিও তাঁহাদের স্ব স্ব প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ, তথাপি তাঁহাদের নিজেদের জন্য বিশেষ কোন সুখ-সুবিধা অথবা সরকারী চাকুরীতে ও ব্যবস্থা-পরিষদে আসন সম্বন্ধে 'ওয়েটেজ' তাঁহারা দাবী করেন না, জনসংখ্যার অনুপাতে তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য আসন পাইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন; তবে খৃষ্টান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাঁহাদের প্রাপ্যরূপে যে 'ওয়েটেজ' দাবী করিবেন, তাহা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অংশ হইতে প্রদান করা হোক। মনে করুন, তাঁহারা একথাও বলিলেন, যেহেতু আমরা নিজেদের জন্য কোনরূপ বিশেষ সুখ-সুবিধা বা 'ওয়েটেজ' দাবী করি না, সেইজন্য যেসব প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু, সেখানে

তাঁহাদিগকে অনুরূপ কোন বিশেষ সুখ-সুবিধা বা 'ওয়েটেজ' দিতে সম্মত নই—অবশ্য খৃষ্টান প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহকে তাঁহাদের আইনতঃ প্রাপ্য 'ওয়েটেজ' আমরা আপন অংশ হইতেই চুকাইয়া দিব। হিন্দুগণ যেসব প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে এই বিষয়টি অন্য আর একভাবেও প্রস্তাবিত হইতে পারে; মনে করুন—তাঁহারা বলিলেন, আমরা যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে মুসলমানদিগকে কোনরূপ বিশেষ সুখ-সুবিধা বা 'ওয়েটেজ' আমরা দিব না এবং মুসলমানগণ যেসব প্রদেশে সংখ্যাগুরু, সেখানে তাঁহারাও আমাদিগকে তাহা দিবেন না। এখন হিন্দুগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও লঘিষ্ঠতা নির্বিশেষে এই নীতিই যদি সর্বত্র অনুসরণ করিতে চান, তাহাও তো পরিপূর্ণরূপে পারস্পরিক আদান-প্রদানের ব্যাপার দাঁড়াইবে এবং সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইবার হেতু থাকিবে না। বরঞ্চ হিন্দুগণ যদি এই নীতির বশবর্তী হন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে যুক্তিযুক্তই হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে বাঙ্গলার হিন্দুগণ লাভবানই হইবেন, কারণ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী আইনপরিষদে তাঁহাদের প্রাপ্য শতকরা ৩২টি আসনের পরিবর্তে তাঁহারা পাইবেন শতকরা ৪৪টি। পাঞ্জাবেও তাঁহাদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইবে। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে বাঙ্গলায় তাঁহারা শতকরা ৫০টির পরিবর্তে প্রাপ্ত হইবেন মাত্র ৪৪টি এবং পাঞ্জাবে এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের অবস্থা অনেকটা অপরিবর্তিতই রহিয়া যাইবে। অবশ্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের হিন্দুগণ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও তাঁহাদের মোট জনসংখ্যা সেখানে মাত্র ১৪·৫০ লক্ষ হওয়ার দরুণ সংখ্যানুপাতের দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহাদের আইন-পরিষদের আসন ও সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে পদ হারাইবার ক্ষতি অতিশয় নগণ্যই হইবে। এখন হিসাব করিয়া দেখা যাক, এই ক্ষতির সহিত বিহারে মুসলমানদের সম্ভাব্য ক্ষতির আপেক্ষিক তুলনায় ফল কিরূপ দাঁড়ায়। ব্যবস্থা-পরিষদে ও সরকারী চাকুরীতে তাঁহাদের প্রাপ্য আসন ও পদের সংখ্যা কমাইয়া শতকরা ২৫টি হইতে ১২টিতে নামাইয়া আনিতে হইবে; এক কথায় বলিতে গেলে তাঁহাদের এই আসন ও পদ হইতে বঞ্চিত হইবার ক্ষতি হইবে অত্যধিক, এই একটি মাত্র প্রদেশে তাঁহারা যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, উভয় মুসলিম অঞ্চলে হিন্দুদের সমষ্টিগত ক্ষতি অপেক্ষা তাহার পরিমাণ অনেক অধিক এবং সমগ্র উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুর সংখ্যা যেখানে ১৪·৫০ লক্ষ, সেখানে একটি মাত্র প্রদেশে ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানের সংখ্যা হইবে ৪৭ লক্ষ। অবশিষ্ট হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে মুসলমানগণের অবস্থা যে কি দাঁড়াইবে, তাহা ইহা হইতেই সহজে অনুমেয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, লীগ প্রস্তাবিত পারস্পরিক আদান-প্রদানের প্রতিশ্রুতি হিন্দুদিগের পক্ষে এমন কোন লোভনীয় বস্তু হইবে না, যাহার আকর্ষণে তাঁহারা মুসলমানগণকে বিশেষ সুখ-সুবিধা বা 'ওয়েটেজ' দিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইতে পারেন।

তাহা ছাড়া প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি যে পালিত হইবেই, সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কি তাহাও প্রতিটি দলকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে দিতে হইবে। সমগ্র পরিকল্পনাটি যে সকল সমস্যা দ্বারা কণ্টকিত, তাহার কয়েকটি মাত্র আমি উল্লেখ করিলাম; এই

জন্যই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিবার পূর্বে সে সম্বন্ধে যথাযোগ্য বিচার-বিশ্লেষণের জন্য তাহার ব্যাখ্যা ও বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

দুই-জাতিতত্ত্বেরও প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধ হওয়া উচিত। প্রত্যক্ষতঃ মনে হয়, মুসলমানকে স্বতন্ত্র জাতিরূপে সপ্রমাণ করিবার জন্য পাকিস্তানের সমর্থকগণ ইসলাম ধর্ম ও তদনুমোদিত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত জাতির অন্যান্য গুণ ও লক্ষণ কেবলমাত্র মুসলমানদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়, মুসলমান ও অমুসলমান ভেদে ভারতের অঞ্চল বিশেষের সকল অধিবাসীই সমভাবে তাহাদের অধিকারী। যথা—ভাষার ক্ষেত্রে পাঞ্জাবের হিন্দু, মুসলমান ও শিখ ধর্ম-নিরপেক্ষভাবে একই ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেইরূপ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী মাত্রই হিন্দু-মুসলমান নির্বিচারে পুস্তু-ভাষা ভাষী। আবার হিন্দু-মুসলমান অবিভেদে বাঙ্গালী মাত্রেরই কথ্য ভাষা বাঙ্গলা। এই সমস্ত অঞ্চলের একই মাটীতে তাহাদের বাস এবং সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনকালের কথা ছাড়িয়া দিলেও শতাব্দীব্যাপী বৃটিশ রাজত্ব-কালে এই সকল অঞ্চলে তাহারা একই শাসনব্যবস্থার অধীনে বসবাস করিয়াছে।

ধর্মকেই জাতি বিচারের একমাত্র মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করিবার সময় স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ধর্মগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য লইয়া বহু জাতি এ দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আস্তীর্ণ বিভিন্ন অঞ্চলে একত্র বসবাস করিতেছে। শোনা যায়, সমস্যাটির এই দিক সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ এডওয়ার্ড টমসন মিঃ জিন্নাকে বলিয়াছিলেন, দুই-জাতিতত্ত্ব যদি মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে প্রতি গ্রামে, এমনকি, প্রত্যেক রাস্তায় সে তত্ত্বেরও সম্মুখীন হইতে হইবে এবং তাহার ফল যাহা হইবে তাহা কল্পনা করিতেও ভয় হয়। উত্তরে মিঃ জিন্না নাকি বলিয়াছিলেন, সম্ভাবনা ভয়াবহ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার অনুকল্প কোথায়? ৩ মিঃ জিন্না সম্প্রতি সংবাদপত্রে একটী বিবৃতিদান প্রসঙ্গে উক্ত সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, সাংবাদিকরূপে মিঃ টমসন কোনদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। কিম্বা যে কথা তাঁহার নাম দিয়া চালাইবার চেষ্টা হইতেছে, তেমন কথা তিনি কোনদিন বলেন নাই। কিন্তু মিঃ জিন্না মিঃ টমসনকে সাক্ষাৎ দান করুন বা না করুন, অথবা যে উক্তির দায়িত্ব তাঁহার উপর বর্তিয়াছে, তাহা তাঁহার প্রাপ্য হোক বা না হোক তাহা অবান্তর; কেননা, ধর্মের ভিত্তিতে দুই-জাতিতত্ত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইলে প্রতি গ্রামে ও প্রত্যেক রাস্তায় যে সেই তত্ত্ব-সংকটের সম্মুখীন হইতে হইবে ইহা অবধারিত; সংবাদ অসত্য প্রমাণিত হইলেও, তাহার ফলে এই অবস্থার কোন পরিবর্তন সাধিত হইবে না। ভারতের যে কোন অঞ্চলে অবস্থিত কোন মুসলমান যদি কেবলমাত্র তাঁহার ধর্মের গুণে অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত মুসলমানগণের সহিত একই জাতির সদস্যরূপে পরিগণিত হন ও স্বীকৃত হয় যে,

---

3. The conversation is reported in Mr. Edward Thompson's 'Enlist India for Freedom', P. 52.

সংলগ্ন অঞ্চলের অ-মুসলমান অধিবাসিগণ হইতে তিনি স্বতন্ত্র, তাহা হইলে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, তাঁহার আনুগত্য কোন্ রাষ্ট্রের প্রতি রহিবে? যে রাষ্ট্রের মধ্যে তাঁহার বসবাস ও চলাফেরা তাহা পাকিস্থানের বহির্ভূত অ-মুসলমান রাষ্ট্র হইলেও, তিনি কি তাহারই নিকট আনুগত্য নিবেদন করিবেন অথবা বহু দূরবর্তী সেই নিঃসম্পর্কীয় মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্দেশে তাঁহার আনুগত্য নিবেদিত হইবে, যাহার অধিবাসিগণের সহিত তিনি একই ধর্মমত পোষণ করেন? মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অ-মুসলমানগণ সম্বন্ধেও সেই একই প্রশ্ন উঠে; অবশ্য স্বতঃসিদ্ধরূপে যদি মানিয়া লওয়া হয়, জাতি গঠনের পক্ষে যোগ্যতা ও গুণসম্পন্ন কেবলমাত্র মুসলমানগণই এবং আর সকলে একজাতিত্বের প্রধান লক্ষণ এক ধর্মবিশ্বাসবর্জ্জিত আকারহীন একটা যৌগিক পদার্থসমষ্টিমাত্র, তাহা হইলে সে স্বতন্ত্র কথা। অথবা সেই মুসলমান বা অ-মুসলমানের সত্তা কি দ্বৈত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দ্বিধাবিভক্ত আনুগত্যের অধিকারী হইবে? যদি তাহাই হয়, তবে সমরকালীন সংকটের সময় এই দ্বিধাগ্রস্ত আনুগত্য কিভাবে সক্রিয় হইবে?

স্বতন্ত্র জাতির সদস্যের নাগরিক মর্যাদা সম্বন্ধে আরও কতগুলি প্রশ্ন দেখা দেয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন এক রাষ্ট্রের রাজ্যসীমার অধিবাসী কোন ব্যক্তি যে কোন ধর্মের লোকই হোক না কেন, কয়েকটি সর্ত মানিয়া লইলে, সে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে এবং তাহা হইবার সংগে সংগে সে মর্যাদাসম্পন্ন হয়, কতগুলি অধিকার লাভ করে ও কয়েকটি দায়িত্ব তাহার স্কন্ধে আসিয়া বর্তায়। যদি কোন ভারতীয় মুসলমান তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের বলে মুসলমান জাতির সদস্যরূপে পরিগণিত হন এবং তিনি যে রাষ্ট্রের অধিবাসী তাহা মুসলমান অথবা অ-মুসলমান রাষ্ট্র হইবার উপর তাঁহার জাতিত্ব যদি আদৌ নির্ভরশীল না হয়, তাহা হইলে ন্যায়সংগতভাবে অ-মুসলমান রাষ্ট্রের নিকট হইতে নাগরিক অধিকার লাভ করিতে অথবা দাবী করিতে তিনি পারেন কি? সেখানে তাঁহার অবস্থা কি অনেকটা বৈদেশিকের মত হইবে না? রাষ্ট্র তাহার নাগরিককে যে মর্যাদা ও অধিকার দান করে, তাহা লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে কি তাঁহার জাতীয় রাষ্ট্র, অর্থাৎ মুসলিম রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না? তিনি বৈদেশিকের প্রাপ্য অধিকার ও সুখ-সুবিধা মাত্র দাবী করিতে পারেন। ভিন্ন জাতির জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে বৈদেশিকরূপে ব্যবসা-বাণিজ্য করা ও যে জাতির সে সদস্য সেই জাতীয় রাষ্ট্রের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত তুলনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হইলেও, তাহার নাগরিকরূপে কাজকারবার করা দুইটি পৃথক বস্তু এবং এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য এত গভীর যে, তাহা সহজে উল্লঙ্ঘন বা উপেক্ষা করা চলে না। কোন সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হইলেও সে জাতির অংশবিশেষ এবং সেখানে তাহার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। জাতির কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় যে অধিকার সম্ভোগ করে, বৈদেশিকের পক্ষে তাহা লভ্য নয়। কাজেই যেসব প্রদেশ ও রাষ্ট্র অ-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানকার মুসলমানগণ যদি নিজদিগকে ভিন্ন জাতির সদস্যরূপে পরিচিত করেন, তাহা হইলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রাপ্য অধিকার তাঁহারা দাবী করিতে পারিবেন না। মুসলিম রাষ্ট্রের অধিবাসী অ-মুসলমানগণ যদি আপনা-

দিগকে ভিন্ন জাতীয়রূপে জাহির করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থাই প্রযোজ্য হইবে।

মুসলিম লীগ যদি চান, উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে তাঁহারা মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করিবেন এবং মুসলিম আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী তাহা পরিচালন করিবেন, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে, সেই সব রাষ্ট্রে অ-মুসলমানগণ যে মর্যাদার অধিকারী হইবেন, তাহার স্বরূপ কি? তাঁহারা কি মুসলমানদের সহিত সমমর্যাদা-সম্পন্ন নাগরিকরূপে বিবেচিত হইবেন অথবা তাঁহাদের অবস্থা হইবে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট?

মুসলিম পৌর বিধান মুসলমান ও 'জিম্মি'গণের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করে। অ-মুসলমানগণ কি এই 'জিম্মিদের' মর্যাদা ভোগ করিবেন অথবা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিকরূপে বিবেচিত হইবেন? আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ এ, এস, ট্রিটন তাঁহার স্বরচিত 'The Caliphs and their Non-Muslim Subjects' নামক গ্রন্থে খলিফাদিগের রাজত্বে অ-মুসলমানগণের অবস্থা সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। সমগ্র বইখানির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণও এখানে দেওয়া অসম্ভব, তাই সর্বশেষ অধ্যায় হইতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। মিঃ ট্রিটন বলিতেছেন, 'ইসলামের শাসন যে প্রায়শঃই অত্যাচারমূলক হইত তাহা মিশরের বিদ্রোহ দ্বারা প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় ওমর হয়তো ক্ষেত্রবিশেষে মুসলমানদের প্রয়োজন মিটাইবার পর তাঁহার রাজকোষের উদ্বৃত্ত অর্থ জিম্মিদের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য শাসনকর্তাদিগকে আদেশ দিয়া থাকিবেন, কিন্তু সাধারণতঃ নিয়ম ছিল ইহাই যে, ষ্টেটের প্রয়োজনমত অর্থ জিম্মিদিগকেই সরবরাহ করিতে হইত এবং তাহার বিনিময়ে রাজসরকার হইতে তাহারা কিছুই পাইত না। শাসনকালের প্রথমদিকে প্রজাদিগকে হয়তো পূর্ববর্তী শাসনকালের তুলনায় অধিক কর প্রদান করিতে হইত না, কিন্তু যে কোনভাবেই হোক করভার ক্রমশঃ গুরুতর হইতে লাগিল। দ্বিতীয় ওমরের শাসনকালে, প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে জিম্মিদের অধিকার সঙ্কোচের যে সূত্রপাত দেখা যায়, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ আরোপিত হইতে আরম্ভ করিল ও চেষ্টা চলিতে লাগিল সরকারী চাকুরী হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিবার।......দ্বিতীয় শতাব্দীতে মুসলমানদের মনোভাব কঠোরতর হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বিধি-নিষেধের কঠোরতাও বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। অতঃপর আর গির্জা তৈয়ারী করিতে দেওয়া হইবে না, এ ধারণাও জন্মলাভ করে এই সময়ে। ন্যায়ের খাতিরে একথা বলিতেই হইবে যে, শাসকবর্গের আচরণ অনেক সময় আইনের দাবী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইত।......প্রকাশ্য বিবাহোৎসব, শব শোভাযাত্রা, ভোজদান ও গির্জা-সংক্রান্ত উৎসব-অনুষ্ঠান জিম্মিদের পক্ষে আইনতঃ নিষিদ্ধ ছিল। কোন মুসলমানের পোষাকের প্রান্তসীমা পদদলিত করা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধরূপে গ্রাহ্য হইত এবং মুসলমানদের জন্য রাস্তার মধ্যভাগ ছাড়িয়া দিয়া তাহাদিগকে উভয় পার্শ্ব দিয়া হাঁটিতে হইত......।

'মুতাসিমের ইচ্ছা হইল সামারায় অবস্থিত খৃষ্টান মিশনারীদের মঠটি ক্রয় করিয়া সেথায় তিনি একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিবেন। অন্যান্য খলিফাগণও নিজেদের অট্টালিকা নির্মাণের জন্য মাল-মশলার প্রয়োজনে গীর্জা ধ্বংস করিয়াছেন এবং জনতাও গীর্জা ও মঠ ধ্বংস করিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিত। জিম্মিরা যে কোন কোন ক্ষেত্রে সংগতিসম্পন্ন না হইত তাহা নয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একদিকে শাসকের অসংযত লোভ ও অপর দিকে জনতার অপরিমিত দ্বেষ তাহাদের জীবন দুর্বিষহ করিয়া তুলিত। আল্‌হাকিম সম্বন্ধে প্রচারিত কাহিনীকে ইসলামের আদর্শরূপে গ্রহণ না করিয়া পাগলের খেয়ালরূপে গ্রহণ করাই উচিত। পরবর্তী-কালে জিম্মিদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠে। জনতার হস্তে তাহাদের দুর্ভোগের মাত্রা আরও বাড়িয়া যায় ও তৎসহ যুক্ত হয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কঠোর মনোভাব। ধর্মের দিক দিয়া ইসলামের স্বতন্ত্রীকরণ এতদিনে সম্পূর্ণ হইল। পৃথিবী ইসলামের চক্ষে দুইটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গেল: মুসলমান ও অমুসলমান এবং এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমটিই হইয়া উঠিল গণ্য। এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল; কিন্তু সাধারণভাবে বলিতে গেলে এই বিবরণ সত্য। কোন মুসলমান যদি কোন জিম্মিকে তাহার ধর্মগত ব্যাপারে কোনরূপ সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে অনুতাপ প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে তিনবার তলব করা হইত এবং তাহা সত্ত্বেও তিনি যদি স্বমতে দৃঢ় থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে হত্যা করা হইত। মুসলমানদের ভুক্তাবশেষ জিম্মিদের পক্ষে পরম উপাদেয় খাদ্য—ইহাই ছিল মুসলমান জনসাধারণের মনোভাব।'৪

পাকিস্থানের সমর্থকগণ একথা স্পষ্ট ভাষাতেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহাদের পরিকল্পিত রাষ্ট্র হইবে ইসলাম রাষ্ট্র। তাঁহাদের ধারণা, সে রাষ্ট্রের অধীনে সকলেই ন্যায়বিচার প্রাপ্ত হইবেন। উপরি উল্লিখিত দৃষ্টান্ত দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া অমুসলমানগণ এ অভিমত গ্রহণ করিতে না-ও পারেন, এই কারণেই সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করিবার জন্য একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা সম্মুখে রাখা আবশ্যক। টীকা ও ভাষ্যহীন লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা এবং বিশদ বিবরণের জন্য যে দাবী করা হইয়া থাকে, তাহার যুক্তিযুক্ততা ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয়। দুই-জাতিতত্ত্ব উদ্ভাবন ও দেশ-বিভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার পূর্বে লীগ অবশ্যই এ সমস্ত কথা ও তৎসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রশ্ন সম্বন্ধেও চিন্তা করিয়াছেন। লীগ যদি চায়, তাহার মতাবলম্বী নহেন এরূপ মুসলমান বা অমুসলমান তাহার কর্মপন্থা গ্রহণ করুন, তাহা হইলে উল্লিখিত এবং আরও অন্যান্য জটিল সমস্যা সমাধান ব্যাপারে তাঁহাদিগকে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া তাহার কর্তব্য; অবশ্য লীগের যদি ইহাই ইচ্ছা হয় যে, তাঁহারা চোখ বুজিয়া তাঁহাদের ব্যবচ্ছেদ-প্রস্তাবের অনুকূলে ভোট দান করুন, তবে সে স্বতন্ত্র কথা।

লীগের ইচ্ছা, একটা অস্পষ্ট তত্ত্ব ও আবছা পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে অগ্রে সকলে সম্মতি প্রদান করুন, তাহার তাৎপর্য ও বিশদ ব্যাখ্যা তাহার পর ক্রমশঃ

4. A. S. Tritton : 'The Caliphs and their non-Muslim subjects', Pp. 230—3.

প্রকাশিত হইবে, তাহার ফল হইবে এই যে, ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য যেরূপই হোক না কেন, অগ্রিম সম্মতি দিয়া রাখিবার দরুণ তখন তাহা গ্রহণ করিতে তাঁহারা বাধ্য হইবেন এবং যদি তাহা না করেন, তাহা হইলে প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন ও বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগে তাঁহারা অভিযুক্ত হইবেনঃ লীগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এরূপ অনুদার ধারণা লোকে পোষণ করুক ইহাই কি তাহার কাম্য?

জনসাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে ব্যাপারটি যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহার দ্বারা এই অনুদার ধারণাই সমর্থিত হয়। লীগ সভাপতি বলেন, ব্যবচ্ছেদ-ব্যবস্থাকে নীতিরূপে সর্বাগ্রে মানিয়া লইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারের পৃথক হইবার ধারার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, সে ক্ষেত্রে পৃথক হইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় আগে, কিভাবে সে কার্য নিষ্পন্ন হইবে তাহার বিস্তৃত বিবরণ নির্ধারিত হয় তাহার পর। কিন্তু আজ সে অবস্থারও পরিবর্তন হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর সমর্থন ও সম্মতি অনুযায়ী মিঃ সি, রাজাগোপালাচারী এমন একটি পরিকল্পনা মিঃ জিন্নার নিকট উপস্থিত করেন, যাহার দ্বারা মিঃ রাজাগোপালাচারীর মতে লীগের লাহোর প্রস্তাবের সমস্ত সর্ত পালিত হয়। কিন্তু মিঃ জিন্না অজস্র নিন্দায় সে প্রস্তাবকে ধিক্কৃত করেন। অবস্থা যে কিভাবে পরিবর্তিত হইল তাহা এখানে দেখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। মিঃ জিন্না তাঁহার বোম্বাইস্থিত ভবনে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন এবং সি, আর প্রস্তাবের নিন্দা করিবার পর বলিলেন, 'মিঃ গান্ধী, তাঁহার ব্যক্তিগত দায়িত্বে হইলেও, ভারত-বিভাগের প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছেন। এখন কবে ও কিভাবে সে ব্যবচ্ছেদ-কার্য নিষ্পন্ন হইবে ইহাই হইল প্রশ্ন।'৫ এই ঘোষণার পর জনসাধারণ আশা করিল, বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিবার পূর্বে যে নীতি গ্রহণের উপর মিঃ জিন্না এতদিন জোর দিয়া আসিয়াছেন তাহা যখন স্বীকৃত হইয়া গেল, তখন মিঃ জিন্না অতঃপর তাহার তাৎপর্য ও বিশদ ব্যাখ্যা রচনায় প্রবৃত্ত হইবেন এবং একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া দেখাইবেন, মিঃ রাজাগোপালাচারীর রচিত 'বিকৃত বিকলাঙ্গ ও কীটদষ্ট' পাকিস্থান পরিকল্পনার সহিত তাহার পার্থক্য কোথায়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নার মধ্যে সুদীর্ঘ পত্রালাপের মধ্যে দুইজাতি-তত্ত্ব ও সমগ্র লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে আরও নূতন নূতন দাবীই উত্থাপিত হইল, পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ রচনার কার্য আদৌ অগ্রসর হইল না। মিঃ জিন্না নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধী ব্যবচ্ছেদ-প্রস্তাব নীতিগতভাবে মানিয়া লইয়াছেন, তাহা সত্ত্বেও মিঃ জিন্না পুনরায় ধুয়া তুলিলেন, ভারত-বিভাগ সম্বন্ধীয় নিরাভরণ ও নিরলঙ্কার সাধারণ নীতি ও প্রস্তাব সর্বাগ্রে স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। বিশদ বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে ব্যবচ্ছেদ-প্রস্তাবকে নীতিগতভাবে স্বীকার করিয়া লইবার দাবী পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু তাহার ফলে বিশদ বিবরণ রচনার প্রসঙ্গ মাত্র উত্থাপিত হইল না, হইল দুইজাতি-তত্ত্ব, ভারত-বিভাগ প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও লাহোর প্রস্তাব সম্বন্ধে

5. Statement before the Council of the All-India Muslim League at Lahore on 30-7-44.

নব নব দাবীর অবতারণা। এ দাবীদ্বয়ও স্বীকৃত হইলে তাহার পর আরও কি দাবী উত্থাপিত হইবে ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। পাকিস্থান পরিকল্পনা ও তাহার অন্তর্নিহিত নীতি সম্বন্ধে খণ্ড খণ্ড আলোচনার অপরিহার্য পরিণাম ইহাই।

(পঁচিশ)

অনিশ্চয়তার অসুবিধা

কোন্ কোন্ অঞ্চল পাকিস্থানের অন্তর্গত হইবে, সে প্রশ্নেরও একটা ইতিহাস আছে, যাহা সাধারণের সুবিদিত নয়। অন্যত্র দেখান হইয়াছে যে, ভারতকে মুসলমান ও অ-মুসলমান অঞ্চলে বিভক্ত করিবার পরিকল্পনা বিভিন্ন সময়ে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রচিত হইয়াছে। কেহ কেহ এই বিভাগ চাহিয়াছেন সংস্কৃতিগত উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া; তাঁহাদের কাম্য ছিল, কেবল মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলে নয়, দেশের সর্বত্র শাসনব্যাপারে মুসলমানদের জন্য অধিকতর অধিকার অর্জন করা। আবার কেহ কেহ বা স্পষ্টভাবেই মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করিবার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। খুব সম্ভব ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্থান প্রস্তাব উত্থাপিত ও পরবর্তী মার্চে তাহা গৃহীত হইবার পরই লীগের বৈদেশিক শাখা ভারতের বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার রচয়িতাগণের উদ্দেশে এই মর্মে একটি আমন্ত্রণ প্রচার করিলেন, 'তাঁহারা যেন উক্ত কমিটির উদ্যোগে আহূত সম্মেলনে মিলিত হইয়া সমবেতভাবে প্রত্যেকটি পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া দেখেন, সেগুলি হইতে একটি সাধারণ ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতে পারে কিনা।'১ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বৈদেশিক সাব্-কমিটির চেয়ারম্যান স্যার আবদুল্লা হারুণ লীগ সভাপতি মিঃ জিন্নার হস্তে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন এবং এই মাত্র যে পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল তাহাতে তিনি লেখেন, 'স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, গত ফেব্রুয়ারী মাসে যে ক্ষুদ্র পত্রখানি স্মারকলিপিরূপে আমি আপনার হাতে প্রদান করি, তাহা অবলম্বন করিয়াই ওয়ার্কিং কমিটি এই প্রস্তাব (লীগের লাহোর প্রস্তাব) রচনা করিয়াছেন।'২ এই স্মারকলিপিটি প্রকাশিত হয় নাই, কাজেই তাহার মধ্যে কি ছিল বলা অসম্ভব।

বৈদেশিক সাব্-কমিটির আমন্ত্রণে শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার রচয়িতাগণ সম্মিলিত হইলেন, কিন্তু আলোচনার ফলে দুইটি পরস্পরবিরোধী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র

---

1. Letter of Sir Abdullah Haroon, Chairman, Foreign Sub-Committee, All India Muslim League, Dated 13th Dec., 1940, published in 'The Pakistan Issue, Pp. 73—4.
2. Ibid. P. 75.

ধারণার উদ্ভব হইল। তন্মধ্যে একটি হইল, মুসলিম অঞ্চল হইতে একটি গোটা গুটি মুসলমানপ্রধান এলাকা; অ-মুসলমানদিগকে যথাসম্ভব বাদ দিয়া, তাহাবে যত বেশী মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ করা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে; তাহ হইলেই অতিশয় সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায় অত্যন্ত সংখ্যালঘু অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত একত্রে তাহাদের ইচ্ছামত শাসনকার্য পরিচালন করিতে পারিবেন কিন্তু মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি যৎসামান্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা হইবে অনিশ্চিত এবং তাহার ফলে, যে উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া মুসলিমপ্রধান অঞ্চল গঠিত হইতেছে তাহা ব্যর্থ না হইলেও, ব্যাহত হইবে। অপর অভিমতটি হইল, ভারতবর্ষ হইতে যত বৃহৎ সম্ভব একটি অংশ কাটিয়া লইয়া মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে—তাহাতে মুসলমানগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অত্যল্প হইলেও কিছু আসে যায় না। বৈদেশিক সাব্-কমিটির দ্বারা গঠিত কমিটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, এই সব পরস্পরবিরোধী ধারণার মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন করা। লীগের বার্ষিক অধিবেশনের সময় পর্যন্ত কমিটির কার্য সমাপ্ত হইল না; কাজেই স্যার আবদুল্লা হারুণ লীগ সভাপতির হস্তে যে স্মারকলিপি প্রদান করিলেন, তাহা চূড়ান্ত নয়, মধ্যবর্তীকালের জন্য রচিত। স্যার আবদুল্লা হারুণের মতে লাহোর প্রস্তাব রচিত হয় এই স্মারকলিপি অনুসরণেই, কাজেই তাহার রচনার ভঙ্গীও অত্যন্ত সাধারণ ও অস্পষ্টঃ 'ভৌগোলিক দিক্ দিয়া সংলগ্ন এলাকাগুলিকে আঞ্চলিক পুনঃসংস্থাপন দ্বারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলের মত মুসলমানপ্রধান স্থানগুলিকে এরূপভাবে পুনর্গঠিত করিতে হইবে যে, তাহারা একত্রিত হইয়া এমন এক স্বাধীন রাষ্ট্র রচনা করিতে পারে, যাহার অন্তর্গত প্রতিটি 'ইউনিট' হইবে স্বায়ত্তশাসনশীল ও সার্বভৌম।' যে ভূখণ্ড মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহার পরিমাণ জ্ঞাপনের জন্য 'ইউনিট', 'রিজিয়ন', 'এরিয়া', 'জোন'—এই চারিটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু শাসনতন্ত্র-সংক্রান্ত সাম্প্রতিক নথিপত্রে এই সকল শব্দের কোন প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। তৎপরিবর্তে যে সব শব্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহা হইতেছে, জেলা, তশীল, তালুক, প্রদেশ ইত্যাদি। অস্বচ্ছতা, অস্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থবোধকতার বদলে স্পষ্টতা, বোধগম্যতা এবং নিশ্চয়তার প্রতি লীগ কর্তৃপক্ষের যদি লক্ষ্য থাকিত, তাহা হইলে সকলের পক্ষে সহজ ও বোধগম্য এই শব্দগুলিই তাঁহারা ব্যবহার করিতেন। তবে কি এমনও হইতে পারে যে, লীগের অভ্যন্তরস্থ উল্লিখিত উভয়পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ পাছে প্রকট ও প্রখরতর হইয়া পড়ে সেই আশঙ্কায় তখন সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত হওয়া সমীচীন বলিয়া মনে হয় নাই? সে যাহাই হোক, এই শব্দ কয়টির দ্বারা যাহা নির্দেশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

সমস্ত অস্বচ্ছতা ও অনির্দিষ্টতা সত্ত্বেও শব্দগুলি তাৎপর্যের দিক্ দিয়া যথেষ্ট পরিমাণে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদিগকে প্রকারান্তরে এই পরিষ্কার অর্থ যিনি দান করিয়াছেন, তিনি হইতেছেন স্বয়ং লীগ সভাপতি। সেই প্রদত্ত অর্থ হইতেছে, অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা সমন্বিত ক্ষুদ্র মুসলিম এলাকার স্বপক্ষে ও অল্পসংখ্যাগুরুত্ব সম্বলিত বৃহৎ মুসলিম অঞ্চলের বিপক্ষে।

এই হিসাব হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা আমেরিকার ইণ্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিসের সংবাদদাতা মিঃ ডবলিউ, চ্যাপমানের সহিত সাক্ষাৎকালে মিঃ জিন্না বলিয়াছিলেন, 'ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলে মুসলমানগণ যেখানে জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ—সেই সব স্থানে এক বা একাধিক স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র গঠন দ্বারা যে পাকিস্থান রচিত হইবে,—সত্যকার স্বাধীনতা আসিতে পারে কেবলমাত্র তাহারই ভিতর দিয়া।'৩ নিম্নে প্রদত্ত ১৯৪১ সালের 'সেন্সাস রিপোর্ট' হইতে দেখা যাইবে যে, যদি পাঞ্জাবে অ-মুসলমানপ্রধান জেলাগুলি বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধে একথা খাটে :

৭নং ছক

অঞ্চলের নাম	মোট জনসংখ্যা (লক্ষ)	মুসলমান জনসংখ্যা (লক্ষ)	অমুসলমান জনসংখ্যা (লক্ষ)
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩০·৩৮	২৭·৮৮	২·৪৯
সিন্ধু	৪৫·৩৫	৩২·০৮	১৩·২৭
বৃটিশ বেলুচিস্থান ...	৫·০২	৪·৩৯	০·৬৩
অমুসলমান সংখ্যাগুরু জেলাগুলি বর্জিত পাঞ্জাবের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা-সমূহ	১৬৮·৭১	১২৩·৬৪	৪৫·০৭
মোট	২৪৯·৪৬	১৮৭·৯৯	৬১·৪৩

এই হিসাব হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা ৭৫-৩০ ভাগ, হিন্দুগণ শতকরা ২৪·৭০ ভাগ। পক্ষান্তরে যদি সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশের জনসংখ্যার অনুপাত কষা হয়, অর্থাৎ, উল্লিখিত হিসাবের সহিত যদি পাঞ্জাবের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির জনসংখ্যা যোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে অবস্থা দাঁড়ায় এইরূপঃ

	মোট জনসংখ্যা (লক্ষ)	মুসলমান জনসংখ্যা (লক্ষ)
উপরে প্রদত্ত হিসাবের জের ...	২৪৯·৪৬	১৮৭·৯৯
পাঞ্জাবে হিন্দুপ্রধান জেলাগুলির জনসংখ্যা ...	১১৫·৪৮	৩৮·৫৪
সর্ব মোট ...	৩৬৪·৯৪	২২৬·৫৩

3. 'Some Recent Speeches and Writings of Mr. Jinnah', collected and edited by Jamiluddin Ahmad, 3rd Edition (1943), P. 366.

এই হিসাব অনুযায়ী মুসলমান জনসংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৬২। আবার ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট মতে পাঞ্জাব প্রদেশ, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বৃটিশ বেলুচিস্থানের মোট জনসংখ্যা ৩,০৩,৫৬,৫০৬; তন্মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা ১,৮৭,৯৫,৮৭২, অর্থাৎ শতকরা ৬১·৯।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মিঃ জিন্না যখন মিঃ চ্যাপমানের নিকট উল্লিখিত উক্তি করেন, তখন উত্তর-পশ্চিম মুসলিম অঞ্চলের মধ্যে সমগ্র পাঞ্জাবকে তিনি গণনা করেন নাই, করিয়াছিলেন মাত্র সেই অংশটুকুকে, মুসলমান যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

আর একটি লিখিত প্রমাণ দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। মিঃ এম, আর, টি ভারতের অবশিষ্ট অংশ হইতে মুসলিম অঞ্চল পৃথক্ করার পক্ষে 'ইষ্টার্ণ টাইমসে' বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ১৯৪০ সালের লীগের লাহোর অধিবেশনের পর বোম্বাই, মালাবার হিলের প্লেসাণ্ট রোড হইতে মিঃ এম, এইচ, সৈয়দ 'India's Problem of Her Future Constitution' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। বইখানি স্পষ্টতঃই মিঃ জিন্নার পক্ষ হইতে প্রকাশিত হয় এবং তিনি স্বয়ং তাহার ভূমিকা লেখেন। মুখবন্ধে মিঃ জিন্না বলেন, 'ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয় সমস্যা লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিতে চান, এই সংকলনখানি তাঁহাদের পক্ষে সাহায্যকর হইবে। এই উদ্দেশ্যেই আমি কতকগুলি সুচিন্তিত অভিমত পুস্তিকাকারে সংকলন করিয়াছি।' তিনি আরও বলেন, 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব যে মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে, তাহার ব্যাখ্যার দিক দিয়া ইহা যথেষ্ট সাহায্য করিবে; আমি আশা করি, এই বিরাট দেশের কল্যাণকামী মাত্রেই সংস্কার, পক্ষপাত ও ভাবপ্রবণতা বর্জিত মন লইয়া সমস্যাটির সম্মুখীন হইবে।' যে সমস্ত অভিমত স্বয়ং মিঃ জিন্না কর্তৃক এই বই-খানিতে সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৯৪০ সালের ৫ই জানুয়ারী তারিখে লীগের লাহোর সেসনের প্রাক্কালে মিঃ এম, আর, টি কর্তৃক 'ইষ্টার্ণ টাইমসে' লিখিত একটি প্রবন্ধ অন্যতম। এই প্রবন্ধে রক্ষাব্যবস্থা বনাম বিশ্লেষ বিষয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে মিঃ এম, আর, টি বলিতেছেন, 'উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থান সংলগ্ন এই পাঁচটী এলাকার মোট জনসংখ্যা ৪২০ লক্ষের মধ্যে তাহাদের (মুসলমানদের) সংখ্যা ২৮০ লক্ষ। পাঞ্জাবের পূর্ব অঞ্চলস্থ স্থানগুলির নূতন করিয়া বিলি-বন্দোবস্ত যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে মুসলমান জনসংখ্যার হার আরও বৃদ্ধি পাইবে। আম্বালা বিভাগ ও পূর্বাঞ্চলস্থ হিন্দু ও শিখ রাজ্যগুলি যদি পাঞ্জাব হইতে বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার লোকসংখ্যা ২৮০½ লক্ষ হইতে কমিয়া ২১০ লক্ষে দাঁড়াইবে, অথচ মুসলমান জন-সংখ্যা বাড়িয়া ৫৫০ লক্ষ হইতে ৭০০ লক্ষে উঠিবে। আর সমস্ত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলকে সমগ্রভাবে যদি একটিমাত্র এলাকারূপে ধরা হয়, মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত তদপেক্ষা অধিকতর মাত্রায় বর্ধিত হইবে। পূর্ব সীমান্ত যদি উল্লিখিত প্রস্তাবানুযায়ী সংশোধিত হয়, তাহা হইলে মোট লোকসংখ্যা ৩৫০ লক্ষের মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা হইবে ২৭০ লক্ষ এবং অ-মুসলমান জনসংখ্যা হইবে মাত্র ৮০ লক্ষ।

মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৭ ভাগ মুসলমান অধিবাসী এই অঞ্চলে স্থায়ী ও অটল গভর্ণমেণ্ট গঠনে সমর্থ হইবে এবং তাহা সম্ভব হইবে, কোনরূপ অধিবাসী বিনিময় ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াই।' ৪ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, মিঃ জিন্নার দায়িত্বে প্রকাশিত ও তাঁহার মতে 'লাহোর প্রস্তাবের পরিষ্কার ব্যাখ্যার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়' এই পরিকল্পনা পাঞ্জাবের সেই অংশ বাদ দিবারই পক্ষপাতী—মুসলমানগণ যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ নহেন।

আর একটি ঘটনার দ্বারাও এই অভিমত সমর্থিত হয়। স্যার আবদুল্লা হারুণের সভাপতিত্বে লীগের বৈদেশিক শাখা কর্তৃক একটি কমিটি নিয়োগের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। লীগের লাহোর অধিবেশন সমাপ্ত হইয়া যাইবার পরেও উক্ত কমিটি তাঁহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব উদ্‌যাপন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া চলিলেন এবং কোন্ কোন্ স্থান উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইবে, তাহার বিস্তৃত বিবরণসহ একটি পরিকল্পনা কার্যতঃ প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী সমগ্র পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যসমূহ, দিল্লী প্রদেশের বাহিরে তাহার পূর্ব প্রান্তস্থিত বৃটিশ ভারতের কিয়দংশ, আলিগড়কে অঞ্চলভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে আলিগড়ের কিছু অংশ এবং রাজপুতানার অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য বিকানীর ও কাশ্মীর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য হইল। পরিকল্পনাটি অকালে ও অননুমোদিতভাবে ১৯৪১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার দিল্লী সংস্করণে প্রকাশিত হইয়া গেল; প্রাদেশিক সংবাদপত্রসমূহের সংবাদদাতাগণ সঙ্গে সঙ্গে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তারযোগে স্ব স্ব কেন্দ্রীয় অফিসে প্রেরণ করিলেন এবং জানাইয়া দিলেন, লীগের বৈদেশিক কমিটি কর্তৃক ইহা ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। স্যার আবদুল্লা হারুণ ডাক্তার সৈয়দ আবদুল্লা লতিফকে অনুরোধ জানাইয়া পাঠাইলেন, তিনি যেন পরিকল্পনাটি পাঠ করিয়া সে সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য লিখিয়া পাঠান। ডাঃ লতিফ ১৯৪১ সালের ৮ই মার্চ তারিখে তাঁহার লিখিত মন্তব্য প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহার মন্তব্যের একটি নকল মিঃ জিন্নার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাহার উত্তরে মিঃ জিন্না ১৫ই মার্চ তারিখে বিরক্তি সহকারে ডাক্তার লতিফকে লিখিয়া পাঠাইলেন, 'আমি আপনাকে স্পষ্টাক্ষরে ও প্রকাশ্যভাবে জানাইয়া রাখিতে চাই, যে কমিটির কথা আপনি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া আসিতেছেন, সেরূপ কোন কমিটি লীগ নিয়োগ করে নাই এবং 'মুসলিম লীগ অথবা আমি কেহই এই সব তথাকথিত পরিকল্পনা প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারি না। অবশ্য একথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, কোন দল অথবা ব্যক্তি যদি কোন প্রস্তাব প্রেরণ করেন, তাহা যথাযোগ্য গুরুত্বের সহিত বিবেচিত হইবে। অতএব আমি এই শেষ বারের মত স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া রাখিতে চাই যে, আপনি অথবা স্যার আবদুল্লা হারুণ বার বার এ-কমিটি—সে-কমিটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কোন দল বা ব্যক্তিবিশেষের রচিত কোন প্রস্তাবের সহিত লীগকে অথবা তাহার কর্তৃপক্ষকে জড়িত করিবেন না।'৫

4. 'India's Problem of Her Future Constitution', Pp. 33—4.
5. The Pakistan Issue, P. 100.

তাহা হইলে অবস্থাটা দাঁড়াইল ইহাই ঃ লীগ সভাপতি একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সংবাদদাতার সহিত আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ, অবশ্য পাঞ্জাবের পূর্বদিকস্থ অ-মুসলমানপ্রধান জেলাগুলি বাদ দিলে ফল সেইরূপই দাঁড়ায় বটে। এ সম্বন্ধে কতগুলি অভিমত সংকলন করিয়া তিনি তাহা প্রকাশ করিলেন ও বলিলেন, 'লাহোর প্রস্তাব ব্যাখ্যার পক্ষে এগুলি যথেষ্ট সহায়তা করিবে।' পাঞ্জাবের পূর্ব প্রান্তস্থ জেলাগুলি বাদ দিবার পক্ষে মিঃ এম, আর, টির প্রস্তাব এই সংকলনের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে, অথচ যে সকল প্রস্তাব সমগ্র পাঞ্জাব ও তৎসহ বৃটিশ ভারত এবং দেশীয় রাজ্যের অংশবিশেষ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষপাতী সেগুলি পরিত্যক্ত হইল। লীগের বৈদেশিক কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি স্যার আবদুল্লা হারুণের সভাপতিত্বে যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন, তাহাতে প্রস্তাবিত হইল, সমগ্র পাঞ্জাব ও বৃটিশ ভারত, দেশীয় রাজ্য এবং আলিগড়ের কিয়দংশ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে; মিঃ জিন্না যে কেবলমাত্র এই পরিকল্পনাই প্রত্যাখ্যান করিলেন তাহা নয়, কমিটিকে পর্যন্ত অস্বীকার করিলেন। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য হইয়া উঠে যে, সমগ্র পাঞ্জাব গ্রহণের পক্ষে যে প্রস্তাব, লীগ সভাপতির তাহা মনঃপূত নয়, তিনি পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলস্থিত জেলাগুলি বাদ দিবার প্রস্তাবেরই পক্ষপাতী। এই সমস্ত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লীগ-সভাপতির কর্তব্য ছিল, বৃটিশ ভারতের অন্তর্গত কোন্ কোন্ প্রদেশ ও জেলা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইবে, তাহা সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিতভাবে মুসলমান ও অ-মুসলমানগণকে জানাইয়া দেওয়া। কিন্তু পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি তাহা দিতে বার বার অস্বীকার করিয়াছেন. এমনকি, ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবের অ-মুসলমান মন্ত্রিগণ পাকিস্থান পরিকল্পনা আলোচনা করিবার সাহায্যের জন্য এ সম্বন্ধে লীগের অভিমত অবগত হইতে চাহিলেন, তখনও মিঃ জিন্নার পক্ষ হইতে সেই অস্বীকৃতিই ব্যক্ত হইয়াছে। মিঃ সি রাজাগোপালাচারী যখন শাসনতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থাসম্মত সুস্পষ্ট ও সুবোধ্য ভাষায় তাঁহার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবাবলী মিঃ জিন্নার সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন, কেবলমাত্র তখনই মহাত্মা গান্ধীর আলাপ-আলোচনা ও জনৈক সাংবাদিকের সহিত সাক্ষাতে মিঃ জিন্না সর্বপ্রথম স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তির জন্য বর্তমান আকারে গঠিত প্রদেশসমূহই লাহোর প্রস্তাবের লক্ষ্য, জেলাগুলি নয়। ইহার অর্থ, সমগ্র পাঞ্জাব হইবে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এবং সমগ্র বাঙলা ও আসাম প্রবেশ করিবে পূর্ব অঞ্চলের মধ্যে। অথচ আমরা দেখিয়াছি, এই পাঞ্জাব অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব লীগ-সভাপতির দ্বারা কিরূপে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

এইবারে আমরা পূর্বাঞ্চল প্রসঙ্গের উল্লেখ করিব। বাঙলার মোট লোক-সংখ্যা ৬,০৩,০৬,৫২৫; তন্মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা ৩,৩০,০৫,৪৩৪, অর্থাৎ শতকরা ৫৪·৭৩ ভাগ। আসামের মোট জনসংখ্যা ১,০২,০৪,৭৩৩, তাহার মধ্যে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা ৩৪,৪২,৪৭৯, অর্থাৎ শতকরা ৩৩·৭৩ ভাগ। লাহোর প্রস্তাবের অধুনা-কথিত তাৎপর্য অনুযায়ী এই দুইটি প্রদেশ যদি সমগ্রভাবে পূর্বাঞ্চলের

অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে উভয় প্রদেশের সর্বমোট জনসংখ্যা ৭,০৫,১১,২৫৮ মধ্যে মুসলমান অধিবাসী সংখ্যা হইবে ৩,৬৪,৪৭,৯১৩, অর্থাৎ শতকরা ৫১·৬৯। মিঃ জিন্না একদা মিঃ চ্যাপমানের নিকট বলিয়াছিলেন, মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা হইবে শতকরা ৭৫ ভাগ; বর্তমান হিসাব হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, মিঃ জিন্নার উল্লিখিত উক্তি সঠিক সংখ্যানুপাতের ধারে-কাছে দিয়াও যায় না। এমনকি, যদি অ-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি বাদ দিয়া কেবলমাত্র মুসলমান সংখ্যাপ্রধান জেলাগুলি পূর্বাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহা হইলেও মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা ৬৮ বা ৬৯ ভাগ অতিক্রম করে না। মিঃ এম, আর, টি এই পূর্বাঞ্চল প্রসঙ্গে তাঁহার 'India's Problem of Her Future Constitution' নামক গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন, 'পাঞ্জাবের মত বাংলাতেও যদি আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে মুসলমান জনসংখ্যা বর্ধিত হইয়া শতকরা ৮০ অথবা তাহারও অধিক দাঁড়াইবে। বর্তমানে পূর্ববঙ্গ ও তৎসন্নিহিত গোয়ালপাড়া ও সিলেট জেলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা অত্যধিক—শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ। এই মুসলমান জনসংখ্যা যদি একত্রীভূত হইয়া বাঙ্গলা ও আসাম লইয়া গঠিত একটি নূতন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা চার কোটি জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগের স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবে।' মিঃ এম, আর, টির প্রদত্ত হিসাব যে ভুল, তাহা পরে দর্শান যাইবে; এখানে শুধু এইটুকু দেখাইতে চাই যে, তাঁহার পরিকল্পনানুযায়ী সমগ্র বাঙ্গলা ও সমগ্র আসাম লইয়া পূর্ব পকিস্থান অঞ্চল গঠিতব্য নয়, তাহা গঠিত হইবে মাত্র সেই সব অংশ লইয়া, মুসলমান জনসংখ্যা যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। আসাম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলা বিযুক্ত বাঙ্গলা প্রদেশ এবং বাঙ্গলার সহিত জাতি ও সংস্কৃতিগত ঐক্যের ভিত্তিতে বিহার প্রদেশের অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলা লইয়া উত্তর-পূর্ব মুসলিম অঞ্চল গঠিত হইবে, ইহাই ছিল হারুণ কমিটির সুপারিশ। এমনকি, এই কমিটিও বাঙ্গলার কয়েকটি জেলা বাদ দিবার প্রস্তাব করেন। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের এলাকাসমূহের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে লীগ দাবী পুনঃ পুনঃ স্থান পরিবর্তন করায় তাহার সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, পূর্বাঞ্চল সম্পর্কেও সে কথা সমান জোরের সহিত প্রযোজ্য।

(ছাব্বিশ)

প্রস্তাবের বিশ্লেষণ

কোন্ কোন্ স্থান পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইবে, সে সম্বন্ধে অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় রচিত লাহোর প্রস্তাব যে কত বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে তাহা আমরা দেখিয়াছি। মুসলমান ও অ-মুসলমান জনসাধারণের জ্ঞান-বুদ্ধি মতে বিচারের জন্য এই কারণে একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার প্রয়োজন। কিন্তু লীগ সেরূপ বিশদ বিবরণ দিতে অসম্মত। তথাপি লাহোর প্রস্তাব যে শব্দ-সমষ্টির দ্বারা গঠিত, আমরা তাহাদিগকে তাহাদের সহজ ও স্বাভাবিক অর্থেই গ্রহণ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব— প্রস্তাবটির বক্তব্য বিষয় কি এবং উহা যখন রচিত ও গৃহীত হয়, তখন মুসলিম লীগের মনোভাব ও উদ্দেশ্যই বা কি ছিল। এখন প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ করা যাক।

ইহা তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথমভাগে পুনরায় জোরের সহিত বলা হইয়াছে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অন্তর্গত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা এদেশের বিশেষ অবস্থার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী ও অচল এবং মুসলিম ভারতের পক্ষে গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য। দ্বিতীয় অংশে এই দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে, সম্রাটের গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ১৯৩৯ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে বড়লাট যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন তাহা এইজন্য আশাপ্রদ যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের নীতি ও পদ্ধতি ভারতের সকল দল, স্বার্থ ও সম্প্রদায়ের সহিত পরামর্শক্রমে পুনর্বিবেচিত হইবে বলিয়া ইহাতে আশ্বাস প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু সমগ্র পরিকল্পনাটি যদি নূতন করিয়া আদ্যোপান্ত পরীক্ষিত না হয় ও পুনর্বিবেচনার পর নূতন পরিকল্পনা যদি মুসলমান সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সম্মতিসহ রচিত না হয়, তাহা হইলে মুসলিম ভারত তাহা গ্রহণ করিবে না। অতএব দেখা যাইতেছে, এই অংশ দুইটি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সম্বোধন করিয়া সম্ভাব্য শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে লীগের অভিমত ব্যক্ত করিতেছে। আমাদের বর্তমান আলোচনার সহিত ইহার প্রাসঙ্গিকতা এই পর্যন্ত যে, ইহারই পটভূমিতে তৃতীয়ভাগে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগঠনের প্রশ্ন পর্যালোচিত হইয়াছে।

তৃতীয় অংশের প্রথম অনুচ্ছেদে লীগের নিম্নোদ্ধৃত সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে; 'নিম্নলিখিত মূল নীতির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত নয় এমন কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা এদেশে কার্যকরী হইবে না,' কিম্বা মুসলমানদের পক্ষে গ্রহণযোগ্যরূপে বিবেচিত হইবে নাঃ ভৌগোলিক দিক দিয়া অব্যবহিত স্থানগুলিকে সীমারেখা দ্বারা স্বতন্ত্র করিয়া লইতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক পুনঃ-সংস্থাপন ব্যবস্থার সাহায্যে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বভারতের মত মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিকে লইয়া এমন স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে, যাহার অন্তর্গত প্রতিটি ইউনিট হইবে স্বায়ত্তশাসনশীল ও সার্বভৌম।'

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, কি মুসলমানপ্রধান, কি অ-মুসলমান-প্রধান প্রত্যেক অঞ্চলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্ম ও কৃষ্টিগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শাসন-বিভাগীয় ও অন্যান্য সকল প্রকার অধিকার রক্ষার জন্য তাঁহাদের সহিত পরামর্শক্রমে পর্যাপ্ত পরিমাণ, কার্যকরী ও নির্দেশাত্মক রক্ষাব্যবস্থার বিধান করিতে হইবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে এই মূলনীতি অবলম্বন করিয়া এমন একটি শাসন-তান্ত্রিক পরিকল্পনা রচনার জন্য লীগ ওয়ার্কিং কমিটিকে অধিকার দেওয়া হইতেছে, যাহার মধ্যে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, যানবাহন, শুল্ক বিভাগ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সকল বিভাগ পরিচালনার সম্পূর্ণ অধিকার স্বাধীন অঞ্চলসমূহের হস্তে চূড়ান্ত-ভাবে অর্পিত হইবার ব্যবস্থা থাকিবে।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি দেখা দেয়ঃ (ক) শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে কে? (খ) পরিকল্পিত শাসনতন্ত্রের স্বরূপ কি হইবে—যাজকতন্ত্র, গণতন্ত্র, মুখ্যতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র অথবা অন্য আর কিছু? (গ) বৃটিশ সাম্রাজ্য ও অন্যান্য অ-মুসলমান অঞ্চলের সহিত এইসব স্বাধীন রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি হইবে? (ঘ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থরক্ষার জন্য আরোপিত রক্ষাব্যবস্থার বিধান লঙ্ঘিত হইলে কাহার দ্বারা, কিভাবে ও কোন্ নির্দেশবলে তাহা প্রবর্তিত হইবে? (ঙ) মুসলিম রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থান অন্তর্ভুক্ত হইবে? (চ) তাহাদের মর্যাদা ও সংগতি হইবে কিরূপ? (ছ) শাসনতন্ত্র প্রবর্তন ও স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে শাসনক্ষমতা অধিকার—এতদুভয়ের মধ্যবর্তীকালে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, যানবাহন, শুল্ক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে কাহার হাতে?

মিঃ জিন্নার জিদ, লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু তাহা করিবার পূর্বে কোন্ কোন্ দেশ মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইবে, সে প্রশ্ন ছাড়াও, অন্যান্য প্রশ্নগুলি সম্বন্ধেও প্রস্তাবের তাৎপর্য ও ইঙ্গিত সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হওয়া দরকার।

(ক) শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা রচনা করিবে কে? প্রস্তাবের গঠনভঙ্গী ও যে পটভূমিতে নূতন শাসনসংস্কার পরিকল্পনা রচনার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে—তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রস্তাবের প্রথম অংশে নিন্দিত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মত ইহাও প্রণয়ন করিবে বৃটিশ পার্লামেণ্ট। ভারতীয়, তথা মুসলমানগণের তাহার রচনায় কোন হাত থাকিবে না; রচিত হইবার পর তাহা যদি মুসলমানগণের সম্মতি ও সমর্থন লাভ করে, তবেই তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। ক্রিপস্ প্রস্তাব অন্ততঃ এটুকু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিল যে, ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার ভারতীয়গণেরই; কাজেই প্রস্তাবের এই অংশটুকু স্বীকার করিয়া লইলে ক্রিপস্ প্রস্তাবেরও বহু পশ্চাতে আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। অন্যান্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিগণের বিবৃতিতেও যে অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে; এই লীগ প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করার

অর্থ, ভারতের হিন্দু ও মুসলমানগণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার অস্বীকার করিবার জন্যই আহ্বান করা।

(খ) পরিকল্পিত শাসনতন্ত্রের স্বরূপ কি হইবে—যাজকতন্ত্র, গণতন্ত্র, মুখ্যতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র অথবা অন্য আরও কিছু? প্রস্তাব এ সম্পর্কে নীরব। বহু ক্ষেত্রে লীগ-সভাপতির বহু ভাষণে এই অভিমতই ব্যক্ত হইয়াছে যে, গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি ভারতীয় পরিবেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। মিঃ জিন্নার রচনা ও বক্তৃতা হইতে এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারেঃ

'এদেশের ভোটদাতার সংখ্যা ৩৫০ লক্ষ; ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই অজ্ঞ, নিরক্ষর, অশিক্ষিত, বহু শতাব্দীর প্রাচীন অন্ধ সংস্কারে আচ্ছন্ন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ; এবম্বিধ পরিবেশের মধ্যে বর্তমান শাসনতন্ত্র পরিচালন করিতে গিয়া এই সত্যই উপলব্ধ হইয়াছে যে, ভারতে গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টারী শাসনপদ্ধতি প্রবর্তন অসম্ভব।' ১

'ভারতীয় অবস্থা সম্বন্ধে বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যগণের অজ্ঞতা এমনি গভীর যে, অতীতের সমস্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আজও তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না, এই জাতীয় শাসন-ব্যবস্থা এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। ইংলণ্ডের মত এক-জাতি অধ্যুষিত দেশের গণতান্ত্রিক শাসনপ্রথা ভারতের ন্যায় বহু-জাতির বাসভূমির পক্ষে কোনক্রমেই প্রযোজ্য নয়। এই সহজ সত্যটিই ভারতের সর্বপ্রকার শাসন-তান্ত্রিক ব্যাধির মূলীভূত কারণ। ....পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ভারতের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং তাহা জোর করিয়া ভারতের উপর আরোপ করার ফলেই সমাজ-দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হয়।'২

এইজন্যই রাষ্ট্রের স্বরূপ সঠিকভাবে বর্ণিত হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে জন-সাধারণ বিচার করিয়া দেখিতে পারে, সেই পরিকল্পিত শাসন-ব্যবস্থা তাহাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইবে কিনা। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, তাহা ভারতের পক্ষে যখন অনুপযোগী ও লীগের পক্ষে অগ্রাহ্য, তখন অন্য কি আকারের শাসন-ব্যবস্থা অথবা পাশ্চাত্য গণতন্ত্র কিভাবে সংশোধিত হইলে লীগের পক্ষে তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে, সেকথাও মুসলমান ও অ-মুসলমান অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়-সমূহের জানিয়া রাখা দরকার। গণতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করিবার পক্ষে লীগ সমর্থকদের যুক্তি এই যে, ভারতের অধিবাসিগণ একজাতি নহেন এবং মুসলমানগণ মোট জন-সংখ্যার একটা বিরাট অংশ। কিন্তু ব্যবচ্ছেদপর্ব সমাধা হইয়া গেলেও মুসলমান অঞ্চলে এ সমস্যার সমাধান হইবে না; কেননা, বর্তমানে সমগ্র ভারতে মোট লোক-সংখ্যার সহিত মুসলমান জনসংখ্যার যে অনুপাত, ব্যবচ্ছেদের পর মুসলিম অঞ্চলে মুসলমান জনসংখ্যার সহিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের সমষ্টিগত জনসংখ্যার

1. Statement to the 'Manchester Guardian' reproduced in 'Recent Speeches and Writings of Mr. Jinnah'. P. 86.
2. Article in the 'Time and Tide', London, Dtd. 19th January, 1940, reproduced in 'Recent Speeches and Writings of Mr. Jinnah', Pp. 111, 113,

অনুপাত তাহা হইতে কম হইবে না। বৃটিশ ভারতে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত শতকরা ২৬·৮৩। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশ অন্তর্ভুক্ত হইলে, তথাকার অ-মুসলমান অধিবাসীদের হার দাঁড়াইবে শতকরা ৩৭·৯৩ এবং পাঞ্জাবের অ-মুসলমানপ্রধান জেলাগুলি বাদ দিলে তাহা ২৪·৬৪ হইবে। অনুরূপভাবে পূর্বাঞ্চলের সহিত অ-মুসলমানপ্রধান জেলাগুলি যুক্ত হইলে সংখ্যালঘু অ-মুসলমান সম্প্রদায়গুলির সমষ্টিগত অনুপাত হইবে শতকরা ৪৮·৩১ এবং সেগুলি বাদ দিলে দাঁড়াইবে ৩০·৫৮। ভারতবর্ষে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যালঘু, এই কারণে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে অনুপযোগী; কিন্তু যে মুহূর্তে এ অবস্থার পরিবর্তন হইল এবং পৃথকীকৃত মুসলিম অঞ্চলে তাঁহারা হইলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অমুসলমান সম্প্রদায় হইলেন সংখ্যালঘু, তদ্দণ্ডে গণতন্ত্র গ্রহণযোগ্য ও উপযোগী হইল—ইহা অসংগত, অযৌক্তিক ও অবিচার। কাজেই এরূপ অনুমান করা অন্যায় হইবে না যে, লীগ-সভাপতি যখন বলেন, গণতন্ত্র ভারতের পক্ষে অনুপযোগী, তখন পাকিস্থানের পক্ষেও সে কথা তিনি সমভাবে প্রয়োগ করিয়া থাকেন; সে ক্ষেত্রে অন্য কোনরূপ শাসন-ব্যবস্থার পরিকল্পনা তিনি অবশ্যই মনে মনে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাই যদি হয়, তবে জনসাধারণ যাহাতে উন্মুক্ত দৃষ্টির সাহায্যে তাহার দোষগুণ ভালভাবে বিচার-বিবেচনা করিবার পর তাহা গ্রহণ করিতে পারে—তদুদ্দেশ্যে সেই পরিকল্পনার একটি পূর্ণাবয়ব চিত্র তিনি কেন প্রদান করিবেন না?

(গ) বৃটিশ সাম্রাজ্য ও অ-মুসলমান অঞ্চলসমূহের সহিত এই সব স্বাধীন রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি হইবে? অ-মুসলমান অঞ্চল হইতে তাহারা যে স্বাধীন হইবে ইহা সুস্পষ্ট, কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রভাব হইতে তাহারা মুক্ত হইবে কিনা, তাহা বেশ পরিস্কার নয়। বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে তাহারা যদি স্বাধীনই হয়, তাহা হইলে তাহাদের জন্য ও ভারতের অবশিষ্ট অংশের জন্য শাসনতন্ত্র রচনার নিমিত্ত বৃটিশ পার্লামেন্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকার কোন অর্থই হয় না। তৃতীয় অংশের তৃতীয় অনুচ্ছেদ হইতে একথা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রারম্ভেই পূর্ণ স্বাধীনতার কথা পরিকল্পিত হয় নাই। হইয়াছে এমন এক অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থার পরিকল্পনা যখন দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, যানবাহন, শুল্ক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিভাগসমূহের দায়িত্ব অর্পিত থাকিবে অন্য কোন কর্তৃত্বের হাতে। এদিকে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান মাত্রই হিন্দু সংখ্যা-গরিষ্ঠ হইতে বাধ্য—এই যুক্তিতে যে কোন ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের হস্তে ক্ষমতা অর্পণের ব্যবস্থা লীগ যখন অস্বীকার করিয়াছে, তখন ইহা স্বচ্ছন্দে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, অন্তর্বর্তীকালের জন্য এই সমস্ত অধিকার বৃটিশের হস্তেই ন্যস্ত থাকিবে। প্রস্তাবের তৃতীয় অংশের তৃতীয় অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'চূড়ান্তভাবে' শব্দটী নির্ভুল রূপে নির্দেশ করে যে, এই সমস্ত তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রারম্ভিক স্বাধীনতা হইবে সর্তাধীন। স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের প্রতিষ্ঠা ও তাহাদের দ্বারা পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ—এই মধ্যবর্তী সময়ের স্থায়িত্বকাল যে কতদিন তাহাও নির্দিষ্ট নয়; যে সব অবস্থার উপর তাহা নির্ভরশীল, প্রস্তাব রচনার সময় সেগুলির সঠিক হিসাব হয়তো সম্ভব হয় নাই। কাজেই স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রারম্ভিক মর্যাদা হইবে 'ষ্ট্যাটিউট অব ওয়েষ্টমিনষ্টার' বর্ণিত বৃটিশ কমনওয়েলথের অধীন ঔপনিবেশিক

মর্যাদা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। তাহা ছাড়া, বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ হইতে তাহারা যদি কোন-দিন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ই, তবে কতদিনে তাহা সম্ভব হইবে, সে কথাও সুস্পষ্ট নয়। এ ব্যাখ্যা যে অযৌক্তিক নয়, তাহা ১৯৪৪ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত লণ্ডনের 'নিউজ ক্রনিক্‌ল' পত্রিকার সংবাদদাতার সহিত সাক্ষাৎকালে মিঃ জিন্নার নিম্নলিখিত কথোপকথনের বিবরণ দ্বারা সমর্থিত হইবে:

প্রঃ—কিন্তু গৃহযুদ্ধ যে সংঘটিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আপনি এমন এক ভারতীয় 'আলষ্টার' তৈয়ারী করিতে চাহিতেছেন, হিন্দুরা অখণ্ড ভারতের নামে যে কোন দিন তাহা আক্রমণ করিয়া বসিতে পারে।

মিঃ জিন্না:—এ বিষয়ে আপনার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। তাহা ছাড়া, পুনর্ব্যবস্থা ও বন্দোবস্তের জন্য নূতন শাসনতন্ত্রে একটা মধ্যবর্তিকালীন ব্যবস্থা থাকিবে; এই সময়ের জন্য সৈন্যবাহিনী ও পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে চূড়ান্ত অধিকার বৃটিশ কর্তৃপক্ষের হাতেই ন্যস্ত থাকিবে। জাতি দুইটি ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কত শীঘ্র নূতন শাসনতন্ত্রের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিবেন, তাহারই উপর মধ্যবর্তী ব্যবস্থার স্থায়িত্বকাল নির্ভর করিবে।

প্রঃ—বৃটিশ যদি তখন এই যুক্তিতে ভারত ত্যাগ করিতে অসম্মত হয় যে, প্রতিবেশীরূপে পাশাপাশি বাস করিবার পক্ষে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের সম্পর্ক যথেষ্ট সৌহার্দপূর্ণ নয়, তাহা হইলে কি হইবে?

মিঃ জিন্না:—তাহা হয়তো ঘটিতে পারে, কিন্তু তেমন কিছু ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না। আর তাহা যদি ঘটেও, সে ক্ষেত্রে আমরা যে-পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন সম্ভোগ করিব বর্তমানে আমরা তাহার অধিকারী নই। বর্তমান শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত একটা আপোষ মীমাংসায় উপনীত হওয়া আমাদের পক্ষে যতখানি কণ্টকর, স্বতন্ত্র জাতি ও উপনিবেশরূপে তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখা প্রয়োজন, উদ্ধৃত উক্তির শেষবাক্যে ব্যবহৃত 'উপনিবেশ' শব্দটী ভুল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ পাকিস্থানে বৈদেশিকনীতি ও সৈন্যবাহিনীর উপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব রহিবে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এবং উপনিবেশসমূহে ঔপনিবেশিক সরকার এসব ক্ষেত্রে সার্বভৌম। এই প্রসঙ্গে 'স্বাধীনতা' শব্দটীর দ্বারা বৃটিশ সম্পর্কবর্জিত পূর্ণ স্বাধীনতা অথবা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনসাধারণের হস্তে সম্পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর বুঝান দূরে থাক, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন পর্যন্ত বুঝায় না। ভারতের অবশিষ্ট অংশ যদি বৃটিশ নিয়ন্ত্রণনিরপেক্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করেও, তথাপি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও এই সকল অঞ্চলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত তাহাদিগকে বুঝাপড়া করিতে হইবে। স্বাধীন ভারত-সমুদ্রের মাঝখানে তাহারা বিরাজ করিবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বীপের মত। অতএব পরিকল্পিত স্বাধীনতার অর্থ হইতেছে, ভারতের অবশিষ্ট অংশ হইতে স্বাতন্ত্র্য, বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে নয়—অন্ততঃপক্ষে প্রথম পর্যায়ে তো নয়ই।

ব্যবচ্ছেদ-ব্যবস্থার ফলে যেসব নূতন রাষ্ট্র গঠিত হইবে তাহাদের মর্যাদা

সম্বন্ধে মিঃ জিন্নার আর একটি উক্তি এস্থলে উদ্ধৃত করিতে চাই। লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হইবার অব্যবহিত পরেই ১৯৪০ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে মিঃ জিন্না সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দান করেন, তাহাতে নিম্নলিখিত অংশটী আমরা দেখিতে পাইঃ

পাকিস্থানের সহিত গ্রেট বৃটেনের সম্পর্ক প্রসঙ্গে, লাহোর প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া মিঃ জিন্না বলেন, 'ভারতে আর যে অঞ্চল অথবা অঞ্চলসমূহ গঠিত হইবে, তাহাদের সহিত আমাদের সম্পর্ক হইবে কতকটা আন্তর্জাতিক ধরণের ভারতের সহিত ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের সম্পর্ক তাহার দৃষ্টান্তস্থল।'৩ ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, কেবল পাকিস্থান নয়, হিন্দুস্থানকেও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশরূপে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে তাহারা সেই মর্যাদাই সম্ভোগ করিবে—ব্রহ্মদেশ ও সিংহল যাহার অধিকারী; তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্কও হইবে ভারতের সহিত ব্রহ্ম ও সিংহলের সম্বন্ধের অনুরূপ।

সাক্ষাৎকালে মিঃ জিন্না কেবলমাত্র সৈন্যবাহিনী ও বৈদেশিক নীতির উল্লেখ করিলেও, প্রস্তাবে কিন্তু যানবাহন, শুল্ক ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিভাগের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ভারত কোন ব্যাপারে কোনরূপ কর্তৃত্বের অধিকারী হইবে না এবং মুসলিম অঞ্চলও মধ্যবর্তীকালে উল্লিখিত বিভাগসমূহের কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিবে না। এই যুক্তি হইতে একমাত্র সিদ্ধান্ত ইহাই যে, যানবাহন, শুল্ক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিভাগের উপর বৃটিশ কর্তৃত্বই হইবে চূড়ান্ত ও সার্বভৌম। এই সমস্ত বিভাগের পরিধি বহুবিস্তীর্ণ, কাজেই একথা অনুধাবন করা দুঃসাধ্য হইবে না যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বলে প্রদেশসমূহ যে পরিমাণ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, মুসলিম অঞ্চলের লব্ধ ক্ষমতার মাত্রা কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা হইতেও অনেক কম হইবে।

বলা হইয়াছে যে, স্বাধীন মুসলিম অঞ্চলসমূহ ভারতের অবশিষ্ট অংশের সহিত দুইটী স্বাধীন রাষ্ট্রের মত পারস্পরিক চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ হইবে। কিন্তু বৃটিশ কর্তৃত্বই যদি মুসলিম অঞ্চলের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সার্বভৌম হয়, তাহা হইলে ঐ সমুদয় অঞ্চলের গভর্ণমেণ্ট অবশিষ্ট ভারতের সহিত চুক্তি বন্ধনে কিরূপে আবদ্ধ হইতে পারেন? কাজেই চুক্তি যদি আদৌ সম্পাদিত হয়, তবে তাহা হইবে অবশিষ্ট ভারতের সহিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের, অন্ততঃপক্ষে ভারতের অবশিষ্ট অংশের সহিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব ও নির্দেশাধীন মুসলিম অঞ্চলের, ঠিক আজ যেভাবে ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত স্বাধীন আফগানিস্থান রাজ্যের চুক্তি সম্পাদন্ হইয়া থাকে।

(ঘ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি কেহ যদি লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তাহাকে তাহা প্রতিপালনে বাধ্য করিবে কে ও কোন্ নির্দেশবলে?

মুসলিম লীগ প্রস্তাব এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। মুসলমান ও

3. Mr. M. R. T. 'India's Problem of Her Future Constitution', P. 31.

অ-মুসলমান অঞ্চল দুইটী পরস্পর নিরপেক্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র এবং তাহারা কোনরূপ কেন্দ্রীয় সাধারণ অনুশাসনের অধীন নয়, এই কারণে এমন কোন কর্তৃত্ব নাই—যাহার দ্বারা নিয়মতন্ত্র ও শাসনতন্ত্রসম্মত কোন উপায়ে এইসব নির্দেশাত্মক রক্ষাব্যবস্থাসমূহ কার্যে প্রযুক্ত হইতে পারে। কোন একটী রাষ্ট্র তাহার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করিলে, অপর রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা বৈরিতার কার্যরূপে পরিগণিত হইবে এবং আপোষ-আলোচনার দ্বারা এই বিরোধের মীমাংসা যদি সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে কূটনৈতিক আলোচনা ও আন্তর্জাতিক সালিশী প্রভৃতি আন্তর্জাতিক বিরোধ-নিষ্পত্তির জন্য যেসব পরিচিত পন্থা রহিয়াছে, তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ বিরোধের ক্ষেত্রে কোন একটী রাষ্ট্রের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পক্ষে অন্যান্য রাষ্ট্রের অধীন স্বসম্প্রদায়সমূহের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করা সম্ভব, অন্ততঃপক্ষে সহজ হইবে কি? ভারতবর্ষ হইতে খণ্ডিত করিয়া যে মুসলমান রাষ্ট্রগুলি তৈয়ারী হইল, পৃথিবীতে তাহারাই একমাত্র মুসলমান রাষ্ট্র নয়, ভারতবর্ষের সন্নিকটে আরও অন্যান্য মুসলমান রাষ্ট্র রহিয়াছে। অ-মুসলমানদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এইসব মুসলমান রাষ্ট্রের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করা ভারতীয় সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে কোনদিন সম্ভবপর হইয়াছে কি? যদি কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল কর্তৃক মুসলমানদের উপর অনুষ্ঠিত নির্যাতন ও নিপীড়নের কাহিনীর মধ্যে এমন কোন সত্যতা থাকিয়া থাকে, যাহার দ্বারা স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবীর যৌক্তিকতা সপ্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সেই যুক্তিবলেই অন্যান্য স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ না হইলেও, কূটনৈতিক প্রতিবাদ জ্ঞাপনের অধিকার সমর্থিত না হইয়া পারে না, বিশেষ করিয়া যেক্ষেত্রে অধিবাসের অঞ্চল নির্বিশেষে মুসলমান মাত্রই কেবলমাত্র সমধর্মিত্বের দাবীতে একজাতিরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। এইরূপ সাহায্য লাভের জন্য ভারতীয় মুসলমানগণের পক্ষ হইতে কোনদিন কোনরূপ চেষ্টা হইয়াছে কি? যেহেতু স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সাধারণ বন্ধন বলিতে কিছু রহিবে না, সেইজন্য পাকিস্থানের অধীনে হিন্দুগণ যদি নিপীড়িত হয়, হিন্দুস্থানের পক্ষে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা কোনক্রমে সম্ভব হইবে না; অনুরূপভাবে হিন্দুস্থান কর্তৃক মুসলমান নিপীড়নের বিরুদ্ধে পাকিস্থানের পক্ষে কোনরূপ সক্রিয় প্রতিবিধান করা অসম্ভব হইবে।

ইউরোপে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থরক্ষা মাইনরিটি চুক্তির' দ্বারা প্রস্তাবিত ও জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক প্রতিশ্রুত, তাহা সত্ত্বেও তাহাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা এস্থলে উল্লেখযোগ্য: 'নতন ও পুরাতন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম যে ঘটে নাই তাহা নয়, তথাপি সাধারণভাবে বলিতে গেলে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের ইতিহাস তাহাদের ভাগ্যবিড়ম্বনারই ইতিহাস। প্রায় প্রত্যেকটী রাষ্ট্র 'মাইনরিটি চুক্তির' সর্ত যথেচ্ছভাবে লঙ্ঘন করিয়াছে এবং তাহার দরুণ প্রায় প্রতিটী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই লঙ্ঘন ইচ্ছাকৃত, উদ্দেশ্যমূলক ও উদ্ধত।......কিন্তু এই সমস্ত সদ্গুণ থাকা সত্ত্বেও, জাতিসঙ্ঘের প্রতিশ্রুতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির পক্ষে সম্পূর্ণরূপে মূল্যহীন প্রতিপন্ন

হইয়াছে। জাতিসঙ্ঘের হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন করা হইয়াছে অতি অল্প ক্ষেত্রেই এবং তাহা হইতেও অল্পতর ক্ষেত্রে সে হস্তক্ষেপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে; তাহার কারণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির জন্য সুবিচার অর্জন করা ছাড়া, অন্যান্য আরও অনেক প্রশ্ন সেখানে প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল ছিল।'৪

পাকিস্থান ও হিন্দুস্থানের অধীন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির উপর সুবিচার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, 'বস্তুতঃপক্ষে হিন্দু ও মুসলিম উভয় রাষ্ট্রের মধ্যেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকার দরুণ এমন একটা সাধারণ কর্মপন্থা অবলম্বন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে যে, তাহার ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে প্রত্যয় ফিরিয়া আসিবে এবং পরিশেষে আপন আপন অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতেও তাহারা সক্ষম হইবে।'৫ 'ভারত-বিভাগের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির উপর এমন এক গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে যে, তাহার চাপে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের মনে নিরাপত্তার ভাব জাগাইয়া তুলিতে ও তাহাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও প্রত্যয় ফিরাইয়া আনিবার জন্য সচেষ্ট না হইয়া তাহারা পারিবে না।'৬ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্বন্ধে দায়িত্ব-বোধ ও তাহাদের বিশ্বাস অর্জনের প্রয়াস জাগাইয়া তুলিবার জন্য পৃথক হওয়া নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন; কারণ, এই দায়িত্ব বোধের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির পক্ষে ঐক্যই প্রকৃষ্টতম ক্ষেত্র এবং বিভাগ হোক বা না হোক, এই বৃত্তির অনুশীলন সর্বথা অনুসরণীয়। উল্লিখিত উদ্ধৃতির দ্বারা যাহা বলিতে চাওয়া হইয়াছে, তাহা সত্যকার দায়িত্ব বোধ ততখানি নয়, যতখানি এক রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অপর রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের শঙ্কাবোধ। নিম্নলিখিত দুইটি কারণের যে কোন একটির দরুণ তাহা ঘটিতে পারে: প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রের মনে অপর স্বাধীন রাষ্ট্রের সক্রিয় হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে শঙ্কাবোধ জাগরূক রহিবে এবং তাহারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে তাহাদের পারস্পরিক আচরণ। কিন্তু পূর্বেই দেখান হইয়াছে, এরূপ ঘটনা একেবারে অসম্ভব না হইলেও, অত্যন্ত বিরল। এতদ্ব্যতীত যে অন্যবিধ উপায়ে ইহা ঘটিতে পারে, তাহা হইতেছে এই যে, কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় তাহার অঞ্চলের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হইলে, অন্য অঞ্চলের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ও তদঞ্চলস্থ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরূপ আচরণ করিবে, এই আশঙ্কার বশেই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় কুত্রাপি নির্যাতিত হইবে না। প্রকারান্তরে ব্যাপারটা দাঁড়াইবে এই যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি অন্য গভর্ণমেন্টের সদাচরণ সম্বন্ধে প্রতিভূ স্বরূপ তাহাদের গভর্ণমেন্টের হাতে গচ্ছিত রহিবে। এ ব্যবস্থাও যে কার্যকরী হইবে, সে সম্বন্ধেও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হয়তো কোনরূপ অন্যায় আচরণ করেন নাই, শুধু তাহাই নয়, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের তাঁহারা হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠ নাগরিক, তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদের নিঃসম্পর্কিত অন্য

---

4. C. B. Macartney: National States and National Minorities (1934), P. 390.
5. Mr. M. R. T.: op. cit. P. 41.
6. Ibid. Mr. Jinnah at P. 30.

এক স্বাধীন রাষ্ট্র অসদ্ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের আপন রাষ্ট্র বিনাদোষে তাঁহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিবে—এ ধারণা সাধারণ বিচার-বুদ্ধির পক্ষে এমনই ন্যক্কারজনক যে, পাকিস্থান অথবা হিন্দুস্থান তাহার আপন প্রজার বিরুদ্ধে এরূপ প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন, ইহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। কংগ্রেস কর্তৃক মুসলমানদের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার কাহিনীর পশ্চাতে যদি কোন সত্য থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে মুসলমান প্রদেশসমূহে মুসলিম মন্ত্রিমণ্ডলী অনায়াসে তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিতেন, কারণ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী সমস্ত মন্ত্রিমণ্ডলীই সমপরিমাণ শক্তির অধিকারী। অন্ততঃপক্ষে সংখ্যা-লঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষাকল্পে সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক গভর্ণরগণের মারফৎ যথোপযুক্ত প্রভাব প্রয়োগ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের উপর তাঁহারা চাপ দিতে পারিতেন। কিন্তু মুসলমান মন্ত্রিমণ্ডলী নিজেদের দায়িত্বে অথবা গভর্ণরদিগের বিশেষ ক্ষমতার আশ্রয় লইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে সেরূপ কিছুই করেন নাই। অমুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহেরও মুসলমান মন্ত্রিসভাগুলির বিরুদ্ধে যে কোনই অভিযোগ ছিল না তাহা নয়। তাঁহারা যে অভিযোগ পোষণ করিতেন, তাহা অত্যন্ত গুরুতর এবং ব্যবস্থা-পরিষদের ও সংবাদপত্রের ভিতর দিয়া সে অভিযোগ সময় সময় অভিব্যক্ত হইত। কিন্তু মুসলিম মন্ত্রিমণ্ডলীর যে সমস্ত অনাচারের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু অমুসলমান সম্প্রদায়ের নালিশ, তাহা যে অন্যত্র সংখ্যা-লঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিহিংসা-বৃত্তির বশবর্তী হইয়া অনুষ্ঠিত, এরূপ অভিযোগ কেহ কোন দিন উত্থাপন করেন নাই। এই সমস্ত ঘটনার দ্বারা এই কথাই প্রতিপন্ন হয় যে, কংগ্রেস মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক অনুষ্ঠিত অত্যাচারের কাহিনী অমূলক, অন্ততঃপক্ষে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, মুসলমান মন্ত্রিমণ্ডলীকে সক্রিয় প্রতিবিধানে তাহা প্রবৃত্ত করিতে পারে। অথচ সেই সমস্ত অভিযোগই আজ ভারত-ব্যবচ্ছেদের পক্ষে অন্যতম যুক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাকথিত ‘কংগ্রেস নির্যাতন-নিপীড়ন’ যখন চলিতেছিল তখনও ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলের শাসনভার মুসলিম মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত; তাহা সত্ত্বেও আমরা কিরূপে আশা করিতে পারি যে, ঐ দুইটি অঞ্চলে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলেই অবস্থার শুভ পরিবর্তন সূচিত হইবে? পরিবর্তন যদি একান্ত কিছু হয়ই, তবে তাহা খারাপের দিকে হওয়াই বেশী সম্ভবপর; ভারতের অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে, সে পথ সুগম না হইয়া, বিঘ্নবহুল হইবারই সম্ভাবনা সমধিক। ব্যবচ্ছেদ-ব্যবস্থার সমগ্র দাবীটি এই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সংহতি কর্তৃক নিগৃহীত ও নিপীড়িত হইবে। মুসলমানগণ যখন ভারতীয় জনসংখ্যার এরূপ একটি বিরাট অংশরূপে বিদ্যমান, তখনই সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে এরূপ অবাধে মুসলমানদের উপর নিগ্রহ ও নিপীড়ন করা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে বিভাগের পর হিন্দুস্থানে অধিকতর সংখ্যাল্পতাহেতু অত্যাচারী সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের নিকট হইতে সুবিচার ও সদ্ব্যবহার আদায় করিয়া লইবার সামর্থ্য যখন তাঁহাদের আরও হ্রাস পাইবে, তখন তাঁহাদের নিকট হইতে ভিন্নরূপ আচরণ প্রত্যাশা করিবার যুক্তিসঙ্গত কোন হেতু থাকিবে কি?

অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলির হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা যখন শূন্য, অন্ততঃপক্ষে সুদূরপরাহত, তখন স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় যে কোন রক্ষাকবচেরই বিধান থাকুক না কেন, তাহা সার্থক হইবার সম্ভাবনা নির্ভর করিবে দুইটি জিনিষের উপর ঃ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের তাহা পালন করিবার প্রবৃত্তি ও সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের তাহা প্রয়োগ করাইয়া লইবার সামর্থ্যের উপর। পূর্ব আচরণ হইতে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, সততা ও সুবিচারের দিক দিয়া হিন্দুসম্প্রদায় নির্ভরযোগ্য নয়। অথচ তাহা আদায় করিয়া লইবার পক্ষে হিন্দুস্থানের সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের সামর্থ্য পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পাইবে। নবগঠিত রাষ্ট্রগুলি যদি সত্য সত্যই স্বাধীন হয়, তাহা হইলে রক্ষাকবচসমূহ নির্দেশাত্মক হওয়া সত্ত্বেও, তাহা সংশোধন ও সংস্কার করিবার অধিকার তাহাদের থাকিবে এবং পুনর্বিবেচিত হইবার পর তাহারা যদি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় অক্ষত অবস্থায় স্ব স্ব স্থানে রহিয়াও যায়, তৎসত্ত্বেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার পক্ষে তাহারা যে নিতান্ত অসার ও অসহায় হইবে—সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থের অনুকূলে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির ব্যর্থতা হইতে আমরা তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারি।

পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ছক হইতে বৃটিশ ভারতের প্রদেশসমূহে ১৯৪১ সালের লোকগণনার হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার আনুপাতিক হিসাব পাওয়া যাইবে।

(সাতাশ)

প্রস্তাবের বিশ্লেষণ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)— মুসলিম রাষ্ট্রের সীমা নির্দ্ধারণ

(ঙ) ১ কোন্ কোন্ অঞ্চল মুসলিম রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইবে?

প্রস্তাবের দ্বারা অথবা লীগের অপর কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা কোন অঞ্চল চিহ্নিত বা সীমাবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু তৎসম্বন্ধীয় মূলনীতি প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহা হইতেছে এই ঃ ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মত মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ যে সব স্থান ভৌগোলিক হিসাবে অব্যবহিত, প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক রদ-বদলের পর তাহাদিগকে লইয়া এমন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে যে, তাহার অন্তর্গত প্রতিটী ইউনিট হইবে স্বায়ত্তশাসনশীল ও সার্বভৌম। কোন বিশেষ স্থান এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইবে কিনা, তাহার নির্ণয় নির্ভর করিবে

---

1. See page 214.

৮ নং ছক

বৃটিশ ভারতের প্রদেশসমূহের লোকসংখ্যা

(লক্ষ হিসাবে ধরা হইয়াছে ও বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হইয়াছে)

প্রদেশ	মোট জনসংখ্যা	তপশীল বিমুক্ত হিন্দুগণ	তপশীলী সম্প্রদায়	মোট হিন্দু-সংখ্যা	মুসলমান	খৃষ্টান	শিখ	উপজাতি	অন্যান্য
মাদ্রাজ	৪৯৩·৪২	৩৪৭·৩১ (৭০·৪)	৮০·৬৮ (১৬·৩)	৪২৭·৯৯ (৮৬·৭)	৩৮·৯৭ (৭·৯)	২০·৪৬ (৪·১)	০·০৪ (০·০)	৫·৬২ (১·১)	০·৩৬
বোম্বাই	২০৮·৫০	১৪৭·০০ (৭০·৫)	১৮·৫৫ (৮·৯)	১৬৫·৫৫ (৭৯·৪)	১৯·২০ (৯·২)	৩·৭৫ (১·৮)	০·০৮ (০·০৪)	১৬·১৪ (৭·৭)	৩·৭৬
বাঙ্গলা	৬০৩·০৭	১৭৬·৮০ (২৯·৩)	৭৩·৭৯ (১২·২)	২৫০·৫৯ (৪১·৫)	৩৩০·০৫ (৫৪·৭)	১·৬৬ (০·২৮)	০·১৬ (০·০৩)	১৮·৮৯ (৩·১)	১·৭০
যুক্তপ্রদেশ	৫৫০·২১	৩৪০·৯৫ (৬২·০)	১১৭·১৭ (২১·১)	৪৫৮·১২ (৮৩·২)	৮৪·১৬ (১৫·৩)	১·৬০ (০·২৯)	২·৩২ (০·৪২)	২·৮৯ (০·৫০)	১·১১
পাঞ্জাব	২৮৪·১৯	৬৩·০২ (২২·১)	১২·৪৯ (৪·৪)	৭৫·৫১ (২৬·৫)	১৬২·১৭ (৫৭·০)	৫·০৫ (১·৭)	৩৭·৫৭ (১৩·২)	— —	৩·৮৯
বিহার	৩৬৩·৪০	২২১·৭৪ (৬১·০)	৪৩·৪০ (১১·৯)	২৬৫·১৪ (৭২·৯)	৪৭·১৬ (১২·৯)	০·৩৩ (০·১০)	০·১৩ (০·০৪)	৫০·৫৬ (১৩·৯)	০·০৬
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	১৬৮·১৪	৯৮·৮১ (৫৮·৮)	৩০·৫১ (১৮·১)	১২৯·৩২ (৭৬·৯)	৭·৮৪ (৪·৬)	০·৫৮ (০·৩৫)	০·১৫ (০·০৯)	২৯·৩৭ (১৭·৪)	০·৮৭
আসাম	১০২·০৫	৩৫·৩৭ (৩৪·৬)	৬·৭৬ (৬·৬)	৪২·১৩ (৪১·২)	৩৪·৪২ (৩৩·৭)	০·৪১ (০·৪০)	০·০৩ (০·০৩)	২৪·৮৫ (২৪·৩)	০·২০
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	৩০·৩৮	১·৮০ (৫·৯)	— —	১·৮০ (৫·৯)	২৭·৮৯ (৯১·৭)	০·১১ (০·৩৬)	০·৫৮ (১·৯)	— —	০·০০১

(৮ নং ছক জের)

উড়িষ্যা	৮৭·২৯	৫৫·৯৫ (৬৪·১)	১২·০৯ (১৪·১)	৬৮·০৪ (৭৮·২)	১·৪৬ (১·৬)	০·২৮ (০·০২)	০·০০২ (০·০)	১৭·২১ (১৯·৭)	০·০০৬
সিন্ধু	৪৫·০৫	১০·০৮ (২২·৯)	১·৯২ (৪·২)	১২·০০ (২৭·১)	৩২·০৮ (৭০·৭)	০·২০ (০·৪৫)	০·৩১ (০·৬৮)	০·৩৭ (০·৮১)	০·০৯
আজমীর মারোয়াড়	৫·৮৪	৩·৭৬ (৬৪·৫)	— —	৩·৭৬ (৬৪·৫)	০·৯০ (১৫·৪)	০·০৬ (০·৯৯)	০·০০৯ (০·১৫)	০·৯১ (১৫·৬)	০·১৯
আন্দামান নিকোবর	০·৩৪	০·০৮ (২৪·৯)	— —	০·০৮ (২৪·৯)	০·০৮ (২০·৭)	০·০৩ (৭·৭)	০·০০৭ (২·২)	০·১১ (৩২·৮)	০·০৩
বেলুচিস্থান	৫·০২	০·৪০ (৭·৯)	০·০৫ (০·৯)	০·৪৫ (৮·৮)	৪·৩৯ (৮৭·৫)	০·০৬ (১·২)	০·১২ (২·৩)	— —	০·০০১
কুর্গ	১·৬৯	১·০৫ (৬২·১)	০·২৬ (১৫·৩)	১·৩১ (৭৭·৪)	০·১৫ (৮·৭)	০·০৩ (২·০)	— —	০·২০ (১১·৬)	—
দিল্লী	৯·১৮	৪·৪৫ (৪৮·৪)	১·২৩ (১৩·৪)	৫·৬৮ (৬১·৭)	৩·০৫ (৩৩·২)	০·১৭ (১·৯)	০·১৬ (১·৭)	— —	০·১৫
পন্থ-পিপলোদা	০·০৫২	০·০৩৭ (৭১·২)	০·০০৯ (১৭·৩)	০·০৫ (৮৯·৭)	০·০০৩ (৪·৭)	০·০০২ (৪·১)	— —	০·০০০১২ (০·২২)	০·০০১
মোট	২,৯৫৮·০০	১৫০৮·৯০ (৫১·০)	৩৯৯·২০ (১৩·৫)	১৯০৮·১০ (৬৪·৫)	৭৯০·৯০ (২৬·৮)	৩৪·৮০ (১·১৯)	৪১·৬০ (১·৪১)	১৬৭·১০ (৫·৬৫)	১২·৪০ (০·৪২)

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তরের উপরঃ (১) এই স্থানটি মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য অপর কোন স্থানের সহিত সংলগ্ন কিনা? (২) এই ইউনিটে মুসলমান কি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়? (৩) প্রথম দুইটি সর্ত পূরণের পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণ আঞ্চলিক রদ-বদল সম্ভব হইবে কিনা? ইহা ছাড়াও, অঞ্চলের অন্তর্বর্তী প্রতিটী ইউনিট স্বায়ত্তশাসনশীল ও সার্বভৌম হওয়া চাই।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি দায়িত্বপূর্ণ পদাধিকারীরূপে বলিয়াছেন, দেশীয় রাজ্যসমূহ লাহোর-প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয় নয়। সে সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে মিঃ জিন্না বলেন, 'যে দেশীয় রাজ্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ ও গণনার যোগ্য, তাহাদের কোনটীই পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত নয়, সব কয়টীর অবস্থানই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেঃ যথা, কাশ্মীর, ভাওয়ালপুর, পাতিয়ালা প্রভৃতি। মুসলিম যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য এই রাজ্যগুলি যদি স্বেচ্ছায় সম্মত হয়, আমরা সানন্দে তাহাদের সহিত যুক্তিযুক্ত ও সম্মানজনক সর্তে আপোষ-রফা করিতে স্বীকৃত হইব। তাহাদের উপর বল প্রয়োগ করিবার অথবা অন্য কোন উপায়ে তাহাদিগকে প্রভাবিত করিবার কোনরূপ ইচ্ছা আমাদের নাই।'২ তাহার পর ১৯৪৪ সালে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সহিত আলোচনাপ্রসঙ্গে যখন জানিতে চাহিলেন, পূর্ব পরিকল্পনা মত কাশ্মীর পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইবে কিনা, মিঃ জিন্না তখন তাহার উত্তরে বলিলেন, এখন পাকিস্থান বলিতে কেবল সিন্ধু, বেলুচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব এই চারিটী প্রদেশকে বুঝাইবে। কাজেই মুসলিম অঞ্চল চিহ্নিত করিয়া লইবার সময় দেশীয় রাজ্যসমূহকে আমাদের বিচার-বিবেচনার বাহিরে রাখা প্রয়োজন।

কোন্ কোন্ এলাকা মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইবে, তাহা যে বাক্যটীর দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অর্থ কিছুটা জড়িত এবং বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সরকারী নথীপত্রে ব্যবহৃত শাসনতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থা-সম্মত পরিভাষার সহিত সম্পূর্ণরূপে পরিচয়হীন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইউনিট, রিজিয়ন, এরিয়া ও জোন প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। শব্দ কয়টীর কোনটীরই সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয় নাই এবং শাসনতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত সরকারী নথীপত্রে ইহাদের কোনটীরই উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। অধুনা প্রচলিত শব্দ হইতেছে প্রদেশ, জেলা, তশীল, তালুক, থানা প্রভৃতি। প্রস্তাবের রচয়িতাগণ স্বয়ং যদি প্রস্তাবটির অর্থ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া থাকিতেন ও মুসলমান অ-মুসলমান নির্বিশেষে সর্বসাধারণের সমক্ষে, এমনকি, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকটেও সুস্পষ্টরূপে সে অর্থ ব্যক্ত করিতে ইচ্ছুক হইতেন, তাহা হইলে প্রচলিত শব্দসমূহের সাহায্যেই তাহা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হইত। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, প্রস্তাবটি রচিত হইয়াছে দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় এবং পুনঃপুনঃ অনুরোধসত্ত্বেও তাহার বিস্তৃত বিবরণ ও তাৎপর্যের ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে অস্বীকার করা হইয়াছে। তাহার ফলে যে কতগুলি অননুমোদিত ব্যাখ্যারই উদ্ভব হইয়াছে তাহা নয়, বহুলোকের মনে সন্দেহেরও উদ্রেক হইয়াছেঃ তাঁহারা

2. Statement to Press, dated 1st April, 1940, printed in 'India's Problem of her future Constitution', P. 30.

প্রশ্ন করিতেছেন, এরূপ দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহৃত হইল কেন? ব্যবচ্ছেদ-প্রস্তাবের সমর্থকগণের মধ্যে ব্যবচ্ছেদের আকার ও প্রকার সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা বিদ্যমানঃ একপক্ষ চান, ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মত অতিমাত্রায় মুসলমান সংখ্যাগুরুত্বসম্পন্ন সংকীর্ণ এলাকায় একজাতীয় মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করিতে এবং অপরপক্ষ ইচ্ছা করেন, মুসলমানগণ স্বল্প পরিমাণ সংখ্যাগুরুত্ব-সম্পন্ন হইলেও, তাহাদের দ্বারা অধ্যুষিত বিস্তীর্ণতর অঞ্চল স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে লইয়া আসিতে; ব্যবচ্ছেদ-ব্যবস্থার সমর্থকগণের মধ্যে বিদ্যমান এই মতবিরোধ গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যেই কি দ্ব্যর্থবোধক ভাষার প্রয়োগ প্রয়োজন হইয়াছে? অথবা সমগ্র পরিকল্পনাটি সর্বসাধারণের দৃষ্টি ও সমালোচনার সম্মুখে অনাবৃত করিয়া স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই? কোন্ কোন্ স্থান মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং কোন্‌গুলিই বা হইবে না, তাহা খুলিয়া বলিতে এই অনিচ্ছার হেতু কি? যথাসময়ে ও যথাক্ষেত্রে যাহা সুষ্ঠু ও সুবিচারসম্মত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাই বসাইয়া লওয়া হইবে—এই উদ্দেশ্যেই কি দ্ব্যর্থবোধক শব্দের সাহায্যে প্রয়োজনীয় স্থান শূন্য রাখা হইয়াছে? কিম্বা অ-মুসলমানগণ ভারত-বিভাগের প্রস্তাব নীতিগতভাবে একবার মানিয়া লইলে, সীমা নির্ধারণের সময় বিশ্বাসভঙ্গ অভিযোগে অভিযুক্ত হইবার আশংকায় লীগের দাবী অনুযায়ী বিনা প্রশ্নে যে-কোন অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইবেন—ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস? প্রচলিত শব্দ পরিহার করিয়া দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করিবার পশ্চাতে যে-কোন উদ্দেশ্যই থাকুক বা না কেন, তাহা যে সিদ্ধ হয় নাই—ইহা অতি সত্য কথা। ভাষার আঙ্গিক ও গঠনভঙ্গীর দিক দিয়া বিচার করিলে, প্রস্তাবটি হইতে একটিমাত্র অর্থই নিঃসন্দেহে নির্গলিত হইয়া বাহির হইয়া আসে এবং তাহা হইতেছে এইঃ যে অঞ্চল মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় তাহা মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে না এবং কোন অঞ্চল মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে হইলে মুসলমানপ্রধান অপর কোন অঞ্চলের সহিত তাহাকে অব্যবহিত হইতে হইবে।

এই আর্যা অনুযায়ী আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিব, উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের সহিত যুক্ত হইয়া কোন্ কোন্ দেশ স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে। জেলাসমূহসহ প্রত্যেক প্রদেশের কথা আমরা একে একে বিচার করিয়া দেখিতে চাই।

(১) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল

১৯৪১ সালে ভারতের লোকগণনার হিসাব (বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হারসহ) নিম্নে দেওয়া হইল।

৯ নং ছক

সিন্ধু জেলাসমূহ	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট জনসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান	ভারতীয় খৃষ্টান	উপজাতি	অন্যান্য
দাদু	৭,০৭০	৩,৮৯,৩৮০	৫৮,৩৭২ (১৪·৯৯)	৩,২৯,৯৯১ (৮৪·৭৪)	৭৪ (০·২৬)	১৫৪	৭৮৯
হায়দ্রাবাদ	৪,৪৭৬	৭,৫৮,৭৪৮	২,৪৫,৮৪৯ (৩২·৪০)	৫,০৭,৬২০ (৬৬·৯০)	৪৯০ (০·৬৯)	৭৬৯	৪,০২০
করাচি	৮,৩৫৭	৭,১৩,৯০০	২,২২,৫৯৭ (৩১·১৮)	৪,৫৭,০৩৫ (৬৪·০০)	১১,৩১০ (৪·৮০)	৮৮৪	২২,০৭৪
লার্কানা	২,৮৫৭	৫,১১,২০৮	৯১,০৬২ (১৭·৮১)	৪,১৮,৫৪৩ (৮১·৮৫)	৪৯ (০·০১)	—	১,৫৫৪
নবাবশাহ	৩,৯০৮	৫,৮৪,১৭৮	১,৪০,৪২৮ (২৪·০৪)	৪,৩৬,৪১৪ (৭৪·৭২)	২১২ (১·২৫)	১,০২৬	৫,৭৯৮
সুক্কুর	৫,৫৫০	৬,৯২,৫৫৬	১,৯৫,৪৫৮ (২৮·২২)	৪,৯১,৬৩৪ (৭০·৯৮)	২৭৭ (০·৭৪)	৫১	৫,১৩৬
থার-পার্কার	১৩,৬৪৯	৫,৮১,০০৪	২,৪৭,৪৯৬ (৪২·৫৮)	২,৯২,০২৫ (৫০·২৬)	৮০০ (৭·১৪)	৩৩,৬৩৫	৭,০৪৮
উত্তর-সিন্ধু সীমান্ত	১,৯৬৯	৩,০৪,০০৪	২৮,৬৬৪ (৯·৪২)	২,৭৫,০৬৩ (৯০·৪৭)	২০ (০·১০)	—	২৮৭
মোট	৪৮,১৩৬	৪৫,৩৫,০০৮	১২,২৯,৯২৬ (২৭·১২)	৩২,০৮,৩২৫ (৭০·৭৫)	১৩,২০২ (২·১০)	৩৬,৮১৯	৪৬,৭০৬

১০ নং ছক

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ জেলাসমূহ	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট জনসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান	ভারতীয় খৃষ্টান	অন্যান্য
হাজরা	৩,০০০	৭,৯৬,২৩০	৩০,২৬৭ (৩·৮০)	৭,৫৬,০৩৪ (৯৪·৯৪)	৩১৪ (১·২৫)	৯,৬৪৫
মর্দান	১,০৯৮	৫,০৬,৫৩৯	১০,৬৭৭ (২·১০)	৪,৮৩,৫৭৫ (৯৫·৪৬)	৩৭৬ (২·৪২)	১১,৯১১
পেশোয়ার	১,৫৪৭	৮,৫১,৮৩৩	৫১,২১২ (৬·০১)	৭,৬৯,৫৮৯ (৯০·৩৪)	৩,৩৯৭ (০·৬৪)	২৭,৬৩৫
কোহাট	২,৭০৭	২,৮৯,৪০৪	১৭,৫২৭ (৬·০৬)	২,৬৬,২২৪ (৯১·৯৯)	৫৯৬ (১·৯৫)	৫,০৫৭
বান্নু	১,৬৯৫	২,৯৫,৯৩০	৩১,৪৭১ (১০·৬৩)	২,৫৭,৬৪৮ (৮৭·০৬)	৪৬৭ (২·৩০)	৬,৩৪৪
ডেরা-ইসমাইল খাঁ	৪,২১৬	২,৯৮,১৩১	৩৯,১৬৭ (১৩·১৪)	২,৫৫,৭৫৭ (৮৫·৭৮)	২৭৬ (১·০৭)	২,৯৩১
মোট	১৪,২৬৩	৩০,৩৮,০৬৭	১,৮০,৩২১ (৫·৯৪)	২৭,৮৮,৭৯৭ (৯১·৭৯)	৫,৪২৬ (২·২৬)	৬৩,৫২০

১১ নং ছক

বেলুচিস্থান জেলাসমূহ	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট জনসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান	ভারতীয় খৃষ্টান	অন্যান্য
কোয়েটা পিশিন	৫,৩১০	১,৫৬,২৮৯	২৮,৬২৯ (১৮·৩২)	১,১৩,২৮৮ (৭২·৪৮)	২,২৯৬ (৯·১৯)	১২,০৭৬ ...
লোরালাই	৭,৩৭৫	৮৩,৬৮৫	৩,১২৯ (৩·৭৪)	৭৯,২৭৩ (৯৪·৭৩)	১১৮ (১·৫৩)	১,১৬৫ ...
জোহোব	১০,৪৭৮	৬১,৪৯৯	৪,২৮৬ (৬·৯৭)	৫৫,৯৮৭ (৯১·০৪)	৭৮ (১·৯৯)	১,১৪৮ ...
বোলান	৪০৭	৬,০০৯	৯৫০ (১৫·৮১)	৪,৮১২ (৮০·০৮)	২২ (৪·১১)	২২৫ ...
চাগাই	১৯,৪২৯	২৯,২৫০	১,২০৪ (৪·১২)	২৭,৮৬৪ (৯৫·২৬)	১ (০·৬২)	১৮১
সিবি	১১,৪৫৭	১,৬৪,৮৯৯	৬,৪২৫ (৩·৮৯)	১,৫৭,৭০৬ (৯৫·৬৩)	১১৮ (০·৪৬)	৬৫০
মোট	৫৪,৪৫৬	৫,০১,৬০১	৪৪,৬২৩ (৮·৮৯)	৪,৩৮,৯৩০ (৮৭·৫১)	২,৬৩৩ (৩·৬০)	১৫,৪৪৫

উপরের হিসাবে, ৯নং ছকে 'অন্যান্য' বলিতে বুঝাইবে শিখ, ৩১,০১১, অর্থাৎ শতকরা ·৬৮ ভাগ; অভারতীয় খৃষ্টান ৬,৯৭৭; জৈন ৩,৬৮৭; পার্শী ৩,৮০৮; বৌদ্ধ ১১১; ইহুদী ১,০৮২; মোট ৪৬,৭০৬। এই সম্প্রদায়গুলির জনসংখ্যার হিসাব জেলা অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে দেখান হয় নাই। (শেষ তিন সারির সাধারণ শতকরা হার একত্রে)।

১০নং ছকে 'অন্যান্য' বলিতে বুঝাইবে শিখ ৫৭,৯৩৯, অর্থাৎ শতকরা ১·৯১, ভারতীয় খৃষ্টান বাদে খৃষ্টান ৫,৪৬৩, বৌদ্ধ ২৫, ইহুদী ৭১; জৈন ১; পার্শী ২৪—মোট ৬৩,৫২৩।

১১নং ছকে 'অন্যান্য' বলিতে বুঝাইবে শিখ ১১,৯১৮, অর্থাৎ শতকরা ২·০৮, ভারতীয় খৃষ্টান বাদে খৃষ্টান ৩,৩৬৯, জৈন ৭, পার্শী ৭৫, বৌদ্ধ ৪৩; ইহুদী ১৯ ও অন্যান্য ১৪,—মোট ১৫,৪৪৫।

উপরের হিসাবগুলিতে চোখ বুলাইবামাত্র দেখা যাইবে, সিন্ধুর কোন জেলাই অ-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। পক্ষান্তরে প্রতি জেলাতেই মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ; তাঁহাদের সর্বোচ্চ সংখ্যাগুরুত্ব উত্তর-সিন্ধু সীমান্ত জেলায় ৯০·৪৭ এবং সর্বনিম্ন সংখ্যাগরিষ্ঠতা থারপার্কার জেলায় ৫০·২৬। সমগ্র প্রদেশে সাম্প্রদায়িক জনসংখ্যার অনুপাত—মুসলমান শতকরা ৭০·৭৫, হিন্দু ২৭·১২ এবং শিখ, খৃষ্টান জৈন, বৌদ্ধ, ইহুদী, উপজাতি প্রভৃতি ২·১৩; তম্মধ্যে কেবলমাত্র শিখ জনসংখ্যাই মোট লোকসংখ্যার ০·৬৮। প্রদেশটি সমগ্রভাবে বেলুচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের সহিত সংলগ্ন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেরও প্রতি জেলাতে মুসলমানগণ সংখ্যাধিক এবং সেই সংখ্যাধিক্যের সর্বোচ্চহার মর্দান জেলায়—৯৫·৪৬ ও সর্বনিম্নহার ডেরা-ইসমাইলখাঁ জেলায়—৮৫·৭৮। মুসলমানগণ সমগ্র প্রদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯১·৭৯ ভাগ, হিন্দু ৫·৯৪ এবং অবশিষ্ট ২.২৬; তন্মধ্যে শিখগণ মোট জনসংখ্যার শতকরা ১·৯১ ভাগ। প্রদেশটি বেলুচিস্থান, সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাবের সহিত অব্যবহিত।

বেলুচিস্থানেরও প্রত্যেক জেলাতে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়; সে গরিষ্ঠতার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন হার যথাক্রমে ৯৫·৬৩ ও ৭২·৪৮ পরিদৃষ্ট হয় সিবি জেলায় ও কোয়েটাপিশিন জেলায়। মুসলমানগণ সমগ্র প্রদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৭.৫১, হিন্দু ৮·৮৯ ও অন্যান্য ৩·৬০; তন্মধ্যে শিখগণ মোট জনসমষ্টির শতকরা ২·০৮ ভাগ। প্রদেশ হিসাবে ইহাও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও পাঞ্জাবের সহিত সংলগ্ন।

কাজেই লাহোর-প্রস্তাবে বর্ণিত আর্যা অনুযায়ী বৃটিশ ভারতের এই তিনটি প্রদেশ যে উত্তর-পশ্চিম ভারতের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই।

কিন্তু নিম্নে প্রদত্ত ১৯৪১ সালের গণনার হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে, পাঞ্জাবের অবস্থা ইহা হইতে পৃথক।

ছক নং ১২ (ক)

বিভাগ বা জেলা	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট জনসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান	খৃষ্টান	শিখ	অন্যান্য
আম্বালা বিভাগ							
হিসার	৫,২১৩	১০,০৬,৭০৯	৬,৫২,৬৭৬ (৬৪·৮৩)	২,৮৫,২০৮ (২৮·৩৩)	১,২৯২ (০·১৩)	৬০,৭৩১ (৬·০৩)	৬,৮০২ (০·৬৭)
রোটক	২,২৪৬	৯,৫৬,৩৯৯	৭,৮০,৪৭৪ (৮১·৬১)	১,৬৬,৫৬৯ (১৭·৪২)	১,০৪৩ (০·১১)	১,৪৬৬ (০·১৫)	৬,৮৪৭ (০·৭১)
গুরগাঁও	২,২০৪	৮,৫১,৪৫৮	৫,৬০,৪৯৮ (৬৫·৮৫)	২,৮৫,৯৯২ (৩৩·৫৬)	১,৬৭৩ (০·২০)	৬৩৭ (০·০৭)	২,৬৫৮ (০·৩১)
কর্ণাল	৩,১২৬	৯,৯৪,৫৭৫	৬,৬৬,০০৬ (৬৬·৯৭)	৩,০৪,৩৪৬ (৩০·৬৮)	১,২৪৯ (০·১৩)	১৯,৮৮৭ (২·০০)	৩,০৫৭ (০·৩০)
আম্বালা	১,৮৫১	৮,৪৭,৭৪৫	৪,১০,৩৩৩ (৪৮·৪০)	২,৬৮,৯৯৯ (৩১·৭৩)	৬,০৬৫ (০·৭১)	১,৫৬,৫৪৩ (১৮·৪৬)	৫,৮০৫ (০·৬৮)
সিমলা	৮০	৩৮,৫৭৬	২৯,৪৬৬ (৭৬·৩৮)	৭,০২২ (১৮·২০)	৯৩৪ (২·৪২)	১,০০২ (২·৬৭)	১২২ (০·৩২)
মোট	১৪,৭৬০	৪৬,৯৫,৪[illegible]২	৩০,৯৯,৪৮৩ (৬৬·০১)	১৩,১৮,১৩৬ (২৮·০৭)	১২,২৫৬ (০·২৬)	২,৪০,২৯৬ (৫·১২)	২৫,২৯১ (০·৫৪)

ছক নং ১২ (খ)

বিভাগ বা জেলা	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট জনসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান	খৃষ্টান	শিখ	অন্যান্য
জলন্ধর বিভাগ	৯,৯৭৯	৮,৯৯,৩৭৭	৮,৩৮,৪৭৯	৪৩,২৪৯	৭০৮	৪,৮০৯	১২,০৫২
কাংগরা			(৯৩·২৩)	(৪·৮১)	(০·০৯)	(০·৫৩)	(১·৩৪)
হোসিয়ারপুর	২,১৯৫	১১,৭০,৩২৩	৪,৬৮,২২৫	৩,৮০,৭৫৯	৬,১৬৫	১,৯৮,১৯৪	১,১৬,৯৮০
			(৪০·০১)	(৩২·৫৩)	(০·৫৩)	(১৬·৯৪)	(৯·৯৯)
জলন্ধর	১,৩৩৪	১১,২৭,১৯০	১,[illegible]৮,১৬০	৫,০৯,৮০৪	৬,২০০	২,৯৮,৭৪১	১,১৪,২৫২
			(১৭·৫৯)	(৪৫·২৩)	(০·৫৫)	(২৬·৫০)	(১০·১৩)
লুধিয়ানা	১,৩০৯	৮,১৮,৬১৫	১,৬৬,৬৭৮	৩,০২,৪৮২	১,৯১৩	৩,৪১,১৭৫	৬,৩৬৭
			(২০·৩৬)	(৩৬·৯৫)	(০·২৩)	(৪১·৬৮)	(০·৭৮)
ফিরোজপুর	৪,০৮৫	১৪,২৩,০৭৬	২,৭৯,২৬০	৬,৪১,৪৪৮	১২,৬০৭	৪,৭৯,৪৮৬	১০,২৭৫
			(১৯·৬২)	(৪৫·০৭)	(০·৮৯)	(৩৩·৬৯)	(০·৭২)
মোট	১৮,৯৯২	৫৪,৩৮,৫৮১	১৯,৫০,৮০২	১৮,৭৭,৭৪২	২৭,৭০৬	১৩,২২,৪০৫	২,৫৯,৯২৬
			(৩৫·৮৭)	(৩৪·৫৩)	(০·৫১)	(২৪·৩১)	(৪·৭৮)

ছক নং ১২ (গ)

লাহোর বিভাগ	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট জনসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান	খৃষ্টান	শিখ	অন্যান্য
অমৃতসর	১,৫৭২	১৪,১০,৮৭৬	২,১৬,৭৭৮ (১৫·৩৩)	৬,৫৭,৬৯৫ (৪৬·৫২)	২৫,৯৭৩ (১·৮৪)	৫,১০,৮৪৫ (৩৬·১৩)	২,৫৮৫ (০·১৮)
লাহোর	২,৫৯৫	১৬,৯৫,৩৭৫	২,৮৪,০৫১ (১৬·৭৭)	১০,২৭,৭৭২ (৬০·৬২)	৭০,১৪৭ (৫·১৪)	৩,১০,৬৪৬ (১৮·৩২)	২,৪৫৯ (০·১৫)
গুরুদাসপুর	১,৮৪৬	১১,৫৩,৫১১	২,৮৩,১৯২ (২৪·৫৫)	৫,৮৯,৯২৩ (৫১·১৪)	৫১,৫২২ (৪·৪৭)	২,২১,২৬১ (১৯·১৮)	৭,৬১৩ (০·৬৬)
শিয়ালকোট	১,৫৭৬	১১,৯০,৪৯৭	২,৩১,১১৪ (১৯·৪১)	৭,৩৯,২১৮ (৬২·০৯)	৭৫,৮৩১ (৬·৩৭)	১,৩৯,৪০৯ (১১·৭১)	৪,৯২৫ (০·৪১)
গুজরাণওয়ালা	২,৩১১	৯,১২,২৩৪	১,০৭,৪৮৭ (১১·৮৩)	৬,৪২,৭০৬ (৭০·৪৫)	৬০,৮২৯ (৬·৬৭)	৯৯,১৩৯ (১০·৮৭)	১,৬৭৩ (০·১৮)
শেখুপুরা	২,৩০০	৮,৫২,৫০৮	৭৭,৭৪০ (৯·১২)	৫,৪২,৩৪৪ (৬৩·৬২)	৬০,০৫৪ (৭·০৪)	১,৬০,৭০৬ (১৮·৮৫)	১১,৬৬৪ (১·৩৭)
মোট	১২,২০৩	৭২,১৮,০০১	১২,০১,০৬২ (১৬·৬৪)	৪১,৯৯,৬৫৮ (৫৮·১৮)	৩,৪৪,৩৫৬ (৪·৭৭)	১৪,৪২,০০৬ (১৯·৯৮)	৩০,৯১৯ (০·৪৩)

ছক নং ১২ (ঘ)

রাওয়ালপিণ্ডি বিভাগ	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট জনসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান	খৃস্টান	শিখ	অন্যান্য
গুজরাট	২,২৬৬	১১,০৪,৯৫২	৮৪,৬৮০ (৭·৬৬)	৯,৪৫,৬০৯ (৮৫·৫৮)	৪,৪৪৯ (০·৪০)	৭০,২৩৩ (৬·৩৬)	১৮ (০·০০)
শাহপুর	৪,৭৭০	৯,৯৮,৯২১	১,০০,৭০৮ (১০·০৮)	৮,৩৫,৯১৮ (৮৩·৬৮)	১২,৭৭০ (১·২৮)	৪৮,০৪৬ (৪·৮০)	১,৪৭৯ (০·১৫)
ঝিলম্	২,৭৭৪	৬,২৯,৬৫৮	৪০,৮৭৯ (৬·৪৯)	৫,৬৩,০৩৩ (৮৯·৪২)	৮৯০ (০·২৪)	২৪,৬৮০ (৩·৯২)	১৭০ (০·০২)
রাওয়ালপিণ্ডি	২,০২২	৭,৮৫,২৩১	৮২,৪৬০ (১০·৫০)	৬,২৮,১৯৩ (৮০·০০)	৯,০১৪ (১·১৫)	৬৪,১২৭ (৮·১৭)	১,৪০৪ (০·১৮)
আটক	৪,১৪৮	৬,৭৫,৮৭৫	৪০,১৯০ (৬·৩৯)	৬,১১,১২৮ (৯০·৪২)	১,৩৯২ (০·২১)	২০,১২০ (২·৯৭)	৪৫ (০·০১)
মিয়ানওয়ালী	৫,৪০১	৫,০৬,৩২১	৬২,৭৮৭ (১২·৪০)	৪,৩৬,২৬০ (৮৬·১৬)	৩৫৮ (০·০৭)	৬,৮৬৫ (১·৩৬)	৫১ (০·০১)
মোট	২১,৩৮১	৪৭,০০,৯৫৮	৪,১৮,৬৭০ (৮·৮২)	৪০,২০,১৪১ (৮৫·৫২)	২৮,৮৭৬ (০·৬১)	২,৩৪,০৭১ (৪·৯৮)	৩,২০০ (০·০৭)

ছক নং ১২ (ঙ)

মুলতান বিভাগ	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট জনসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান	খৃষ্টান	শিখ	অন্যান্য
মণ্টগোমারী ...	৪,২০৪	১৩,২৯,১০৩	১,৯১,১৮২ (১৪·৩৮)	৯,১৮,৫৬৪ (৬৯·১১)	২৪,৪৩২ (১·৮৪)	১,৭৫,০৬৪ (১৩·১৭)	১৯,৮৬১ (১·৪৯)
লায়ালপুর ...	৩,৫২২	১৩,৯৬,৩০৫	১,৬২,২৯৫ (১১·৬২)	৮,৭৭,৫১৮ (৬২·৮৫)	৫১,৯৪৮ (৩·৭২)	২,৬২,৭৩৭ (১৮·৮২)	৪১,৮০৭ (২·৯৯)
ঝাং ...	৩,৪১৫	৮,২১,৬৩১	১,২৯,৭৯১ (১৫·৮০)	৬,৭৮,৭৩৬ (৮২·৬১)	৭৬৩ (০·০৯)	১২,২০৮ (১·৪৯)	১০৩ (০·০১)
মুলতান ...	৫,৬৫৩	১৪,৮৪,৩৩৩	২,৪২,৯৮৭ (১৬·৩৭)	১১,৫৭,৯১১ (৭৮·০১)	১৪,২৯০ (০·৯৬)	৬১,৬২৮ (৪·১৫)	৭,৫১৭ (০·৫১)
মুজাফরগড় ...	৫,৬০৫	৭,১২,৮৪৯	৯০,৫৪৭ (১২·৭০)	৬,১৬,০৭৪ (৮৬·৪২)	২২৭ (০·০৩)	৫,৮৮২ (০·৮২)	১১৯ (০·০২)
ডেরাগাজিখাঁ ...	৯,৩৬৪	৫,৮১,৩৫০	৬৭,৩৯৩ (১১·৫৯)	৫,১২,৬৭৮ (৮৮·১৯)	৮৭ (০·০১)	১,০৭২ (০·১৮)	১২০ (০·০২)
বালোচ সীমান্ত অঞ্চল ...		৪০,২৮৬	১৬০ (০·৩৯)	৪০,০৮৪ (৯৯·৬০)	—— ——	২ (০·০)	—— ——
মোট ...	৩১,৭৬৩	৬৩,৬৫,৮১৭	৮,৮৪,৩৫৫ (১৩·৮৯)	৪৮,০১,৫৬৫ (৭৫·৭৩)	৯১,৭৪৭ (১·৪৪)	৫,১৮,৬২৩ (৮·১৫)	৬৯,৫২৭ (১·০৯)
প্রদেশের সর্বমোট	৯৯,০৮৯	২,৮৪,১৮,৮১৯	৭৫,৫০,৩৭২ (২৬·৫৭)	১,৬২,১৭,২৪২ (৫৭·০৬)	৫,০৪,৯৪১ (১·৭৮)	৩৭,৫৭,৪০১ (১৩·২২)	৩,৮৮,৮৬৩ (১·৩৭)

পাঞ্জাবের মুসলমান-প্রধান ও অমুসলমান-প্রধান জেলাসমূহ

বিভাগ অথবা জেলা	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট জনসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান	খৃষ্টান	শিখ	অন্যান্য	মোট অমুসলমান জনসংখ্যা
মুসলমানপ্রধান জেলাসমূহ								
রাওয়ালপিণ্ডি বিভাগ	২১,৩৮১	৪৭,০০,৯৫৮	৪,১৪,৬৭০ (৮·৮২)	৪০,২০,১৪১ (৮৫·৫২)	২৮,৮৭৬ (০·৬১)	২,০৪,০৭১ (৪·১৮)	৩,২০০ (০·০৭)	৬,৮০,৮১৭ (১৪·৪৮)
মুলতান বিভাগ	৩১,৭৬৩	৬৩,৬৫,৮১৭	৮,৮৪,৩৫৫ (১৩·৮৯)	৪৮,০১,৫৬৫ (৭৫·৪৩)	৯১,৭৪৭ (১·৪৪)	৫,১৮,৬২৩ (৮·১৫)	৬৯,৫২৭ (১·০৯)	১৫,৬৪,২৫২ (২৪·৫৭)
লাহোর বিভাগ বাদ অমৃতসর	১০,৬৩০	৫৮,০৪,১২৫	৯,৮৪,২৮৪ (১৬·৯৬)	৩৫,৪১,৯৬৩ (৬১·০২)	৩,১৮,৩৮৩ (৫·৪৯)	৯,৩১,১৬১ (১৬·০৪)	২৮,৩৩৪ (০·৪৯)	২২,৬২,১৬২ (৩৮·৯৮)
মোট	৬৩,৭৭৪	১,৬৮,৭০,৯০০	২২,৮৩,৩০৯ (১৩·৫৩)	১,২৩,৬৩,৬৬৯ (৭৩·২৯)	৪,৩৯,০০৬ (২·৬০)	১৬,৮৩,৮৫৫ (৯·৯৮)	১,০১,০৬১ (০·৬০)	৪৫,০৭,২০১ (২৬·৭১)
অমুসলমান-প্রধান জেলাসমূহ								
আম্বালা বিভাগ	১৪,৭৫০	৪৬,৯৫,৪৬২	৩০,৯৯,৪৮৩ (৬৬·০১)	১৩,১৮,১৩৬ (২৮·০৭)	১২,২৫৬ (০·২৬)	২,৪০,২৯৬ (৫·১২)	২৫,২৯১ (০·৫৪)	৩৩,৭৭,৩২৬ (৭১·৯৩)
জলন্ধর বিভাগ	১৮,৯৯২	৫৪,৩৮,৫৮১	১৯,৫০,৮০২ (৩৫·৮৭)	১৮,৭৭,৭৪২ (৩৪·৫৩)	২৭,৭৩৬ (০·৫১)	১৩,২২,৪০৫ (২৪·৩১)	২,৫৯,৯২৬ (৪·৭৮)	৩৫,৬০,৮৩৯ (৬৫·৪৭)
অমৃতসর বিভাগ	১,৫৭২	১৪,১৩,৮৭৬	২,১৬,৭৭৮ (১৫·৩৩)	৬,৫৭,৬৯৫ (৪৬·৫২)	২৫,৯৭৩ (১·৮৪)	৫,১০,৮৪৫ (৩৬·১৩)	২,৫৮৫ (০·১৮)	৭,৫৬,১৮১ (৫৩·৪৮)
মোট	৩৫,৩১৪	১,১৫,৪৭,৯১৯	৫২,৬৭,০৬৩ (৪৫·৬১)	৩৮,৫৩,৫৭৩ (৩৩·৩৫)	৬৫,৯৩৫ (০·৫৭)	২০,৭৩,৫৪৬ (১৭·৯৬)	২,৮৭,৮০২ (২·৪৯)	৭৬,৯৪,৩৪৬ (৬৬·৬৩)

উল্লিখিত হিসাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার পূর্বে লক্ষ্য করা কর্তব্য যে, 'অন্যান্য' স্তম্ভে যাঁহারা স্থান পাইয়াছেন তাঁহারা হইতেছেন আদিধর্মী, জৈন, পার্শী, ইহুদী ও সেইসব সংহতি, যাঁহারা বিশেষ কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। ই'হাদের মধ্যে আদিধর্মীরাই সর্বাপেক্ষা সংখ্যাধিক। সেন্সাস কমিশনারের মতে তাঁহারা তপশীলী সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও, হিন্দু বলিয়া নিজদিগকে দাবী করেন না; সেইজন্য তাঁহারা যে কেবল হিন্দুসমাজ হইতেই বাদ পড়িলেন তাহা নয়, তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় হইতেও বহিষ্কৃত হইয়া স্বতন্ত্র স্তম্ভে স্থানলাভ করিলেন। পাঞ্জাবে তাঁহাদের সংখ্যা ৩,৪৩,৬৮৫, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ১·২১ ভাগ। জলন্ধর বিভাগে তাঁহাদের জনসংখ্যা ২,৫০,২৬৭ অর্থাৎ ঐ বিভাগের মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৪·৬০ ভাগ; এইস্থানেই তাঁহারা সর্বাপেক্ষা সংখ্যা-বহুল। সংখ্যাধিক্যের দিক দিয়া তাহার পরেই আসে মুলতান ও লাহোর বিভাগ; ঐ দুই স্থানে তাঁহাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৬৮,৬৪১ ও ২০,৪৮৮। আম্বালা ও রাওয়ালপিণ্ডি বিভাগে তাঁহারা সংখ্যায় নগণ্য—যথাক্রমে ২,৭৯৫ ও ১,৫৩৪। ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেখান হইয়াছে, 'ধর্মের দিক দিয়া বর্তমান লোকগণনার বৈশিষ্ট্য হইতেছে, চামার, চুব্‌রা ও আরও অন্যান্য অস্পৃশ্য সম্প্রদায় কর্তৃক আদিধর্মী উপাধি গ্রহণ। পূর্ববর্তী লোকগণনায় চুব্‌রাগণ বিশেষ কোন ধর্মের নামোল্লেখ না করিলে, হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছে।' উক্ত সেন্সাস রিপোর্টে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, আদিধর্মী নামে যাহারা লিপিবদ্ধ, তাহারা হিন্দু বলিয়া আপনাদিগকে দাবী করিলেও, তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের লোকরূপে নিজদিগকে গণনা করিয়া থাকে। এইরূপে সর্বশেষ দুইটি সেন্সাস আদিধর্মীদিগকে হিন্দু সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া ঐ প্রদেশে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস করিতে সক্ষম হইয়াছে।

পাঞ্জাবের লোকগণনার হিসাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা যেমন অত্যধিক, মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে শতকরা ৭০·৭৫, ৯১·৭৯ ও ৮৭·৫১ ভাগ, পাঞ্জাবে কিন্তু সে সংখ্যাধিক্য নাম মাত্র, প্রদেশের মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৫৭·০৬ ভাগ। আবার পাঞ্জাবের প্রতি বিভাগ ও জেলা মুসলমানপ্রধান নয়, বরঞ্চ সেখানে এমন অনেক বিভাগ ও জেলা আছে, অ-মুসলমানগণ যেখানে অতিশয় সংখ্যাগুরু। লীগের লাহোর প্রস্তাবে 'Numerically in a Majority' অর্থাৎ 'সংখ্যাগত হিসাবে অধিক' মাত্র এই বাক্যাংশটুকু ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু সে আধিক্যের পরিমাণ নিরূপণের নিমিত্ত কোন গুণবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। কাজেই সে আধিক্য অতিমাত্রায় ও নামে মাত্র উভয়ভাবেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে ও হেতুতে ব্যবচ্ছেদ বাসনা করা হইয়া থাকে—তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিলে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া পারা যায় না যে, সংখ্যাধিক্য বলিতে অতিমাত্রায় আধিক্যের কথাই মনে মনে সাব্যস্ত করা হইয়াছে, নামমাত্র আধিক্যের কথা নয়। ব্যবচ্ছেদ-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইতেছে মুসলমানদিগকে তাঁহাদের আপন আদর্শ অনুযায়ী নিজদিগকে

বিকশিত করিয়া তুলিবার সুযোগ দেওয়া। যে যুক্তিবলে তাঁহারা এই বিশেষ সুযোগের দাবী করিয়া থাকেন, তাহা হইল এই যে, তাঁহারা এক স্বতন্ত্র জাতিরূপে সংস্কৃতি ও ধর্ম, সমাজ-জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গী—সকল দিক দিয়া এদেশের অন্যান্য অধিবাসিগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; এই কারণেই তাঁহাদের এমন এক স্বতন্ত্র বাসভূমি প্রয়োজন, যেখানে তাঁহারাই হইবেন সার্বভৌম। কিন্তু নামেমাত্র সংখ্যাধিক্যের ক্ষেত্রে মুসলমান-গণ তাঁহাদের আপন আদর্শ অনুযায়ী আত্মবিকাশ লাভ করিতে সক্ষম হইবেন না, কারণ সেখানকার শক্তিশালী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলমান সমাজের মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, স্বীয় আদর্শ অনুযায়ী আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিবার সহজ ও স্বাভাবিক অধিকার দাবী করিবে। কেবলমাত্র পৃথক ধর্ম ও তজ্জনিত পৃথক সংস্কৃতি, সমাজ-জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গীর যুক্তিতে নামেমাত্র সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যদি স্বতন্ত্র বাসভূমির জন্য দাবী করিতে পারেন, তাহা হইলে নামেমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও স্বতন্ত্র বাসভূমির জন্য দাবী করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী এবং ন্যায় ও নীতিগত বিচারে সে অধিকার হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা চলে না। ইহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের চারিটি প্রদেশের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য আছে, এ কথা স্বীকার করিয়াই লাহোর প্রস্তাবে দাবী করা হইয়াছিল, যে সকল ইউনিট লইয়া স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হইবে, তাহাদের প্রত্যেকটি হইবে স্বায়ত্তশাসনশীল ও সার্বভৌম। একটি বৃহত্তর রাষ্ট্রের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদানগুলি যে কিরূপে সার্বভৌম হইতে পারে, সে প্রশ্নের বিচার উপস্থিত স্থগিত রাখিয়া, আমরা যদি ইউনিটসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের কার্যে মনোনিবেশ করি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইব যে, প্রত্যেকটি ইউনিটকে তাহার আপন আপন আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা পরিচালনের জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভর হইতে হইবে। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে, স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলির শাসন-ব্যবস্থা যদি গণতান্ত্রিক হয়, অর্থাৎ, জাতি, ধর্ম ও বর্ণনির্বিশেষে নাগরিক সাধারণ যদি দেশের শাসনতন্ত্র বলে শাসনপরিষদ গঠন ও তদ্দ্বারা আপনাদের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী দেশ শাসন-কার্য পরিচালন করিবার অধিকার লাভ করে, তাহা হইলে সেই রাষ্ট্রের অন্তর্গত নামে-মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে স্বমতে ও স্বীয় আদর্শ অনুযায়ী শাসন-ব্যবস্থা পরিচালন করা অসম্ভব না হইলেও, দুষ্কর হইবে। অতএব সম্পূর্ণরূপে ন্যায় ও নীতিসঙ্গতভাবে একথা বলা চলে যে, বর্তমান আকারে গঠিত পাঞ্জাব প্রদেশ নামেমাত্র মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, মুসলমানগণ সেখানকার মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৫৭ ভাগ; এরূপ ক্ষেত্রে লাহোর প্রস্তাবে উল্লিখিত সর্ত সে পূরণ করিতে অক্ষম; অতএব উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের ইউনিটরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য ভারতের অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে সে পারে না, হওয়া কর্তব্য নয়।

কোন্ কোন্ অঞ্চল পৃথক করা হইবে, তাহা নির্ধারণ করিবার নীতিরূপে যদি আমরা সমগ্র প্রদেশকে ইউনিট হিসাবে গ্রহণ করিয়া তাহার লোকসংখ্যার উপর নির্ভর করি, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না।

এই কারণেই 'পাঞ্জাবী' তাঁহার 'Confederacy of India' নামক পুস্তকে ও মিঃ এম, আর, টি তাঁহার প্রবন্ধে সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশকে তাঁহাদের হিসাবের মধ্যে গণনা করেন নাই, বুদ্ধিমানের মত সেই অংশটুকুকেই স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছেন, মুসলমানগণ যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

'যদি আম্বালা বিভাগ ও পূর্ব এজেন্সির অন্তর্গত শিখ এবং হিন্দু রাজ্যগুলি পাঞ্জাব হইতে বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার লোকসংখ্যা ২৮০ই লক্ষ হইতে কমিয়া ২১০ লক্ষে আসিয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু মুসলমান জনসংখ্যা বাড়িয়া শতকরা ৫৫ হইতে ৭০-এ গিয়া পেঁছাইবে। আবার উত্তর-পশ্চিমের মুসলমান-প্রধান অঞ্চল যদি সমগ্রভাবে ধরা হয়, তাহা হইলে মুসলিম জনসংখ্যার এই হার আরও বৃদ্ধি পাইবে। যদি প্রস্তাবিত উপায়ে পূর্ব সীমান্তের পরিবর্তন সাধন করা হয়, তাহা হইলে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মোট লোকসংখ্যা দাঁড়াইবে ৩৫০ লক্ষ, তন্মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা হইবে ২৭০ লক্ষ ও অমুসলমানগণের সংখ্যা হইবে ৮০ লক্ষ মাত্র। সে ক্ষেত্রে সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৭৭ ভাগ মুসলমান অধিবাসীর পক্ষে লোক-বিনিময়ের কোনরূপ পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াই স্থায়ী ও সুদৃঢ় গভর্ণমেণ্ট গঠন করা সম্ভবপর হইবে।' ৩

'পাঞ্জাবের পূর্ব সীমান্ত সংক্রান্ত প্রশ্ন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই তাহা লইয়া মুসলিম অভিমত মাঝে মাঝে বিভক্ত হওয়া বিচিত্র নয়ঃ কেহ কেহ মনে করেন সিন্ধু নদ ও গঙ্গা নদীর সমতল ভূমিদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধানরূপে প্রবাহিত যমুনা নদীই অথবা গিরিপৃষ্ঠ পূর্বে হিন্দু-ভারতের স্বাভাবিক সীমারেখা হওয়া উচিত; আবার কাহারও কাহারও মতে এই সীমারেখা চিরতরে এরূপভাবে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া দরকার যে, কাঙ্গরা জেলার সমগ্র হিন্দুপ্রধান অঞ্চল, হোসিয়ারপুর জেলার কিয়দংশ এবং সমগ্র আম্বালা বিভাগ যেন পাঞ্জাব হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়ে। অভিমতদ্বয়ের প্রথমটাই অগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখা যাকঃ যমুনা নদী অথবা পূর্বোল্লিখিত গিরিপৃষ্ঠই যে একদিকে হিন্দু-ভারত ও অপরদিকে হিন্দুস্থানের পাঞ্জাব ইউনিটের মধ্যবর্তী স্বাভাবিক ভৌগোলিক সীমারেখা তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সিন্ধু নদ অঞ্চলীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে, হিন্দু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা কমাইয়া সাম্প্রদায়িকতা হ্রাস করা ও মুসলমানগণের কৃষি, শিল্প ও সংস্কৃতিগত স্বার্থ রক্ষা করা। দিল্লী হইতে দক্ষিণ-পূর্বদিকে আরাবলী পর্বতের অভিমুখে প্রবাহিত যমুনা নদীর পূর্ব তীর যদি সীমান্তরূপে নির্ধারিত হয়, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে তাহা সহায়ক হইবে না; কারণ তদ্দ্বারা চীফ কমিশনারের অধীন দিল্লী প্রদেশ, আম্বালা বিভাগ ও অন্যান্য অতিমাত্রায় হিন্দুপ্রধান এলাকা আমাদের অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবে এবং তাহার ফল হইবে সমগ্র লোকসংখ্যার ভিতর হিন্দু জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি। এ অবস্থা আমাদের স্বার্থের পরিপন্থী, কারণ এই সীমারেখা হিন্দু-ভারতের সহিত আমাদের সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না। তাহা ছাড়া, আমাদের অঞ্চলস্থ বিরাট হিন্দুসংহতির হিন্দু-ভারতের

3. 'India's Problem of her Future Constitution', pp. 33—4.

অন্তর্গত স্বধর্মিগণের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ও সহানুভূতি থাকিবেই এবং তাহার ফলে আমাদের অসুবিধা অশেষরূপে বৃদ্ধি পাইবে। এই একটিমাত্র গুরুত্ব-পূর্ণ সমস্যার কথা বিবেচনা করিয়াই দ্বিতীয় প্রস্তাবটী আমাদের গ্রহণ করা কর্তব্য, কারণ তাহার ফলে কোন অতিমাত্রায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা আমাদের অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।' ৪ 'অতএব প্রারম্ভেই মুসলমানদের কর্তব্য হইবে, হিন্দুপ্রধান পূর্ব অঞ্চলগুলি বাদ দিয়া পূর্ব সীমান্ত নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্তন সাধনের পক্ষে চাপ দেওয়া।' ৫

পক্ষান্তরে, যে সব অঞ্চল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, তাহা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য জিদ্ করা পাকিস্থানের অত্যুৎসাহী সমর্থকগণের পক্ষেও ন্যায় ও নীতির দিক দিয়া অসম্ভব। এরূপ দাবী যে কেবলমাত্র লাহোর প্রস্তাবের সহিত অসংগত ও সংঘাতশীল হইবে তাহা নয়, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অ-মুসলমান অধিবাসিগণের উপর অবিচার করা হইবে এবং তাহার ফলে অ-মুসলমান-দের মনে এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হইবে যে, তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুসলিম শাসন তাঁহাদের উপর আরোপ করিবার চেষ্টা হইতেছে। ভারতবর্ষকে কয়েকটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করিবার ও শাসনতন্ত্রসম্মত উপায়ে মুসলিম স্বার্থরক্ষা করিবার পরিকল্পনা লইয়া সাধারণের সমক্ষে সর্বপ্রথম আসিয়া দাঁড়ান স্যার সৈয়দ আব্দুল লতিফ। 'হারুণ কমিটি' যখন সমগ্র পাঞ্জাব ও তৎসহ দিল্লী প্রদেশ এবং আলিগড় জেলার কিয়দংশ উত্তর-পশ্চিম মুসলিম অঞ্চলের মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিবার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, তখন স্যার সৈয়দ লতিফ সে সম্বন্ধে ১৯৪১ সালে লিখিয়াছিলেন ঃ

'উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সীমান্ত নির্ধারণের পক্ষে কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। লাহোর প্রস্তাবের লক্ষ্য ছিল, অতিমাত্রায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলিকে লইয়া এক-জাতীয় ও ঘন-সন্নিবদ্ধ রাষ্ট্রপুঞ্জ গঠন করা। কিন্তু আপনাদের কমিটির পাঞ্জাব ও আলিগড় অধিবাসী সভ্যগণ একান্তভাবে অ-মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব কায়েম করিবার আগ্রহের বশবর্তী হইয়া, আলিগড় পর্যন্ত বিস্তৃত বৃহত্তর পাঞ্জাব গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই পরিকল্পনার সাহায্যে কাশ্মীর হইতে যশল্মীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বিরাট অঞ্চলের সমুদয় অ-মুসলমান রাজ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং তাহার ফলে মুসলমান জনসংখ্যার হার হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া আসিয়া দাঁড়াইবে শতকরা ৫৫। অনুরূপ উপায়ে সমগ্র বাঙ্গলা, আসাম ও বিহারের কয়েকটী জেলা উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে, সেখানেও মুসলমান জনসংখ্যার হার কমিয়া শতকরা ৫৪তে আসিয়া দাঁড়াইবে। এ সম্বন্ধে আমার বিনীত অভিমত এই যে, এই জাতীয় সীমানির্ধারণ লাহোর প্রস্তাবের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী; কারণ যে উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অ-মুসলমান জনসংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ৪৬ ও ৪২, সে অঞ্চলকে মুসলিম অঞ্চল

4. 'Confederacy of India' by 'A Punjabi', pp. 243—4.
5. Ibid., p. 246.

অথবা তাহাদের সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্রকে মুসলিম রাষ্ট্ররূপে আখ্যাত করিতে আপনারা কোনক্রমেই পারেন না। এইরূপ সীমানির্ধারণের জন্য আমি আদৌ দায়ী নই, সে দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও যুক্তপ্রদেশের সভ্যগণের। আমি চাই শতকরা ৮০ জন মুসলমান—সংখ্যাধিক্য সম্বলিত মুসলিম রাষ্ট্রসংঘ গঠন করিতে; হোক সে রাষ্ট্রপুঞ্জ আয়তনে ক্ষুদ্র, তথাপি তাহাই হইবে আমার আপন ও নিজস্ব সামগ্রী।'৬

লাহোর প্রস্তাবের মর্ম অনুযায়ী যে কমিটি কর্তৃক এই পরিকল্পনা রচিত হয়, তাহা নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বৈদেশিক সাব-কমিটির চেয়ারম্যান হাজি স্যার আবদুল্লা হারুণ, কে, টি, এম, এল, এ কর্তৃক গঠিত। তিনি উক্ত কমিটির সভাপতির পদে বরাবর আসীন রহিয়া যে রিপোর্ট চূড়ান্তভাবে রচনা করিয়া তুলিলেন, তাহা ১৯৪০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে লীগ-সভাপতির নিকট উপস্থাপিত হইলে, মিঃ জিন্না ১৯৪১ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে ডাক্তার লতিফকে লিখিত এক পত্রে কমিটি ও তাহার প্রণীত পরিকল্পনা উভয়ই প্রত্যাখ্যান করিলেন।

মিঃ এম, আর, টি ও 'জনৈক পাঞ্জাবী'র উল্লিখিত উদ্ধৃতির ভিতর দিয়া যে মুসলিম স্বার্থ অভিব্যক্ত হইয়াছে—সেদিক হইতে, অথবা অ-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ যেসব অঞ্চল মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাওয়া হইতেছে তাহাদের অধিকাংশ অধিবাসীর মনোভাবের দিক হইতে—যে কোন দৃষ্টিকোণ হইতেই এই প্রশ্নটির বিচার করা যাক না কেন, ভারত-খণ্ডনের দাবী যদি স্বীকৃতও হয়, তথাপি মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ কোন অঞ্চলকে মুসলিম রাষ্ট্রের অংগীভূত করিয়া লইবার দাবী ন্যায় ও নীতি পদদলিত না করিয়া কোনক্রমেই মানিয়া লওয়া চলে না।

লাহোর প্রস্তাবের দৃষ্টিকোণ হইতে অভিন্ন এই দৃষ্টিভংগী দিয়া পাঞ্জাবের অবস্থা বিচার করিয়া দেখা যাক। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, পাঞ্জাবের অন্তর্গত মুলতান বিভাগ সিন্ধু ও বেলুচিস্থানের সংলগ্ন এবং মুসলমানগণ সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়—সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭৫·৪১ ভাগ। বালুচ সীমান্তের লোকসংখ্যা অতিশয় অল্প, প্রায় ৪০,২৪৬ মাত্র এবং মুসলমানগণ তন্মধ্যে শতকরা ৯৯·৬০ ভাগ; এই ক্ষুদ্র জনসমষ্টি গণনায় না আনিলেও, মুলতান বিভাগের প্রতিটি জেলা মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাঁহাদের সর্বোচ্চ সংখ্যাধিক্য শতকরা ৮৮·১৯ দৃষ্ট হয় ডেরাগাজিখাঁ জেলায় ও সর্বনিম্ন সংখ্যাগুরুত্ব ৬২·৮৫ লায়ালপুর জেলায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সন্নিহিত রাওয়ালপিণ্ডি বিভাগেও মুসলমান সংখ্যাধিক্য অতিমাত্রায়, সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা হার তথায় ৮৫·৫২। উক্ত বিভাগের আটক জেলায় যেখানে মুসলমান সংখ্যাধিক্য সর্বোচ্চ সেখানে সমগ্র জনসংখ্যার তাঁহারা শতকরা ৯০·৪২ এবং সর্বনিম্ন সংখ্যাধিক্য ৮০.০০ দৃষ্ট হয় রাওয়ালপিণ্ডি জেলায়। কাজেই ব্যবচ্ছেদ-ব্যবস্থা যদি কার্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে লাহোর প্রস্তাবের মর্ম অনুযায়ী এই দুইটি বিভাগ সমগ্রভাবে উত্তর-পশ্চিম মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য।

কিন্তু লাহোর বিভাগের কথা বিচার করিতে গেলে অবস্থা একটু জটিল

6. 'The Pakistan Issue', pp. 98—9.

হইয়া দাঁড়ায়। সমগ্র বিভাগের জনসমষ্টির অনুপাতে মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা মাত্র ৫৮·১৮; এই সংখ্যাধিক্য এরূপ অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না যে, তাহার উপর দাঁড়াইয়া এই বিভাগকে মুসলিম অঞ্চল বলিয়া দাবী করার অধিকার জন্মে। তদুপরি অমৃতসর জেলায় তাঁহারা সংখ্যাল্প সম্প্রদায়, মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৬·৫২ ভাগ; গুরুদাসপুর জেলায় তাঁহারা প্রায় সমসংখ্যক, সেখানে মুসলমান জনসংখ্যা মোট জনসমষ্টির শতকরা মাত্র ৫১.১৪। ঐ বিভাগে তাঁহাদের সর্বোচ্চ সংখ্যাধিক্য ৭০.৪৫ দৃষ্ট হয় গুজরাণওয়ালা জেলায় এবং লাহোর, শিয়ালকোট ও শেখুপুরা জেলায় তাঁহাদের জনসংখ্যার হার যথাক্রমে শতকরা ৬০·৬২, ৬২·০৯ ও ৬৩·৬২। উল্লিখিত আর্যা অনুযায়ী বিচার করিলে, মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ অমৃতসর জেলা কোনক্রমেই মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। তেমনি গুরুদাসপুর জেলাকে আপন অঞ্চল বলিয়া দাবী করিবার পক্ষে মুসলমানগণ যে পরিমাণ অধিকারী,' সে দাবীর পক্ষে অ-মুসলমানগণের অধিকারের পরিমাণ তাহা হইতে কম নয়। অতিমাত্রায় সংখ্যাধিক্যের উপর যদি জোর দেওয়া না হয় এবং কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্যই যদি বিচারের একমাত্র মাপকাঠিরূপে গণ্য হয়, তাহা হইলে শতকরা ৬০ হইতে ৭০ ভাগ মুসলমান সংখ্যাগুরুত্বসম্পন্ন অন্যান্য জেলাগুলিও মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী উত্থাপিত হইতে পারে।

জলন্ধর বিভাগের অবস্থা সুস্পষ্ট। মুসলমানগণ এখানে মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৩৪·৫৩ ভাগ এবং কোন জেলাতেই তাঁহাদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা নাই; তাঁহাদের সর্বোচ্চ সংখ্যাগুরুত্ব জলন্ধর জেলায় ও সর্বনিম্ন সংখ্যাধিক্য কাংগরা জেলায়, ঐ দুইস্থানে তাঁহাদের জনসংখ্যার হার যথাক্রমে ৪৫.২৩ ও ৪·৮১ মাত্র। একক সম্প্রদায়রূপে ঐ বিভাগে হিন্দু জনসংখ্যা শতকরা ৩৫·৮৭ ও মুসলমান জনসংখ্যা ৩৪·৫৩; বিভাগের পাঁচটি জেলার মধ্যে জলন্ধর ও ফিরোজপুর জেলা দুইটিতে মুসলমান জনসংখ্যার হার সর্বোচ্চঃ যথাক্রমে ৪৫·২৩ ও ৪৫·০৭। কিন্তু এই জেলা দুইটিতেও তাঁহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ। কাজেই লাহোর প্রস্তাবের সূত্র অনুযায়ী বিচার করিলে জলন্ধর বিভাগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় না; তাহা ছাড়া, মুলতান ও রাওয়ালপিণ্ডি বিভাগের জেলাগুলির সহিত তাহাদের সংযুক্ত হইবার পথ রোধ করিয়া লাহোর বিভাগের জেলাগুলি অন্তরায়স্বরূপ দণ্ডায়মান।

আম্বালা বিভাগে মুসলমানগণ মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ২৮·০৭। গুরগাঁও জেলায় তাঁহারা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৩৩·৫৬ এবং ইহাই সমগ্র বিভাগে তাঁহাদের জনসংখ্যার সর্বোচ্চ হার। পক্ষান্তরে এই বিভাগে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত ৬৬·০১; তাঁহাদের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন হার রোটক ও আম্বালা জেলায় যথাক্রমে ৮১.৬১ ও ৪৮·৪০। যদি বিচারের জন্য লীগ-প্রদত্ত আর্যাই মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে এই বিভাগ অথবা তাহার অন্তর্বর্তী কোন জেলা যে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না, তাহা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট।

এইবারে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলটিকে আমরা সমগ্রভাবে বিচার করিয়া দেখিব। যে যে এলাকা ইহা হইতে বাদ দিবার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহা বাদ দিবার পর অবস্থা যাহা দাঁড়াইবে, নিম্নে প্রদত্ত হিসাবে তাহাই দেখান হইল:

ছক নং ১৩

প্রদেশ	মোট লোকসংখ্যা	মুসলমান জনসংখ্যা	মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা হার
সিন্ধু	৪৫,৩৫,০০৮	৩২,০৮,৩২৫	৭০.৭৫
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩০,৩৮,০৬৭	২৭,৮৮,৭৯৭	৯১.৭৯
বেলুচিস্থান ...	৫,০১,৬৩১	৪,৩৮,৯৩০	৮৭.৫১
পাঞ্জাব (বাদ—আম্বালা ও জলন্ধর বিভাগ এবং লাহোর বিভাগের অমৃতসর জেলা) ...	১,৬৮,৭০,৯০০	১,২৩,৬৩,৬৬৯	৭৩.২৮
সমগ্র উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল	২,৪৯,৪৫,৬০৬	১,৮৭,৯৯,৭২১	৭৫.৩৬

পাঞ্জাবের অতিমাত্রায় অ-মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলিকে বাদ না দিয়া হিসাব করিলে অবস্থা দাঁড়াইবে এই যে, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের মোট লোকসংখ্যা ৩,৬৪,৯৩,৫২৫ মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা হইবে ২,২৬,৫৩,২৯৪, অর্থাৎ শতকরা ৬২.০৭। এই অত্যল্প মুসলমান সংখ্যাধিক্য-সম্বলিত অঞ্চলকে মুসলিম অঞ্চল নামে অভিহিত করা চলে কিনা তাহা প্রশ্নের বিষয়।

এইবারে আমরা পূর্বাঞ্চল সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রথমেই বাঙ্গলার কথা ধরা যাক:

ছক নং ১৪ (ক)

বিভাগ অথবা জেলা		আয়তন (বর্গমাইল)	মোট লোকসংখ্যা	মুসলমান	হিন্দু	ভারতীয় খৃষ্টান	উপজাতি	অন্যান্য
বর্ধমান বিভাগ								
বর্ধমান	...	২,৭০৫	১৮,৯০,৭৩২	৩,৩৬,৬৬৫ (১৭·৮১)	১৩,৯৩,৮২০ (৭৩·৭২)	৩,২৮০ (০·১৭)	১,৫১,৩৫৫ (৮·০০)	৫,৬১২ (০·৩০)
বীরভূম	...	১,৭৪৩	১০,[illegible],০১৭	২,৮৭,৩১০ (২৭·৪১)	৬,৮৬,৪০৬ (৬৫·৪৮)	৩৪৪ (০·০৩)	৭৪,০৮৪ (৭·০৭)	১৪৩ (০·০১)
বাঁকুড়া	..	২,৬৪৬	১২,৮৯,৬৪০	৫৫,৫৬৪ (৪·৩১)	১০,৭৮,৫৫৯ (৮৩·৬৩)	১,২১৬ (০·০৯)	১,৫৪,২৪৬ (১১·৯৭)	৫৫ (০·০০)
মেদিনীপুর	...	৫,২৭৪	৩১,৯০,৬৪৭	২,৪৬,৫৫৯ (৭·৭৩)	২৬,৮১,৯৬৩ (৮৪·০৬)	৩,৮০৪ (০·১২)	২,৫০,৬২৫ (৭·৯৫)	৪,৬৬৬ (০·১৪)
হুগলী	...	১,২০৬	১৩,৭৭,৭২৯	২,০৭,০৭৭ (১৫·০৩)	১০,৯৯,৫৪৪ (৭৯·৮১)	৫৪৩ (০·০৪)	৬৯,৫০০ (৫·০৪)	১,০৬৫ (০·০৮)
হাওড়া	...	৫৬১	১৪,৯০,০৩৪	২,৯৬,৩২৫ (১৯·৮৮)	১১,৮৪,৮৬৩ (৭৯·৫০)	৯৯৪ (০·০৭)	৩,৯১৯ (০·২৬)	৪,২০০ (০·২৯)
মোট	...	১৪,১৩৫	১,০২,৮৭,০৬৯	১৪,২৯,৫০০ (১৩·৯০)	৮১,২৫,১৮৫ (৭৮·৯৮)	১০,২১১ (০·১০)	৭,০৬,৭২৯ (৬·৮৭)	১৫,৭৪৪ (০·১৫)

ছক নং ১৪ (খ)

বিভাগ অথবা জেলা	আয়তন (বর্গমাইল	মোট লোকসংখ্যা	মুসলমান	হিন্দু	ভারতীয় খৃষ্টান	উপজাতি	অন্যান্য
প্রেসিডেন্সী বিভাগ							
চব্বিশ পরগণা	৩,৬৯৬	৩৫,৩৬,৩৮৬	১১,৪৪,১৮০ (৩২·৪৭)	২৩,০৯,৯৯৬ (৬৫·৩২)	২০,৮২৩ (০·৫৯)	৫১,০৮৫ (১·৪৪)	৬,৩০২ (০·১৮)
কলিকাতা	৩৪	২১,০৮,৮৯১	৪,৯৭,৫৩৫ (২৩·৫৯)	১৫,৩১,৫১২ (৭২·৬২)	১৬,৪৩১ (০·৭৮)	১,৬৮৮ (০·০৮)	৬১,৭২৫ (২·৯৩)
নদীয়া	২,৮৭৯	১৭,৫৯,৮৪৬	১০,৭৮,০০৭ (৬১·২৬)	৬,৫৭,৯৫০ (৩৭·৩৪)	১০,৭৪৯ (০·৬১)	১২,৬৭১ (০·৭২)	৪৬৯ (০·০৩)
মুর্শিদাবাদ	২,০৬৩	১৬,৪০,৫৩০	৯,২৭,৭৪৭ (৫৬·৫৫)	৬,৮৪,৯৮৭ (৪১·৭৫)	৩৯৪ (০·০২)	২৬,১৩৮ (১·৫৯)	১,২৬৪ (০·০৮)
যশোহর	২,৯২৫	১৮,২৮,২১৬	১১,০০,৭১৩ (৬০·২১)	৭,২১,০৭৯ (৩৯·৪৪)	১,০৫৭ (০·০৬)	৪,৯৭৮ (০·২৭)	৩৮৯ (০·০২)
X খুলনা	৪,৮০৫	১৯,৪৩,২১৮	৯,৫৯,১৭২ (৪৯·৩৬)	৯,৭৭,৬৯৩ (৫০·৩১)	৩,৫০৮ (০·১৮)	২,৬৭৫ (০·১৪)	১৪০ (০·০১)
মোট ...	১৬,৪০২	১,২৮,১৭,০৮৭	৫৭,১১,৩৫৪ (৪৪·৫৬)	৬৮,৮৩,২১৭ (৫৩·৭০)	৫২,৯৯২ (০·৪১)	৯৯,২৩৫ (০·৭৭)	৭০,২৮৯ (০·৫৫)

ছক নং ১৪ (গ)

বিভাগ অথবা জেলা	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট লোকসংখ্যা	মুসলমান	হিন্দু	ভারতীয় খৃষ্টান	উপজাতি	অন্যান্য
রাজশাহী বিভাগ							
রাজসাহী	২,৫২৬	১৫,৭১,৭৫০	১১,৭৩,২৮৫ (৭৪·৬৪)	৩,২৯,২০০ (২০·৯৫)	১,১৬৬ (০·০৭)	৬৭,২৯৮ (৪·২৮)	৭৭১ (০·০৫)
দিনাজপুর	৩,৯৫৩	১৯,২৬,৮৩৩	৯,৬৭,২৪৬ (৫০·২০)	৭,৭৪,৬২২ (৪০·২০)	১,৪৪৮ (০·০৮)	১,৮২,৮৯২ (৯·৪৯)	৬২৫ (০·০৩)
জলপাইগুড়ি	৩,০৫০	১০,৮৯,৫১৩	২,৫১,৪৬০ (২৩·০৮)	৫,৫১,৬৪৭ (৫০·৬৩)	২,৫৮৯ (০·২৪)	২,৭৯,২৯৬ (২৫·৬৩)	৪,৫২৯ (০·৪১)
দার্জিলিং	১,১৯২	৩,৭৬,৩[illegible]	৯,১২৫ (২·৪২)	১,৭৮,৪৯৬ (৪৭·৪৩)	২,৫৯৯ (০·৬৯)	১,৪১,০০১ (৩৭·৫৪)	৪৪,৮৪৮ (১১·৯২)
রংপুর	৩,৬০৬	২৮,৭৭,৮৪৭	২০,৫৫,১৮৬ (৭১·৪১)	৮,০২,৮৪৯ (২৭·৯০)	৩৮৯ (০·০১)	১৮,২০০ (০·৬৩)	১,২২০ (০·০৪)
বগুড়া	১,৪৭৫	১২,৬০,৪৬০	১০,৫৭,৯০২ (৮৩·৯৩)	১,৮৭,৫০২ (১৪·৮৮)	২৮৬ (০·০২)	১৪,০৮৭ (১·১৪)	৩৫৬ (০·০৩)
পাবনা	১,৮৩৬	১৭,০৫,০৭২	১৩,১৩,৯৬৮ (৭৭·০৬)	৩,৮৩,৭৫৫ (২২·৫১)	২৮৫ (০·০২)	৬,৯০৬ (০·৪০)	১৫৮ (০·০১)
মালদহ	২,০০৪	১২,৩২,৬১৮	৬,৯৯,৯৪৫ (৫৬·৭৮)	৪,৬৫,৬৭৮ (৩৭·৭৮)	৪৬৬ (০·০৪)	৬৬,৪৪৯ (৫·৩৯)	৮০ (০·০১)
মোট	১৯,৬৪২	১,২০,৪০,৪৬৫	৭৫,২৮,১১৭ (৬২·৫২)	৩৬,৭৩,৮০৯ (৩০·৫১)	৯,২২৮ (০·০৮)	৭,৭৬,৭২৯ (৬·৪৫)	৫২,৫৮২ (০·৪৪)

ছক নং ১৪ (ঘ)

বিভাগ অথবা জেলা	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট লোকসংখ্যা	মুসলমান	হিন্দু	ভারতীয় খৃষ্টান	উপজাতি	অন্যান্য
ঢাকা বিভাগ							
ঢাকা ...	২,৭০৮	৪২,২২,১৪৩	২৮,৪১,২৬১ (৬৭·২৯)	১৩,৬০,১০২ (৩২·২১)	১৫,৮৪৬ (০·৩৮)	৪,০২৯ (০·১০)	৮৭৫ (০·০২)
মৈমনসিংহ ...	৬,১৫৬	৬০,২৩,৭৫৮	৪৬,৬৪,৫৪৮ (৭৭·৪৪)	১২,৯৬,৬৩৮ (২১·৫২)	২,৩২২ (০·০৪)	৫৯,৭২২ (০·৯৯)	৫২৮ (০·০১)
ফরিদপুর ...	২,৮২১	২৮,৮৮,৮০৩	১৮,৭১,৩৩৬ (৬৪·৭৮)	১০,০৬,২৩৮ (৩৪·৮৩)	৯,৫৪৯ (০·৩৩)	১,৩৬৩ (০·০৫)	৩১৭ (০·০১)
বাখরগঞ্জ ...	৩,৭৮৩	৩৫,৪৯,০১০	২৫,৬৭,০২৭ (৭২·৩৩)	৯,৫৮,৬২৯ (২৭·০১)	৯,৩৫৭ (০·২৬)	২৮৪ (০·০১)	১৩,৭১৩ (০·৩৯)
মোট ...	১৫,৪৯৮	১,৬৬,[illegible]৩,৭১৪	১,১৯,৪৪,১৭২ (৭১·৫৯)	৪৬,২১,৬৩৭ (২৭·৭০)	৩৭,০৭৪ (০·২২)	৬৫,৩৯৮ (০·৩৯)	১৫,৪৩৩ (০·০৯)

ছক নং ১৪ (ঙ)

বিভাগ বা জেলা	আয়তন (বর্গ মাইল)	মোট (লোকসংখ্যা)	মুসলমান	হিন্দু	ভারতীয় খৃষ্টান	উপজাতি	অন্যান্য
চট্টগ্রাম বিভাগ							
ত্রিপুরা	২,৫৩১	৩৮,৬০,১৩৯	২৯,৭৫,৯০১ (৭৭·০৯)	৮,৭৯,৯৬০ (২২·৮০)	৪২৮ (০·০১)	১,৫২৪ (০·০৪)	২,৩২৬ (০·০৬)
নোয়াখালি	১,৬৫৮	২২,১৭,৪০২	১৮,০৩,৯৩৭ (৮১·৩৫)	৪,১২,২৬১ (১৮·৫৯)	৫৩৫ (০·০২)	৩৪ (০·০০)	৬৩৫ (০·০৩)
চট্টগ্রাম	২,৫৬৯	২১,৫৩,২৯৬	১৬,০৫,১৮৩ (৭৪·৫৫)	৪,৫৮,০৭৪ (২১·২৭)	৩৯৫ (০·০২)	৬,৩৪৮ (০·২৯)	৮৩,২৯৬ (৩·৮৭)
পার্বত্য চট্টগ্রাম	৫,০০৭	২,৪৭,০৫৩	৭,২৭০ (২·৯৪)	৪,৮৮১ (১·৯৮)	৬০ (০·০২)	২,৩৩,৩৯২ (৯৪·৪৭)	১,৪৫০ (০·৫৯)
মোট	১১,৭৬৫	৮৪,৭৭,৮৯০	৬৩,৯২,২৯১ (৭৫·৪০)	১৭,৫৫,১৭৬ (২০·৭০)	১,৪১৮ (০·০২)	২,৪১,২৯৮ (২·৮৪)	৮৭,৭০৭ (১·০৩)
বাংলার সর্বমোট	৭৭,৪৪২	৬,০৩,০৬,৬২৫	৩,৩০,০৫,৪৩৪ (৫৪·৭৩)	২,৫০,৫৯,০২৪ (৪১·৫৫)	১,১০,৯২৩ (০·১৮)	১৮,৮৯,৩৮৯ (৩·১৩)	২,৪১,৭৫৫ (০·৪০)

বাংলার মুসলমান ও অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহ

বিভাগ বা জেলা	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট লোকসংখ্যা	মুসলমান	হিন্দু	ভারতীয় খৃষ্টান	উপজাতি	অন্যান্য	মোট অমুসলমান জনসংখ্যা
নদীয়া	২,৮৭৯	১৭,৫৯,৮৪৬	১০,৭৮,০০৭ (৬১·২৬)	৬,৫৭,৯৫০ (৩৭·৩৮)	১০,৭৪৯ (০·৬১)	১২,৬৭১ (০·৭২)	৪৬৯ (০·০৩)	৬,৮১,৮৩৯ (৩৮·৭৪)
মুর্শিদাবাদ	২,০৬৩	১৬,৪০,৫৩০	৯,২৭,৭৪৭ (৫৬·৫৫)	৬,৮৪,৯৮৭ (৪১·৭৫)	৩৯৪ (০·০২)	২৬,১৩৮ (১·৫৯)	১,২৬৪ (০·০৮)	৭,১২,৭৮৩ (৪৩·৪৪)
যশোহর	২,৯২৫	১৮,২৮,২১৬	১১,০০,৭১৩ (৬০·২১)	৭,২১,০৭৯ (৩৯·৪৪)	১,০৫৭ (০·০৬)	৪,৯৭৮ (০·২৭)	৩৮৯ (০·০২)	৭,২৭,৫০৩ (৩৯·৭৯)
রাজসাহী বিভাগ —বাদ— দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি	১৫,৪০০	১,০৫,৭৪,৫৮৩	৭২,৬৭,৫৩২ (৬৮·৭২)	২৯,৪৩,৬৬৬ (২৭·৮৪)	৪,০৪০ (০·০৪)	৩,৫৬,১৩২ (৩·৩৭)	৩,২১৩ (০·০৩)	৩৩,০৭,০৫১ (৩১·২৮)
ঢাকা বিভাগ	১৫,৪৯৮	১,৬৬,৮৩,৭১৪	১,১৯,৪৪,১৭২ (৭১·৫৯)	৪৬,২১,৬০৭ (২৭·৭০)	৩৭,০৭৪ (০·২২)	৬৫,৩৯৮ (০·৩৯)	১৫,৪৩৩ (০·০৯)	৪৭,৩৯,৫৪২ (২৮·৪০)
চট্টগ্রাম বিভাগ	১১,৭৬৫	৮৪,৭৭,৮৯০	৬৩,৯২,২৯১ (৭৫·৪০)	১৭,৫৫,১৭৬ (২০·৭০)	১,৪১৮ (০·০২)	২,৪১,২৯৮ (২·৮৪)	৮৭,৭০৭ (১·০৩)	২০,৮৫,৫৯৯ (২৪·৫৯)
মোট মুসলমান-প্রধান জেলাসমূহ	৫০,৫৩০	৪,০৯,৬৪,৭৭৯	২,৮৭,১০,৪৬২ (৭০·০৯)	১,১৩,৮৪,৪৯৫ (২৭·৭৯)	৫৪,৭৩২ (০·১৩)	৭,০৬,৬১৫ (১·৭২)	১,০৮,৪৭৫ (০·২৬)	১,২২,৫৪,৩১৭ (২৯·৯০)
বর্ধমান বিভাগ	১৪,১৩৫	১,০২,৮৭,০৬[illegible]	১৪,২৯,৬০০ (১৩·৯০)	৮১,২৫,১৮৫ (৭৮·৯৮)	১০,২১১ (০·১০)	৭,০৬,৯২৯ (৬·৮৭)	১৫,৭৪৪ (০·১৫)	৮৮,৫৭,৮৬৯ (৮৬·১০)
চব্বিশ পরগণা	৩,৬৯৬	৩৫,৩৬,৩৮৬	১১,৪৮,১৮০ (৩২·৪৭)	২৩,০৯,৯৯৬ (৬৫·৩২)	২০,৮২৩ (০·৫৯)	৫১,০৮৫ (১·৪৪)	৬,৩০২ (০·১৮)	২৩,৮৮,২০৬ (৬৭·৫৩)

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার ছকের জের)

বিভাগ অথবা জেলা	(বর্গমাইল) আয়তন	মোট লোকসংখ্যা	মুসলমান	হিন্দু	ভারতীয় খৃষ্টান	উপজাতি	অন্যান্য	মোট অমুসলমান জনসংখ্যা
কলিকাতা ...	৩৪	২১,০৮,৮৯১	৪,৯৭,৫৩৫ (২৩·৫৯)	১৫,৩১,৫১২ (৭২·৬২)	১৬,৪৩১ (০·৭৮)	১,৬৮৮ (০·০৮)	৬১,৭২৫ (২·৯৩)	১৬,১১,৩৫৬ (৭৬·৪১)
খুলনা ...	৪,৮০৫	১৯,৪৩,২১৮	৯,৫৯,১৭২ (৪৯·৩৬)	৯,৭৭,৬৯৩ (৫০·৩১)	৩,৫৩৮ (০·১৮)	২,৬৭৫ (০·১৪)	১৪০ (০·০১)	৯,৮৪,০৪৬ (৫০·৬৪)
জলপাইগুড়ি ...	৩,০৫০	১০,৮৯,৫১৩	২,৫১,৪৬০ (২৩·০৮)	৫,৫১,৬৪৭ (৫০·৬৩)	২,৫৮৯ (০·২৪)	২,৭৯,২৯৬ (২৫·৬৩)	৪,৫২১ (০·৪১)	৮,৩৮,০৫৩ (৭৬·৯১)
দার্জিলিং ...	১,১৯২	৩,৭৬,৩৬৯	৯,১২৫ (২·৪২)	১,৭৮,৪৯৬ (৪৭·৪৩)	২,৫৯৯ (০·৬৯)	১,৪১,৩০১ (৩৭·৫৪)	৪৪,৮৪৮ (১১·৯২)	৩,৬৭,২৪৪ (৯৭·৫৮)
মোট অমুসলমান-প্রধান জেলাসমূহ	২৬,৯১২	১,৯৩,৪১,৭৪৩	৪২,৯৪,৯৭২ (২২·২১)	১,৩৬,৭৪,৫২৯ (৭০·৭০)	৫৬,১৯১ (০·২৯)	১১,৮২,৭৭৪ (৬·১১)	১,৩৩,২৮০ (০·৬৯)	১,৫০,৪৬,৭৭৪ (৭৭·৭৯)

চৌদ্দ নম্বর ছকে দেখা যাইবে যে, বর্ধমান বিভাগে মুসলমানগণ অতিশয় সংখ্যালঘু, মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৩·৯০ ভাগের উর্ধ্ব নয়। এই বিভাগের কোন জেলায় তাঁহাদের সংখ্যা ২৭·৪১ অতিক্রম করে না এবং সর্বনিম্ন সংখ্যা ৪·৩১এর বেশী নয়। এই বিভাগের বীরভূম ও বর্ধমান জেলা ছাড়া আর সব জেলা কয়টীই চতুর্দিকে বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যার অমুসলমান-প্রধান জেলাসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং বীরভূম ও বর্ধমানেরও একদিকে যদিও বাংলার মুসলমানপ্রধান জেলাসমূহ অবস্থিত, অপর দিকে কিন্তু তাহারা অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির সহিত সন্নিহিত। এই বিভাগটী কোন দিক দিয়াই লাহোর-প্রস্তাব-প্রদত্ত সর্ত পূরণ করে না, সুতরাং ইহাকে পূর্ব-মুসলিম-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী অবাস্তব।

কলিকাতানগরীসমেত প্রেসিডেন্সী বিভাগে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যালঘিষ্ঠঃ মোট জনসংখ্যার তাঁহারা শতকরা ৪৪.৫৬ মাত্র এবং হিন্দু জনসংখ্যার হার শতকরা ৫৩·৭০। কিন্তু এই বিভাগের কয়েকটি জেলায় অবশ্য মুসলমানগণ সংখ্যাগুরুঃ—যথা—নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও যশোহর; এই তিনটী জেলায় তাঁহাদের সংখ্যার শতকরা হার যথাক্রমে ৬১·২৬, ৫৬·৫৫ এবং ৬০·২১। চব্বিশ পরগণা ও খুলনা জেলায় মুসলমান সংখ্যার অনুপাত যথাক্রমে ৩২·৪৭ ও ৪৯·৩৬ এবং এই দুই জেলায় কেবলমাত্র হিন্দু জনসংখ্যার হার যথাক্রমে ৬৫·৩২ ও ৫০·৩১। কলিকাতায় মুসলমান-সংখ্যা শতকরা ২৩·৫৯ মাত্র, অর্থাৎ মোট অধিবাসী সংখ্যার এক চতুর্থাংশেরও কম এবং কেবলমাত্র হিন্দু জনসংখ্যার হার ৭২·৬২। সংখ্যানুপাতকেই বিচারের মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করিলে, সমগ্র বিভাগ মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইতেই পারে না, আর জেলা হিসাবে গণনা করিলেও, চব্বিশ পরগণা, কলিকাতা ও খুলনা তাহার আওতার বহির্ভূত রহিয়া যায়। কলিকাতার কথা স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, চতুর্দিকে অমুসলমানপ্রধান অঞ্চল দ্বারা সে পরিবেষ্টিত এবং তাহার চতুঃসীমার এমন কোনরূপ সংস্কার ও সংশোধন অসম্ভব—যাহার ফলে সে মুসলিম অঞ্চলে পরিণত হইতে পারে। এই বিভাগের প্রত্যেকটী জেলা একদিকে যেমন মুসলমানপ্রধান জেলাকে স্পর্শ করিতেছে, অন্যদিকে তেমনি অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার সহিতও সংযুক্ত হইতেছে; কেবলমাত্র কলিকাতা ইহার ব্যতিক্রম, কোনদিকে কোন মুসলিম অঞ্চলের সহিত সে সন্নিহিত নয়।

রাজসাহী বিভাগের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় মুসলমানগণ অত্যন্ত সংখ্যাল্প, তাহাদের সংখ্যার হার যথাক্রমে ২৩·০৮ ও ২·৪২; প্রান্তবর্তী দিনাজপুর জেলার মুসলমান জনসংখ্যার হার শতকরা ৫০·১৯ মাত্র। এই বিভাগের অন্যান্য জেলায় মুসলমানগণ সংখ্যাধিক, সংখ্যাগুরুত্বের উচ্চতম হার ৮৩·৯৩ ও নিম্নতম হার ৫৬·৭৮ যথাক্রমে বগুড়া ও মালদহ জেলায়। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার মত অতিমাত্রায় মুসলমানসংখ্যাল্প স্থান সম্বন্ধে মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন একেবারে অবান্তর; এমনকি, শতকরা ৫০জন মাত্র মুসলমান সংখ্যা সম্বলিত দিনাজপুর জেলা সম্বন্ধেও ন্যায় ও নীতি সম্মত উপায়ে সে দাবী উত্থিত হওয়া উচিত নয়।

ঢাকা বিভাগের অবস্থা স্বতন্ত্র। এখানে মুসলমান জনসংখ্যার হার শতকরা ৭১·৫৯; তাহা ছাড়া এই বিভাগের প্রতিটি জেলা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ,

তাহাদের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সংখ্যাধিক্য ৭৭·৪৪ ও ৬৪·৭৮ যথাক্রমে ময়মনসিং ও ফরিদপুরে।

চট্টগ্রাম বিভাগেও মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাঁহাদের সংখ্যার হার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫·৪০। কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া এই বিভাগের সমস্ত জেলাতেই মুসলমান সংখ্যাধিক্য বিদ্যমান; এই জেলায় মোট জনসংখ্যার তাঁহারা শতকরা মাত্র ২·৯৪। উপজাতীয়গণই পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়।

বর্ধমান, প্রেসিডেন্সী, রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম—এই পাঁচটী বিভাগ লইয়া বর্তমানে বাংলা প্রদেশ যেভাবে গঠিত, আমরা যদি সমগ্রভাবে তাহাকে বিচার করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, মুসলমানগণ সমগ্র প্রদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৪·৭৩ মাত্র; এই অত্যল্প সংখ্যাধিক্যের বলে তাহাকে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদাসম্পন্ন স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করিবার দাবী অন্যায় ও অযৌক্তিক। এরূপ রাষ্ট্রে কোন স্থায়ী, প্রতিনিধিমূলক গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইতে পারে না; তাহা ছাড়া, যাহার সহিত স্মরণাতীত কাল হইতে সে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট সেই ভারতের অবশিষ্ট অংশ হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিবার মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে শতকরা মাত্র ৫৪·৭৩ সংখ্যাধিক্যসম্পন্ন এক সম্প্রদায় অবশিষ্ট আর সকলের উপর আপনাদের ইচ্ছা কেন যে আরোপ করিবেন, তাহারও তো কোন যুক্তিযুক্ত হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

যদি জেলা হিসাবেই বিচার করা যায়, তবে বর্ধমান বিভাগের সমস্ত জেলা, প্রেসিডেন্সী বিভাগের চব্বিশ পরগণা, খুলনা ও কলিকাতা এবং অতিমাত্রায় অমুসলমান-প্রধান জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা মুসলিম অঞ্চলের আওতায় আসিবে না। তাহা ছাড়া, মুসলমান ও অমুসলমান প্রাধান্যের প্রান্ত সীমায় অবস্থিত দিনাজপুর জেলাকে আপন আপন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করিবার অধিকার হিন্দু ও মুসলমান সমপরিমাণে দাবী করিতে পারে। রাজসাহী বিভাগের অন্যান্য জেলা ঢাকা বিভাগের সকল জেলা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত চট্টগ্রাম বিভাগের আর সমস্ত জেলা লাহোর প্রস্তাবের আর্যা অনুযায়ী মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইবার অবশ্যই যোগ্য।

প্রশ্নাধীন দিনাজপুর জেলা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইলে বাংলার মুসলমান ও অমুসলমান প্রধান জেলাগুলির অবস্থা যাহা দাঁড়াইবে, ১৪ নম্বর ছকে তাহা দেখান হইয়াছে। আবার ঐ দুইটি জেলা মুসলিম অঞ্চল হইতে বাদ দেওয়া হইলে, অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন অবশ্য ঘটিবেই।

উপরে প্রদত্ত ছক হইতে দেখা যাইবে যে, মুসলিম অঞ্চলে মুসলমান, হিন্দু ও উপজাতীয় জনসংখ্যা দাঁড়াইবে যথাক্রমে শতকরা ৭০·০৯, ২৭·৭৯ এবং ১·৭২। অমুসলমান অঞ্চলে তাহাদের জনসংখ্যার হার হইবে, হিন্দু ৭০·৭০—মুসলিম অঞ্চলে মুসলমান জনসংখ্যার হার হইতে কিছু বেশী; মুসলমান ২২·২১—মুসলিম অঞ্চলে হিন্দু জনসংখ্যা হইতে অনেক কম এবং উপজাতীয়গণ হইবে মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৬·১১ ভাগ। সমগ্র প্রদেশে মোট উপজাতীয় সংখ্যা ১৮,৮৯,৩৮৯, অর্থাৎ সমগ্র জনসমষ্টির শতকরা ৩·১৩ ভাগ। ইহাদের অবস্থা স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা প্রয়োজন এবং তাহা করা হইবে আসামের হিসাব গণনা কালে, কারণ সে সমস্যা

বাংলা অপেক্ষা আসামের ক্ষেত্রেই আরও স্পষ্টতর আকারে দেখা দিবে এবং নিয়ন্ত্রিত হইবে একই নীতির দ্বারা।

এইবারে আসামের অবস্থা বিচার করা যাক:

ছক নং ১৫ (ক)

বিভাগ অথবা জেলা	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট লোকসংখ্যা	মুসলমান	হিন্দু	খৃষ্টান	উপজাতি	অন্যান্য
সুরমা উপত্যকা ও পার্বত্য বিভাগ							
কাছাড় ...	৩,৮৬২	৬,৪১,১৮১	২,৩২,৯৫০ (৩৬·৩৩)	২,২৫,৮১৬ (৩৫·২২)	৩,৯৭৯ (০·৬২)	১,৭৮,২৬৪ (২৭·৮০)	১৭২ (০·০৩)
সিলেট ...	৫,৪৭৮	৩১,১৬,৬০২	১৮,৯২,১১৭ (৬০·৭১)	১১,৪৯,৫১৪ (৩৬·৮৮)	৩,০৫৫ (০·০৯)	৬৯,৯০৭ (২·২৪)	২,০০৯ (০·০৬)
খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চল ...	২,০৫৩	১,১৮,৬৬৫	১,৫৫৫ (১·৩১)	১২,৭০৯ (১০·৭৪)	৪২৪ (০·৩৬)	১,০৩,৫৯৭ (৮৭·২৭)	৩৮০ (০·৩২)
নাগা পার্বত্য অঞ্চল	৪,২৮৯	১,৮৯,৬৪১	৫৩১ (০·২৮)	৪,১৯৮ (২·২১)	৩০ (০·০২)	১,৮৪,৭৬৬ (৯৭·৪৩)	১১৬ (০·০৬)
লুসাই পার্বত্য অঞ্চল	৮,১৪২	১,৫২,৭৮৬	১০১ (০·০৬)	২,৪৪৭ (১·৬০)	৫১ (০·০৩)	১,৪৭,০৪২ (৯৬·২৪)	৩,১৪৫ (২·০৬)
মোট ...	২৪,১২৪	৪২,১৮,৮[illegible]	২১,২৭,২৫৪ (৫০·৪২)	১৩,৯৪,৭১৪ (৩৩·০৬)	৭,৫৩৯ (০·১৮)	৬,৮৩,৫৪৬ (১৬·২০)	৫,৮২২ (০·১৪)

ছক নং ১৫ (খ)

বিভাগ বা জেলা	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট লোকসংখ্যা	মুসলমান	হিন্দু	খৃষ্টান	উপজাতি	অন্যান্য
আসাম উপত্যকা বিভাগ							
গোয়ালপাড়া ...	৩,৯৬৯	১০,১৪,২৮৫	৪,৬৮,৯২৪ (৪৬·২৩)	৩,০৬,২২৩ (৩০·১৯)	২৮৫ (০·০৩)	২,৩৭,৯৯৩ (২৩·৪৬)	৮৬০ (০·০৮)
কামরূপ	৩,৮৪০	১২,৬৪,২০০	৩,৬৭,৫২২ (২৯·০৭)	৬,৯৬,৫৪৯ (৫৫·০৯)	১,১৬৮ (০·০৯)	১,৯৭,৯২৬ (১৫·৬৫)	১,০০৫ (০·০৮)
দরং	২,৮০৪	৭,৩৬,৭৯১	১,২০,৯৯৫ (১৬·৪২)	৩,৪৭,৭৫৮ (৪৭·১৯)	৬,৬৪৩ (০·৯০)	২,৬০,৭৪৮ (৩৫·৩৮)	৬৪৭ (০·০৯)
নওগাঁ	৩,৮৯৮	৭,১০,৮০০	২,৫০,১১৩ (৩৫·১৮)	২,৮৮,৩৫১ (৪০·৫৬)	৪,১৪৭ (০·৫৮)	১,৬৬,৫২৫ (২৩·৪২)	১,৬৬৪ (০·২৩)
শিবসাগর	৫,১২৮	১০,৭৪,৭৪১	৫১,৭৬৯ (৪·৮১)	৬,৪৩,১৯১ (৫৯·৮৪)	১৫,৭০৭ (১·৪৬)	৩,৬০,৭৬৮ (৩৩·৫৬)	৩,৩০৬ (০·৩১)
লক্ষ্মীপুর ...	৪,১৫৬	৮,৯৪,৮৪২	৪৪,৫৭৯ (৪·৯৮)	৫,০১,০০৬ (৫৫·৯৮)	৪,৭৪৫ (০·৫৩)	৩,৩৫,২০০ (৩৭·৪৬)	৯,২৫২ (১·০৩)
গারো পাহাড় ...	৩,১৫২	২,২৩,৫৬৯	১০,৩৯৮ (৪·৬৫)	১৪,০০৭ (৬·৩৯)	২৯ (০·০১)	১,৯৮,৪৭৪ (৮৮·৭৭)	৩৬১ (০·১৬)
মোট ...	২৬,৯৪৭	৫৯,১৯,২২৮	১৩,১৪,৩০০ (২২·১২)	২৭,৯৭,৪১৫ (৪৭·২৬)	৩২,৭২৫ (০·৫৫)	১৭,৫৭,৬৬৪ (২৯·৭০)	১৭,১২৫ (০·২৯)
সাদিয়া সীমান্ত অঞ্চল	৩,৩০৯	৬০,১১৮	৮৬৪ (১·৪৩)	১৮,৫০৬ (৩০·৭৮)	৫১৬ (০·৮৬)	৩৯,৯৭৪ (৬৬·৪৯)	২৫৮ (০·৪৩)
বালিপাড়া সীমান্ত অঞ্চল ...	৫৭১	৬,৫১২	৬১ (০·৯৪)	২,৫৮৮ (৩৯·৭৪)	৩১ (০·৪৮)	৩,৮১২ (৫৮·৫৩)	২০ (০·৩১)
মোট আসাম ...	৫৪,৯৫১	১,০২,০৪,৭৩৩	৩৪,৪২,৪৭৯ (৩৩·৭৩)	৪২,১৩,২২৩ (৪১·২৯)	৪০,৮১৩ (০·৪০)	২৪,৮৪,৯৯৬ (২৪·০৫)	২৩,২২৫ (০·২৩)

১৬ নং ছক

আসামের মুসলমান ও অমুসলমান প্রধান জেলাসমূহ

বিভাগ বা জেলা	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান	হিন্দু	খৃষ্টান	উপজাতি	অন্যান্য	মোট মুসলমান জনসংখ্যা
মুসলমানপ্রধান জেলাসমূহ								
সিলেট	৫,৪৭৮	৩১,১৬,৬০২	১৮,৯২,১১৭ (৬০·৭১)	১১,৪৯,৫১৪ (৩৬·৮৮)	৩,০৫৫ (০·০৯)	৬৯,৯০৭ (২·২৪)	২,০০৯ (০·০৬)	১২,২৪,৪৮৫ (৩৯·২৭)
অমুসলমানপ্রধান জেলাসমূহ								
সমগ্র আসাম-বাদে সিলেট	৪৯,৪৭৩	৭০,৮৮,১৩১	১৫,৫০,০৬২ (২১·৮৭)	৩০,৬৩,৭০৯ (৪৩·২২)	৩৭,৭৫৫ (০·৫৩)	২৪,১৫,০৮৯ (২৪·০৭)	২১,২১৬ (০·৩০)	৫৫,৩৭,৭৬৯ (৭৮·১৩)

উপরে প্রদত্ত ১৫ ও ১৬নং ছকের লোকগণনার হিসাব সম্মুখে রাখিয়া আসামকে যে কোন্ যুক্তিতে মুসলিম অঞ্চলরূপে দাবী করা যাইতে পারে, তাহা দুর্বোধ্য। সমগ্র প্রদেশ হিসাবে মুসলমান জনসংখ্যা মোট লোকসংখ্যার শতকরা মাত্র ৩৩·৭৩ এবং হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৪১·২৯। আর যদি জেলা হিসাবেই গণনা করা যায়, তাহা হইলেও কেবলমাত্র সিলেট জেলায় মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাঁহাদের সংখ্যার হার শতকরা ৬০·৭১। ইহা ব্যতীত অন্য কোন জেলায় তাঁহাদের সংখ্যাধিক্য নাই; কাছাড় ও গোয়ালপাড়ায় তাঁহারা বহুসংখ্যক হইলেও, সংখ্যাগরিষ্ঠ নহেন, ঐ উভয় জেলায় তাঁহাদের সংখ্যার হার যথাক্রমে শতকরা ৩৬·৩৩ ও ৪৬·২৩। মুসলিম অঞ্চলরূপে আসামের কোন একটি জেলাকে যদি দাবী করা চলে, তবে তাহা সিলেট, যদিও মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬০·৭১ ভাগ সংখ্যাধিক্যের অতিশয় উচ্চহার রূপে গণ্য হইবার যোগ্য নয়। ছোট ছোট কয়েকটি জেলায় উপজাতীয়গণ অতিমাত্রায় সংখ্যাধিক, আবার কোথাও কোথাও হিন্দু সম্প্রদায় এককরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠ না হইলেও, উপজাতীয়গণের সহিত যুক্ত হইয়া সংখ্যাগুরুত্ব সম্পাদন করে। সমগ্র প্রদেশের ১৪টি জেলার মধ্যে আটটিতে মুসলমান জনসংখ্যার হার শতকরা পাঁচের কম এবং তিনটিতে একের নিম্নে। যে-কোন অঞ্চলকে মুসলিম অঞ্চল বলিয়া দাবী করিবার পক্ষে লীগের যুক্তি হইতেছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাধিক্য; কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, বিশেষ কোন একটি অঞ্চলে তাঁহারা সংখ্যাবহুল হইলেও, অপর কোন সম্প্রদায় বা সম্প্রদায়সমষ্টির সহিত মিলিত না হইয়া তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু অপর কোন সম্প্রদায় যখন ভারতের অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার দাবী উত্থাপন করা দূরে থাকুক, সে দাবীর বিরোধিতাই করিয়াছেন, তখন লীগ কেবলমাত্র মুসলমান সংখ্যাধিক্যের বলেই সে দাবী উত্থাপন করিতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে উপজাতীয়গণের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। নিম্নে প্রদত্ত ১৭ নম্বর ছক দৃষ্টে আমরা বুঝিতে পারিব, কিরূপে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন দ্বারা এই প্রদেশে হিন্দু-জনসংখ্যা হ্রাস ও মুসলমান-জনসংখ্যা বর্ধিত করা হইয়াছেঃ ধর্মকে সম্প্রদায় বিভাগের ভিত্তিরূপে গ্রহণ না করিয়া, উদ্ভাবন করা হইয়াছে এক উপজাতি সম্প্রদায়ের এবং বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে তাহাদের স্বস্থান হইতে সরাইয়া আনিয়া, লোকগণনার হিসাবে এই নব-রচিত স্তম্ভে আশ্রয় দান করা হইয়াছে।

১৭ নং ছক

১৯০১, ১৯১১, ১৯২১, ১৯৩১ ও ১৯৪১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী প্রধান প্রধান সম্প্রদায়সমূহের জনসংখ্যার হিসাব।

প্রদেশ	মোট লোকসংখ্যা (১৯৪১)	হিন্দু (প্রতি দশ হাজারে)					মুসলমান (প্রতি দশ হাজারে)					উপজাতি (প্রতি দশ হাজারে)				
		১৯৪১	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৯৪১	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৯৪১	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১
বৃটিশ আসাম	১,০২,০৪,৭৩৩	৪১২৯	৫৭২০	৫৪৩৩	৫৪১৮	৫৫৭৮	৩৩৭৩	৩১৯৬	২৮৯৬	২৮১০	২৬৮৯	২৪৩৫	৮২৫	১৪৭৯	১৬৫২	১৬৫২
আসাম দেশীয় রাজ্যসমূহ	৭,২৫,৬৫৫	৪৫১৬	৪৩৬২	৫৯৯৪	৫৮১৬	৫৯৯৬	৪৩৬	৩৯৩	৪৫৫	৪১৯	৩৬৫	৪৬৭৪	৪৪৯১	৩৪৩৩	৩৭৫৮	৩৬৩২
আসাম সর্বমোট	১,০৯,৩০,৩৮৮	৪১৫৪	৫৬২৮	৫৪৬১	৫৪৩৮	৫৫৯৮	৩১৭৮	৩০০৭	২৭৭৮	২৬৯৩	২৫৮১	২৫৮৪	১০৭৩	১৫৭৩	১৭৫৫	১৭৪৪

উল্লিখিত হিসাব হইতে দেখা যাইবে, বৃটিশ আসামে ১৯৩১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী হিন্দু-জনসংখ্যা ছিল শতকরা ৫৭·২০। ১৯৪১ সালের লোকগণনায় তাহা কমিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ৪১·২৯ এবং দেশীয় রাজ্য সমেত সমগ্র আসামে ঐ সময়ের মধ্যে তাহা ৫৬·২৮ হইতে হ্রাস পাইয়া ৪১·৫৪ আসিয়া উপনীত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ঐ একই সময়ের মধ্যে বৃটিশ আসামের উপজাতীয় সংখ্যা ৮·২৫ হইতে বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ২৪·৩৫ এবং দেশীয় রাজ্য সমেত সমগ্র আসামে সে বৃদ্ধির হার ১০·৭৩ হইতে ২৫·৮৪। এই আকস্মিক ও আত্যন্তিক পার্থক্যের হেতু ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আসামের সেন্সাস অপারেশানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কে, ডব্লিউ, পি, মারার, আই, সি, এস, বলেনঃ

'আসল কথা হইল এই যে, উপরে বর্ণিত ছকে ধর্ম পরিচয়ের পরিবর্তে জন্ম পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সময় ও আর্থিক সঙ্গতির সংকুলান হইলে, ১৯৩১ সালের সেন্সাসের সহিত ইহার সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অন্যান্য বিবরণও লিপিবদ্ধ হইতে পারিত, কিন্তু এই ছিন্নান্ত সেন্সাস রিপোর্টে তাহা সম্ভব হইল না। সম্প্রদায় ও ধর্ম অনেকের দৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন পদার্থ বলিয়া মনে হইতে পারে এবং বাস্তবিকপক্ষে অনেকক্ষেত্রে তাহারা বটেও তাহাই। কিন্তু উপজাতির ক্ষেত্রে সম্প্রদায় ও ধর্ম এক নাও হইতে পারে এবং বর্তমান সেন্সাসে তাহাদের শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে, ধর্মগত ভিত্তিতে নয়। গত সেন্সাসে একজন খাসী তাহার ধর্মবিশ্বাস মতে হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান, জড়োপাসক অথবা অন্য যে-কোন ধর্মাবলম্বীরূপে আপনাকে লিপিবদ্ধ করাইতে পারিত, কিন্তু বর্তমান সেন্সাসে তাহার পরিচয় কেবলমাত্র খাসী ছাড়া আর কিছু নয়। এই কারণেই খৃষ্ট ধর্মাবলম্বিগণের সংখ্যার এই বিপুল হ্রাস সংঘটিত হইয়াছে, অবশ্য হিন্দু ও বৌদ্ধ সংখ্যাও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। সঙ্গে সঙ্গে উপজাতীয়গণের সংখ্যা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিসাবটি যদি এই দৃষ্টিকোণ হইতে নিরীক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে, তাহাতে আতঙ্ককর কোন অবস্থা-বিপর্যয়ের ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হইবে না। বিভিন্ন হারে হইলেও, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যাই কিছু-না-কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কোন জেলাতেই বহিরাগত লোকের আবির্ভাব হেতু ভিন্ন এই কারণে পূর্ববর্তী সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাতের বিশেষ কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই।

'হিন্দু অথবা খৃষ্টান জনসংখ্যা লোপ করিবার প্রশ্নই উঠে না। খৃষ্টানদের সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য পরে দেওয়া হইল এবং হিন্দুদের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তাঁহাদের অনুপাত পূর্ববৎ অক্ষুণ্নই রহিয়া গেল। জাতি বা ধর্মগত ভিত্তিতে শ্রেণী-বিভাগ ব্যতিরেকে ১৯৩১ সালের সেন্সাসের ধারা অনুসৃত হইলে তাহার অর্থ হইত এই যে, যে-উপজাতীয় সম্প্রদায় আসামের অধিবাসিগণের মধ্যে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং যাহাদের জন্য এমন বহু বিস্তীর্ণ একটি অঞ্চল সংরক্ষিত এলাকারূপে পরিগণিত, তাহাদের জনসংখ্যা সম্বন্ধে কোনরূপ হিসাব রাখাই সম্ভব হইত না।'৭

7. Census of India, 1941, Volume IX—Assam, Tables, Pp. 21—2.

উপজাতীয়গণকে একটি স্বতন্ত্র স্তম্ভে লিপিবদ্ধ করিবার সময়, সেই সঙ্গে তাহাদের ধর্মও যদি উল্লিখিত হইত, তাহা হইলে, সে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই থাকিত না। সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিতেছেন, 'হিন্দুদের সংখ্যানুপাত পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে'; কিন্তু ছকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র অবস্থা সম্বন্ধে যে চিত্র চোখে পড়ে, তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিভ্রমাত্মক। হিন্দু ও খৃষ্টান জনসংখ্যার হ্রাসপ্রাপ্তি সম্বন্ধে উল্লিখিত কৈফিয়ৎ দিবার পরেও সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্লেশ স্বীকার করিয়া ১৯৪১ সালের এই ছিন্নান্ত সেন্সাস রিপোর্টেও খৃষ্টান জনসংখ্যার একটা হিসাব দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী বৃটিশ ও দেশীয় রাজ্য সমেত সমগ্র আসামের খৃষ্টান সংখ্যা ৬৭,১৮৪র অধিক নয়; বাকী ৩,১৯,০০০, ১৯৩১ সালের লোকগণনার হিসাব অনুযায়ী উপজাতীয় খৃষ্টানদের সংখ্যা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রদেশের খৃষ্টান জনসংখ্যা সম্বন্ধে যথাসম্ভব সঠিক একটা হিসাব দিবার চেষ্টা করা হইলেও, হিন্দু জনসংখ্যা সম্বন্ধে, তাহাদের সংখ্যানুপাত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে'—এই অস্পষ্ট মন্তব্য ছাড়া আর কিছুই উচ্চারিত হয় নাই।

ভারতের ১৯৪১ সালের সেন্সাস কমিশনার মিঃ এম্, ডব্লিউ, এম, ইয়েটস, উপজাতীয়গণের ধর্মের পরিবর্তে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কারণ দর্শাইবার পর বলিতেছেন, 'ব্যাপারটা হইতেছে এই যে, খৃষ্টান, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মে দীক্ষিত হইতে হইলে, দীক্ষা গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিকে যেমন বিশেষ কোন একটি রন্ধ্রের ভিতর দিয়া বা প্রতিবন্ধক উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে হয়, জড়োপাসনারূপ অত্যন্ত অস্পষ্ট আখ্যায় অভিহিত ধর্মবিশ্বাসের সহিত সমপরিমাণ অস্পষ্ট হিন্দুধর্মের মধ্যে সেরূপ কোন নির্দিষ্ট ব্যবধান নাই; যাহা আছে, তাহাকে বিস্তীর্ণ বেওয়ারিশ এলাকা বলিলেও চলে এবং যে পদ্ধতিক্রমে একজন উপজাতীয় ধীরে ধীরে হিন্দুত্বে রূপান্তরিত হইয়া যায়, তাহাকে ধর্মান্তর গ্রহণ বা জনসমষ্টির বিশিষ্ট কোন একটি অংশে যোগদান বলা চলে না, তাহাকে উভয় ধর্মবিশ্বাসের মাঝখানে আস্তৃত বেওয়ারিশ এলাকার ক্রমিক অতিক্রম বলিলেই ঠিক বলা হয়। এই ব্যবধান অতিক্রম করিতে সাধারণতঃ এক পুরুষের অধিককাল কাটিয়া যায়; কখন যে সে অর্ধপথ অতিক্রম করিল এবং কখন যে তাহার হিন্দুত্বে পরিণতির পর্ব অর্ধ সমাপ্ত হইল, তাহা বিশেষজ্ঞের নির্ণয়সাপেক্ষ। শ্রেণী বিভাগের ছক ও তৎসংক্রান্ত পারস্পরিক অনুপাতের হিসাব এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এই দিক হইতে নিরীক্ষণ করিলে বৃটিশ ভারতের মোট জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা সাম্প্রদায়িক অনুপাত দাঁড়ায় নিম্নরূপঃ হিন্দু ৬৪ই, মুসলমান ২৭, খৃষ্টান ১ ও উপজাতীয় ৫ই; ধর্ম হিসাবে বিচার করিলে এই উপজাতীয় সংখ্যার ১/২০ ভাগ খৃষ্টান ও অবশিষ্ট কম-বেশী হিন্দুত্বের অভিমুখী রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। অবশ্য উভয় সম্প্রদায়েরই একপ্রান্তে উপজাতীয় জীবনধারা যদিচ তখনও বিদ্যমান, অপর প্রান্ত কিন্তু ধর্মান্তরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আর এই উভয় প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানে রূপান্তর কার্য চলিতে থাকে ধীর মন্থর গতিতে ও সুস্পষ্ট ক্রমপর্যায়ে। স্থানান্তরে স্থানীয় কোন একটি

হিসাব প্রদান প্রসঙ্গে পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই ক্রম-পরিণতির পরিমাণ প্রদেশ ভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে'।৮

অতঃপর তিনি আরও বলেন, 'উপজাতীয় হিসাবে শ্রেণীবিভাগ সত্ত্বেও বাংলার হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাত কিন্তু অপরিবর্তিতই রহিয়া যায়।......বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের হিসাব কিন্তু উপজাতীয় অনুক্রমিক বিভাগও আত্মস্থ করিবার প্রশ্নকে অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট করিয়া তোলে; কিন্তু ১৯৩১ সালের সেন্সাস কর্তৃক অনুসৃত ধর্মবিশ্বাসকেই যদি শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিরূপে ব্যবহার করা হইত, তাহা হইলে হিন্দু জনসংখ্যার হার ভগ্নাংশ পরিমাণ হ্রাস পাইত।'৯

অন্য কোন ধর্ম সম্প্রদায় অপেক্ষা হিন্দুদের সহিতই যে উপজাতীয়গণের সামঞ্জস্য সর্বাধিক—ইহাই হইল বিশেষজ্ঞদিগের অভিমত। হিন্দুসমাজের মধ্যে তাহাদের এই ক্রমিক বিলয়ের ধারা স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। শত শত শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুসমাজ উপজাতীয় সম্প্রদায়ের বিরাট অংশকে এমন ধীরে ধীরে আত্মস্থ করিয়া আসিতেছে যে, তাহার আকর্ষণে অতীতের সহিত তাহাদের যোগসূত্র কোথাও দৃশ্যতঃ ও দারুণভাবে ছিন্ন হইয়া যায় নাই। এই কারণে পূর্ব পূর্ব সেন্সাসের মত এবারেও যাহারা হিন্দুরূপে আপনাদের পরিচয় দেয়, তাহাদিগকে হিন্দু বলিয়াই গণ্য করা উচিত ছিল।

মিঃ ভেরিয়ার এলউইন, এম এ (অক্সন), এফ আর এ আই, এফ এন আই, উপজাতীয়গণের কৃষ্টি ও আচার ব্যবহার অধ্যয়ন করিবার জন্য মধ্য প্রদেশের উপজাতীয়গণের মধ্যে বহুদিন হইতে বাস করিয়া আসিতেছেন। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস পঞ্চত্রিংশৎ অধিবেশনে নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাখার সভাপতিরূপে অভিভাষণ দিবার জন্য বিষয় নির্বাচন করেন, 'নৃতত্ত্বে সত্যের স্থান'। ভারতবর্ষে নৃতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সর্ববিধ পরীক্ষা কার্যে অতি উচ্চাঙ্গের সত্যান্বেষণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া তিনি বলেনঃ 'এই বিষয়টীর উপর আমি অত্যধিক জোর দিতেছি এই কারণে যে, ভারতবর্ষে নৃতত্ত্বকে সন্দেহের চক্ষে দেখা হইয়া থাকে। তাহার হেতু অবশ্য অনেক। কোন কোন মনীষী ও রাজনীতিক লোকগণনার সময় উপজাতীয়গণকে হিন্দুসম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করেন, তাহার ফলে অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, প্রয়োজন হইলে বিজ্ঞানও রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। সেন্সাস কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে জড়োপাসনা ও হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রভেদ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য "উপজাতীয় ধর্মাবলম্বী" শব্দটী ব্যবহার করা হয়। কোন একজন লোক হিন্দু অথবা উপজাতীয় তাহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হইত, সে হিন্দু অথবা উপজাতীয় কোন্ দেব-দেবীর উপাসনা করে। কিন্তু এ প্রশ্ন অর্থহীন। অন্ততঃ-পক্ষে ভারতীয় উপদ্বীপের অভ্যন্তরস্থ উপজাতীয়গণ ধর্মের দিক দিয়া যে হিন্দু

8. Census of India, 1941, Vol. I—India, Pp. 28—9.
9. Census of India, 1941, Vol. I—India, P. 30.

গোষ্ঠীভুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই; তাহা ছাড়া, হিন্দুধর্মের মধ্যেও এমন অনেক কিছু আছে যাহা ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির বিচারে জড়োপাসনারূপে বিবেচিত হইতে পারে। এই কারণে ধর্মজ্ঞাপক স্তম্ভে উপজাতীয়গণকে প্রথম হইতেই হিন্দুদের সহিত একত্র লিপিবন্ধ করা উচিত ছিল। ইহা ছাড়া, অন্য যে কোন প্রকারের শ্রেণী বিভাগ অর্থ-হীনতা হইতেও নিরর্থক। বিভিন্ন উপজাতির ধর্মগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা অতিশয় সুদক্ষ ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও দুঃসাধ্য, অশিক্ষিত ও অজ্ঞ লোকগণনাকারী সেই অসাধ্য কিরূপে সাধন করিবে! দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে উপজাতীয়গণ যাহাতে তাহাদের যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারে—এই উদ্দেশ্যে আমরা চাই মাত্র তাহাদের সংখ্যা নির্ধারণ করিতে। ইহা ছাড়া তাহাদের ধর্ম অথবা গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের কোনই অভিজ্ঞতা নাই। তাহা সত্ত্বেও কোন কোন নৃতত্ত্ববিদ্ হিন্দু-সমাজের সহিত উপজাতীয়গণের পার্থক্য নির্ণয় করিবার জটিল পন্থা আবিষ্কার করিতে গিয়া আমাদের বিজ্ঞানের শ্রদ্ধার আসন লোকচক্ষে হেয় ও অবনমিত করিয়াছেন।' ১০

সেন্সাস কর্তৃপক্ষের এই অন্যায় ও অযৌক্তিক হস্তক্ষেপের ফলে হিন্দু জন-সংখ্যার হার যে কোন কোন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে এবং সমগ্রভাবে সর্বভারতে যথেষ্ট সংখ্যায় হ্রাস পাইয়াছে—উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ হইতে প্রমাণিত হয় যে, সে কথা তাঁহারা নিজেরাও স্বীকার করেন। ভারতের সেন্সাস কমিশনার মিঃ ইয়েট্স দেখাইয়াছেন, 'উপজাতীয় শ্রেণীবিভাগ ব্যবস্থার দ্বারা মুসলমান জন-সংখ্যার হার অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই; বরঞ্চ পূর্ব পূর্ব বারের সেন্সাস হইতে যে ক্রমিক বৃদ্ধি চলিয়া আসিতেছে, বর্তমান বর্ষে লোক-গণনার হিসাবেও তাহা অব্যাহত দেখিতে পাই। তাহার কারণ সেই সেই বৎসরের সেন্সাস রিপোর্টে বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে। বাংলার অবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত; পাঞ্জাবে শতকরা ½ হইতে ১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আসামের বৃদ্ধির হার বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য এবং এক্ষেত্রেও তাহার হেতু বিশেষভাবে ময়মনসিংহ হইতে ও সাধারণভাবে সমগ্র পূর্ববঙ্গ হইতে আগত লোকের সংখ্যাবাহুল্য।' ১১

১৭ নম্বর ছকে আসামের অধিবাসিগণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়সমূহের সংখ্যানুপাত দেখান হইয়াছে। হিন্দু জনসংখ্যা যে কেন সহসা হ্রাস পাইল তাহারও হেতু যথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মুসলমান জনসংখ্যার ক্রমিক ও অব্যাহত বৃদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৯০১ সালে বৃটিশ আসামের সমগ্র লোক সমষ্টির মধ্যে তাহাদের জনসংখ্যার হার ছিল মাত্র ২৬·৮৯ এবং ১৯৪১ সালের মধ্যে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল ৩৩·৭৩। বিশেষভাবে ময়মনসিংহ ও সাধারণ-ভাবে সমগ্র পূর্ববঙ্গ হইতে আগত লোকের সংখ্যাধিক্যই এই বৃদ্ধির জন্য অনেকাংশে দায়ী। ১৯৩১ সালের সেন্সাস বিবরণীতে পূর্ণ একটি পরিচ্ছেদ ব্যাপিয়া এই বহিরাগত সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পর দেখান হইয়াছে যে, বাহির হইতে

10. Proceedings of the Thirty-First Science Congress, Delhi, 1944, P. 91.
11. Census of India, 1941, Vol. I—India, Tables, P. 29.

আগত জনস্রোত আসামে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে নিম্নলিখিত তিনটী মূল ধারা বাহিয়া: (১) চা বাগানের কুলি-মজুর দল, (২) পূর্ববঙ্গের ঔপনিবেশিক দল ও (৩) নেপালীগণ। ১৯৩১ সালের আসামের সেন্সাস সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ সি, এস, মুল্লান, এম এ, আই সি এস, বলেন, 'বর্তমান সেন্সাসে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্তন লক্ষ্য হয়। বহিরাগত জনস্রোত বাংলা হইতে পূর্ববৎ বহিয়া আসিয়াছে, কিন্তু যে সমস্ত প্রদেশ হইতে কুলী সংগৃহীত হইয়া থাকে, তথাকার আগত লোকসংখ্যা পূর্বের হার বজায় রাখিতে পারে নাই।' ১২

আসামে বসবাস স্থাপনের উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত জনসমাগম সম্বন্ধে আসামের সেন্সাস রিপোর্ট হইতে একটু দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন:

'বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই প্রদেশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল, সাধারণভাবে পূর্ববঙ্গ হইতে ও বিশেষভাবে ময়মনসিংহ হইতে বিপুলসংখ্যক বাঙ্গালীর ভূমির সন্ধানে আসামে প্রবেশ; এস্থলে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, বহিরাগত এই বাঙ্গালী জনসংখ্যার অধিকাংশই মুসলমান। ১৮২০ সালে বর্মীগণের আক্রমণের ফলে যাহা সম্ভব হয় নাই, এই ঘটনার আঘাতে হয়তো তাহাই সাধিত হইবে: আসামের সমগ্র ভবিষ্যৎ হয়তো স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, আসামী সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। এই আক্রমণ সুরু হয় ১৯১১ সালের পূর্ববর্তী কোন এক সময় হইতে এবং এই সালের সেন্সাস রিপোর্টেই এই অভিযাত্রী বাহিনীর অগ্রগতির সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়। যে প্রথম বাঙ্গালী দলের গোয়ালপাড়ার চরে বসবাস স্থাপন ১৯১১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ হয়, এখন দেখা যাইতেছে পশ্চাদ্বর্তী এক বিরাট বাহিনীর তাহারা অগ্রগামী সৈনিক দল মাত্র। ১৯২১ সালের মধ্যে প্রথম সৈনিক দল আসামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সমগ্র গোয়ালপাড়া অধিকার করিয়া ফেলে। ১৯১১ সাল হইতে ১৯২১ সালের মধ্যবর্তী কালের ঘটনার গতি সম্বন্ধে ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হয়:

"১৯১১ সালে পূর্ববঙ্গ হইতে অতি অল্পসংখ্যক কৃষকই গোয়ালপাড়া অতিক্রম করে। আসাম উপত্যকার অন্যান্য জেলায় সেন্সাস রিপোর্টে যাহাদের নাম লিপিবদ্ধ হয়, সংখ্যায় তাহারা কয়েক সহস্রের অধিক হইবে না এবং তাহাদের অধিকাংশই ছিল কেরাণী, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য বৃত্তিজীবী। গত দশ বৎসরের মধ্যে এই অগ্রগতি উপত্যকার বহু দূর উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। উত্তর আসামের দুইটি জেলা এখনও আক্রান্ত না হইলেও, নিম্ন ও মধ্য আসামের জেলা চারিটীতে সমগ্র অধিবাসী-সংখ্যার মধ্যে বহিরাগতদের সংখ্যার হার আজ আর নগণ্য নয়। এই ঔপনিবেশিক দল গোয়ালপাড়া জেলার সমগ্র জনসংখ্যার আজ শতকরা ২০ ভাগ। তাহার পরেই তাহাদের মনোমত স্থান নওগাঁ জেলা, এখানে মোট জনসংখ্যার তাহারা ১৪ ভাগ। কামরূপ জেলায়, বিশেষ করিয়া বড়পেটা মহকুমায় পতিত জমি দ্রুত বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইতেছে। দরং জেলায় অনুসন্ধান ও বসবাস স্থাপন কার্য এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে পড়িয়া রহিয়াছে, অভিযাত্রী দল ব্রহ্মপুত্রের তীর

12. Census of India, 1931, Vol. III, Assam Report, Part 1, P. 44.

অতিক্রম করিয়া আজও অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে নাই। প্রতিটী ট্রেণ এবং ষ্টীমার ঔপনিবেশিক বাহিনীর নব নব দল যেভাবে প্রতিদিন বহন করিয়া আনিতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, তাহারা অচিরে আরও উত্তরে অগ্রসর হইয়া, নদী অতিক্রম করিয়া বহু দূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।"

'অতঃপর ১৯২১ সাল হইতে এই অগ্রগতির ধারা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, বহিরাগতদের যে সব সন্তান-সন্ততি আসামে আসিবার পর জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেন্সাস-বিবরণীতে তাহাদিগকে আসামে ভূমিষ্ঠরূপেই গণনা করা হইয়াছে। কাজেই নিম্নে প্রদত্ত ছকে তাহাদের হিসাব ধরা হয় নাই। নীচের ১৮নং ছকে কেবলমাত্র বহির্গমনকারীদের নয় সমগ্র বাংলার শিশুজন্মের হার দেখান হইয়াছে। গত দশ বৎসর যাবৎ যাহা ঘটিয়া আসিতেছে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট একটা ধারণা এই ছক হইতে আমরা পাইতে পারিব।

'বহিরাগত ঔপনিবেশিক দলের বন্যাপ্রবাহের জন্য প্রধানতঃ ময়মনসিংহ জেলাই দায়ী বলিয়া উক্ত জেলার জন্মসংখ্যা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল।

নিম্নে প্রদত্ত এই আতঙ্ককর হিসাব হইতে আমরা বুঝিতে পারি, নিম্ন আসাম উপত্যকার জেলাগুলি কি অদ্ভুত দ্রুততার সহিত ময়মনসিংহ জেলার উপনিবেশে রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে।......পূর্বেই বলিয়াছি, প্রথম সৈন্যদল ১৯২১ সালের মধ্যে গোয়ালপাড়া বিজয় সমাপ্ত করে। দ্বিতীয় সৈন্যদল তাহারই অনুসরণ করিয়া ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩১ সালের মধ্যে আসামে প্রবেশ করিল এবং গোয়ালপাড়া জেলায় তাহাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া নওগাঁ সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিল। অতঃপর কামরূপ জেলার বড়পেটা মহকুমা আক্রমণকারী সৈন্যদলের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে দরং আক্রমণ আরম্ভ হয়। শিবসাগর এই আক্রমণের হাত হইতে আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু কয়েক সহস্র ময়মনসিংহবাসী কর্তৃক অধ্যুষিত উত্তর লক্ষ্মীপুর আগামী দশ বৎসরের মধ্যে পরবর্তী আক্রমণ পরিচালনের জন্য মূল্যবান ঘাটীরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে......।

'আসামে ভূমিষ্ঠ সন্তান-সন্ততি সহ আসাম অধিবাসী এই পূর্ববঙ্গীয় ঔপনিবেশিক দলের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ১৯২১ সালে মিঃ লয়েড বলেন, তাঁহার হিসাব অনুযায়ী আসামে ভূমিষ্ঠ পুত্র-কন্যা সহ এই অধিবাসীদলের সংখ্যা ঐ সালে অন্ততঃপক্ষে ৩০০,০০০। আমার হিসাব মতে তাহাদের বর্তমান সংখ্যা ৫ লক্ষেরও অধিক। কেবলমাত্র ময়মনসিংহ হইতেই নবাগত অভিযাত্রীদলের সংখ্যা হইবে ১৪০,০০০। ইহা ছাড়া পুরাতন বাসিন্দাগণ আছে ও তাহারা যথারীতি বংশ বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। ১৯২১ সালের সেন্সাস-বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, ঔপনিবেশিকদল একক আসে নাই, আসিয়াছিল সপরিবারে। যে সব ব্যক্তি ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করিয়া আসাম সেন্সাসে গণিত হইয়াছে, তাহাদের মোট সংখ্যা ৩৩৮,০০০ এবং তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১৫২,০০০। এই হিসাব হইতে উল্লিখিত উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। ভবিষ্যৎ কি হইবে? যতদূর দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে মনে হয়, আক্রমণ আজিও সমাপ্ত হয় নাই; আসামে, বিশেষ করিয়া

১৮ নং ছক

[১৯১১, ১৯২১ ও ১৯৩১ সালে আসাম উপত্যকার প্রতি জেলার যত লোক বাংলায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তাহার হিসাব '০০০' বাদে দেওয়া হইল।]

বৎসর	গোয়ালপাড়া	কামরূপ	দারাং	নওগাঁ	শিবসাগর	লক্ষ্মীপুর
১৯১১	৭৭ (ময়মনসিং ৩৪)	৪ (ময়মনসিং ১)	৭ (ময়মনসিং ১)	৪ (ময়মনসিং ১)	১৪ (ময়মনসিং ০)	১৪ (ময়মনসিং ০)
১৯২১	১৫১ (ময়মনসিং ৭৮)	৪৪ (ময়মনসিং ৩০)	২০ (ময়মনসিং ১২)	৫৮ (ময়মনসিং ৫২)	১৪ (ময়মনসিং ০)	১৪ (ময়মনসিং ০)
১৯৩১	১৭০ (ময়মনসিং ৮০)	১৩৪ (ময়মনসিং ৯১)	৪১ (ময়মনসিং ৩০)	১২০ (ময়মনসিংহ ১০৮)	১২ (ময়মনসিং ০)	১৯ (ময়মনসিং ২)

উত্তর লক্ষ্মীপুর মহকুমায় ও কামরূপ জেলায় এখনও অনাবাদী জমি পড়িয়া রহিয়াছে প্রচুর; গত দশ বৎসরের মধ্যে বহু বহিরাগত পরিবারকে সে অঙ্কে ধারণ করিয়াছে সত্য, তথাপি আরও বহুসংখ্যক পরিবারকে ধারণ করিবার মত সামর্থ্য এখনও তাহার আছে। মঙ্গলদই মহকুমাও আরও বহুতর পরিবারের বসবাস স্থাপনের পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রশস্ত। গোয়ালপাড়া ও নওগাঁ জেলার অধিকাংশ পতিত জমিই বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পরবর্তী অভিযান কামরূপ, মঙ্গলদই ও উত্তর লক্ষ্মীপুর অভিমুখে পরিচালিত হওয়াই স্বাভাবিক। লক্ষ্মীপুর এলাকায় প্রচুর পরিমাণে পতিত জমি হাল ও ফালের প্রহার প্রতীক্ষায় প্রহর গণিতেছে—এই শুভ সংবাদটি যদি মূল অভিযাত্রী-বাহিনীর কাণে গিয়া পেঁছায়, দেখিতে দেখিতে সে অঞ্চল স্বর্ণপ্রসূ স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হইয়া যাইবে।

'অত্যন্ত শোচনীয় হইলেও, আগামী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে অবস্থা দাঁড়াইবে এই যে, সমগ্র আসামের মধ্যে একমাত্র শিবসাগর জেলা ব্যতীত আসামীদের পক্ষে স্বচ্ছন্দে বসবাসের যোগ্য তিল পরিমিত স্থান আর অবশিষ্ট রহিবে না।' ১৩

১৯৪১ সালের সেন্সাস-বিবরণী অন্যত্র উল্লিখিত একটি ক্ষুদ্র অথচ অর্থপূর্ণ বাক্যের দ্বারা এই কাহিনীর উপসংহার করিয়াছে ঃ 'আসামেই মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষগোচর এবং ইহার দ্বারা ময়মনসিংহ ও সাধারণভাবে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত জনতার চাপ আরবার সূচিত হয়।' ১৪

গত ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাঙলা গভর্ণমেণ্টের এক ইস্তাহার হইতে প্রমাণিত হয় যে, আসামে এই উপনিবেশ স্থাপনের পর্ব আসামের সাদুল্লা মন্ত্রিসভা ও বাঙলার নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভা এই যুগ্ম লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীর মিলিত তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হইয়াছিলঃ

'আসাম গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ১৯৪০ সালের ২১শে জুন তারিখে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৩৮ সালের ১লা জানুয়ারীর পর বাহির হইতে আগত কোন ব্যক্তিকে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা ময়মনসিংহের ন্যায় প্রান্তবর্তী জেলার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কারণ, এই প্রদেশের কৃষিযোগ্য ভূমির উপর অত্যধিক চাপ হেতু এই জেলা হইতে বহু কৃষক জমির সন্ধানে আসামে গমন করে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিগত অধিবেশনে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, আসাম উপত্যকায় জমি বন্দোবস্ত লইবার পক্ষে এই প্রদেশের কৃষকদের উপর আসাম গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক আরোপিত সমস্ত বিধি-নিষেধ যাহাতে অবিলম্বে প্রত্যাহৃত হয় তাহার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিবার উদ্দেশ্যে বাঙলার গভর্ণরের নিকট একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করা হউক। তদনুযায়ী বাঙলার গভর্ণমেণ্ট আন্তঃপ্রাদেশিক সৌহার্দ্যের খাতিরে ও বাঙলার দুঃস্থ কৃষকদের দুর্গতি লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে

13. Census of India, 1931, Vol. III, Assam Report, Part I, pp. 49—52.
14. Census of India, 1941, India, Tables, P. 29.

ঐ সমস্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিবার অথবা তাহাদের প্রয়োগ স্থগিত রাখিবার জন্য আসাম গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া পাঠান।

'তদুত্তরে আসাম গভর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন, বহিরাগতদিগকে জমি বন্দোবস্ত দিবার নীতি ইতিমধ্যেই অনেকখানি শিথিল করা হইয়াছে এবং সে কার্য যাহাতে আরও ত্বরান্বিত হয় সেই উদ্দেশ্যে কোন কোন জেলায় গো-চারণের জন্য সংরক্ষিত জমির উদ্বৃত্ত অংশ বন্দোবস্ত করিবার জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বিধি-নিষেধসমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করিতে আসাম গভর্ণমেণ্ট অক্ষম, বিশেষ করিয়া সেই সব অঞ্চলে—উপজাতীয়গণ যেখানে সংখ্যাবহুল; কারণ বহিরাগতদের আগমনের ফলে অতীতে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া পুনরাগমন সম্ভাবনায় তাহারা শঙ্কিত; তবে গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দিয়াছেন যে, আদিম অধিবাসিগণের জন্য ভূমি-সংরক্ষণ ও উপজাতীয় সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বিধিনিষেধসমূহের ক্রমিক অবলোপ যাহাতে সাধিত হয় ও বহিরাগতদের বসবাসের জন্য নূতন নূতন অঞ্চল যাহাতে উন্মুক্ত হয়, তৎপ্রতি তাঁহারা অবহিত হইবেন।'

এখানে সুস্পষ্টরূপে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, এই নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া সাদুল্লা মন্ত্রিসভা আসামের ভূতপূর্ব গভর্ণর স্যার রবার্ট রীডের পূর্ব-গৃহীত সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিলেন। স্যার রবার্ট রীড তৎকালীন ভূমি-বন্দোবস্ত-নীতি পর্যালোচনা করিবার পূর্ববর্তী সাদুল্লা মন্ত্রিসভার রচিত একটি ক্রমোন্নয়ন-পরিকল্পনা প্রত্যাহার করিবার আদেশ দেন ও সেই প্রসঙ্গে বলেন: 'আসামের উপজাতীয় আদিম অধিবাসিগণ যে অঞ্চলে (আসাম উপত্যকা) বসবাস করিত, বাঙলার ময়মনসিংহ জেলা হইতে আগত এক প্রবল মুসলমান-জনস্রোত আসিয়া তাহা প্লাবিত করিয়াছে, তাহার জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহা মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে সন্তোষজনক হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুদের পক্ষে নয়; কারণ, আসামে মুসলমান জনসংখ্যা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, পাকিস্থানের দাবী হইবে সেই পরিমাণে প্রবলতর।'[15] নবাগত জনতার চাপ আসিয়া যাহাতে স্থায়ী বাসিন্দাদের স্বার্থ বিপন্ন করিতে না পারে—তদুদ্দেশ্যে আসামের অংশ-বিশেষের উপর দিয়া একটি সীমা-রেখা টানিয়া ঔপনিবেশিক দলকে তাহার অপর পারে অবস্থান করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। আসামে ইহাই জনসাধারণের মধ্যে 'লাইন-প্রথা' নামে পরিচিত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আক্রমণ এখন আর নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করিয়াই নিরস্ত নয়, যে গোচারণক্ষেত্রের পবিত্রতা ও মর্যাদা বৃটিশ শাসনের সূত্রপাত হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সসম্মানে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহা পর্যন্ত আজ আক্রান্ত: এই রক্ষিত অঞ্চলকে লক্ষ্য করিয়াই বাঙলা গভর্ণমেণ্টের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, বিধি-নিষেধের ক্রমিক বিলোপ সাধন ও নবাগতদের

15. Quoted in an article—'The Background of Immigration into Assam', published in the 'Hindusthan Standard', of 19th Dec. 1944.

বসবাসের জন্য নূতন নূতন এলাকা উন্মুক্ত করিয়া দিবার পক্ষে আসাম গভর্ণমেণ্ট আশ্বাস দিয়াছেন।

আসামের হিন্দুদের বিরুদ্ধেও যে সাঁড়াশী অভিযান পরিচালিত হইয়াছে, হিন্দু ও উপজাতি উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষেই তাহার গুরুত্ব উপলব্ধির যোগ্য। আসামের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসিগণ যে জমির মালিক এবং তাহাদের আপন আত্মপ্রসারের জন্য যাহা একান্ত অপরিহার্য, সাঁড়াশীর এক বাহু পূর্ববঙ্গের বিশেষ করিয়া ময়মনসিংহের মুসলমানগণকে তাহা অধিকার করিয়া লইবার জন্য আসাম অভিমুখে পরিচালিত করিতেছে এবং অপর বাহু হিন্দুগণকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করিবার, অন্ততঃপক্ষে, কোন সম্প্রদায়ই একক হিসাবে যাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবী করিতে না পারে সেইরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে উপজাতীয়গণকে হিন্দুসম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিতেছে। কিন্তু অবস্থার পরিহাস হইল ইহাই যে, উপজাতীয়গণের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করিবার প্রয়োজনীয়তার যুক্তিতে সেন্সাস কমিশনার মিঃ ইয়েট্স তাহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে সমর্থন করিলেন; এই প্রসঙ্গে তিনি ইহাও স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, এই উপজাতীয় সম্প্রদায়ের কল্যাণকামনাবশেই ভারত শাসন আইনে ৯১ ও ৯২ ধারা বিধিবন্ধ হইয়াছে এবং গভর্ণরগণের বিশেষ দায়িত্বের অধীন সংরক্ষিত বা অর্ধসংরক্ষিত অঞ্চলসমূহ সৃষ্টি করা হইয়াছে। ১৬ আসামের জনৈক অভিজ্ঞ সিভিলিয়ান কর্মচারী মিঃ এস, পি, দেশাই, আই, সি, এস-এর নিম্নোদ্ধৃত বিবৃতির দ্বারা প্রমাণিত হইবে, আসামের ভূমি সম্পর্কিত ব্যাপারে সেই সব বিশেষ দায়িত্ব কিভাবে প্রতিপালিত হইতেছে; 'আসামের ভূমি ও রাজস্ব-সংক্রান্ত আইন অন্ততঃপক্ষে বহিরাগত আক্রমণকারীদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। নবাগতগণ প্রকাশ্যভাবে দাবী করে, স্থানীয় সরকারী কর্মচারিগণকে তাহারা হাত করিয়া ফেলিয়াছে। প্রতিদিন সংরক্ষিত অঞ্চলে নূতন নূতন বাঁশের চালা ও অস্থায়ী আবাস গজাইয়া উঠিতেছে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এই অভিযাত্রীদল উর্ধতন মহকুমা হাকিম হইতে আরম্ভ করিয়া স্থানীয় সমস্ত সরকারী কর্মচারীকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া চলে; এমন কি, প্রশ্ন করিলে, তাহার উত্তর পর্যন্ত তাহারা দেওয়া প্রয়োজন মনে করে না। মুষ্টিমেয় নেপালী পশুপালচারক ও আসামী পামুয়া দল কোন দিক হইতে কোন আশ্বাস না পাইয়া সম্রাটের দোহাই পাড়িতে থাকে। তাহার উত্তরে কোন কোন অর্বাচীন-নবাগত নাকি এমন কথাও বলিয়াছে যে, সম্রাট তো তাহারাই। আসামীগণের অবমাননার পাত্র আজ কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহারা অনুভব করিতেছে, আইন শুধু তাহাদেরই জন্য, নবাগতদের জন্য নয় এবং যে গভর্ণমেণ্ট তাহাদের স্বার্থের রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক, সে তাহার দায়িত্ব পালনে আজ অক্ষম। স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ই বিশেষভাবে বিচলিত এবং তাহাদের আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়া অন্তর্নিহিত গভীর বিদ্বেষ ব্যক্ত হইয়া পড়ে।' ১৭

---

16. Census of India, 1941, Vol. 1, India, Tables, p. 28.
17. Quoted in 'The Background of Immigration into Assam', published in the 'Hindusthan Standard', 19th Dec., 1944.

লীগ মন্ত্রিসভার প্রশ্রয়ে উৎসাহিত হইয়া ও ব্যবস্থা পরিষদের ঔপনিবেশিক সদস্যগণের দ্বারা সাহায্যপুষ্ট হইয়া এই আক্রমণকারী নবাগতবাহিনী গবাদি পশুকে অঙ্গহীন করা প্রভৃতি অশেষবিধ অনাচার ও অত্যাচারমূলক কার্যে তৎপর হইয়া উঠিল। পশুপালকগণ প্রায়শঃই আক্রান্ত ও মাঝে মাঝে নিহত হইতে থাকিল। তাহার ফলে জাগিয়া উঠিল দেশব্যাপী বিদ্বেষ ও ঘৃণা। আইন পরিষদের ১৯৪৪ সালের নভেম্বর-অধিবেশনে গভর্ণমেণ্টকে বিরোধী দলের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়; প্রায় আড়াই বৎসর পরে অন্যান্য দলের সহিত কোয়ালিশনে যথাবিধিভাবে গঠিত দলরূপে আইনপরিষদ-কক্ষে বিরোধীদলের ইহাই সর্বপ্রথম আবির্ভাব। জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্ট গভীর অসন্তোষ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়া, ভূমি-বন্দোবস্ত-সংক্রান্ত সমগ্র ব্যাপারটি সেখানে আলোচনা করিবার ও প্রয়োজনানুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পক্ষে একটি প্রস্তাব স্যার মহম্মদ সাদুল্লার নিকট উত্থাপন করা হয়। সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি কামনা করিয়া স্বয়ং গভর্ণর এই অধিবেশনে অভিভাষণ প্রদান করেন। স্যার সাদুল্লা বিরোধীদলের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন ও তদনুযায়ী ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে একটি সম্মেলন আহূত হইল। নিম্নলিখিত দুইটি প্রধান বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ভূমি-বন্দোবস্ত-সংক্রান্ত সমগ্র ব্যবস্থাটি পর্যালোচিত হয়ঃ (১) ইতিপূর্বে অন্যায় ও অত্যধিক পরিমাণে সুবিধাপ্রাপ্ত নবাগতদের সহিত স্থানীয় ভূমিহীন লোকদিগকেও পরিকল্পনানুযায়ী পতিত জমি বন্দোবস্ত দিবার নীতি গ্রহণ ও উপজাতিগণকে তাহাদের জন্য, বিশেষভাবে সংরক্ষিত অঞ্চলের মধ্যে বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করা এবং (২) গোচারণক্ষেত্র হইতে অনধিকার প্রবেশকারীদের বহিষ্কৃত করিয়া তাহার অখণ্ডতা বজায় রাখা। কিন্তু ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে গভর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, এই সম্মেলনের প্রস্তাবিত রক্ষা-ব্যবস্থা তাহার অঙ্গীভূত তো হইলই না, বরঞ্চ মূলতঃ অনেক বিষয়ে তাহা সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধী হইল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পতিত জমি পাইবার দাবী কেবলমাত্র তাহাদেরই স্বীকৃত হইবে—১৯৩৮ সালের পূর্বে যাহারা আসামে আসিয়াছে; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবে কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল, ১৯৩৮ সালের পরে আগত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেণীবিশেষকে গোচারণ-ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইল এবং তিন বৎসরের অধিককাল হইতে গোচারণ-ভূমি যাহারা দখলে রাখিয়াছে ও চাষ করিয়া আসিতেছে, জমির উপর তাহাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্থানীয় কর্মচারিগণের হস্তে অবাধ ক্ষমতা অর্পিত হইল। পতিত জমির বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বিধান হইল, পাঁচ বিঘা জমি যাহার আছে সে আর নূতন কোন জমি বন্দোবস্ত লইতে পারিবে না। এখন ব্যাপার দাঁড়াইল এই যে, সাংসারিক প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত না হইলেও, অধিকাংশ স্থানীয় কৃষকেরই এই পরিমাণ জমি ছিল, কাজেই এই ধারা তাহাদের নূতন জমি বন্দোবস্ত পাইবার পথে অযোগ্যতার অন্তরায় সৃষ্টি করিল। তাহা ছাড়া, উপজাতিদের জন্য যে অঞ্চল সংরক্ষিত রাখিবার কথা, তাহার সীমানা সুস্পষ্টরূপে নির্ধারিত না

হওয়ায়, যথেষ্ট অনিশ্চয়তা ও অব্যবস্থার সম্ভাবনা রহিয়া যায়। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসের বাজেট অধিবেশনে বিষয়টি পুনরায় ব্যবস্থাপকসভা কর্তৃক আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। এদিকে বিরোধীদল ইতিমধ্যে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, কাজেই স্যার মহম্মদ সাদুল্লা পরাজয় ও পদত্যাগের আশঙ্কায় বিরোধীদলের সহিত আপোষ-রফায় সম্মত হইলেন। তিনি লীগ দলীয় রাজস্বমন্ত্রীকে অপসারিত করিয়া, তাঁহার স্থলে বিরোধী পক্ষের মনোনীত এক ব্যক্তিকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

স্যার সাদুল্লা ইতিপূর্বে কথা দিয়াছিলেন, যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত চুক্তির সর্তসমূহ কার্যকরী করিবার জন্য তিনি সচেষ্ট হইবেন; কিন্তু পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী হইবা মাত্র তিনি সে প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইলেন এবং তাহার ফলে প্রস্তাবটী যথারীতি প্রণয়ন ও প্রকাশ করিতেই প্রায় তিন মাসকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। বর্তমানে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তিনি ও লীগ মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ সম্পাদিত চুক্তি কার্যে পরিণত হইবার পথ সকল প্রকারে ব্যাহত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। এমনও সংবাদ আসিতেছে যে, লীগনেতা মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না মন্ত্রিসভার উদ্দেশে এমন সব নির্দেশ প্রচার করিতেছেন, যাহা চুক্তিপত্রের মূলনীতির বিরোধী। এদিকে বর্তমান পরিষদের আয়ুষ্কালও সমাপ্ত প্রায়, অবস্থা অতঃপর কি দাঁড়াইবে কে বলিতে পারে!

কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও সমগ্র প্রদেশের হিন্দুগণ এখনও মুসলমানদের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর উপজাতিগণ যদি হিন্দুদের সহিত যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মিলিত জনসংখ্যা হইবে আরও অধিক গরিষ্ঠতর। স্মরণ থাকিতে পারে, যে সকল ইউনিট লইয়া অঞ্চল দুইটি গঠিত হইবে, তাহাদের প্রত্যেকেই হইবে স্বাধীন এবং সার্বভৌম ইহাই ছিল লীগ প্রস্তাবের মর্ম। সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৩৩·৭৩ ভাগ মুসলমান লইয়া আসামের ন্যায় মুসলমান-সংখ্যালঘু প্রদেশ যে কিরূপে স্বায়ত্তশাসনশীল ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র হইতে পারে, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। ইহার দ্বারা কোনরূপ রাষ্ট্র গঠন করা যদি সম্ভব হয়, তবে পূর্বাঞ্চলে অমুসলমান স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রই হইবে ইহার সত্যকার স্বরূপ। ইহার উপর মুসলমান-প্রধান সিলেট জেলা যদি আসাম হইতে বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রদেশের অন্যান্য জেলাগুলির ও সিলেটের অবস্থা যাহা দাঁড়াইবে, ইতিপূর্বে ১৬ নম্বর ছকে তাহা দেখান হইয়াছে।

কিন্তু পাকিস্থান-সমর্থক দলের উদ্ভাবনীশক্তি অসীম এবং আসামকে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষে তাঁহাদের যুক্তিও অসংখ্য। প্রদর্শিত যুক্তির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

(১) মুসলমানগণ যে অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসাম সেই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

(২) আসামের অধিকাংশ অমুসলমান জনসংখ্যা উপজাতীয়।

(৩) মুসলমানগণ প্রদেশে সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহা নিম্নলিখিতরূপ: আসামের মোট লোক-সংখ্যা ১ কোটি ৯ লক্ষ, তন্মধ্যে হিন্দু-জনসংখ্যা মাত্র ৪৫ লক্ষ। অর্থাৎ শতকরা

৪১·৫ ভাগ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হিন্দুগণ মোট অধিবাসী-সংখ্যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। কারণ, সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে ২৯ লক্ষ, অর্থাৎ শতকরা ২৬·৭ ভাগই উপজাতি; ইহারা সুসভ্য রাষ্ট্রের নাগরিক জীবন যাপনের সম্পূর্ণ অযোগ্য, কাজেই যে কোনরূপ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রসঙ্গে তাহাদের কথা উত্থাপিত হইবার অনুপযোগী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রাপ্য শাসনতান্ত্রিক অধিকার ৮০ লক্ষ সভ্য সম্বলিত কেবলমাত্র হিন্দু অথবা মুসলমান সমাজেরই সম্ভোগের যোগ্য। আসামের চা বাগান ও তৈল খনি এলাকায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বিপুল সত্য, কিন্তু তাহারা সকলেই অবাসিন্দা ও অস্থায়ী। কাজেই শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রসঙ্গে এই ১৫·২ লক্ষ বহিরাগত বৈদেশিকগণের বিষয়ও বিবেচ্য নয়। যদি মোট লোক-সংখ্যা হইতে এই শ্রমিক-সংখ্যাও বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রিক অধিকারের বণ্টন সীমাবদ্ধ হয় মাত্র ৬৫ লক্ষ লোকের মধ্যে। এই জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা ৩৪·৭৫ লক্ষ; সুতরাং এই হিসাব অনুযায়ী প্রদেশের তাহারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়।

(৪) বাঙ্গলার প্রান্তবর্তী জেলাসমূহ হইতে কৃষিজীবিগণ আসিয়া উত্তর-আসামে বসবাস স্থাপন করিতেছে। এই কৃষিজীবী বহিরাগতগণের অধিকাংশই মুসলমান। তাহাদের অর্থসাহায্যদান ও প্রয়োজনীয় বিবিধ বস্তু সরবরাহ করিবার জন্য মধ্যবিত্ত হিন্দুগৃহস্থগণ দোকানদার, ব্যবসায়ী, মহাজন, ডাক্তার প্রভৃতিরূপে তাহাদের মধ্যে আসিয়া বসবাস করিতেছে। বলিতে গেলে, পূর্ববঙ্গের জেলাসমূহ ধীরে ধীরে আসাম অভিমুখে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে।

(৫) 'কেবলমাত্র প্রদেশে নয়, প্রতিটি বিভাগেও মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুরমা উপত্যকায় মুসলমানগণ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫১ ভাগ। উপজাতীয়-দিগকে যদি হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের যোগ্য জনসংখ্যার শতকরা ৬৫ ভাগের ঊর্ধ্বে হইবে মুসলমান। আসাম উপত্যকার জেলাসমূহে হিন্দুগণ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৭ হওয়ায় সেখানে তাহারা সংখ্যালঘু। যেহেতু অস্থায়ী ও অবাসিন্দা শ্রমিকগণের প্রায় সকলেই হিন্দু ও আসাম উপত্যকার অধিবাসী, সেইজন্য গণনার যোগ্য প্রকৃত হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা সেখানে ১২·৯৮ লক্ষ। এখানেও রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের যোগ্য জনসংখ্যার অধিকাংশই মুসলমান।'১৮

(৬) পূর্ব-পাকিস্থানের বিপুল জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজন প্রভূত পরিমাণ জমির এবং আসাম হইবে তাহার আত্মপ্রসারের সেই পর্যাপ্ত ক্ষেত্র।

(৭) পূর্ব-পাকিস্থানকে আর্থিক সঙ্গতি ও অন্যান্য সম্পদের দিক দিয়া শক্তিশালী হইতে হইলে আসাম তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ আসাম হইতেই সে লাভ করিবে গভীর অরণ্য, খনিজ সম্পদ, পাথুরিয়া কয়লা ও পেট্রোলিয়াম।

(৮) আসামের অধিকাংশ অধিবাসীই বাঙ্গলাভাষা-ভাষী।

---

18. Mujibur Rahman: 'Eastern Pakistan, its population, delimitation and Economics', quoted by H. N. Barua in 'Reflections on Assam-cum-Pakistan', Pp. 82-3.

এইবারে যুক্তিগুলি একটি একটি করিয়া বিচার করিয়া দেখা যাক ঃ

নম্বর ১—ইতিপূর্বে আমাদের ধারণা হইয়াছিল, মুসলিম অঞ্চল বলিতে সেই এলাকাকেই বুঝায়—মুসলমানগণ যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, মুসলমান অঞ্চল বলিতে যাহাকে বুঝায় তাহা ইহা হইতে এক স্বতন্ত্র বস্তু। *কোন প্রদেশ যদি মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাহা পাকিস্থানের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইবে।*

নম্বর ২—আসামের অধিকাংশ অ-মুসলমান অধিবাসী উপজাতি নয়, হিন্দু—তর্কের খাতিরে একথা স্বীকার করিয়া লইলেও, উপজাতিগণ যে অ-হিন্দু একথা স্বীকার করা চলে না।

নম্বর ৩—৫—মিঃ মুজিবর রহমনের প্রদত্ত হিসাব হইতে আমরা দেখিতে পাই, ২৯ লক্ষ উপজাতিকে যে কেবল মাত্র হিন্দুগণ হইতে পৃথকই করা হইয়াছে তাহা নয়, সভ্য রাষ্ট্রের নাগরিক হইবার অযোগ্য রূপে ঘোষণা করিয়া রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের যোগ্য সভ্য অংশের সংখ্যা ১০৯ লক্ষ হইতে ৮০ লক্ষে নামাইয়া আনা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হিন্দুগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ রহিয়া যায়, কারণ তাহারা সংখ্যায় তখনও ৪৫ লক্ষ এবং মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা তখন ৩৪·৭৫ লক্ষ মাত্র। অতএব মুসলমানদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত করিতে হইলে ১৫·২ লক্ষ হিন্দু শ্রমিককে মোট লোকসংখ্যা হইতে বাদ দেওয়া প্রয়োজন। এইরূপে আসাম মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পরিণত হইল। অংকশাস্ত্রের ইহা হইতে বিস্ময়কর ভোজবাজি কল্পনা করাও অসম্ভব।

এই যুক্তির একমাত্র অন্তর্নিহিত ত্রুটী ইহাই যে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস করিবার এইরূপ ব্যবস্থা যদি অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে সমগ্র ভারতেই হিন্দুগণ হইয়া পড়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়; সেক্ষেত্রে সমগ্র ভারত পাকিস্থানে পরিণত হইয়া পড়ায়, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলকে ভারতের অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাকিস্থান রচনা করিবার কোন প্রশ্নই উঠে না।

নম্বর ৪, ৬ এবং ৭—মুসলমানদের প্রয়োজন জমির ও আসামের তাহা দিবার আছে যোগ্যতা। তাহা ছাড়াও, পাকিস্থানের প্রয়োজনানুযায়ী অরণ্য, খনি, পাথুরে কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের প্রচুর সঞ্চয় আসামের আছে। ইহাই কি যথেষ্ট নয়? তবে, পাকিস্থানের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আসাম পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইবে না কেন? কোন সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশকামী শক্তিই ইহা হইতে ভিন্ন যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া পররাজ্যের উপর প্রভুত্ব কামনা করে নাই। পাকিস্থানের বেলাতেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? দেখা যাইতেছে যে, ভারতের কেবলমাত্র আপনাকে খণ্ডিত করিবার পক্ষে সম্মতি দিলেই যথেষ্ট হইবে না, তাহার ভরণ ও পোষণের জন্য সকল রকম রসদ তাহাকেই সরবরাহ করিতে হইবে।

সাম্প্রতিক দাবী অনুযায়ী বৃটিশের অধীন আসাম ও বাঙলা প্রদেশ দুইটি মিলিত হইলে পূর্ব-পাকিস্থান অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাত দাঁড়াইবে নিম্নলিখিত রূপঃ—

১৯ নং ছক

প্রদেশ	মোট লোকসংখ্যা	মুসলমান	হিন্দু	ভারতীয় খৃষ্টান	উপজাতি	অন্যান্য	মোট অমুসলমান
বাঙলা	৬,০৩,০৬,৫২৫	৩,৩০,০৫,৪৩৪ (৫৪·৭২)	২,৫০,৫৯,০২৪ (৪১·৫৫)	১,৬৬,৫০৯ (০·২৮)	১৮,৮৯,৩৮৯ (৩·১৩)	১,৮৬,১৬৯ (০·৩১)	২,৭৩,০১,০৯১ (৪৫·২৭)
আসাম	১,০২,০৪,৭৩৩	৩৪,৪২,৪৭৯ (৩৩·৭৩)	৪২,১৩,২২৩ (৪১·২৯)	৪০,৮১০ (০·৪০)	২৪,৮৪,৯৯৬ (২৪·৩৫)	২৩,২২৫ (০·২৩)	৬৭,৬২,২৫৪ (৬৬·২৭)
মোট	৭,০৫,১১,২৫৮	৩,৬৪,৪৭,৯১৩ (৫১·৬৯)	২,৯২,৭২,২৪৭ (৪১·৫১)	২,০৭,৩১৯ (০·২৯)	৪৩,৭৪,৩৮৫ (৬·২০)	২,০৯,৩৯৪ (০·৩০)	৩,৪০,৬৩,৩৪৫ (৪৮·৩০)

উভয় প্রদেশের মুসলমান-প্রধান জেলাগুলির হিসাব ধরিলে পূর্ব-পাকিস্থান অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাত নিম্নরূপ দাঁড়াইবে।

২০ নং ছক

অঞ্চল	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান	হিন্দু	ভারতীয় খৃষ্টান	উপজাতি	অন্যান্য	মোট অমুসলমান
অমুসলমানপ্রধান জেলাসমূহ বাদে বাংলা	৪,০৯,৬৪,৭৭৯	২,৮৭,১০,৪৬২ (৭০·০৯)	১,১৩,৮৪,৪৯৫ (২৭·৭৯)	৫৪,৭৩২ (০·১৩)	৭,০৬,৬১৫ (১·৭২)	১,০৮,৪৭৫ (০·২৬)	১,২২,৫৪,৩১৭ (২৯·৯০)
আসাম-বিযুক্ত সিলেটের অমুসলমানপ্রধান জেলাসমূহ	৩১,১৬,৬০২	১৮,৯২,১১৭ (৬০·৭১)	১১,৪৯,৫১৪ (৩৬·৮৮)	৩,০০৫ (০·০৯)	৬৯,৯০৭ (২·২৪)	২,০০৯ (০·০৬)	১২,২৪,৪৮৫ (৩৯·২৭)
সমগ্র পূর্ব-অঞ্চলের মুসলমানপ্রধান প্রতি জেলা সহ মোট	৪,৪০,৮১,৩৮১	৩,০৬,০২,৫[illegible]৯ (৬৯·৪২)	১,২৫,৩৪,০০৯ (২৮·৪৩)	৫৭,৭৮৭ (০·১৩)	৭,৭৬,৫২২ (১·৭৬)	১,১০,৪৮৪ (০·২৫)	১,৩৪,৭৮,৮০২ (৩০·৫৭)

বাঙলা ও আসাম প্রদেশ দুইটি সমগ্রভাবে গ্রহণ করিলে, বাঙলার ৫৪·৭৩ মুসলমান সংখ্যাধিক্য হ্রাস পাইয়া দাঁড়ায় শতকরা ৫১·৬৯ ভাগের নামমাত্র সংখ্যাধিক্যে এবং অমুসলমানপ্রধান জেলাগুলি বাদ দিলে বাঙলা ও আসামের প্রতিটি মুসলমানপ্রধান জেলার জনসংখ্যা সমেত মুসলমান সংখ্যাগুরুত্ব দাঁড়ায় ৬৯·৪২। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রদেশ দুইটি সমগ্রভাবে একত্র গ্রহণ করিলে পূর্ব-ভারতে মুসলিম অঞ্চল বলিতে কোন এলাকার অস্তিত্ব থাকে না। তবে উভয় প্রদেশের অমুসলমানপ্রধান জেলাগুলি বাদ দেওয়া এবং না দেওয়ার ফলে যে দ্বিবিধ মুসলমান সংখ্যাধিক্য দর্শিত হইল, তন্মধ্যে প্রথমবিধই মিঃ চ্যাপম্যানের নিকট মিঃ জিন্না কর্তৃক কথিত শতকরা ৭৫ ভাগ মুসলমান সংখ্যাগুরুত্বের অধিকতর সমীপবর্তী।

লোকগণনার হিসাব হইতে যে অবস্থা প্রত্যক্ষীভূত হয়, নিম্নে তাহার সার-সংক্ষেপ প্রদত্ত হইল ঃ

(১) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্থানের প্রতিটি প্রদেশে ও প্রদেশের প্রত্যেকটি জেলায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ।

(২) পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডি ও মুলতান বিভাগদ্বয়ের ১২টি জেলা ও বালুচ সীমান্ত অঞ্চল সমেত মোট ১৩টি জেলা মুসলমানপ্রধান।

(৩) লাহোর বিভাগে তাহারা সংখ্যাগুরু হইলেও, অমৃতসর জেলায় তাহারা সংখ্যালঘু এবং গুরুদাসপুর জেলায় তাহাদের সংখ্যাধিক্য নামমাত্র।

(৪) জলন্ধর বিভাগে তাহারা সংখ্যালঘু; সেখানে মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান শতকরা ৩৪·৫৩, হিন্দু ৩৫·৮৭ এবং শিখ ২৪·৩১। আদিধর্মী-দিগকে তপশীলভুক্তরূপে গণনা না করিয়া হিন্দুসম্প্রদায়েরই অংশরূপে গণ্য করিলে হিন্দুদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নততর হইবে।

(৫) আম্বালা বিভাগে মুসলমানগণ অতিশয় সংখ্যালঘু; মোট জনসংখ্যার তাহারা শতকরা মাত্র ২৮·০৭ ভাগ এবং ৬৬·০১ ভাগ হিন্দু।

(৬) যদি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান ও পাঞ্জাব—এই চারিটি জেলা একত্র গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে মুসলমান সংখ্যাধিক্য দাঁড়ায় শতকরা ৬২·০৭।

(৭) আম্বালা ও জলন্ধর বিভাগ ও লাহোর বিভাগের অমৃতসর জেলা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে বাদ দিয়া, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থান—এই প্রদেশত্রয় ও তৎসহ রাওয়ালপিণ্ডি, মুলতান ও অমৃতসর জেলা বিযুক্ত লাহোর বিভাগ গ্রহণ করিলে মুসলমান সংখ্যাধিক্য দাঁড়ায় ৭৫·৩৬।

(৮) পূর্বাঞ্চলের আসাম প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ, সেখানে মোট জনসংখ্যার তাহারা ৩৩·৭৩, হিন্দু ৪১·২৯ ও উপজাতি ২৪·৩৫; উপজাতি সম্প্রদায়ের যে অংশ হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং হিন্দুরূপেই নিজেদের পরিচয় প্রদান করে, হিন্দু-জনসংখ্যার সহিত তাহারা যুক্ত হইলে হিন্দুদের সংখ্যানুপাত গিয়া উঠে শতকরা ৫০-এর ঊর্ধ্বে। একমাত্র শ্রীহট্ট জেলা ছাড়া

আসামের আর সমস্ত জেলাতেই মুসলমানগণ সংখ্যালঘু; সেখানে তাহারা মোট অধিবাসী সংখ্যার শতকরা ৬০·৭১ ভাগ।

(৯) সমগ্র বাঙলায় মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা ৫৪·৭৩।

(১০) চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগে ও কেবলমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত উক্ত বিভাগদ্বয়ের প্রতিটি জেলায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ।

(১১) সমগ্র রাজসাহী বিভাগে তাহারা সংখ্যাগুরু, কিন্তু উক্ত বিভাগের অন্তর্গত জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় তাহাদের সংখ্যার হার যথাক্রমে মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৩·০৮ ও ২·৪২। দিনাজপুর জেলায় তাহারা লঘুত্ব ও গুরুত্বের প্রায় প্রান্তসীমায় অবস্থিত। সেখানে তাহাদের সংখ্যানুপাত শতকরা ৫০·২০।

(১২) কলিকাতা নগরী সমেত সমগ্র প্রেসিডেন্সী বিভাগে তাহারা সংখ্যাল্প, মোট জনসংখ্যার তাহারা শতকরা ৪৪·৫৬ এবং হিন্দুগণ ৫৩·৭০; নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও যশোহর জেলায় তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং খুলনা জেলায় ৪৯·৩৬, অর্থাৎ অর্ধেকের কিছু কম।

(১৩) কেবলমাত্র মুসলমানপ্রধান জেলাগুলিকে লইয়াই যদি বাঙলার মুসলিম অঞ্চল গঠিত হয় তাহা হইলে সেখানে তাহাদের সংখ্যানুপাত দাঁড়ায় শতকরা ৭০·০৯।

(১৪) অমুসলমানপ্রধান জেলাসমূহে তাহাদের সংখ্যার হার হইবে ২২·২১।

(১৫) যদি বাঙলা ও আসাম উভয় প্রদেশকে সমগ্রভাবে লইয়া হিসাব করা হয়, তাহা হইলে মুসলমানগণ মোট জনসংখ্যার হইবে শতকরা ৫১·৬৯।

(১৬) মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ জেলাগুলি বাদ দিলে মুসলমানগণ হইবে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৯·৪২ ভাগ।

ভারত খণ্ডনের দাবী উত্থাপিত হয় এই যুক্তিতে যে, মুসলমানগণ ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। প্রাকৃতিক দিক দিয়া ভারতবর্ষ যেমন একটি অখণ্ড সত্তারূপে সংগঠিত এবং ঐতিহাসিক দিক দিয়া সে অখণ্ডতা যেমন স্বীকৃত ও সমর্থিত, তাহাকে যদি ঠিক সেই পরিপূর্ণ আকারেই গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে দেশীয় রাজ্য সমেত সমগ্র ভারতের মোট লোকসংখ্যার মধ্যে মুসলসমান জনসংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ২৩·৮ ও অ-মুসলমান জনসংখ্যা ৭৬·২; আর দেশীয় রাজ্য বাদে কেবলমাত্র বৃটিশ ভারতের হিসাব ধরিলে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত হয় ২৬·৮ এবং অমুসলমান হয় ৭৩·২। মুসলমানপ্রধান জেলাগুলি যোগ ও বিয়োগ করিবার ফলে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অ-মুসলমান সংখ্যার হার দাঁড়ায় যথাক্রমে শতকরা ৩৮ ও ২৫ এবং পূর্বাঞ্চলে দাঁড়ায় ৪৮ ও ৩২। ইহাই যদি হয় তাহাদিগকে ভারতের অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার প্রস্তাবে সম্মত করিবার যুক্তি, তাহা হইলে সমগ্র ভারতে যাহাদের জনসংখ্যার হার ২৩·৮ ও বৃটিশ ভারতে ২৬·৮ মাত্র, অনুরূপ যুক্তিবলেই তাহাদিগকে পূর্বের মতই অখণ্ড ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতে বাধ্য করা চলিবে না কেন?

কোন কোন অঞ্চলে মুসলমানগণ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ—এই হেতুতে মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি ভারত হইতে পৃথক করিবার দাবী যদি উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা হইলে সমগ্র ভারতের মোট জনসংখ্যার যাহারা ৭৬·২ ভাগ ও বৃটিশ ভারতের মোট লোকসংখ্যার যাহারা ৭০·২ ভাগ, তাহারা অন্য কোন কারণে না হইলেও, দেশ শাসনের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক ধারার অখণ্ডতার দিক দিয়া সেরূপ প্রস্তাবে সম্মত হইতে অস্বীকার করিতে পারিবে না কেন?

পূর্ববর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় লীগের লাহোর-প্রস্তাবে বর্ণিত উপায়ে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের সীমা নির্দেশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা এরূপ ধারণা যেন করা না হয় যে, এই চতুঃসীমা আমারই স্বহস্তে রচিত। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসিগণ যদি সম্মত হয়, সীমানির্ধারণ-কার্য সম্পন্ন হইতে পারে মাত্র তখনই এবং অধিবাসী বলিতে সেই অঞ্চলের মুসলমান বাসিন্দাগণকেই বুঝাইবে না, অ-মুসলমান বাসিন্দাগণও অধিবাসীরূপে গণ্য। তর্কের খাতিরে আমি ধরিয়া লইয়াছি যে, উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমানই খণ্ডন-প্রস্তাবের পক্ষপাতী এবং তদনুযায়ী সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থান সমগ্রভাবে, পশ্চিম পাঞ্জাবের জেলাসমূহ, উত্তর ও পূর্ব বাঙলার জেলাগুলি এবং আসামের শ্রীহট্ট জেলা মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছি। কিন্তু যতক্ষণ না খণ্ডন-প্রস্তাবের পক্ষে তাহাদের সুস্পষ্ট অভিমত সুনিশ্চিত ও প্রশ্নাতীতরূপে অভিব্যক্ত হয়, ততক্ষণ কিছুটা জোরাল যুক্তির সহিতই একথা বলিবার পথ প্রশস্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমানই হয়তো স্বতন্ত্রীকরণের প্রস্তাব সমর্থন করিবেন না। তাহা ছাড়া, মুসলমানদের কথা ছাড়িয়া দিলেও আরও অন্যান্য অনেকে আছেন, যাঁহাদের অভিমত উপেক্ষার যোগ্য নয়।

(আটাশ)

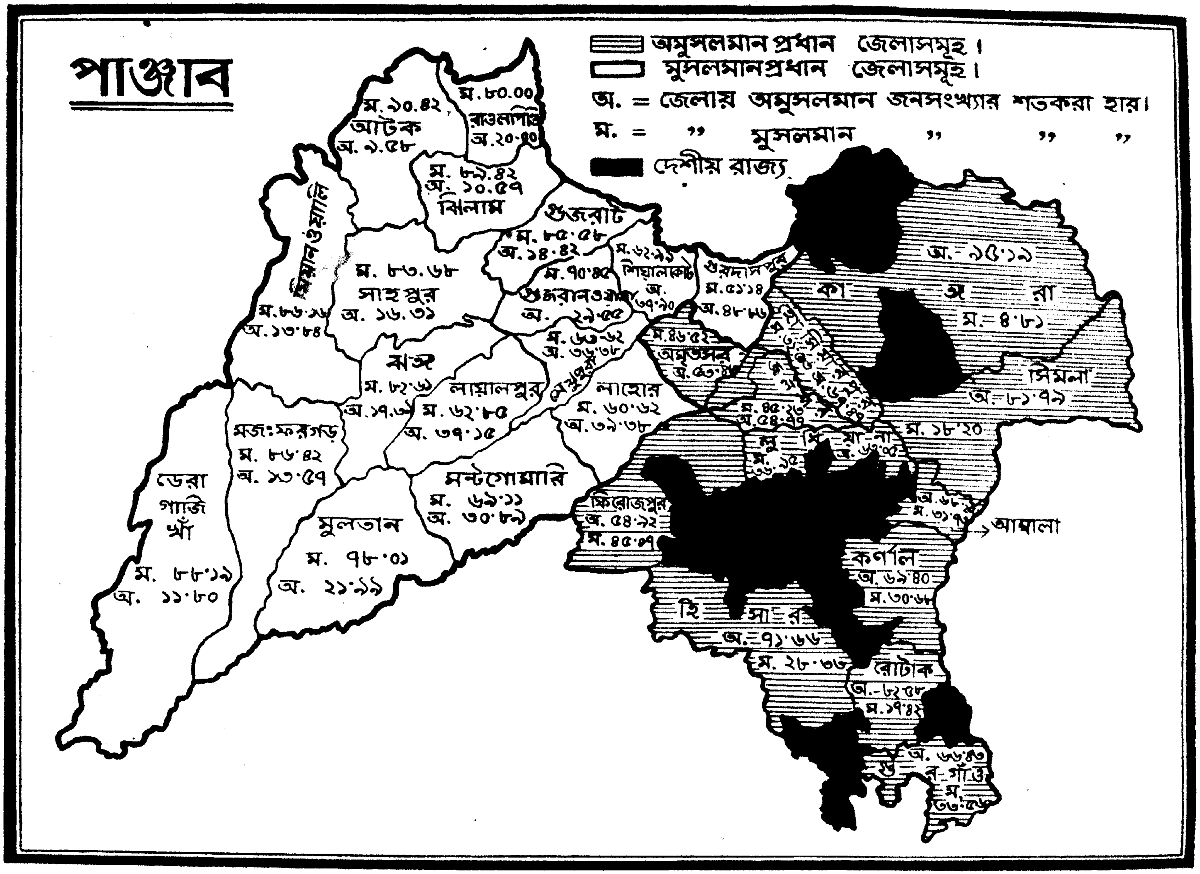
শিখ ও বাঙালীদিগের স্বতন্ত্রীকরণ

বৃটিশ-অধিকৃত পাঞ্জাব ও পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যসমূহের অধিবাসী শিখদিগের কথা আলোচনা করা যাক। পাঞ্জাবের যে-কোন অংশকে ভারতের অবশিষ্ট অঞ্চল হইতে পৃথক করিবার যে কোন পরিকল্পনার তাঁহারা বিরোধী এবং সেরূপ পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার প্রচেষ্টাকে সর্বশক্তি দিয়া প্রতিহত করিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মুসলমানগণ কর্তৃক খণ্ডন-ব্যবস্থা যদি কার্যকরী হয়, সেক্ষেত্রে তাঁহাদের দাবী, যে অঞ্চল শিখগণ কর্তৃক অধ্যুষিত, যেখানে তাঁহাদের ধর্মমন্দিরসমূহ প্রতিষ্ঠিত এবং যাহার সহিত ধর্মগত ও ঐতিহাসিক সূত্রে তাঁহারা দীর্ঘ দিন হইতে সংশ্লিষ্ট—সেই অঞ্চলটিকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র শিখ-রাষ্ট্র গঠিত হোক। পশ্চিমে চেনাব ও পূর্বে যমুনা নদী, দক্ষিণে রাজপুতানার সীমান্ত ও উত্তরে কাশ্মীর রাজ্য ও তদন্তর্গত পার্বত্য অঞ্চল —ইহাই হইবে সে রাষ্ট্রের চতুঃসীমা। পশ্চিমে পাকিস্থান ও পূর্বে হিন্দুস্থান—এই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী উপরোক্ত রাজ্যের চতুঃসীমা সম্বন্ধে মিঃ ভি, এস, ভাট্টি তাঁহার 'খালিস্থান' নামক প্রচার-পুস্তিকায় বলিয়াছেন, 'প্রস্তাবিত শিখ-রাষ্ট্রের উত্তরে হইবে কাশ্মীর, উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে চেনাব নদী ও মুলতানের পশ্চাদ্বর্তী পাঞ্জাব, দক্ষিণে রাজপুতানা ও কচ্ছ উপসাগর, পূর্বে যমুনা নদী এবং উত্তর-পূর্বে সিমলার পার্বত্য রাজ্যসমূহ ও কুলু। এই শিখ-রাজ্য খালসাদের আবাসস্থান হইবে বলিয়া তাহাকে 'খালিস্থান' আখ্যায় অভিহিত করা অযৌক্তিক হইবে না।' ১

মিঃ সন্ত নেহাল সিং 'হিন্দুস্থান রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পাঞ্জাব খণ্ডনের পরিকল্পনা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, পাকিস্থান যদি রচিত হয়ই, তাহা হইলে শিখগণ তাঁহাদের আজাদ পাঞ্জাব দাবী করিবেন। এই মতবাদের ব্যাখ্যাতাগণের হিসাব অনুযায়ী এই পরিকল্পিত শিখরাজ্যের শিখ অধিবাসীর সংখ্যা হইবে বৃটিশ-ভারত ৩,৫০০,০০০, দেশীয় রাজ্য ১,২৫০,০০০, অর্থাৎ ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী সর্বসমেত ৫,১০০,০০০ অধিবাসী-সংখ্যার মধ্যে মোট শিখ-জনসংখ্যা হইবে ৪,৮০০,০০০। এই পরিকল্পনানুযায়ী আজাদ পাঞ্জাবের চতুঃসীমা সবিস্তারে চিহ্নিত হইলেও, তাহা কিছুটা পরিমাণে অস্পষ্ট রাখা হইয়াছে। "সীমানির্ধারণের দায়িত্ব এমন সব ব্যক্তিবর্গ দ্বারা গঠিত এক কমিশনের হস্তে অর্পণ করা হোক, যাঁহারা নিরপেক্ষ মন লইয়া এই অতিশয় বিতর্কমূলক প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে সক্ষম হইবেন। ১৯৪৩ সালের ৫ই জুন তারিখে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে গিয়া বর্তমান

---

1. V. S. Bhatti : 'Khalistan', P. 4.



পাঞ্জাব
অমুসলমানপ্রধান জেলাসমূহ।
মুসলমানপ্রধান জেলাসমূহ।
অ. = জেলায় অমুসলমান জনসংখ্যার শতকরা হার।
ম. = ” মুসলমান ” ” ”
দেশীয় রাজ্য
ম. ৯০.৪২ আটক অ. ৯.৫৮
ম. ৮০.০০ রাওলপিণ্ডি অ. ২০.০০
ম. ৮৯.৪২ অ. ১০.৫৭ ঝিলাম
গুজরাট ম. ৮৫.৫৮ অ. ১৪.৪২
মিয়ানওয়ালি ম. ৮৬.১৬ অ. ১৩.৮৪
ম. ৮৩.৬৮ সাহপুর অ. ১৬.৩১
ঝঙ্গ ম. ৮২.৬১
লায়ালপুর ম. ৬২.৮৫ অ. ৩৭.১৫
মজঃফরগড় ম. ৮৬.৪২ অ. ১৩.৫৭
ডেরা গাজি খাঁ ম. ৮৮.১৯ অ. ১১.৮০
মুলতান ম. ৭৮.০১ অ. ২১.৯৯
মন্টগোমারি ম. ৬৯.১১ অ. ৩০.৮৯
লাহোর ম. ৬০.৬২
শিয়ালকোট
গুরদাসপুর ম. ৫১.১৪ অ. ৪৮.৮৬
গুজরানওয়ালা ম. ৭০.৪৫ অ. ২৯.৫৫
শেখুপুরা
অমৃতসর
অ. ৯৫.১৯ কাংড়া ম. ৪.৮১
সিমলা অ. ৮১.৭৯ ম. ১৮.২০
ফিরোজপুর অ. ৫৪.৭২ ম. ৪৫.০৭
আম্বালা
কর্ণাল
হিসার অ. ৭১.৬৬ ম. ২৮.৩৩
রোটাক
গুরগাঁও

পরিকল্পনার উদ্যোক্তা শিরোমণি আকালী দল বলিলেন, 'সীমা নির্ধারণ করিবার সময় জনসংখ্যা, সম্পত্তি, ভূমি-রাজস্ব, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক সাহচর্যের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।' পরিকল্পনানুযায়ী এই রাষ্ট্র গঠিত হইবে চারিটি বিভাগ লইয়া ঃ—

মুলতান বিভাগ—মুলতান, (অংশতঃ) মণ্টোগোমারী, লায়ালপুর, ঝাং ও মুজাফরগড়;

লাহোর বিভাগ—লাহোর, শেখুপুরা, গুজরাণওয়ালা, অমৃতসর, গুরুদাসপুর ও শিয়ালকোট;

জলন্ধর বিভাগ—জলন্ধর, হোসিয়ারপুর, কাংরা, লুধিয়ানা ও ফিরোজপুর;

আম্বালা বিভাগ—আম্বালা, কর্ণাল, হিসার, রোটক, গুরগাঁও ও সিমলা।

মণ্টোগোমারী জেলার সমান্তরালে অবস্থিত মুলতান জেলার অংশটুকু বাদ দিয়া আজাদ পাঞ্জাবের মোট অধিবাসী-সংখ্যার মধ্যে সাম্প্রদায়িক অনুপাত হইবে নিম্নলিখিতরূপ ঃ—

শিখ—	৩৪,৪২,৫০৮
মুসলমান—	৯১,৯১,৬০৮
অন্যান্য অমুসলমান (অধিকাংশ হিন্দু)—	৭২,৪৫,৩৩৬
	মোট—১,৯৮,৭৯,৪৫২

মিঃ সন্ত নেহাল সিংএর মতে 'হিন্দুদের প্রতি অবিশ্বাস মুসলমান-চিত্তকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে; ফলে 'পাকিস্থান' পরিকল্পনার প্রস্তাব।'

'শিখ-চিত্ত বিষাক্ত করিয়াছে মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাস। পাঞ্জাব-খণ্ডনের পরিকল্পনা প্রস্তাবিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার পশ্চাতে রহিয়া যাঁহারা কার্য করিতেছেন, তাঁহারা রাজনৈতিক প্রেরণা দ্বারা অনুপ্রাণিত সংগঠন শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি।'

কাজেই পাকিস্থানের জন্য যদি দাবী করা হয়, শিখগণ উপেক্ষিত হইতে অসম্মত হইবেন এবং খণ্ডন-ব্যবস্থা দাবী করিবেন তাঁহাদের নিজেদের সর্তে।

স্মরণ থাকিতে পারে, ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাঙলা বিভক্ত করিয়া দুইটি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছিলেন, একটি আসাম ও পূর্ব এবং উত্তর বঙ্গের জেলাসমূহ লইয়া এবং অপরটি বাঙলার অবশিষ্টাংশ, বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া। এই বিভাগের বিরুদ্ধে সমগ্র হিন্দুসমাজ ও মুসলমানসম্প্রদায়ের একটি প্রতিপত্তিশালী অংশ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে; তাহারই ফলে যে বঙ্গ-ভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন জাগ্রত হয় তাহার দূর-প্রসারী প্রভাব কার্যকরী হয় জাতীয় চেতনার উন্মেষের পক্ষে; বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ তাহারই প্রত্যক্ষ লব্ধ ফল। তাহার ফলে গৃহীত সিদ্ধান্তরূপে ঘোষিত এই পরিকল্পনা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বর্জন করিতে বাধ্য হন। বিভাগ-বিরোধী আন্দোলনের পর্যায়বিশেষে

গভর্ণমেণ্টই ঘোষণা করেন যে, মুসলমান স্বার্থের অনুকূলেই এ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে; কাজেই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে মুসলমানগণ অসন্তুষ্ট হইলেন। এস্থলে ইহাই দ্রষ্টব্য যে, ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী বাঙলার যে অংশ তাহার অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে, তাহা ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ পরিকল্পনানুমোদিত পূর্ববঙ্গের অনেকখানি অনুরূপ। যে বাঙালী হিন্দুগণ প্রবল আন্দোলন পরিচালন দ্বারা সে ব্যবস্থা বাতিল করিতে সক্ষম হন, তাঁহারা যে স্বেচ্ছায় বর্তমান ব্যবস্থায় সম্মত হইবেন এরূপ ধারণা করিবার কোন হেতু নাই। তাহা ছাড়া, এবার আর শুধু বঙ্গ-ভঙ্গ নয়, বাঙলাকে ভারতের অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কাজেই এ ব্যবস্থায় সম্মত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে আরও অসম্ভব, বিশেষ করিয়া তাঁহাদের আন্দোলনের পশ্চাতে ভারতের অন্যান্য অংশের হিন্দুদের সমর্থন যখন সুনিশ্চিত। এই জন্যই লাহোর-প্রস্তাবের তাৎপর্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে আমি যত্নবান হইয়াছি।

পঞ্চম খণ্ড

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সম্পদ

২১ নং ছক

	মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ (একর)	মাথাপিছু (একর)	কর্ষিত জমির পরিমাণ (একর)	মাথাপিছু (একর)	আবাদযোগ্য কিন্তু অনাবাদী জমির পরিমাণ (একর)	মাথাপিছু (একর)	আবাদী জমির শতকরা হার	আবাদযোগ্য জমির শতকরা হার
মুসলমান অঞ্চল	২,৩৯,৪৮,৪৬২	০·৫৮	১,৭৮,৩৩,৬০০	০·৪৩	৬১,১৪,৮৬২	০·১৪	৭৪·৪	২৫·৬
অ-মুসলমান অঞ্চল	১,১১,৫৮,৫৮৭	০·৫৭	৬৬,৩২,৭০০	০·৩৪	৪৫,২৫,৮৮৭	০·২৩	৫৯·৪	৪০·৬

উপরের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, মুসলমান ও অ-মুসলমান উভয় অঞ্চলেই জনসংখ্যার অনুপাতে মাথাপিছু কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় সমান, কিন্তু কর্ষণযোগ্য অথচ অনাবাদী জমির পরিমাণ মুসলমান অঞ্চল অপেক্ষা অ-মুসলমান অঞ্চলেই অধিক। পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে এই কথাই সপ্রমাণ হয়। উপজাতি-অধ্যুষিত এই অঞ্চলটি স্বল্পবসতিপূর্ণ এবং কর্ষণযোগ্য অথচ অনাবাদী জমির পরিমাণ সেখানে অপেক্ষাকৃত অধিক। এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা ২,৪৭,০৫৩ এবং কর্ষণযোগ্য অনাবাদী জমির পরিমাণ ১৪,২২,০১৭ একর; সুতরাং মাথাপিছু উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ সেখানে পড়িবে ৫·৭৫ একর, অথচ মুসলিম অঞ্চলে সেরূপ ভূমির পরিমাণ মাথাপিছু ০·১৪ একর মাত্র। এই জমি যদি উপজাতিগণের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়—এবং তাহা হইবারই সম্ভাবনা সর্বাধিক, তাহা হইলে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে মাথাপিছু উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণের হার উপরে প্রদত্ত হিসাব হইতে আরও কম হইবে।

এদিকে জনসংখ্যা কিন্তু বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং তাহা সর্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে, অর্থাৎ মুসলিম অঞ্চলে। ঢাকা, (প্রতি বর্গমাইলে (১,৫৪২), ময়মনসিংহ (প্রতি বর্গমাইলে ৯৭৯), ফরিদপুর (প্রতি বর্গমাইলে ১,০২৪), ত্রিপুরা (প্রতি বর্গমাইলে ১,৫২৫) এবং নোয়াখালি (প্রতি বর্গমাইলে ১,৩৩৭) প্রভৃতি অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ জেলাসমূহে ১৯৩৬-৩৭ সালে আবাদযোগ্য জমির যথাক্রমে শতকরা ৯৫·৬, ৮৪,৯৯,৯৩ ও ৯২ ভাগ কর্ষিত হইয়া গিয়াছিল। মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে ১৮৮১ সাল হইতে ১৯৩১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে যথাক্রমে শতকরা ৬০ ও ৮৮ হারে; ১৯৩১ হইতে ১৯৪১ সালের মধ্যে শতকরা ১৯·৯ ও ২৫.২ হারে। দুইটি জেলা ব্যতীত সমগ্র রাজসাহী বিভাগে ১৮৮১ সাল হইতে ১৯৩১ সালের মধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ২৬ হারে এবং ১৯৩১ সাল হইতে ১৯৪১ সালের মধ্যে বাড়িয়াছে শতকরা ১২·৮। চব্বিশ পরগণা জেলা ও কলিকাতা বাদে সমগ্র প্রেসিডেন্সী বিভাগে ১৯৩১ হইতে ১৯৪১ সাল মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১৫·৬।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বাংলায় কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ নিতান্তই অল্প, বিশেষ করিয়া মুসলিম অঞ্চলে তাহা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কাজেই কৃষির বিস্তার সেখানে স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে অক্ষম। লোকসংখ্যার ভাবী বৃদ্ধির কথা উপস্থিত ছাড়িয়া দিয়া দেখা যাক্, প্রদেশ নিজের ক্ষেত্রজাত শস্যের দ্বারা তাহার বর্তমান জনসংখ্যার খাদ্য যোগাইতে পারে কিনা। নিম্নে দেখান হইয়াছে যে, বাংলা ঘাটতি প্রদেশ এবং এই সত্য অতি নিদারুণভাবে প্রমাণিত হইয়াছে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে। অবশ্য সে দুর্ঘটনার অন্যান্য কারণও যে না ছিল তাহা নয়, কিন্তু এ কারণটিও উপেক্ষা অথবা লঘু করিবার যোগ্য নয়। স্যার আজিজুল হক 'The Man Behind the Plough' নামক তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থে বলিয়াছেন, 'প্রদেশের লোকদের প্রধান খাদ্য চাউল এবং কৃষকদের প্রধান খাদ্য ভাত, ডাল ও তৎসহ অতি অল্প পরিমাণ শাকসব্জী, মাছ ও

মাংস। তাহার প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন ও নৈশভোজন সমস্তই সম্পন্ন হয় ভাতের সাহায্যে। এইজন্যই প্রদেশের চাউল উৎপাদনকার্য জাতীয় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রশ্ন, অথচ আপন প্রয়োজন মিটাইবার মত পর্যাপ্ত পরিমাণ চাউল সে উৎপাদন করে না'১

১৯৩১ সালের সেন্সাস-রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া, তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, ভাত খাইতে যাঁহারা অনভ্যস্ত মোট জনসংখ্যা হইতে তাঁহাদের সংখ্যা যদি বাদ দেওয়া হয় এবং পূর্ণ খাদ্য যাহাদের পক্ষে অনাবশ্যক সেই শিশুদের সংখ্যা কমাইয়া যদি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের সংখ্যার সমান করা হয়, তাহা হইলে মোট ৫,১৮,৭৩,৪৩৬ জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৪ কোটি লোকের পূর্ণখাদ্য প্রয়োজন হইবে। 'যদি প্রতিজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জন্য দৈনিক ১৪ ছটাক করিয়া চাউল ধার্য করা হয়, তাহা হইলে প্রদেশের প্রয়োজনের জন্য প্রতি বৎসর ৩১৯০ লক্ষ মণ চাউল আবশ্যক হইবে।'২ দৈনিক আহার্যের পরিমাণ যদি জেলের ধার্য খাদ্যের পরিমাণের সমান ১২ ছটাক করিয়া ধরা হয়, তাহা হইলেও বৎসরের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ দাঁড়াইবে ২৭৩০ লক্ষ মণ। ইহাকে চাউলে রূপান্তরিত করা হইলে দৈনিক ১২ ছটাক হিসাবে সারা বৎসরে ধান্য প্রয়োজন হইবে ৪১০০ লক্ষ মণ এবং ১৪ ছটাক হিসাবে তাহার পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪৭৯০ লক্ষ মণ।'৩ ১৯৩৬-৩৭ সালের ২·২ কোটি একর আবাদী জমির জন্য প্রতি একরে ১ মণ হিসাবে ২·২ কোটি মণ বীজ ধান্য ইহার সহিত যোগ করিলে, প্রাপ্তবয়স্ক জনপিছু প্রতিদিন ১৪ ছটাক ও ১২ ছটাক হিসাবে বৎসরে যথাক্রমে ৫০·১ ও ৪৩·২ কোটি মণ চাউলের প্রয়োজন। ১৯২৭—২৮ সাল হইতে ১৯৩৬—৩৭ সাল পর্যন্ত এই দশ বৎসরের উৎপন্ন শস্যের হিসাব ধরিয়া স্যার আজিজুল হক্ দেখাইয়াছেন, মাথাপিছু দৈনিক ১৪ ছটাক ও ১২ ছটাক হিসাবে প্রতিবৎসর যথাক্রমে ১৬·১ কোটি ও ৯·৩ কোটি মণ চাউল ঘাটতি পড়িয়া আসিয়াছে। ইহার দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, স্বাভাবিক খাদ্যের দিক দিয়া বাংলা ঘাটতি প্রদেশ। প্রদেশের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের সহিত প্রতি বৎসরের গড়পড়তা আমদানী চাউলের পরিমাণ যোগ করিলে ৩½ লক্ষ টন ধান্য বা ২½ লক্ষ টন চাউল, অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি মণ অধিক ধান্য প্রাপ্ত হওয়া যায়: 'যেখানে গড়ে প্রতি বৎসর ১৬৯০ লক্ষ মণ ধান্য ঘাটতি পড়ে, সেখানে প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ মণ উদ্বৃত্ত ধান্যের আমদানী প্রদেশের সর্বনিম্ন প্রয়োজন পূরণের পক্ষে বিশেষ কোন সাহায্য করিবে না।'৪

মিঃ কালিচরণ ঘোষ তাঁহার 'Famines in Bengal, 1770—1943' নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, মাথাপিছু ৫·৫ মণ চাউল হিসাবে বাংলার জন্য প্রয়োজন

1. Sir Azizul Haque : 'The Man Behind the Plough,' p. 51.
2. Ibid., p. 153.
3. Haque, op. cit., p. 52.
4. Ibid., pp. 55—6. There is an evident misprint here. We should read 10 million maunds instead of 1 million maunds.

২৫·৭ কোটি, অর্থাৎ ৯৩·৭০ লক্ষ টন চাউলের। এই হিসাব করিতে গিয়া, তিনি শিশু, বিধবা ও অন্যান্য যাহাদের পক্ষে পূর্ণ দুই বেলার খাদ্য প্রয়োজন হয় না—তাহাদিগকে গণনা হইতে বাদ দিয়াছেন। এই প্রয়োজনীয় পরিমাণ হইতে বাৎসরিক ৮৫ লক্ষ টন আমদানী চাউল বাদ দিলেও, বার্ষিক ১৩·৪৬ লক্ষ বা ৩·৬৭ কোটি মণ চাউল ঘাটতি পড়ে।'[5]

উল্লিখিত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, বাংলায়—বিশেষ করিয়া মুসলিম অঞ্চলে কৃষিকার্যের বিস্তার জনসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে অক্ষম। তাহার উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া সরবরাহ-ব্যবস্থা উন্নততর করিতে হইলে, কৃষিকার্য ব্যাপকতর না করিয়া তীব্রতর করিতে হইবে। বর্তমান অবস্থায় মুসলিম অঞ্চল সেচ-প্রথা প্রবর্তনের পক্ষে যোগ্য ক্ষেত্র নয়; প্রদেশে দুইটি মাত্র খাল আছে এবং তাহা বর্ধমান বিভাগের বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা দিয়া প্রবাহিত; কাজেই মুসলিম অঞ্চলকে শস্য উৎপাদনের জন্য সম্পূর্ণরূপে আবহাওয়া ও বারিপাতের উপর নির্ভর করিতে হইবে। মুসলিম অঞ্চলের আবহাওয়া বৎসরের অধিকাংশ সময় আর্দ্র এবং অনাবৃষ্টি অপেক্ষা বন্যা ও ঝটিকা দ্বারাই সে অধিক বিধ্বস্ত; কাজেই সেচ-প্রথা প্রবর্তন সেখানে আদৌ সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হইলেও, ভূমির উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে তাহা সবিশেষ সাহায্যকারী হইবে কিনা সন্দেহের বিষয়। তবে এই পর্যন্ত আশা করা যাইতে পারে যে বড় বড় নদীগুলি আজ মাঝে মাঝে বন্যার অভিশাপ বহন করিয়া আনে, বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া অধিকতর শস্য উৎপাদনের কার্যে নিয়োজিত করা হয়তো দুঃসাধ্য হইবে না।

হোল্ডিং-এর আকার এবং তাহার পুনঃ পুনঃ বিভাগের দরুণ কৃষিকার্য তীব্রতর করার পথ বিপম্মুক্ত নয়। স্যার আজিজুল হক হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, ৫ জন লোকবিশিষ্ট গড়পড়তা কৃষক পরিবারের হোল্ডিং সাধারণতঃ ৭ একর হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ৫·৩ একর জমি কৃষিযোগ্য এবং ১·৭ একর অনাবাদী। হোল্ডিং-এর অংশবিশেষে বৎসরে দুইবার ফসল উৎপন্ন হইতে পারে, সে সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া লইয়া তিনি বলেন, 'প্রতি পরিবারের মোট কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ঊর্ধ্ব সংখ্যায় ৬·৫ একরের অধিক হইবে না, তাহার মধ্যে ৫ একরে ধান, ½ একরে পাট ও বাকী ১ একরে অন্যান্য ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে।'[6] ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রতি কৃষক পরিবারের হোল্ডিং-এর আয়তন ৭ একর হইলেও, তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরায় বিভক্ত এবং প্রতি দুই টুকরা জমির মধ্যে অন্য কৃষকের জমি ব্যবধান স্বরূপ পড়িয়া রহিয়াছে। কেবলমাত্র সারের উন্নতি বিধান ছাড়া এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরাগুলির উৎপাদন-শক্তি বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি করিবার জন্য আর কিইবা করা যাইতে পারে! তাহা ছাড়া প্রবল বৃষ্টির দরুণ সার

5. K. C. Ghose : 'Famines in Bengal, 1770—1943,' Appendix, pp. 193—4.
6. Haque, op. cit., pp. 93—4.

ধুইয়া যায় ও জমির অধিকাংশ দীর্ঘকালের জন্য জলের নীচে ডুবিয়া থাকে, কাজেই কৃত্রিম উপায়ে সার দিবার ক্ষেত্রও সেখানে অতিশয় অপ্রশস্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুক্‌রা জমি তীব্রতর কৃষিব্যবস্থার অধীন করা অপেক্ষা আকারে বড় ক্ষেত ও খামার-ব্যবস্থা অধিকতর লাভজনক হইবে—ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, দেয় খাজনার পরিমাণ অল্পবিস্তর স্থায়ীভাবে ধার্য হইয়া যাওয়ার দরুণ কৃষকদের অবস্থা যে অনেকখানি চাষী জোতদারদের সামিল তাহাও অস্বীকার করা চলে না; কাজেই বিশেষ ফললাভ করিতে হইলে বড় আকারের যৌথ ক্ষেত-খামার-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা প্রয়োজন। কিন্তু তাহাও সহজসাধ্য হইবে না; কারণ হিন্দু হোক্ অথবা মুসলমানই হোক্ ভারতীয় কৃষক মাত্রই তাহার ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের উপর এমন নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট ও নির্ভরশীল যে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অপরের সহিত একাকার হইয়া মিশিয়া যাইতে তাহাদিগকে সম্মত করা দুষ্কর।

অন্যান্য ফসলের প্রসঙ্গে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইক্ষু, কলাই, তিল প্রভৃতি শস্য কোন প্রদেশ আপন প্রয়োজনমত যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করিতে সমর্থ নয়, কাজেই তাহাদের ও তজ্জাত দ্রব্যের জন্য ভিন্ন প্রদেশের আমদানীর উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয়।

চিনি প্রদেশের অন্যতম প্রধান খাদ্য এবং বাংলা এক সময়ে তাহা উৎপাদন করিত প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু সে অবস্থার আজ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 'ভারতে প্রস্তুত ও আমদানী মোট চিনির শতকরা ১৩ ভাগ ব্যবহার করে বাংলা; কিন্তু সে উৎপাদন করে ভারতের মোট উৎপন্ন চিনির শতকরা ২·৮ ভাগ মাত্র। ১৯৩৫-৩৬ সালে এই প্রদেশে আমদানী গুড় ও চিনির পরিমাণ যথাক্রমে ২০,৭৯,৪৯৪ এবং ২৯,৪৩,৩১১ মণ। ১৯৩৬-৩৭ সালে বাংলা উৎপাদন করিয়াছিল ৬,২৫,১৭৫ মণ চিনি এবং ব্যবহার করিয়াছিল ৩৫,৩৯,২৫০ মণ।'[7]

পরিমিত খাদ্যের পক্ষে তৈল আর একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য। স্যর আজিজুল হক বলেন, 'অধিকাংশ সরিষার তৈল আজও কাট্‌তি হয় বাংলায়। তথাপি ১৯১৪-১৫ সালে সরিষার চাষ হয় ১৪,৫৯,১০০ একর জমিতে এবং ১৯৩৪-৩৫ সালে তাহার পরিমাণ নামিয়া আসে ৭,২৩,৮০০ একর, অর্থাৎ ২০ বৎসর সময়ের মধ্যে তাহার পরিমাণ কমিয়া অর্ধেকে দাঁড়ায়।'[8] 'Statistical Abstract of India'র[9] হিসাব অনুযায়ী ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে উৎপন্ন মোট তৈল-বীজের পরিমাণ ২,০৫,০০০ টন বা ৫৫,৯৬,৫০০ মণ; এই বীজ পীড়াইয়া তৈল উৎপাদন করিলে, উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ শতকরা ৩৩·৩ ভাগ হিসাবে দাঁড়ায় ১৮,৬৫,৫০০ মণ। মাথাপিছু দৈনিক জেল-রেশন হইতেও নিম্নতর পরিমাণ ½ ছটাক করিয়া হিসাব ধরিলে প্রতি বৎসর লোকপিছু ১০ সের করিয়া ঘাট্‌তি পড়ে। অর্থাৎ বাংলা তাহার প্রয়োজনীয় তৈলের শতকরা ১১ ভাগ

7. Haque, op. cit., p. 91.
8. Ibid., p. 39.
9. Statistical Abstract of India, 1930—31 to 1939—40, p. 556.

মাত্র উৎপাদন করে এবং যাহা উৎপাদন করে তাহার আট গুণ বাহির হইতে আমদানী করে।

মেট্রমুটি হিসাব ধরিলে কলাই ঘাটতি পড়ে শতকরা ৮০ ভাগ; এই ঘাটতির পরিমাণ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ একদিকে যেমন বাংলার খাদ্যের অবস্থার শোচনীয়তা সপ্রমাণ করিয়াছে, অপরদিকে তাহা দেখাইয়াছে, সমগ্র ভারত তাহার সাহায্যার্থে ঠিক তেমনিভাবেই অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল—১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পের সময় বিহারের সাহায্যকল্পে যেমন করিয়া সে কর প্রসারণ করিয়াছিল। ভূমিকম্পের পরবর্তী ফল দূরপ্রসারী হইলেও, তাহার ধ্বংসলীলা মাত্র স্বল্পকাল স্থায়ী; তাহার তুলনায় বাংলার দুর্ভিক্ষের করালতা শতগুণ ভয়াবহ, অসহনীয় ও অবর্ণনীয়; শত শত শিশু, রমণী ও পুরুষ কলিকাতার রাজপথে ও বাংলার পথে-প্রান্তরে পতঙ্গের মত প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সে বিপর্যয়ের আঘাত হইতে বাংলা আজও আত্মসম্বরণ করিতে পারে নাই—একথা যদি আমরা ভুলিয়া যাই তাহা হইলে নিজেদের বিপদ আমরা আপনারাই ডাকিয়া আনিব। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টসমূহ এবং সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি বাংলার উদ্দেশে যেরূপ দ্রুততার সহিত হাজার হাজার মাইল দূর হইতে সাহায্য-সম্ভার বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, কোন স্বাধীন রাষ্ট্র কর্তৃক পার্শ্ববর্তী কোন বিপন্ন রাষ্ট্রের সাহায্যার্থে কোনদিন সেরূপ কিছু করা হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী ১৯৪৪ সালের ২৪শে জুলাই তারিখে বলেন, ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাংলায় চাউল ও ধান্য আমদানী হয় যথাক্রমে ৫৪,৩৩,৪৩৭ ও ৫,২৭,৯৩৪ মণ। তন্মধ্যে ২৬,১৮,০০৯ মণ চাউল ও ৩,৩৮,৫৩২ মণ ধান্য আসে বিহার ও উড়িষ্যা হইতে। ১৯৪৩ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বাংলায় যে পরিমাণ গম ও তজ্জাত দ্রব্য, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, কলাই প্রভৃতি আমদানী হয় তাহার মূল্য ২১,..৮,৭৪,১৬৫ টাকা।'১০

কেন্দ্রীয় পরিষদে মিঃ এ, এন, চট্টোপাধ্যায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে খাদ্যমন্ত্রী মিঃ জে, পি, শ্রীবাস্তব ১৯৪৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বলেন, '১৯৪৪ সালের মধ্যে বাংলা গভর্ণমেণ্ট চাউল খরিদ করেন মোট ১০ লক্ষ টন এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৩ সালের নভেম্বর হইতে ১৯৪৪ সালের ২রা নভেম্বরের মধ্যে ২,৩৫,৪৭০ টন চাউল ও ১৯৪৩ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪৪ সালের ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে ৪,৬৯,১২৫ টন গম সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করেন।'১১

বাংলা ভারতের অংশবিশেষ ছিল বলিয়া এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট নামক বস্তুর অস্তিত্ব ছিল বলিয়া বাংলা তাহার ঘোর দুর্দিনে অতীতে তাহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছে ও ভবিষ্যতেও পাইবে।

---

10. 'Hindusthan Standard,' dated 26-7-44.
11. 'Hindusthan Standard,' dated 2-3-45.

পাট বাংলার অন্যতম প্রধান ও মূল্যবান ফসল। ১৯৩৬-৩৭ সালে বাংলায় যে ২১,৫৪,৮০০ একর জমিতে পাটের চাষ ছিল, তাহার মধ্যে অন্যূন ২০,১১,৮০০ একর জমিই মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্বর্তী উত্তর ও পূর্ববঙ্গের অধীন। ১৯৩৬-৩৭ সালে মোট পাট উৎপন্ন হয় প্রতি গাঁইট ৪০০ পাউন্ড ওজন হিসাবে ১০৪ লক্ষ গাঁইট; তন্মধ্যে ভারতীয় মিলসমূহে কাটতি হয় ৫৯ লক্ষ গাঁইট এবং বিদেশে চালান যায় ৪৯ লক্ষ গাঁইট। ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে বিগত ১৫ বৎসরের মধ্যে প্রতি বৎসরে গড়ে পাট উৎপন্ন হইয়াছে ৯৫ লক্ষ গাঁইট এবং প্রায় সমপরিমাণ পাটই ভারতীয় মিলে কাটতি ও বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। কিন্তু পাটের দাম সেই সময়ের মধ্যে উঠিয়াছে ও পড়িয়াছেঃ উচ্চতম হইয়াছে ১৯২৫-২৬ সালে মণকরা ১৮৸৵০ এবং নিম্নতম হইয়াছে ১৯৩২—৩, ১৯৩৩—৪ ও ১৯৩৪—৫ সালে প্রতি মণ ৩৷৷০ টাকা।'[১২] মূল্যবান ফসল হিসাবে গ্রাম্য অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাহার ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ; ইঁহারই বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়া কৃষক তাহার জমির খাজনা পরিশোধ করে, বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করে। ইহার দামের উঠা-নামা চাহিদা ও সরবরাহের হ্রাস বৃদ্ধির উপর ততখানি নির্ভর করে না যতখানি ব্যবসায়সংক্রান্ত কারচুপির উপরে সে নির্ভরশীল। ভারতীয় কলসমূহ ও বৈদেশিক ক্রেতাগণ তাহাদের খুসি খেয়ালমত পাটের মূল্য ধার্য করিয়া দেয় এবং কৃষকগণ তাহাদের অর্থনৈতিক অসহায়তার দরুণ মূল্যবাড়িবার অপেক্ষায় পাট ধরিয়া রাখিতে অক্ষম হইয়া ক্রেতাদের নির্ধারিতমূল্যেই তাহা বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। এইজন্য পাট হইতে লভ্য আয়ের পরিমাণ এরূপ অস্থির ও অনিশ্চিত যে, কৃষকদের খাদ্যের অভাব পূরণ করিবার পক্ষে তাহা বর্তমান অবস্থায় অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য। ভারতীয় কারখানা ও বৈদেশিক ক্রেতাগণই পাটের একমাত্র খরিদ্দার এবং ইহারা উভয়েই পূর্বাঞ্চলের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের আওতার বাহিরে অবস্থিত; এরূপ-ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমত্বপ্রাপ্ত হইলেও, মুসলিম রাষ্ট্র যে কিরূপে কৃষকদের স্বার্থের অনুকূলে পাটের মূল্যনিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইবেন তাহা প্রশ্নাধীন।

তাহা ছাড়া, যে জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তাহা হইতে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের মূল্য যদি উৎপন্ন পাটের দাম অপেক্ষা অধিক না হয় তাহা হইলে কেবলমাত্র অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের তাগিদের ফলেই পাটের চাষ পরিত্যক্ত হইতে পারে। স্যার আজিজুল হক হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, 'বাজারের বর্তমান অবস্থায় (১৯৩৬-৩৭) পাটের বিক্রয়মূল্য যদি পাঁচ টাকার নিম্নে হয়, তাহা হইলে পাটের আবাদ মোটেই লাভজনক হইবে না।'[১৩] তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, ১৯২৮-২৯ সাল হইতে ১৯৩৪-৩৫ সালের মধ্যে কৃষকগণ পাটের চাষে মোটামুটি ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছে।

---

12. Haque, op., cit., pp. 66—8.
13. Haque, op. cit., p. 62.

পূর্বেই দেখান হইয়াছে, আসামের সিলেটই একমাত্র জেলা যাহা মুসলিম পূর্বাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৪১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী ইহার আয়তন ৫,৪৭৮ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৩১,১৬,৬০২, অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে ৫৬৯। ১৯৩১ সালে ইহার সংখ্যা ছিল ৪৯৭, কাজেই দশ বৎসর সময়ের মধ্যে তাহা শতকরা ১৪·৪ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রদেশের কোন জেলার জনসংখ্যাই প্রতি বর্গমাইলে ৩২৯-এর অধিক নয় এবং সমগ্র প্রদেশ হিসাবে আসামের জনবসতির ঘনতা গড়ে প্রতি বর্গমাইলে ১৮৬। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বাংলার ন্যায় সিলেটও অতিশয় ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। সমগ্র আসাম প্রদেশে ১৯৩৬-৩৭ সালে মোট আবাদী জমির পরিমাণ ছিল ৫৬,৮৩,৭৭৪ একর, অর্থাৎ মাথাপিছু ১·৮ একর। আর ঐ সময়ে সিলেট জেলার খাদ্যশস্যের আবাদী জমির পরিমাণ ছিল ১৯,৮৩,৫৬৬ একর, অর্থাৎ মাথাপিছু ০·৬৩ একর। ১৯৩৬-৩৭ সালের শীতকালীন উৎপন্ন শস্যের গড়পড়তা পরিমাণ ধার্য হইয়াছিল প্রতি একরে ৮৯৬ পাউন্ড; উহাই যদি সিলেটের উৎপন্ন শস্যের গড় হার বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে বৎসরে তথায় চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল ৫৬৪ পাউন্ড, অর্থাৎ জনপিছু দৈনিক ১·৫ পাউন্ড—অবশ্য সমস্ত জমিতেই ধানের চাষ ছিল ইহা যদি ধরিয়া লওয়া হয়। এমনকি, এই অতিরঞ্জিত পরিমাণও সাধারণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন একজন লোকের জীবন-ধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। বিস্তৃত কোন হিসাব-নিকাশ না দিয়াও একথা বলা যায় যে, মুসলিম বাংলার জেলাগুলির মত পাটের আবাদ এই জেলায় ব্যাপক ও বহু বিস্তীর্ণ নয় এবং বাংলার খাদ্যের ঘাটতি পূরণ করিবার পক্ষেও ইহার সাহায্য বিশেষ কার্যকরী হইবে না।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ঔপনিবেশিক জনস্রোত কিভাবে পূর্ববঙ্গ হইতে অবিরাম আসামে প্রবেশ করিতেছে। এই বহিরাগত লোকপ্রবাহ আসামের মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার ফলে বাংলার খাদ্যের অবস্থার অণুমাত্র উন্নতি সাধিত হয় নাই এবং তাহা হওয়াও সম্ভব নয়, কারণ ঐ সময়ের মধ্যে বাংলার লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে ১৮১ লক্ষ; ১৯৩১ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত এই দশ বৎসরের মধ্যে বাংলার বর্ধিত লোকসংখ্যা ১০২ লক্ষ—আসামের সমগ্র জনসংখ্যার সমতুল।[14]

চা বাংলা ও আসামের অন্যতম বাণিজ্য দ্রব্য। কিন্তু এদিক দিয়াও মুসলিম-বাংলার জেলাগুলির অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে বাংলায় মোট চায়ের আবাদী জমির পরিমাণ ২,০৩,১০০ একর মধ্যে মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্বর্তী মাত্র ৭,৭০০ একর এবং অবশিষ্ট ১,৯৫,৪০০ একর অ-মুসলমান অঞ্চলের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার অন্তর্ভুক্ত। আসামের অবস্থা অবশ্য অপেক্ষাকৃত উন্নততর। ১৯৩৬-৩৭ সালে প্রদেশের মোট চায়ের আবাদী জমির ৪,৩৮,৯২৫ একরের মধ্যে মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সিলেটের

---

14. Census of India, Vol. 1, Tables. p. 62.

মধ্যে পড়ে ৪,৩৮,৯২৫ একর। অবশিষ্ট চা উৎপাদনকারী জেলা শিবসাগর, লক্ষ্মীপুর, দারাং ও কাছাড় মুসলিম অঞ্চলের বহির্ভূত।

(২) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলে কৃষিকার্য ও খাদ্যশস্য সম্বন্ধে যে চিত্র চোখে পড়ে তাহা অপেক্ষাকৃত আশাপ্রদ। পাঞ্জাবের জেলা-সমূহের লোকসংখ্যা ১,৬৮,৭০,৯০০ এবং তাহার আয়তন ৬৩,৭৭৫ বর্গ মাইল, অর্থাৎ প্রতি বর্গ মাইলে ২৬৪। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জনসংখ্যার ঘনতা প্রতি বর্গ মাইলে ২১৩, সিন্ধুতে ৯৪, বেলুচিস্থানে ৯। পাঞ্জাবের অংশ-বিশেষ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্থানসহ সমগ্র অঞ্চলের লোকসংখ্যা প্রতি বর্গ মাইলে ১৩৮, অথচ বাংলার মুসলিম অঞ্চলে তাহা ৮১০ ও সিলেটে ৫৬৯।

বেলুচিস্থান বাদে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের আবাদী জমির পরিমাণ ২৪ নম্বর ছকে দেখান হইয়াছে। এ স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাহাতে যে হিসাব ধরা হইয়াছে তাহা ১৯৩৯-৪০ সালের এবং তাহা সমগ্র পাঞ্জাবের, কেবলমাত্র মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্বর্তী জেলাগুলির নয়।

Agricultural Statistics of India-তে ১৯৩৭-৩৮ সালে পাঞ্জাবের মুসলমান ও অ-মুসলমান অঞ্চলের লোকসংখ্যার মাথা পিছু আবাদী জমির পরিমাণ সম্বন্ধে যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা নিম্নে ২২, ২৩ ও ২৪নং ছকে প্রদত্ত হইল।

ঐসকল ছক হইতে দেখা যাইবে, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বাংলা অপেক্ষা যে কেবল মাথা পিছু আবাদী জমির পরিমাণই বেশী তাহা নয়, কৃষিকার্যের বিস্তারের আবাদযোগ্য জমির পরিমাণও বাংলা অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহার কারণ পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে ব্যাপক সেচপ্রথার প্রবর্তন।

অন্যান্য প্রদেশের মত বেলুচিস্থানের হিসাব-নিকাশের বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৩৩-৩৪ সালে সেখানে আবাদ হইয়াছিল ৪,৪৯,০৯৪ একর এবং ফসল কাটা হইয়াছিল ২,৭৩,৮৭২ একরের। ১৯৩১ সালের সেন্সাস-রিপোর্ট অনুযায়ী মাথা পিছু আবাদ হইয়াছিল ১·১ একর ও ফসল কাটা হইয়াছিল ০·৭ একরের এবং ১৯৪১ সালের সেন্সাস-রিপোর্টে তাহা দাঁড়ায় ০·৫৪ ও ০·৮১ একর।

সৌভাগ্যক্রমে পাঞ্জাবে ও সিন্ধুতে ব্যাপক সেচ-ব্যবস্থার বিধান আছে এবং তজ্জন্য কৃষিকার্য যে কেবল ব্যাপকতর হইবারই সম্ভাবনা বিদ্যমান তাহা নয়, তীব্রতর হইবারও আশা পোষণ করা যায়।

২২ নং ছক

	মোট জমির পরিমাণ (একর)	চাষের অযোগ্য জমির পরিমাণ (একর)	চাষের যোগ্য জমির পরিমাণ (একর)	চাষের যোগ্য অথচ অনাবাদী জমির পরিমাণ (একর)	মোট ফসল উপ্ত জমির পরিমাণ (একর)	খাদ্যশস্য উপ্ত জমির পরিমাণ (একর)
পাঞ্জাবের অমুসলমান-প্রধান জেলা-সমূহ	২,১৮,৯২,৩৩৮	৬৭,০৯,৫৭৬	১,৫১,৫২,৭৬২	৩৭,৬৮,৬৪৯	১,১৩,৮৪,১১৩	৯৭,৭৮,৯৮১
পাঞ্জাবের মুসলমানপ্রধান জেলাসমূহ	৩,৮২,৬২,৩৮৬	৮২,৫৭,৫৫৩	৩,০০,০৪,৮৩৩	১,৪০,৯২,০৬৯	১,৫৯,১২,৭৬৪	১,১৬,৩২,১০৭
সিন্ধু	৩,০১,৭৯,৪৮৬	১,৪২,৬৬,০৪৭	১,৫৯,১৩,১৩৯	৫৮,৯১,৫১২	২১,০৯,০২৯	৪২,৯৬,২১১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	৮৪,০৭,৫৮২	৩০,০৯,৯৮৪	৫৩,৯৭,৫৯৮	২৮,৫১,৭০০	৪৮,৭৩,২৪৮	২১,১২,৯২৯

২৩ নং ছক

	তৈলবীজ আবাদী জমির পরিমাণ (একর)	ইক্ষু আবাদী জমির পরিমাণ (একর)	তুলা আবাদী জমির পরিমাণ (একর)	লোকসংখ্যা	মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ (একর)	মাথাপিছু আরও আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ (একর)	মাথাপিছু খাদ্যশস্য আবাদী জমির পরিমাণ (একর)
পাঞ্জাবের অমুসলমানপ্রধান জেলাসমূহ ...	৪,১২,৭৭১	২,৫৬,৫৫০	৭,৭৯,৭৭৯	১,১৫,৪৭,৯১৯	০·৯৮	০·৩২	০·৮৪
পাঞ্জাবের মুসলমানপ্রধান জেলাসমূহ	৪,৮৮,৭৮৩	২,৫৩,৪৬৪	৯,৭০,১৭৪	১,৬৮,৭০,৯০০	০·৯৪	০·৮৩	০·৬৯
সিন্ধু ...	২,১৩,৫১২	৭,৪২০	২৩,৫৫,৭৫২	৪৫,৩৫,০০৮	১·০৮	১·৩০	০·৯৪
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ...	৯১,৭৩৯	৭০,০৮৪	২২,১৯৫	৩০,৩৮,০৬৭	০·৬৯	০·৯৩	০·৬৯

২৪ নং ছক

১৯৩৯-৪০ সালে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কর্ষিত জমি ও উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ

প্রদেশ	মোট আবাদী জমির পরিমাণ (একর)	চাউল: আবাদী জমির পরিমাণ (একর)	চাউল: উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ (টন)	গম: আবাদী জমির পরিমাণ	গম: উৎপন্ন গমের পরিমাণ	অন্যান্য খাদ্যশস্য: আবাদী জমির পরিমাণ	অন্যান্য খাদ্যশস্য: উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ	মোট খাদ্যশস্য: আবাদী জমির পরিমাণ (একর)	মোট খাদ্যশস্য: উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ (টন)	তুলা: আবাদী জমির পরিমাণ (একর)	তুলা: উৎপন্ন তুলার পরিমাণ (গাইট)
পাঞ্জাব মাথাপিছু	২,৫৭,৪৪,১২৯ ০·৯	৯,৭৬,৫৫২	২,৮৭,০০০	৯৫,৬৫,৯৭৬	৩৭,৬০,০০০	৯৩,৫৫,৮৬৯	১৪,৭২,০০০	১,৯৮,৯৮,৩৯৭ ০·৭	৫৫,১৯ ০০০ ৫·৩ মণ	২৬,৪১,১০৫ ০·০৯	১০,১৭,০০০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত মাথাপিছু	২০,০০,৬১৭ ০·৬৬	৩৬,৪২৩	—	৯,৩১,৩৭৩	২,৬০,০০০	৯,৭৭,২৩৫	৩,২৩,০০০	১৯,৪৫,০৩১ ০·৬৫	৫,৮৩,০০০ ৫·২ মণ	১৭,৩৫১ ৮,৫৪,৩৯০	৩,০০০
সিন্ধু মাথাপিছু	৪৯,৪৫,৮৪৩ ১·১	১৩,২৮,৭১৩	৪,৪৩,০০০	১২,৭০,৫৬৩	৩,২৬,০০০	১৬,৪৫,০১০	১,৯০,০০০	৪২ ৪৪,২৮৬ ০·৯৩...	৯,৫৯,০০০ ৫·৮ মণ	০·১৮	৩,০৯,০০০
তিন প্রদেশের সর্ব মোট মাথাপিছু	৩,২৬,৯০,৫৮৯ ০·৯০	২৩,৪১,৬৮৮	৭,৩০,০০০	১,১৭,৬৭,৯১২	৪৩,৪৬,০০০	১.১৯.৭৮.১১৪	১৯,৮৫,০০০	২,৬০,৮৭,৭১৪ ০·৭০	৭০,৬১,০০০ ৫·৪ মণ	৩৫,১২,৮৪৬ ০·১০	১৩,২৯,০০০

পরবর্তী ছক দুটিতে ১৯৩৯-৪০ সালে কর্ষিত ও সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণের হিসাব প্রদত্ত হইল:—

২৫ নং ছক

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের উপ্ত ও সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ

	উপ্ত জমির পরিমাণ (একর)	সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ (একর)	সেচপ্রাপ্ত ও উপ্ত জমির শতকরা আনুপাতিক হার	মূল খাল ও তাহার শাখা-প্রশাখার দৈর্ঘ (মাইল)	১৯৩৯-৪০ সালে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে প্রযুক্ত মূলধনের পরিমাণ
পাঞ্জাব	২,৫৭,৪৪,১২৯	১,৩৫,২১,৮৮৯	৬২·৫	২০,১৯৩	৩৯,২৬,৯০,২৬৮
সিন্ধু	৪৯,৪৫,৮৪৩	৪২,৪০,৯৪৯	৮৫·৮	৯,৬২০	৩৩,০০,৮৮,৭৬০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২০,০০,[illegible]	৪,৭৫,৪১৩	২০·৫	৯৭৯	৩,১৫,২১,৪৪৪
বেলুচিস্থান ...	৪,৪৯,০৯৪	১,৪৫,৪০২	৩২·৩	২৫২	১,৪৫,১১,২৭৬
সমগ্র উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল	৩,৩১,৩৯,৬৮৩	১,৮৩,৮৬,৬৫৩	৫৫·৪	৩১,০৪৪	৭৩,৮৮,১১,৭৪৮
মোট বৃটিশ ভারত ...	২০,৯৯,৫৯,৭৮৬	২,৮২,৯২,৯০৮	১৩·৪	৭৪,৯১১	১,৫৩,৮৯,৪২,৪০০
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সহিত বৃটিশ ভারতের শতকরা হার ...	১৫·৬	৬১·৪		৪১·৪	৪৭·৯

২৬ নং ছক

	প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ আদায়	প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ব্যয়ভার	মোট রাজস্বের পরিমাণ (টাকা)	মোটপ্রযুক্ত মূলধনের শতকরা হার	সেচপ্রাপ্ত অঞ্চলের শস্যের মোট দাম	সেচপ্রাপ্ত অঞ্চলের শস্যের মূল্য (মাথাপিছু হার)
পাঞ্জাব	৭,১০,৯০,১৪৮	১,৫৩,৯৮,২২২	৫,৫৬,৯১,৯২৬	১৪·১৯	৫০,৭৪,৫৭,৬৯৬	১৭-৩-০
সিন্ধু	১,৬৮,৬১,২৯৩	৬৮,৮৫,৫৫৪	৯৯,৭৫,৭৩৯	৩·৩২	১১,০২,১২,৬৭৭	২৪-৫-০
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	২৩,২২,৫৫৭	৯,৮০,০৭১	১৩,৪২,৪৮৬	০·৪২	২,৬৬,৮২,৯১২	৮-১২-০
বেলুচিস্থান	৩,৯৪,৫৪০	২,৫৫,৯৫৫	১,৩৮,৫৮৫	০·৯৫	৪,৪৮,৩৯৮	০-১৪-০
উঃ পঃ অঞ্চলের সর্বমোট ...	৯,০৬,৬৮,৫৩৮	২,৩৫,১৯,৮০২	৬,৭১,৪৮,৭৩৬	৯·০৮	৬৪,৪৮,০১,৬৮৩	১৭-১০-০
বৃটিশ ভারতের সর্বমোট ...	১৪,৬০,৪২,১২৭	৪,৫৬,৯৩,৪৭১	১০,০৩,৪৮,৬৫৬	৬·৫২	১,৩৬,২৯,০৮,৩৭৩	০-৮-০
বৃটিশ ভারতের সহিত উঃ পঃ অঞ্চলের শতকরা অনুপাত	৬২·৪	৫১·৪	৬৬·৯		৪৭·৩	

কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি বে-সরকারী সূত্র হইতে সেচপ্রাপ্ত জমি বাদে সরকারী খালসমূহ হইতে সেচপ্রাপ্ত পাঞ্জাবের মুসলমান ও অ-মুসলমান অঞ্চলের জমিসমূহের তুলনামূলক বিচার করিলে তাহা দাঁড়াইবে নিম্নলিখিত রূপঃ—

	সরকারী খালসমূহ হইতে সেচ প্রাপ্ত মোট জমির পরিমাণ	সরকারী খালসমূহ হইতে সেচ প্রাপ্ত অঞ্চলের সহিত অন্যবিধ উপায়ে সেচ প্রাপ্ত অঞ্চলের শতকরা অনুপাত
পাঞ্জাবের মুসলিম অঞ্চল ...	৮৭,০৮,০৮৯ একর	শতকরা ৭৮
পাঞ্জাবের অমুসলমান অঞ্চল ...	২৪,৯৫,১৯৯ একর	শতকরা ২২
পাঞ্জাবের সর্বমোট ...	১,১২,০৩,২৪৮ একর	

উপরে প্রদত্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, সরকারী খালসমূহ হইতে পাঞ্জাবের মুসলিম অঞ্চলই সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধাপ্রাপ্ত। সেচ-ব্যবস্থার দিক দিয়া সমগ্র বৃটিশ ভারতের তুলনায় উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অবস্থানই যে সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। সমগ্র বৃটিশ ভারতে সর্বসমেত যত জমিতে ফসল বোনা হইয়াছে তাহার শতকরা ১৫.৬ ভাগ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত। কিন্তু তাহার সেচপ্রাপ্ত জমির অনুপাত সমগ্র বৃটিশ ভারতের সেচপ্রাপ্ত জমির শতকরা ৬১·৪। সমগ্র বৃটিশ ভারতে সরকারী খাল ও তাহার শাখা-প্রশাখাসমূহের মোট দৈর্ঘ্য ৭৪,৯১১ মাইল; ইহার মধ্যে ৩১,০৪৪ মাইল, অর্থাৎ শতকরা ৪১.৪ ভাগ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এবং মোট প্রযুক্ত মূলধন ১৫৩·৮৯ কোটী টাকার মধ্যে ৭৩·৮৮ কোটী টাকা অর্থাৎ শতকরা ৪৭·৯ ভাগ খাটান হইয়াছে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। সমগ্র বৃটিশ ভারতে সেচ-ব্যবস্থা হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ মোট ১০.০৩ কোটী টাকা; তন্মধ্যে ৬.৭১ কোটী টাকা, অর্থাৎ শতকরা ৬৬.৯ ভাগই আদায় হয় উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে। সমগ্র বৃটিশ ভারতে মোট সেচপ্রাপ্ত জমির ফসলের দাম ১৩৬.২৯ কোটী টাকা এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অনুরূপ উপায়ে উৎপন্ন ফসলের মূল্য ৬৪.৪৮ কোটী টাকা, অর্থাৎ মোট টাকার শতকরা ৪৭·৩ ভাগ। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সেচপ্রাপ্ত জমির ফসলের মূল্য মাথাপিছু পড়ে ১৭৷৵৹ অথচ বৃটিশ ভারতে তাহা ৩৸৹-র অধিক নয়। এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সমগ্র পাঞ্জাবের মোট সাধারণ রাজস্বের শতকরা ৪২ ভাগ সেচব্যবস্থা হইতে প্রাপ্ত; সিন্ধুতে তাহা ১৩·৪ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৭·৫ ভাগ মাত্র। কেবলমাত্র সিন্ধু ও

পাঞ্জাবের হিসাব ধরিলে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অবস্থা অধিকতর সুবিধাজনক হইয়া দাঁড়ায়। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে মোট যে পরিমাণ জমিতে ফসল বোনা হইয়াছে, তাহার শতকরা যথাক্রমে ৮৫·৮ ও ৬২·৫ ভাগ সেচব্যবস্থার দ্বারা আবাদীকৃত। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মোট যত জমিতে ফসল বোনা হইয়াছে, তাহার শতকরা ৫৫·৪ ভাগই সেচপ্রাপ্ত, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলসহ সমগ্র বৃটিশ ভারতের আবাদী জমির তাহা শতকরা ১০·৪ ভাগ। আবার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সহিত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল বিযুক্ত সমগ্র বৃটিশ ভারতের তুলনা করিলে তাহার অবস্থা হইবে আরও অধিক সুবিধাজনক; কারণ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল বাদে সমগ্র বৃটিশ ভারতের মোট আবাদী জমির শতকরা ৫·৫ ভাগ মাত্র সেচপ্রাপ্ত।

এই সমস্ত সুবিধা সত্ত্বেও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদনকারী প্রদেশরূপে গণ্য হইতে পারে না। উদ্বৃত্ত ফসল বলিতে যদি কিছু অবশিষ্ট রহিয়াও যায়, তাহা কাটতি হইয়া যায় পার্শ্ববর্তী এলাকায়। ১৯৩৪ সালের জুন মাসে 'ক্রপ প্ল্যানিং কনফারেন্সের' সিমলা অধিবেশনে 'ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ' কর্তৃক প্রত্যেক প্রদেশের চাউল ও গমের অবস্থা পর্যালোচিত হয় এবং দেখান হয় যে, পাঞ্জাবে প্রচুর পরিমাণে চাউল উৎপন্নও হয় না, কাটতিও হয়না। গম সম্বন্ধে বলা হয়, তাহার উৎপাদন পরিমাণে অত্যধিক বলা চলে না। উদ্বৃত্ত শস্য পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহে ও কলিকাতায় চালান হইয়া যায়; সিন্ধুতে গমের আবাদী জমির পরিমাণ যখন ২০ লক্ষ একরে পৌঁছিবে, প্রকৃতপক্ষে অতিরিক্ত উৎপাদন আরম্ভ হইবে তখনই।[১৫] উপরে প্রদত্ত হিসাব হইতে দেখা যায়, ১৯৩৯-৪০ সালের পূর্বে সিন্ধু সে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হয় নাই।

পাঞ্জাবের উন্নয়ন বিভাগীয় মন্ত্রী সর্দার বলদেও সিং ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় এক বিবৃতিদান প্রসঙ্গে বলেন, তিন বৎসর পূর্বে পাঞ্জাব চাউলের দিক দিয়া ঘাটতি প্রদেশ ছিল সত্য, কিন্তু ১৯৪৪-৪৫ সালে তাহার উদ্বৃত্ত চাউলের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩০ লক্ষ টন। তবে পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে কৃষিকার্য যেরূপ দ্রুতগতিতে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, অচিরে তাহারা তাহাদের উদ্বৃত্ত ফসল ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইবে। উৎপাদনের পরিমাণ যে যুদ্ধের ফলেই এরূপ আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের জন্য দৈনিক ১৪ ছটাক অথবা ১২ ছটাক করিয়া খাদ্য ধার্য হয় এবং সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ যদি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরূপে গণ্য হয়, তাহা হইলে খাদ্যের অবস্থা দাঁড়ায় নিম্নলিখিতরূপঃ—

15. 'Proceedings of the Crop Planning Conference' (Delhi, 1934), pp. 7—10, quoted by Prof. Benoy Kumar Sarkar in the 'Sociology of Population,' pp. 38—9.

২৭ নং ছক

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে খাদ্যের অবস্থা

প্রদেশ	মোট জনসংখ্যা	প্রাপ্তবয়স্করূপে গণ্য জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ	প্রতি বৎসরের উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ (মণ)	দৈনিক মাথাপিছু ১৪ ছটাক হিসাবে ধার্য এক বৎসরের খাদ্যের পরিমাণ (মণ)	ঘাটতির পরিমাণ (মণ)	দৈনিক মাথাপিছু ১২ ছটাক হিসাবে ধার্য এক বৎসরের খাদ্যের পরিমাণ (মণ)	উদ্বৃত্ত ফসলের পরিমাণ (মণ)
পাঞ্জাব	২,৮৪,১৮,৮১৯	২,১৩,১৪,[illegible]	১৫,০৬,৬৮,৭০০	১৭,০১,৭৯,৭৯০	১,৯৫,১১,০৯০ (১১·৪২%)	১৪,৫৮,৬৮,২০৫	৪৮,০০,৪৬৫ (০·২৯%)
সিন্ধু	৪৫,৩৫,০০৮	৩৪,০১,২৫০	২,৬১,৮০,৭০০	২,৭১,৫৬,৭০০	৯,৭৬,০৩০ (৩·৫৯%)	২,৩২,৭৭,৫১০	২৯,০৩,১৯০ (১২·৪৭%)
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩০,৩৮,০৬৭	২২,৭৮,৫৫০	১,৫৯,১৫,৯০০	১,৮১,৯২,৬৯৫	২২,৭৬,৭৯৫ (১২·৫১%)	১,৫৫,৯৩,৮৯৫	৩,২২,০০৫ (২·০৬%)

২৮ নং ছক

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

প্রদেশ	১৯৪১ সালের লোকসংখ্যা	১৮৯১ সালের লোকসংখ্যা	১৯৪১ সাল ও ১৮৯১ সালের মধ্যে পার্থক্য সংখ্যা	%	১৯৩১ সালের লোকসংখ্যা	১৯৪১ সাল ও ১৯৩১ সালের মধ্যে পার্থক্য সংখ্যা	%
পাঞ্জাব	২,৮৪,১৮,৮১৯	১,৮৬,৫২,৬১৪	৯৭,৬৬,২০৫	৫২·৩	২,৩৫,৮০,৮৬৪	৪৮,৩৭,৯৫৫	২০·৫
সিন্ধু	৪৫,৩৫,০০৮	২৮,৭৫,১০০	১৬,৫৯,৯০৮	৫৭·০	৩৮,৮৭,০৭০	৬,৪৭,৯৩৮	১৬·৭
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩০,৩৮,০৬৭	১৮,৫৭,৫১৯	১১,৮০,৫৪৮	৬৩·৫	২৪,২৫,০৭৬	৬,১২,৯৯১	২৫·২
বেলুচিস্থান	৫,০১,৬৩১	৩,৮২,১০৬	১,১৯,৫২৫	৩১·২	৪,৬৩,৫০৮	৩৮,১২৩	৮·২
বৃটিশ ভারতীয় প্রদেশ সমূহ	২৯,৫৮,০৮,৭২২	২১,২৯,৭০,৬১৬	৮,২৮,৩৮,১০৬	৩৮·৮	২৫,৬৭,৫৭,৮১৮	৩,৯০,৫০,৯০৪	১৫·২

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেও জনসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং তাহা বৃদ্ধির হার অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক অধিক। ১৮৯১ হইতে ১৯৪১ ও ১৯০১ হইতে ১৯৪১ সালের বৃদ্ধির হার পূর্ব পৃষ্ঠায় ২৮ নম্বর ছকে দর্শিত হইল।

ব্যাপকতর সেচব্যবস্থা অবলম্বনের সংগে সংগে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আরও বাড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু হিসাব দেখিয়া মনে হয়, খাদ্যশস্য উৎপাদনের হার জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছে নাঃ বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে পাঞ্জাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৫২, সিন্ধুতে শতকরা ৫৭ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শতকরা ৬৩ ভাগ হারে।

দেশের অন্যান্য অংশের সহিত এই অঞ্চলকেও এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে এবং তাহা করিবার পক্ষে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এই অঞ্চলের অবস্থা অধিকতর সুবিধাজনক।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছাড়াও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবে ও সিন্ধুতে ব্যাপক আকারে তুলার চাষ আছে। ১৯৩৯-১৯৪০ সালে পাঞ্জাবে উৎপন্ন তুলার পরিমাণ ১০,১৭,০০০ গাঁইট (প্রতি গাঁইট ৪০০ পাউন্ড), সিন্ধুতে ৩,০৯,০০০ গাঁইট ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৩,০০০ গাঁইট। উপরোক্ত তিনটি প্রদেশে তুলার চাষ হইয়াছিল যথাক্রমে ২৬,৪১,১০৫; ৮,৫৪,৩৯০ ও ১৭,৩৫১ একর জমিতে।১৬ এই খাদ্যেতর শস্যের গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি তখনই, যখন অবশিষ্ট বৃটিশ ভারতের উৎপাদনের সহিত এই অঞ্চলের উৎপাদনের আমরা তুলনামূলক বিচার করিঃ সমগ্র বৃটিশ ভারতে উৎপন্ন মোট ৩৩,৮১,০০০ গাঁইট তুলার মধ্যে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল উৎপাদন করিয়াছিল অন্যূন ১৩,২৯,০০০ গাঁইট, অর্থাৎ মোট উৎপন্ন তুলার শতকরা ৩৯·৩ ভাগ। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া সিন্ধুর সুক্কুর বাঁধ এলাকায় তুলার চাষ প্রতি বৎসরে বৃদ্ধি পাইতেছে: বাঁধ নির্মাণের পূর্ববর্তী যুগে ১৯৩২-৩৩ সালে তুলার চাষ হইয়াছিল ৩,৪২,৮৬০ একর জমিতে, বাঁধ নির্মাণের পরবর্তী যুগে ১৯৩৯-৪০ সালে সেচ-ব্যবস্থার কল্যাণে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৮,৫৫,২৭৭ একরে। উপরন্তু উৎপন্ন তুলা উৎকৃষ্টতর ধরণের আমেরিকান তুলা হওয়ার দরুণ, তাহা বিক্রয় হয় অধিকতর উচ্চমূল্যে।১৭ অনুরূপ আকারে না হইলেও, অনুরূপভাবে পাঞ্জাবেও উন্নততর ধরণের তুলার চাষ প্রতি বৎসরে প্রসারলাভ করিতেছে।

১৯৩৯ সালে ৪০০ পাউন্ড ওজনের প্রতি গাঁইট তুলার দাম ১০৫ টাকা হিসাবে সমগ্র দেশে মোট তুলা বিক্রয়লব্ধ ৩৫·৫০ কোটি টাকার মধ্যে পাঞ্জাবে বিক্রয় হইয়াছিল ৯ কোটি ও সিন্ধুতে ৩·২৫ কোটি টাকার।

---

16. 'Statistical Abstract for British India', 1930-31 to 1939-40, p. 554.
17. Annual Report of the Dept. of Agriculture of Sind, 1939-40, pp. 7—8.

এই তুলার বেশীর ভাগই অন্যান্য প্রদেশে ও বিদেশে চালান যায়; তাহার কারণ কাপড়ের কল এইসব প্রদেশে নাই বলিলেই চলে; পাঞ্জাবে অবশ্য চরকার প্রচলন আছে, কিন্তু তাহাতে যে পরিমাণ তুলার কাটতি হয়, তাহা একেবারে নগণ্য। ১৯৩৮-৩৯ সালে সমগ্র ভারতে ৩৮০টি কাপড়ের কলে মোট ১০ লক্ষ টেকো ও দুই লক্ষ তাঁত সক্রিয় ছিল; তন্মধ্যে সিন্ধু ও পাঞ্জাবে সক্রিয় কল, টেকো ও তাঁতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭; ৭২০০০ ও ২০০০ মাত্র; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও বেলুচিস্থানে তাহার অস্তিত্ব মাত্র ছিল না। ১৮

উপরি-উক্ত আলোচনায় উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হইয়াছে অ-মুসলমানপ্রধান জেলাগুলিসহ পাঞ্জাব প্রদেশ, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—পাঞ্জাবের অ-মুসলমানপ্রধান জেলাগুলি শেষোক্ত প্রদেশ হইতে স্পষ্টতঃ বাদ দেওয়া হয় নাই।

(ত্রিশ)

খনিজ সম্পদ

যুক্তপ্রদেশের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক চার্লস এইচ, বেহরী 'Foreign Affairs' নামক পত্রিকায় লিখিতেছেন, 'ব্রহ্মদেশ বিযুক্ত সমগ্র ভারত কয়লা, পেট্রোলিয়াম, লৌহ, ম্যাংগানিজ, ক্রোম, স্বর্ণ, বক্সাইট, সল্ট, ম্যাগনেসাইট, অভ্র, জিপ্সাম, মোনাজাইট প্রভৃতি নানাবিধ মূল্যবান প্রস্তরের খনি-রূপে শীঘ্রই বিশ্বের বাজারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিবে।

'বর্তমান জগতের শিল্পসম্পদ কয়লা, লৌহ ও তৈল এই তিনটি পদার্থের উপর নির্ভর করে। কয়লা ও লৌহের যৌথ সম্পদই বর্তমান যুগের শিল্প সংগঠনের ভিত্তি-ভূমি। মনুষ্যদেহ গঠনের ক্ষেত্রে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের স্থান যেখানে, যন্ত্রনির্মাণের ক্ষেত্রে তাহাদের স্থান তথায়; সর্বক্ষেত্রে তাহাদের একত্র উপস্থিতি প্রয়োজন। তৈলও অবশ্য মূল্যবান দ্রব্য, কিন্তু শান্তির সময়ে তাহার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য নয়; খনিজ দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময় যদি স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ হয়, তাহা হইলে কয়লা-সম্পদে সম্পন্ন রাষ্ট্র তৈলের সঞ্চয় ব্যতিরেকেও কার্য চালাইতে পারে। এমনকি, তৈল যদি তাহার আদৌ না থাকে, তথাপি জার্মাণীর মত কয়লাকে সে তরল দাহ্য পদার্থে পরিণত করিয়া লইতে পারে। ইস্পাত

18. M. P. Gandhi, Indian Textile Cotton Industry Annual, (1939), p. 62 and Appendix 1.

নির্মাণের পক্ষে তৈলের প্রত্যক্ষ কার্যকারিতা কিছুমাত্র নাই, কাজেই ইস্পাত তৈয়ারীর ক্ষেত্রে কয়লার স্থান পূরণ করিতে সে অক্ষম। সেদিক দিয়া কয়লা একান্ত অপরিহার্য।

'আমাদের প্রথম সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট : ভারতবর্ষের তৈলসম্পদ প্রচুর না হইলেও, কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত নির্মাণের পক্ষে প্রয়োজনীয় লৌহঘটিত অন্যান্য মিশ্র ধাতু এবং আনুষঙ্গিক অপরাপর খনিজ পদার্থের সঞ্চয় এত বেশী যে, আত্মনির্ভর শিল্পসমৃদ্ধ জাতিরূপে উঠিয়া দাঁড়াইতে সে সমর্থ। অন্যান্য শিল্পসমৃদ্ধ জাতিসমূহের তুলনায় তাহার মাথাপিছু সরবরাহের পরিমাণ অত্যন্ত কম, কিন্তু অনতিদূর ভবিষ্যতে অতি প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের সঞ্চয় গুরুতররূপে ক্ষুণ্ণ না করিয়াও মাথাপিছু কার্যতির পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিবার সম্ভাবনা বিদ্যমান।'

এক্ষণে দেখা যাক, এই সমস্ত খনিজ পদার্থ দেশে কোথায় কিভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বদিকস্থ মুসলিম অঞ্চলের এইসব খনিজ দ্রব্যের সঞ্চয়ের পরিমাণ কিরূপ।

সল্ট, বক্সাইট ও অন্যান্য কয়েকটি অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য পরবর্তী ২৯ ও ৩০ নম্বর ছকের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই; সল্ট (৬৪,৬৭৪ টন) উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র পশ্চিম পাঞ্জাবে এবং বক্সাইট (১০,১৩৪ টন) ও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয় সম্পূর্ণরূপে অ-মুসলমান অঞ্চলে।

কয়লা নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ। পাঞ্জাব ও বেলুচিস্থান হইতে প্রাপ্ত স্বল্প পরিমাণ কয়লা ছাড়া প্রায় সমগ্র পরিমাণই উৎপন্ন হয় মুসলিম অঞ্চলের বহির্ভূত এলাকায়। বাংলার কয়লাখনিসমূহ বর্ধমান জেলায় অবস্থিত এবং উক্ত জেলার মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা ১৮ হওয়ার দরুণ তাহা মুসলিম অঞ্চলের বহির্ভূতরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। আসামের তৈলখনি এলাকাও মুসলিম অঞ্চলের বহির্ভূত।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও বেলুচিস্থানে খনিজ তৈল অল্পবিস্তর পরিমাণে পাওয়া যায়। 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া'র সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ জে, কগিন ব্রাউন তাঁহার 'India's Mineral Wealth' নামক গ্রন্থে ১৯০০ সাল হইতে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মদেশের অন্তর্ভুক্তিকালে ভারতে পেট্রোলিয়াম উৎপাদনের গড়পড়তা বার্ষিক হারের হিসাব দিয়াছেন। ১৯২৯ সাল হইতে ১৯৩২ সালের মধ্যে উৎপন্ন পেট্রোলিয়ামের হার নিম্নলিখিতরূপঃ ব্রহ্মদেশ ৮১·৪, আসাম ১৫·৫ এবং পাঞ্জাব ৩·১ ভাগ। স্যার এডুইন প্যাসকোর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিতেছেনঃ 'পাঞ্জাবের অনেক স্থানে ও বেলুচিস্থানে পার্বত্য অঞ্চলের খনিসমূহ ভূকম্পন ও অন্যবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে হয় গভীরভাবে বিচ্ছিন্ন নয় স্থানচ্যুত বা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে; স্থানে স্থানে তৈল নিঃসরণ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা নিতান্ত বাহ্যিক ব্যাপার; উৎসের সহিত তাহাদের এমন কোন ঘনিষ্ঠ সংযোগ নাই যে, কৃত্রিম উপায়ে সে-সব শৈলক্ষেত্র হইতে তৈল নিষ্কাসনের

২৯ নং ছক

১৯৩৮ সালে মুসলিম অঞ্চলে উৎপন্ন খনিজ দ্রব্য

খনিজ দ্রব্য	মুসলিম বাংলা		পাঞ্জাব		সিন্ধু		উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ		বেলুচিস্থান	
	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)
কয়লা (টন)	—	—	১,৮৪,০২৮	১০,২০,৮৫৬৲	—	—	—	—	১৪,৩৮৮	৯১,৮১২
পেট্রোলিয়াম (গ্যালন	—	—	২,১১,১৩,৪২০	৫২,৭৮,৩৫৫৲	—	—	—	—	—	—
ক্রোমাইট (টন)	—	—	—	—	—	—	—	—	২১,৮৯২	৩,২৬,০১৪
কপার ওর ও ম্যাটে (টন)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
আয়রণ ওর (টন)			—	—	—	—	—	—	—	—
ম্যাঙ্গানিয়া ওর (টন)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ম্যাগনেসাইট (টন)	—	—								
মাইকা (হন্দর)			—	—	—	—	—	—	—	—

৩০ নং ছক

বৃটিশ ভারতে এবং মুসলমান ও অমুসলমান অঞ্চলে উৎপন্ন খনিজ দ্রব্য

খনিজ দ্রব্য	সমগ্র মুসলিম অঞ্চল		বৃটিশ ভারত		বৃটিশ ভারত বিযুক্ত মুসলিম অঞ্চল	
	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)
কয়লা (টন)	১,৯৮,৪১৬	১১,১২,৬৬৮	২,৫২,৭৮,২১৮	৯,৪৬,০০,৭১৮	২,৫০,৭৯,৮০২	৯,৩৫,১৮,০৫০
পেট্রোলিয়াম (গ্যালন)	২,১১,১৩,৪২০	৫২,৭৮,৩৫৫	৮,৭০,৮২,৩৭১	১,৬৫,৪৩,১৪২	৬,৫৯,৬৮,৯৫১	১,১২,৬৪,৭৮৭
ক্রোমাইট (টন)	২১,৮৯০	৩,২৬,০১৪	২৭,০৮৬	৪,২৫,৯৪২	৫,১৯৪	৯৯,৯২৮
কপার ওর ও ম্যাট্রে (টন)	—	—	২,৮৮,০৭৬	৩২,৪০,৬৪০	২,৮৮,০৭৬	৩২,৪০,৬৪০
আয়রণ ওর (টন)	—	—	১৪,২১,৭০১	২৬,৯১,৮২৯	১৪,২১,৭০১	২৬,৯১,৮২৯
ম্যাংগানিজ ওর (টন)	—	—	৭,৬৬,৩৪১	৩,২০,৯৩,৭০৯	৭,৬৬,৩৪১	৩,২০,৯৩,৭০৯
ম্যাগনেসাইট (টন)	—	—	২৩,০৫২	১,৩৪,৮৭৬	২৩,০৫২	১,৩৪,৮৭৬
মাইকা (হন্দর)	—	—	১,০৮,৮৩৪	৪০,৮৯,৪৮৮	১,০৮,৮৩৪	৪০,৮৯,৪৮৮
মোট		৬৭,১৭,০৩৭		১৫,৩৮,৫০,৩৪৪		১৪,৭১,৩৩,৩০৭

ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে।'১ কোন কোন স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে খনন-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, কেবলমাত্র খাউরের তৈলক্ষেত্রে উৎপাদন-কার্য সার্থকতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। ১৯৩৮ সালে সমগ্র বৃটিশ ভারতে মোট ১৫,৩৮,৫০,০০০ টাকা মূল্যের খনিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে খনিজজাত দ্রব্যের মূল্য ৭৬,১৭,০০০ টাকা, অর্থাৎ মোট টাকার শতকরা ৪·৩ ভাগ; মুসলিম পূর্বাঞ্চলে খনিজ দ্রব্য আদৌ উৎপন্ন হয় নাই। বৃটিশ ভারতের সহিত দেশীয় রাজ্যসমূহেরও হিসাব ধরিলে, মুসলিম অঞ্চলের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণেই অধ্যাপক বেহরী যে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাইঃ 'ভারতের খনিজ সম্পদ হিন্দু ও মুসলিমপ্রধান অঞ্চলে এরূপভাবে বণ্টিত রহিয়াছে যে, ভারতবর্ষ যদি ধর্মগত ভিত্তিতে বিভক্ত হয়, তাহা হইলে হিন্দুরাষ্ট্র হইবে সম্পদশালী ও মুসলিমরাষ্ট্র হইবে স্পষ্টতঃ দরিদ্র। এই বণ্টন-বৈষম্য এতই অধিক যে, জনসংখ্যার ঘনতার পার্থক্য সে ক্ষতিপূরণ করিতে অসমর্থ। খনিজাত দ্রব্যের তুলনামূলক বিচার দ্বারা হিন্দুস্থানের বর্তমান খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যই যে প্রমাণিত হয়, তাহা নয়, ভারতবর্ষে শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাবী উন্নতির সম্ভাবনাও সূচিত করে। হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান সমস্যার সমাধান এই সিদ্ধান্তের উপরেই নির্ভরশীল। হিন্দুস্থানে কয়লা, লৌহ ও লৌহঘটিত অন্যান্য মিশ্র ধাতুর সঞ্চয় প্রচুর (অবশ্য ইহার পরিপূরক হিসাবে অনুরূপ অন্যান্য দ্রব্যের আমদানীও একান্ত প্রয়োজন); অন্যান্য অধাতব পদার্থ ও স্বর্ণের সঞ্চয়ও এখানে স্বল্প নয়; তাম্র এবং বক্সাইটও এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাকিস্থানে কয়লা ও লৌহের সঞ্চয় অতিশয় অল্প। কিন্তু ম্যাঙ্গানিজ ও ক্রোমিয়াম ব্যতীত লৌহঘটিত অন্যান্য মিশ্র ধাতুর দিক দিয়া পাকিস্থান হিন্দুস্থানের মতই সমৃদ্ধ। ম্যাগনেসাইট ব্যতীত অন্যান্য গৌণ খনিজ দ্রব্যের সঞ্চয় এই অঞ্চলে পর্যাপ্ত; ভারতবর্ষে প্রাপ্ত তৈলের বেশীর ভাগই এই অঞ্চলে উৎপন্ন।

'আমাদের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত সংক্ষেপতঃ ইহাই যে, হিন্দু ও মুসলিম অঞ্চল পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। পাকিস্থান হইতে কোন কোন দ্রব্য গ্রহণ করা যেমন হিন্দুস্থানের পক্ষে প্রয়োজন হইবে, পাকিস্থানের শিল্প-সংগঠনের পক্ষেও তেমনি হিন্দুস্থানের সম্পদ আহরণ করা হইবে একান্ত আবশ্যক।' তাহার পর নিম্নলিখিত তাৎপর্যপূর্ণ উক্তির দ্বারা অধ্যাপক বেহরী তাঁহার বক্তব্যের উপসংহার করিয়াছেনঃ

'এই বিবরণী একদিকে যেমন গ্রেটবৃটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে আপোষ-রফা সম্পাদনের পক্ষে বিলম্বের দায়িত্বের পরিমাপ করে না, অপরদিকে তেমনি ভারতীয় বিভিন্ন জাতিসমূহের পক্ষে তাহাদের ধর্মের গুরুত্বও লাঘব করিতে চেষ্টা করে না। ইহা শুধু এই কথাই বলিতে চায় যে, খনিজ সম্পদের দিক দিয়া হিন্দু ও মুসলিম অঞ্চল যেমন নিবিড়ভাবে পরস্পরের সহিত সন্নিবদ্ধ, অর্থনীতির

1. J. C. Brown : Mineral Wealth of India, p. 60.

দিক দিয়া তেমনি তাহারা পরস্পরের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। ইহা জোরের সহিত এই কথাই ব্যক্ত করিতে চায় যে, পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরতা যেক্ষেত্রে এমন নিবিড় ও অপরিহার্য, রাজনৈতিক নির্ভরতাই সেক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের সুষ্ঠুতম পন্থা। একথার তাৎপর্য ইহাই যে, ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র-বিভাগ যদি বিহিত হয়, তাহা হইলে হিন্দু-ভারত অপেক্ষা মুসলিম-ভারতই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সর্বশেষে এই কথা বলিয়াই সে তাহার বক্তব্য সমাপ্ত করিতে চায় যে, ভারতীয় অর্থনীতিও সমগ্রভাবে এশিয়ার অন্যান্য অংশের উপর নির্ভরশীল।'

স্যার হোমি মোদী ও ডাক্তার মাথাইও অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন; তাঁহারা লিখিতেছেন:

'একক অর্থনৈতিক সত্তারূপে গড়িয়া উঠিবার পক্ষে ভারতবর্ষ জনসংখ্যা, আয়তন ও বাস্তব সম্পদের দিক দিয়া কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া ব্যতীত অন্য যে কোন দেশ অপেক্ষা অধিকতর সমৃদ্ধ......। 'ভারত খণ্ডিত হইলে পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তবে পাকিস্থানের ক্ষতি হইবে হিন্দুস্থান অপেক্ষা অধিকতর; কারণ কয়লা, লোহা ও লোহঘটিত অন্যান্য মিশ্র ধাতুর দিক দিয়া উভয় অঞ্চলের মধ্যে মুসলিম অঞ্চলই হইবে অধিকতর অভাব-পীড়িত; তাহার ভাবী উন্নতির পক্ষে একান্ত অপরিহার্য শিল্পপ্রসারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খনির দৈন্য তাহার অত্যন্ত অধিক।'২

'মুসলিম অঞ্চলের একটিমাত্র সুবিধা আছে: হাইড্রো-ইলেকট্রিক হিসাব অনুযায়ী পাকিস্থানের অন্তর্গত জলস্রোতের সম্ভাবিত সর্বনিম্ন শক্তি নির্ধারিত হইয়াছে ২৮৭৭ হাজার কিলোওয়াট; তন্মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলে ১৭৯৩ হাজার ও পূর্বাঞ্চলে ১০৮৪ হাজার কিলোওয়াট; অথচ হিন্দুস্থানে তাহার মোট পরিমাণ হইবে ১৩৪৩ হাজার কিলোওয়াট মাত্র।' ৩

---

2. Sir Homi Mody and Dr. Matthai: 'A Memorandum of the Economic and Financial Aspects of Pakistan', pp. 25—26.
3. Ibid., p. 16.

(একত্রিশ)

অরণ্য

অরণ্যও সকল দেশেই অন্যতম সম্পদরূপে পরিগণিত। আরণ্য সম্পদের দিক হইতে ভারতবর্ষ তেমন সমৃদ্ধ নয়, সেইজন্য তাহা হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণও অতিশয় নগণ্য। এই কারণে তাহার বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে না গিয়া, মোটামুটি অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইবে।

পূর্বাঞ্চলে, অর্থাৎ বাংলায় বনবিভাগ দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত। উত্তর ও দক্ষিণ সার্কেল, উত্তর অঞ্চলের সমগ্র অরণ্য-বিভাগ বাংলার অ-মুসলমান এলাকার অধীন এবং দক্ষিণাঞ্চলেরও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এই এলাকার অন্তর্বর্তী ও দুই-তৃতীয়াংশ পড়ে মুসলিম অঞ্চলের মধ্যে। সমগ্র প্রদেশের বন বিভাগ হইতে প্রাপ্ত মোট রাজস্বের পরিমাণ ৬,৫৮,০৩৩ টাকা; বনাঞ্চল দুইটী খণ্ডে বিভক্ত হইলে, অমুসলমান অঞ্চলের প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ হইবে ৪·৫০ লক্ষ টাকা এবং মুসলিম অঞ্চলের অংশে পড়িবে কিঞ্চিদধিক দুই লক্ষ টাকা। ১

পাঞ্জাবে মোট ৫,১৮৪ বর্গমাইল অরণ্যের মধ্যে ৩,৮৭৭ বর্গমাইল পরিমিত স্থান পূর্বাঞ্চলের অন্তর্বর্তী ও ১,৩০৭ বর্গমাইল পড়ে পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমান এলাকার মধ্যে। ১৯৩৭—৩৮ সালে বনবিভাগ হইতে প্রাপ্ত মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২৩,৬০,১৯২ টাকা; মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২২,৮৫,০০৭ টাকা বাদে উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ যাহা দাঁড়াইয়াছিল তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর—৭৫,১৮৫ মাত্র।২

এদিক দিয়া সিন্ধুর অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত। ১৯৩৯—৪০ সালে ইহার ১,১৩৪ বর্গমাইল অরণ্য হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৭,৭৬,৩৪৮ টাকা এবং ৩,৬২,৭৪১ টাকা ব্যয় বাদে উদ্বৃত্ত অর্থ সে পাইয়াছিল ৪,১৩,৬০৬ টাকা। ৩

---

1. Based on the Report of the Forest Dept. of Bengal, 1939-40.
2. Based on the Report of the Forest Dept., Punjab, 1937-8.
3. Based on the Report of the Forest Dept. of Sind, 1939-40.

(বত্রিশ)

শিল্প

এইবার শিল্পের অবস্থা পর্যালোচনা করা যাক:

৩১ নং ছক

শিল্পসমূহ—১৯৩৯

ক: কারখানার সংখ্যা; খ: দৈনিক নিযুক্ত শ্রমিকের গড়পড়তা হার

১। গভর্ণমেন্ট ও লোকাল ফন্ড ফ্যাক্টরি	বাংলা (ক)	(খ)	পাঞ্জাব (ক)	(খ)	সিন্ধু (ক)	(খ)	উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ (ক)	(খ)	বৃটিশ বেলুচিস্থান (ক)	(খ)	বৃটিশ ভারত (ক)	(খ)
শিল্প (পেরেনিয়াল)												
বস্ত্র শিল্প	—	—	১	১০৯	—	—	—	—	—	—	২	২,১৫৭
চোলাই	—	—	—	—	১	৩৪	—	—	—	—	২	১৭৫
দারু-শিল্প	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৩,	৫৪৯
কটন-মিল	১	১৯	১	১৯৫	—	—	—	—	—	—	৫,	১,৭০১
ডক-ইয়ার্ড	৪	২,০৪৮	—	—	—	—	—	—	—	—	৮,	৪,৯৪০
ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং	৯,	১,১১৬	৯	১,০০৯	১,	৪৩,	৫,	১৪৮	১	৪৮	৩৪,	৩,৫৯২
ইঞ্জিনীয়ারিং (জেনারেল)	১০	১,৯১২	৫	৯২০	৩	৫৮১	—	—	১	৪৩	৫২	৭,৭৪৫
ফোরেজ প্রেস	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১	৪০
মিন্ট	১	৯৩৩	—	—	—	—	—	—	১	১০৭৫	২	১,৮০৬
অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী	৩	৯,২৭৫	৬	৬,৫৫৬	১	৫৩৫	৩	২৭০	—	—	২৫	৩০,৭০৯
প্রিন্টিং প্রেস	১১	৩,৫২১	৬	১,৪৪০	১	১৭৫	১	১০৫	—	—	৪৫	১২,৫৫৫
রেলওয়ে ওয়ার্কশপ	১৬	১৫,১৭০	৭	১১,৪০২	৫	১,৭০৬	—	—	—	—	৭৪	৫৫,৭৪৮
স-মিল	১	২৫	১	৮	১	—	—	—	—	—	৬	২৪৫
টেনারি	১	৩২	—	—	—	—	—	—	—	—	১	৩২
টেলিগ্রাফ	১	১,১১৮	—	—	—	—	—	—	—	—	২	১,০০১
ওয়াটার পাম্পিং ষ্টেশন	৫	৭৭০	১	৬৫	২	৬২	১	২২	—	—	২৬	২,১০১

(৩১ নং ছকের জের)

ক : কারখানার সংখ্যা; খ : দৈনিক নিযুক্ত শ্রমিকের গড়পড়তা হার

	বাংলা ক	বাংলা খ	পাঞ্জাব ক	পাঞ্জাব খ	সিন্ধু ক	সিন্ধু খ	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ক	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ খ	বৃটিশ বেলুচিস্থান ক	বৃটিশ বেলুচিস্থান খ	বৃটিশ ভারত ক	বৃটিশ ভারত খ
গভর্ণমেন্ট ও লোকাল ফণ্ড ফ্যাক্টরী (শিল্প পেরেনিয়াল)												
উলেন মিল	১	১৬১	—	—	—	—	—	—	—	—	৩	৬২৬
বিবিধ	৪	৫৬৭	৬	৫২৬	২	৯৭	—	—	৫	৪২৩	৫৪	৪,৯৪২
মোট পেরেনিয়াল শিল্প	৬৮	৩৬,৬৬৯	৪৩	২২,২৭০	১৭	৩,২৬৩	১২	৫৪৫	৮	১,৫৮৯	৩৪৫	১,০১,০৬৬
(সিজনাল)												
ফোরেজ প্রেস	—	—	৪	১০৮	—	—	৬	২২৫	—	—	১৯	১,০৪৮
বিবিধ	—	—	১	২৪	—	—	—	—	—	—	১০	৩৩২
(সিজনাল)	—	—	৫	১৩২	—	—	৬	২২৫	—	—	২৯	১,৩৮০
সর্বমোট— গভর্ণমেন্ট ও লোকাল ফণ্ড ফ্যাক্টরী	৬৮	৩৬,৬৬৯	৪৮	২২,৪০২	১৭	৩,২৬৩	১৮	৭৭০	৮	১,৫৮৯	৩৭৪	১,০২,৪৪৬

৩২ নং ছক

শিল্পসমূহ

ক=কারখানাসমূহের সংখ্যা, খ=নিযুক্ত শ্রমিকের দৈনিক হার

২। অন্যান্য কারখানা-সমূহ	বাংলা		পাঞ্জাব		সিন্ধু		উঃ পঃ সীমান্ত		বৃটিশ বেলুচিস্থান		বৃটিশ ভারত	
	ক	খ	ক	খ	ক	খ	ক	খ	ক	খ	ক	খ
শিল্প (স্থায়ী)												
১। টেক্সটাইল কটন (স্পিনিং), উইভিং ও অন্যান্য	৩৩	৩১,৮৫৯	১৪	৯,২১১	—	—	—	—	—	—	৮০৬	৪,৮৬,৮৫৩
জুট মিল	৯৭	২,৮১,২২৯	—	—	—	—	—	—	—	—	১০৬	২,৯৮,৯৬৭
হোসিয়ারী	৪১	১,৯৪৫	৬২	১,৮৬৩	১	৩০	—	—	—	—	১৫২	৭,৭০৮
রেশম কল	৬	১,৮৮৬	৪	৫৬৩	২	৭০	—	—	—	—	১০৭	৬,২৫১
পশম কল	—	—	৬	২,৬৬১	—	—	—	—	—	—	১৩	৬,৮০৭
বিবিধ	৬	৯৯১	২৫	১,৯০৬	—	—	—	—	—	—	৮৯	১০,৪২১
মোট	১৮৩	৩,১৭,৯১০	১১১	১৬,২০৪	৩	১০০	—	—	—	—	১,০০০	৮,১৭,০৭৭
২। ইঞ্জিনীয়ারিং	২৫৯	৬৫,২৪৭	৫৫	৩,১১৬	২৯	২,২২৮	২	৯৪	৪	২৬৫	১,০০১	১,৪৮,৪২৪
৩। খনিজদ্রব্য ও ধাতু প্রস্তর	—	—	৪৬	১,৫৫৪	২	৬৪	—	—	—	—	১১০	৬,০৬৬
লৌহ ও ইস্পাত গালাই এবং ইস্পাত পেটাই কল	৬	১৬,৯১৪	—	—	—	—	—	—	—	—	১০	৪০,৭২০
সীসা গালাই ও পেটাই কল	১	২৬২	—	—	—		—		—	—	১	২৬২
পেট্রোলিয়াম রিফাইনিং	—	—	২	৮০৩	—		—		—	—	৪	২,৯৮১
বিবিধ	৬	৪৫৭	২৩	১,১০৮	—		—		—	—	৫৩	৫,০২৪
মোট	১৩	১৭,৬০৩	৭১	৩,৪৬৫	২	৬৪	—	—	—	—	১৮৭	৫৫,২২০

(৩২ নং ছকের জের)

অন্যান্য কারখানাসমূহ শিল্প (স্থায়ী)	বাংলা ক	বাংলা খ	পাঞ্জাব ক	পাঞ্জাব খ	সিন্ধু ক	সিন্ধু খ	উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ ক	উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ খ	বৃটিশ বেলুচিস্থান ক	বৃটিশ বেলুচিস্থান খ	বৃটিশ ভারত ক	বৃটিশ ভারত খ
৪। খাদ্য, পানীয় ও তামাক												
ময়দার কল	১১	১,১৮১	১৮	১,১৭৮	১৩	৭৮৯	—	—	—	—	৮০	৫,৭৯৪
চাউলের কল	৪০০	১৮,৭৪২	৪৩	১,০৫৬	—	—	—	—	—	—	১,১৫৮	৪৫,৪০৯
তামাক	৪	১,৩৩৯	১	৫০	১	৭৭	—	—	—	—	১৬৫	১১,৮০১
অন্যান্য ও বিবিধ	২৭	২,৯২৪	২৬	৯৯৫	৯	৩০১	৪	৯৬	—	—	৪৭৭	২৬,৩৬৫
মোট	৪৪২	২৪,১৮৬	৮৮	৩,২৭৯	২৩	১,১৬৭	৪	৯৬	—	—	১,৮৮০	৯৭,৪০৭
৫। রাসায়নিক দ্রব্য ও রং ইত্যাদি	১১৮	১৭,২১২	৩২	১,৫৫৪	৯	১,৬৪২	—	—	—	—	৫৪৮	৫৫,৯৮৫
৬। কাগজ, ছাপাই কাগজ ও পাল্প কল	৪	৬,২৬৮	১	৯৯৫	—	—	—	—	—	—	১৪	১১,৫৫৩
প্রিণ্টিং ও বাঁধাই	৯৬	৬,৫৭৫	৪৪	২,০১৯	১৬	৫০৯	৫	১০৯	—	—	৬৫৫	৩০,৯৪২
বিবিধ	১৭	১,০৯৬	২	৫৬	—	—	—	—	—	—	৪০	১,৮৪২
মোট	১১৭	১৩,৯৩৯	৪৭	৩,০৭০	১৬	৫০৯	৫	১০৯			৭০৯	৪৪,০৭৭

(৩২ নং ছকের জের)

শিল্প (স্থায়ী)	বাংলা		পাঞ্জাব		সিন্ধু		উঃ পঃ সীমান্ত		বৃটিশ বেলুচিস্থান		বৃটিশ ভারত	
	ক	খ	ক	খ	ক	খ	ক	খ	ক	খ	ক	খ
৭। কাষ্ঠ, প্রস্তর ও কাচ সম্বন্ধীয় ধারা—ইট, টাইল, দারু-শিল্প ও ক্যাবিনেট তৈয়ারী	১৫	১,৩৫৭	৭	১,০১৭	৬	৩২৫	—	—	—	—	১৮৬	২০,৫৫০
সিমেণ্ট, চুণ ও মৃৎ-শিল্প	১০	৩,৫১৪	৫	৮০৩	২	৫২৪	—	—	—	—	৪৬	১৩,০৮৮
কাচ	১২	২,২৮০	৩	২০৪	—	—	—	—	—	—	৭৪	৮,৯০৪
স-মিল, পাথর ড্রেসিং ও বিবিধ	১৮	১,১৩৭	৪	১৫১	১	৪১	—	—	২	১০৯	১৫৯	৯,৭১৫
মোট	৫৮	৮,২৮৮	১৯	২,২০৭	৯	৮৯০	—	—	২	১০৯	৪৬৫	৫২,২৯০
৮। চামড়া ও পশু-চর্ম	৫	৪,০১৭	২	১৫৫	১	১৬	—	—	—	—	৬৬	১২,৯০৬
৯। জিন ও প্রেস	৩৩	১৯,১৫৫	—	—	—	—	—	—	১	৬০	১৮৯	২৫,৯৮৭
১০। বিবিধ— দড়ি তৈয়ারী প্রভৃতি	৫৮	৯,৬৬৫	২	১৮৭	৬	২৩২	—	—	—	—	২১৮	১৯,৭১২
মোট (স্থায়ী শিল্প)	১,২৮৬	৪,৯৭,২৫২	৪২৭	৩৩,২৬৭	৯৮	৬,৮৪৮	১১	২৯৯	৭	৪০৪	৬,৫১৮	১০,২৯,২৪৮

(২৩ নং ছকের জের)

শিল্প (মরসুমী)	বাংলা		পাঞ্জাব		সিন্ধু		উঃ পঃ সীমান্ত		বৃটিশ বেলুচিস্থান		বৃটিশ ভারত	
	ক	খ	ক	খ	ক	খ	ক	খ	ক	খ	ক	খ
খাদ্য, পানীয় ও তামাক	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
চাউলের কল	—	—	—	—	১০২	২,০০৭	—	—	—	—	১০২	২,০০৭
চিনি	১৩	৩,৫৫৮	৪	১,৩০৩	১	১৭৭	—	—	—	—	২৫৪	৭৪,৮৭২
চা	২৮৮	১৮,৮২৮	১০	২১৫	—	—	—	—	—	—	১,০৫৫	৬৭,৩০৩
কফি, তামাক, বরফ, সোডা ওয়াটার ও বিবিধ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৯৭	৫,৮৩৬
মোট	৩০১	২২,৩৮৬	১৪	১,৫১৮	১০৩	২,২১৪	—	—	—	—	১,৫০৮	১,৫০,০৪৮
রাসায়নিক দ্রব্য ও রং			—	—			—	—	—	—	২২	১,৯৮৯
তুলা, জিন ও বেইলিং	৮	২,৩৬৩	৩১১	২১,১১৫	১০৩	১২,৫৬৫	৭	১১৯	—	—	১,৮৭৯	১,২০,৮৭৯
পাট চাপাই ও বিবিধ	৬২	১২,৮৬৯	—	—	৩	১০৫	—	—	—	—	৮৫	*১০,৫২৭
মোট মরসুমী	৩৭১	৩৭,৬১৮	৩২৫	২২,৬৩৩	২০৯	১৪,৮৮৪	৭	১১৯			৩,৪৯৪	২,৮৯,৪৪৩
মোট অন্যান্য কারখানা	১,৬৫৭	৫,৩৪,৮৭০	৭৫২	৫৫,৯০০	৩০৭	২১,৭০২	১৮	৪৯৮	৭	৪০৪	১০,০৯২	১৬,১৮,৬৯১
সর্ব মোট	১,৭২৫	৫,৭১,৫০৯	৮০০	৭৮,৩০২	৩২৪	২৪,৯৯৫	৩৬	১,২৬৮	১৫	২,০২৩	১০,৪৬৬	১৭,৫১,১৩৭

৩১ ও ৩২ নম্বর ছকে বাংলা ও পাঞ্জাবের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা কেবল মুসলিম অঞ্চলের নয়, সমগ্র প্রদেশের। এই কারণে প্রদত্ত হিসাব হইতে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে, বিশেষ করিয়া বাংলায় সেরূপ সম্ভাবনা সমধিক এই হেতুতে যে, সে প্রদেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ যে অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা মুসলিম এলাকার বহির্ভূত। পাট অবশ্য উৎপন্ন হয় মুসলিম অঞ্চলেই, কিন্তু পাটকলগুলি কলিকাতা হইতে কয়েক মাইলের মধ্যে হুগলী নদীর কূলে কূলে অবস্থিত। বাংলার ৩০টি তুলার ও কাপড়ের কলের মধ্যে মাত্র ৭টি মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত, অবশিষ্ট আর সবগুলিই মুসলিম এলাকার বহির্ভূত পশ্চিম বাংলায়। এই ৭টী কলের টেকো ও তাঁতের সংখ্যা যথাক্রমে ১,১২,০০০ ও ২,৬০০ এবং অবশিষ্ট কলগুলিতে ১০ লক্ষ টেকো ও ২ লক্ষ তাঁত চলিয়া থাকে। পাটকলগুলিই একক হিসাবে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক নিযুক্ত করিয়া থাকে। লোহা ও ইস্পাতের যাবতীয় কারখানাই পশ্চিম বাংলার অমুসলমান জেলাসমূহে অবস্থিত। গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানই কলিকাতা অথবা তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার অন্তর্ভুক্ত, কেবলমাত্র চাউল ও পাট মোড়ান কলগুলি প্রদেশের সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় তহবিল দ্বারা পরিচালিত কারখানাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে অস্ত্র তৈয়ারীর কারখানা, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, ডকইয়ার্ড ও ছাপাখানা এবং এসবগুলিই কলিকাতা ও সহরতলী অঞ্চলে অবস্থিত। এই হিসাব দৃষ্টে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলার শিল্পসংগঠনের অবস্থা সন্তোষজনক হইলেও, তাহার স্বত্বাধিকার মুসলিম অঞ্চলের তুলনায় অমুসলমান অঞ্চলের অনেক বেশী।

প্রোফেসার কুপল্যাণ্ড সাহেব সংক্ষেপতঃ অবস্থার নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা দিয়াছেন: 'বর্তমানে বাংলার লোকসংখ্যা সমগ্র বৃটিশ ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ এবং কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যার গড়পড়তা হিসাবে বৃটিশ ভারতের শিল্পসমৃদ্ধির শতকরা ৩৩ ভাগ তাহার। কলিকাতা-বিযুক্ত সমগ্র পূর্ব বাংলার শিল্পসম্ভার বৃটিশ ভারতের শিল্পসমৃদ্ধির শতকরা ২·৭ ভাগ মাত্র।'[১]

পাঞ্জাবের অবস্থা একটু স্বতন্ত্র। লাহোর মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্বর্তী, কাজেই তথাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহও সেই এলাকারই সম্পত্তি। কাজেই পাঞ্জাব সম্বন্ধীয় হিসাবকে কিছুটা অতিরঞ্জিতভাবে হইলেও, মুসলিম অঞ্চলের হিসাব বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অতএব বাংলা বাদ দিয়া আমরা যদি পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্থানের হিসাব গণনা করি, তাহা হইলে ভারতের মুসলিম অঞ্চলের শিল্পসংগঠন সম্বন্ধীয় অবস্থার ন্যূনাধিক সঠিক চিত্র পাওয়া যাইতে পারে। পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্থানে গভর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় তহবিল দ্বারা পরিচালিত এবং ব্যক্তিগত অধিকারের অধীন মোট কারখানার সংখ্যা ১,১৭৫ এবং তাহাতে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যা ১,০৬,৫৮৮। বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত কারখানাসমূহের তুলনায় এই অঞ্চলের প্রতিটি কারখানার আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। বৃটিশ ভারতে কারখানার সংখ্যা

1. R. Coupland: The Future of India, p. 96.

১০,৪৬৬ এবং সেগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১৭,৫১,১৩৭। কাজেই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কারখানাসমূহের সংখ্যা বৃটিশ ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির শতকরা ১১·২৩ হইলেও, সেগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যা সমগ্র বৃটিশ ভারতের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যার ৬·১ ভাগ মাত্র, অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রতি কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যা যেখানে ৯০, বৃটিশ ভারতে সেখানে ১৬৭। এই সমস্ত কারখানা ও ওয়ার্কশপসমূহের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় তহবিল পরিচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির অনুপাতই অধিক। তাহারা সংখ্যায় ৯১ এবং সেগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যা ২৮,০২৪ ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয়, কারখানাসমূহের সংখ্যার হার শতকরা ৭·৭ হইলেও, নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যার শতকরা হার ২৬·৩, অর্থাৎ প্রায় সমস্ত বৃহদাযতন কারখানাই গভর্ণমেণ্ট বা স্থানীয তহবিল দ্বারা পরিচালিত। আবাব সেইসব বড় বড় কাবখানাগুলির মধ্যে অধিকাংশই অস্ত্র তৈয়ারীর কারখানা ও রেলওয়ে ওয়ার্কশপ। বে-সরকারী ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কারখানাসমূহের কোনটিই বেলওয়ে ওয়ার্কশপ ও অস্ত্র নির্মাণের কারখানাসমূহের সমসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে না অবশ্য কটন গিনিং ও বেইনিং শিল্প ইহার ব্যতিক্রম কারণ একক শিল্পপ্রতিষ্ঠানরূপে ইহারাই সর্ববৃহৎ।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল শিল্প-সংগঠনের দিক দিয়া বৃটিশ ভারতের মত সমৃদ্ধিসম্পন্ন নয় এবং বড় আকারের শিল্প-প্রতিষ্ঠান সেখানে যতগুলি আছে তাহার সবগুলিই ষ্টেট পরিচালিত।

এই কারণে বাংলার মুসলিম অঞ্চলের বহির্ভূত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যদি গণনা হইতে বাদ দেওয়া হয় তাহা হইলে উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের শিল্প-প্রসারের অবস্থা হয় আরও অসন্তোষজনক। বাংলা পাঞ্জাব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সিন্ধু ও বেলুচিস্থানের লোকসংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৬ ৭ ভাগ অথচ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা শতকরা ১৩ ৯ ও নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ৭ ৩৬ ভাগ মাত্র তন্মধ্যে বড় আকারের কারখানাগুলি হয় অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নয় রেলওয়ে ওয়ার্কশপ।

যে সমস্ত ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধনের বেশীর ভাগ প্রযুক্ত হয় তাহাদের মধ্যে সূতার কল চটকল ও চিনির কল অন্যতম। বেশীর ভাগ তুলা উৎপন্ন হয় পাঞ্জাবে ও সিন্ধুতে এবং অধিকাংশ পাট পূর্ববঙ্গজাত কিন্তু তাহা হইতে সূতা প্রস্তুত হয় ও বোনা হয় উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলমান এলাকার বাহিরে। ১৯৩৯-৪০ সালে কটন মিলের স্বত্বাধিকারী যে সমস্ত জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী ভারতে রেজিষ্টারীকৃত হয় তাহাদের প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ মোট ৩৩·৯৩ কোটি টাকা ঐ সময়ের মধ্যে ভারতের বাহিরে রেজিষ্টারীকৃত ও ভারতে স্থাপিত কলসমূহের মালিক জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীগুলির মূলধন ২৭১,৭৭৮ পাউণ্ড ইহার সহিত যুক্ত হইবে। অনুরূপ উপায়ে পাটকলে প্রযুক্ত ভারতীয় মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ২০ ৪৬ কোটি টাকা ও ৩,২৯৫,৫৮৭ পাউণ্ড। চিনির কলে প্রযুক্ত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ১০ ৯৭ কোটি টাকা ও ৩০৬,৬৫৬ পাউণ্ড। এই সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে মুসলিম অঞ্চলের প্রাপ্য অংশ অতিশয়

অংশ। মাইনিং ও কোয়ারিয়িং শিল্পে প্রযুক্ত ভারতীয় মূলধনের পরিমাণ ১১·২৮ কোটি টাকা ও বিদেশী মূলধনের পরিমাণ ১১১,০৫৬,৪৪৪ পাউণ্ড। এইসব শিল্প-প্রতিষ্ঠানে মুসলিম অঞ্চলের অংশমাত্র নাই, কারণ মুসলিম অঞ্চল কয়লা, লোহ, তাম্র প্রভৃতি ধাতুর খনি-বিরল, কেবলমাত্র পেট্রোলিয়ামের কিছু অংশ তাহার ভাগে পড়ে।

এই হিসাব 'Foreign Affairs' নামক পত্রিকায় অধ্যাপক চার্লস বেহরী কর্তৃক লিখিত উপরি-উদ্ধৃত প্রবন্ধের সত্যতা সপ্রমাণ করে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সমগ্র বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম আসামের তৈলখনি অঞ্চল সমেত সমস্ত আসাম প্রাচ্য মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইবে এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া অধ্যাপক বেহরীর সিদ্ধান্ত গঠিত। কিন্তু উক্ত বিষয়ে লীগের প্রস্তাব হইতে সেরূপ ধারণার কোন পক্ষে কোনরূপ সমর্থন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অন্যদিকে সমগ্র পাঞ্জাবও তিনি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি যদি কয়লা-খনিবহুল ও শিল্পপ্রধান পশ্চিম বাংলা, তৈলখনি অঞ্চল ও সিলেট জেলাসহ সমস্ত আসাম ও পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলস্থ শিল্পপ্রধান জেলাগুলি তাঁহার বিবেচনার বহির্ভূত রাখিতেন, তাহা হইলে মুসলিম অঞ্চলসমূহের স্বার্থে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত করিবার বিরুদ্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত আরও শক্তিশালী হইত।

ডাক্তার এ, এম, লরেঞ্জো 'অ্যাটলাস অব্ ইণ্ডিয়া' নামক ভারত সম্বন্ধীয় অক্সফোর্ড প্রচার-পুস্তিকায় ভারতের শিল্পসংগঠন সংক্রান্ত অবস্থার একটি অতি সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন:

'ভারতে শিল্পপ্রসারের প্রগতি প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুগামী। ভারত-বর্ষের প্রধান প্রধান শিল্পগুলি যেন আপনাদিগকে কতকগুলি স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া লইতে চাহিতেছে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বাংলা ও বিহারের কয়লা ও লৌহখনি অঞ্চলের নিকটবর্তী স্থানসমূহে গড়িয়া উঠিয়াছে; জামসেদপুর, কুল্টি, বার্ণপুর ও মনোহরপুর তাহাদের প্রধান উৎপাদন-কেন্দ্র। তুলা-শিল্প আবহাওয়ার আর্দ্রতাকে আশ্রয় করিয়া বোম্বাইয়ের কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্রসমূহের চারিপাশে গড়িয়া উঠিয়াছে; তাহাদের প্রধান উৎপাদন-কেন্দ্র হইতেছে বোম্বাই, শোলাপুর, হুবলী ও আমেদাবাদ; পাটকলগুলি বাংলায় কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া দণ্ডায়মান; চিনির কলগুলি বিহার ও যুক্তপ্রদেশের রেলওয়ে লাইনের পার্শ্ববর্তী ইক্ষু উৎপাদন ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে বিক্ষিপ্ত; সিমেন্ট শিল্প লাইমষ্টোন, জিপ্সাম ও ক্লে প্রভৃতি কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্রসমূহের নিকটবর্তী দক্ষিণ ও মধ্যভারতের মালভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত; কাগজের কলগুলি প্রধানতঃ বাংলা, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশে কেন্দ্রীভূত; চর্মশিল্পের জন্মস্থান যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজ; কাঁচ-শিল্প প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে উত্তর-ভারতের সমতল ভূমিতে।'২

অবস্থা আরও একটু পরিষ্কার করিবার জন্য বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, এই বিবরণীতে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলস্থ কোন জেলার নাম একবারও উচ্চারিত হয়

2. A. M, Lorenzo: 'Atlas of India,' Sec. 8.

নাই এবং বাংলা সম্বন্ধে যেখানে যেখানে উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলি সমস্তই মুসলিম অঞ্চলের বহির্ভূত শিল্পপ্রধান স্থান।

একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বর্তমান অবস্থা উৎকটতর হইবার ভাবী সম্ভাবনা বিদ্যমান। যে প্রাকৃতিক পরিবেশকে আশ্রয় করিয়া যে যে বিশেষ শিল্প বিশিষ্ট কতকগুলি স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা একদিকে যেমন অপরিবর্তনীয়, অপরদিকে তেমনি রাজনৈতিক সীমারেখার কোনরূপ নির্ধারণ বা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-গঠনের কোনরূপ ধারাই খনিজ ও অন্যান্যবিধ সম্পদ বণ্টনের বর্তমান ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারিবে না।

পরের পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ৩৩ নম্বর ছকে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহের সহিত ভারতের অবশিষ্ট অংশের ১৯৩৯-৪০ সালের হিসাব (হাজার মনে) দেওয়া হইল; রপ্তানি অপেক্ষা আমদানীর আধিক্য বিয়োগ (–) চিহ্ন দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে।

উভয় অঞ্চলেই কয়লা, কোক, তুলাজাত দ্রব্য, লোহা, ইস্পাত ও চিনির আমদানী অত্যধিক এবং পূর্বাঞ্চলে লবণ, চাউল ও গম ব্যতীত সকল রকম শস্যের রপ্তানীর আধিক্য লক্ষিত হয়। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কাঁচা তুলা, গম ও তৈল-বীজের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ অধিক। এই হিসাব সমগ্ররূপে প্রদেশ সম্বন্ধে অমুসলমান-প্রধান জেলাগুলি বাদ দেওয়া হইলে কয়লা, কোক, লোহা ও ইস্পাত সম্বন্ধে পূর্বাঞ্চলের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে, কারণ পূর্ব ও উত্তর বাংলার মুসলমানপ্রধান জেলাগুলি এই সমস্ত জিনিস আদৌ চালান দিতে পারিবে না এবং পশ্চিম বাংলার অমুসলমানপ্রধান জেলাগুলিতে তাহাদের আমদানী অসম্ভব হইবে; ফলে মুসলিম অঞ্চলে আমদানীর উদ্বৃত্ত ভাগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইবে। একই কারণে মুসলিম পূর্বাঞ্চলে পাটের অবস্থা হইবে উন্নততর। এই অঞ্চলে পাটের আমদানীর যে আধিক্য পরিলক্ষিত হয়, বিদেশে চালান দিবার উদ্দেশ্যেই তাহা আমদানী করা হইয়া থাকে। ইহার কারণ কয়লা, কোক, লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন একদিকে যেমন পশ্চিম বাংলার কেবলমাত্র অমুসলমানপ্রধান জেলাগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অপরদিকে পাট উৎপন্ন হয় তেমনি প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গের মুসলমান-প্রধান জেলাগুলিতেই। গম যদিও পাঞ্জাবের অন্যতম রপ্তানীযোগ্য শস্য, তথাপি অমুসলমান ভারতকে তাহার জন্য পাঞ্জাবের উপর ততখানি নির্ভর করিতে হইবে না, কয়লা, লৌহ ও ইস্পাতের জন্য মুসলিম ভারত অমুসলমানপ্রধান ভারতের উপর যে পরিমাণে নির্ভরশীল; কারণ অমুসলমান ভারত বর্তমানে তাহার নিজের প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণ গম উৎপাদন করিতে সক্ষম। তাহা ছাড়া পাঞ্জাবের গমকে অষ্ট্রেলিয়ার গমের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে; অষ্ট্রেলিয়ার গম ১৯৩৫-৩৬ সালে ভারতে আমদানী হইয়াছিল ১৩,০০০ টন, ১৯৩৮—৩৯ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইল ১৫০,০০০ টন।

যে অঞ্চলকে ভারতের অবশিষ্ট অংশ হইতে পৃথক করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে—তাহার অধিবাসিগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এইসব সমস্যার সমাধানের উপর নির্ভর করে; তাই মিঃ এম, এ, জিন্না হার্বার্ট এল, ম্যাথুসের সহিত সাক্ষাৎকালে

বলেনঃ 'আফগানিস্থান দরিদ্র দেশ সত্য, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহার দিন কোনরূপে চলিয়া যাইতেছে; ইরাকের অবস্থাও তাহাই, অথচ তাহার লোকসংখ্যা আমাদের ৭ কোটী বিপুল জনসংখ্যার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। আমরা যদি স্বাধীন জাতিরূপে দরিদ্রভাবে অথচ বুদ্ধিমানের মত জীবনযাপন করিতে চাই, তাহাতে হিন্দুদের আপত্তি করিবার হেতু কি?......অর্থনীতি নিজের কথা নিজেই ভাবিবে।' ১৯৪২ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় এই সাক্ষাতের বিবরণ প্রকাশিত হয়। ইহা বিতর্কের যোগ্য বিষয় হইতে পারে, কিন্তু বহু শতাব্দীব্যাপী সর্যত্ন আয়াসের ফলে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সমূলে উৎখাত ও উৎপাটিত করিয়া ৭ কোটী মুসলমানের ভাগ্যের সহিত জড়িত সমস্যার সমাধানের পক্ষে সুষ্ঠু পন্থা ইহা নয়।

(তেত্রিশ)

রাজস্ব ও ব্যয়ভার

রাজস্ব ও ব্যয়-বরাদ্দের দিক দিয়া মুসলিম অঞ্চলদ্বয়ের অবস্থা সম্বন্ধে অতঃপর আলোচনা করিয়া দেখা দরকার। লীগ-প্রস্তাব দ্বারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে এমন দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে, দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, যানবাহন, শুল্ক, কারেন্সী, এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি বিভাগ শেষ পর্যন্ত যাহাদের আয়ত্তে আসিবে। লীগ-প্রস্তাবে ও ১৯৪১ সালে লীগের মাদ্রাজ অধিবেশনে মিঃ জিন্নার সভাপতির অভিভাষণে 'রাষ্ট্র' শব্দটী বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে; তাহা হইতে মনে হয়, রাষ্ট্র দুইটি যে কেবলমাত্র ভারতের অবশিষ্ট অংশ হইতেই স্বাধীন হইবে তাহা নয়, তাহারা পরস্পর নিরপেক্ষও হইবে। এতদ্ব্যতীত যে সকল ইউনিট লইয়া রাষ্ট্র দুইটি গঠিত হইবে তাহাদের সার্বভৌমত্ব ও স্বায়ত্ত-শাসনশীলতাও পরিকল্পিত হইয়াছে। কিন্তু স্বায়ত্তশাসনশীল ও সার্বভৌম ইউনিট-সমূহের সহযোগে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে কিনা সে কথা বেশ স্পষ্ট নয়। 'যুক্তরাষ্ট্র' শব্দটীর অব্যবহার ও 'সার্বভৌম' শব্দটীর ব্যবহারের দরুণ বরঞ্চ বিপরীত ধারণাই সৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ধরিয়া লওয়া যাক, উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র গঠনই পরিকল্পিত হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে প্রতিটি যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাধীন ও সার্বভৌম মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্রের উপযোগী সকল প্রকার শাসনবিভাগের ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া প্রতিটী ইউনিটকেও আপন আপন শাসনতন্ত্র সচল ও সক্রিয় রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর গঠন অনুযায়ী প্রতিটী যুক্তরাষ্ট্রের

পৃথক বাজেট রচনা করিতে হইবে; একটী হইবে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় বাজেট এবং অপরটি হইবে প্রত্যেকটী ইউনিটের বা প্রাদেশিক বাজেট। আমরা জানি, প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের ভূমিরাজস্ব, আবগারী বিভাগ প্রভৃতি আয়ের বিভিন্ন পথ আছে এবং সেই আয় হইতে তাহাদিগকে আপন আপন শাসনযন্ত্র এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি সমাজহিতকর ও জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনের ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টেরও রাজস্ব ও শুল্ক প্রভৃতি বিভাগ হইতে আয়ের আগম হয় এবং তাহার দ্বারা তাহার নিজস্ব শাসনযন্ত্র সচল রাখিবার এবং দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পরিচালন করিবার ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। আমরা ইহাও অনুমান করিয়া লইতে পারি যে, যুক্তরাষ্ট্রের ও ইউনিটসমূহের শাসনযন্ত্রের স্বরূপ হইবে অনেকাংশে বৃটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের অনুরূপ। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে তাহাদের আয়ের পথ ও ব্যয়ের ব্যবস্থাও যে অনেকাংশে অনুরূপ হইবে তাহাও আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি; সুতরাং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় ইউনিট-সমূহের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় স্বতন্ত্র অঞ্চলদ্বয়ের অংশমত প্রাপ্য ও দেয় রাজস্ব এবং বরাদ্দ হিসাব করিয়া তাহাদের আর্থিক সঙ্গতি ও ব্যয়ের সামর্থ্য সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা আমরা গঠন করিয়া লইতে পারি। এ সম্পর্কে দুইটী অসুবিধার কথা আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য। সমগ্র প্রদেশের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা সহজ। কিন্তু প্রত্যেক জেলার আয়-ব্যয়ের পরিমাণ নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। সমগ্র প্রদেশ যদি মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া, কয়েকটী জেলা মাত্র হয় এবং অপর কয়েকটী জেলা তাহার এলাকার বহির্ভূত থাকে, তাহা হইলে প্রদেশের যে অংশটুকু মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্বর্তী, কেবলমাত্র সেই অংশটুকুর আয়-ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা অসম্ভব না হইলেও, কষ্টসাধ্য হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত হইলেও, স্বতন্ত্র অঞ্চলসমূহের মধ্যে তাহাদের প্রাপ্য অংশ বণ্টন করা প্রাদেশিক বণ্টন ব্যবস্থা অপেক্ষাও দুরূহতর হইবে। ইহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, যুক্তরাষ্ট্রের ও ইউনিটসমূহের আর্থিক সঙ্গতি সম্বন্ধে যে কোন আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত হইবে সাময়িক বা সর্তমূলক। যুদ্ধের ফলে যে অবস্থার ও যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহার দরুণ বাজেট সম্বন্ধীয় অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া হিসাব-গণনার পথে অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক। এই সব অবস্থার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া বর্তমান আয়-ব্যয়ের অঙ্কের উপর নির্ভর করিয়া হিসাব-নিকাশের জন্য সচেষ্ট হইলে হয়তো কিছুটা সুবিধা হইতে পারে। সেই জন্য প্রাদেশিক বাজেট এবং উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব মুসলিম অঞ্চলের যুক্তরাষ্ট্রীয় বাজেট পৃথক পৃথকভাবে আলোচিত হইবে।

প্রথমেই প্রাদেশিক বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। ১৯৩৮-৩৯ ও ১৯৩৯-৪০ সালকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পূর্ববর্তী যুগের সর্বশেষ স্বাভাবিক সময় রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, কাজেই উক্ত সময়ের আয়-ব্যয়ের অঙ্ক অনেকখানি নির্ভরযোগ্য।

৩৫ নং ছক (ক)

প্রাদেশিক ব্যয় বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

দফা	বাংলা		আসাম		পাঞ্জাব		উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ		সিন্ধু	
	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৯-৪০	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৯-৪০	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৯-৪০	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৯-৪০	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৯-৪০
রাজস্বের উপর প্রত্যক্ষ দাবী	৯৭·৬৪	১০৪·৬৩	৩৫·৯২	৪৮·৫৮	৮৬·৪৬	৮৫·০৬	৮·৫৩	৮·৫১	২৬·০০	২৮·২৬
সেচ বিভাগ	৩৮·৯২	৩৮·৯৭	৬৯	৫৯	১৪৯·৮২	১৫৮·২৬	৪·৭৭	৪·৫৮	১২৭·৯৮	১৭০·৬৭
ডেট্ সার্ভিসেস	১৫·৭৩	১৭·১৫	৩৩·৯০	৪·১২	—২১·০২	—১৭·৪৬	২·৪০	১·৮২	১·৬৭	৫·১৭
সিভিল শাসন বিভাগঃ (ক) সাধারণ	৫১৯·৭১	৫৩৪·৭১	৭৯·৮৬	৮২·১১	৩২৯·৫৮	৩২৮·৭৪	৭২·১২	৭৮·১৬	৮০·০০	৮৫·০০
(খ) সোস্যাল সার্ভিসেস	৩৩৮·০৯	৩২৪·৮৮	৭১·৪১	৭৩·৮৬	৩২৩·৮৪	৩২৫·৮৮	৩৬·৬৮	৩৮·২৫	৫২·৫২	৫৫·৮৫
সিভিল ওয়ার্কস	১২৮·৬৯	১৪২·০২	৪৩·৮৩	৪৭·৮৪	১৪০·০৭	৯২·০৪	৩৯·৫৪	৩৭·৫১	২০·৯৯	৩৩·০৪
বিবিধ	১৫৪·৬৪	১৯৪·৭৭	৩৩·৮৭	৩৫·২৩	১৫২·২৩	১৯৫·৪৭	১২·৬৩	১৫·২৯	২৮·৬২	২৭·৬০
রেভিনিউ একাউণ্টের অন্তর্গত বিভিন্ন ক্যাপিটাল একাউন্ট	১৩·২০	১৩·৮২	—	—	—	—	১·৬৩	৭৪	১·১১	২·১১
বৈদ্যুতিক পরিকল্পনা মূলধনের সুদ	—	—	—	—	—	২৭·০২	—	২·০৯	—	—
বিশেষ দফা	—	২·৯৭	—	—	—	—	—	—	—	—
মোট	১২৭৬·৬২	১৩৭১·২৪	২৯৯·৪৮	২৯২·০০	১১৬১·২৮	১১৯৫·৬১	১৭৮·০০	১৮৬·১৫	৩৪৫·৮৩	৪০৫·০৮

৩৫ নং ছক (খ)

সোশ্যাল সার্ভিসেস—ব্যয়ের বিস্তৃত বিবরণ (লক্ষ টাকায়)

দফা	বাংলা		আসাম		পাঞ্জাব		উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ		সিন্ধু	
	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৯-৪০	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৯-৪০	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৯-৪০	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৯-৪০	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৯-৪০
বিজ্ঞান বিভাগ	২৯	৩০	৪	৫	৩৬	২৯	৫	৫	—	—
শিক্ষা বিভাগ	১৫৫.১৮	১৬২.৬০	৩৬.০৫	৩৮.৬৭	১৬১.৩৫	১৬০.৫১	২২.২৫	২০.০৮	৩৩.৬১	৩১.০৭
চিকিৎসা বিভাগ	৫৫.৯৬	৫৬.৩৩	১৪.৫৪	১৪.৪০	৫২.৫৮	৫০.৬০	৬.৭৫	৭.৭৬	৭.৮৮	৮.৫৪
জনস্বাস্থ্য বিভাগ	৪০.৬০	৩৯.৩৯	৮.৮৬	৮.২১	২০.৩৭	১৮.০১	১.৭৭	১.৫৯	২.৫৭	২.৬৬
কৃষিবিভাগ	১৪.০৩	২১.৬৪	৫.৭৮	৬.৩০	৩৫.৫০	৩৬.৬২	২.০৭	২.৪১	৭.৭২	১.০৭
পশুচিকিৎসা বিভাগ	৫.০০	৫.৮০	১.৫৮	১.৬৩	১৭.৬০	১৮.৪৯	১.৬০	১.৫০	১.১১	১.২০
সমবায়	১০.৭৮	১৪.৪৯	৯৬	৯২	১৪.৯২	১৭.৮১	১.২১	১.২১	১.২৮	১.২০
শিল্প	১৮.০২	২০.২২	২১৭৩	২.৭৮	১৯.০৬	১৮.৮০	৬২	২৫	৮৫	১১
বিমান বিভাগ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
বেতার বিভাগ	—	—	—	—	—	—	—	৪	—	—
বিবিধ	৫.০০	৪.০৮	৮৭	৯০	১.৮০	১.৭৫	৬	৩	৪২	৩৩
মোট	৩০৮.০৯	৩২৪.৮৮	৭১[illegible]	৭৩.৮৬	৩২৩.৮৪	৩২৫.৮৮	৩৬.৬৮	৩৮.২৫	৫২.০৫	৫৬.৮৬

৩৪ ও ৩৫ নম্বর ছকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক প্রদেশের আয় ও ব্যয়ের অঙ্ক সম-পরিমাণ এবং প্রদেশগুলির নিজস্ব [illegible] যুদ্ধের পরেও যদি এই আয় রক্ষা করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে [illegible] সমতা রক্ষিত রহিয়া যাইবে। এক্ষেত্রে ইহাও লক্ষণীয় যে, আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যদি যথাক্রমে ৩০ লক্ষ, ১ কোটি এবং ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী পায়, তবেই তাহারা আপন আপন আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। তাহাদের প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে এই ব্যয়-ভার বহন করা অসম্ভব; কাজেই এই মঞ্জুরী যদি তাহারা প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে প্রচুর পরিমাণ টাকা ঘাটতি পড়িবে।

৩৬ নং ছক

রাজস্ব বণ্টন সম্বন্ধীয় ভারত গভর্ণমেণ্টের সংশোধিত আদেশ দ্বারা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রদেশসমূহকে প্রদত্ত মঞ্জুরী (লক্ষ টাকায়)

প্রাপ্ত প্রদেশ	আয়-কর		পাট-কর		মঞ্জুরী	
	১৯৩৮—৩৯ হিসাব	১৯৪৫—৪৬ বাজেট	১৯৩৮—৩৯ হিসাব	১৯৪৫—৪৬ বাজেট	১৯৩৮—৩৯ হিসাব	১৯৪৫—৪৬ বাজেট
বাংলা	৩০·০০	৪৬৫·৮০	২২১·২৭	১২১·২২	...	...
বোম্বাই	৩০·০০	৪৬৫·৮০	...	...	...	...
মাদ্রাজ	২২·৫০	৩৪৯·৩৫	...	...	...	...
যুক্তপ্রদেশ	২২·৫০	৩৪৯·৩৫	...	...	২৫·০০	...
পাঞ্জাব	১২·০০	১৮[illegible]	...	...	...	...
মধ্য প্রদেশ	৭·৫০	১১৬·৪৫	...	...	...	...
বিহার	১৫·০০	২০২·৯০	১৭·১২	৭·৮০	...	...
আসাম	৩·০০	৪৬·৫৮	১১·৬৯	১০·০৮	৩০·০০	৩০·০০
উড়িষ্যা	৩·০০	৪৬·৫৮	০·৯২	০·৯০	৪৩·০০	৪০·০০
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	১·৫০	২৩·২৯	...	...	১০০·০০	১০০·০০
সিন্ধু	৩·০০	৪৬·৫৮	...	...	১০৫·০০	...

আসামকে 'সোস্যাল সার্ভিস' খাতে ১৯৩৮-৩৯ ও ১৯৩৯-৪০ সালে যথাক্রমে ৭১·৪১ ও ৭৩·৮৬ লক্ষ টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল; ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, এই মঞ্জুরী প্রাপ্ত না হইলে আসাম প্রদেশ উক্ত দফার দরুণ অর্ধেক পরিমাণ ব্যয়ও সে আপন তহবিল হইতে নির্বাহ করিতে পারিত না। এই মঞ্জুরী ব্যতিরেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইত। সে তাহার শাসনকার্য চালনার ব্যয়ভার বহন করিতেই অক্ষম এবং এই মঞ্জুরী না পাইলে উক্ত দুই বৎসরে কেবলমাত্র শাসনকার্য পরিচালনের দরুণই যথাক্রমে ২২·২৫ ও ২৮·৫০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িত। 'সোস্যাল সার্ভিস' ও 'সিভিল ওয়ার্কস' বাবদ বরাদ্দ ব্যয়ের পরিমাণ একেবারে ছাঁটিয়া ফেলিয়া বিভাগ দুইটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিতে হইত।, সিন্ধুতেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সম-পরিমাণ না হইলেও শাসনবিভাগের জন্য বরাদ্দ টাকা বহু পরিমাণে ঘাটতি পড়িত এবং কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে সাহায্য না পাইলে 'সোস্যাল সার্ভিস' ও 'সিভিল ওয়ার্কস' বিভাগ এক্ষেত্রেও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িত, সন্দেহ নাই। বেলুচিস্থান কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের স্কন্ধে দায় স্বরূপ চাপিয়া আছে। ১৯৩২-৩৩ সালে ইহার আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২০·৫৪ লক্ষ টাকা এবং বরাদ্দ ব্যয়ের পরিমাণ ৯১·৫৬ লক্ষ টাকা; কাজেই কিঞ্চিদধিক ৭১ লক্ষ টাকার ঘাটতি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকেই পূরণ করিতে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যদি আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্থান ভারতের অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে ১৯৩৮-৩৯ ও ১৯৩৯-৪০ সালের মান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টর তহবিল হইতে পূর্ব মুসলিম অঞ্চলকে ৩০ লক্ষ টাকা ও উত্তর-পশ্চিম মুসলিম অঞ্চলকে ২·৭৬ কোটি টাকা মঞ্জুরী দিতে হইবে।

নিম্নে প্রদত্ত ছক হইতে দেখা যাইবে, তৎকালীন বরাদ্দ ব্যয়ের মান এত নিম্ন ছিল যে, তদনুযায়ী সোস্যাল সার্ভিস কার্য পরিচালনা করা বর্তমানে একেবারে অসম্ভব:

৩৭ নং ছক

সোস্যাল সার্ভিসেস খাতে ব্যয়

প্রদেশ	সোস্যাল সার্ভিস খাতে ১৯৩৮-৩৯ ও ১৯৩৯-৪০ সালের গড় ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মাথাপিছু ব্যয়ের গড়পড়তা হার টাকা	আনা	পাই
বাংলা	৩১৬·৪৮	০	৮	৫
আসাম	৭২·৬৩	০	১১	৩
পাঞ্জাব	৩২৪·৮৬	১	২	৩
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩৭·৪৬	১	৩	৮
সিন্ধু	৫৪·১৮	১	৩	১

এই সমস্ত খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করিতে গেলে হয় প্রদেশের অভ্যন্তরে নূতন কর ধার্য করিতে হইবে, নয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে মঞ্জুরী বাবদ অধিকতর পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। শাসনবিভাগের কোন দফায় ব্যয়-সঙ্কোচ করার কথা চিন্তা করাও অসম্ভব। সাময়িকভাবে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ছাড়া এই সমস্ত প্রদেশের কোনটির বিচারেই তাহার বরাদ্দ ব্যয়ের পরিমাণ এমন অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয় নাই যে, তাহার সঙ্কোচ সাধনে প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে। সাধারণতঃ অভিযোগ উত্থাপিত হইয়া থাকে যে, ভারতবাসীগণের জাতীয় আয়ের তুলনায় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণের বেতনের হার অত্যধিক; শাসনবিভাগীয় ব্যয়-বরাদ্দ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে না হইলেও, এই অভিযোগের সত্যতা সপ্রমাণ করিবার জন্যই কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট মন্ত্রীদের বেতনের হার নিম্নতর মানে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও তাহার মন্ত্রীবর্গ এ অভিযোগ স্বীকার করেন না, কাজেই এই দফায় ব্যয়-সঙ্কোচের সদিচ্ছা তাঁহাদের পক্ষ হইতে কোনদিন প্রকাশিতও হয় নাই। শাসন-বিভাগীয় শীর্ষস্থানীয় কর্মচারিগণের বেতন সম্বন্ধে ব্যয়-সঙ্কোচ যদি সাধিত না হয়, তাহা হইলে নিম্নপদস্থ কর্মচারিগণের বেতনের উপর দিয়া তাহার পরীক্ষা প্রয়োগ করা অন্যায় না হইলেও, অর্থহীন হইবে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অযৌক্তিক হইবে না যে, শাসন-বিভাগীয় কোন দফার ব্যয় বিশেষ পরিমাণে সংকুচিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই সোস্যাল সার্ভিস খাতে ব্যয়ের পরিমাণ কিছুমাত্র বৃদ্ধি করিতে গেলে হয় প্রদেশের অভ্যন্তরে নূতন কর ধার্য করা, নয় যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে অধিকতর মঞ্জুরী প্রার্থনা করা ছাড়া গত্যন্তর রহিবে না।

প্রাদেশিক বাজেট সম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। উপরে প্রদত্ত ছকে ও আলোচনায় বাংলা, আসাম ও পাঞ্জাবকে প্রদেশ হিসাবে সমগ্ররূপেই মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্বর্তী বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। অন্য কোন একটি পরিচ্ছেদে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই প্রদেশগুলির অংশবিশেষ মাত্র মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইবে। সেক্ষেত্রে প্রদেশের আয় ও ব্যয় উভয়ই কিছুটা পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে, যদিও তাহার সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা অসম্ভব না হইলেও দুষ্কর। পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি জেলার হিসাবের অঙ্ক দুষ্প্রাপ্য এবং তাহা সংগ্রহ করাও দুরূহ ও দীর্ঘকালস্থায়ী অনুসন্ধানসাপেক্ষ। সত্বর ও সহজ উপায়ে তাহা করিতে হইলে প্রদেশের আয় ও ব্যয়ের অঙ্ক মুসলমান ও অ-মুসলমানপ্রধান জেলাগুলির মধ্যে তাহাদের লোকসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। ইহার দ্বারা রাজস্ব সম্বন্ধে কতকটা পরিমাণে সঠিক ধারণা লাভ করা হয়তো সম্ভবপর, কিন্তু ব্যয় সম্বন্ধে ইহার প্রদত্ত হিসাব হইবে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। প্রদেশ অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় ইউনিট যদি স্বায়ত্তশাসনশীল ও সার্বভৌম হয়, তাহা হইলে আয়তনে সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, শাসন-বিভাগীয় সপারিষদ সর্বোচ্চ কর্মচারীসহ শাসনযন্ত্রের সমস্ত বিভাগের ব্যয়ভার তাহাকে বহন করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, বাংলাকে যদি মুসলমান ও অ-মুসলমান অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়, তাহা হইলে তথায় শাসন-বিভাগীয় সপারিষদ সর্বোচ্চ কর্মকর্তা

একজন না হইয়া দুইজন হইবেন। প্রাদেশিক সেক্রেটারী প্রভৃতি একজনের পরিবর্তে দুইজন নিযুক্ত করিতে হইবে। বাংলা মুসলমান ও অ-মুসলমান অঞ্চলে খণ্ডিত হইলে জেলার শাসনকার্য পরিচালনের ব্যয় পূর্ববৎই রহিয়া যাইবে, কিন্তু স্ব স্ব সেক্রেটারিগণসহ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদ্বয়ের পোষণের খরচ প্রায় দ্বিগুণ বর্ধিত হইবে। ব্যয়ের পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণ করা দুরূহ হইলেও, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বর্তমান ব্যয়ের অঙ্ক লোকসংখ্যার অনুপাতে জেলাগুলির মধ্যে বণ্টিত হইলে, মুসলমানপ্রধান জেলাগুলির ভাগে তাহার যে অংশ পড়িবে, সমগ্র প্রদেশের শাসনকার্য পরিচালনের ব্যয়ভার তাহার সমষ্টি হইতে পড়িবে অনেক অধিক। কাজেই লোকসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী বর্তমান ব্যয়ভার বণ্টিত হইলে যে অঙ্ক দাঁড়াইবে, বাংলা ও পাঞ্জাবের উচ্চতম কর্মকর্তাদ্বয় ও তাঁহাদের সেক্রেটারিগণসহ সমগ্র শাসনবিভাগ পরিপোষণের ব্যয় তাহা হইতে বহু অধিক পরিমাণে বর্ধিত করিবার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার। আসামের বেলায় সে অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না, কারণ সিলেটই হইতেছে তাহার একটিমাত্র জেলা—যাহা মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং সে জেলাটি বাংলার সহিত যুক্ত হইয়া যাওয়ার ফলে তাহাকে স্বতন্ত্র প্রাদেশিক শাসনবিভাগীয় কাঠামো গঠন ও তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না। অর্থাৎ ৩৪ ও ৩৫ নম্বর ছকে বাংলা ও পাঞ্জাবের বাজেটে আয়-ব্যয়ের যে সমতা দর্শিত হইয়াছে, অ-মুসলমানপ্রধান জেলাগুলি তাহাদের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, সে ভারসাম্য আর রক্ষিত হইবে না। ঘাটতির সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা শক্ত হইলেও, তাহা যে নিতান্ত অল্প হইবে না—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অন্যান্য প্রদেশের অঙ্গ হইতে কর্তন করিয়া যে প্রদেশগুলি গঠিত হইয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা এ কথার সত্যতা সপ্রমাণ হয়। সিন্ধু ও উড়িষ্যা তাহার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্তস্থল। বিচ্ছিন্ন হইবার পর হইতে তাহাদের প্রত্যেকেই আপন আপন বাজেটের সমতা রক্ষায় সক্ষম হইতেছে না, তাহার ফলে ভারত গভর্ণমেণ্টকে তাহাদের অনুকূলে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে অর্থ-সাহায্য মঞ্জুর করিতে হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি, সিন্ধু প্রতি বৎসর ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী পাইয়া থাকে এবং উড়িষ্যা ১৯৩৮-৩৯ ও ১৯৩৯-৪০ সালে প্রতি বৎসর পাইয়াছিল ৪৩ লক্ষ করিয়া টাকা। প্রাদেশিক আয়-ব্যয়ের এই দিকটা এত স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন এই কারণে যে, অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড পাকিস্থানের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার অনাথা সতর্ক সমালোচনায় বলিয়াছেন, 'প্রাদেশিক আয়-ব্যয়ের সঙ্গতি অনেকটা অবিভক্ত ভারতের অবস্থার মতই রহিয়া যাইবে।'২ এইজন্যই তিনি ইহার বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর হইবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। স্যার হোমি মোদী ও ডাক্তার মাথাইও সপ্রু কমিটির নিকট তাঁহাদের স্মারকলিপি প্রেরণ করিবার সময় এই কথাটি উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

বাংলা, আসাম ও পাঞ্জাবের মুসলমানপ্রধান জেলাগুলির লোকসংখ্যার অনুপাতে তাহাদের পৃথক পৃথক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করিবার কোন

---

2. R. Coupland: 'The Future of India,' p. 91.

প্রয়োজনীয়তা নাই। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উক্ত প্রদেশত্রয়ের মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির মোট লোকসংখ্যার অনুপাতে মুসলমান জনসংখ্যার হার হইবে নিম্নলিখিতরূপঃ বাংলা ৬৭·৯, আসাম ৩০·৫ ও পাঞ্জাব ৫৯·৪।

এখন দেখিতে হইবে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের রাজস্বের কত অংশ ও কি পরিমাণ মঞ্জুরী উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব মুসলিম যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্য হইতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এ সম্বন্ধে সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করার পথে যে বাধা দণ্ডায়মান তাহা. অল্প-বিস্তর অনতিক্রম্য। প্রোফেসর কুপল্যাণ্ড তাঁহার 'Future of India' নামক গ্রন্থে এবং স্যার হোমী মোদী ও ডাক্তার মাথাই অতি সূক্ষ্ম ও জটিল হিসাব-নিকাশের পর যে সংখ্যাগুলি কষিয়া বাহির করিয়াছেন, আমি আমার বর্তমান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেগুলি এই স্থানে ব্যবহার করিব। প্রোফেসার কুপল্যাণ্ড হিসাব দিয়াছেন ১৯৩৮-৩৯ সালের এবং স্যার হোমি মোদী ও ডাক্তার মাথাই কিঞ্চিৎ রদ-বদলসহকারে অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড অবলম্বিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া যে হিসাব কষিয়া বাহির করিয়াছেন, তাহা ১৯৩৯-৪০ সালের। কাজেই প্রদেশগুলির মত এক্ষেত্রেও উল্লিখিত দুই বৎসরের যে হিসাব পাওয়া যাইবে, তাহা নিম্নে ৩৮ ও ৩৯ নম্বর ছকে প্রদত্ত হইল।

এস্থলে প্রদত্ত হিসাব ১৯৩৮-৩৯ ও ১৯৩৯-৪০ সালের। পরে ৪০ নম্বর ছকে এ সম্বন্ধে যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা আরও আধুনিক, কারণ ব্যাখ্যা-মূলক স্মারকপত্র সহ ভারত গভর্ণমেণ্টের ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেট হইতে তাহা গৃহীত। প্রাদেশিক হিসাব প্রত্যেক প্রদেশের পৃথক পৃথক দেওয়া হয় নাই, সমগ্রভাবে দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের ফলে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর অবস্থা সাময়িকভাবে কিছুটা উন্নত হইলেও, সাধারণভাবে অবস্থা মোটামুটি অপরিবর্তিতই আছে। কিন্তু বাঙলার ঘাটতি বাড়িয়াছে অত্যধিক পরিমাণে। সিন্ধু তাহার দেয় ঋণ পরিশোধ করিয়াছে। কাজেই তাহার মঞ্জুরীর আর আবশ্যকতা না থাকায়, ১৯৪৩-৪৪ সাল হইতে বন্ধ করা হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের মঞ্জুরী সম্বন্ধীয় অবস্থা অপরিবর্তিত। (পশ্চাতে ৩৭ নম্বর ছক দ্রষ্টব্য)

৩৮ নং ছক

রাজস্ব (লক্ষ টাকায়)

দফা	কেন্দ্রীয় ১৯৩৮—১৯৩৯ *	উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ১৯৩৮—৩৯ **	উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ১৯৩৯—১৯৪০ **	পূর্ব অঞ্চল ১৯৩৯—৪০ **
শুল্ক	৪০৫০·৫৩	৪৪৮·০৬	৫৮২·৯	১২০৬·৩
আবগারি	৮৬৫·৭৩	১০০·৯২	৭৮·৩	১২১·১
করপোরেশনের কর	২০৩·৭২	১৫·২৮	১৭·১	৭৩·৫
অন্যান্য আয়-কর	১৩৭৪·৪৪	১২১·১০	১৫০·৪	২৯৭·৫
লবণ	৮১২·০৪	৭৬·৬৫	১১৯·১	২০৭·৬
আফিং	৫০·৮৯	—	—	—
রেলওয়ে	১৩৭·৩২	১৫০·০০	—১১১·৮	—১৪০·৮
পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ, কারেন্সী ও টাকশাল	৪১·৪০	৫·১৭	২১·৩	৩৬·০
অন্যান্য দফায়	১০৩·২০	১৮·৮৭	১৯·৮	১·৬
মোট	৭৬৩৯·২৭	৯৩৬·০৫	৮৭৬·৮	১৮০২·৮

* R. Coupland: 'Future of India', p. 92.
** Sir Homi Mody and Dr. Matthai: 'A Memorandum on the Economic and Financial Aspects of Pakistan' p. 7.

৩৯ নং ছক

ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

দফা	কেন্দ্রীয় ১৯৩৮—৩৯ *	উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ১৯৩৮—৩৯ *	দফা	উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ১৯৩৯—৪০ **	পূর্ব অঞ্চল ১৯৩৯—১৯৪০ **
রাজস্ব হইতে সরাসরি প্রাপ্য	৪২৩·৬০	৫১·৪৯	সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেস্যান	১৪৫·৮	২০৩·১
সেচ বিভাগ	৯·২৪	৭·০২	ডেট সার্ভিসেস	২১৬·৪	৪৪১·৭
ডেট সার্ভিসেস	১৩৩৮·৫৪	১৮৬·০০	অতিরিক্ত বার্ষিক মঞ্জুরী	৪০·৭	৬৫·৫
সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেস্যান	৯৮৪·৬৯	১৪৫·৫৬	প্রদেশসমূহে প্রদত্ত সাহায্য	২০৫·০	৩৩·০
সিভিল ওয়ার্কস	২১৯·৫৮	১০·৮৩			
বিবিধ	২০৪·৩২	৩৩·১৩	অন্যান্য দফায়	৩০·৪	৪৭·৬
দেশরক্ষা	৪৬১৮·০০				
কন্ট্রিবিউশ্যান ও অ্যাডজাস্টমেন্ট	৩০৬·৩২	২০৫·০০			
মোট	৮১০৪·২৯	৬৩৯·০০	মোট	৬৩৮·৩	৭৮৭·১

* R. Coupland: 'Future of India', p. 92.

** Sir Homi Mody and Dr. Matthai: 'A Memorandum on the Economic and Financial Aspects of Pakistan' p. 7.

৪০ নং ছক

ভারতের সাধারণ রাজস্ব, ব্যয় ও ঋণ ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে (কোটি টাকায়)

	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৯-৪০	১৯৪৪-৪৫ (পুনরালোচিত)	মোট ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে ১৯৪৪-৪৫ সাল পর্যন্ত	১৯৪৫-৪৬ (বাজেট)
১। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট বাজেট					
(১) রাজস্ব	৮৪·৫২	৯৪·৫৭	৩৫৬·৮৮	১,১২২·৬১	৩৬২·৩৪ *
(২) ব্যয়	৮৫·১৫	৯৪·৫৭	৫১২·৬৫	১,৫৯৯·৫৫	৫১৭·৬৩
(৩) উদ্বৃত্ত (+) বা ঘাটতি (—)	—০·৬৩	...	—১৫৫·৭৭	—৪৭৬·৯৪	—১৫৫·২৯
(৪) শতকরা ১ হইতে ২	৯৯·৩	১০০·০	৬৯·৭	৭০·২	৭০·০
২। গভর্ণমেন্টের মোট প্রযুক্ত মূলধন					
(ক) ভারত খাতে	৮৫·১৫	৯৪·৫৭	৫৭২·০৬	১,৪৭৮·৯৩	৫৩৫·৩৯
(১) সিভিল বিভাগীয় ব্যয়	৩৮·৯৭	৪৫ ০৩	১১৫·৪২	১৩২·২২	১২৩·৪০
(২) দেশরক্ষা খাতে ব্যয়	৪৬·১৮	৪৯·৫৪	৪৫৬·৬৪	১,৩৪৬·৭১	৪১১·৯৯
(ক) ক্যাপিটাল একাউন্ট	...	...	৫৯·৪১	১৪৯·৩৮	১৭·৭৬
(খ) রেভিনিউ একাউন্ট	৪৬·১৮	৪৯·৫৪	৩৯৭·২৩	১,১৯৭·৩৩	৩৯৪·২৩
(এক) বেসিক নর্মাল বাজেট	৩৮·০৭	৩৬·৭৭	৩৬·৭৭	২২০·৬২	৩৬·৭৭
(দুই) মূল্য বৃদ্ধি	...	১·১৯	১৬·৯২	৪৭·৪৮	১৯·৭৬
(তিন) সামরিক ব্যবস্থা (মোট)	...	৩·৫২	৩৩৪·২২	৮৭৮·৪৬	৩২৮·৫১
(চার) নন্-এফেক্টিভ চার্জেস (মোট)	৮·১১	৮·০৭	৯·৩২	৫০·৮০	৯·১১
(৩) রেভিনিউ একাউন্টে সাধারণ ব্যয়ের সহিত দেশরক্ষা ব্যয়ের শতকরা হার	৫৪·২	৫২·৪	৭৭·৫	৭৪·৯	৭৬·২

* নূতন ধার্য করসহ

(৪০ নং ছকের জের)

	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৯-৪০	১৯৪৪-৪৫ (পুনবালোচিত)	মোট ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে ১৯৪৪-৪৫ সাল পর্যন্ত	১৯৪৫-৪৬ (বাজেট)
(খ) আদায়যোগ্য সামরিক ব্যয়		৪ ০০	৪৩৯ ৫৩	১,৩৯৩·৮৮	৪৮৮·৮০
৩। বৎসর শেষে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের ঋণ—আমানত ও সুদের দেয় সকল প্রকার দায় ও অনাদায়ী ঋণসহ	১ ২০৫ ৭৬	১ ২ ·৮৬	১,৮১১·০২	..	২,১৮০·৫৭
৪। প্রদেশসমূহ					
(১) রাজস্ব	৮৪·৭৪	৯০·৮৩	২০০ ৭৮	৭৮৪·১২	১৮৮·১৭
(২) ব্যয়	৮৫·৭৬	৮৯·২২	২০৮·০৫	৭৬৭·৯৬	১৯১·৭৪
(৩) উদ্বৃত্ত (+) বা ঘাটতি (–)	–১·০২	+১ ৬১	–৭·২৭	+১৬ ১৬	–৩·৫৭
(৪) ঋণের অবস্থা (মোট ঋণের পরিমাণ) **	১৬৩·২০	১৬৭·৬১	২১৫·৪৯	৫২·২৯	...

** (১) স্থায়ী ঋণ, (২) চলতি ঋণ, (৩) অনাদায়ী ঋণ ও (৪) কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ সমেত।

উপরে প্রদত্ত ৩৮ ও ৩৯নং ছক হইতে দেখা যাইবে, অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড, স্যার হোমি মোদী ও ডাক্তার মাথাই রেলওয়ে হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ যাহা নির্ধারণ করিয়াছেন, প্রকৃত অঙ্কের সহিত তাহার পার্থক্য বিদ্যমান। প্রোফেসার কুপল্যাণ্ড দেখাইয়াছেন, 'পাকিস্থান অঞ্চলের অন্তর্বর্তী রেলওয়েসমূহ হইতে ১৯৩৮-১৯৩৯ সালে ব্যবসায়ের দিক দিয়া মোট লাভ হইয়াছে ১২৮ লক্ষ টাকা এবং সামরিক স্ট্রাটেজির দিক দিয়া মোট ক্ষতি হইয়াছে ১৮২ লক্ষ টাকা।' তিনি স্ট্রাটেজিক লাইনের দরুণ ক্ষতি গণনার মধ্যে আনেন নাই, কারণ তাঁহার বিবেচনায় ইহা দেশরক্ষা খাতের অন্তর্গত। তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, লাভের অঙ্ক ১৫০ লক্ষ টাকার কোঠায় কোনক্রমেই পৌঁছায় না; কিন্তু যাত্রীদের ভাড়া বর্ধিত হইলে আয় বৃদ্ধি হইবে—এই সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া তিনি তাঁহার হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন। সুতরাং স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে, যে আয়ের পরিমাণ কুপল্যাণ্ড সাহেবের হিসাব মতই হওয়া উচিত (১২৮—১৮২)= —৫৪ লক্ষ টাকা, তাহা অন্যায়ভাবে বর্ধিত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ১৯৩৮-৩৯ সালের দরুণ মোট আয় ৯৩৬·০৫ টাকার পরিবর্তে হইবে ৭৩২·০৫ লক্ষ টাকা।

ব্যয়ের অঙ্ক নির্ণয় করিতে গিয়া অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড কয়েকটি দফার কথা উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহা গণ্য করেন নাই; এই কারণেই আশঙ্কা হয়, একটী স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র পরিচালনের পক্ষে যেসব আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর প্রয়োজন, তাহা সচল ও সক্রিয় রাখিবার জন্য যে ব্যয়ভার নির্ধারিত হইয়াছে, প্রকৃত ব্যয়ের অঙ্ক তাহা হইতে অনেক উচ্চ হইবে। আবার নূতন প্রাদেশিক শাসনযন্ত্র গঠন করিতে গেলে যে সমস্ত বিচার-বিবেচনার সম্মুখীন হইতে হয়, স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রগঠন ও পরিচালনের বেলায় অবিকল তাহারই পুনরাবৃত্তি হইবে। কিন্তু প্রদত্ত হিসাবের অঙ্ক স্বীকার করিয়া লওয়া হইলে, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ১৯৩৮—৩৯ সালে উদ্বৃত্ত হইবে ৯৩.০২ লক্ষ টাকা ও ১৯৩৯—৪০ সালে হইবে ২৩৮.৫ লক্ষ টাকা। দেশরক্ষা ব্যবস্থার দরুণ ব্যয় এই হিসাবে গণনা করা হয় নাই এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মত অতি ক্ষুদ্র স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে এই রূপ পরিমাণ উদ্বৃত্ত টাকা হইতে আত্মরক্ষা ব্যবস্থার ব্যয়ভার নির্বাহ করা সম্ভব হইবে কিনা তাহা ভাবিবার কথা। লীগ মনোভাবের প্রতি অধ্যাপক কুপল্যাণ্ডের সহানুভূতি তাঁহার সমগ্র গ্রন্থটীতে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও তিনি পরিষ্কার এই সিদ্ধান্তে আসিয়াই উপনীত হইয়াছেন যে, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পক্ষে আত্মরক্ষা ব্যবস্থার ব্যয়ভার বহন করা সাধ্যাতীত। তাঁহার সিদ্ধান্ত তাঁহার নিজের কথাতেই উদ্ধৃত করিতেছিঃ 'অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাকিস্থানের দূরূহতম বিঘ্ন ও দুর্বারতম বিপদ নিহিত রহিয়াছে তাহার আত্মরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই। যে সমস্ত সম্ভাব্য পরিস্থিতির কথা উপরে আলোচিত হইল, তাহা যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে পাকিস্থানকে হিন্দু-ভারতের সাহায্য ব্যতিরেকেই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের বিপদ বরণ করিতে হইবে এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের বর্ধিত ব্যয়-বাহুল্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আত্মরক্ষা ব্যবস্থার

যুদ্ধ-পূর্ববর্তী মান বজায় রাখিতে সে আদৌ সমর্থ হইবে না। প্রয়োজনীয় অর্থের অতি সামান্য অংশও যদি তাহাকে সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য একদিকে তাহাকে যেমন অতিরিক্ত কর ধার্য করিতে হইবে, অপরদিকে তেমনি শাসনকার্য পরিচালনের ও সমাজ-কল্যাণকর কর্তব্য সাধনের ব্যয়ভার এমন অতিরিক্ত পরিমাণে হ্রাস করিতে হইবে যে, তাহার ফলে জীবনযাত্রার সাধারণ মানই যে অবনমিত হইবে তাহা নয়, দেশের অনুন্নত জনসাধারণ অধঃপতনের এমন এক নিম্নতর স্তরে পতিত হইবে যে, বহু বর্ষ পর্যন্ত তাহারা তথা হইতে উঠিয়া আসিবার সামর্থ্য সঞ্চয় করিতে পারিবে না। ইহাই সব নয়। পাকিস্থানের পূর্ব সীমান্ত রক্ষার পক্ষেও দুশ্চিন্তার কারণ দেখা দিবে না কি? এই পরিচ্ছেদের প্রথমদিকে খণ্ডন-ব্যবস্থার সুবিধার কথা যথাসম্ভব বিষয়গতভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং তাহার অসুবিধাগুলির পরীক্ষাও তাহা হইতে কম বিষয়গত হইবে না। তাহা হইলে তথ্য ও যুক্তি দেশরক্ষা সম্বন্ধীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কোন সমাধানের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে? ইহা কি তর্কাতীতরূপে নিশ্চিত নয় যে, পাকিস্থান ভারতের অংশবিশেষরূপে অবস্থান করিয়া অতীতে যে নিরাপত্তা ভোগ করিয়াছে, ভবিষ্যতে সে তাহা আর করিতে সক্ষম হইবে না? দেশরক্ষা-ব্যবস্থার জন্য সর্বনিম্ন ব্যয়ও যদি তাহাকে বহন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার আয়ের ক্ষেত্রে এমন অত্যধিক চাপ পতিত হইবে যে, জনসাধারণের সামাজিক প্রগতি তাহার ফলে ব্যাহত হইতে বাধ্য। বাদবাকি সব কিছুর জন্য বিপদের ঝুঁকি তাহাকে বরণ করিতেই হইবে।'[4] তাঁহার স্বমতের পক্ষে স্যার সিকন্দর হায়াৎ খাঁ কর্তৃক পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় প্রদত্ত একটী বক্তৃতাও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অধ্যাপক কুপল্যান্ড পূর্বাঞ্চল সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই এবং অমুসলমানপ্রধান জেলাসমূহ বিযুক্ত মুসলিম অঞ্চলের অবস্থাও তাঁহার আলোচনার বহির্ভূত। স্যার হোমি মোদী ও ডাক্তার মাথাই অবশ্য উভয় অবস্থা সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন। উপরি উদ্ধৃত বিবরণীতে বাংলা ও আসাম প্রদেশদ্বয়কে সমগ্ররূপে গ্রহণ করিয়া পূর্বাঞ্চলের হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে এবং নিম্নে প্রদত্ত হইল—অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহ বাদে পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের জেলা অনুযায়ী হিসাবঃ

4. Coupland, op. cit., pp. 95—6.

৪১ নং ছক

জেলা হিসাবে ১৯৩৯—৪০ সালে মুসলিম অঞ্চলের রাজস্ব ও ব্যয় বরাদ্দ

(লক্ষ টাকায়)
(১৯৩৯—৪০*)

দফা	মোট রাজস্ব পূর্বাঞ্চল	মোট রাজস্ব উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল	দফা	মোট ব্যয় পূর্বাঞ্চল	মোট ব্যয় উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল
শুল্ক	৭৭৫.০	৪০২.২	সিভিল শাসন বিভাগ	১২৬.৮	১০০.৬
কেন্দ্রীয় আবগারী	৭৫.৫	৫৩.৮	ডেট্ সার্ভিসেস	২৭৬.৭	১৪৯.৫
করপোরেশনের কর	৪৬.০	১২.০	অতিরিক্ত বার্ষিক মঞ্জুরী	৪১.০	২৮.০
অন্যান্য আয়-কর	১৮৬.৫	১০৩.৭	প্রদেশসমূহকে সাহায্যদান	১৮.৮	১৪১.৪
লবণ	১৩০.০	৮২.২	অন্যান্য দফা	৩০.০	২১.০
পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ, কারেন্সী ও টাকশাল	২২.০	১৪.৭	মোট	৪৯৩.৩	৪৪০.৫
রেলওয়ের মোট ক্ষতি	−৮৮.৫	−৭৭.২			
বিবিধ	১.০	১৩.৬			
মোট	১১৪৭.৫	৬০৫.০			

* Modi and Matthai, op. cit., p. 9.

দেখা যাইতেছে, উদ্বৃত্ত টাকার পরিমাণ হয়তো কমিতে পারে, কিন্তু দেশরক্ষার প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ হ্রাস পাইবে না; অবশ্য সে কথা অন্য দৃষ্টিকোণ হইতেও আলোচিত হইতে পারে। উভয় অঞ্চলের লোকসংখ্যার অনুপাতে দেশরক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যয়-বণ্টন করিয়া দেওয়া দেশরক্ষা সমস্যার সমুচিত সমাধান নয়। উভয় অঞ্চলই সীমান্তবর্তী, কাজেই স্থলপথে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার দায়িত্ব কার্যতঃ উভয়েরই। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল দিয়া ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা যে কেবলমাত্র বৃটিশ শাসকবর্গই স্বীকার করেন তাহা নয়, মুসলমান শাসনকালের সুদূর সুলতানী আমল হইতেই তাহা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। বৈদেশিক আক্রমণের দিক হইতে পূর্বাঞ্চলের দুর্বলতাও বর্তমান যুদ্ধে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে এবং সে আশঙ্কা ভবিষ্যতেও অস্বীকার করা চলিবে না। একথা সত্য যে, উভয় মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্বর্তী উপকূলভাগ বিশেষ বিস্তীর্ণ নয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জলপথে আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা তাহাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। লোকসংখ্যার অনুপাতে দেশরক্ষার ব্যয়-বণ্টন করার নীতি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেই নীতি অনুযায়ী আমরা যদি ভবিষ্যতে যান্ত্রিক বাহিনী গঠনজনিত অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের কথা গণনা না করিয়া, কেবলমাত্র বর্তমান যুদ্ধের পূর্ববর্তীকালের দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়ের অঙ্ক জনসংখ্যার অনুপাতে বণ্টন করিয়া দিই, তাহা হইলে অবস্থা দাঁড়ায় নিম্নবর্ণিত ৪২নং ছকের অনুরূপ।

দেশরক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্নের আর একটি যে দিক আছে, তাহাও উপেক্ষণীয় নয়। স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হইলে, তাহার নিজের নাগরিকগণের মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করিতে হইবে এবং তাহা পালনের ব্যয়ভার আপন তহবিল হইতে বহন করিতে হইবে। ভারতের অন্যান্য অংশের কর্তব্যও হইবে অনুরূপ। দেশরক্ষার দিক দিয়া এই ব্যবচ্ছেদের অর্থনৈতিক তাৎপর্য উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক হইবে। ডাক্তার আম্বেদকর দেখাইয়াছেন, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ১৯৩০ সালে যেভাবে গঠিত ছিল, তাহাতে তাহার সৈন্যদলের শতকরা ৫৮·৫ ভাগই সংগৃহীত হইত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসিগণের মধ্য হইতে।'[5] ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে 'মুসলমানদের' অনুপাত স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারণ করিতে গিয়া ডাক্তার আম্বেদকর দেখাইয়াছেন, 'পদাতিকবাহিনীতে মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা শতকরা ৩৬ ও অশ্বারোহীদলে শতকরা ৩০ এবং সৈন্যসংখ্যা সংগৃহীত হইয়া থাকে সম্পূর্ণরূপে পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে।'[6] এই অঞ্চল ভারতের অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইলে, হিন্দুস্থান তাহার সৈন্যদল সংগ্রহ করিবে আপন অধিবাসিগণের মধ্য হইতে, ফলে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসী সৈন্যদল যদি তত্রত্য স্বাধীন রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে সৈন্যবাহিনী হইতে তাহারা বহিষ্কৃত হইবে। বিচক্ষণ ডাক্তার আম্বেদকর হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, 'যে পাকিস্থান অঞ্চল ভারতীয় সৈন্য-

5. Dr. Ambedkar : Thoughts on Pakistan, p. 70.
6. Ibid; pp. 76—7.

৪২ নং ছক

পূর্বাঞ্চল

(লক্ষ টাকায়)

	প্রদেশ হিসাবে			জেলা হিসাবে		
সাল	দেশরক্ষার জন্য রাজস্ব হইতে প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ	দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ	ঘাটতি	দেশরক্ষার জন্য রাজস্ব হইতে প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ	দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ	ঘাটতি
১৯৩৯-৪০	১০৪৪·৯	১১৯৭·৮	১৫২·৯	৬৫৪·২	৭৪৮·৯	৯৪·৭

পশ্চিম অঞ্চল

(লক্ষ টাকায়)

১৯৩৮-৩৯	৯৩·০২	৬৪২·০১	৫৪৮·৯৯			
১৯৩৯-৪০	২৩৮·৫	৬১৯·৭৬	৩৮১·২৬	১৬৪·৫	৪২৩·৭৩	২৫৯·২৩

বাহিনীতে সেনাসংগ্রহের ক্ষেত্রস্বরূপ, নিম্নবর্ণিত ছক হইতে দেখা যাইবে যে, কেন্দ্রীয় তহবিলে তাহার দেয় অর্থের পরিমাণ অতিশয় নগণ্য':

৪৩ নং ছক

কেন্দ্রীয় তহবিলে দেয় অর্থের পরিমাণ:

পাঞ্জাব	... ...	১,১৮,০১,৩৮৫ টাকা
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	... ...	৯,২৮,২৯৪ "
সিন্ধু	... ...	৫,৮৬,৪৬,৯১৫ "
বেলুচিস্থান	... ...	০
মোট	... ...	৭,১৩,৭৬,৫৯৪ টাকা

এই দৃষ্টে হিন্দুস্থানের অন্তর্গত প্রদেশসমূহের দেয় অংশের পরিমাণ নিম্নলিখিতরূপ:

মাদ্রাজ	... ...	৯,৫৩,২৬,৭৪৫ টাকা
বোম্বাই	... ...	২২,৫৩,৪৪,২৬৭ "
বাংলা	... ...	১২,০০,০০,০০০* "
যুক্তপ্রদেশ	... ...	৪,০৫,৫৩,০০০ "
বিহার	... ...	১,৫৪.৩৭,৭৪২ "
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	... ...	৩১,৪২,৬৮২ "
আসাম	... ...	১,৮৭,৫৫,৯৬৭ "
উড়িষ্যা	... ...	৫,৬৭,৩৪৬ "
মোট	... ...	৫১,৯১,২৭,৭২৯ টাকা

হিসাব হইতে দেখা যায়, পাকিস্থান-প্রদেশগুলির প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। আগত অর্থের অধিকাংশই আসিয়া থাকে হিন্দুস্থান-প্রদেশসমূহ হইতে। বস্তুতঃ গভর্ণমেণ্ট হিন্দুস্থান-প্রদেশসমূহের প্রদত্ত অর্থের দ্বারাই পাকিস্থান-প্রদেশগুলির শাসনকার্য পরিচালন করিতে সক্ষম হন। পাকিস্থান-প্রদেশগুলি হিন্দুস্থান-প্রদেশের দায়স্বরূপ। তাহারা কেন্দ্রীয় তহবিলে কিছু দেয় না বলিলেই যথেষ্ট হইবে না, সেখান হইতে প্রচুর পরিমাণ অর্থসাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ ১২৬ কোটি টাকা, তন্মধ্যে প্রতি বৎসর সামরিক বিভাগের বাবদ ৫২ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। কিন্তু এই অর্থ ব্যয়িত হয় কোথায় এবং কে-ই বা ইহার অধিকাংশ

* Only half revenue is shown because nearly half population is Hindu.

পরিমাণ অর্থ যোগাইয়া থাকে? এই ৫২ কোটি টাকা রাজস্বের একটা মোটা অংশ সংগৃহীত হয় পাকিস্থান অঞ্চল হইতে এবং ব্যয়িত হয় মুসলমান সৈন্যবাহিনীর বাবদ। এই অর্থের অধিকাংশ পরিমাণ যদিও যোগাইয়া থাকে পাকিস্থান অঞ্চলের হিন্দুপ্রধান প্রদেশসমূহ, তাহা ব্যয়িত হয় এমন এক সৈন্যবাহিনীর জন্য, যাহা প্রধানতঃ অহিন্দু সৈন্যদল লইয়া গঠিত।'৭

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ভারতের অবশিষ্ট অংশ হইতে যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ব্যয় করিয়া থাকেন, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল যে কেবল সেই বিপুল অর্থের আনুকূল্য হইতেই বঞ্চিত হইবে তাহা নয়, তাহার নিজস্ব সৈন্যবাহিনী পোষণের ব্যয়নির্বাহের জন্য তাহাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থের সন্ধান করিতে হইবে। প্রথমতঃ সৈন্যবাহিনীর চাকুরী হারাইবার দরুণ উক্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণের আয়ের পথ রুদ্ধ হইবে, তদুপরি সৈন্যদল পোষণের ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য নূতন কর তাহাদের উপর ধার্য করা হইবে। মিঃ কে, টি, সাহার মতে, 'এই অদৃশ্য অবদানের' পরিমাণ বেশ সুপ্রচুর। তিনি বলেন, 'ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বৃহত্তম অংশ পাঞ্জাব হইতে সংগৃহীত হইত বলিয়া, সৈন্যদলের বেতন, পেন্সন, ভাতা ও এমনকি ঠিকাদারীর লভ্যাংশ-সমেত অন্যূন ১০ কোটি টাকার এই বার্ষিক 'অদৃশ্য অবদান' ভারতের অবশিষ্ট অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করিয়া, ব্যয় করা হইত কেবলমাত্র পাঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে। এই ব্যয় যুদ্ধ-পূর্ববর্তীকালীন মালের উপর ভিত্তি করিয়া সাধিত হইত; বলা নিষ্প্রয়োজন যে, যুদ্ধের ফলে তাহার পরিমাণ অবিশ্বাস্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে এই অর্থের পরিমাণ বার্ষিক ২৫ কোটি টাকার কম হইবে না।'৮

স্যার সিকন্দর হায়াৎ খাঁ যে তাঁহার আঞ্চলিক গভর্ণমেণ্ট গঠন বা সীমান্ত রদবদল সম্বন্ধীয় পরিকল্পনায় দাবী করিয়াছিলেন, সৈন্যবাহিনীতে মুসলমান সৈনিকের সংখ্যা ১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে যত ছিল তাহা হইতে কোনক্রমেই কমান চলিবে না—প্রদেশের এই আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কাই তাহার অন্যতম কারণ। বর্তমান যুদ্ধেও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে বহুসংখ্যক সৈন্য সরবরাহ করিয়া, মিঃ কে, টি, সাহার দর্শিত 'অদৃশ্য অবদানের' অধিকতর অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে সমরসচিব বলেন, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে মোট সংগৃহীত সৈন্যের মধ্যে পাঞ্জাব সরবরাহ করিয়াছে শতকরা ২৯·৯ ভাগ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ শতকরা ৪ ভাগ ও সিন্ধু ০·৪ ভাগ, একুনে শতকরা ৩৪·৩ ভাগ।

---

7. Ambedkar, op. cit., pp. 86—7.
8. K. T. Shah: 'Why Pakistan, why Not,' p. 164.

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহের সরকারী ঋণের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

৪৪ নং ছক

সরকারী ঋণ

(১৯৩৯—৪০)

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট:			
ভারতে	৫,০৫,৫১,১০,৪১৬	টাকা	
বিলাতে	৯,৪৪,৬১,৫৫,৩৯৯	টাকা	
	(৩২৯,৩২৮,৩৯৪ পাউণ্ড—প্রতি পাউণ্ড ১৩⅓ টাকা হিসাবে)		
প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ:			
বাংলা	৩০,০০,০০০	টাকা	
আসাম	৫০,০০,০০০	,,	
পাঞ্জাব	৩৪,০৫,৫০,৫১৫	,,	মোট ৬৩,১৯,৫২,১৬৭ টাকা (পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু)
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ...	৫৭,২৪,৯০০	,,	
সিন্ধু	২৩,৫৬,৭৬,৭৫২	,,	
কুর্গ	৩,৬২,৫৮২	,,	
মাদ্রাজ	১১,৯৬,৯২,৩১৯	,,	
বোম্বাই	৩১,১৮,৭২,৭২০	,,	
যুক্তপ্রদেশ	৩৯,১৩,৯২,৮৮৬	,,	
বিহার	০		
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ...	৪,৮৮,৪০,৮৬৩	,,	
উড়িষ্যা	০		
মোট	১,৪৩,২১,১২,৯৩৭	টাকা	

প্রদেশসমূহের দরুণ মোট সরকারী ঋণ ১৪৩ কোটি টাকার মধ্যে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টত্রয়ের অংশে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ৬৩ কোটি টাকার কিছু বেশী। এই টাকার অধিকাংশই সেচবিভাগে প্রযুক্ত হইয়াছে; পাঞ্জাবে এই বাবদে খাটানো টাকা লাভজনক হইয়াছে, সুতরাং আশা করা যায় সিন্ধুতে তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। পূর্বাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য কোন সরকারী ঋণ নাই।৯

9. Table XLV in the next page brings up-to-date the debt position in the Provinces collectively.

৪৫ নং ছক

১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে প্রদেশসমূহের ঋণগত অবস্থা

(কোটী টাকায়)

	১৯৩৮—৩৯এর শেষে	১৯৪৪—৪৫এর শেষে
১। সরকারী ঋণ		
(ক) স্থায়ী ঋণ	১৫·০৭	৫০·৯২
(খ) অস্থায়ী ঋণ	১·৫০	৬৮·২৩
(গ) কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ঋণ	১২৩·২৪	৬৬·৫৭
২। অপরিশোধিত ঋণ	২৩·৩৯	২৯·৭৭
৩। মোট ঋণের পরিমাণ (১ম ও ২য় দফার একুন)	১৬৩·২০	২১৫·৪৯
৪। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত হাওলাত ও অগ্রিম টাকা বাদে মোট ঋণের পরিমাণ	১০২·৪৮	১৮৫·৭৯

ব্যবচ্ছেদের পর মুসলমান ও অ-মুসলমান অঞ্চল অনুযায়ী এই ঋণ বণ্টন করিয়া দেওয়া অতিশয় জটিল ও দুরূহ ব্যাপার হইবে। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলকে যে ঋণ বহন করিতে হইবে, তাহা নিতান্ত লঘু হইবে না।

তাহা ছাড়া, সরকারী ঋণের পরিমাণ সমরকালীন সময়ে অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে, কাজেই ১৯৩৯-৪০ সালের অঙ্কের উপর নির্ভর করিয়া হিসাব করিতে গেলে, তাহা বিভ্রান্তিকর হইতে বাধ্য। ১৯৩৯-৪০ সালে যাহা ছিল ৯৪৪½ কোটি টাকা বর্তমানে তাহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২,০০০ কোটি টাকা; দুইটি মুসলমান অঞ্চলের মুসলমান অধিবাসিগণের সংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী যদি তাহা বণ্টিত হয়, তাহা হইলেও, তাহাদের নিজস্ব ঋণসমেত এই ঋণের তাহাদের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ দাঁড়াইবে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। বার্ষিক শতকরা তিন টাকা হিসাবে হইলেও এই টাকার সুদ হইবে বৎসরে ১৫ কোটি টাকা; দেশরক্ষা খাতে ব্যয় বাদে শাসনবিভাগের অন্যান্য সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিবার পর উভয় অঞ্চলের তহবিলে যে পরিমাণ অর্থ মজুত থাকিবে, এই টাকাটির পরিমাণ তাহার দ্বিগুণ। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই ঋণ-বণ্টন ব্যাপার আদৌ সহজ কার্য হইবে না, হইবে অতিশয় জটিল ও কষ্টসাধ্য কর্ম: 'এই ইউনিটকে (বৃটিশ ভারত) কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করিতে গেলে রাজস্ব ও অর্থনীতিক্ষেত্রে যে সঙ্কট দেখা দিবে, তাহা অনতিক্রম্য। রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ, জলসরবরাহ ও সেচ-ব্যবস্থা সব কিছুই খণ্ডিত করিতে হইবে। এই সমস্ত পরিকল্পনার ব্যয়-নির্বাহের জন্য যে জাতীয় ঋণ গৃহীত হইয়াছে, তাহার বর্তমান বণ্টন-ব্যবস্থা খণ্ডিত করিয়া নূতনভাবে বিলি-বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সৈন্যবাহিনীও

খণ্ডিত করিয়া, তাহার অতীত দায় ও বর্তমান ভবিষ্যৎ ব্যয়ভার নূতন করিয়া বণ্টন করিতে হইবে। সিন্ধু প্রদেশে সুক্কুর বাঁধ জাতীয় পরিকল্পনার জন্য ভারতীয় রাজস্ব হইতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। ইহার জন্য ও পাকিস্থানের অভ্যন্তরে এই জাতীয় অন্যান্য কার্যের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, পাকিস্থানকে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে, অবশ্য হিন্দুস্থানের মধ্যে অনুরূপ খাতে ভারত গভর্ণমেণ্ট যে টাকা খরচ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে পাকিস্থানের প্রাপ্য অংশও হিন্দুস্থানের দেয় হইবে। বহু বিবাদ-বিপত্তির পর এই জটিল, দুরূহ ও মর্মান্তিক হিসাব-নিকাশ নিষ্পন্ন করা যদি কোনদিন সম্ভবও হয়, তথাপি সেই বিপর্যয়ের মধ্য হইতে পাকিস্থান যখন বাহির হইয়া আসিবে, তখন রাষ্ট্ররূপে সমৃদ্ধি ও সম্পদের দিক দিয়া সে হইবে আরও দীন, আরও দুঃস্থ। তাহার সম্মুখে জাগিয়া উঠিবে আশু সমাধান-যোগ্য অসংখ্য সমস্যা, তাহার স্কন্ধে চাপিয়া রহিবে পরিশোধের অযোগ্য 'বিপুল ঋণভার; অর্থনৈতিক ও শিল্পগত সমৃদ্ধির যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা স্বায়ত্তশাসনশীল ভারতের সম্মুখে প্রসারিত রহিবে, এই অবস্থাপন্ন পাকিস্থানের পক্ষে তাহা হইবে নিষিদ্ধ রাজ্য।'

৪৬ নং ছক

ভারত গভর্ণমেণ্টের ১৯৪৫-৪৬ সালের ব্যাখ্যামূলক মেমোরেণ্ডাম বাজেট

(সুদ দেয় ও সুদ প্রাপ্য দায় ও দাবীর পরিমাণ—কোটী টাকায়)

ভারতবর্ষে	১৯৩৮-৩৯ (যুদ্ধপূর্বকাল)	১৯৪৫-৪৬ (বাজেট এষ্টিমেট)
সরকারী ঋণ		
হাওলাত	৪৩৭.৮৭	১,৪৮৪,৪৩
ট্রেজারী বিল ও ওয়েজ এবং মিন্স অ্যাডভ্যান্সেস	৪৬.৩০	৮৬.৬১
	৪৮৪.১৭	১,৫৭১.০৪
অপরিশোধিত ঋণ		
সার্ভিস ফাণ্ডস্	১.০৩	.৭৪
পোষ্ট আফিস সেভিংস ব্যাংক—ডিফেন্স সেভিংস ব্যাংকসহ	৮১.৪৮	১১০.২০
পোষ্ট আফিস ক্যাস ও ডিফেন্স সেভিংস	৫৯.৫৭	৪৩.৯০
ষ্টেট প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড	৭২.৪০	৯৭.২০
ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট		৫১.৬৫
অন্যান্য দফা	১০.২৫	১৩.০৮
মোট অপরিশোধিত ঋণ	২২৫.১৩	৩১৬.৭৭

(৪৬ নং ছকের জের)

ভারতবর্ষে	১৯৩৮-৩৯ (যুদ্ধপূর্বকাল)	১৯৪৫-৪৬ (বাজেট এস্টিমেট)
ডিপোজিট		
ডিপ্রিসিয়েসান ও রিজার্ভ ফান্ড	২৭·৩৪	১২৫·৮৯
অন্যান্য ডিপোজিট		১২৯·২৮
ভারতে মোট ঋণ	৭৩৬·৬৪	২,১৪২·৯৮
বিলাতে		
সরকারী ঋণ		
হাওলাত	৩৯৬·৫০	১৩·৪২
যুদ্ধের চাঁদা	২০·৬২	২০·৬২
রেলওয়ে খরিদজনিত এনুইটির প্রধান অংশ	৪৭·৮২	২৬·০১
	৪৬৪·৯৪	৬০·০৫
অপরিশোধিত ঋণ		
সার্ভিস ফাণ্ড	৪·১৮	৩·৫৫
বিলাতে দেয় মোট দায়	৪৬৯·১২	৬৩·৬০
মোট সুদ দেয় ঋণ	১,২০৩·৭৬	২,২০৬·৫৮
সুদ-প্রাপ্য দাবী		
রেলওয়েসমূহকে প্রদত্ত মূলধন	৭২৫·২৪	৭৯৭·৩১
অন্যান্য কমার্শিয়াল বিভাগকে প্রদত্ত মূলধন	২৭·৪২	৪২·১০
প্রদেশসমূহকে প্রদত্ত মূলধন	১২৩·২৮	৭৬·৯৭
দেশীয় রাজ্যসমূহকে প্রদত্ত ও অন্যান্য সুদ-প্রাপ্য ঋণ	২০·৭১	১৮·৬৫
ব্রহ্মদেশ হইতে প্রাপ্য ঋণ	৪৯·৭৩	৪৮·১৫
রেলওয়েসমূহের দায় পরিশোধ বাবদ এইচ্, এম্, জি'র নিকট গচ্ছিত টাকা	—	২৬·০১
	৯৪৬·৩৮	১,০০৯·২৬
ট্রেজারী একাউণ্টে জমা		
ক্যাস সিকিউরিটি	৩০·৩০	৫৪৭·০২
উল্লিখিত দাবীর বহির্ভূত মোট	২২৯·০৮	৬৫০·৩০

৪৭ নং ছক

রেলপথসমূহ

(১৯৩৯—৪০)
(হাজার টাকায়)

রেলওয়েজ	প্রযুক্ত মোট মূলধন	মোট আমদানী	চলতি ব্যয়	খরচ বাদে মোট আয়	আমদানীর সহিত ব্যয়ের শতকরা হার	প্রযুক্ত মূলধনের সহিত মোট আয়ের শতকরা হার
আসাম-বেঙ্গল	২৬,৪৮,৭৪	২,১৩,০৫	১,৬৮,২৬	৪৫,০৬	৭৮.৮৬	১.৭০
বেঙ্গল এণ্ড এন ডাব্লিউ	২২,৮৪,৯৪	৩,৬২,৯০	১,৮৪,৮২	১,৭৮,০৮	৫০.৯৩	৭.৭৯
বেঙ্গল-নাগপুর	৭৮,৪৫,৯৭	১১,০৪,৪৬	৭,৪৩,৪৪	৩,৬১,০২	৬৭.৩১	৪.৬০
বি, বি, এণ্ড সি, আই	৭৭,৫০,২০	১২,৮৭,০৩	৭,৪১,০০	৫,৪৬ ০৩	৫৭.৫৭	৭.০৫
ইষ্টার্ণ বেঙ্গল	৫৩,০৬,৪৬	৬,৩৬,৫৯	৫,৫০,২০	৮০,৩৯	৮৬.৯০	১.৫১
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান	১,৪৯,৯৪,১৭	২১,৫৫,৪৬	১৩,১০,৮৪	৮,৪৪,৬২	৬০.৮২	৫.৬৩
জি, আই, পি	১,১৭,৭১,৭০	[illegible] ২,৯৮	৯,১১,০১	৫,১১,৯৭	৬৪.০২	৪.৩৫
এম, এস, এম	৫৬,৩৪,৬০	৮,০১,৭১	৪,৮৯,২৬	৩,১২,৪৫	৬১.০০	৫.৫৫
নর্থ ওয়েষ্টার্ণ (মোট)	১,৫৩,২৬,০২	১৬,৮৯,৭৯	১১,৯৬,৪৫	৪,৯৩,০৪	৭০.৮০	৩.২২
রোহিলাখণ্ড ও কুমায়ুন	৪,৭৫,৯১	৭৬,৯০	৩৭,১৯	৩৯,৭৪	৪৮.৩৪	৮.৩৫
সাউথ ইণ্ডিয়ান	৪৪,৬৮,৫৩	৫,৫১,২৬	৩,৮৬,৮৮	১,৬৪,০৮	৭০.১৮	৩.৬৭
নর্থ ওয়েষ্টার্ণ (কম্যার্শিয়াল)	১,১৯,৪৪,৩১	১৫,৫০,৪৩	১০,০৭,০০	৫,৪৩,৪৩	৬৪.৯৫	৪.৫৫
নর্থ ওয়েষ্টার্ণ (মিলিটারী)	৩৩,৮১,৭১	১,৩৯,৩৬	১,৮৯,৪৫	—৫০,০৯	১৩৫.৯৬	—১.৪৮

বৃটিশ ভারতের এই সকল প্রধান প্রধান রেলওয়েগুলির মধ্যে ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের প্রায় সমুদয় অংশ ও আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের কিয়দংশ মাত্র পূর্বাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের জন্য প্রযুক্ত মোট মূলধনের পরিমাণ ৭৯·৫৫ কোটি টাকা এবং উক্ত রেলওয়ে হইতে আয়ের পরিমাণ ১ কোটি ২৮·৪৫ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ শতকরা ১·৬ ভাগ। এন, ডব্লিউ, রেলওয়ের প্রায় সমস্তটাই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে পড়ে; তাহার দরুণ প্রযুক্ত মূলধন ১৫৩·২৬ কোটি টাকা এবং মোট লভ্যাংশের পরিমাণ ৪ কোটি ৯৩·৩৪ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ প্রযুক্ত মূলধনের শতকরা ৩.২২ ভাগ। অতএব দেখা যাইতেছে, উভয় মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্বর্তী রেলওয়েসমূহ হইতে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ বৃটিশ ভারতের জন্য যে-কোন প্রধান রেলওয়ের আয় হইতে অনেক কম। সুতরাং এদিক দিয়াও মুসলিম অঞ্চলের অবস্থা বৃটিশ ভারতের অন্যান্য অংশের অবস্থার তুলনায় অনেক খারাপ। প্রধান প্রধান রেলওয়ের সমস্তগুলি না হইলেও অধিকসংখ্যকই স্টেট রেলওয়ে হইয়া যাওয়ার দরুণ রেলওয়ে-অর্থনীতির এই অংশের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ এই সব রেলওয়ে হইতে যদি কোন আয় হয়, তাহা যেমন বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত হইবে, অপর দিকে প্রযুক্ত মূলধনের সুদ পরিশোধ করিতে গিয়া তাহারা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত রেলওয়ে বা রেলওয়েসমূহ যে রাষ্ট্রের অধিকার-সীমার মধ্যে পড়িবে, তাহাকে তেমনি আপন রাজস্ব হইতেই এই ক্ষতি বহন করিতে হইবে।

(চৌত্রিশ)

খণ্ডন প্রস্তাবের সমালোচনা

খণ্ডনের পক্ষে যুক্তি

ভারতবর্ষকে মুসলমান ও অ-মুসলমান অঞ্চলে খণ্ডিত করিবার প্রধান যুক্তি হইতেছে এই যে, হিন্দু ও মুসলমান দুইটি স্বতন্ত্র জাতি। এ যুক্তি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি এবং সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রচিত বিভিন্ন খণ্ডন-পরিকল্পনা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া আমরা দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি, ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে তাহাদের কোনটির সামঞ্জস্য কতখানি। লীগ এ সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করে নাই, বিভাগ সম্পর্কে কতগুলি সাধারণ সর্তের উল্লেখ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। এই কারণে লীগ-প্রস্তাবের প্রদত্ত আলোকের সাহায্যে আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইয়াছে, কোন কোন এলাকা এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে এবং এই সব স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের বর্তমান আর্থিক সঙ্গতিই বা কিরূপ ও ভবিষ্যতেই বা কি হওয়া সম্ভবপর। বর্তমান জাগতিক ও

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে স্বতন্ত্র মুসলিম অঞ্চল গঠনের দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়া খণ্ডন-প্রস্তাবটিকে এইবারে আমরা সাধারণভাবে আলোচনা করিয়া দেখিতে পারি।

অধ্যাপক রেজিনাল্ড কুপল্যাণ্ড খণ্ডন-পরিকল্পনার পক্ষীয় যুক্তিগুলিকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও বিশ্বাস উৎপাদনের উপযোগী করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার উক্তিই বিশদভাবে উদ্ধৃত করা প্রয়োজনঃ

'(১) প্রথমতঃ, যে শঙ্কা ও সম্ভ্রমবোধ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে রচিত ব্যবধান অধুনা বিস্তৃততর করিয়াছে—খণ্ডন-ব্যবস্থা তাহা দূরীকরণের পক্ষে অনেকখানি কার্যকরী হইবে। ইহার ফলে ভারতীয় মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের মন হইতে হিন্দুরাজ ও তজ্জনিত আশু এবং অন্তিম পরিণতির আশঙ্কা অপনোদিত হইবে, সেরূপ সম্ভাবনার বাহিরে গিয়া তাহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে। খণ্ডন-পরিকল্পনা তাহাদের আত্মমর্যাদাবোধের পরিপোষক, কারণ ইহা কার্যে পরিণত হইলে তাহারা বৃহৎ এক রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে না রহিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একাধিক রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হইবে এবং তখন তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিবে, তাহারা শুধু সম্প্রদায়মাত্র নয়, আপনাদের আবাসভূমিতে জাতীয় স্বাধীনতা সম্ভোগে সক্ষম তাহারা এক স্বতন্ত্র জাতি। এতদ্ব্যতীত বিশ্বের বুকে তাহাদের বিশিষ্ট স্থান বিস্তৃততর হইবে।......তাহাদের রাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সহিত পাশাপাশি দণ্ডায়মান হইবে। তাহারা যে ধর্ম-সঙ্ঘের সভ্য, তাহার রাজ্য-সীমা যে ভারতের অবস্থানের বাহিরে বহু দূর অবধি বিস্তৃত, এ সম্বন্ধে তাহাদের চেতনা আরও বর্ধিত হইবে। পক্ষান্তরে বহির্জগত হইতে বিমুখ তাহারা যদি বিচ্ছিন্ন ভারতের অভ্যন্তরে হিন্দুপ্রাধান্যের দ্বারা স্থায়ীভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহারা নিজের সর্বনাশ নিজে ডাকিয়া আনিবে এবং তাহাদের অবস্থা দাঁড়াইবে অনেকটা ইউরোপের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির মত......

'(২) দ্বিতীয়তঃ, দাবী করা হইয়া থাকে যে, সংখ্যালঘুসম্প্রদায়-ঘটিত সমস্যার পক্ষে পাকিস্থান অপেক্ষা যোগ্যতর সমাধান আর কিছু নাই। সমতা সংস্থাপনের নীতি ইহার দ্বারা যেভাবে গৃহীত হইয়াছে তাহাই ইহা অবলম্বনের সঠিক পদ্ধতি। এক বা একাধিক হিন্দুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমতা সম্পাদনের জন্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলি মানদণ্ডের অপর পাল্লায় সংস্থাপিত—তাহাদের আকার যাহাই হোক না কেন তাহাতে কিছু আসে যায় না, জাতীয় মর্যাদার দিক দিয়া তাহারা সমস্তরের। তথাপি সেইসব রাষ্ট্রে তাহারা সংখ্যালঘুই রহিয়া যাইবে। একথা সত্য যে, সাম্প্রদায়িক একীকরণের আদর্শ এক অবাস্তব পরিকল্পনা এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সহ লক্ষ মুসলমান হিন্দুরাষ্ট্রগুলির মধ্যে পড়িয়া রহিবে, এ কথার সত্যতাও অস্বীকার করা চলে না; তথাপি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংক্রান্ত সমস্যা সেখানে গুরুতর আকার ধারণ করিবে না; কারণ, নিরপেক্ষ বৃটিশ কর্তৃত্ব হইতে ভারতের আসন্ন মুক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতা হস্তগত করিবার জন্য যে প্রতিযোগিতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে

তাহার অস্তিত্ব থাকিবেনা। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের জন্য রক্ষা-ব্যবস্থা অবশ্য মুসলিম লীগ কার্যক্রমের অন্তর্গত, কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ঠিক হিন্দুরাষ্ট্রগুলি যেমন হইবে সম্পূর্ণ-রূপে হিন্দুপ্রধান, একান্তরূপে মুসলমান রাষ্ট্রগুলিতে তেমনি মুসলিম নীতি ও সংস্কৃতিই হইবে তাহাদের নিয়ামক। তাহা ছাড়া, নিখিল ভারত কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সে সব রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির পক্ষে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইবার আর কোন সুযোগ রহিবে না।.. ...সে দায়িত্ব অতঃপর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপরেই বর্তাইবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিও তাহাদের আপন আপন অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লইতে সচেষ্ট হইবে; কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের অধীন প্রদেশসমূহ অপেক্ষা স্বাধীন রাষ্ট্র-গুলির মধ্যে 'প্রতিভূ'-প্রথা যে অধিকতর কার্যকরী হইবে এ সম্বন্ধে উভয় পক্ষই হইবে নিশ্চিতরূপে নিঃসন্দেহ।

'(৩) তৃতীয়তঃ, বিভাগ ব্যবস্থার দ্বারা ভারতের আত্মরক্ষা সমস্যাও অনেক পরিমাণে সহজ হইবে।......উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হইলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গুরুত্ব একেবারে লুপ্ত হইবে। উপজাতি ও সীমান্তের বহির্ভূত অঞ্চলের অধিবাসিসাধারণ সকলেই মুসলমান, কাজেই যখন তাহারা দেখিবে, অমুসলমানদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক জেহাদ পরিচালনা করিতে গেলে প্রথমেই স্বধর্মিগণের সম্মুখীন হইতে হয়, তখনই জেহাদের উৎসাহ তাহাদের দমিয়া যাইবে।...পাকিস্থান ও প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য-পূর্ণ অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর দ্বারা অবস্থা আরও দৃঢ়তর করা যাইতে পারিবে। যে সা-আদাবাদ চুক্তির দ্বারা ১৯৩৭ সালে তুরস্ক, ইরাক, পারস্য ও আফগানিস্থান এই চারিটি রাষ্ট্র পারস্পরিক নিরাপত্তার সর্তে সম্মিলিত হইল, তাহাতে পঞ্চম পক্ষরূপে পাকিস্থানের মিলিত হইতে আপত্তি কি?

'(৪) চতুর্থতঃ, অবিভক্ত ভারতে সামরিক সংগঠনের দায়িত্ব যখন ভারতীয়-গণের বিশেষ করিয়া হিন্দুদের হাতে আসিবে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা তখন হ্রাস পাইতে বাধ্য। ১৯৩৯ সালে মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা ছিল এক-তৃতীয়াংশ এবং বর্তমানে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৩০·৮ ভাগ। ঐরূপ ক্ষেত্রে তাহা আরও কমিয়া এক-চতুর্থাংশে পরিণত হইতে বাধ্য। পাঞ্জাবের জীবনধারণের মান পাঞ্জাবী সৈন্যদের বেতন ও বৃত্তির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল; এই ব্যবস্থার দ্বারা সে মানই যে শুধু অবনমিত হইবে তাহা নয়, সামরিক শক্তির উপর হিন্দু-রাজের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ইহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

'(৫) পঞ্চমতঃ, অর্থনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কেবলমাত্র খণ্ডন-ব্যবস্থার দ্বারাই মুসলমানগণের করায়ত্ত হওয়া সম্ভবপর। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের অর্থনৈতিক হেতু বরাবরই বিদ্যমান রহিয়াছে, এই কারণেই মুসলমানদের আশঙ্কা, হিন্দুরাজ গঠিত হইলে সমগ্র ভারতে হিন্দুদের সেই অর্থনৈতিক প্রাধান্য আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।...গ্রামাঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাধিক্য যেখানে অতিমাত্রায়—এমন কি সেখানেও খুচরা মালের কারবার ও ব্যবসা হিন্দু মহাজন ও দোকানদার-

গণের একচেটিয়া; নাগরিক জীবনেও হিন্দুপ্রাধান্য সুস্পষ্ট; এমন কি, পাঞ্জাব ও সিন্ধুতেও নবজাগ্রত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী বৃত্তি ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করিতেছে। এ সমস্তই নিঃসন্দেহে শোচনীয়, কিন্তু অবস্থা শোচনীয়তর করিয়া তুলিয়াছে যন্ত্র-শিল্পের অভ্যুত্থান।...উত্তর-পশ্চিম মুসলিম অঞ্চল মুখ্যতঃ কৃষি-প্রধান। ইহার লোকসংখ্যা বৃটিশ ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১২·৩ ভাগ, কিন্তু হিসাব করিলে দেখা যায়, ইহার যন্ত্রশিল্প বৃটিশ ভারতের যান্ত্রিক সম্পত্তির শতকরা ৫·১ ভাগ ও খনিজ সম্পদ শতকরা ৫.৪ ভাগ মাত্র। সমগ্র প্রদেশ হিসাবে বাংলা যন্ত্রশিল্পের দিক দিয়া অতিশয় উন্নত। ইহার জনসংখ্যা বৃটিশ ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ, কিন্তু কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা-অনুপাত হিসাব করিলে ইহার যন্ত্রশিল্পের পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ৩৩ ভাগ। কিন্তু শিল্পাঞ্চলসমূহের অধিকাংশই হিন্দুপ্রধান কলিকাতা নগরী ও তাহার চতুঃপার্শ্বে অবস্থিত। কলিকাতা বাদে উত্তর-পূর্ব মুসলিম অঞ্চল উত্তর-পশ্চিম মুসলিম অঞ্চল অপেক্ষাও অধিকতর কৃষি প্রধান। ভারতীয় যন্ত্রশিল্প বস্তুতঃ হিন্দু অঞ্চলেই অবস্থিত; ইহার মালিক ও মহাজন উভয়ই হিন্দু এবং হিন্দু শ্রমিকগণেরই ইহা অন্নসংস্থানের ক্ষেত্রস্বরূপ। পাকিস্থান অন্ততঃপক্ষে তাহার নিজের অর্থনীতি নিজে নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যেমন করিয়া হোক সে তাহার যন্ত্রশিল্প গড়িয়া তুলিতে ও বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। উৎপন্ন কাঁচা তুলা বোম্বাইয়ে চালান না দিয়া, সে নিজের কলের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিতে পারে এবং শুল্ক স্থাপন দ্বারা তজ্জাত সামগ্রী রক্ষা করিতে পারে। পরে আর্থিক আনুকূল্য যদি আরও অধিক পরিমাণে লাভ করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে সলিল-শক্তির সঞ্চয় কার্যে নিয়োগ করিয়া আপন যন্ত্রশিল্প সে আরও সমৃদ্ধতর করিতে সমর্থ হইবে। করাচী বন্দরের আরও উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হইলে, সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রবেশদ্বাররূপে বোম্বাই বন্দরের গুরুত্ব হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে।'[১]

(২) খণ্ডন প্রস্তাবের পক্ষীয় যুক্তির প্রত্যুত্তর

উল্লিখিত প্রত্যেকটি যুক্তির বিচার করিয়া দেখা যাউক।

(১) পূর্বেই বলা হইয়াছে, সংস্কার ও ভাবাবেগ বর্তমানে যেরূপ প্রবলভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সুস্থ ও সংস্কারমুক্ত মন লইয়া বিচার করা অসম্ভব না হইলেও অতিশয় দুরূহ কার্য। সাধারণতঃ গর্ববোধ ভীতিভাবের প্রতিষেধক হওয়াই উচিত, কিন্তু অধ্যাপক কুপল্যান্ড সাহেবের বিশ্লেষণ যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এক্ষেত্রে তাহারা উভয়েই একত্র অবস্থান করিতেছে। সে যাহাই হোক, এই ভীতি-ভাবের হেতুটা কি? রাজনৈতিক ক্ষমতা ইংরাজদের হস্তগত হইবার পর হইতে ভারত শাসনের ভার তাহারাই গ্রহণ করিয়াছে এবং শাসনকার্য তাহারাই পরিচালন করিয়া আসিতেছে। মুসলমানগণ যদি তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রভুত্বের আসন হইতে

1. R. Coupland: 'The Future of India,' pp. 75—9.

বিচ্যুত হইয়া থাকেন, হিন্দু অথবা অন্য কোন অমুসলমান সম্প্রদায় তাহার জন্য দায়ী হইতে পারেন না, কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের দরুণ রাষ্ট্রশক্তি তাঁহাদের হাত হইতে বিচ্যুত হয় নাই, হইয়াছিল মুসলমানদের হাত হইতে। বৃটিশ শাসনের গোড়ার দিকে হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানগণই যে রাজশক্তির চক্ষে অধিকতর সন্দেহভাজন ছিলেন এবং তাঁহারাই যে অধিকতররূপে নিগৃহীত ও নিপীড়িত হইয়াছিলেন—ইহা তো ঐতিহাসিক সত্য। ইহাও সমপরিমাণে অস্বীকার্য যে, কর্তৃপক্ষ যখন জানিতে পারিলেন, হিন্দুরা বৃটিশ প্রভুত্বের বিরোধিতা করিতে উদ্যত হইয়াছে, কেবল তখনই তাঁহারা হিন্দুদের পিঠে হাত বুলান হইতে ক্ষান্ত হইয়া মুসলমানদের পৃষ্ঠের অভিমুখে কর প্রসারণ করিলেন। বৃটিশ নীতির এই পরিবর্তনের অপরিহার্য ফল হইল এই যে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস সঞ্চারিত হইল এবং রাজশক্তি তাহার দরুণ অন্ততঃ সাময়িকভাবেও, শাসন ক্ষমতার নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রব সম্ভোগে সক্ষম হইলেন। অপক্ষপাত দৃষ্টি লইয়া ঘটনাস্রোত লক্ষ্য করিলে ও সংস্কারবিমুক্ত মন লইয়া অবস্থা পর্যালোচনা করিলে, তৃতীয় পক্ষের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে সংশয় জাগরিত না হইয়াই পারিত না. কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সুচতুর মোচড়ের ফলে ঘটনাস্রোত ভিন্ন পথে মোড় ফিরিল। মুসলমানদের অনুন্নত অবস্থার দরুণ হিন্দুদিগকে কোনক্রমেই দায়ী করা চলে না, দায়ী তাহার জন্য সেই বৃটিশ রাজশক্তি—সর্বপ্রকার শাসন-ক্ষমতা দেড়শত বৎসর ধরিয়া যাহার কবলে কেন্দ্রীভূত। হিন্দুদের হাতে আদৌ কোন ক্ষমতা যদি হস্তান্তরিত হইয়া থাকে, তবে তাহা হইয়াছে ১৯১৯ ও ১৯৩৫ সালের শাসনসংস্কারের ফলে এবং তাহা বিধিবদ্ধ করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বৃটিশ গভর্ণমেণ্টেরই। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন বলে মুসলমানগণ মুসলমান-প্রধান প্রদেশসমূহ শাসন করিতেছেন। এমন কি, আসামে যদিও তাঁহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ, তথাপি সে প্রদেশের শাসনভার তাঁহাদেরই হস্তে ন্যস্ত। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে নূতন ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হইবার পর হইতে, বিশেষ করিয়া, পাঞ্জাব ও বাংলা—এই দুইটি বৃহত্তম প্রদেশে এবং সিন্ধুতে মুসলমান শাসন আজ পর্যন্ত অব্যাহতভাবেই চলিয়া আসিতেছে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বরাবরই বৃটিশ কর্তৃত্বাধীন। মাত্র সাতাশ মাসব্যাপী সংক্ষিপ্ত সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়, এমন কি, মুসলমান সংখ্যালঘু প্রদেশগুলিও শাসন করিবার সুযোগ পায় নাই। তাহা সত্ত্বেও মুসলমানগণ যদি অনুন্নত অবস্থায় পতিত রহিয়া থাকেন, তাহার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়কে দোষী করা চলে কি? কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগমাত্র তাহারা পায় নাই এবং হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে যে সুযোগ তাহারা পাইয়াছিল, তাহাও স্বল্পকালস্থায়ী। কিন্তু মুসলিম প্রগতির পথে অন্তরায় অপসারণের জন্য মুসলমানগণ এই দীর্ঘ আট বৎসরে কি করিয়াছেন? যদি স্বপক্ষে কোনরূপ প্রমাণ প্রয়োগ উপস্থিত না করিয়াই যুক্তি দেখান হয় যে, সংখ্যালঘু হিন্দুসম্প্রদায়ের বিরোধিতার জন্যই আমূল সংস্কার সাধন সম্ভবপর হয় নাই, তাহা হইলে যৌক্তিকতার দিক দিয়া প্রশ্ন জাগে না কি যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

[illegible] সত্ত্বেও, ভারত খণ্ডিত হইবামাত্র অবস্থার উন্নতিসাধন কিরূপে সম্ভব হইবে? অবশ্য এরূপ যদি কোন পরিকল্পনা থাকিয়া থাকে যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিগৃহীত ও নিপীড়িত করিয়া, তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার এমনভাবে হরণ করিতে হইবে যেন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিয়মতন্ত্রসম্মত বাধাদান করিবার সামর্থ্য পর্যন্ত তাহাদের না থাকে—তবে সে স্বতন্ত্র কথা। উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্গত স্বায়ত্তশাসনশীল ইউনিটসমূহ হইতে, বিশেষ করিয়া পাঞ্জাব ও বাংলা হইতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যদি কোন না কোন উপায়ে নির্মূল করা সম্ভব হইত, তাহা হইলেও বা অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইবার সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু সেরূপ কোন উদ্দেশ্যের কথা কুত্রাপি উল্লিখিত হয় নাই; বরঞ্চ লীগ-প্রস্তাবে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা যদি মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে একথাও মানিয়া লইতে হয় যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পূর্ববৎ বহাল থাকিবে; শুধু তাহাই নয়, অ-মুসলমান রাষ্ট্রের সহিত পরামর্শক্রমে ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিত্তিতে তাহাদের ধর্মগত, সংস্কৃতিগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য সর্ববিধ স্বার্থ এবং অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সকল প্রকার কার্যকরী ও নির্দেশাত্মক রক্ষা-ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, পাঞ্জাবে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত লঘু হইবে না: পাঞ্জাবে মুসলমানগণ শতকরা মাত্র ৫৭, সমগ্র পাঞ্জাব সমেত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শতকরা ৬২ এবং মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি বাদ দিলে শতকরা ৭৫ ভাগের বেশী হইবে না। কোন রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হইতে হইলে, তাহাতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা হওয়া প্রয়োজন অত্যধিক। কাজেই এইসব অঞ্চল লইয়া যে রাষ্ট্র গঠিত হইবে তাহা যে মুসলিম রাষ্ট্ররূপে কেমন করিয়া গণ্য হইতে পারে তাহা বুঝা দুষ্কর। সেইরূপ সমগ্র বাংলা ও আসাম পূর্বাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইলে, মুসলমান জনসংখ্যা সেখানে দাঁড়ায় শতকরা ৫১ হইতে ৫২ এবং অমুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি বাদ দিলেও তাহা কোনক্রমেই শতকরা ৬৯ ভাগের বেশী হয় না। এইসব প্রদেশ সহযোগে গঠিত রাষ্ট্রও যে কিভাবে মুসলিম রাষ্ট্ররূপে আখ্যাত হইতে পারে তাহা দুর্বোধ্য, কারণ এ অঞ্চলেও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজনীয় পরিমাণে অত্যধিক নয়। অবশ্য মুসলমানদের পক্ষে কেবলমাত্র এই সান্ত্বনাটুকু থাকিবে যে, তাঁহারা এক বৃহৎ রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে না রহিয়া, দুইটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলেন। এখন ভাবিয়া দেখা কর্তব্য, কেবলমাত্র এই অহমিকাবোধ পরিতৃপ্ত করিবার জন্য যে ক্ষতিস্বীকার করিতে হইবে তাহাতে মজুরি পোষাইবে কিনা।

বিশ্বের বুকে তাঁহাদের বিশিষ্ট স্থান বিস্তৃততর করার কার্যও মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের উপরেই বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। বর্তমান পৃথিবীতে এমন কোন মুসলিম রাষ্ট্র নাই যেখানে অ-মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মত সংখ্যাবহুল। বাকী রহিল ভারতীয় মুসলমানগণ কর্তৃক বহির্ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি পোষণের কথা: তাহা তাঁহারা

স্বাচ্ছন্দে করিতে পারেন, সে কার্যে তাঁহাদিগকে বাধা দিবে কে? হিন্দুরা কোনদিন সে পথে অন্তরায় হয় নাই; তাহারা শুধু এইটুকু আশা করিয়াছে যে, ভারতের দুঃখ-দৈন্য দূরীকরণের জন্যও তাঁহাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করিবেন। বেশী-দিনের কথা নয়, পাঞ্জাবে হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি অনুষ্ঠিত অনাচারের প্রতিবিধানের জন্য সমগ্র অ-মুসলমান সমাজ যেমন সচেষ্ট হইয়াছিল, খিলাফত আন্দোলনের সময় অন্য দেশস্থ মুসলিম খলিফার অধিকার রক্ষার জন্য ঠিক তেমনি করিয়াই সে সঙ্ঘবদ্ধভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার জন্য ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছে, দুঃখবরণ করিয়াছে। হিন্দুগণ কোনদিন কোন মুসলিম রাষ্ট্রের স্বার্থ-বিরোধী কার্য করে নাই, কাজেই পারস্পরিক সুবিধার জন্য ভারতবর্ষের মধ্যপ্রাচ্যস্থ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সহিত চুক্তিবদ্ধ না হইবার পক্ষেও কোন কারণ দেখা যায় না। ভারত যদি অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ থাকে, তাহার বলিষ্ঠ আশ্রয়ে মুসলমানগণ যে সুখ-সুবিধা সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন, ভারত খণ্ডিত হইলে তাহার দুর্বল আশ্রয়ে এবং তদপেক্ষা দুর্বলতর ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের আওতায় তাহা তাঁহাদের পক্ষে লভ্য হইবে না;—এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, কেবলমাত্র গর্ববোধ পরিতৃপ্ত করিবার জন্য অতীতের সুদীর্ঘ সাহচর্য মুসলমানগণ পরিহার করিবেন কিনা সে কথা অবশ্য তাঁহাদেরই বিচার্য। তবে যে প্রস্তাবিত বিভাগ-ব্যবস্থার দ্বারা আট শতাব্দীর ইতিহাস খণ্ডিত হইতে চলিয়াছে,—তাহার ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অ-মুসলমানকে তাহাদের বক্তব্য হইতে বঞ্চিত করা চলে না, করা কর্তব্য নয়।

খণ্ডন-ব্যবস্থার ফল তাহাদের পক্ষে কিরূপ হইবে ও উক্ত প্রস্তাবের সমর্থকগণের ঘোষিত উদ্দেশ্যের চরম পরিণতিই বা কি হইবে তাহা ভাবিয়া সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সমগ্র ভারতের অ-মুসলমানগণ যে খণ্ডন-পরিকল্পনাকে সংশয়ের চক্ষে দেখিবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, খণ্ডিত ভারত অখণ্ড ভারত অপেক্ষা দুর্বল হইবে এবং তজ্জন্য আন্তর্জাতিক দরবারে তাহার কণ্ঠস্বরও হইবে ক্ষীণতর। বাণিজ্যগত সুবিধা, শিল্পোন্নয়ন প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাপারে অন্যান্য দেশের সহিত যে চুক্তি সে সম্পাদন করিবে তাহার সর্তও দুর্বলতর হইতে বাধ্য। মুসলিম অঞ্চল ভারতের অবশিষ্ট অংশ হইতে আয়তনে ক্ষুদ্রতর হওয়ার দরুণ এ অসুবিধা বিশেষভাবে তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে। অবশ্য ভারতের অবশিষ্ট অংশও ইহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং সে ক্ষতির পরিমাণও হইবে মারাত্মক।

কিন্তু ইহা ছাড়াও, পাকিস্থানের সমর্থকগণ কর্তৃক তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রচারিত ঘোষণার ফলে সত্য সত্যই একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। এস্থলে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমি দেখাইব যে, ভারত খণ্ডন দ্বারা পুনরায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, তাহা অমূলক নয়। মিঃ এফ, কে, খাঁ দুরাণী—'The Meaning of Pakistan' নামক তাঁহার স্বরচিত পুস্তকের ভূমিকায় ১৯৪৩ সালের ১২ই নভেম্বর তারিখে লিখিতেছেন, 'ভারতে এমন এক ইঞ্চি পরিমিত স্থানও নাই যাহা আমাদের পূর্বপুরুষগণ

রক্তমূল্যে ক্রয় করেন নাই। সে শোণিতপাত আমরা ব্যর্থ হইতে দিতে পারি না। এই কারণে সমগ্র ভারত আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি এবং তাহা ইসলামের জন্য আমাদিগকে আবার অর্জন করিতে হইবে। আধ্যাত্মিক অর্থে আত্মপ্রসার আমাদের ধর্মের অন্তর্নিহিত প্রেরণা, তাহা দ্বারা হিন্দু অথবা অন্য কাহারও প্রতি বিদ্বেষ সূচিত হয় না। ব্যাপারটা বরঞ্চ ঠিক তার বিপরীত। আমাদের চরম লক্ষ্য হইতেছে কি রাজনীতির দিক দিয়া, কি ধর্মের দিক দিয়া সমগ্র ভারতকে ইসলামের পতাকাতলে একীভূত করা। ভারতের চূড়ান্ত রাজনৈতিক মুক্তির ইহা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই।'২

'জনৈক পাঞ্জাবী' বলেন, 'একথা স্পষ্টভাবে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, আমরা যে হিন্দু-ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিতেছি তাহা কেবল লক্ষ্যে উপনীত হইবার উপায় মাত্র এবং আদর্শ ইসলামীয় রাষ্ট্র গঠনই হইতেছে আমাদের সেই লক্ষ্য। প্রস্তাবিত ব্যবচ্ছেদ-ব্যবস্থা দ্বারা হিন্দুদের অর্থনৈতিক দাসত্ব হইতে আমরা নিঃসন্দেহে মুক্তি পাইব। কিন্তু যেহেতু আমাদের উদ্দেশ্য হইল আদর্শ ইসলামীয় রাষ্ট্র গঠন, সেইজন্য পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভও তদ্দ্বারা সূচিত হইতেছে। স্বাধীনতা লাভের পর অনৈস্লামিক পরিবেশের মধ্যে ইসলামীয় রাষ্ট্রের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব হইবে। সেইজন্য ইসলাম-অনুমোদিত পথে বিশ্ববিপ্লবের আয়োজন করা হইবে আমাদের অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হইল, খাঁটি ইসলামীয় পদ্ধতিতে বিশ্ববিপ্লব সংগঠন। অঞ্চল স্বতন্ত্র করা, হিন্দুদের অর্থনৈতিক দাসত্ব হইতে মুক্ত হওয়া ও ইংরাজদের রাজনৈতিক পরাধীনতা হইতে অব্যাহতি পাওয়া প্রভৃতি কার্যগুলি পরিপূর্ণ ইসলামীয় পদ্ধতিতে বিশ্ববিপ্লব সংগঠনরূপ আমাদের চরম আদর্শ উপলব্ধি করিবার পক্ষে কয়েকটি উপায় মাত্র।'৩

'অতীতে মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পৃথিবীর যে-কোন অংশেই বাস করিয়াছে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বিগণের সহিত পরম সৌহার্দ্যের সহিত তাহারা জীবন-যাপন করিয়াছে। কিন্তু যে মুহূর্তে তাহারা উপলব্ধি করিয়াছে যে, দৈহিক শক্তি ও সংখ্যার দিক দিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে তাহারা সক্ষম, তদ্দণ্ডেই কেবলমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে অবস্থান করিতে তাহারা অস্বীকার করিয়াছে। ......স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের এই ভারতীয় আন্দোলন হইতে চীন ও রাশিয়ার অনুরূপ আন্দোলন প্রবল প্রেরণা ও অনুপ্রাণনা লাভ করিবে, কারণ সেই দুইটি দেশেও মুসলমানগণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পর্যায়ে পতিত রহিয়াছে।

মধ্য এশিয়ায় ৮ কোটি অধিবাসী-সংখ্যার শতকরা ৯৫ ভাগ মুসলমান, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা চীন ও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের অধীন।

'ইসলামের রাজনৈতিক সমস্যা প্রায় সর্বত্রই একই ধরণের। কাজেই যে-কোন একটি মুসলিম দেশের মুক্তি অপর মুসলিম দেশকে প্রভাবিত না করিয়াই পারে না। ভারতীয় মুসলমানদের পরিণতি পৃথিবীর অন্যান্য অংশের,

2. F. K. Khan Durrani : 'The Meaning of Pakistan,' p. X.
3. 'Confederacy of India' by 'A Punjabi,' pp. 269—70.

বিশেষ করিয়া পশ্চিম চীনের প্রদেশসমূহ ও রাশিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলস্থ মুসলমানপ্রধান এলাকাসমূহের উপর প্রভূত পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিবে। ভারতবর্ষে যদি আমরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অবস্থা স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলে কেবলমাত্র নয় কোটি ভারতীয় মুসলমানের ভাগ্যই যে তদ্দ্বারা নির্ধারিত হইয়া যাইবে তাহা নয়, সোভিয়েট রাশিয়ার ৩ কোটি ও চীনের ৫ কোটি মুসলমানকে চিরদাসত্বে আবদ্ধ করা হইবে।

'ইহা ধরিয়া লওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, ভারতবর্ষ যদি কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভ করে, এই তিনটী দেশের মুসলমানগণকে চিরপরাধীন রাখিবার উদ্দেশ্যে চীন ও রাশিয়ার সহিত সে সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইবে। মধ্য এশিয়ায় যদি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হয়, ভাবী কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট তাহাকে সন্দেহের চক্ষে না দেখিয়া পারিবে না, কারণ সেখান হইতে ভারতেও স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন সংক্রামিত হইবার আশংকা রহিবে।'৪

'আতাতুর্কের জীবিত কালেও তাঁহারই নির্দেশক্রমে, সৈয়দ জালিল আহম্মদ সিনিযুসির পৃষ্ঠপোষকতায় সমস্ত মুসলিম জগতের একীকরণের জন্য তুরস্কে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, ভারতীয় মুসলমানগণের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের আশংকা তাহারই অংশ মাত্র। যে সকল মুসলিম রাষ্ট্র বর্তমানে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা ছাড়াও পৃথিবীর মুসলমানপ্রধান অন্যান্য অঞ্চলে স্বাধীন মুসলিম সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হইল ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। অধুনা-প্রস্তাবিত দশটী মুসলমান সাধারণতন্ত্রের মধ্যে একটী হইবে মুসলিম বাংলা, অপরটী উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং 'তৃতীয়টী হায়দ্রাবাদ রাজ্য।' ৫

এই সমস্ত সুস্পষ্ট ঘোষণাবাণী সম্মুখে রাখিয়া অ-মুসলমানগণ যদি সন্দেহ করেন যে, ভারতীয় মুসলমানগণ চান, ভারত-ব্যবচ্ছেদের সূক্ষ্ম রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা ক্রমশঃ তাহা সম্প্রসারিত করিবেন এবং ধীরে ধীরে ইসলামের জন্য ভারত-বিজয় সম্পন্ন করিয়া ও মধ্য-এশিয়ার মুসলমানগণকে চীন ও রাশিয়ার কবল হইতে মুক্ত করিয়া পরিশেষে সম্পূর্ণ ইসলামীয় পদ্ধতিতে বিশ্বসভাব সংগঠন করিবেন, তবে তাঁহাদিগকে দোষী করা চলে না। এই স্বপ্ন যাঁহারা দেখেন, তাঁহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না—যদিও এ স্বপ্নের সৃষ্টি চীন, রাশিয়া ও হিন্দুদের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পটভূমিকায়; সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই তাঁহারা ভাবেন, মুসলমানদিগকে দমিত রাখা ছাড়া চীন, রাশিয়া ও হিন্দু-ভারতের যেন আর অন্য কিছু করণীয় নাই।

তাহা ছাড়া, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুসম্প্রদায় যে এহেন শক্তিশালী সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজকে দমিত করিয়া রাখিতে চায়—সে আশঙ্কাও ইসলামের জন্য ভারত—তথা বিশ্ববিজয়ের স্পর্ধিত পরিকল্পনা দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

(২) দুইটি মুসলমানরাষ্ট্র গঠন করিলেই ভারতের—তথা নবগঠিত

---

4. Mr. M. R. T. in 'India's Problem of her future Constitution', Pp. 60—7.
5. Ansari ; 'Pakistan—The Problem of India', p. 47.

মুসলিম রাষ্ট্রদ্বয়ের সাম্প্রদায়িক সমস্যার যে কিরূপে সমাধান হইয়া যাইবে তাহা দুর্বোধ্য। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নাই যাহার অধিবাসিগণ অবিমিশ্র এক জাতীয়। প্রত্যেক দেশে স্বাভাবিক নিয়মের বশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সৃষ্ট হইতে বাধ্য, ভারতবর্ষ এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয় এবং ভারত-বিভাগের পর মুসলমান ও অমুসলমান অঞ্চলও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। মুসলমান ও অমুসলমান অঞ্চলের মধ্যে লোক-বিনিময়ের দ্বারা মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করিবার যৌক্তিকতা কি অর্থনীতি, কি মানবিকতা—উভয় দিক দিয়াই অবাস্তব প্রতিপন্ন হইয়াছে। মুসলমান অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আকার কি হইবে তাহা আমরা দেখিয়াছি। পাঞ্জাবের অ-মুসলমান-প্রধান জেলাগুলি মুসলিম অঞ্চল হইতে বিযুক্ত বা তাহার সহিত যুক্ত হইলে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অমুসলমান-সংখ্যা দাঁড়াইবে যথাক্রমে শতকরা ২৫ বা ৩৮। পূর্বাঞ্চলেও বাংলা ও আসামের অ-মুসলমানপ্রধান জেলাগুলি বাদ দিলে অমুসলমান সংখ্যা হইবে শতকরা ৩১ এবং যোগ করিলে হইবে শতকরা ৪৮। আবার উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল যদি একত্র করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের অ-মুসলমানপ্রধান জেলাগুলি বিয়োগ ও যোগ করা অনুযায়ী তাহার মুসলমান জনসংখ্যা হইবে শতকরা ৭১·৫৬ ও ৫৫·২৩। অথচ সমগ্র পাঞ্জাব, আসাম ও বাংলা যদি অমুসলমান অঞ্চল হইতে বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে বৃটিশ ভারতের অমুসলমান অঞ্চলে যে সব মুসলমান রহিয়া যাইবে, মোট জনসংখ্যার তাহারা হইবে শতকরা ১০·৭৫ মাত্র এবং অ-মুসলমানপ্রধান জেলাগুলি অমুসলমান অঞ্চল হইতে বিযুক্ত করিয়া যদি মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহা হইলে তাহারা হইবে সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১৩·২২ ভাগ মাত্র।

বৃটিশ ভারতের মোট ৭৯৩·৯৫ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে বাংলা, আসাম ও পাঞ্জাবে অ-মুসলমানপ্রধান জেলাগুলি যোগ ও বাদ দেওয়া অনুযায়ী ২০২·৯৫ ও ২৯৯·৯৪ লক্ষ, অর্থাৎ শতকরা ২৫·৫৬ ও ৩৭·৭৭ ভাগ মুসলমান অ-মুসলমান অঞ্চলে রহিয়া যাইবে। প্রদেশে প্রদেশে তাহাদের শতকরা হারের তারতম্য ঘটিবে: উড়িষ্যায় হইবে ১·৬৮, যুক্তপ্রদেশে ১৫·৩০ এবং দিল্লীর ক্ষুদ্রায়তন প্রদেশে ৩৩.২২।

পক্ষান্তরে অ-মুসলমানপ্রধান জেলাগুলি মুসলিম অঞ্চলের সহিত যুক্ত অথবা তাহা হইতে বিযুক্ত হইলে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অ-মুসলমান সংখ্যা হইবে ১৩৮.৪০ বা ৬১·৪৬ লক্ষ এবং পূর্বাঞ্চলে দাঁড়াইবে ৩৪০·৬৪ লক্ষ বা ১৩৪·৭৯ লক্ষ, অর্থাৎ অ-মুসলমানপ্রধান জেলাগুলি যোগ ও বাদ দেওয়া ক্রমে উভয় মুসলিম অঞ্চলের মোট অ-মুসলমান সংখ্যা ৪৭৯·০৪ বা ১৯৬.২৫ লক্ষ। সুতরাং মুসলিম ও অ-মুসলিম অঞ্চলের মুসলমান ও অ-মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যা মুসলিম অঞ্চলের সহিত মুসলমানপ্রধান জেলাগুলি যুক্ত হইলে বা তাহা হইতে বিযুক্ত হইলে যথাক্রমে দাঁড়াইবে ৬৮১·৯৯ লক্ষ বা ৪৯৬·১৯ লক্ষ।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, হিন্দু ও মুসলিম অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যার দিক দিয়া বিশেষ শক্তিশালী হইবে। মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অপেক্ষা

৪৮ নং ছক

অমুসলমানপ্রধান প্রদেশসমূহে মুসলমান জনসংখ্যা

(ক) যদি সমগ্র পাঞ্জাব, বাংগলা ও আসাম মুসলমান অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়

প্রদেশ	মোট জনসংখ্যা (লক্ষ)	মুসলমান সংখ্যা (লক্ষ)	মোট জনসংখ্যার সহিত মুসলমান সংখ্যার শতকরা হার
মাদ্রাজ	৪৯৩·৪২	৩৮·৯৬	৭·৯০
বোম্বাই	২০৮·৫০	১৯·২০	৯·২১
যুক্তপ্রদেশ	৫৫০·২১	৮৪·১৬	১৫·৩০
বিহার	৩৬৩·৪০	৪৭·১৬	১২·৯৮
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১৬৮·১৪	৭·৮৪	৪·৬৬
উড়িষ্যা	৮৭·২৯	১·৪৬	১·৬৮
আজমীঢ় মারোয়াড়া	৫·৮৪	০·৯০	১৫·৪০
আন্দামান ও নিকোবর	০·৩৪	০·০৮	২৩·৭০
কুর্গ	১·৬৯	০·১৪	৮·৭৮
দিল্লী	৯·১৮	৩·০৫	৩৩·২২
মোট	১৮৮৮·০১	২০২·৯৫	১০·৭৫

৪৯ নং ছক

অমুসলমানপ্রধান প্রদেশসমূহে মুসলমান জনসংখ্যা

(খ) পাঞ্জাব, বাংগলা ও আসামের অমুসলমানপ্রধান জেলাগুলি মুসলিম অঞ্চল হইতে বিযুক্ত হইলে ঃ

প্রদেশ	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান সংখ্যা	শতকরা হার
বাংলা	১৯৩·৪২	৪২·৯৫	২২·২১
আসাম	৭০·৮৯	১৫·৫০	২১·৮৯
পাঞ্জাব	১১৫·৪৯	৩৮·৫৪	৩৩·৩৭
মোট	৩৭৯·৮০	৯৬·৯৯	২৫·২৭
অন্যান্য অমুসলমানপ্রধান প্রদেশসমূহ	১৮৮৮·০১	২০২·৯৫	১০·৭৫
সর্বমোট	২২৬৭·৮১	২৯৯·৯৪	১৩·২২

৫০ নং ছক

মুসলিম প্রদেশসমূহে মুসলমান জনসংখ্যা

প্রদেশ	অমুসলমানপ্রধান জেলাগুলি বাদ দিলে			অমুসলমানপ্রধান জেলাগুলি যোগ দিলে		
	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান-সংখ্যা	শতকরা হার	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান-সংখ্যা	শতকরা হার
বাংলা	৪০৯·৬৫	২৮৭·১০	৭০·০৮	৬০৩·০৬	৩৩০·০৫	৫৪·৭৩
আসাম	৩১·১৬	১৮·৯২	৬০·৭১	১০২·০৫	৩৪·৪২	৩৩·৭৩
পাঞ্জাব	১৬৮·৭০	১২৩·৬৩	৭৩·২৫	২৮৪·১৯	১৬২·১৭	৫৭·০৭
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ...	৩০·৩৮	২৭·৮৯	৯১·৭৯	৩০·৩৮	২৭·৮৯	৯১·৭৯
সিন্ধু	৪৫·৩৫	৩২·০৮	৭০·৭৫	৪৫·৩৫	৩২·০৮	৭০·৭৫
বেলুচিস্থান	৫·০২	৪·৩৯	৮৭·৫০	৫·০২	৪·৩৯	৮৭·৫০
মোট ...	৬৯০·২৬	৪৯৪·০১	৭১·৫৬	১০৭০·০৫	৫৯১·০০	৫৫·২৩

অ-মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হইবে অনেক গুণে সংখ্যাধিকঃ মুসলমানপ্রধান জেলাগুলির যোগ ও বিয়োগ ক্রমে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে তাহারা হইবে শতকরা ২৫ বা ৩৮ ভাগ এবং পূর্বাঞ্চলে শতকরা ৩১ বা ৪৮ ভাগ; অথচ মুসলিম ও অ-মুসলিম অঞ্চলে মুসলমান জনসংখ্যা হইবে সেক্ষেত্রে শতকরা ১০.২২ বা ১০.৭৫ ভাগ।

কিন্তু অ-মুসলিম অঞ্চলের মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় একদিকে বাংলা হইতে পাঞ্জাব ও অপরদিকে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বহু বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকার ফলে কোন অঞ্চলেই বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারিবে না; পক্ষান্তরে অ-মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় উভয় মুসলিম অঞ্চলের স্বল্পায়তন সীমার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইবার দরুণ নিজেদের স্বত্ব সাব্যস্ত ও সুবিধা আদায়ের জন্য অধিকতর শক্তি প্রয়োগে সমর্থ হইবে।

মুসলমান ও অ-মুসলমান অঞ্চলের অধিবাসী-বিনিময় যদি বিরাট আকারে সম্ভব হয়, তবেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের বিলোপ সম্ভবপর হইবে। এই অধিবাসী-বিনিময় আবার দুইপ্রকার হইতে পারে—বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছাসম্মত। মুসলিম ও অ-মুসলিম অঞ্চল হইতে লক্ষ লক্ষ নরনারী যে স্বেচ্ছায় স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে সম্মত হইবে—একথা কল্পনা করাও অসম্ভব। বল্কানে এ ব্যবস্থার পরীক্ষা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতায় পরিণত হইয়াছেঃ সেখানে দেখা গিয়াছে যে, লোকজন তাহাদের পুরাতন পরিবেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মাটীর প্রতি মমতা অত্যন্ত অধিক, কাজেই কেবলমাত্র অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হইবার জন্য তাহাদের বহুদিনের বাসভূমি তাহারা যে ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইবে না—একথা নিশ্চিতরূপে ধরিয়া লওয়া যায়। খিলাফৎ আন্দোলনকালীন হিজরতের সময় মুসলমানগণ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, বিপুল জনসংখ্যার স্থান ত্যাগ আশা করিবার পক্ষে তাহা আদৌ উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কেবলমাত্র দূরত্বের কথাই এক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়, পরিবেশ, ভাষা, আবহাওয়া, জীবনধারণ-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ের পার্থক্যের কথা স্মরণ করিয়া এ ব্যবস্থা শুধু অনভিপ্রেত বলিয়াই মনে হইবে না, অসম্ভবরূপে অনুমিত হইবে। তাহার পর ব্যয়বাহুল্যের কথাঃ এক বিরাট জনসংখ্যা যে দেশে পুরুষানুক্রমে বসবাস করিয়া আসিতেছে, সেখান হইতে তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া নূতন পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করিতে গেলে যে ব্যয়-বিধান করিতে হইবে তাহা মুসলিম ও অ-মুসলিম অঞ্চল উভয়ের পক্ষেই দুর্বহ; এতদ্ব্যতীত এই ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করিতে গেলে বিষয়-সম্পত্তির দিক দিয়া যে ক্ষতি হইবে তাহাও বিশেষভাবে বিবেচ্য; অবশ্য সে ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি সচেষ্ট হইবে, কিন্তু তাহা করিতে গেলে যে ব্যয়বাহুল্যের সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা বহন করিবার সামর্থ্যও কোন রাষ্ট্রের রহিবে না। ইহার জন্য দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইবে অপরিসীম; কাজেই কি অর্থনীতি, কি শাসন-ব্যবস্থা সকল দিক দিয়াই এ পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইবার অযোগ্য। আবার বিনিময়-ব্যবস্থা যদি বাধ্যতামূলক হয়, তাহা

হইলে এইসব অসুবিধা শতগুণ বর্ধিত হইবে, কারণ তাহাদিগকে স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হইবে পুলিশ প্রহরীর অধীনে; এ বিড়ম্বনা কল্পনাতীত। গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে কয়েক সহস্র অধিবাসী বিনিময়ের দৃষ্টান্ত যাঁহারা উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের বিনিময়যোগ্য জনসংখ্যা ও অতিক্রমযোগ্য দূরত্বের কথা বিস্মৃত হনঃ এখানকার বিনিময়যোগ্য জনসংখ্যা হইবে ৬·৮ কোটি, অন্ততঃপক্ষে পাঁচ কোটি এবং তাহাদিগকে যে ব্যবধান অতিক্রম করিতে হইবে তাহাও বিরাট। এই ব্যবস্থা কার্যকরী করিতে গেলে যে ব্যয়-বাহুল্যের প্রয়োজন, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ তাহা বহন করিতে যদি সমর্থও হয়, তথাপি তাহার গুরুভারে বহুদিন পর্যন্ত তাহাদিগকে পঙ্গু হইয়া রহিতে হইবে।

লীগ-প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্ম, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা-সংক্রান্ত সকল স্বার্থ ও অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে কার্যকরী ও নির্দেশাত্মক সমস্ত রকম রক্ষা-ব্যবস্থার বিধান করা হইবে।

কিন্তু মুসলিম ও অমুসলিম স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ যদি তাহাদের আপন আপন প্রয়োজন ও পছন্দ অনুযায়ী স্বতন্ত্র শাসনতন্ত্র রচনা করে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে এইরূপ রক্ষা-ব্যবস্থার বিধান রাখিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিবে কে? মনে করুন, স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি গঠিত হইবার পর তাহাদের মধ্যে কোন একটী তাহার নিজস্ব শাসনতন্ত্রে এইরূপ রক্ষাব্যবস্থার বিধান রাখিতে অস্বীকৃত হইল, সেক্ষেত্রে তাহাকে বাধ্য করা যাইবে কি উপায়ে? ধরিয়া লওয়া যাক, এই সব রক্ষা-ব্যবস্থা প্রথমে বিহিত হইল, কিন্তু পরে তাহা এমনভাবে পরিবর্তিত হইল যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থের পক্ষে তাহা হইয়া দাঁড়াইল ক্ষতিকর, কিম্বা সম্পূর্ণরূপে সেগুলি প্রত্যাহৃত হইল, সেক্ষেত্রেই বা তাহা পুনঃপ্রবর্তনের দায়িত্ব লইবে কে? স্বীকার করিয়া লওয়া যাক, বিহিত রক্ষাব্যবস্থাগুলি শাসনতন্ত্রের অঙ্গীভূত রহিয়া গেল, কিন্তু সেগুলি কার্যকরী হইল না, অথবা যদিই বা হইল, তাহাদের প্রয়োগের পরিধি হইল সঙ্কুচিত, তখন একটী স্বাধীন রাষ্ট্র অপর একটী স্বাধীন রাষ্ট্রের উপর তাহা যথাযথ পালনের দায়িত্ব আরোপ করিবে কেমন করিয়া? কারণ আগেই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, প্রত্যেকটী রাষ্ট্র হইবে স্বাধীন এবং উভয়ের উপরে এমন কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব রহিবে না—যে শাসনতন্ত্র বিধিবদ্ধ ধারাগুলি তাহাদিগকে পালন করিবার জন্য বাধ্য করিতে সক্ষম। শাসনতন্ত্রসম্মত ও নির্দেশাত্মক শব্দ দুইটির প্রয়োগ দ্বারা অবস্থার আদৌ উন্নতি সাধিত হইবে না, কারণ না রহিবে সে নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য করিবার মত কর্তৃত্ব, না রহিবে তাহাদের শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের পথে কোন বাধা।

জাতিসঙ্ঘও তাঁহাদের চুক্তিপত্রের সংখ্যালঘুসম্প্রদায়-সংক্রান্ত ধারায় এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু সে দিক দিয়া তাঁহাদের অর্জিত কৃতকার্যতার পরিমাণ দেখিয়া বাহিরের কোন কর্তৃত্বের বলপ্রয়োগের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর রিতে ভরসা হয় না। তাহার পর 'প্রতিভূ প্রথা'র কথাঃ দেখা গিয়াছে সে প্রথাও কার্যকরী নয়। এক ভুলের দ্বারা অন্য ভুলের সংশোধন অসম্ভব।

দাঁতের বদলে দাঁত ও চোখের বদলে চোখ লইবার পুরাতন প্রথা মানিয়া লইলেও, একের অপরাধে অন্যের দাঁত-চোখ উৎপাটন করিবার নীতি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ একের পাপের ফল অন্যকে ভোগ করিতে বাধ্য করা কোনরূপ নীতির দ্বারাই সমর্থিত নয়। ব্যষ্টি সম্বন্ধে যদি ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, সমষ্টি সম্বন্ধে সে নীতি আরও অধিকতরভাবে প্রযোজ্য: এক সম্প্রদায় লোক কিছু করিয়া বা করিতে না পারিয়া কোন ভুল করিল, অথচ তাহারই জন্য বিশিষ্ট একটি উপায়ে ভগবানের উপাসনা করা ব্যতীত অন্য সর্বদিক দিয়া তাহাদের সহিত সামঞ্জস্য, সম্পর্ক ও পরিচয়হীন আর একসম্প্রদায় লোককে দণ্ডিত, নিপীড়িত ও নিগৃহীত করা মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোনরূপ নীতির দ্বারাই অনুমোদিত হইবার যোগ্য নয়। জনৈক খ্যাতনামা মুসলমান ভদ্রলোকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিতে গেলে, 'প্রতিভূ-প্রথা কার্যকরী হইবে না এবং যদি হয়, তাহা হইলে রাজনীতির ভিত্তি সভ্যতার স্তর হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া বর্বরতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।'[৬] পাকিস্থানপন্থিগণ যাহাই বলুন না কেন, কোন মুসলমান বা অ-মুসলমান প্রকৃতিস্থ চিত্তে বর্বরতার যুগে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইবেন বলিয়া আমি অন্ততঃ বিশ্বাস করি না।

অত্যাচারকারী ও অত্যাচারী উভয়েই এক সাধারণ যৌথ রাষ্ট্রের সভ্য হইলে এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার ও সুবিচারসম্পন্ন হইতে বাধ্য করা যেমন সহজ হইবে, তাঁহারা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হইলে তাহা হইবে বহুগুণে জটিল ও দুরূহ। এই সংকট সমুপস্থিত হইলে তাহা সমাধানের একটিমাত্র শান্তিপূর্ণ উপায় আছে এবং তাহা হইতেছে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ। তাহাও যদি ব্যর্থ হয়, তখন যুদ্ধই হইল সর্বশেষ পন্থা—সে যুদ্ধ অর্থনৈতিক অনুশাসনও হইতে পারে, আবার সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপও গ্রহণ করিতে পারে। জনসাধারণ যতক্ষণ না উপলব্ধি করিবে যে, সংগ্রাম ছাড়া গত্যন্তর নাই ততক্ষণ, অভিযোগ গুরুতর হইলেও, তাহাদিগকে যুদ্ধে নিয়োজিত করা সম্ভব হইবে না। তুচ্ছ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া যুদ্ধ ঘোষিত হইতে পারে না। গুরুতররূপে আহত না হইলে কোন রাষ্ট্রই যুদ্ধ ঘোষণার ঝুঁকি লইতে সম্মত হইবে না এবং তাহার পক্ষে বা বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার সময় দেশের দূরতম প্রান্তবর্তী সহধর্মী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ অপেক্ষা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের জনসাধারণের স্বার্থই সমধিক গুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এসব আলোচনা কেবলমাত্র অবাস্তব নীতিকথা নয়। ভারতের বহির্দ্বার প্রান্তেই একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র রহিয়াছে, কিন্তু মুসলমানগণ এখানে অত্যাচারিত—এই হেতুতে ভারতের সহিত তাহারা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে—ইতিহাস এমন কথা বলে না। দীর্ঘকালব্যাপী বৃটিশ শাসনাধীনে অথবা কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টসমূহের মাত্র সাতাশ মাসব্যাপী স্বল্পকালস্থায়ী শাসনকালে মুসলমানদের উপর যখন তথাকথিত উৎপীড়ন চলিতেছিল, এই সব মুসলিম রাষ্ট্রের শান্ত ও স্থির বক্ষে উত্তেজনার ক্ষুদ্র

---

6. Sir Sultan Ahmed: 'A Treaty between India and United Kingdom', p. 84.

বীচি-বিক্ষোভ পর্যন্ত লক্ষিত হয় নাই। এমনকি, বাংলা ও সিন্ধুর লীগ মন্ত্রিসভা পর্যন্ত কংগ্রেসের তথাকথিত দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে ক্ষীণতম প্রতিবাদ পর্যন্ত উত্থাপন করেন নাই। দুইটি নূতন মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হইলেই মুসলমানগণের অবস্থার এমন আমূল পরিবর্তন সাধিত হইবে যে, অমুসলমান অঞ্চলে তাহাদের সুবিচার প্রাপ্তি সম্বন্ধে সংশয়ের আর কোন কারণ রহিবে না—এরূপ ধারণা করা নিছক স্বপ্নবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। ধর্মনির্বিশেষে মানবজীবন মনুষ্যচরিত্রের কতগুলি প্রধান বৈশিষ্ট্য ও মানবীয় কতগুলি সার্বজনীন নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সর্বত্র ও সকল সময় এই বৈশিষ্ট্য ও নীতিগুলির উপরেই নির্ভর করিতে হয়। মুসলমানদিগকে নিগৃহীত ও নিপীড়িত করা ছাড়া অমুসলমানদের আর কিছু করণীয় নাই—একথা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা যেমন মুসলমানদের পক্ষে কল্যাণকর নয়, অমুসলমানগণেরও তেমনি বিশ্বাস পোষণ করা কর্তব্য যে, মুসলমানগণ তাহাদের প্রতি অন্যায় বা অবিচার করিতে অক্ষম। একদিকে স্পষ্টাক্ষরে অথবা প্রকারান্তরে বলা হয় যে, মুসলমানগণ অমুসলমানদের উপর নির্ভর করিতে পারে না এবং তাহা পারে না বলিয়াই, কোনপ্রকার কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট স্বীকার করিয়া লইতে তাহারা অক্ষম—তাহার ক্ষমতা যতই সংযত ও অধিকার-সীমা যতই সঙ্কুচিত হোক না কেন; অপরদিকে অমুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া পরামর্শ দেওয়া হয়, মুসলমানগণ তাহাদের প্রতি সুবিচারসম্পন্ন হইবে—এ বিশ্বাস যেন তাহারা রাখে—এই উভয়বিধ উক্তির যুগপৎ উচ্চারণের মধ্যে একটা স্থূল অবিবেচনা বিদ্যমান। বিশ্বাস হইতে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়—একথা সত্য হইলে, অবিশ্বাস হইতে অবিশ্বাসের জন্ম—একথাও সমভাবে সত্য; আপনারা অ-মুসলমান-দিগকে সন্দেহ করিবেন, পদে পদে তাহাদের সততা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিবেন, অথচ আশা করিবেন, তাঁহারা আপনাদের প্রতি অনুরূপ ব্যবহার না করুন—ইহা কি ন্যায় ও অধিকার সঙ্গত? স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-সমস্যার সমাধান হইবে না, বরঞ্চ সমস্যা তাহার দ্বারা আরও জটিলতর হইবে। ইহার ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়—তাঁহারা মুসলমান হোন অথবা অমুসলমানই হোন, হইবেন আরও অসহায়, আত্মরক্ষায় আরও অক্ষম এবং তাঁহাদের অধিকার স্বীকৃত ও সাব্যস্ত করিবার পক্ষে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ আহ্বান করিবার দিক দিয়া আরও দুরবস্থাগ্রস্ত।

(৩) ও (৪) পাকিস্থান ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব উভয় সীমান্তেরই আত্মরক্ষা-সমস্যার সমাধানেও অক্ষম। বলা হইয়াছে, যেহেতু উপজাতিসমূহ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অপর প্রান্তের অধিবাসিগণ সকলেই মুসলমান, সেইজন্য সে অঞ্চলে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলেই অমুসলমানদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় জেহাদের উৎসাহ তাহাদের উবিয়া যাইবে। এই আশার পশ্চাতে ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি বা সমর্থন নাই। প্রস্তাবিত মুসলিম রাষ্ট্রই ভারতের প্রথম মুসলমান রাষ্ট্র নয়। বস্তুতঃ কুতুবুদ্দীন আইবাক কর্তৃক দিল্লীর সিংহাসন অধিকৃত হইবার পর হইতে শিখগণ কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে স্বাধীন রাজ্য গঠনের সময় পর্যন্ত ভারতে মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বরাবর রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু

তাহা সত্ত্বেও দীর্ঘ ছয়শত বৎসর ধরিয়া ঐ পথ দিয়াই মুসলিম আক্রমণ পরিচালিত হইয়াছে মুসলমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই। কারণ, হিন্দু রাজ্যের অস্তিত্ব পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে কোন দিন ছিল না। আলাউদ্দিনের শাসনকাল হইতে ভারতের প্রত্যেক মুসলমান সুলতানকে ঐ পথ দিয়াই মুসলিম আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সেই কারণে আলাউদ্দিন সীমান্তবর্তী দুর্গ ও রক্ষাব্যবস্থাসমূহ দৃঢ়তর ও অধিকতর শক্তিশালী করিতে বাধ্য হন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মুসলমান আক্রমণকারী-গণ বার বার ঐ পথেই হানা দিয়াছে। কাজেই সুদীর্ঘ মুসলমান শাসনকাল ব্যাপিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্বন্ধে ভারতীয় মুসলমান সুলতানগণের ইহাই ছিল সামরিক নীতি। তৈমুর, বাবর, নাদির শাহ ও আহম্মদ শা আবদালীর ইতিহাসবিদিত ভারত আক্রমণের প্রত্যেকটিই ছিল মুসলমান আক্রমণ এবং প্রত্যেকটি পরিচালিত হইয়াছিল মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে; কাজেই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হইবামাত্র ঐ পথ দিয়া সমস্ত আক্রমণ-আশঙ্কা তিরোহিত হইবে—এইরূপ মধুর ও মনোরম আশা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দ্বারা সমর্থিত নয়। অবশ্য বর্তমান কালের আক্রমণ পূর্বের ন্যায় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়; কাজেই তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে হইবে না অন্য কারণে, কেবলমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দ্বারাই আক্রমণ নিরস্ত করা সম্ভব নয়।

বহিরাগত মুসলমান আক্রমণকারী ও ভারতীয় মুসলমান সুলতানগণই যে কেবলমাত্র পরস্পরের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন তাহা নয়, মুসলমানগণ রাজ্য, সিংহাসন ও রাজশক্তি হস্তগত করিবার জন্য আপনাদের মধ্যেও যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত হইয়াছেন। মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও জাতিগত সকল পার্থক্য বিলুপ্ত হইবে—ইহাই যদিও ইসলামের মহান শিক্ষা, তথাপি সে শিক্ষার ফলে মুসলমানগণ আত্মঘাতী সংগ্রাম হইতে বিলুপ্ত হইতে সক্ষম হন নাই; অবশ্য ইসলামের ন্যায় খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। দূরবর্তী অতীতের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়াও আমরা বলিতে পারি, এই সেদিন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েও আরবগণ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। মুসলমান সমাজের খলিফারূপে তুরস্কের সুলতানের পদ ও প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ভারতীয় মুসলমানগণ যখন প্রাণান্ত প্রয়াসে তৎপর, আরবগণ তখন তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। বর্তমান পারস্যের স্রষ্টা রেজা শা পহলবীকে তাঁহার স্বদেশবাসী ও স্বধর্মী মুসলমানগণের সহায়তাপুষ্ট পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের চক্রান্তের ফলে রাজ্যচ্যুত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট সময় নির্বাসনে অতিবাহিত করিতে হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে আফগানিস্থান দুইটি বিদ্রোহ প্রত্যক্ষ করিয়াছে; একটির ফলে আমানুল্লার পতন ও বাচ্চা-সাক্কোর অভ্যুত্থান এবং অপরটির ফলে বাচ্চা-ই-সাক্কোর অপসারণ ও নাদিরশাহের আবির্ভাব, বলা বাহুল্য, ইঁহাদের প্রত্যেকেই মুসলমান। এমনকি, বর্তমানকালেও তুরস্ক, পারস্য ও আফগানিস্থানকে বাদ দিয়া বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রগুলিকে একত্রীভূত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই সব ঘটনা হইতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম বিভিন্ন দেশ ও সংহতি দূরে থাক, এমন কি একই দেশস্থ মুসলমানগণকে ঐক্যবদ্ধ করিতে সক্ষম হয় নাই;

অবশ্য কেবলমাত্র মুসলমান কেন, প্রত্যেক জাতিই সংগ্রাম ও শোণিতপাত পরিহার করিয়া পরম সৌহার্দ্যের সহিত প্রতিবেশীর মত পাশাপাশি বাস করিতে শিক্ষা করুক—এ আশা সকলেই পোষণ করে; কিন্তু তাই বলিয়া মুসলিম রাষ্ট্রগুলি—কেবলমাত্র ধর্মে মুসলমান বলিয়াই পরস্পরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবে না—ইহা ভরসা নয়, ভরসার ভাণ মাত্র।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতবর্ষ আক্রমণ সম্বন্ধে বক্তব্য এই পর্যন্ত; পূর্বাঞ্চল সম্বন্ধে এ অজুহাত দর্শিত হইবারও অবকাশ নাই এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অপেক্ষা এই পথে আক্রমণ আশঙ্কা যে অল্প—এমন কথাও বলা চলে না। এই অঞ্চলে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের ফলে অমুসলমান ভারতকে তাহার প্রাকৃতিক রক্ষা-ব্যবস্থার সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইবে, অথচ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অজুহাত সৃষ্ট সুবিধালাভে মুসলিম রাষ্ট্র উপকৃত হইবে না।

সুতরাং এ যুক্তি শুধু উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। আত্মরক্ষা-সমস্যার সমাধানের অনুকূলে প্রদর্শিত যুক্তি অ-মুসলমান ভারতের আত্মরক্ষা-সমস্যাকে জটিলতর ও দুরূহতর করিয়া তুলিবে। ভারতের অমুসলমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও ধর্মগত জেহাদ ঘোষণার পক্ষে বহির্ভারতীয় মুসলমানগণের যদি কোন আগ্রহ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতের প্রাকৃতিক সীমার মধ্যে মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হইবার ফলে সে আগ্রহ আরও তীব্রতরই হইবে, কারণ অমুসলমান ভারতকে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের প্রাকৃতিক ব্যবধানের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়া, দেশরক্ষার জন্য উপায়ান্তরের উপর যথাসাধ্য নির্ভর করিতে বাধ্য হইতে হইবে। পাকিস্থানের অনুকূলে প্রদর্শিত এই যুক্তির যদি কোন ভিত্তি থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে লীগ-ঘোষিত পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার সর্বশেষ পরিণতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অমুসলমানগণ যদি সন্দেহ করেন যে, দেশের স্বাভাবিক রক্ষা-ব্যবস্থা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিবার পশ্চাতে নিশ্চয় কোন দুরভিসন্ধি রহিয়াছে এবং সেই সন্দেহের বশবর্তী হইয়া ভারত-ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাবে তাঁহারা যদি কোনক্রমেই সম্মত না হন, সে অবিশ্বাস ও অসম্মতি তাঁহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গতই হইবে।

'নিরাপদ সীমান্ত অপেক্ষা নিরাপদ সৈন্যবাহিনী উৎকৃষ্টতর'৭ ডাক্তার আম্বেদকরের এই তত্ত্বের স্বপক্ষে অনেক কথাই বলা যাইতে পারে।

আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের আকার ও প্রকার এবং তাহাদের উদ্ভাবনজনিত নবপরিকল্পিত রণকৌশল সম্মুখে রাখিয়াই দেশরক্ষা ব্যবস্থার প্রশ্ন বিচার করিতে হইবে। পুরাতন রণনীতির দিক দিয়া বিচার করিলেও, ভারতের অবশিষ্ট অংশের রক্ষণীয় বিস্তীর্ণ উপকূলভাগ বাদে মুসলিম রাষ্ট্রকে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে সুদীর্ঘ উপকূল-সীমা রক্ষা করিতে হইবে। এইসব কথা ভাবিতে গেলে মুসলমান ও অ-মুসলমান রাষ্ট্রগুলির রক্ষা-ব্যবস্থার ব্যয়ভার বহন করিবার পক্ষে আর্থিক সঙ্গতির প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হয়। তাহাদিগকে যে কেবলমাত্র বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থাই করিতে হইবে তাহা নয়, ভারতের বর্ত্তমান

7. Dr. B. R. Ambedkar: 'Thoughts on Pakistan', p. 95.

চতুঃসীমার মধ্যে মুসলমান ও অ-মুসলমান রাষ্ট্রসমূহকে পরস্পরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে হইবে। সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ না করিয়াও বলিতে পারা যায় যে, ভারত খণ্ডিত হইলে মুসলমান ও অ-মুসলমান উভয় রাষ্ট্রেরই আর্থিক সংগতি যেমন একদিকে হীনতর হইবে, অপরদিকে তাহাদের আত্মরক্ষার ব্যয়ভারও বৃদ্ধি পাইবে প্রভূত পরিমাণে এবং তাহার ফল হইবে এই যে, কোন অঞ্চলই তাহার অধিবাসিগণের দুঃখ-দুর্দশা দুর্বহ পরিমাণে বর্ধিত না করিয়া তাহার সংগতির অতিরিক্ত ব্যয় সংকুলানে সমর্থ হইবে না। রাজস্ব ও শিল্প সম্বন্ধীয় আলোচনার সময় এই দুইটি বিষয়ে মুসলিম ও অ-মুসলিম রাষ্ট্রের অবস্থা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি এবং তাহা হইতে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, খণ্ডিত ভারতের উভয় অঞ্চলই যদিও শিল্প ও রাজস্বের দিক দিয়া অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তথাপি মুসলমান রাষ্ট্রগুলির তুলনায় অ-মুসলমান অঞ্চলের অবস্থা রহিবে অধিকতর শক্তি ও সংগতি সম্পন্ন। আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা সম্পন্ন করিবার পক্ষে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের না রহিবে রাজস্ব সম্বন্ধীয় সামর্থ্য, না রহিবে শিল্পসংক্রান্ত সংগতি। সে যাহাই হোক, 'ভারতীয় মাত্রেরই এদিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন, যেন তাহার রক্ষাব্যবস্থা বিশৃঙ্খল ও বহুমুখী না হয়, বহু বিস্তীর্ণ হইবার ফলে যেন সে তাহার কার্যকারিতা না হারায়, বহু ব্যয়সাপেক্ষ হইবার দরুণ তাহা যেন দুর্বহ না হয়; আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে তাহার অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে।'[৮]

আত্মরক্ষা-সমস্যার এমন আরও একটি দিকে প্রোফেসার কুপল্যাণ্ড অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন যাহা সকলের পক্ষে, বিশেষ করিয়া পাকিস্থান-পন্থীদের পক্ষে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য। ভারতব্যবচ্ছিন্ন হইলে মুসলমান ও অ-মুসলমান উভয় রাষ্ট্রকেই আপন আপন স্থল, বিমান ও নৌবাহিনী রাখিতে হইবে এবং তাহা গঠিত হইবে স্ব স্ব অঞ্চলের অধিবাসিগণকে লইয়া। তাহার ফলে সৈন্যবাহিনীর গঠনপদ্ধতি প্রভূত পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। ডাক্তার আম্বেদকর দেখাইয়াছেন, ১৮৫৬ সালে, সিপাহী-বিদ্রোহের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর সমগ্র সৈন্যসংখ্যার মধ্যে উত্তর-পূর্বভারত, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের অধিবাসী ছিল শতকরা ৯০ ভাগ এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসী-সংখ্যা শতকরা দশজন মাত্র। সিপাহী-বিদ্রোহ দমিত হইবার ঠিক অব্যবহিত পরেই ১৮৫৮ সালে সদ্য সমাপ্ত বিদ্রোহের ফলে সৈন্য সংগ্রহের নীতি পরিবর্তিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর গঠনেও পরিবর্তন দেখা গেলঃ তখন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে সংগৃহীত সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়াইল শতকরা ৪৭, নেপাল, গাড়োয়াল ও কুমায়ুন শতকরা ৬ এবং উত্তর-পূর্বভারত, যুক্তপ্রদেশ ও বিহার শতকরা ৪৭ ভাগ। 'সামরিক ও অ-সামরিক ভেদে শ্রেণী-বিভাগের পদ্ধতি নীতিরূপে সর্বপ্রথম গৃহীত হয় ১৮৭৯ সালে, পরবর্তীকালে লর্ড রবার্টস বিশেষভাবে তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং লর্ড কিচেনার কর্তৃক তাহাই ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে সেনাসংগ্রহের মূলনীতিরূপে

8. Sultan Ahmed, op. cit. p. 87.

স্বীকৃত হয় বটে, কিন্তু কার্যতঃ সেনাদলে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসিগণের সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত তাহার কোনই সংস্রব ছিল না।' ১৯৩০ সালে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসিগণের শতকরা হার আরও বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইল ৫৮·৫, নেপাল, গাড়োয়াল ও কুমায়ুন ২২, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের শতকরা হার আরও হ্রাস পাইয়া নামিয়া আসিল ১১তে এবং ব্রহ্মদেশ অবশিষ্ট ৩ ভাগ।'[9]

ডাক্তার আম্বেদকরের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত ছকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর গঠন-পদ্ধতিতে সাম্প্রদায়িক অনুপাতের হার কিভাবে পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে।

৫১ নং ছক

অঞ্চল ও সম্প্রদায়	শতকরা হার ১৯১৪	শতকরা হার ১৯১৮	শতকরা হার ১৯১৯	শতকরা হার ১৯৩০
১। পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও কাশ্মীর	৪৭·০	৪৬·৫	৪৬·০	৫৮·৫
(২) শিখ	১৯·২	১৭·৪	১৫·৪	১৩·৫৮
(২) পাঞ্জাবী মুসলমান	১১·১	১১·৩	১২·৪	২২·৬
(৩) পাঠান	৬·২	৫·৪২	৪·৫৪	৬·৩৫
২। নেপাল, কুমায়ুন ও গাড়োয়াল	১৫·০	১৬·৬	১২·২	১৬·৪
গুর্খা	১৩·১	১৬·৬	১২·২	১৬·৪
৩। উত্তর ভারত	২২·০	২২·৭	২৫·৫	১১·০
(১) যুক্ত প্রদেশীয় রাজপুত	৬·৪	৬·৮	৭·৭	২·৫৫
(২) হিন্দুস্থানী মুসলমান	৪·১	৩·৪২	৪·৪৫	০
(৩) ব্রাহ্মণ	১·৮	১·৮৬	২·৫	০
৪। দক্ষিণ ভারত	১৬·০	১১·৯	১২·০	৫·৫
(১) মারাঠী	৪·৯	৩·৮৫	৩·৭	৫·৩৩
(২) মাদ্রাজী মুসলমান	৩·৫	২·৭১	২·১৩	০
(৩) তামিল	২·৫	২·০	১·৬৭	০
৫। বর্মী	—	নগণ্য	১·৭	৩·০

9. Ambedkar, op. cit. p. 70.

'উল্লিখিত হিসাব হইতে দেখা যায়, পাঞ্জাবী মুসলমান ও পাঠানের সংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আরও দেখা যায় যে, সংখ্যানুপাতিক হিসাবে শিখগণ তাহাদের অধিকৃত প্রথম স্থান হইতে তৃতীয় স্থানে নামিয়া আসিয়াছে; রাজপুতগণও অধঃপতিত হইয়াছে চতুর্থ স্থানে এবং যুক্তপ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ, মাদ্রাজী মুসলমান ও তামিলদিগকে একেবারে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে।'১০

১৯৩০ সালের ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাতের হার অনুযায়ী বিশ্লেষণ করিয়া ডাক্তার আম্বেদকর দেখাইয়াছেন, গুর্খাদিগকে বাদ দিলে ভারতীয় পদাতিক বাহিনীতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৬ ও তাহাদিগকে গণনা করিলে শতকরা ৩০। দিল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চলের শতকরা ১ ভাগ বাদে পদাতিক বাহিনীর প্রায় সমস্ত মুসলমান এবং অশ্বারোহীদলের মুসলমান সৈনিকগণের শতকরা প্রায় ১৯ ভাগই সংগৃহীত হইত পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে।১১ কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যগণ পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করা সত্ত্বেও পরবর্তীকালের হিসাব গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করেন নাই। পাঞ্জাবী মুসলমানরূপে স্যার সিকন্দর হায়াৎ খাঁ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রিক পরিকল্পনার মুখবন্ধে প্রস্তাব করেন, ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী যেভাবে গঠিত ছিল তাহার কোনরূপ পরিবর্তন করা চলিবে না এবং ছাঁটাই যদি কোন কারণে করিতেই হয়, সেক্ষেত্রেও তৎকালীন সাম্প্রদায়িক অনুপাত অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে, যুদ্ধ বা অন্য কোনরূপ জরুরী কারণ ব্যতিরেকে এই নীতির ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না। ইহা স্বচ্ছন্দে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, স্যার সিকন্দর এই প্রস্তাব অহেতুক উত্থাপন করেন নাই। ১৯৩০ সালে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর শতকরা ১৩·৫৮ ভাগ ছিল শিখ এবং মুসলমান ছাড়াও এই সমস্ত শিখ সৈন্য সংগৃহীত হইত পাঞ্জাব হইতে। ভারত বিভাগের অব্যবহিত ও অনিবার্য ফল হইবে ইহাই যে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর এই বিরাট অংশ অ-মুসলমান ভারতের সেনাবাহিনী হইতে বহিষ্কৃত হইবে এবং তখন মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্ব হইবে সাধ্যমত সেনাবাহিনীতে এই অংশকে আত্মস্থ করা। সামরিক ও অ-সামরিক ভেদে কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগের এই পদ্ধতি বিলুপ্ত করিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে দাবী উত্থিত হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, এই বিভেদ কোনরূপ বাস্তব বা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; সিপাহী-বিদ্রোহে গৃহীত অংশের তারতম্য অনুযায়ী পাঞ্জাবকে পুরস্কৃত ও যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারকে দণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। কাজেই ভারত যদি খণ্ডিত নাও হয়, তাহা হইলেও কোন জাতীয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষেই এই অনুপাত রক্ষা করিয়া চলা অসম্ভব, প্রদেশসমূহের মধ্যে আনুপাতিক হার তাহাকে ন্যায় ও বিচার সংগতভাবে বণ্টন করিতে হইবে। তাহা হইলেও ভারত-বিভাগের পর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠিত হইলে এই ব্যতিক্রম যেরূপ ব্যাপক ও আকস্মিক হইবে, এক্ষেত্রে তাহা তেমন হইবে না। অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড সাহেব বলিয়াছেন, ১৯৩৯ সালে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে

10. Ibid., p. 75.
11. Ibid., p. 76.

মুসলমান সৈন্যের শতকরা হার ছিল এক-তৃতীয়াংশেরও কিছু বেশী। বর্তমানে তাহা কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ৩০·৮ ভাগ; ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরও হ্রাস করিয়া যদি শতকরা পঁচিশও করা হয়, তাহা হইলেও পাঞ্জাবের সাধারণ জীবনযাত্রার মান ক্ষুণ্ণ হইবে, কারণ পাঞ্জাবী সৈন্যদিগকে সামরিক বিভাগের বৃত্তি ও বেতনের উপরেই সমধিক পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়।১২ এখনই যদি এই অবস্থা হয়, তাহা হইলে পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হইবার পর হিন্দুস্থান সেনাবাহিনীতে ইহাদের প্রবেশের পথ যখন একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে, তখন অবস্থা যে আরও কতগুণ শোচনীয় হইবে, তাহা অনুমানসাপেক্ষ।

অবশ্য এ যুক্তি দেখান যাইতে পারে যে, এখন যাহারা ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীতে নিযুক্ত হইতেছে, তখন তাহারা স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের অধীনে নিযুক্ত হইবে। হয়তো তাহা হইতেও পারে, কিন্তু তথাপি ক্ষুদ্রায়তন মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে এই সমস্ত কর্মচ্যুত সৈনিকের স্থান সংকুলানের মত বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করা একেবারে অসম্ভব না হইলেও, দুঃসাধ্য হইবে সন্দেহ নাই। আবার কর্মচ্যুত প্রত্যেকটি সৈনিকের জন্য সংস্থান করা যদি সম্ভবও হয়, সেক্ষেত্রেও বাহির হইতে কোন সাহায্যের প্রত্যাশা না করিয়া তাহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার একা মুসলিম রাষ্ট্রকেই বহন করিতে হইবে। সুতরাং এই ব্যবস্থার দ্বারা মুসলিম অঞ্চল যে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, অ-মুসলমান অঞ্চল লাভবান হইবে সেই পরিমাণে; কারণ অ-মুসলমান অঞ্চলকে তাহার সৈন্যবাহিনী বাবদ যাহা ব্যয় করিতে হইবে, তাহার পরিমাণ যাহাই হোক না কেন, তাহা ব্যয়িত হইবে তাহাদেরই মধ্যে রাজস্বের তহবিল যাহাদের দান।

(৫) যুক্তি দেখান হইয়াছে যে, কেবলমাত্র ভারত-বিভাগের দ্বারাই মুসলমানগণ অর্থনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা লাভে সমর্থ হইবে। অর্থনৈতিক প্রশ্নের দুইটি দিক আছে; তাহার একটি হইতেছে সরকারী চাকুরীর ভাগ-বাঁটোয়ারা। মুসলিম অঞ্চলগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইলে অর্থনীতির দিক দিয়া সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মুসলমানগণের অবস্থার উন্নতি সাধনে তাহারা আদৌ সমর্থ হইবে না। সরকারী চাকুরীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রাপ্য অংশ পূর্ব হইতেই নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে; কোন ক্ষেত্রে তাহা অন্যায় বা অসম মনে হইলে বড় জোর তাহা পুনরালোচিত হইতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ এইরূপ সিদ্ধান্ত না হয় যে, কেবলমাত্র ধর্মগত কারণে অ-মুসলমানগণকে সরকারী চাকুরী হইতে বঞ্চিত করা হইবে, অথবা তাহাদিগকে অনুন্নত সম্প্রদায়ে পরিণত করা হইবে, ততক্ষণ তাহাদের প্রাপ্য অংশের শতকরা হার যে কিরূপে বিশেষভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব তাহা দুর্বোধ্য। তাহা ছাড়া ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, স্ব স্ব রাষ্ট্রের অন্তর্গত মুসলমান ও অ-মুসলমানগণের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের কোনরূপ সম্পর্ক রক্ষা করা যদি সম্ভবপর হয়, তবে তাহা হইবে সরকারী চাকুরীতে লোক-নিয়োগ দ্বারাই। মুসলমান রাষ্ট্রের অন্তর্গত অ-মুসলমানগণের অবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠতাহেতু অ-মুসলমান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মুসলমানদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ও

12. Coupland, op. cit. p. 77.

সুবিধাজনক হইবে। অ-মুসলমান রাষ্ট্রে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ১ হইতে ১৩ এবং মুসলমান রাষ্ট্রে অ-মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা ২৫ হইতে ৪৮; এরূপ অবস্থায় অ-মুসলমানগণ সরকারী চাকুরীতে যে হার ও 'ওয়েটেজ' দাবী করিতে পারিবেন, মুসলমানগণের পক্ষে তাহা দাবী করা অসম্ভব না হইলেও দুঃসাধ্য হইবে। কাজেই যদি ন্যায় ও নীতি অনুযায়ী সরকারী চাকুরী বণ্টন করিতে হয়, অ-মুসলমান রাষ্ট্রে মুসলমান চাকুরিয়ার শতকরা হার যে পরিমাণে হ্রাস পাইবে, মুসলমান রাষ্ট্রে অ-মুসলমানদিগের শতকরা হার থাকিবে তদপেক্ষা অনেক উচ্চে। 'ওয়েটেজ' সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যে-সব চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, খণ্ডিত ভারতে তাহা পুনরালোচনা ও পরিবর্তনসাপেক্ষ, কেননা এইসব চুক্তি যখন সম্পাদিত হয়, খণ্ডন-পরিকল্পনা তখন ছিল কল্পনাতীত বস্তু। তাহা ছাড়া, একই রাষ্ট্রের সদস্যদের সম্বন্ধে যে বিচার-বিবেচনা প্রদর্শিত হইয়া থাকে, ভারত-বিভাগের পর ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতি তাহা প্রদর্শনের প্রয়োজন না-ও হইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে, হিন্দুস্থানে মুসলমানগণ সরকারী চাকুরীর দিক দিয়া যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, পাকিস্থানে তাঁহাদের লাভের হার ঠিক সেই অনুপাতে হইবে না; মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমানগণ অনেক অধিকসংখ্যক সরকারী চাকুরী লাভে সমর্থ হইবেন, একথা ধরিয়া লইলেও, হিন্দুস্থানের মুসলমানগণ সেই অর্থনৈতিক সুবিধায় ও আশ্বাসে কতদূর উপকৃত ও আশ্বস্ত হইতে পারিবেন, তাহা বিবেচনার বিষয়।

শিল্পোন্নয়ন দ্বারা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন হইতেছে, এই প্রশ্নের অপর দিক। এস্থলে যুক্তি দেখান যাইতে পারে যে, ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে অ-মুসলমান-গণ যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহাদের অর্জিত রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধাই তাহার মূলীভূত কারণ। কিন্তু আসল কথা হইতেছে, ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতার ভোগাধিকার হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে বৃটিশের করায়ত্ত; কাজেই হিন্দুগণ যদি প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া থাকে, তবে তাহাদের অলব্ধ রাজনৈতিক সুখ-সুবিধার বলে তাহারা তাহা করে নাই, করিয়াছে উদ্যম ও কর্ম-ক্ষমতার সাহায্যেই। অর্থনৈতিক প্রাধান্য যদি রাজনৈতিক সুখ-সুবিধা ও জনসংখ্যার শতকরা হারের উপর নির্ভরশীল হইত, তাহা হইলে ভারতীয় অর্থনীতি-ক্ষেত্রে অতিশয় নগণ্য সংখ্যাসম্বলিত পার্শী সম্প্রদায়ের স্থানমাত্র রহিত না। অথচ তাঁহারা আজ সেখানে যে স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন, তাহা কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট তো নয়ই, বরঞ্চ হিন্দুদের অধিকৃত স্থান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। তাঁহাদের এই সৌভাগ্যে কেহই ঈর্ষ্যান্বিত নয় এবং তাঁহারাও এমন অভিযোগ কখনও উচ্চারণ করেন নাই যে, অ-পার্শী বিপুল জনসংখ্যা দ্বারা তাঁহারা নিপীড়িত ও নিগৃহীত। কাজেই হিন্দুগণ প্রতিষ্ঠাপন্ন—একথার মধ্যে কোন যুক্তি নাই। মুসলিম রাষ্ট্র যদি তাহার রাজনৈতিক ক্ষমতা ন্যায় ও নীতি সঙ্গতভাবে প্রয়োগ না করিয়া সাম্প্রদায়িক বিচার-বুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া প্রয়োগ করে, তবেই হিন্দুদিগকে তাহাদের বর্তমান অবস্থা হইতে বিচ্যুত করা সম্ভব। অর্থাৎ, মুসলিম রাষ্ট্র যদি তাহাদের সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, বর্তমান

অবস্থা হইতে তাহারা কোনক্রমেই অপসারিত হইবে না। পাকিস্থানপন্থীদের ইহাই যদি হয় উদ্দেশ্য—অবশ্য তাঁহাদের আদর্শের চরম পরিণতির যে ভাবী রূপ তাঁহারা চিন্তিত করিয়াছেন তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহা ছাড়া অন্য কোন প্রদেশের কথা অনুমান করা অসম্ভব,—সেক্ষেত্রে তাহারা কিরূপে আশা করিতে পারেন যে, অ-মুসলমানগণ স্বচ্ছন্দচিত্তে সেই অবস্থা স্বীকার করিয়া লইবেন? হিন্দুদের হাতে আদৌ যদি কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকিত এবং তাহারা তাহা প্রয়োগ করিত নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, অবস্থা তাহা হইলে দাঁড়াইত সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। পূর্বেই বলা হইয়াছে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হিন্দুগণ কোনদিন অধিকার করিতে পারেন নাই এবং প্রদেশসমূহে যে ক্ষমতা মাত্র সাতাশ মাসের জন্য তাঁহাদের হস্তগত হয়, মুসলিম লীগ তাহা অব্যাহতভাবে সম্ভোগ করেন দীর্ঘ আট বৎসর ধরিয়া, উপরন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের শুভেচ্ছা ও সমর্থন সর্ব সময়ের জন্য তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পাঞ্জাবের কিছুসংখ্যক হিন্দু ও শিখ কেবলমাত্র উদ্যম ও কর্মক্ষমতার বলে পাঞ্জাবের বাহিরে তাঁহাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। রাজপুতানা, কাথিয়াবাড়, গুজরাট ও চেট্টিনাদের হিন্দুগণ এবং মুসলমন সমাজের অন্তর্গত মেমন ও খাজা সম্প্রদায় ভারতীয় শিল্প-সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাপন্ন পক্ষরূপে পরিগণিত। এ সমৃদ্ধি তাঁহারা রাজনৈতিক প্রাধান্যের দ্বারা অর্জন করেন নাই। অপরাপর সকলকে দমিত করিতে না পারিলে অবশিষ্ট মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি সাধিত হইবে না—ইহাই যদি হয় মুসলমানগণের সাম্প্রদায়িক উন্নতির যুক্তি, স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলমান নাগরিকদের প্রতি তাহা অত্যন্ত অবিচারমূলক হইবে।

(৩) পাকিস্থান বিরোধী যুক্তি

অতএব দেখা যাইতেছে, যে সকল যুক্তির বলে ভারত-বিভাগ দাবী করা হইয়াছে, সেগুলি হয় অসার, নয় খণ্ডন-প্রস্তাবের অনুকূলে ন্যায়সংগতভাবে ব্যবহৃত হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। পক্ষান্তরে বিভাগের বিরুদ্ধে যুক্তিগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী ও সারবান।

সংক্ষেপে তাহার কয়েকটি এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(১) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির দিন ফুরাইয়া না গেলেও, গণনার মধ্যে আসিয়াছে। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা হইতে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করি যে, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা অসম্ভব। এমন কি, বড় বড় রাষ্ট্রগুলিকেও তাহা রক্ষা করিতে গলদঘর্ম হইতে হইয়াছে। কাজেই স্বাভাবিকপ্রবণতা দেখা দিয়াছে একাধিক রাষ্ট্রের সমবায়ের দিকে। এইসব রাষ্ট্র-সমবায়ের উর্ধ্বে একটি মহারাষ্ট্র গঠন পরিকল্পনাও আজ আর বাস্তব রাজনীতির বহির্ভূত নয়। এরূপক্ষেত্রে ভারতের আয়তন ও ক্ষমতা খণ্ডিত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা বিশ্বের ঘটনাস্রোত ঠেলিয়া উজানে চলিবার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়।

হয়তো এমনও হইতে পারে, মুসলিম অঞ্চল পৃথক হইলেই, পৃথক হইবার মানসিক প্রবণতা ক্ষান্ত হইবে না; সে মনোভাব একবার কার্যরত হইলে এমন অবস্থাও আসিতে পারে যে, কেবলমাত্র ভারতকে মুসলমান ও অ-মুসলমান অঞ্চলে খণ্ডিত করিলেই চলিবে না, দেশীয় রাজ্য ছাড়াও, হয়তো দেখা দিতে পারে মুসলমান ও অমুসলমান অঞ্চলদ্বয়কে আরও ক্ষুদ্রতর খণ্ডে বিভক্ত করিবার প্রয়োজন। এইরূপে বহুধা বিভক্ত ভারত যদি কোনদিন স্বাধীনতা লাভে সমর্থও হয়, তাহা হইলেও পরস্পরবিরোধী খণ্ডসমষ্টির সমাহারে গঠিত এই দেশ হইবে বৈদেশিক কূটনীতির উন্মুক্ত ক্রীড়াক্ষেত্র মাত্র। তাহার ফলে ভারতীয় রাষ্ট্র-দেহে বিভিন্ন উপাদানগুলি হইবে শক্তিহীন, বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় অক্ষম ও পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রয়োগের যোগ্য তৃতীয় পক্ষের হস্তের ক্রীড়নক।

(২) যেখানে পারস্পরিক সহনশীলতা এবং মিলিত ও সম্মত কর্মপন্থার নীতি অনুসৃত হয়, জাতীয় সম্পদ ও শক্তি সেখানে সর্বসাধারণের কল্যাণে যেরূপ পরিপূর্ণরূপে নিয়োজিত হইতে পারে, স্বতন্ত্র বহু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তাহা হওয়া অসম্ভব। তাহাদের স্বাতন্ত্র্যই তাহাদের মধ্যে যে ব্যবধান রচনা করে তাহারই প্রতিরোধে পারস্পরিক সহনশীলতা ও মিলিত কর্মপন্থার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কোন বিরাট পরিকল্পনা প্রস্তুত করা অসম্ভব, কারণ, প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়া তাহারা প্রত্যেকেই সমপরিমাণে সমৃদ্ধ নয়; তাহা ছাড়া আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য কোন না কোন জিনিষের জন্য তাহাদের একটিকে অপরটির উপর নির্ভর করিতে হয়। আয়তন যেখানে যত বৃহৎ, বৈচিত্র্য সেখানে ততো বেশী; কাজেই কৃষিজাত, খনিজ ও শক্তি উৎপাদনকারী প্রাকৃতিক সম্পদও সেখানে তত বহু বিস্তীর্ণ এলাকায় আস্তৃত। এই জন্যই পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োগের পক্ষে ইহাই প্রশস্ততর ক্ষেত্র। ভারত খণ্ডিত হইলে এই সুবিধা হইতে সে বঞ্চিত হইবে এবং সে ক্ষেত্রে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম রাষ্ট্রগুলিই যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে সমধিক সে কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের নিজেদের শাসনকার্য পরিচালনের ও আত্মরক্ষাব্যবস্থা সম্পাদনের উপযোগী আর্থিক সঙ্গতি পর্যন্ত থাকিবে না।

(৩) জাতি গঠনের জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে ক্রমবর্ধমান ব্যয়-বরাদ্দ—ইহাই হইতেছে বর্তমান ভারতের অতি প্রয়োজনীয় দাবী। ভারতবর্ষ অতীতে বৃটিশ শাসনাধীনে যে দুঃখ-দুর্গতি বহন করিয়াছে তাহা অপরিমেয়; সে এখানে অভিনয় করিয়াছে নিছক পুলিশ-রাজের ভূমিকা, কাজেই জাতিগঠন সম্বন্ধীয় সমস্ত বিভাগ সে অবহেলা করিয়াছে ও অর্থাভাবের দ্বারা পঙ্গু করিয়াছে। সমগ্র দেশকে এই ক্ষতিপূরণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহও সে দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবে না। দেশ খণ্ডিত হইলে আর্থিক সঙ্গতিও ক্ষুণ্ণ হইবে, তাহার ফলে মুসলিম ও অমুসলমান উভয় অঞ্চলই ক্রমবর্ধমান দাবী পূরণ করিতে অসমর্থ হইবে।

(৪) বর্তমান জগতের, এমন কি মুসলিম রাষ্ট্রসমূহেও রাজনীতি ও অর্থ-নীতিকে ধর্মেতর অন্যান্য বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার একটা

প্রকাশ্য লক্ষিত হইতেছে। মুসলিম লীগ ও পাকিস্থানপন্থীরা যাহাই বলুন না কেন, ইউরোপের খৃষ্টান দেশগুলির মত বর্তমান জগতের মুসলিম রাষ্ট্রগুলিও পুরাপুরি পার্থিব রাজ্যে পরিণত না হইলেও, দ্রুত পরিণত হইতে চলিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, ভারতীয় মুসলমানগণ এই ঘটনাস্রোতের মোড় ফিরাইয়া তাঁহাদের ভারতীয় রাষ্ট্রকে অন্য কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবেন কি না।

(৫) ব্যবচ্ছেদ-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে কি মুসলমান কি অ-মুসলমান সকল পক্ষ হইতেই প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছে ইহা সুবিদিত ঘটনা। মুসলিম লীগ, জমিয়ত-উল-উলেমা, মোমিন, অহ্‌রার ও জাতীয় মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন মুসলিম দল ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনটি যে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করে তাহা আমার বিচার্য নয়। আমার বক্তব্য হইল ইহাই যে, লীগ ব্যতীত অন্যান্য দল ও সম্প্রদায় খণ্ডন-ব্যবস্থার বিরোধী। অবস্থা সম্বন্ধে মুসলমানগণের মনোভাব শেষপর্যন্ত কি দাঁড়াইবে তাহা তাঁহারাই জানেন; তবে হিন্দু শিখগণ খণ্ডন-ব্যবস্থা প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর। বিভাগের অনুকূলে এক পক্ষের জিদ যতই বর্ধিত হইবে, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও হইবে ততই স্পষ্ট ও তিক্ততর। এই সংঘর্ষ যে ভবিষ্যতে কি রূপ পরিগ্রহ করিবে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। তবে একটা কথা নিশ্চিত; এই প্রস্তাবের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যাঁহারা সংশ্লিষ্ট, তাঁহাদের সম্মতিক্রমে ব্যবচ্ছেদ-প্রস্তাব কার্যকরী হইতে পারিবে না এবং তাঁহাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও যদি তাহা কার্যে পরিণত হয়, এই অসন্তোষ তাহার পরেও উভয় পক্ষের অন্তরে সঞ্জীবিত থাকিবে ও সম্প্রসারিত হইবে। যে অবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া এই প্রস্তাব রচিত, তাহা বর্ধিত হইতে বাধ্য এবং কেহ যদি মনে করিয়া থাকেন, বিভাগ-ব্যবস্থা কার্যকরী হইয়া গেলেই সকল উত্তেজনা শান্ত হইয়া যাইবে ও স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হইবে, তাহা হইলে তিনি বালির ভিতের উপর প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছেন। বরঞ্চ তাহার ফলে পারস্পরিক সহনশীলতা আরও দুঃসাধ্য হইবার ও তাহার দরুণ উভয় পক্ষকেই আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা পূর্ণতর করিবার প্রয়োজনীয়তা অধিকতরভাবে উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনাই সমধিক।

(৬) এই সমস্ত কারণে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের অবস্থা হইবে অধিকতর অসহনীয়। মুসলমান ও অমুসলমান অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তাহাদের অন্যথায় ন্যায্য প্রাপ্য সহানুভূতি ও সদিচ্ছা হইতে বঞ্চিত হইবে এবং তাহার দরুণ তাহাদের অবস্থা হইবে বর্তমান হইতে আরও বহুগুণ শোচনীয়। বস্তুতঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির অবস্থা হইবে তপ্ত কটাহ হইতে বহ্নিকুণ্ডে পতিত পতঙ্গের মত। প্রস্তাব কার্যকরী হইলে, অমুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে সেই অবস্থায় পতিত হইতে বাধ্য করা হইবে। কিন্তু মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সে অবস্থার জন্য অন্য কাহাকেও দোষী করিতে পারিবেন না, কারণ ইহাই তাঁহারা কামনা করিয়াছিলেন এবং অমুসলমানগণের নিকট হইতে বলপূর্বক ইহা তাঁহারা অর্জন করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত, মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অপেক্ষা অমুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আত্মরক্ষায় অধিকতর সক্ষম হইবেন, কারণ সংখ্যাধিক্য হেতু স্বল্পায়তন স্থানে অমুসলমানগণের শক্তি কেন্দ্রীভূত রহিবে ও সংখ্যাল্প মুসলমান সম্প্রদায়কে বহু বিস্তীর্ণ এলাকায় বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিতে হইবে। পারস্পরিক সুখ-সুবিধার আদান-প্রদানের দিক দিয়াও বিশেষ কোন সুবিধা হইবে না, কারণ মুসলিম রাষ্ট্রের প্রদানের ক্ষমতা যাহা রহিবে তাহা পর্যাপ্ত পরিমাণ নয় এবং অমুসলমান রাষ্ট্রের পক্ষে পারস্পরিক আদান-প্রদানের জন্য প্রলুব্ধ হইবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ থাকিবে না।

ষষ্ঠ খণ্ড

পাকিস্থান প্রস্তাবের বিকল্প

(পঁয়ত্রিশ)

ক্রিপস্-প্রস্তাব

মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালে তাহার লাহোর অধিবেশনে পাকিস্থান-প্রস্তাব গ্রহণ করার পর হইতে মুসলমানদের ন্যায়সংগত দাবী পূরণ করিবার জন্য বহু পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। সেগুলিকে পাকিস্থানের বিকল্পরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এইসব পরিকল্পনার মধ্যে বৃটিশ সমর-পরিষদের ঘোষণাই প্রথম ও প্রধান স্থান পাইবার যোগ্য; স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ সর্বপ্রথম এই প্রস্তাব ভারতের গোচর করেন বলিয়া 'ক্রিপস্ প্রস্তাব' নামে ইহা খ্যাত হইয়াছে। প্রস্তাবের যে অংশটুকু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার গঠনতন্ত্র রচনার উপায়ের সহিত সম্পর্কিত, আমরা শুধু সেই অংশ সম্বন্ধেই আলোচনা করিব; ইহার অন্তর্গত মধ্যকালীন গভর্ণমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ পরিচালিত আলাপ-আলোচনার বিবরণ বা তাহার পরিণতি প্রভৃতি বিষয় এস্থলে আমাদের আলোচ্য নয়। ঘোষণা-পত্রের উদ্দেশ্য ছিল, 'তাঁহাদের (বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের) প্রস্তাবক্রমে ভারত যাহাতে যতশীঘ্র সম্ভব স্বায়ত্তশাসনে উপনীত হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে ক্রমপর্যায়গুলি সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যক্ত করা। ঔপনিবেশিক মর্যাদাসম্পন্ন এমন একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে, যাহা যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য উপনিবেশের সহিত ইংলণ্ডের রাজার প্রতি আনুগত্যের এক সাধারণসূত্রে গ্রথিত রহিবে, অথচ সে হইবে তাহাদের সহিত সমমর্যাদাসম্পন্ন, স্বরাষ্ট্রীয় অথবা পররাষ্ট্রীয় কোন ব্যাপারেই সে কাহারও অধীন রহিবে না।' 'যুদ্ধ-বিরতির অব্যবহিত পরেই নূতন ভারতীয় শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্বসম্পন্ন একটি প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে এবং দেশীয় নৃপতিগণ যাহাতে সেই প্রতিষ্ঠানের কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে'; রচিত শাসনতন্ত্র যাহাতে অবিলম্বে গৃহীত ও কার্যকরী হয়, সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট তৎসম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন নিম্নলিখিত সর্তাধীনেঃ

'(১) বৃটিশ ভারতের অন্তর্গত কোন প্রদেশ যদি নূতন শাসনতন্ত্র গ্রহণে অসম্মত হয়, পুনঃ প্রবেশের পথ উন্মুক্ত রাখিয়া সে তাহার বর্তমান শাসনতান্ত্রিক অবস্থা অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিবে। সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট যদি ইচ্ছা করেন, অনিচ্ছুক প্রদেশগুলিকে লইয়া এরূপ নূতন আর একটি শাসনতন্ত্র রচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন, যাহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রিক পরিকল্পনার সহিত সমমর্যাদা-সম্পন্ন ও অত্রবর্ণিত অনুরূপ প্রণালীতে রচিত।

'(২) শাসনক্ষমতা বৃটিশের অধিকার হইতে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় অধিকারে হস্তান্তরিত হইবার ফলে যেসব সমস্যার উদ্ভব হইবে সেগুলিকে আশ্রয়

করিয়া, জাতি ও ধর্মগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি-সম্বলিত একটি চুক্তিপত্র সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট ও শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা রচনাকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বাক্ষরিত হইবে; কিন্তু তাহার স্বারা বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভাবী সম্পর্ক নির্ধারণের পথে কোনরূপ বিধিনিষেধ আরোপিত হইবে না। যুদ্ধ-বিরতির পূর্বে ভারতের প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের নেতাগণ যদি অন্য কোনরূপ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত না হন, তাহা হইলে শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা রচনাকারী প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত উপায়ে গঠিত হইবে।'

যুদ্ধ-বিরতির পর প্রাদেশিক আইন-পরিষদসমূহের নির্বাচন-পর্ব সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহের সভ্যগণ একটি নির্বাচক-মণ্ডলীরূপে মিলিত হইয়া, আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রথায় গণ-পরিষদ গঠন করিতে উদ্যোগী হইবেন। এই পরিষদের সভ্যসংখ্যা হইবে নির্বাচক-মণ্ডলীর সভ্যসংখ্যার এক-দশমাংশ। বৃটিশ ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার সহিত তত্রত্য সদস্যদের যে আনুপাতিক হার তদনুযায়ী ও তাঁহাদের সহিত সমমর্যদাসম্পন্ন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য দেশীয় রাজ্যসমূহকেও আমন্ত্রণ করা হইবে।

উপরে প্রদত্ত সারাংশ হইতে দেখা যায় যে, যুদ্ধ-বিরতির সঙ্গে সঙ্গে পরিপূর্ণ ঔপনিবেশিক মর্যাদাসম্পন্ন এমন একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করেন, ইচ্ছা করিলে যাহার বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে থাকিবার অধিকার রহিবে। প্রাদেশিক শাসন পরিষদসমূহের নূতন নির্বাচন হইয়া গেলে, প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহের সদস্যগণ মিলিত হইয়া যে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করিবেন, আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব-মূলক প্রথায় গণপরিষদ গঠিত হইবে তাহার স্বারা। দেশীয় রাজ্যসমূহ বৃটিশ ভারতের অন্তর্গত প্রদেশসমূহের সমগ্র জনসংখ্যার সহিত প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যসংখ্যার যে হার তদনুপাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন। গণপরিষদ কর্তৃক রচিত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অনুমোদন ও কার্যকরী করিবেন এই সর্তে যে, কোন প্রদেশ যদি এই শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণে অসম্মত হয়, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে অবস্থান করিয়া, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রিক পরিকল্পনার সহিত সমমর্যাদাসম্পন্ন স্বকীয় নূতন শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার তাহার থাকিবে। ক্ষমতাহস্তান্তর-সংক্রান্ত সমুদয় সমস্যা আশ্রয় করিয়া ধর্ম ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতিতে একটি চুক্তিপত্র গণপরিষদ ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মধ্যে স্বাক্ষরিত হইবে। প্রারম্ভে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠনের উল্লেখ মাত্র ছিল না, ছিল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব এই সর্তাধীনে যে, কোন প্রদেশ সে শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে অবস্থান করিবার অধিকার তাহার থাকিবে এবং তাহার মর্যাদার মান নির্ধারিত হইবে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যে সম্পর্ক তদনুযায়ী। প্রোফেসার কুপল্যাণ্ডের ভাষায় বলিতে গেলে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহাদের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন এবং তাহা হইতেছে

এই ঃ নূতন এক শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার অধীনে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন-সম্পন্ন একটি নূতন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা। বৃটিশ সমর-পরিষদের ঘোষণাপত্র পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদানের সমগ্র পরিকল্পনা যাহাতে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়া না যায় কেবলমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই অসম্মতির সর্তটি সংযোজিত হইয়াছে।'১ এই প্রস্তাবে ভারত-বিভাগের অনুকূলে সুনিশ্চিত কোন অভিমত প্রদত্ত হয় নাই বলিয়া মুসলিম লীগ ইহা বর্জন করে; পাকিস্থান প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইলেও, একাধিক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা ইহাতে সুদূরপরাহত।

যে সমস্ত কারণে মিঃ জিন্না এই পরিকল্পনা বর্জন করেন—তাহা ১৯৪২ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনের সভাপতিরূপে তাঁহার প্রদত্ত অভিভাষণে ও ১৯৪২ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন; হেতুগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ (১) ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল নূতন এক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা; যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে অবস্থান করিবার পক্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উল্লিখিত অধিকার অবাস্তব; (২) গণপরিষদ হইবে সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান এবং তাহা সাম্প্রদায়িক নির্বাচনপ্রথার দ্বারা গঠিত না হইয়া, গঠিত হইবে এগারটি প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যগণকে লইয়া রচিত এক নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনপ্রথার দ্বারা। পৃথক-নির্বাচন-প্রথা গৃহীত হইলেও মুসলমানগণ শতকরা ২৫টির অধিক আসন লাভ করিতে পারিবে না বটে, কিন্তু আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনপ্রথার দ্বারা তাহাদের অধিকৃত আসনের সংখ্যা হইবে তদপেক্ষা অনেক কম; সরল ভোটাধিক্যের দ্বারা ইহার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, কাজেই সে সিদ্ধান্ত যে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলেই হইবে ইহা নিঃসন্দেহেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে; (৩) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হইতেছে, কোন এক বা একাধিক প্রদেশ কিভাবে তাহার বা তাহাদের সম্মতি জ্ঞাপনের অধিকার ব্যবহার করিবে—কোন প্রদেশ, অর্থাৎ সেই প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণ যদি শতকরা ৬০ ভোটে যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে; কিন্তু তাঁহাদের ভোটসংখ্যা যদি ৫৯ হয় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে ভোটসংখ্যা যদি হয় ৪১, সেক্ষেত্রে প্রদেশের গণভোট গৃহীত হইবে। এই ব্যবস্থার দ্বারা মুসলমান জাতির একক ও অখণ্ড সত্তা অস্বীকৃত হইয়াছে; প্রদেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বৃটিশ নীতি সঞ্জাত এক দৈব দুর্ঘটনা মাত্র, অথচ ইহারই উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে অত্যন্ত অধিক, তাহা ছাড়া, মুসলমান জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অধিকার ইহার দ্বারা সরল সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকৃত হয় নাই। বাংলা ও পাঞ্জাব—এই দুইটি বৃহত্তম মুসলমানপ্রধান প্রদেশের প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবে না, তাহারা হইবে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের

1. R. Coupland, "Indian Politics", 1936-42, p. 276.

কর্ণার পাত্র; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও সিন্ধুতে অমুসলমানগণকে প্রদত্ত 'ওয়েটেজে'র পরিমাণ মুসলমানগণের স্বার্থসিদ্ধির পথে হইবে দুরতিক্রম্য বাধা।

অতএব সরল ও সুস্পষ্ট ভাষায় পাকিস্থানের প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয় নাই ও মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অধিকার স্বীকৃত হয় নাই—এই হেতুতে পরিকল্পনাটি বর্জিত হইল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতবিভাগের প্রস্তাবকে নীতিগতভাবে মানিয়া লওয়ার জন্য যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশও করা হইল।২

(ছত্রিশ)

অধ্যাপক কুপল্যাণ্ডের আঞ্চলিক পরিকল্পনা

অধ্যাপক রেজিনাল্ড কুপল্যাণ্ড তাঁহার 'The Future of India' নামক গ্রন্থে আঞ্চলিক ভিত্তিতে রচিত একটি পরিকল্পনা প্রদান করিয়াছেন। এই আঞ্চলিক ধারণা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন স্যার সিকন্দর হায়াত খাঁর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রিক পরিকল্পনা হইতে এবং আঞ্চলিক সীমানা নির্ধারণ পরিকল্পনা ভারতের সেন্সাস কমিশনার মিঃ এম, ডব্লিউ, এম, ইয়েট্সের নিকট হইতে গৃহীত; ভারতের জলপ্রবাহ শক্তির সঞ্চয় বর্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে মিঃ ইয়েট্স ১৯৪১ সালের সেন্সাস-বিবরণীর ভূমিকায় এই পরিকল্পনা পঞ্চাশ বৎসরের জন্য গ্রহণ করিতে সুপারিশ করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তর-ভারতের সীমা তিনটি নদীর অববাহিকা দ্বারা চিহ্নিত করিবার কথা হয়ঃ (১) কাশ্মীর হইতে করাচী পর্যন্ত বিস্তৃত সিন্ধু নদের অববাহিকা (রাজনৈতিক পরিভাষায় ইহাই পাকিস্থান নামে পরিচিত), (২) পাঞ্জাব ও বাংলার মধ্যবর্তী গঙ্গা ও যমুনা নদীর অববাহিকা (হিন্দুস্থান) ও (৩) বিহার ও পূর্ব সীমান্তের মধ্যবর্তী গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা (উত্তর-পূর্ব ভারত)। গঙ্গা নদীর অববাহিকা যে খণ্ডিত ইহা প্রাকৃতিক সত্য। 'প্রায় দেড়শত মাইল দূরে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য গঙ্গা ঠিক যে স্থানে দক্ষিণমুখী হইল, দেশের প্রাকৃতিক পরিবর্তন আরম্ভ হইল সেই স্থান হইতেই। উত্তর সমতলের দেশ সহসা বদ্বীপের দেশে রূপান্তরিত হইয়া গেল।'১ (৪) চতুর্থ অঞ্চল অনেকটা উপদ্বীপের সামিল। অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড সাহেবের মতে নদীর অববাহিকাগত এই বিভাগ অনেকখানি অর্থনৈতিক প্রয়োজনের অনুগামী। বিরাট প্রবাহ-শক্তির যথাযোগ্য ব্যবহারের উপরেই অর্থ-নৈতিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা নির্ভর করে। হাইড্রোলেকট্রিক কারখানার প্রতিষ্ঠা ও প্রবাহশক্তির পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার দূরপ্রসারী পরিকল্পনাসাপেক্ষ ব্যাপার। এই

2. "Speeches and Writings of Mr. Jinnah", Pp. 350—364.
1. R. Coupland, 'The Future of India,' p. 120.

পরিকল্পনা কোন একটি প্রদেশে তাহার একার সামর্থ্যে কার্যকরী হইতে পারে না, তাহার জন্য প্রয়োজন অতি-প্রাদেশিক সংযোগ ও সহযোগিতা, কারণ ইহা কার্যকরী করিতে গেলে যে ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে, কেবলমাত্র আঞ্চলিক ভিত্তিতেই তাহার সংকুলান হওয়া সম্ভব। এই ভিত্তিতে ভারতবর্ষ যে চারিটি অঞ্চলে বিভক্ত হইতে পারে তাহা এই ৫২ নম্বর ছকে প্রদর্শিত হইল।

অনুপাত হিসাব করিতে গিয়া বিজ্ঞ অধ্যাপক সামান্য একটু গণিতের ভুল করিয়াছেন; জনসংখ্যার স্তম্ভে তাঁহার প্রদত্ত সংখ্যা অনুযায়ী হিসাব করিয়া উল্লিখিত ছকে সংশোধিত আকারে তাহা সন্নিবদ্ধ করিলাম।

অধ্যাপক সাহেবের মতে আঞ্চলিকতা একদিকে যেমন বিভাগ হইতে পৃথক্, অপরদিকে তেমনি সংযোগ হইতে স্বতন্ত্র। ভারতের অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একটি আন্তরাঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন ইহার লক্ষ্য; কিন্তু সে কেন্দ্র হইবে এক সম্পূর্ণ নূতন জিনিস; ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করিতে হইলে যে সর্বনিম্ন পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন—মাত্র তাহাই সে কেন্দ্র ব্যবহার করিবে, কিন্তু তাহাও সে সর্বভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলীর প্রদত্ত প্রত্যক্ষ অধিকারের উপর নির্ভর করিয়া করিবে না, করিবে অঞ্চলসমূহের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানরূপে। যে-টুকু অধিকার বহির্জগতের দৃষ্টিতে ভারতীয় অখণ্ডতার পরিচয় প্রদান করিবে, ভারতবর্ষের যে কোন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহাই হইল অবশ্য-প্রাপ্য সর্বনিম্ন ক্ষমতা, যথা; (১) পররাষ্ট্র নীতি ও আত্মরক্ষা, (২) বহির্বাণিজ্য বা ট্যারিফ নীতি, (৩) কারেন্সী। আত্মরক্ষা বলিতে বুঝায়, নৌ ও বিমানবাহিনী সমেত সেই পরিমাণ সশস্ত্র শক্তির নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ—বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার জন্য যাহা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

জনসংখ্যার আগম ও নিগম নিয়ন্ত্রণ এবং বৈদেশিকগণকে পৌরাধিকার প্রদান পররাষ্ট্র নীতির অন্তর্গত, কাজেই কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীন বিষয়, কিন্তু তাই বলিয়া কোন অঞ্চল যদি নিজের অধিকার-সীমার মধ্যে তাহার স্বতন্ত্র জাতিত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, ইহার দ্বারা সে প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হইবে না।

শুল্ক সংগ্রহ, কূটনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ দ্বারা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে সুসজ্জিত করিতে ব্যয় যে অত্যধিক হইবে তাহা নয়। কেবলমাত্র আত্মরক্ষা বাবদ ব্যয়ের দফাই হইবে অতিশয় গুরুতর। বর্তমান যুদ্ধের পূর্ববর্তীকালে ভারতের রক্ষা-ব্যবস্থার দরুণ ব্যয় শুল্কজাত রাজস্বের দ্বারা অনেকটা সমতাসম্পন্ন করা সম্ভব হইয়াছিল। ঘাটতি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে প্রত্যক্ষ কর বসাইবার অধিকার দেওয়া হইবে অথবা পরিকল্পনানুযায়ী প্রত্যেক অঞ্চল তাহার অংশমত দেয় চাঁদার দ্বারা সে ঘাটতি পূরণ করিবে—তাহা ভাবিবার বিষয়। সম্ভাবিত উদ্বৃত্ত অর্থ যাহাতে অঞ্চলসমূহের মধ্যে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশমত বণ্টিত হইতে পারে সে ব্যবস্থার জন্যও পরিকল্পনাতে স্থান রাখিতে হইবে।

ইহাই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধীন সর্বনিম্নসংখ্যক বিষয়; ইহার সহিত রেলওয়ে, বিমান বিভাগ, উপকূল অঞ্চলের সামুদ্রিক যানবাহন, বেতার, টেলিফোন, টেলিগ্রাম এবং সম্ভবতঃ সমস্ত ডাক বিভাগও কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে আসা

উচিত। কিন্তু স্বাভাবিক সময়ে আন্তরাঞ্চলিক কেন্দ্রের পক্ষে এগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়; যুদ্ধকালীন সময়ে এগুলির উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব যদি নিতান্ত প্রয়োজনীয়ই হয়, পরিকল্পনায় তাহার জন্য একটি ধারা রাখিলেই চলিবে। আরও কতকগুলি বিষয়, যেমন—সেন্সাস, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, শিল্প-বিস্তার, খনি ও তৈল-ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ, প্রধান প্রধান বন্দর ও জলযান বিভাগ নিয়ন্ত্রণ, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য প্রভৃতিও কার্যকারিতা ও অর্থনীতিগত সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু কেন্দ্রীভূত না হইয়া এগুলি বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বণ্টিত হইবে। অবশ্য যে সব বিষয়ে সংগতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা প্রয়োজন, সেগুলি সম্বন্ধে আইনপ্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে অধিকার দান ব্যবস্থা রাখা সম্ভব, কিন্তু সেরূপ আইন প্রণয়নও অঞ্চলসমূহের অনুমতিসাপেক্ষ।

আন্তরাঞ্চলিক ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্র হইলেও, অঞ্চলসমূহের সংযোগ এক্ষেত্রে অত্যন্ত শিথিল ও শ্লথ। তাহা ছাড়া, ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আঞ্চলিকতা হইতে এক নূতন ধারণা ও নবতর যুক্তিপরম্পরার উদ্ভব হইবে। প্রথমেই ইহা ভারতবর্ষকে এমন কতগুলি বড় বড় রাষ্ট্রে বিভক্ত করিবে, ইচ্ছা করিলে যাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিতে পারিত, কিন্তু কোন একটি সাধারণ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া তাহারা রাষ্ট্রক্ষমতা আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র মাত্রই এমনভাবে বিভক্ত যে, জাতীয় অখণ্ডতার নীতির সহিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের নীতি যাহাতে সুসংগত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়; কিন্তু আঞ্চলিকতার মধ্যে এরূপ দ্বৈত নীতির অস্তিত্ব নাই। কেন্দ্র এক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে আন্তরাঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান। ইহাকে কর্তা না বলিয়া করণ বলা যাইতে পারে। ইহার শাসন ও আইন বিভাগীয় সদস্যগণ স্ব স্ব অঞ্চলের এজেণ্ট ব্যতীত আর কিছুই নহেন। 'কন্ফিডারেসী' বা রাষ্ট্র-সমবায়ের সহিতও ইহার পার্থক্য আছে; ইহা কতগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত লীগ মাত্র; ইহার নিজস্ব কোন কর্তৃত্ব নাই এবং ইহার সিদ্ধান্ত ইউনিটসমূহের দ্বারা গৃহীত হইলে, তাহাদেরই অর্থব্যয়ে তাহা কার্যে পরিণত হইবে। পক্ষান্তরে আন্তরাঞ্চলিক কেন্দ্র একটি রীতিমত গভর্ণমেণ্ট, সে আপন সৈন্য ও কর্মচারিগণের উদ্দেশ্যে আদেশ জারী করিবে ও নিজের ব্যয়ভার নিজে বহন করিবে। বস্তুতঃ, ইহার স্থান হইবে রাষ্ট্র-সমবায় ও যুক্তরাষ্ট্রের মাঝা-মাঝি ঃ রাষ্ট্রসমবায় হইতে কিছু ঊর্ধ্বে ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে কিছু নিম্নে।

আন্তরাঞ্চলিক কেন্দ্রের আইনসভাগুলি ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের অন্তর্গত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের মত ভারতীয় জাতীয়তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও শক্তি-সামর্থ্যের কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবে না; কারণ, আন্তরাঞ্চলিকতা এই ধারণা হইতেই উদ্ভূত যে, ভারতে এক-জাতিত্বের আদর্শ আজিও উপলব্ধ হয় নাই। বরঞ্চ ইহার ভিতর দিয়া তদন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তার কথাই অভিব্যক্ত হইবে। সুতরাং প্রত্যেক অঞ্চল হইতেই সমানসংখ্যক সদস্য ইহাতে প্রেরিত হইবে এবং প্রত্যেক ইউনিটকে তাহার দেয় পর্যাপ্তসংখ্যার প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ দিবার জন্য কেন্দ্রীয় সদস্য-সংখ্যার এমন একটা সর্বনিম্ন মান নির্ধারণ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইবে, যাহা কোনক্রমেই অতিক্রম করা চলিবে

না। অঞ্চলসমূহের আয়তন ও জনসংখ্যানির্বিশেষেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। সদস্যগণ অধিকার লাভ করিবেন অঞ্চলসমূহ হইতে ও দায়ী থাকিবেন অঞ্চলসমূহেরেই নিকট। তাঁহারা নির্বাচিত হইবেন আঞ্চলিক আইন-পরিষদসমূহ কর্তৃক এবং সে নির্বাচন পরিচালনের জন্য এমন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে, যাহাতে প্রদেশ ও রাষ্ট্রসমূহ যথাবিধি প্রতিনিধি প্রেরণের পরিপূর্ণ সুযোগ পায়। গংগা নদীর অববাহিকা ও দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের কোন কোন অথবা সবগুলি প্রদেশ এবং রাষ্ট্র যদি তাহাদের প্রাদেশিক ও রাষ্ট্রিক সত্তা পরিহার করিয়া অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে আন্তরাঞ্চলিক কেন্দ্রে তাহাদের প্রতিনিধি-সংখ্যা এরূপভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে—অঞ্চলবহির্ভূত প্রদেশগুলি যে সত্য সত্যই অঞ্চলভুক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ, গংগানদীর অববাহিকা ও দাক্ষিণাত্য এলাকা অঞ্চলভুক্ত হোক বা না হোক, সিন্ধুনদীর অববাহিকা ও বদ্বীপ-এলাকা আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে তাহাদের সহিত সমসংখ্যক প্রতিনিধিত্বের অধিকারী হইবে।

কেন্দ্রীয় অধিকারের এলাকা তিনটি মাত্র বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার ফলে কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত সংকুচিত হইবে; কাজেই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে চারটি বিভাগীয় মন্ত্রী ও আরও দুই-একটি দপ্তরবিহীন মন্ত্রী লইয়া। কতকটা সুইজারল্যাণ্ডের গঠনতন্ত্রের অনুকরণে একটি ষ্ট্যাটুটারী কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে হইবে। প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার সহকর্মিগণ ব্যবস্থা-পরিষদ দ্বারা নির্বাচিত হইবেন এবং তাঁহাদের কার্যকাল হইবে পরিষদের আয়ুষ্কালের সমান। কোন একটি আইন প্রণয়ন করিতে গেলে সুইজারল্যাণ্ডের শাসনবিভাগের মতই কাউন্সিলের ভোটাধিক্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য কাউন্সিলের নিকট তাঁহারা দায়ী রহিবেন না। সুইজারল্যাণ্ডের মতই শাসনবিভাগীয় পদ অঞ্চলসমূহের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হইবে—প্রত্যেক অঞ্চল অন্ততঃপক্ষে একটি এবং কোনক্ষেত্রেই দুইটির অধিক পদ পাইবে না। অঞ্চল-বহির্ভূত প্রদেশগুলিকেও এই দিক দিয়া অঞ্চলের অন্তর্গতরূপে গণ্য করিতে হইবে। প্রধান মন্ত্রী পালাক্রমে একবার হিন্দু ও একবার মুসলমান হইবেন।

সুপ্রিম কোর্ট বর্তমানে ফেডারেল কোর্টের মতই শাসনতান্ত্রিক ব্যাখ্যার অধিকারসম্পন্ন হইবে। প্রত্যেক অঞ্চল হইতে একজন করিয়া বিচারক লইয়া ইহার বিচারকমণ্ডলী গঠিত হইবে এবং এক্ষেত্রেও অঞ্চল-বহির্ভূত প্রদেশগুলি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তরূপে গণনীয়।

এই নূতন ব্যবস্থার দ্বারা সাম্প্রদায়িক সমস্যা কিভাবে প্রভাবিত হইবে? অধ্যাপক কুপল্যাণ্ডের মতে তাহা নির্ভর করে কেন্দ্রে সাম্প্রদায়িক সমতা কি ভাবে রক্ষিত হইবে তাহারই উপরে। আঞ্চলিক প্রথা অনুযায়ী আন্তরাঞ্চলিক ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচনে জাতীয় প্রতিনিধিত্বের জন্য কোন স্থান থাকিবে না। সদস্যগণ প্রতিনিধিত্ব করিবেন কেবলমাত্র অঞ্চলসমূহের। বস্তুতঃ, সদস্যগণকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের এজেণ্টরূপে স্ব স্ব অঞ্চলের নির্দেশ অনুযায়ীই ব্যবস্থা-পরিষদে ভোট দিতে হইবে। কাজেই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সাম্প্রদায়িক সমতা ব্যক্তি বা দল

বিরোধের মধ্যে সম্পাদিত হইবে না, হইবে অঞ্চলসমূহের অনুসৃত নীতিগুলির মধ্যে। তাহার ফলে ভারতের দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ দেশের সাধারণ স্বার্থের কল্যাণে দিনের পর দিন একত্র ও একযোগে কার্য করিবার সুবিধা পাইবেন; কালক্রমে হয়তো এমন দিন আসিবে, যখন হিন্দু ও মুসলমানগণ সুইজারল্যাণ্ড ও কানাডার সুইস্ ও কানাডিয়ানদের মত আপন আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও এক সাধারণ ভারতীয় জাতীয়তা সম্বন্ধে সচেতনতা লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। ভবিষ্যতে এই সম্ভাবনা যাহাতে বাস্তবে পরিণত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে হিন্দুদিগকে তিনি যে কোন সর্তে ইউনিয়ন গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মুসলমানদের নিকট তাঁহার আবেদন, তাঁহার পরিকল্পনানুযায়ী মুসলমানগণকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা প্রদত্ত না হইলেও অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে ইহা তাঁহাদের দাবী পূরণ করে; অন্ততঃ এই কারণে ইহা তাঁহাদের গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া কর্তব্য। দুইজাতি-তত্ত্ব নীতিগতভাবে ইহার দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। মুসলমান জাতি ইহার দ্বারা এক বা একাধিক জাতীয় রাষ্ট্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই সকল রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা যাহাই হোক না কেন, হিন্দুরাষ্ট্র অথবা প্রদেশগুলির সমবায়-সমূহের সহিত তাহারা যে সমমর্যাদাসম্পন্ন, একথাও পরিকল্পনায় স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা তাঁহাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে না, পরন্তু স্ব স্ব এজেন্টগণের মারফৎ সর্বনিম্ন পরিমাণ সর্তে সম্মত অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতায় শাসন-ক্ষমতা সম্ভোগ করিবার অধিকার ইহা তাহাদিগকে প্রদান করিবে।

অধ্যাপক কুপল্যাণ্ডের পরিকল্পনা যতদূর সম্ভব তাঁহার নিজের ভাষায় বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভারতে দুই জাতি বিদ্যমান ও ভারতীয় জাতি নামক কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই—এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়াই যে পরিকল্পনাটি রচিত, সে কথা তাহার রচয়িতা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি নিঃসন্দেহে সত্য। এই ধারণার উপর নির্ভর করিয়াই মুসলিম লীগের ভারত-খণ্ডনের দাবী সমর্থন করিতে তিনি যথাসাধ্য সচেষ্ট হইয়াছেন এবং তাহা করিতে গিয়া ধর্ম ও সম্প্রদায় অনুযায়ী জনসংখ্যা বণ্টন করিয়া ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অখণ্ডতার ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের জন্য আঞ্চলিক পরিকল্পনার সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে আপনাকে সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ডাক্তার রাধাকমল মুখার্জির ভাষায় বলিতে গেলে, 'অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড অর্থনৈতিক ভিত্তিতে মুসলিম-প্রধান এলাকাগুলির সীমারেখা আঞ্চলিক বিভাগের সীমানার সহিত একাকার করিয়া মিলাইতে গিয়া কৃষিগত ভূগোলের ক্ষেত্রে এক বিষম ভুল করিয়াছেন।'১

এতদ্ব্যতীত ইহার আর একটি গুরুতর ত্রুটি হইতেছে এই যে, আঞ্চলিকতাও ইহা যুক্তিসংগত ও যথাযথভাবে অনুসরণ করে নাই। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, পাঞ্জাবের একটি বৃহৎ অংশ গঙ্গা নদীর অববাহিকার মধ্যে পড়ে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি সে অংশটিকে সিন্ধুনদের অববাহিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয় রাজপুতনার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এই

1. Dr. Radhakamal Mukerjee: 'An Economist looks at Pakistan', 12.

অঞ্চলের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন এই যুক্তিতে যে, ইহার নাকি নিজস্ব একটা নৈতিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে; কিন্তু তাঁহার এই কার্য ভৌগোলিক যুক্তির দ্বারা মোটেই সমর্থিত নয়। যে কোন হেতুতেই হোক, এই অঞ্চলটি যদি সিন্ধু-নদের অববাহিকার সহিত যুক্ত করা হয়, তাহা হইলেও গুজরাটের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন দক্ষিণের রাষ্ট্রচতুষ্টয় কেন যে গুজরাটের সহিত একই অঞ্চলে যুক্ত হইবে তাহার কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া গুজরাট, বিশেষ করিয়া তাহার দক্ষিণার্ধ যে সকল নদী দ্বারা বিধৌত, তাহারা বাহির হইয়াছে প্রবল বারিপাত প্লাবিত আরাবলী পর্বতমালা হইতে, তাহা সত্ত্বেও তাহাকে এই অঞ্চলের সহিত যুক্ত না করিয়া দাক্ষিণাত্যের অঙ্গীভূত করিয়া দিবার হেতুও দুর্বোধ্য।

গঙ্গানদীর অববাহিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বিচার-বিবেচনার কথা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া কতকগুলি এলাকাকে যথেচ্ছভাবে কাটিয়া লইয়া এই অঞ্চল গঠন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহা সর্বজনবিদিত যে, এমন বহু নদী আছে, যেগুলি হিমালয় পর্বত হইতে বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের উৎপত্তিস্থল ও অববাহিকা বৃটিশ এলাকার বহির্ভূত; সেইজন্য বৃটিশ-শাসিত প্রদেশসমূহকে ইহাদিগকে লইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইতে হয়। কোশী এই সমস্ত নদীর অন্যতম, অথচ উত্তর বিহারের প্লাবনের জন্য দায়ী ইহাই; মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা জেলার বন্যা যাহাদের দ্বারা সংঘটিত হয়, সেই বাগমতী ও অন্যান্য নদীও এই পর্যায়ে পড়ে। শোন ও নর্মদা অমরকণ্টক পর্বত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রবাহিত হইয়াছে উৎপত্তিস্থল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন মুখে। অথচ অমরকণ্টক পর্বতের প্রচুর বারিপাতের ফলে যে সব অঞ্চলে প্রবল বন্যা নামে, তাহারা পরস্পর হইতে বহু দূরবর্তী: যথা, সাহাবাদ ও পাটনা জেলা, কখনও কখনও বিহারের সারন জেলায়, জব্বলপুর ও হোসাঙ্গাবাদে —এমন কি, আরও নিম্নে মধ্যপ্রদেশে এবং গুজরাটের স্থানে স্থানে।

অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'Tennessee Valley Authority Scheme' সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিয়া, তাঁহার অববাহিকা অঞ্চল পরিকল্পনার সহিত তাঁহার সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা করিতে গিয়া এই জাতীয় পরিকল্পনার সার্থকতার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য একটি ব্যাপার উপেক্ষা করিয়াছেন। নদীগুলিকে যথেচ্ছভাবে খণ্ডিত করিয়া, সেই খণ্ডাংশগুলির সাহায্যে তদ্দ্বারা বিধৌত অঞ্চলের উন্নয়ন সম্বন্ধীয় কোনরূপ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা চলে না। নদীর উৎপত্তিস্থল হইতে অববাহিকা পর্যন্ত এবং সেখান হইতে আরম্ভ করিয়া নদী যেখানে অপর কোন নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে অথবা সমুদ্রে পতিত হইয়াছে সেই অবধি গতিপথের সমগ্র দৈর্ঘ্যটা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু গঙ্গানদী ঠিক যেখান হইতে দক্ষিণমুখী হইয়াছে, অধ্যাপক মহাশয় যথেচ্ছভাবে ঠিক সেই স্থানে তাহাকে খণ্ডিত করিয়াছেন। দেশের প্রাকৃতিক চেহারা ও মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যই যদি বিচার্য বিষয় হয়, তাহা হইলে বিহারের উত্তরাংশ, চম্পারণ জেলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশ ও মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, মুঙ্গের, ভাগলপুর এবং পূর্ণিয়া প্রভৃতি জেলার উত্তরাংশের সহিত

উত্তর-বাংলার জেলাগুলির ও আসাম উপত্যকার কোন পার্থক্য দর্শান চলে না। অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে গঙ্গাকে যদি দ্বিধাবিভক্ত করাও হয়, তাহা হইলে তাহার একাংশ পরিচিত হয় ভাগীরথী এবং আরও নিম্নে গিয়া হুগলী নদী নামে; এই অংশ দ্বারা বিধৌত পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলি মেঘনা ও পদ্মানদী বিধৌত পূর্ববঙ্গ নামে পরিচিত অপর অংশ অপেক্ষা বিহার প্রদেশের জেলাগুলির সহিতই সমধিক সাদৃশ্যসম্পন্ন। এতদ্ব্যতীত দামোদর নদের কথাও বিশেষভাবে বিবেচ্য; ইহার উৎপত্তিস্থল ছোটনাগপুর, কিন্তু পশ্চিম বাংলার জেলাগুলি ইহার বন্যার বিধ্বংসী লীলাক্ষেত্র। এই লাইনগুলি যখন লিখিত হইতেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ভারত গভর্ণমেণ্টের জনৈক সদস্যের নেতৃত্বাধীনে বাংলা ও বিহার গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ এই সর্বনাশা বন্যা নিবারণের উপায় উদ্ভাবনের জন্য এক সম্মেলনে মিলিত হইয়াছেন। অধ্যাপক কুপল্যাণ্ডের আঞ্চলিক পরিকল্পনা যদি গৃহীত হয় ও তদনুযায়ী ভারত বিভক্ত হয়, তাহা হইলে একক তাহার দ্বারা এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে না, গঙ্গানদীর অববাহিকা ও বদ্বীপ অঞ্চলের মধ্যে অস্থায়ী কোন ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজনীয় হইবে। ব্যাপার হইতেছে এই যে, অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড প্রস্তাবিত বিভাগ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাচারপ্রসূত এবং আঞ্চলিকতার বিকৃত অনুকরণ মাত্র। আঞ্চলিক পরিকল্পনা যদি স্বাভাবিক ও বিচারবুদ্ধিসম্মতভাবে প্রযুক্ত হয়, তাহার ফলে যে অঞ্চলগুলি সৃষ্ট হইবে তাহারা হইবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের এবং তদ্দ্বারা মুসলমান অঞ্চলগুলিকে ভারতের অবশিষ্ট অংশের সহিত সমমর্যাদার পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইবে না, অথচ সমগ্র দেশকে চারিটি অঞ্চলে বিভক্ত করিবার পক্ষে অধ্যাপকের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল ইহাই।

চতুর্থ অঞ্চলের কথা বিচার করিবার সময় ইহা আরও স্পষ্টতর হইয়া উঠে। এই অঞ্চলটির আয়তন সমগ্র দেশ বিযুক্ত তিনটি উত্তরাঞ্চলের সমান। প্রায় এক হাজার মাইল দীর্ঘ ও পাঁচশত মাইল প্রশস্ত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগকে যদি একটিমাত্র অঞ্চলরূপে গণ্য করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র দুইটি অমুসলমান অঞ্চলের বিরুদ্ধে মাত্র দুইটি মুসলমান অঞ্চল স্থাপন করিয়া ভারসাম্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশকে চারিটী অঞ্চলে বিভক্ত না করিয়া, তাহাকে একটীমাত্র অখণ্ড অঞ্চলরূপে গণ্য করা যাইবে না কেন? অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড ভাল করিয়াই জানেন যে, দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের সীমারেখা নির্ধারণের জন্য নদীর অববাহিকা সৃষ্টির অজুহাতও অনাবশ্যক, কারণ স্পষ্টতঃ ইহা তিনটী অঞ্চল গঠনের পর অবশিষ্ট অংশ লইয়া কতকগুলি প্রদেশ ও রাষ্ট্রের সমবায়ে তৈয়ারী।

বিচক্ষণ অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার আঞ্চলিক পরিকল্পনা রচনা করিবার সময় অন্য কোন বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জি বলেন, 'আঞ্চলিক সমাজ-বিজ্ঞানে আঞ্চলিকতার উদ্দেশ্য হইতেছে, বিশিষ্ট কোন একটি অঞ্চলের জীবনযাপন-পদ্ধতি, বৃত্তি, ভাষা, লোক-প্রবাদ এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করা।' 'ভাষা ও সংস্কৃতিগত

স্বাতন্ত্র্য বর্জন করিয়া অঞ্চল গঠনের প্রচেষ্টা আঞ্চলিকতার বিকৃত অনুকরণ মাত্র।'২ বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচলন থাকা হেতু ভারতবর্ষ যদি একটী জাতিরূপে গণ্য না হয়, তাহা হইলে প্রতিটী অঞ্চলই হইবে এই সমস্ত স্বাতন্ত্র্য সম্বলিত এক একটী ক্ষুদ্রাকার ভারতবর্ষ; আভ্যন্তরীণ এই সকল পার্থক্য সত্ত্বেও অঞ্চলসমূহ আপন আপন কার্য চালাইতে সক্ষম হইবে—এরূপ আশা পোষণ করা যদি সংগত হয়, তাহা হইলে সমগ্র ভারতের সম্বন্ধেই বা সে আশা পোষণ করা যাইবে না কেন?, বস্তুতঃ, মিঃ কুপল্যাণ্ড উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তাঁহার আঞ্চলিক পরিকল্পনা কোন বোধগম্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া, তাহার অন্তর্গত ইউনিটগুলি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইতে অস্বীকার করিবে। তিনি বুঝিয়াছেন, সিন্ধু নদের অববাহিকা ও বদ্বীপ অঞ্চলের ইউনিটগুলি মিলিত হইবার পক্ষে বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না, কিন্তু গঙ্গানদীর অববাহিকা ও দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের ইউনিটসমূহের মিলন সংঘটন কষ্টসাধ্য হইবে। এই অসুবিধা একবার দেখা দিলে, দুইটি অমুসলমান অঞ্চলের বিরুদ্ধে দুইটী মুসলিম অঞ্চল স্থাপন দ্বারা ভারসাম্য রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া অধ্যাপক মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছেন, শেষোক্ত অঞ্চল দুইটি আঞ্চলিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হোক না হোক সেদিকে দৃকপাত না করিয়া, তাহাদিগকে আন্তরাঞ্চলিক কেন্দ্রে প্রতিনিধি প্রেরণক্ষম যুগ্ম অঞ্চলরূপে গণ্য করা হইবে।

অঞ্চল চতুষ্টয় গঠন করিবার সময় তিনি তাহাদের আয়তন ও লোক-সংখ্যার কথা আদৌ চিন্তা করেন নাই। পূর্বে প্রদত্ত ৫২ নম্বর ছক হইতে দেখা যাইবে, দেশীয় রাজ্যসমূহ যুক্ত বা বিযুক্ত হইলে বদ্বীপ অঞ্চলের আয়তন যথাক্রমে দাঁড়ায় ১৫৬·৯৬ ও ১৩২·৩৯ হাজার বর্গমাইল; অথচ তাহার প্রতি-ভাররূপে যে গঙ্গানদীর অববাহিকা ও দাক্ষিণাত্য অঞ্চলকে স্থাপন করা হইয়াছে, দেশীয় রাজ্য সমেত বা ব্যতীত তাহার আয়তন হয় যথাক্রমে ৩১১·৮০ ও ৫৩৯·২৫ অথবা ২০৮·২০ ও ৩০২·৭৯ হাজার বর্গমাইল। জনসংখ্যার পার্থক্য আরও বেশী প্রকট। দেশীয় রাজ্যসমূহের যোগ ও বিয়োগক্রমে সিন্ধু ও বদ্বীপ অঞ্চলের লোকসংখ্যা হয় ৬১২·৫০ বা ৩৭০·৮০ লক্ষ এবং ৭৩৫·০ অথবা ৭০৫·১০ লক্ষ, অথচ সমতা সম্পাদনের জন্য তাহারই বিরুদ্ধে যে গঙ্গানদীর অববাহিকা ও দাক্ষিণাত্য অঞ্চলকে স্থাপন করা হইয়াছে, দেশীয় রাজ্যের যোগ ও বিয়োগক্রমে তাহাদের জনসংখ্যা দাঁড়ায়, ১১৬৫·৫০ লক্ষ বা ১০০০·৯০ লক্ষ এবং ১৩৬৮·২০ বা ৮৭১·৮০ লক্ষ। অঞ্চল চতুষ্টয়ের মুসলমান ও অ-মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা অনুপাত হিসাব করিলে পার্থক্য প্রায় সমপরিমাণ প্রকট হয়। বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের হিসাব ধরিলে সিন্ধু ও বদ্বীপ অঞ্চলের মুসলমান জনসংখ্যা হয় শতকরা ৫২·০ ও ৫০·১ এবং অ-মুসলমান জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৪৮·০ ও ৪৯·৯। কেবলমাত্র বৃটিশ ভারতের হিসাব অনুযায়ী সিন্ধু ও বদ্বীপ অঞ্চলের মুসলমান জনসংখ্যা হইবে শতকরা ৬১·৩ ও ৫১·৬ এবং অ-মুসলমান সংখ্যা দাঁড়াইবে ৩৮·৭ ও ৪৮·৪। একদিকে মুসলিম অঞ্চলে এই নামমাত্র মুসলমান

2. Mukerjee; op. cit. p. 13.

সংখ্যাধিক্য এবং অপর দিকে অ-মুসলমান অঞ্চলে তাহাদের বিপুল সংখ্যাধিক্য দাঁড়ায় নিম্নলিখিতরূপঃ গঙ্গানদীর অববাহিকা ও দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে অ-মুসলমান জনসংখ্যা হইবে শতকরা ৮৮·০ ও ৯১·৮ এবং অপরদিকে মুসলমান-সংখ্যা দাঁড়ায় ১২·০ ও ৮·২;— অবশ্য এ হিসাব বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য একত্রে ধরিয়া এবং কেবলমাত্র বৃটিশ ভারতে তাহার সংখ্যা দাঁড়ায় অ-মুসলমান ৮৬·৮ ও ৯২·৫ এবং মুসলমান ১৩·২ ও ৭·৫।

কেবলমাত্র ভারসাম্য সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে দুইটি অ-মুসলমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দুইটি মুসলমান রাষ্ট্র স্থাপন করিবার জন্য এইসব ত্রুটি, বিচ্যুতি ও পরস্পর-বিরোধিতা গলাধঃকরণ করিতেই হইবে। ইহাই যদি মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে সরল ও স্পষ্ট ভাষায় বলা ভাল যে, অ-মুসলমান মুসলমান রাষ্ট্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে দায় ও দায়িত্বগত সমতা যদি নাও থাকে, তথাপি অন্যান্য সমস্ত বিচার-বিবেচনা নিরপেক্ষভাবে ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্বন্ধীয় সমতা স্থাপন করিতেই হইবে। আঞ্চলিকতা ও অর্থনৈতিক সুখ-সুবিধার ছদ্ম আবরণ এত সূক্ষ্ম যে, মুসলমান বা অ-মুসলমান কাহারও দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিতে সে সমর্থ নয়।

অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড রচিত পরিকল্পনা আলোচনা করিতে গেলে অবস্থা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আন্তরাঞ্চলিক ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণের কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা থাকিবে না, তাঁহারা হইবেন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহের নির্দেশের অধীন প্রতিনিধি মাত্র। কেবলমাত্র ব্যবস্থা-পরিষদ কেন, শাসন-বিভাগীয় সদস্য-গণকেও অনুরূপ বাধ্যবাধকতার অধীন হইতে হইবে। অধ্যাপক মহাশয়ের কি বারেকের জন্য উপলব্ধি হইল না যে, শাসনতান্ত্রিক সংকট সৃষ্টির পক্ষে প্রত্যক্ষতঃ উপযোগী কোন পরিকল্পনা রচনা করা যদি সম্ভব হয়, তবে এই পরিকল্পনা প্রস্তাবের দ্বারা তিনি তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছেন? অন্যান্য পরিকল্পনা শাসন-তান্ত্রিক অচল অবস্থার সম্ভাবিত হেতুগুলি অনুমান করিয়া লয় ও তাহা দূরীকরণের জন্য সচেষ্ট হয়; কিন্তু অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড রচিত পরিকল্পনা শাসনতান্ত্রিক সংকটের জন্য প্রবেশদ্বার এমনভাবে উন্মুক্ত করিয়া দেয় যে, তাহার অঘটনই হইয়া দাঁড়ায় বস্তুতঃ অসম্ভব, অথচ তাহার সমাধান সম্বন্ধে কোন উপায়ই প্রস্তাব করে না।

কেন্দ্রে একত্র কার্য করিতে করিতে তাহার ফলে ঐক্যবোধ উদ্বুদ্ধ হইবে- এ আশা একেবারে ভিত্তিহীন; কেননা, একত্র যাঁহাদের কার্য করিবার কথা, তাঁহারা এক সাথে বসিয়া পারস্পরিক পরামর্শ ও আলাপ-আলোচনার দ্বারা যাহা ন্যায় ও নির্ভুল বলিয়া মনে করিবেন তদনুযায়ী কাজ করিতে পারিবেন না; তাঁহাদিগকে কার্য করিতে হইবে এমন কতগুলি লোকের নির্দেশক্রমে —যাঁহারা পরস্পরের নিকট হইতে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত রহিবার দরুণ না পাইবেন পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার সুবিধা, না পাইবেন মতবিনিময়ের সুযোগ; ফলে অবস্থা দাঁড়াইবে ইহাই যে, হাতে-কলমে যাঁহাদিগকে একত্র কার্য করিতে হইবে, তাঁহাদের স্বয়ংসক্রিয়তা থাকিবে না, তাহারা হইবেন অন্যের দ্বারা

চালিত যন্ত্রপুত্তলিমাত্র এবং বস্তুতঃ কার্য যাহারা করিবেন, তাঁহারা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার জন্য মিলিত হইতে পারিবেন না, তাঁহাদিগকে কার্যসাধন করিতে হইবে—তাঁহাদেরই নির্দেশ-চালিত বহুদূরবর্তী যন্ত্রপুত্তলির মারফৎ। তাহা ছাড়া, ইউনিটসমূহ মুসলমান ও অ-মুসলমানরূপে ভাবিতে ও কাজ করিতে যেখানে বাধ্য এবং জাতীয়তাবোধের উঁকি মারিবার মত ক্ষুদ্রতম রন্ধ্র পর্যন্ত যেখানে সযত্নে রুদ্ধ, সেক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রতিরোধ ঠেলিয়া ঐক্যবোধ উদ্বুদ্ধ হইবে—এরূপ আশা পোষণ করিবার কোন হেতু থাকিতে পারে কি?

এই পরিকল্পনার একটিমাত্র দিক আছে যাহা লক্ষ্য করিবার যোগ্য এবং তাহা হইতেছে, অ-মুসলমান অঞ্চলের সহিত মুসলমান অঞ্চলকে সমপরিমাণ মর্যাদা ও শাসনক্ষমতা প্রদান। মর্যাদা ও রাষ্ট্রক্ষমতার ক্ষেত্রে এই সমতার দ্বারা দায় ও দায়িত্বের ক্ষেত্রেও অঞ্চল চতুষ্টয়ের মধ্যে সাম্য বুঝাইবে—এমন কথা আভাসে-ইংগিতে পর্যন্ত কোথাও ব্যক্ত হয় নাই—বরঞ্চ তাহার বিপরীত ধরিয়া লইবার পক্ষে যথেষ্ট অবকাশ আছে। বলা হইয়াছে, দেশরক্ষা বিভাগীয় ব্যয় বাদ দিলে, কেবলমাত্র আন্তরাঞ্চলিক কেন্দ্র পরিচালনের ব্যয়ভার খুব বেশী গুরু হইবে না। যুদ্ধ-পূর্ববর্তী যুগে দেশরক্ষাবিভাগীয় ব্যয় শুল্কবিভাগ হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের প্রায় সমপরিমাণ হইত, যুদ্ধোত্তর যুগেও সে অবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে ব্যয় সংকুলানের উপায় উদ্ভাবন সমস্যার সহজেই সমধান হইয়া যায়—ইহাই হইল তাঁহার যুক্তি। কিন্তু সেই রাজস্ব-তহবিলে অঞ্চল চতুষ্টয়ের দেয় অংশের পরিমাণ অতীতেই বা কত ছিল এবং ভবিষ্যতেই বা কত হইতে পারে—বিচক্ষণ অধ্যাপক মহাশয় এ প্রসংগে সে আলোচনা করার কোন প্রয়োজনবোধ করেন নাই। তিনি শুধু এইটুকু মাত্র বলিয়াই নিশ্চিন্ত যে, মুসলিম অঞ্চল রাজস্ব-ব্যয়ের ক্ষমতা অন্যান্য অঞ্চলের সহিত সমান পরিমাণে সম্ভোগ করিবে এবং অ-মুসলমান অঞ্চলসমূহ সে রাজস্বের বৃহত্তম অংশ সরবরাহ করিবার অসপত্ন অধিকার সম্ভোগ করিবে মাত্র, অথচ মুসলিম অঞ্চলের প্রাপ্য সুখ-সুবিধা লাভের সুযোগ পাইবে না। ঐক্য লোভনীয় বস্তু সন্দেহ নাই, কিন্তু যে-কোন সর্তে তাহা লাভ করিতে গেলে, তাহার জন্য অত্যন্ত উচ্চমূল্য প্রদান করিতে হইতে পারে।

(সাঁইত্রিশ)

স্যার সুলতান আহম্মদের পরিকল্পনা

তৃতীয় পরিকল্পনাটি স্যার সুলতান আহম্মদ প্রদান করিয়াছেন তাঁহার 'A Treaty Between India and the United Kingdom' নামক গ্রন্থে। পাকিস্থান-প্রস্তাব আলোচনা করিবার পর তিনি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছেনঃ 'উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব পাকিস্থান যদি ভারতের অবশিষ্টাংশের সহিত সর্বপ্রকার শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক বর্জিত সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়, কার্যকরী প্রস্তাবরূপে তাহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য, কারণ তাহার না রহিবে সামরিক নিরাপত্তা, না রহিবে অর্থ-নৈতিক স্থায়িত্ব; তাহা ছাড়া ভারতের অবশিষ্ট অংশের মুসলমানদের জন্য ন্যায় ও সুবিচার আদায়ের পক্ষেও সে হইবে একেবারে অক্ষম। অতএব অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থার সন্ধান করিতে হইবে ও তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং তাহা করিতে গিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মুসলমানগণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে হিন্দুপ্রাধান্যের ভয়ে ভীত, তাহাদের আহত আত্মমর্যাদা-বোধকে আশ্বস্ত করাই হইবে আমাদের লক্ষ্য।'১ একটি বিকল্প-প্রস্তাবও তিনি প্রদান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ভারতের বিশেষ অবস্থায় তাহা কার্যকরী ও যুক্তিসংগত বলিয়া বিবেচিত হইবে। তাঁহার পরিকল্পনা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ঘোষণাপত্রের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত ঃ তাঁহার পরিকল্পিত ভারতীয় ইউনিয়ন হইবে এমন একটি যুক্তরাষ্ট্র যাহার অন্তর্গত প্রত্যেকটি ইউনিয়ন হইবে এক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। ইউনিটগুলির সীমান্ত প্রয়োজন হইলে নূতন করিয়া চিহ্নিত করা চলিবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল হইবে এইরূপ দুইটি ইউনিট; মুসলমান সংখ্যাধিক্য সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে তাহাদের সীমান্ত পরিবর্তিত করিতে হইবে। ইউনিটগুলি সার্বভৌম ও স্বায়ত্ত-শাসনশীল হইবে এবং আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপারে তাহারা হইবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইউনিটসমূহের সর্বসম্মতিক্রমে যে স্বাধীনতা ইউনিয়নের হাতে হস্তান্তরিত হইয়াছে, ইউনিটগুলির বহিঃস্বাধীনতা কেবলমাত্র তাহারই নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে।

(১) **ক্ষমতা ঃ** দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, কারেন্সী, শুল্ক, বেতার, বিমান, রেলওয়ে ও সামুদ্রিক জলযান বিভাগ কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীন হইবে এবং অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি রহিবে ইউনিটসমূহের অধিকারে।

(২) **যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপরিষদ গঠিত হইবে নিম্নলিখিত উপায়ে ঃ** মুসলমান

1. Sir Sultan Ahmad: 'A Treaty Between India and The United Kingdom,' p. 88.

শতকরা ৪০, হিন্দু ৪০, অনুন্নত সম্প্রদায় ১০ এবং ভারতীয় খৃষ্টান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, শিখ, পার্শী ও উপজাতি প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায় ১০। বিভিন্ন দলের যৌগিক সম্ভাব্যতার দরুণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অবস্থা বরাবরই অনিশ্চিত থাকিবে এবং তাহার ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই সংখ্যাগুরুত্ব লাভের সমান সুযোগ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। তাহা ছাড়া সংখ্যাগুরুত্বও হইবে এত অল্প যে, বিরোধী দলের সদিচ্ছা ও সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে সে বাধ্য থাকিবে।

(৩) **গণ-পরিষদের গঠন পদ্ধতি হইবে নিম্নলিখিতরূপ :** হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য উপরে যে ৮০টি আসনের কথা বলা হইয়াছে, একটি হিন্দু ও একটি মুসলমান—এই দুইটি করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণক্ষম ৪০টি নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যের দ্বারা তাহা পূর্ণ করা হইবে। এইরূপ প্রত্যেকটি নির্বাচকমণ্ডলী ৫০০ সার্কেলে বিভক্ত হইবে। প্রত্যেক সার্কেলে লেখাপড়া জানে, বা নিজের বাড়ী রাখে অথবা অন্য কোনরূপ কর দেয়—এমন প্রাপ্তবয়স্ক হিন্দু ও মুসলমানের নাম লিপিবদ্ধ করিবার জন্য পৃথক পৃথক রেজিষ্টার থাকিবে এবং সেইরূপ প্রতিটি সার্কেল স্বতন্ত্রভাবে একজন করিয়া হিন্দু ও একজন করিয়া মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে। এইরূপে প্রত্যেক নির্বাচক-মণ্ডলী হইতে ৫০০ হিন্দু ও ৫০০ মুসলমান প্রতিনিধি পৃথক নির্বাচন দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। এই এক হাজার লোককে লইয়া যে যুক্ত-নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হইবে, তাহাই একটি করিয়া হিন্দু ও একটি করিয়া মুসলমান সদস্য নির্বাচন করিবে। অনুন্নত ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্যও এইরূপ কোন উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে। এই উপায়ে গঠিত ব্যবস্থা-পরিষদের শতকরা ১০ জন, এমন কি, ৫ জন করিয়া লইয়া গণ-পরিষদ গঠিত হইতে পারিবে।

(৪) **শাসন বিভাগ :** (ক) মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে ব্যবস্থা-পরিষদে অনুসৃত সাম্প্রদায়িক হার অনুযায়ী। (খ) শাসনবিভাগ ব্যবস্থা-পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবে। (গ) প্রধান মন্ত্রী পর্যায়ক্রমে একবার হিন্দু ও একবার মুসলমান হইবেন। (ঘ) প্রধান মন্ত্রী হিন্দু হইলে সহকারী প্রধান মন্ত্রী হইবেন মুসলমান এবং প্রধান মন্ত্রী মুসলমান হইলে তাঁহার সহকারী হইবেন হিন্দু। (ঙ) প্রধান সেনাপতি এবং দেশরক্ষা বিভাগীয় মন্ত্রীও অনুরূপ উপায়ে পর্যায়ক্রমে হিন্দু ও মুসলমান হইবেন। (চ) মিলিত দায়িত্ব হইবে সর্বদলীয় সম্মতিসাপেক্ষ ব্যাপার। নীতিগত ব্যাপারের কথা ছাড়াও, কোন সম্প্রদায়বিশেষের অভিমত যাচাই না করিয়া তাহার স্বার্থের পরিপন্থী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা হইলে, ইহা তাহার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের কাজ করিবে; সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ে মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিলে মন্ত্রিসভা ভাঙিগয়া যাইবে।

(৫) **সিভিল সার্ভিস :** সিভিল সার্ভিস বিভাগেও যোগ্যতানুযায়ী যথাসম্ভব পূর্বোক্ত সাম্প্রদায়িক হার বজায় রাখিতে হইবে। পদোন্নতি সাধারণতঃ নির্ভর করিবে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার উপর।

(৬) **স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগ :** করপোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি

স্বায়ত্তশাসনশীল সর্বপ্রকার বোর্ডে ও কাউন্সিলে উল্লিখিত সাম্প্রদায়িকতা রক্ষিত হইবে।

(৭) **সামরিক বিভাগ :** মুসলমান শতকরা ৫০ ও অমুসলমান শতকরা ৫০ হারে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গঠিত হইবে।

(৮) **রক্ষাকবচের ধারা :** এই প্রসঙ্গে মৌলিক স্বার্থ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্বন্ধে কংগ্রেসের ঘোষণা ও মিঃ জিন্নার ১৪ দফা সর্তের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মিঃ জিন্নার চৌদ্দ দফায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে রক্ষাকবচ দাবী করা হইয়াছে:—

(ক) ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিগত; (খ) রাজনীতি ও শাসন বিভাগ সম্বন্ধীয়। প্রথমটি সম্বন্ধে, আপত্তিজনক অংশবর্জিত বন্দে মাতরম সঙ্গীত ও ইকবালের গান কংগ্রেস সমর্থনক্রমে একত্র সন্নিবন্ধ করিতে হইবে। কংগ্রেস-পতাকায় মুসলিম প্রতীক চিহ্ন অঙ্কিত করিতে হইবে। গোহত্যা অনুমোদন করিতে হইবে, কিন্তু হত্যাকার্য অনুষ্ঠিত হইবে বিনা আড়ম্বরে। আজানের পথে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করা হইবে না এবং মসজিদের সম্মুখে গীতবাদ্য থামাইলে হিন্দু শোভাযাত্রা নির্বিবাদে যাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেওয়া হইবে। বিতর্ক এড়াইবার জন্য রোমান অক্ষরে লিখিত ইংরাজী ভাষাই হইবে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সরকারী ভাষা। প্রদেশসমূহে স্থানীয় ভাষা চলিতে পারিবে। (খ) কোন প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাধিক্য ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এরূপ আঞ্চলিক পুনর্ব্যবস্থা সম্বন্ধেই এ ধারা প্রযোজ্য; মুসলিম সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত আইন রক্ষা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি; রাষ্ট্রক্ষেত্রে ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগে সাম্প্রদায়িক হার সংরক্ষণ সম্বন্ধে আইন বিধিবদ্ধ করা। পাকিস্থান প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইলে প্রথম সর্তের প্রশ্ন আদৌ উঠিবে না। অন্যান্য সর্তগুলি মানিয়া লইতে হইবে। ইতিমধ্যে অন্য কোন অভিযোগ যদি উত্থাপিত হয়, তাহারও মীমাংসা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৯) **রক্ষাকবচ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি :** বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ঘোষণাপত্র দ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্বন্ধে বৃটেনের দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা অনুমোদিত হয়। আজ বৈদেশিক শক্তির হাতে যে শাসন-ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র তাহা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে সক্ষম—তাহার সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে এরূপ শ্রদ্ধাবোধ ও তাহার ঔপনিবেশিক মর্যাদা সম্বন্ধে এরূপ প্রত্যয় যদি আমরা পোষণ করি, তাহা হইলে উল্লিখিত ব্যবস্থা ভারতবর্ষকে স্বীকার করিয়া লইতে নাও হইতে পারে। 'অবস্থা যদি এইরূপ দাঁড়ায়, দেশীয় বিধানের উপর আমরা আমাদের আস্থা স্থাপন করিব, ইউনিটসমূহের কোর্টে, তাহার পর সুপ্রিম কোর্টে এবং সর্বশেষ আন্তর্জাতিক দরবারে আমাদের অভিযোগ পেশ করিয়া তাহার প্রতিকার চাহিব।'

(১০) **ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতা,** শিক্ষা, দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সম্বন্ধে রক্ষাকবচের প্রতিশ্রুতি এস্তোনিয়ার 'কালচারাল অটোনমি ল' অনুযায়ী প্রদত্ত হইতে পারে; সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষাগত অধিকার ও প্রতিষ্ঠান রক্ষার জন্য সাংস্কৃতিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(১১) **রাজনৈতিক রক্ষাকবচ :** কোন সম্প্রদায় যদি মনে করেন, কোন একটি বিল তাঁহাদের স্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতি ব্যতিরেকে তাহা আলোচিত হইবে না।

(১২) শিখ সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব ১১ নম্বর অনুচ্ছেদের সর্তাধীনে কেবলমাত্র পাঞ্জাব ব্যবস্থাপরিষদেই উত্থাপিত ও আলোচিত হইতে পারিবে।

(১৩) পার্শী সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় কোন প্রস্তাব ১১ নম্বর অনুচ্ছেদের সর্তাধীনে কেবলমাত্র বোম্বাই পরিষদেই উত্থাপিত ও আলোচিত হইবে।

ইউনিটসমূহ :

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা-পরিষদসমূহে, শাসন-বিভাগে ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগে প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি বিবেচ্যঃ

(ক) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি প্রয়োজনবোধ করিলে পৃথক-নির্বাচন-প্রথা বজায় রাখিতে পারিবে, কিন্তু 'কেন্দ্রীয় গণপরিষদ' এই শিরোনামায় নির্বাচন পরিচালন সম্বন্ধে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহকে তাহা মানিয়া চলিতে হইবে।

(খ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তাহাদের বর্তমান 'ওয়েটেজ' বজায় রাখিতে পারিবে, তবে বাঙলায় ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের 'ওয়েটেজ' যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করিতে হইবে।

(গ) কোন সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যাহাতে সংখ্যালঘুত্বে পরিণত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া, প্রয়োজন হইলে ইউনিটগুলির সীমানা পরিবর্তন করা চলিবে।

(ঘ) ব্যবস্থা-পরিষদসমূহে প্রচলিত সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের যে আনুপাতিক হার, যোগ্যতা অনুযায়ী যথাসম্ভব তাহা শাসন-বিভাগে অনুসরণ করিতে হইবে।

(ঙ) ইউনিটসমূহের স্বার্থে যখনই প্রয়োজন হইবে, বিশেষ করিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির স্বার্থরক্ষার জন্য উল্লিখিত ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রস্তাবিত ধারাগুলি প্রযোজ্য হইবে।

আর একটি বিকল্প প্রস্তাবও করা হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে পর্যায়ক্রমে ৫১টি করিয়া আসন দিয়া প্রতিবার এক একটি সম্প্রদায়কে একক সংখ্যাগুরুত্বের সুযোগ দিলে কেন্দ্রে সংখ্যাসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হইবে। ইহার ফলে ভোট সংগ্রহের অপকৌশল অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা ফুরাইবে এবং একযোগে কাজ করিবার মত পারস্পরিক বিশ্বাস ও বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্ট হইবে। রাষ্ট্র-ক্ষমতা যখন যে পক্ষের হাতে সে বুঝিবে, আজ যদি তাহারা কোন অন্যায় করে, অপর পক্ষ অচিরে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করিয়া সুদ সমেত সে অন্যায়ের উশুল করিবে; এই সচেতনার দরুণ, উভয়পক্ষেরই দুষ্ট প্রবৃত্তি সংযত থাকিতে বাধ্য হইবে। ইহার একমাত্র ত্রুটি হইল, শতকরা ৪০ : ৪০ পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি ভারসাম্য রক্ষা করিতে সমর্থ, এই প্রথা প্রবর্তিত হইলে তাহারা নিঃশেষে নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইবে।

স্যার সুলতান আহম্মদের উপরি উল্লিখিত পরিকল্পনার একমাত্র গুণ হইল তাহার ঋজুতা ও স্পষ্টভাষিতা। যাহা প্রয়োজন, স্পষ্টাক্ষরে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে এবং আঞ্চলিকতা অথবা অন্য কোনরূপ আদর্শের ছদ্ম আবরণে আসল উদ্দেশ্য আবৃত করিবার কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। সেই কারণেই ইহার গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য। মুসলিম লীগ মতাবলম্বী নহেন বৃটিশ ভারতীয় এমন কোন ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী নহেন। লীগই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহা সকল অবস্থায় ও সর্বক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করিতে বদ্ধপরিকর—সে যুক্তরাষ্ট্র যে কোন আকারে বা আদর্শেই গঠিত হোক না কেন। যে যে বিষয় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীন রহিবে সেগুলি সম্বন্ধে একটা আপোষ-নিষ্পত্তিতে আসিয়া পেঁীছাইবার পথে দুরতিক্রম্য কোন বাঁধা দাঁড়াইবে না। স্যার সুলতান আহম্মদ প্রদত্ত তালিকা যথেষ্ট পরিমাণ দীর্ঘ, কিন্তু তাহাতে একটি মাত্র বিষয় বাদ পড়িয়াছে যাহা বিতর্কের বিষয়ীভূত হইতে পারে। তাহা হইতেছে, বহু বিস্তীর্ণ পরিকল্পনা; অবশ্য এ বিষয়েও বাধা অনতিক্রম্য ও দূরীকরণের অযোগ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। ১৯৪২ সালের আগষ্ট-প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর 'রেসিডিউয়ারী' ক্ষমতা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে ন্যস্ত করিবার পক্ষে কোন কংগ্রেস সদস্যেরই আপত্তি থাকিতে পারে না; এই প্রস্তাবকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগ সভাপতির তীব্র আক্রমণ ও বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছে।

প্রস্তাবের অবশিষ্ট অংশ কতগুলি আনুমানিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রধান আনুমানিক সিদ্ধান্ত হইল এই যে, ভারতীয় জনসংখ্যার সর্ব-বৃহৎ অংশ হিন্দুসম্প্রদায় অতীতে একযোগে মুসলমান পীড়ন করিয়াছে, বর্তমানে করিতেছে ও ভবিষ্যতেও করিবে। সেইজন্য এমন একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা উদ্ভাবন করা প্রয়োজন, যাহা হিন্দুদের সেরূপ আচরণ অসম্ভব করিয়া তুলিবে। হিন্দুদের উপর তিন দিক হইতে আক্রমণ পরিচালিত হইয়াছে, অবশ্য তাহার জন্য স্যার সুলতান আহম্মদকে দায়ী করা চলে না। প্রথম প্রচেষ্টা হইল, তপশীলভুক্ত জাতিগুলিকে হিন্দুসমাজ হইতে পৃথকরূপে গণনা করিয়া হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও তাহার জনসংখ্যা হ্রাস করা। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হইল, উপজাতিগণকে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার জনসংখ্যা আরও হ্রাস করা—যদিও বিজ্ঞতম নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে তাহাদের হিন্দুরূপে গণ্য হওয়াই উচিত। সর্বশেষ প্রচেষ্টা হইল, এই হ্রাস সাধনের পরেও ব্যবস্থাপরিষদে, শাসন-বিভাগে ও সরকারী চাকুরীতে হিন্দুদের ন্যায্য প্রাপ্য আসন-সংখ্যা শাসনতন্ত্রসম্মত উপায়ে আরও হ্রাস করা। স্যার সুলতান আহম্মদের প্রস্তাব হইল এইরূপ: তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৩·৫ এবং উপজাতি ৫·৬৫; হিন্দুসমাজ হইতে ইহাদিগকে বাদ দিলে হিন্দুগণ মোট জনসংখ্যার দাঁড়ায় শতকরা ৫১ ভাগ; মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৬·৮৩ ভাগ মুসলমানকে এই ৫১ ভাগ হিন্দুর সহিত সমান অংশে প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ৪০টি করিয়া কেন্দ্রীয় পরিষদের আসন বণ্টন করিয়া দেওয়া হোক। যে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য লীগের এত

উদ্বেগ—এমন কি, তাহাদেরও প্রতিনিধি-সংখ্যা কমাইয়া শতকরা ১০ জন করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে অনতিদূর অতীতের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা স্মরণ করা প্রয়োজন। মুসলমানগণ যেসব প্রদেশে সংখ্যালঘু, লক্ষ্মৌ-চুক্তি অনুযায়ী সেই সেই স্থানে তাহাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ 'ওয়েটেজে'র ব্যবস্থা করা হয়। তদনুযায়ী যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজে তাঁহাদের জনসংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ১৪ ও ৬·১৫ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের জন্য প্রতিনিধি-সংখ্যা ধার্য হয়, যথাক্রমে ৩০ ও ১৫। বিহারে ও উড়িষ্যায় তাঁহাদের লোকসংখ্যা শতকরা যথাক্রমে ১০ এবং ১১, অথচ তাঁহাদের প্রাপ্য আসন-সংখ্যা শতকরা ২৫। কিন্তু বাংলা ও পাঞ্জাবে যেখানে তাঁহাদের শতকরা ৫২·৩ ও ৫১ ভাগ সংখ্যাগুরুত্ব, সেখানে তাঁহাদের প্রতিনিধি-সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ৫০ ও ৪০। এই চুক্তি গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়া লন এবং ১৯২০ সালের শাসনসংস্কারে তদনুযায়ী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আসন বণ্টন করিয়া দওয়া হয়। কিন্তু মুসলমানগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া চুক্তিভঙ্গ করিলেন। তাঁহাদের বক্তব্য হইল, যে সকল প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে তাঁহাদের প্রতিনিধি-সংখ্যার হার কমাইয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে; সুতরাং তাঁহারা দাবী করিলেন, প্রতিনিধি-সংখ্যা এরূপভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে—সংখ্যাগরিষ্ঠতা যেন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠতায়—এমন কি, সংখ্যাসমতায় পরিণত না হয়। কিন্তু আজ সে আদর্শ আমূল পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে; মুসলিম লীগ অভিমতের প্রতি যাঁহারা সহানুভূতিসম্পন্ন, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুসম্প্রদায়কে অসহায় সংখ্যালঘিষ্ঠতায় পরিণত করিবার জন্য আজ তাঁহারা গম্ভীরভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতেছেন, প্রস্তাব রচনা করিতেছেন। হিন্দুরা যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ—যেমন সমগ্র ভারতে, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্যে শাসন নিপীড়নমূলক, সুতরাং নিন্দার্হ; কিন্তু মুসলমানপ্রধান উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে তাহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থনযোগ্য। স্যার সুলতান আহম্মদ প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় পরিষদে আসন বণ্টনের ব্যবস্থা এই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিনিধিগত সংখ্যাসাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সংখ্যাগুরু হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব হ্রাস করিয়া ও সংখ্যালঘু মুসলমানসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-সংখ্যা বর্ধিত করিয়া উভয় সম্প্রদায়কেই ৪০টি প্রতিনিধি প্রেরণক্ষম সমপর্যায়ে পরিণত করা হইয়াছে। স্যার সুলতান বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হইল ইহাই যে, হিন্দু ও মুসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করিবার দায়িত্ব রহিবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির হাতে।

এই ভারসাম্য রক্ষা করিবার কার্য কেবলমাত্র ব্যবস্থাপরিষদের পরিধির মধ্যেই সমাপ্ত নয়, শাসনবিভাগসমেত সরকারী চাকুরীর সর্বক্ষেত্রে এই পরিকল্পনার প্রভাব পরিব্যাপ্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা আরও অগ্রসর; ইহার দাবী, প্রধান মন্ত্রী পর্যায়ক্রমে মুসলমান ও অ-মুসলমান হইবেন; বলা বাহুল্য, খৃষ্টান, শিখ, পার্শী, উপজাতি, তপশীলী প্রভৃতি অন্যান্য সকল সম্প্রদায় 'অ-মুসলমান' সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য হিন্দুগণ হইবেন এই বহু ও বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহের অন্যতম। শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার সর্ত অনুযায়ী সাব্যস্ত হইয়াছে, কোন একটি নির্দিষ্ট

সময় অন্তে মুসলমানগণ স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত একজন প্রধান মন্ত্রী পাইতে পারিবেন, হিন্দুদের অবস্থা কিন্তু সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত এবং মুসলমানসমেত অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যদি হিন্দুদের বিরুদ্ধে একত্র মিলিত হন, তাহা হইলে প্রধান মন্ত্রীর পদ অধিকার করা তাঁহাদের পক্ষে কোন দিনও সম্ভব না হইতে পারে। হয়তো বলা হইবে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ হিন্দুদের প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের বিরুদ্ধে মিলিত হইবেন—এরূপ আশঙ্কা অন্যায় ও অমূলক; কিন্তু মুসলমান প্রধানমন্ত্রিত্বের বিরুদ্ধে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মিলিত হইবার আশঙ্কাও অনুরূপ অন্যায় ও অযৌক্তিক নয় কি? হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মিলন যতখানি সম্ভবপর, মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু ও বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মিলন-সম্ভাবনা তাহা হইতে আদৌ কম নয়। অন্যান্য সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া প্রধানমন্ত্রিত্ব পর্যায়ক্রমে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকারে না রাখিয়া স্যার সুলতান সুবিবেচনার কার্যই করিয়াছেন। আবার দেশরক্ষাবিভাগীয় মন্ত্রী ও প্রধানসেনাপতির পদও অনুরূপভাবে পর্যায়ক্রমে হিন্দু ও মুসলমান প্রার্থীর প্রাপ্য। এক্ষেত্রেও মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মিলিত হইলে হিন্দুদের পক্ষে ঐ দুইটি পদ লাভ করিবার সম্ভাবনা অতিশয় অল্পই রহিবে। এই সব দেখিয়া মনে হয়, ইহা সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার, প্রচেষ্টা নয়, সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়কে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও দণ্ডিত করিবার শাসনতান্ত্রিক অপকৌশল মাত্র।

স্যার সুলতান আহম্মদের পরিকল্পনার ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাগুলি দুর্বোধ্য। যাহা বলা হইয়াছে তাহার মর্মার্থ কি এই যে, স্থানীয় ও প্রাদেশিক জনসংখ্যার সাম্প্রদায়িক হার সমস্ত করপোরেশনে, মিউনিসিপাল কাউন্সিলে ও লোকাল বোর্ডে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রত্যেককে ৪০টী করিয়া আসন দিতে হইবে? এরকম প্রস্তাব কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার ক্ষেত্রে উত্থাপিত হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং আমার আশঙ্কা হয় স্যার সুলতান আহম্মদ কোনরূপ ভুলের বশবর্তী হইয়া তাঁহার প্রস্তাবিত পরিকল্পনার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন নাই। উড়িষ্যায় মুসলমান জনসংখ্যার হার শতকরা ১ বা ১·৫ জন, অথচ সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটিতে ও লোকাল বোর্ডে শতকরা ৪০টী আসন তাহাদিগকে দিতে হইবে—যথাযোগ্য গাম্ভীর্যের সহিত এরূপ প্রস্তাব যে স্যার সুলতান আহম্মদ কিরূপে করিতে পারেন তাহা কল্পনার অতীত।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতেও হিন্দু ও মুসলমান সৈনিক সংগৃহীত হইবে শতকরা ৫০ জন হারে এবং এক্ষেত্রেও যদি একজনও হিন্দু সৈন্যবিভাগে প্রবেশাধিকার না পায়—তাহা আইন ও শাসনতন্ত্র বিরোধী হইবে এরূপ মনে করিবার কোন হেতু থাকিবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গঠিত হইবে মুসলমান ছাড়া, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হইতে সংগৃহীত লোক দ্বারা। স্যার সুলতান আহম্মদ হয়তো এরূপ অভিপ্রায় পোষণ নাও করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু আমি তাঁহার ব্যবহৃত ভাষার ব্যাখ্যা

করিতেছি মাত্র। স্যার সুলতান আহম্মদের ন্যায় পদস্থ ব্যক্তির নিকট হইতে সঠিক ভাষার প্রয়োগই লোকে আশা করে এবং মুসলিম স্বার্থ যেখানে সংশ্লিষ্ট, তাঁহার উক্তি সেখানে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধহীন।

ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিগত স্বার্থের রক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পরিকল্পনানুযায়ী গোহত্যা ও আজানের অধিকার অব্যাহত থাকিবে, কিন্তু হিন্দু শোভাযাত্রাকে নিরাপত্তা ক্রয় করিতে হইবে—মসজিদের সম্মুখে গীত-বাদ্য বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে।

কেন্দ্রে রোমান অক্ষরে লিখিত ইংরাজি ভাষা ও প্রদেশসমূহে স্থানীয় ভাষার প্রচলন প্রস্তাব করিয়া, ভাষা-সঙ্কটের তিনি সমাধান করিয়াছেন। পরিকল্পনার পক্ষপাতদোষ ও তদন্তর্গত হিন্দুদের প্রতি অন্যায় ও অবিচার করিবার সম্ভাবনার প্রতি আমি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া এমন যেন কেহ না মনে করেন যে, আমার বক্তব্য, ইহার মধ্যে গ্রহণযোগ্য এমন কিছুই নাই, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া সংস্কারবিমুক্ত মন লইয়া শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে আলোচনা অসম্ভব এবং আলোচনার দ্বারা তাহা সংস্কৃত ও মার্জিততর করা অসাধ্য।

(আটত্রিশ)

স্যার আর্দেশির দালালের পরিকল্পনা

১৯৪৩ সালের মে মাসে 'পাকিস্থানের বিকল্প' শীর্ষক যে প্রবন্ধগুলি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় স্যার আর্দেশির দালাল তাহাতে বলিয়াছেন, 'ভারতবর্ষ যে কেবল পাহাড় ও সমুদ্র দ্বারা চিহ্নিত সীমারেখাবিশিষ্ট একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সত্তা তাহাই নয়, স্মরণাতীত কাল হইতে সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়াও একটী বিশিষ্ট সত্তারূপে সে বিদ্যমান। যুগে যুগে যে সমস্ত জাতি এদেশে আগমন করিয়াছে, জয় করিয়াছে ও বসবাস করিয়াছে, ভারতীয় সভ্যতা তাহার স্বভাবধর্ম, সহনশীলতা ও উপযোগিতার গুণে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ করিয়া লইয়াছে; এই সমস্ত জাতির যুগযুগান্তব্যাপী কৃষ্টি, প্রথা ও ঐতিহ্যের সমবায়ে এই সত্তা গঠিত। পাকিস্থানের অর্থ সেই অখণ্ড সত্তার বিশ্লেষণ।' অন্য কোন বিকল্প-ব্যবস্থা যদি খুঁজিয়া না পাওয়া যায়, তখন ইহা বিচার-বিবেচনার আমলে আসিতে পারে। ইহার তাৎপর্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিবার পর তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, 'পাকিস্থানের পরিণাম অন্য সকলের অপেক্ষা মুসলমানদের পক্ষেই অধিকতর বিপর্যয়জনক হইবে। ভারতের

এই অখণ্ড সত্তাকে বহুধা বিভক্ত করিবার পথে অর্থনৈতিক ও রাজস্বঘটিত প্রতিবন্ধক এত প্রবল যে, তাহা অলঙ্ঘ্য বলিলেও চলে।' 'রাজনৈতিক দলগুলি যতক্ষণ রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া ধর্মগত ভিত্তির উপর গঠিত থাকিবে, মুসলমানদের বিশ্বাস, বৃটিশ পার্লামেণ্টারী শাসনপদ্ধতির কল্যাণে ততক্ষণ তাহারা পরাধীন থাকিতে বাধ্য হইবে এবং অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক দলগুলি শাসনক্ষমতা অধিকার করিবার যে সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তাহা কোনদিন তাঁহারা পাইবে না। যুক্তরাষ্ট্রের অধীন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের বিরুদ্ধে তাহাদের আপত্তির মূলীভূত কারণ নাই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসাবে তাহা ফিরাইয়া আনিবার দায়িত্ব হিন্দুদেরই।' এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তিনি তাঁহার পাকিস্থানের বিকল্প-প্রস্তাব প্রদান করিয়াছেন। প্রস্তাবটির সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র হইবে, সাধারণ আইন দ্বারা শাসিত রাষ্ট্রসমূহের অনুকরণে পার্লামেণ্টারী শাসন ও বিচার বিভাগসমন্বিত বিধিবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরণের। উক্ত যুক্তরাষ্ট্র একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সুপ্রিম কোর্টের অনুশাসনাধীন রহিবে। কেবলমাত্র অতি-প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয় ও ক্ষমতা রহিবে যোগদানকারী ইউনিটসমূহের হস্তে।

কেন্দ্রীয় বিষয় হইবে, দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র নীতি, কারেন্সী, ক্রেডিট, শুল্ক, যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়কর, বহিরাগত ও বহির্গমন সমস্যা, নাগরিককরণ, রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ, জলপথ এবং শিল্পোন্নয়ন। মুসলমানগণ যে-সব অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেগুলি যাহাতে অর্ধস্বায়ত্তশাসনশীল রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসীমা রদ-বদল করিবার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় ইউনিটসমূহের কোন আপত্তি চলিবে না।

প্রত্যেকটি লোকের ব্যক্তিগত, নাগরিক ও ধর্মগত মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য **মৌলিক অধিকারের** এক **সনদ** দ্বারা নিম্নলিখিত মর্মে লিখিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে হইবেঃ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি অধিবাসী আইনের চক্ষে সমান।

সংবাদপত্র ও সভাসমিতির স্বমত ব্যক্ত করিবার অধিকার প্রদান করিতে হইবে। আইন কর্তৃক প্রদত্ত যোগ্যতাসম্পন্ন আদালত ব্যতীত অন্য কেহ কোন ব্যক্তির বিচার করিতে বা তাহাকে দণ্ডিত করিতে পারিবেন না, প্রত্যেকটি বসতবাটীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রহিবে।

কোন ব্যক্তি তাঁহার ধর্মমত, বিশ্বাস, জাতি, সংহতি, সম্প্রদায় বা নীতির জন্য কোনরূপে অসুবিধাগ্রস্ত হইবেন না। ধর্ম ও বিবেক সম্বন্ধীয় স্বাধীনতার সহিত মতবাদ, পূজা-অর্চনা, আচার-অনুষ্ঠান, প্রচার, সাহচর্য ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় স্বাধীনতারও প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। আইনের দৃষ্টিতে সব ধর্মই সমান বলিয়া বিবেচিত হইবে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি যে সমস্ত স্বার্থ তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য বলিয়া মনে করিবেন, রাষ্ট্র সেগুলি ও তৎসহ বিশেষ

করিয়া শিক্ষা, ভাষা, ধর্ম ও ব্যক্তিগত বিধান পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দান করিবেন। প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই নিজ ব্যয়ে দাতব্য ও ধর্ম প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় ও অন্যান্যবিধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন করিবার সমান অধিকার থাকিবে এবং সে সকলের মধ্যে তাঁহাদের প্রত্যেকেই আপন আপন ভাষা ব্যবহার করিতে ও ধর্মের অনুশীলন করিতে পারিবেন।

কোন গ্রামে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্ততঃপক্ষে পঞ্চাশটি শিশুর শিক্ষাদানের ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দাবী করিলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত অঞ্চলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন এবং শিক্ষক উক্ত সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষাদান করিতে পারিবেন।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ কর্তৃক স্থাপিত বিদ্যালয়, কলেজ ও কার্যকরী বিদ্যাশিক্ষাদান প্রতিষ্ঠানগুলি যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিধিবিধান মানিয়া চলেন, তাহা হইলে জনসাধারণ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়গুলির সহিত একই কর্তৃত্বের অধীন রহিয়া রাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে তাহাদের সমপরিমাণ সাহায্য লাভের অধিকারী হইবে।

ভোটদানের অধিকার সম্প্রসারিত করা হইবে বটে, কিন্তু পৃথক-নির্বাচন-প্রথা বহাল রাখিতে হইবে। মুসলিম সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য এবং মুসলমানগণ দাবী করিলে তাঁহাদের জন্যও সংরক্ষিত আসনসম্বলিত একাধিক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের ব্যবস্থা আরও বর্ধিত করিতে হইবে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানেও প্রয়োজন হইলে সংরক্ষিত আসনসম্বলিত একাধিক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে।

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুযায়ী মুসলমান ও তপশীলী সম্প্রদায়কে যে **'ওয়েটেজ'** প্রদত্ত হইয়াছে, কেবলমাত্র বাংলা ব্যতীত আর সমস্ত প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে তাহা বজায় রাখা হইবে; বাংলায় পারস্পরিক সম্মতিক্রমে সম্ভব হইলে পুণা-চুক্তি সংশোধন করিয়া লওয়া চলিবে। ইউনিটসমূহের সীমান্ত যদি পরিবর্তিত হয়, আসননির্ধারণ-ব্যবস্থাও কাজে কাজেই পরিবর্তিত হইবে। সেই সব পুনর্গঠিত ইউনিটসমূহের মধ্যে মুসলমানগণ যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হন, তথাপি তাঁহাদের প্রাপ্য বর্তমান 'ওয়েটেজের'ই তাঁহারা অধিকারী হইবেন এবং হিন্দুগণ যে সব অঞ্চলে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় হইবেন, সেখানে তাঁহারাও 'ওয়েটেজ' প্রাপ্ত হইবেন। যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা অত্যন্ত অধিক, সেখানে সাধারণ আসনগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়কে দিলে অন্যায় হইবে না। কোন ইউনিটে বা রাষ্ট্রেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের জন্য আসন এরূপভাবে নির্ধারিত হইতে পারিবে না, যাহার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘুত্বে পরিণত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে।

ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মধ্য হইতে লোক বাছিয়া লইয়া যে মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে, তাহাই হইবে **যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টের শাসন-পরিষদ।** কিন্তু তাহা হইবে কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট এবং তাহা গঠনের পদ্ধতি হইবে নিম্নলিখিতরূপঃ যে সকল সংখ্যালঘু দল কোন একটি নির্দিষ্টসংখ্যক

সর্বনিম্ন জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করিবেন তাঁহাদের এই গভর্ণমেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার থাকিবে এবং মন্ত্রিসভার মোট সদস্যসংখ্যার সহিত তাঁহাদের প্রতিনিধিসংখ্যার হার নির্ধারিত হইবে প্রদেশের বা রাষ্ট্রের সমগ্র জনসংখ্যার সহিত তাঁহাদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যার হার অনুযায়ী। অথবা তাহার বিকল্প ব্যবস্থাস্বরূপ ইহাও হইতে পারে যে, মন্ত্রিসভায় তাঁহাদের প্রতিনিধিসংখ্যা ধার্য হইবে ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের সদস্যসংখ্যার অনুপাতে।

সঠিক মন্ত্রিসংখ্যা নির্ধারণের জন্য একটি কমিশন গঠন করিতে হইবে। মন্ত্রিসভায় প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ব্যবস্থাপরিষদের সেই সেই সম্প্রদায়ের সদস্যগণ কর্তৃক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রথায় নির্বাচিত হইবেন। প্রধান মন্ত্রী অথবা তৎস্থানীয় অন্য যে কোন কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তি 'ক্যাবিনেট' গঠন করিবার সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আইনানুযায়ী নির্ধারিত সদস্যসংখ্যার অতিরিক্ত লোক শাসনপরিষদে গ্রহণ করিতে পারিবেন, উল্লিখিত সর্তসমূহের দ্বারা তাহার পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধক সৃষ্ট হইবে না।

কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট আসনের সংখ্যা শতকরা ৩৩, অর্থাৎ সমগ্র আসনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ হইবে; কিন্তু মহিলা, শ্রমিক, জমিদার ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিশেষ স্বার্থ বাদে সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত আসনসংখ্যা মোট আসনসংখ্যার শতকরা পঞ্চাশের অধিক হইবে না।

কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদ গঠিত হইবে কোয়ালিশন দ্বারা এবং তাহার মুসলিম সদস্যসংখ্যা মোট সদস্যসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের কম হইবে না। শাসন-পরিষদের মুসলিম সদস্যগণ ব্যবস্থাপরিষদের মুসলমান সদস্যগণ কর্তৃক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রথায় নির্বাচিত হইবেন। শিখ ও তপশীলী সম্প্রদায় হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন উল্লিখিত প্রথা অনুযায়ী। মন্ত্রিসভায় সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব মোট সদস্যসংখ্যা[র] শতকরা পঞ্চাশের অধিক হইবেন না। তাহা সত্ত্বেও প্রধান মন্ত্রী তাঁ[হার] ক্যাবিনেটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন সদস্যসংখ্যার অতিরিক্ত সভ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন, উল্লিখিত সর্তসমূহের দ্বারা তাঁহার সে অধিকার ব্যাহত হইবে না।

গভর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা-পরিষদের নিকট দায়ী রহিবেন এবং ব্যবস্থা-পরিষদ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারিবেন। এরূপ প্রস্তাব যে অধিবেশনে আনীত হইবে তাহাতে অন্ততঃপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন এবং উপস্থিত সদস্যগণের সুস্পষ্ট ভোটাধিক্যের দ্বারা সমর্থিত হইলে তবে তাহা গৃহীত হইবে।

কোন **বিল বা প্রস্তাব** অথবা তাহার অংশবিশেষ কোন ব্যবস্থাপরিষদে গৃহীত হইতে পারিবে না—যদি সেই পরিষদস্থ কোন সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য তাহার বিরুদ্ধে এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করেন যে, ইহার দ্বারা তাঁহাদের ধর্ম অথবা সংস্কৃতিগত স্বার্থ সাংঘাতিকভাবে ক্ষুণ্ণ হইবে, কিম্বা যে ব্যক্তিগত বিধান দ্বারা তাঁহারা এতাবৎকাল অনুশাসিত হইয়া আসিয়াছেন ইহা তাহার পরিপন্থী।

যাঁহাদের সদস্যসংখ্যা পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার অন্ততঃপক্ষে শতকরা ১৫ ভাগ নয়, তাঁহারা এরূপ আপত্তি উত্থাপন করিবার অধিকারী হইবেন না। কোন বিল বা প্রস্তাব এই ধারার আমলে আসিবে কিনা সে সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হইলে তাহা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারাধীন হইবে।

পাঁচজন বিচারক লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গঠিত হইবে; তাঁহাদের মধ্যে দুইজন হইবেন মুসলমান।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে মুসলমানের সংখ্যা কোন ক্ষেত্রেই ১৯৩৮ সালের আনুপাতিক হার অপেক্ষা ন্যূন হইবে না।

১৯৩৪ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখের এফ, ১৪।১৭-বি ৩৩ নম্বর ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে সরকারী চাকুরীতে যে সাম্প্রদায়িক হার নির্দিষ্ট হইয়াছে, প্রয়োজনমত কিছু রদবদল করিয়া শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় তাহাই বিধিবদ্ধ করিয়া লইতে হইবে।

শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ সেই উদ্দেশ্যে আহূত এক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানরূপে বিশেষ অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী ইউনিটসমূহের ব্যবস্থাপক সভা যদি দুই পরিষদ বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই উদ্দেশ্যে আহূত স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানরূপে প্রত্যেক পরিষদ কর্তৃক সাধারণ ভোটাধিক্যে তাহা নির্ধারিত হওয়া চাই।

যে কোন বিধান শাসনতন্ত্রসম্মত কি না তাহা বিচার করিবার চূড়ান্ত দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের।

ব্যবস্থাপক সভাসমূহের দ্বিতীয় চেম্বার গঠন, উভয় চেম্বারের সাধারণ ও স্বতন্ত্র অধিকারের সীমা-নির্ধারণ প্রভৃতি যে সব প্রশ্ন ভারতীয় শাসনতন্ত্রের আলোচনাকালে দেখা দিবে সে সব সম্বন্ধে উল্লিখিত প্রস্তাবে কোন ইঙ্গিত করা হয় নাই। সে সকল সমস্যা সমাধানের ভার গণপরিষদের হাতে ন্যস্ত হইবে। মূল কথা হইল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা এবং তাহা এই সব প্রশ্নের দ্বারা আদৌ আহত হইবে না।

দেশীয় রাজ্যসমূহের কথা বর্তমানে আলোচনার বহির্ভূত রাখাই বিধেয়।

উল্লিখিত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাই যে আদর্শস্থানীয় এমন দাবী করা হইতেছে না। 'আমার বিবেচনায় প্রস্তাবের সার মর্ম হইল, কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট গঠন।' সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত রক্ষাব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, ইহা সংশোধনযোগ্য এমন একটি লিপিবদ্ধ শাসনতন্ত্র যে, তাহার সংশোধনী আলোচনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তাঁহাদের বক্তব্য বলিবার পর্যাপ্ত সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন; ইহা তাঁহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত ও সৈন্যবাহিনী সহ সরকারী চাকুরীর সমস্ত বিভাগে তাঁহাদিগকে ন্যায় ও নীতিসঙ্গত যথাযোগ্য অংশ দিতে প্রস্তুত; ইহার দ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে ব্যবস্থাপরিষদে 'ওয়েটেজ' সহ প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমূহের শাসন বিভাগেও সদস্য পাঠাইবার ব্যবস্থা

বিহিত হইয়াছে; কোন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যোগদানকারী ইউনিটগুলিকে যে পরিমাণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়া সম্ভব, ইহার দ্বারা তাহা প্রদত্ত হইয়াছে এবং সর্বশেষে, শাসনতন্ত্রের কোন বিধান যদি লঙ্ঘিত হয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে সেক্ষেত্রে চূড়ান্ত হস্তক্ষেপের অধিকার ইহা প্রদান করিয়াছে।

বিহিত রক্ষাব্যবস্থার বিধানসমূহ কেবলমাত্র কাগজ-কলমের ব্যাপার নয়। সেগুলি লঙ্ঘন করিতে গেলে সমগ্র শাসনতন্ত্র ভাঙিয়া পড়িবে এবং এমন কি, গৃহযুদ্ধও আসন্ন হইয়া উঠিতে পারে। এই পরিকল্পনা স্থায়ীভাবে গৃহীত না হইলেও, অন্ততঃপক্ষে দশ বৎসরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে; তাহার পর মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের মনোমত স্বতন্ত্র পথ বাছিয়া লইতে পারিবেন।

তাহা ছাড়া, একথা ভুলিলে চলিবে না যে, যুদ্ধ শেষ হইলে জাতিসংঘ অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সে প্রতিষ্ঠান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির রক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিতে বাধ্য। স্যার আর্দেশির দালাল একজন পার্শি, কাজেই ক্ষমতা অধিকার করিবার প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত না হইবার সুযোগ তাঁহার আছে। সুতরাং তাঁহার রচিত পরিকল্পনা এমন এক নিরপেক্ষ সূত্র হইতে নির্গত হইয়া আসিতেছে বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, প্রধান দুইটি সম্প্রদায়ের কোনটির অনুকূলেই পক্ষপাতিত্ব পোষণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে মিলিত মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন এবং সুপারিশ করিয়াছেন, ব্যবস্থাপরিষদে ও মন্ত্রিসভায় মুসলমানগণ তাঁহাদের জনসংখ্যার আনুপাতিক হার অনুযায়ী প্রাপ্য আসন অপেক্ষা অধিকসংখ্যক আসন পাইতে পারিবেন—কেবলমাত্র এই সর্তাধীনে যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিসংখ্যা মোট প্রতিনিধিসংখ্যার শতকরা পঞ্চাশের অধিক হইবে না। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি হইতে মন্ত্রিসভায় প্রতিনিধি ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রথায় নির্বাচিত হইবেন। যে-কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য যতসংখ্যক আসন নির্দিষ্ট হইবে, তাহা অপেক্ষা অধিক আসন তাহাকে প্রদান করিবার ক্ষমতা প্রধান-মন্ত্রীর থাকিবে। কাজেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি যদি প্রধান মন্ত্রীর বিশ্বাসভাজন হন, তাহা হইলে শতকরা পঞ্চাশটির অধিক আসন অধিকার করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে।

(উনচল্লিশ)

ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখার্জি রচিত সাম্প্রদায়িক সমস্যার নূতন সমাধান

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতিসঙ্ঘের আহ্বানে, অধিনায়কতায় ও আশ্বাসে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহা এবং সোভিয়েট রাশিয়ার শাসনতন্ত্র ও তাহার ক্রমবিবর্তন অধ্যয়ন করিয়া ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জি কতগুলি সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হন এবং সেই সিদ্ধান্তগুলি 'সাম্প্রদায়িক সমস্যার নূতন সমাধান' শীর্ষক এক প্রচার-পত্রিকার সাহায্যে প্রকাশ করেন। তাঁহার বক্তব্যের সারমর্ম নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

সাম্প্রদায়িক সমস্যা একটি বিশ্বজনীন ব্যাপার; তাহার কারণ, রাজনৈতিক ও জাতীয় সীমান্তকে সংহত, ধর্ম ও সমাজ সীমান্তের সহিত একাকার করিয়া মিলাইয়া দিবার চেষ্টা প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার দরুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই তাহার অভ্যন্তরে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সংহতির জন্য স্থান সঙ্কুলান করিতে হয় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিঃশেষে বিলুপ্ত করা কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব হয় না। এই জন্যই তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা বিধানের উদ্দেশ্যে উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরে ১৮৫৬ সালের ৩০শে মার্চ তারিখে যে প্যারিস-চুক্তি সম্পাদিত হয়, তদনুযায়ী স্থির হয় যে, কোন দেশেই ধর্ম অথবা সংহতিগত কারণে কোন এক শ্রেণীর প্রজা অপর এক শ্রেণীর প্রজা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবেন না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এ সম্পর্কে যে নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইল, রাজনীতিক্ষেত্রে 'মাইনরিটিজ গ্যারাণ্টী ট্রিটীজ' নামে তাহা পরিচিত; আন্তর্জাতিক ও আইনসঙ্গত মর্যাদায় মণ্ডিত হইয়া, জাতিসঙ্ঘের সদস্য বলিয়া পরিগণিত ৫২টি রাষ্ট্রের দ্বারা তাহা গৃহীত হইল অবশ্য-পালনীয় নির্দেশরূপে।

একই সাধারণ রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণীর যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, (১) ভাষা, (২) সংহতি ও (৩) ধর্ম। কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বিশেষ ব্যবহার পাইবার যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইলে, তুরস্কের শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী সংখ্যাগতভাবে দেশের মোট জনসংখ্যার একটা বিশিষ্ট অংশ তাহাকে হইতে হইবে; এই সংখ্যাগত বৈশিষ্ট্য মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগরূপে ধার্য হয়, কারণ যে সম্প্রদায়ের সংখ্যানুপাত তদপেক্ষা কম, তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিধান করা কি অর্থনীতি, কি শাসননীতি—সকল দিক দিয়াই কার্যতঃ অসম্ভব।

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের রক্ষার জন্য যে প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয়, তাহা কেবল সংহতি, ধর্ম ও ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এইগুলির ভিতর দিয়া যে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠিয়াছে কেবলমাত্র তাহাই শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ কোন সম্প্রদায় এইগুলির সাহায্যেই তাহার বৈশিষ্ট্য বিবর্তনের পথে অগ্রসর হইয়া, বিশ্বমানবীয় সংস্কৃতির সাধারণ ভাণ্ডারে আপন অবদানের অঞ্জলি প্রদান করিতে সক্ষম। এইজন্যই আপন মাতৃভাষার অনুশীলন করিবার অধিকার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের থাকা বিধেয়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বালকবালিকাগণ তাহাদের আপন মাতৃভাষা ও বর্ণমালার সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিবে এবং রাষ্ট্র অন্যূন ৪০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য এক এক অঞ্চলে এক একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। উপরন্তু শাসন-বিভাগীয় সাধারণ ব্যয়ের অংশ ও সরকারী সাহায্য ছাড়াও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তাহাদের ছাত্রসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী শিক্ষা-বিভাগীয় ব্যয়-বরাদ্দের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার দরুণ ধার্য অংক হইতে তাঁহাদের প্রাপ্য অংশ লাভ করিবেন।

সংহতি রক্ষার প্রতিশ্রুতি প্রসঙ্গে ঘোষিত হয়, আপন আপন আচার ব্যবহার এবং ব্যক্তি, বিবাহ ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় বিধানের মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের যে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান তাহার সংরক্ষণ ও বিকাশের অধিকার সম্প্রদায় মাত্রেরই থাকিবে, কারণ এইগুলিই হইল তাহার নিজস্ব ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্মগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দাবী সভ্যদেশ মাত্রেই বহুপূর্বেই স্বীকৃত হইয়াছে। এ সম্পর্কে তুরস্কের শাসনতন্ত্রে যে বিধান আছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই আমরা আমাদের শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা রচনা করিতে পারি; তুরস্কের শাসনতন্ত্র হইতে সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ 'প্রত্যেক অধিবাসী তাঁহার নিজ নিজ নীতি, ধর্ম ও বিশ্বাস গোপনে ও প্রকাশ্যে স্বাধীনভাবে অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিবেন—কেবলমাত্র এই সর্তে যে, তাঁহার আচরণ সাধারণের শান্তি ও নীতিবোধের বিরোধী না হয়। তুরস্কের অ-মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিকগণ আইনগত আচরণ ও আশ্রয়ের দিক দিয়া তুর্কী নাগরিকদের সহিত সমান অধিকার সম্ভোগ করিবেন। বিশেষ করিয়া, দাতব্য, ধর্মগত, সামাজিক অথবা শিক্ষাসম্বন্ধীয় যে-কোন প্রতিষ্ঠান তাঁহারা নিজ ব্যয়ে স্থাপন ও পরিচালন করিতে পারিবেন এবং সেইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিজেদের ভাষা ব্যবহারের ও ধর্ম অনুশীলনের অধিকার তাঁহাদের অক্ষুণ্ণ থাকিবে।'

তুরস্কের শাসনতন্ত্রে শাসন-বিভাগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্থান নিম্নলিখিত রূপঃ 'ধর্ম, বিশ্বাস ও আচরণগত পার্থক্য হেতু তুরস্কের কোন নাগরিক রাজনৈতিক অথবা নাগরিক অধিকার সম্ভোগের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবেন না, অর্থাৎ, সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ, সরকারী সম্মানলাভ, সাধারণ অনুষ্ঠানে যোগদান এবং স্ব স্ব বৃত্তি ও ব্যবসায় অনুসরণ প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহার অবাধ অধিকার থাকিবে। তুরস্কের অ-মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তুর্কী মুসলমানদের সহিত রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সমপরিমাণে সম্ভোগ করিবেন। ধর্মনির্বিশেষে তুরস্কের অধিবাসীমাত্রই আইনের দৃষ্টিতে সমান বলিয়া বিবেচিত

হইবেন। সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ, সাধারণ অনুষ্ঠানে যোগদান, সামরিক সম্মানসহ সরকারী উপাধিলাভ ও সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে সকল নাগরিকই সমমর্যাদাসম্পন্নরূপে বিবেচিত হইবেন।'

যে সকল স্বার্থ ও বিষয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের আত্মবিকাশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এই পরিকল্পনায় সেগুলি রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি ও সেইসব ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা প্রচেষ্টারও একটা সীমা আছে এবং সে সীমা হইতেছে রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা; একার্যে সকল সম্প্রদায়কে সর্বস্ব পণ করিয়া আত্মনিয়োগ করিতে হইবে এবং কোন সম্প্রদায়কেই তাহার অতিরঞ্জিত ও অত্যধিক পরিমাণ দাবীর দ্বারা রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ করিতে দেওয়া হইবে না।

ইউ, এস, এস, আর, কে অতি উৎকট সাম্প্রদায়িক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ দ্বারা ইউনিয়ন গঠিতঃ (১) লোক-সংখ্যা ১৭ কোটি, (২) ১৮০টি স্বতন্ত্র জাতি, (৩) ১৫১টি পৃথক ভাষা, (৪) ১১টি জাতীয় সাধারণতন্ত্র এবং (৫) ২২টি স্বায়ত্তশাসনশীল সাধারণতন্ত্র। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট জার-সরকারের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রাপ্ত হয় ও চতুর্দিক হইতে তাহার আক্রমণে সংকটাপন্ন হয়। বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিবাসী বিভিন্ন জাতিকে ঐক্যবন্ধ করা জার-শাসনের উদ্দেশ্য ছিল না; সে চাহিত, পারস্পরিক বৈরিতায় জর্জরিত হইয়া তাহারা দিনযাপন করুক। সাম্রাজ্য শাসিত হইত রুশ জাতির স্বার্থে এবং তাহার তুলনায় অন্যান্য সমস্ত জাতি হীন ও হেয় বিবেচিত হইত; সেইজন্য রুশ ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত জাতির নির্দয় ও নির্বিচার রুশীকরণই ছিল সংগ্রামশীল ও আক্রমণাত্মক রুশীয় জাতীয়তাবাদের মূলনীতি। তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইবার যে মনোভাব ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠে আত্মনিয়ন্ত্রণের ধ্বনি তাহাকে প্রেরণা ও পুষ্টি যোগায়। বলশেভিকগণ শাসনক্ষমতা অধিকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে জারের শাসননীতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গেলঃ বিচ্ছিন্ন হইবার মনোভাব ব্যাহত ও ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা ঘোষণা করিলেন, মুসলমান, তাতার, তুর্কী প্রভৃতি জাতিসমূহ অতঃপর অবাধে তাঁহাদের স্ব স্ব ধর্মবিশ্বাস ও আচার-ব্যবহার অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিবেন, তাঁহাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতি এখন হইতে অক্ষুণ্ণ ও বিপ্লবের বলিষ্ঠ বাহুর রক্ষণাধীন রহিবে। এই ঘোষণার দ্বারা কার্যতঃ প্রাক্তন রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সকল জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। বিভিন্ন জাতির স্বেচ্ছাসম্মত সমবায়ের দ্বারা যে সোভিয়েট কমনওয়েল্‌থ গঠিত হয়, ১৯১৮ সালের শাসনতন্ত্রে তাহা 'রাশিয়ান সোস্যালিষ্ট ফেডারেটিভ সোভিয়েট রিপাব্লিক' ('আর, এস, এফ, এস, আর') নামে আখ্যাত। বলশেভিকগণ এই ঘোষণাবাণীর আদর্শে ইউক্রেন, হোয়াইট রাশিয়া, ট্রান্স ককেসিয়ান ফেডারেশন, সেণ্ট্রাল এসিয়াটিক রিপাব্লিক প্রভৃতি অন্যান্য সাধারণতন্ত্র গঠন করিলেন। এই সকল সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমবায়ে যে বৃহত্তর যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় তাহার নূতন নামকরণ হইল 'ইউনিয়ন অব্‌

সোস্যালিস্ট সোভিয়েট রিপাব্লিক' (ইউ, এস, এস, আর); রাষ্ট্রীয় আখ্যা হইতে 'রাশিয়ান' শব্দটি এতদিনে একেবারে বর্জিত হইল।

ইউ, এস, এস, আর বস্তুতঃ একটি মহা-যুক্তরাষ্ট্র, কারণ ইহার অন্তর্গত অনেক ইউনিট নিজেরাই এক একটি যুক্তরাষ্ট্র। এইরূপে একাদশটি জাতীয় বা ইউনিয়ন সাধারণতন্ত্রই সর্বোচ্চ পরিমাণ ক্ষমতার অধিকারী। তাহারা সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্তশাসনশীল এবং আপন আপন প্রতিনিধির মারফৎ ইউ, এস, এস, আরের মিলিত পরিচালনার অন্যতম অংশীদার। স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সম্পাদন ব্যাপারে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন, এমন কি, ১৯৩৬ সালের শাসনতন্ত্রের ১৭ ধারা অনুযায়ী ইউনিয়ন হইতে তাহাদের বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার পর্যন্ত স্বীকৃত। অবশিষ্ট ২২টি স্বায়ত্তশাসনশীল সাধারণতন্ত্রের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃত হইলেও, আভ্যন্তরীণ দায়িত্ব সম্পাদনের মধ্যেই তাহা সীমাবদ্ধ, ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার তাহাদের নাই। সর্বশেষে তৃতীয় আর এক শ্রেণীর এমন কতগুলি স্বায়ত্তশাসনশীল সংগঠন আছে, যাহাদের সংখ্যা কখনও হ্রাস এবং কখনও বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; ইহাদের স্বায়ত্তশাসন অধিকারও স্থানীয় ব্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং যে অঞ্চলের মধ্যে ইহাদের সমবায় সংঘটিত, ইহাদের পরিচালনভার সেই অঞ্চলস্থ 'ইউনিয়ন রিপাব্লিক' বা 'অটোনমাস রিপাব্লিকের' নিয়ন্ত্রণাধীন। আপনাকে সুগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে নূতন শাসনতন্ত্রের প্রথম কর্তব্য হইল, ভৌগোলিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, নূতন আঞ্চলিক বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা জাতীয় নীতির ভিত্তিতে নিজেকে এরূপভাবে পুনর্গঠিত করা যে, নিয়ত ও পরস্পর সংঘাতশীল বহু জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত তৎকালীন প্রদেশগুলির অস্তিত্ব পর্যন্ত যেন নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়।

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ও ইউনিটগুলির মধ্যে শাসনক্ষমতার বণ্টন মোটামুটি নিম্নলিখিতরূপঃ বৈদেশিক নীতি, দেশরক্ষা, যানবাহন, ডাক ও তার বিভাগ ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের অধীন; অর্থনীতি, রাজস্ব ও শ্রমিক সমস্যা ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট ও তাহার সদস্যসমূহের যৌথ কর্তৃত্বের অধীন এবং আইন, জনস্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা-বিভাগ পরিচালিত হয় সদস্য রাষ্ট্র, স্বায়ত্ত-শাসনশীল সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলসমূহের স্থানীয় কর্তৃত্বের দ্বারা। অতএব দেখা যাইতেছে বিভিন্ন সোভিয়েটসমূহ এইসব নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে স্বায়ত্তশাসন ও পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সম্ভোগ করিয়া থাকে। রাশিয়ার বিভিন্ন জাতি-গুলির মধ্যে সাম্য সংস্থাপনই হইল বর্তমান শাসনব্যবস্থার মূলনীতি এবং সে নীতি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে স্বায়ত্তশাসনের মধ্য দিয়া অনুন্নত অঞ্চল ও সম্প্রদায়গুলির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিগত মান উন্নীত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন। প্রত্যেক সম্প্রদায় তাহার নিজস্ব ভাষায় শিশুদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা-দান করিয়া থাকে। যাহাদের বর্ণমালা নাই, তাহাদের জন্য বর্ণমালা তৈয়ারী করিয়া দিবার চেষ্টা হইয়া থাকে এবং সেই চেষ্টার ফলে ৭৪টি বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণমালা তৈয়ারী করিয়া দেওয়া সম্ভব হয়।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি যাহাতে সমগ্র ইউনিয়নের অখণ্ডতা ও ক্ষমতা ক্ষুন্ন করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের স্থানীয় স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সীমাবদ্ধ। এ সম্বন্ধে মিঃ ওয়েবস্ বলেন, 'রাষ্ট্র সমগ্ররূপে তাহার অখণ্ডতা অক্ষুন্ন রাখে এবং অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মতই কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব আরও শক্তিশালী করে। কেবলমাত্র ইউ, এস, এস, আরেই কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব বৃদ্ধির দরুণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য মোটেই ক্ষুন্ন হয় না।' ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু শাসন-প্রতিষ্ঠান একে অপরের মধ্যে এরূপভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে যে, তাহাদের পরস্পরের অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে বস্তুতঃ কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করা অসম্ভব; তাহার ফলে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের পরিধি কিছুটা সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য। উচ্চতর শাসন-প্রতিষ্ঠান তাহার নিম্নস্থ শাসনযন্ত্রের কর্তব্য করায়ত্ত করিতে পারে এবং তাহার দরুণ কর্তব্যকার্যের যদি কোন ত্রুটী হয়, সে দায়িত্ব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের একার নয়, উভয় রাষ্ট্রই সম পরিমাণে তাহার জন্য দায়ী হইবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তি হইল এমন এক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যাহা পূর্ণতঃ সমস্ত দেশের ও অংশতঃ প্রতিটি খণ্ডের সমগ্র জীবনধারা আপন সর্বব্যাপী আলিঙ্গনের আয়ত্তে আনিতে চায়। বাহ্যতঃ মনে হয়, শাসনতন্ত্রের ১৫ নম্বর ধারা বুঝি বা যুক্তরাষ্ট্রের অধিকার সঙ্কুচিত করিতেছে। কিন্তু কার্যতঃ ইহা বিভিন্ন সম্প্রদায়কে তাহাদের নিজ নিজ বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্ব স্ব ভাষা ব্যবহারের অধিকার দান ছাড়া আর কিছুই করিতেছে না।

বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার অসংখ্য স্বায়ত্তশাসনশীল সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলসমূহের প্রাপ্য নয়, সে অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে কেবলমাত্র ১১টি জাতীয় বা ইউনিয়ন সাধারণতন্ত্রকে। ষ্টালিনের ভাষায় বলিতে গেলে, 'বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার সম্বন্ধে কমিউনিষ্ট পার্টির মনোভাব নিয়ন্ত্রিত হয় আন্তর্জাতিক অবস্থা ও বিপ্লবের স্বার্থ—এই দুইটি বিবেচ্য বাস্তব ঘটনার দ্বারা। এই কারণেই কমিউনিষ্টগণ মিত্রশক্তিবর্গের কবল হইতে উপনিবেশগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিবার পক্ষপাতী; এবং সেই একই কারণে সোভিয়েট-প্রভাব হইতে সীমান্ত অঞ্চলগুলি বিচ্ছিন্ন হইতে দিবার তাহারা বিরোধী।' ইহার তিন বৎসর পূর্বে ১৯১৭ সালে ষ্টালিন বলেন, 'নির্যাতিত জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হইবার এবং তাহাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ তাহাদের নিজেদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবার অধিকার আমরা স্বীকার করি বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা এই মুহূর্তে কোন কোন জাতি রুশরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত কিনা সে প্রশ্ন মীমাংসিত হয় না।...এইজন্যই সর্বহারা শ্রেণীর ও তাহাদের বৈপ্লবিক স্বার্থের অনুকূলে প্রয়োজনমত কখনও বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকারের পক্ষে আবার কখনও বা তাহার বিপক্ষে স্বচ্ছন্দে আমরা আন্দোলন পরিচালন করিতে পারি।' কেহ কেহ যে কোন কোন অঞ্চল ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এমন বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ ১৯৩৭-৩৮ সালের দলীয় শুদ্ধির সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বায়ত্তশাসনশীল সাধারণতন্ত্র বিচ্ছিন্ন হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন ইউনিয়ন

সাধারণতন্ত্রে উন্নীত হইতে পারে নিম্নলিখিত তিনটি সর্তেঃ (১) সংশ্লিষ্ট সাধারণতন্ত্র এমন একটি রাজ্য হইবে যে, সোভিয়েট রাষ্ট্র তাহার বহির্গমনের পথ রোধ করিয়া চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া নাই; (২) যে জাতির নামানুযায়ী সাধারণতন্ত্রটি আখ্যাত হইবে তাহার সংখ্যাগুরুত্ব অল্পবিস্তর এরূপ সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, ওই রাষ্ট্রের অন্য কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেন রাষ্ট্রের নামে বিচ্ছিন্ন হইবার দাবী না করিতে পারে; (৩) সাধারণতন্ত্রের লোকসংখ্যা দশ লক্ষের কম হইলে চলিবে না,অধিক হওয়া চাই।

এইরূপে ইউ, এস, এস, আর ইউনিয়নে যোগদানকারী সাধারণতন্ত্রগুলিকে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার দিল বটে, কিন্তু আপনাকে এমনভাবে গঠিত করিয়া লইল, যাহাতে নিজে কেন্দ্রস্থ রহিয়া সাধারণতন্ত্রগুলিকে আপন পরিধির মধ্যে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, সাধারণতন্ত্রগুলি একবার ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইলে, বাহির হইতে চাওয়া দূরে থাকুক, তাহারাই ইউনিয়নকে ক্রমশঃ আরও আত্মকেন্দ্রিক করিয়া তোলে। ভারতের অখণ্ড সত্তা ক্রম-বিবর্তনশীল নয়, তাহার অখণ্ডতা পরিপূর্ণ ও পরিসমাপ্ত এবং বর্তমান গভর্ণমেণ্ট শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া সেই আকারেই তাহাকে শাসন করিয়া আসিতেছেন। কালস্রোত উজান ঠেলিয়া পুনরায় অতীতে যাইবার চেষ্টা বিফল; তাহা না করিয়া, স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষীয় ও বিপক্ষীয় অভিমত যাঁহারা পোষণ করেন, ইউ, এস, এস, আরের দৃষ্টান্ত অনুসরণে বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য দান করিয়া, তাঁহাদিগকে সন্নিবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করাই কর্তব্য। মুসলমানগণের আশঙ্কা, হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের সহিত মিলিত হইয়া ইউনিয়ন গঠন করিলে মুসলিম রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হইবে। মূল রাষ্ট্রকে খণ্ডিত না করিয়াও বিভিন্ন উপায়ে এ অসুবিধার দূরীকরণ সম্ভবপর; (১) প্রথম, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক কর্তব্যের নির্ঘণ্ট এমনভাবে তৈয়ারী করিতে হইবে, যাহাতে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় এবং ফলে পাকিস্থান রাষ্ট্র কার্যতঃ পরিণত হয় সার্বভৌম রাষ্ট্রে; (২) দ্বিতীয় সমাধান হইল, ইউ, এস, এস, আরের আদর্শে প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান; (৩) অর্থনীতির দিক দিয়া যদি আত্মনির্ভর হয়, তাহা হইলে প্রদেশগুলিকে ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা—ইহাই হইল তৃতীয় সমাধান।

এই জাতীয় যে-কোন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মিঃ জিন্নার আপত্তি হইতেছে, 'শাসনতান্ত্রিক অথবা অন্য যে কোন প্রকারের রক্ষাকবচ কোনই কাজে আসিবে না; কেন্দ্রে যতক্ষণ হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিদ্যমান, রক্ষা-ব্যবস্থাগুলি ততক্ষণ কেবলমাত্র কাগজস্থই রহিয়া যাইবে।' ইহার জবাবে এই কথা বলা যায় যে, সম্প্রদায়সমূহের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থের রক্ষক হইবে স্বয়ং আইন ও শাসনতন্ত্র। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের জন্য রক্ষাকবচ পর্যালোচনা ও প্রয়োগের জন্য আবশ্যক হইলে শাসনতন্ত্রের দ্বারাই সুপ্রিম কোর্টের মত একটি বিচার প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতে পারে এবং যদি কোন সম্প্রদায় মনে করেন, তাঁহাদের স্বার্থ উপেক্ষিত হইতেছে, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে সেই প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে

তাঁহাদের অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়া বিচার প্রার্থনা করিতে পারিবেন। সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত হইবে না। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে ইউনিয়ন গঠিত হইবে, তাহা তাহার নিজস্ব শাসনতন্ত্রের দ্বারা বিহিত রক্ষাব্যবস্থা বাতিল অথবা ব্যত্যয় করিতে পারিবে না এবং অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত সুপ্রিম কোর্টও নিরপেক্ষভাবে তাহা প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইবে।

(চল্লিশ)

পাকিস্থানের পক্ষে কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থন

ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি পাকিস্থান দাবী সমর্থন করেন এবং সে সমর্থনের অনুকূলে যুক্তি অনুসন্ধানের জন্য পার্টির নেতাগণ যদি ইউ, এস, এস, আরের শাসনতন্ত্র ও মঃ ষ্টালিনের রচনার দ্বারস্থ হন তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, অখণ্ড হিন্দুস্থান সম্মেলনের সভাপতি ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখার্জিও প্রেরণা আহরণ করিয়াছেন সেই উৎস হইতে এবং প্রস্তাব রচনা করিয়াছেন সেই আদর্শে। এই কারণে এ সম্বন্ধে মঃ ষ্ট্যালিনের যে অভিমত কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বারা সমর্থিত ও ইউ, এস, এস, আরের শাসনতন্ত্রে বিধিবন্ধ, ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের সময় হইতে তাহার ক্রম-বিবর্তনের ধারা বিস্তৃত-ভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

জাতির সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া মঃ ষ্ট্যালিন বলেন, 'জাতি বলিতে ঐতিহাসিক ধারা অনুযায়ী বিবর্তিত এমন এক সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজ বুঝায়, যাহার ভাষা, অঞ্চল, অর্থনৈতিক জীবন, মানসিক গঠনগত ঐক্য একটি মাত্র সংস্কৃতির মধ্যে বিকাশ লাভ করিয়াছে।'১ অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনার মত 'ইহাও পরিবর্তনশীল ও ঐতিহাসিক ধারার অনুগামী; ইহারও আদি আছে এবং অন্ত আছে। এখানে বিশেষ করিয়া বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য-গুলির মধ্যে কোনটিই এককভাবে জাতির সংজ্ঞা নির্ধারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। পক্ষান্তরে তাহাদের যে কোন একটির অনুপস্থিতিই 'জাতিকে' জাতিচ্যুত করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত।' ২ বর্তমান কালের জাতিগুলির উদ্ভব বিশেষ কোন একটি যুগে এবং সে যুগ হইতেছে উদীয়মান পুঁজিপ্রথার যুগ। সামন্ত-প্রথার উচ্ছেদ ও পুঁজি-প্রথার উদ্ভব যে ঐতিহাসিক ধারার অনুবর্তী, বিভিন্ন সংহতিসমূহের

---

1. M. Stalin: 'Marxism and the National and Colonial question', p. 8.
2. Ibid., p. 8.

জাতিত্বে পরিণতি তাহারই অনুসরণের ফল। বিশৃংখল সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে পরাভূত করিয়া ধনতন্ত্রের জয়যাত্রা যেদিন সুরু হইল, সেই দিনই সেই বিজয়-অভিযানের পথে ইংরাজ, ফরাসী, জার্মাণী ও ইতালি প্রভৃতি জাতি জন্মলাভ করিল।

'যেখানে জাতিগুলির জন্মকাল কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্মকালের সহিত সমসাময়িক, সেখানে স্বাভাবিক নিয়মের বশেই জাতীয় সত্তা রাষ্ট্রীয় সত্তার বহিরাবরণের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়িল এবং ফলে গড়িয়া উঠিল 'বুর্জোয়া ন্যাশনাল ষ্টেট'। ফ্রান্স, ইতালি ও আয়র্লণ্ড বর্জিত গ্রেট-বৃটেনের জন্ম-বৃত্তান্ত ইহাই। পক্ষান্তরে পূর্ব ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিধ্বস্ত করিয়া জাতি-গঠনের পূর্বেই মোগল, তুর্কী প্রভৃতি জাতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার তাগিদেই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। এই কারণেই এ অঞ্চলের জাতি-গুলি জাতীয় রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম হয় নাই, হয়তো তাহার প্রয়োজনও অনুভব করে নাই; তাহার পরিবর্তে সেখানে গঠিত হইল একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন জাতির সমবায়ে বহু দুর্বল বুর্জোয়া রাষ্ট্র; দৃষ্টান্তস্বরূপ অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও রাশিয়ার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

'ফ্রান্স ও ইতালির মত যে সব জাতীয় রাষ্ট্র আপনাদের জাতীয় সৈন্য-বাহিনীর উপরেই প্রধানতঃ নির্ভরশীল, জাতীয় নির্যাতনের সহিত তাহারা আদৌ পরিচিত নয়। বহু জাতির সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্রগুলির অবস্থা কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত। একটি শক্তিশালী জাতি বা শাসকশ্রেণীর প্রভুত্বের ভিত্তি করিয়া ইহারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জাতীয় নির্যাতন এবং জাতীয় আন্দোলনের ইহারা জন্ম ও কর্মভূমি। শাসক ও শাসিত জাতির স্বার্থের মধ্যে এরূপ উৎকট বিরোধিতা বিদ্যমান যে, তাহাদের সমাধান না হইলে বহু জাতির সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব অসম্ভব। এই জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির বিড়ম্বনাই এই যে, এই বিরোধিতার অবসান ঘটাইতে তাহারা অক্ষম; শুধু তাহাই নয়, শ্রেণী-বৈষম্য ও ব্যক্তিগত অধিকার বজায় রাখিয়া যতবার তাহারা জাতিগত বিভেদ বিদূরিত করিতে, সংখ্যালঘু জাতিসমূহের স্বার্থরক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়, ততবার তাহাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় ও জাতিগত বিরোধিতা প্রবলতর আকারে আত্মপ্রকাশ করে।

'পরবর্তীকালে ইউরোপে পুঁজিবাদের পুষ্টি, নূতন নূতন বিক্রয়ের বাজারের আবশ্যকতা, কাঁচামাল ও জ্বালানীর তৈলের সন্ধান এবং পরিশেষে সাম্রাজ্যবাদের প্রসার, মূলধনের রপ্তানি ও বহু বিস্তীর্ণ জল ও স্থলপথ রক্ষণা-বেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার চাপে একদিকে যেমন গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মাণী ও ইতালির মত জাতিগত বিরোধ ও বৈরিতা কণ্টকিত পুরাতন জাতীয় রাষ্ট্রগুলি নব নব অঞ্চল অধিকার করিয়া আপনাদিগকে বহু জাতির সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্রে (ঔপনিবেশিক) পরিণত করিতে বাধ্য হইল, অপর দিকে তেমনি বহু জাতির সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রভুত্বপরায়ণ জাতিসমূহ নব-উদ্দীপিত আশা-আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় অধীর হইয়া পুরাতন রাষ্ট্রসীমার মধ্যে আবদ্ধ রহিতে পারিল না। নূতন নূতন দুর্বল রাজ্য জয় করিয়া প্রাচীন রাষ্ট্রসীমা সম্প্রসারিত করিতে

লাগিল। এইভাবে জাতীয় সমস্যাগুলি ঘটনাপরম্পরার আঘাতে ক্রম-প্রসারিত হইয়া উপনিবেশসমূহের সাধারণ সমস্যার সহিত একাকার হইয়া গেল। এতদিন যাহা ছিল জাতিগত নির্যাতন, এখন তাহা রাষ্ট্রগত সংগ্রাম ও সংঘর্ষের রূপ ধারণ করিল: সাম্রাজ্যবাদী প্রধান প্রধান শক্তিগুলি দুর্বল জাতিসমূহকে পদানত করিবার প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইল।'[3]

'১৯১৪-১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি বিজয়ী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন জাতীয় স্বার্থের মধ্যে এই বিরোধিতা অতিশয় বৃদ্ধি পায় এবং তাহার ফলে একদিকে যেমন অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, রাশিয়া প্রভৃতির মত বহুজাতির সমবায়ে গঠিত বিজিত রাষ্ট্রগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, অপরদিকে তেমনি পোল্যাণ্ড, জেকোশ্লাভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, ফিনল্যাণ্ড, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া প্রভৃতির মত স্ব স্ব জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমন্বিত নূতন বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে। যেহেতু এই নূতন জাতীয় রাষ্ট্রগুলি ব্যক্তিগত অধিকারবাদ ও শ্রেণীগত বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য (ক) আপন আপন জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির উপর নির্যাতন না করিয়া তাহাদের উপায় থাকে না; যথা: পোল্যাণ্ড নির্যাতন করে হোয়াইট রাশিয়ান, ইহুদী, লিথুয়ানিয়ান ও ইউক্রেনিয়ানদের উপর; জর্জিয়া নিপীড়ন করে ওসেট, আবখাসিয়ান ও আর্মেনিয়ানদের উপর এবং ক্রোট, বোসনিয়ান প্রভৃতি জাতিগুলি নির্যাতিত হয় যুগোশ্লাভিয়ার দ্বারা; (খ) প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরে তাহাদের অধিকার-সীমা সম্প্রসারিত করিতে তাহারা বাধ্য এবং তাহার ফলে সংগ্রাম ও সংঘর্ষ অনিবার্য: এবং (গ) অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়া বড় বড় সাম্রাজ্য-বাদী শক্তিগুলির অধীনতা স্বীকার করা ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর থাকে না। ব্যক্তিগত অধিকারবাদ ও পুঁজিপ্রথা জাতীয় ঐক্য অগ্নিদগ্ধ করে, জাতীয় অনৈক্য সৃষ্টি করে এবং জাতীয় নির্যাতন উগ্রতর করে বলিয়া এ অবস্থা অপরিহার্য হয়; পক্ষান্তরে যৌথ অধিকার ও শ্রম বিভিন্ন জাতিকে পরস্পরের সমীপবর্তী করে, জাতীয় অনৈক্য দূরীভূত করে ও জাতীয় নির্যাতন নিবারিত করে। নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতাবিহীন সমাজতন্ত্রবাদ কল্পনা করা যেমন কঠিন, জাতীয় নির্যাতনবর্জিত পুঁজিবাদও তেমনি কল্পনাতীত। এই কারণেই জাতীয় নির্যাতন নিবারণ, জাতীয় সাম্য সংস্থাপন ও জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-গুলির স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে হইলে, সোভিয়েটের বিজয় ও সর্বহারাশ্রেণীর এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠা তাহার মৌলিক ভিত্তি হওয়া প্রয়োজন। রাশিয়ার সোভিয়েট-প্রথার প্রবর্তন ও বিভিন্ন জাতির রাজনীতির দিক দিয়া বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার ঘোষিত হওয়ার ফলে রাশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। রাশিয়ার বিভিন্ন সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রগুলি যখন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল, তখন ধনতান্ত্রিক

3. Resolution adopted by the Tenth Congress of the Russian Communist Party, March 1921, reproduced in 'Marxism and the National and Colonial Question', Pp. 270—1.

রাষ্ট্রসমূহের আক্রমণ আশঙ্কার দরুণ তাহাদের অবস্থা ছিল অনিশ্চিত ও অস্থায়ী। দেশরক্ষা-ব্যাপারে তাহাদের সাধারণ স্বার্থ, যুদ্ধের ফলে বিধ্বস্ত উৎপাদনশক্তির পুনরাহরণ এবং খাদ্য-সঞ্চয়ের দিক দিয়া সমৃদ্ধ সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রগুলি অপেক্ষাকৃত দুঃস্থ রাষ্ট্রগুলির সহায়তার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিবে, এই বিশ্বাস তাহাদিগকে এক যুক্তরাষ্ট্রে সংবন্ধ হইবার প্রেরণা যোগাইল, কারণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের অধীনতা ও জাতীয় নির্যাতন হইতে অব্যাহতি লাভের আর কোন পথ তাহাদের সম্মুখে প্রসারিত ছিল না।' ৪

উল্লিখিত উদ্ধৃতিই হইল রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মনীতির নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা; ১৯১৭ সালের বিপ্লবের বহু পূর্ব হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত মঃ ষ্ট্যালিন ও অন্যান্য আরও সকলে তাঁহাদের বক্তৃতায় ও রচনায় সে নীতিগুলি এইভাবেই সবিস্তারে ব্যাখ্যাত করিয়া আসিতেছেন। মুসলিম লীগ দাবী করিয়া থাকেন, মুসলমানগণ অন্যান্য ভারতীয় জাতিসমূহ হইতে স্বতন্ত্র একটি জাতি এবং সেই কারণে যে সকল অঞ্চলে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেগুলি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে এই মুহূর্তে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে শুধু সরিয়া দাঁড়াইবার নয়, সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইবার যোগ্য; উল্লিখিত নীতির আলোকে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক, লীগের সে দাবী কতদূর সমর্থনযোগ্য।

যদি কমিউনিষ্ট নীতি অনুযায়ী বিচার করিয়া দেখা যায়, কোন একটি সম্প্রদায় জাতিরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য কিনা, তাহা হইলে মুসলমান সম্প্রদায় সমগ্ররূপে 'জাতি'-পদবাচ্য হইতে পারে না। মুসলমান মাত্রই একভাষা-ভাষী নহেন, প্রদেশ ও অঞ্চল ভেদে তাঁহাদের ভাষা বিভিন্ন। বস্তুতঃ, মুসলমানগণ যে প্রদেশের অধিবাসী, তথাকার অন্যান্য অ-মুসলমান সম্প্রদায়সমূহের মত তাঁহারাও সেই প্রদেশের ভাষাতেই কথা কহিয়া থাকেন এবং সে ভাষা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। একথা যে কেবলমাত্র দূরবর্তী প্রদেশসমূহ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য তাহা নয়, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সংলগ্ন প্রদেশগুলি সম্বন্ধেও একথা খাটে; বেলুচী, সিন্ধি, পুস্ত ও পাঞ্জাবী—এই চারিটি পৃথক ভাষাই হইল তত্রত্য প্রদেশ-চতুষ্টয়ের নিজ নিজ বিশিষ্ট ভাষা। এই ভাষা চারিটির সহিত হিন্দী, হিন্দুস্থানী, বাংলা ও গুজরাটীর পার্থক্য যত গভীর, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের গভীরতা তাহা হইতে আদৌ কম নয়।

যদি সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি অখণ্ড অঞ্চলরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে সে স্বতন্ত্র কথা, অন্যথায় মুসলমানগণ এক অঞ্চলের অধিবাসীরূপে গণ্য হইতে পারেন না। ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বের মুসলমানপ্রধান প্রদেশ দুইটির মধ্যে ব্যবধান এক হাজার মাইল। মুসলমানদের অর্থনৈতিক জীবনও যে অমুসলমানগণের অর্থনৈতিক জীবন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এমন কথাও বলা চলে না। তাঁহারা যে অঞ্চলের অধিবাসী, তথাকার অ-মুসলমানদের সহিত একই অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর তাঁহাদের জীবন সমপরিমাণে নির্ভরশীল এবং তাঁহাদের

4. Adopted from the same resolution, op. cit. Pp. 273—4.

অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত অন্যান্য প্রদেশের অর্থনীতিগত অবস্থার পার্থক্যও সমপরিমাণে পরিস্ফুট।

এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়, মঃ ষ্ট্যালিন ধর্মকে জাতিবিচারের ভিত্তিরূপে কোথাও উল্লেখ করেন নাই। বরঞ্চ তাঁহার রচনার বহু স্থানে ইহুদীদের ধর্মের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র জাতিরূপে স্বীকৃত হইবার দাবীতে তিনি ব্যঙ্গই করিয়াছেন। তিনি স্থানবিশেষে 'সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিগত ঐক্যের মধ্যে পরিব্যক্ত তাহার বিশিষ্ট মানসিক গঠনের' কথা উল্লেখ করিয়াছেন; জাতির সাংস্কৃতিক বিবর্তনে ধর্ম যেরূপ প্রধান অংশ গ্রহণ করে, তাহাতে ধর্মকেও তিনি তাহার অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য করিয়াছেন বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি। ইসলামের শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন রহিয়াও একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, ভারতে ইসলামীয় সংস্কৃতির স্বরূপ সর্বত্র একই প্রকার নয়; অঞ্চল ভেদে তাহার আকার ও প্রকারের পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির মত ইসলামীয় সংস্কৃতির সত্তাও এদিক দিয়া বিচিত্র ও বিভিন্ন। সিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে প্রভেদ ইসলামের জন্মের সহিত সমসাময়িক বলিলেও চলে। মুসলমান সমাজের মধ্যে এমন অনেক সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা আজও হিন্দু উত্তরাধিকার আইন মানিয়া চলেন ও হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন। তাহা ছাড়া, কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি অতি আধুনিক। যদিও ধর্মগত নীতি ও শিক্ষার উপর ভিত্তি করিয়াই এই পার্থক্যগুলির সৃষ্টি, তথাপি মুসলমানদিগের সমাজ-জীবনেও তাহার প্রভাব পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে, এই সমস্ত পার্থক্য সত্ত্বেও একটি সাধারণ সংস্কৃতির অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং সে অর্থে মুসলমান ও অমুসলমানগণের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও একটি সাধারণ ভারতীয় সংস্কৃতির অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না। ইহা হইতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, কমিউনিষ্ট সংজ্ঞা অনুযায়ী ভারতীয় মুসলমানগণ স্বতন্ত্র জাতিরূপে স্বীকৃত হইতে পারেন না। ভারতীয় কমিউনিষ্টগণও সে বিষয়ে একমত : 'ধর্মকে জাতি-গঠনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে গান্ধীজীর আপত্তি অত্যন্ত গুরুতর। তাঁহার সে আপত্তি যুক্তিসঙ্গত এই কারণে যে, কেবল ধর্মই জাতি-গঠনের নিয়ামক নয়। মানসিক গঠন ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন জাতির অন্যতম প্রধান দুইটি ধর্ম, এই দুইটির উপর ধর্মের প্রভাব কতদূর কার্যকরী তাহা বিচার করিবার স্থান ইহা নয়। সংক্ষেপে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কেবলমাত্র ধর্মগত ঐক্যের ভিত্তিতে মুসলমানগণ একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে স্বীকৃত হইতে পারেন না। অবশ্য একথা সত্য হইলেও পরিপূর্ণ সত্য নয়, অর্ধ সত্যমাত্র।' ৫ মিঃ যোশীর বিবৃত সত্যের অপর অর্ধাংশের মর্ম হইল ইহাই যে, ভারতবর্ষ বহু জাতির সমবায়ে গঠিত একটি বিরাট যৌথ পরিবার।

দ্বিতীয় বিচার্য বিষয় হইল, জাতিসমূহের জন্ম-কথা; ইহা একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন। মঃ ষ্ট্যালিন এই ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করিয়াছেন : 'পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস ও ধনতন্ত্রের জন্ম—ইহাই হইল প্রথম যুগ।

5. P. C. Joshi: 'They must meet again', p. 7.
6. Stalin, op. cit., p. 99.

জনসংহতিসমূহ জাতি আকারে গড়িয়া উঠে এই সময়ে'।৬ আয়র্লণ্ড-বর্জিত গ্রেট-বৃটেন, ফ্রান্স ও ইতালি এই নবোদ্ভূত জাতিগুলির আদি জন্মভূমি। 'পক্ষান্তরে পূর্ব-ইউরোপে কিন্তু সামন্ততন্ত্রের বিলয় ও জাতিসমূহের জন্ম কেন্দ্রায়ত্ত গভর্ণমেণ্ট গঠনের সহিত সমসাময়িক নয়......এমন কতকগুলির বিভিন্ন সংহতির সমবায়ে মিশ্র রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিল যাহারা তখন পর্যন্ত জাতি-আকারে জন্মলাভ করে নাই, কিন্তু একই সাধারণ রাষ্ট্রের মধ্যে সম্মিলিত হইয়াছে। বহু জাতির সমবায়ে গঠিত এই সব পূর্ব-ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিই হইল জাতীয় নির্যাতনের জন্মস্থান এবং তাহার ফল স্বরূপ উদ্ভূত হইল জাতিগত বিরোধ, জাতীয় আন্দোলন, জাতীয় সমস্যা ও তাহা সমাধানের বিভিন্ন পন্থা।' ৭ জার শাসনাধীন রাশিয়া পূর্ব-ইউরোপের এই জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের অন্যতম; এই স্থানে শ্বেত রাশিয়ানগণ কর্তৃক সীমান্তবর্তী জাতিসমূহের উপর নির্যাতনের ফলে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলির উদ্ভব হয়।

দ্বিতীয় যুগঃ জেক, পোল, ইউক্রেনিয়ান প্রভৃতি পরাধীন জাতিসমূহের জাগরণ ও শক্তি সঞ্চয়; প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে বহু জাতির সমবায়ে গঠিত প্রাচীন বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি ভাঙিয়া যায় ও তাহাদের স্থলে উদ্ভূত হয় বৃহত্তর শক্তিগুলির আশ্রিত নূতন জাতীয় রাষ্ট্রসমূহ।

'তৃতীয় যুগ ঃ সোভিয়েটের জন্ম, ধনতন্ত্রের ধ্বংস ও জাতীয় নির্যাতনের অবসান।' ৮

কিন্তু ভারতীয় অবস্থার বিববর্তন ঠিক এইভাবে ঘটে নাই।

অবশ্য সমগ্র বৃটিশ ভারত ব্যাপিয়া ও দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া একটি কেন্দ্রায়ত্ত গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব যে এখানে বিদ্যমান তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কেন্দ্রায়ত্ত সরকারের উপর ভারতীয় কোন সম্প্রদায় বা প্রদেশের কোনরূপ কর্তৃত্ব নাই। এখানকার বিভিন্ন জাতিসমূহকে নির্যাতন যাহা বহন করিতে হইয়াছে, তাহা পূর্ব ইউরোপ, বিশেষ করিয়া রাশিয়ার ন্যায় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে কর্তৃত্বসম্পন্ন কোন ভারতীয় শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের হস্তে নয়। ভারতের সমস্ত জাতিই এক বৈদেশিক শক্তির করায়ত্ত কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধীন। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সংহতির স্বার্থ এবং অধিকার তাহাদের পারস্পরিক আক্রমণ হইতে কিরূপে রক্ষা করিতে হইবে তাহা এখানকার সমস্যা নয়, তাহাদের সকলের সমবেত স্বার্থ কেমন করিয়া এক সাধারণ কেন্দ্রায়ত্ত গভর্ণমেণ্টের কবল হইতে রক্ষিত হইবে, এ দেশের সমস্যা হইল তাহাই। কাজেই ইউরোপীয় জাতিসমূহের অবস্থার সহিত ভারতীয় অবস্থার কোন সামঞ্জস্য নাই; তাহার অবস্থা উপনিবেশসমূহের সহিত তুলনীয়। সুতরাং যুক্তি অনুসরণ করিয়া যে প্রশ্ন সর্বাগ্রে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহা নির্যাতীত জাতিগুলির পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার প্রশ্ন নয়, সে প্রশ্ন হইতেছে, গ্রেট-বৃটেনের সাম্রাজ্যিক শাসন-শৃঙ্খল হইতে তাহাদের সর্বাঙ্গীন মুক্তিলাভের।

7. Stalin, op. cit., Pp. 99—100.
8. Ibid., Pp. 100—101.

সাম্রাজ্যিক অধীনতা ও অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যখন শাসন-ক্ষমতা করায়ত্ত করিবে, তখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যে পুনরায় তাহাদের হস্তে অনুরূপ নির্যাতন ভোগ করিতে হইবে না, সে সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতির দাবী অবশ্য খুবই প্রাসঙ্গিক। আত্মনিয়ন্ত্রণেরও বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া সে প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইতে পারে, কিন্তু ইউ, এস, এস, আর-এর শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আরোপিত সর্তাবলির ন্যায় কতগুলি স্বতঃসিদ্ধ ও মৌলিক সর্তাধীনে। 'জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকারের অর্থ এ নয় যে, যে-কোন জাতি যে-কোন সময়ে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকারী।...নির্যাতিত জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হইবার ও তাহাদের স্ব স্ব আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আমরা স্বীকার করি বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা কোন এক বিশেষ সময়ে কোন একটি বিশেষ জাতির রুশীয় রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হয় না। কোন একটি জাতির বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়ার অর্থই তাহাকে বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য করা নয়। যে কোন জাতিরই যুক্তরাষ্ট্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার অধিকার থাকিবে সত্য, কিন্তু অবস্থা অনুযায়ী সে অধিকার সে ব্যবহার নাও করিতে পারে। এই জন্য সর্বহারা শ্রেণী ও তাহাদের বৈপ্লবিক স্বার্থের অনুকূলে প্রয়োজনমত বিচ্ছিন্ন হইবার পক্ষে এবং বিপক্ষে উভয়বিধ আন্দোলনই পরিচালন করিতে পারি। অতএব বিচ্ছিন্ন হইবার প্রতিটি প্রশ্ন তৎকালীন অবস্থা অনুযায়ী স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন এবং সেই কারণেই বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার ও কোন একটি অবস্থাবিশেষে কার্যতঃ বিচ্ছিন্ন হওয়া যে একবস্তু নয়, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।' ৯ কিন্তু ভারতবর্ষে যে দাবী উত্থিত হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকারের দাবী নয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্ত হইবার পূর্বেই এখনই—এই মুহূর্তে কার্যতঃ বিচ্ছিন্ন হইবার দাবী।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এই কথাই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, মঃ ষ্ট্যালিন ও রুশীয় কমিউনিষ্ট পার্টি অবস্থানিরপেক্ষভাবে সকল দেশের পক্ষে এক এবং অনুরূপ কর্মপন্থা অনুসরণের পক্ষপাতী নহেন। অন্যান্য জাতিসমূহের উপর নির্যাতনপরায়ণ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের দ্বারা নির্যাতিত উপনিবেশ ও অধীনস্থ দেশসমূহের বিপ্লব মঃ ষ্ট্যালিন এই উভয়বিধ বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য দেখাইবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন। ১০ তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে কমিউনিষ্ট ইণ্টার-ন্যাশনালের থিসিস হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিতেছেন, 'চীন ও ভারতবর্ষের ন্যায় দেশসমূহে সমাজ-জীবন গঠনের পথে বৈদেশিক শাসন এক চিরন্তন অন্তরায়; অতএব উপনিবেশসমূহে বিপ্লবের প্রথম পর্যায় হইবে বৈদেশিক ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ।' ১১ এই নীতির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া কাজ করিতে গেলে, ভারতের খণ্ডনের পরিবর্তে বৈদেশিক প্রভুত্বের অবসান ঘটানই কি প্রথম কর্তব্য হইবে না?

9. Stalin, op. cit., p. 64.
10. Ibid., p. 232.
11. Ibid., p. 236.

এ স্থলে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রত্যেকটি জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার, তাহার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তার দাবী স্বীকার করে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমপরিমাণ জোরের সহিত এ কথাও বলে যে, যতদিন পর্যন্ত ব্যক্তিগত অধিকার ও পুঁজিবাদের অবসান না ঘটে, যতদিন পর্যন্ত শ্রম ও সম্পত্তির ক্ষেত্রে সমবায়-প্রথা প্রবর্তিত এবং সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন নির্যাতিত জাতিসমূহের পক্ষে মুক্তিলাভ সম্ভব হইবে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, একটি অখণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপন দুইটি নীতির উপর নির্ভরশীল ঃ জাতিগুলির যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকারের স্বীকৃতি এবং সোভিয়েটশাসন-প্রথা ও সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা। এই উভয় নীতির একটি গ্রহণ করিয়া, অপরটি বর্জন করা চলে না; বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার যদি স্বীকার করিতে হয়, সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাও মানিয়া লইতে হইবে। উভয় নীতিই যুক্তিসংগতভাবে মানিয়া লইতে গেলে যে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হইবে সে কথা মুসলিম লীগের পাকিস্থান দাবীর সমর্থকগণ ভালরূপেই জানেন এবং সেইজন্যই এই প্রসঙ্গে একটির সম্বন্ধে তাঁহারা যতখানি মুখর, অপরটি সম্বন্ধে ঠিক ততখানি মৌন। ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লীগ-প্রস্তাবের পক্ষে যে সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছেন, মিঃ জিন্না তথা মুসলিম লীগ যে তৎপ্রতি বিরূপ না হইলেও বীতশ্রদ্ধ তাহাও নিতান্ত অহেতুক নয়।

(একচল্লিশ)

সপ্রু কমিটির প্রস্তাব

বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহের রাজনীতি ও কর্মক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন এমন কতগুলি ব্যক্তিকে লইয়া স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর সভাপতিত্বে কিছুদিন পূর্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটির পক্ষ হইতে দাবী করা হয় যে, তাহার সদস্যগণ দেশের কোন সাম্প্রদায়িক দলের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন এবং শাসনতান্ত্রিক অথবা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য এতাবৎকাল যত প্রস্তাব রচিত হইয়াছে, তাহার কোনটির সহিত তাঁহাদের কাহারও নাম যুক্ত নহে; এই কারণে তাঁহারা যে প্রস্তাব রচনা করিবেন তাহা অপক্ষপাত হইবে, এরূপ আশা করা অসংগত হইবে না। উক্ত কমিটি দুইটি কিস্তিতে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন ঃ প্রথমটি কেন্দ্রে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন বিষয়ক অস্থায়ী ব্যবস্থা সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয়টি ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে। আমি এখানে কেবলমাত্র দ্বিতীয় কিস্তির প্রস্তাব সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

কমিটি কর্তৃক যে প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোন সুপারিশের উল্লেখ নাই এবং ইহাও ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, সে প্রস্তাব কার্যকরী করিবার দায়িত্ব বৃটিশ পার্লামেণ্টের। তাহা ছাড়া, তাঁহাদের রচিত প্রস্তাব ঔপনিবেশিক ও স্বাধীন ভারতীয় উভয়বিধ শাসনতন্ত্রের সহিতই সম-পরিমাণে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গণ-পরিষদ গঠিত হইবে ক্রীপ্‌স-প্রস্তাবের 'ঘ' ধারা অনুযায়ী, কিন্তু নিম্নলিখিতরূপ সংশোধনাধীনেঃ--(১) পরিষদের মোট সদস্য-সংখ্যা হইবে ১৬০ এবং তাহা বণ্টিত হইবে নিম্নলিখিত উপায়েঃ বাণিজ্য, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, জমিদার, বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিক ও মহিলা প্রভৃতি বিশেষ স্বার্থ ১৬; তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়-বর্জিত হিন্দু ৫১; মুসলমান ৫১; তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ২০; ভারতীয় খৃষ্টান ৭; শিখ ৮; অনুন্নত অঞ্চল ও উপজাতি ৩; অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ২; ইউরোপীয়ান ১ এবং অন্যান্য ১। কমিটির নির্ধারিত সদস্য-সংখ্যা ১৬০; কিন্তু ক্রীপ্‌স-প্রস্তাব অনুযায়ী তাহার সংখ্যা নির্দিষ্ট হয় ব্যবস্থা-পরিষদসমূহের সদস্য-সংখ্যার এক-দশমাংশরূপে; অবশ্য সে সংখ্যাও হিসাবমত দাঁড়ায় ১৬০-এরই কাছাকাছি। এ বিষয়ে ক্রীপস্‌-প্রস্তাবের সহিত আলোচ্য প্রস্তাবের পার্থক্য এই যে, আলোচ্য প্রস্তাব দ্বারা প্রত্যেকটি বিশেষ স্বার্থ ও সম্প্রদায়ের জন্য আসনসংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা করিতে গিয়া তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় বর্জিত হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যাসাম্য স্থাপন করা হইয়াছে। অথচ ক্রীপ্‌স-প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থাপরিষদের প্রতিটি দল আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রথায় যে সংখ্যক সদস্য নির্বাচন করিতে পারিত, তাহা তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য প্রতিনিধি-সংখ্যা হইতে অধিকন্তু নয়, অল্পও নয়; তাহার ফলে সপ্রু কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত আসন-সংখ্যা হইতে হিন্দুগণ অধিকার করিত অনেক অধিক এবং মুসলমানদের লভ্য হইত অনেক কম। তথাপি কমিটি যে এইরূপ সম-বণ্টনের সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা কেবল সাম্প্রদায়িক ঐক্যের খাতিরে।

যদি উপস্থিত সদস্যসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশের ভোটের দ্বারা সমর্থিত না হয়, তাহা হইলে গণ-পরিষদের কোন সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য হইবে না। গণ-পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের ভিত্তিতে সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট শাসনতন্ত্র বিধিবদ্ধ করিবেন এবং যে সব বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যাধিক্যের সমর্থন পাওয়া যাইবে না, সেখানে নিজস্ব নির্দেশ প্রদান করিয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সম্পাদন করিবেন।

ভারত বিভাগঃ কমিটি ভারতকে দুই বা তদধিক যে কোন সংখ্যক স্বাধীন রাষ্ট্রে খণ্ডিত করিবার বিরোধী, কারণ তাহার দ্বারা সমগ্র দেশের সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ অগ্রগতি ব্যাহত হইবে অথচ কোন সম্প্রদায়ই তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ কোনরূপ সুবিধাপ্রাপ্ত হইবে না।

দেশীয় রাজ্যঃ যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী ইউনিটরূপে দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রবেশের পথ উন্মুক্ত রাখিতে হইবে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের গঠন তাহাদের সকলের অথবা কতিপয়ের কিম্বা কোন একটির যোগদানের সর্তাধীন হইবে না।

যোগদান না করা ও বিচ্ছিন্ন হওয়াঃ বৃটিশ ভরতের কোন প্রদেশ যুক্ত-

রাষ্ট্রের বহির্ভূত থাকিতে পারিবে না এবং যে প্রদেশ বা রাষ্ট্র একবার অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা আর বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে না।

কমিটি মনে করেন, কৃষ্টি অথবা ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের সীমান্ত পুনর্নির্ধারণের অপেক্ষায় নূতন শাসনতন্ত্র চালু করিবার কার্য বিলম্বিত করা অবাঞ্ছনীয়; সে কাজ অবসরমত সম্পাদনের জন্য স্থগিত রাখিলেও চলিবে।

গণ-পরিষদ গঠন সম্পর্কে কমিটি কয়েকটি সুপারিশ করিয়াছেন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এমন একজন অধিনায়ক রহিবেন, যিনি হইবেন শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত সকল প্রকার দায়িত্ব ও অধিকারের ধারক ও বাহক এবং বর্তমানে দেশীয় রাজ্যসমূহের সম্পর্কে ইংলণ্ডের রাজার যে স্থান ও অধিকার, তিনি হইবেন সেই স্থলাভিষিক্ত ও সেই ক্ষমতার অধিকারী।

অধিনায়কের কার্যকাল হইবে পাঁচ বৎসর এবং সাধারণতঃ একবারের বেশী তিনি নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

(১) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপরিষদ ও ব্যবস্থাপকসভার সদস্যগণকে লইয়া যে নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হইবে, রাষ্ট্রাধিনায়ক নির্বাচিত হইবেন তাহার দ্বারা হয় বিনা সর্তে, নয় সর্ত যদি একান্ত আরোপিত হয়, তবে তাহা হইবে দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্বন্ধে তাঁহাদের রাজ্যের সর্বনিম্নসংখ্যক লোকসংখ্যা ও সর্বনিম্ন পরিমাণ দেয় রাজস্বের মাত্রা নির্ধারণ করিয়া দিয়া; কিম্বা (২) দেশীয় রাজাগণ কর্তৃক তাঁহাদের মধ্য হইতে কোন একজনকে নির্বাচন করিতে পারিবেন; অথবা (৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে ইংলণ্ডের রাজা তাঁহাকে নির্বাচন করিতে পারিবেন—হয় বিনা সর্তে, কিম্বা সর্ত যদি আরোপিতই হয়, তাহা হইলে দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্বন্ধে উল্লিখিত সর্তাধীনে। যদি তৃতীয় প্রস্তাবটিই গৃহীত হয় এবং বৃটিশ রাজানুগত্য অক্ষুণ্ণ থাকে, সেক্ষেত্রেও ভারতসচিবের পদ বিলোপ করিতে হইবে এবং তিনি অথবা বৃটিশ মন্ত্রিসভা ভারতশাসন ব্যাপারে যতটুকু নিয়ন্ত্রণাধিকার সম্ভোগ করিয়া থাকেন তাহা পরিহার করিতে হইবে।

দেশীয় রাজ্য ব্যতীত যে কোন ইউনিটের নায়ক যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রনায়ক দ্বারা নিযুক্ত হইবেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপরিষদ রাষ্ট্রাধিনায়কসহ দুইটি চেম্বারে বিভক্ত হইবে; ইউনিয়ন এসেম্বলী ও কাউন্সিল অব্ ষ্টেট। ইউনিয়ন এসেম্বলীর সদস্য-সংখ্যা এরূপভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে, যেন গড়ে প্রতি দশ লক্ষে একজন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরিত হইতে পারেন। জমিদার, ব্যবসায়ী, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, শ্রমিক ও স্ত্রীলোক প্রভৃতি বিশেষ স্বার্থের জন্য শতকরা দশটি আসন সংরক্ষিত রাখিতে হইবে। অবশিষ্ট আসন বণ্টিত হইবে নিম্নলিখিত সম্প্রদায়গুলির মধ্যেঃ তপশীল-ভুক্ত সম্প্রদায় ব্যতীত হিন্দু, মুসলমান, তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়, শিখ, ভারতীয় খৃষ্টান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও অন্যান্য সম্প্রদায়। মুসলমান সম্প্রদায় যদি পৃথক নির্বাচনের পরিবর্তে সংরক্ষিত আসনসহ যৌথ-নির্বাচনে সম্মত হন, কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রে কমিটি সুপারিশ করিবেন, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যাগত বৈষম্য যদিও বিরাট, তথাপি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনুরোধে হিন্দুগণ যেন

কেন্দ্রীয় পরিষদে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় বর্জিত হিন্দু সদস্যসংখ্যার সমসংখ্যক প্রতিনিধি মুসলমানদিগকে প্রদান করিতে সম্মত হন।

যদি এই সুপারিশ সমগ্রভাবে গৃহীত না হয়, তাহা হইলে হিন্দু সম্প্রদায়ের যে কেবল সংখ্যাসাম্যে অসম্মত হইবারই অধিকার থাকিবে তাহা নয়, এমন কি, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিবর্তনও তাঁহারা দাবী করিতে পারিবেন।

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুযায়ী শিখ ও তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য যে আসন নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অপ্রচুর, সুতরাং তাহা বর্ধিত হওয়া কর্তব্য; তাহাদের সঠিক সংখ্যানির্ধারণের দায়িত্ব গণ-পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

বিশেষ স্বার্থ ব্যতীত ইউনিয়ন এসেমব্লীর অন্যান্য সদস্যগণ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেরই ভোটাধিক্যের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।

দায়িত্বের বণ্টনঃ ইহার বিস্তৃত তালিকা প্রণয়ন করিবেন গণ-পরিষদ। পরিষদের অনুসরণের জন্য কমিটি নিম্নলিখিত নীতিগুলি সুপারিশ করিতেছেনঃ কেন্দ্রের হস্তে যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পিত হইবে, তাহার পরিমাণ যথাসম্ভব অল্প হওয়া প্রয়োজন; তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তাহার আয়ত্তাধীন হইবেই; (১) বৈদেশিক ব্যাপার, দেশরক্ষা, দেশীয় রাজ্যসমূহের সহিত সম্পর্ক, ইউনিট-সমূহের মধ্যে ভাবের পারস্পরিক আদান-প্রদান, বাণিজ্য, শুল্ক, ডাক ও তার বিভাগ প্রভৃতি সর্বভারতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ; (২) ইউনিটসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পত্তি, (৩) প্রয়োজনমত বিভিন্ন ইউনিটগুলির মধ্যে শাসন ও আইন বিভাগের ভিতর সঙ্গতি স্থাপন; (৪) সমগ্র ভারত অথবা তাহার যে কোন অংশ-বিশেষের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সত্তার অখণ্ডতা রক্ষা ও জরুরী অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনিবার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যে কোন বিধিব্যবস্থা।

রেসিডিউয়ারী ক্ষমতাঃ যে সমস্ত ক্ষমতা ইউনিয়ন অথবা তাহার অন্তর্গত ইউনিটসমূহ কোনটিরই সম্পর্কিত তালিকাভুক্ত নয়, তাহা ইউনিটগুলির উপর বর্তাইবে।

ইউনিটসমূহের মধ্যে শুল্কের অবরোধ বিলোপ করা হইবে এই সর্তে যে, তাহার দরুণ যদি কোন ইউনিটের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হইলে সে ক্ষতি ইউনিয়নের রাজস্ব-তহবিল হইতে পূর্ণ করা হইবে।

ইউনিয়নের শাসন-পরিষদঃ ইউনিয়নের শাসন-পরিষদ একটি মিলিত প্রতিষ্ঠান হইবে এই অর্থে যে, নিম্নলিখিত সম্প্রদায়সমূহের প্রতিনিধি তাহাতে স্থান পাইবেন; (১) তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়বর্জিত হিন্দু, (২) মুসলমান, (৩) তপশীলী সম্প্রদায়, (৪) শিখ, (৫) ভারতীয় খৃষ্টান, (৬) অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। ইঁহাদের সদস্য-সংখ্যা নির্দিষ্ট হইবে যতদূর সম্ভব ব্যবস্থাপরিষদে ইঁহাদের প্রতিনিধিত্বের অনুপাত অনুযায়ী।

কোন সম্প্রদায় যদি ক্যাবিনেটে যোগদান করিতে অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও মন্ত্রিসভা বিধিসঙ্গতরূপে গঠিত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

মন্ত্রিসভা সমগ্ররূপে আইন-পরিষদের নিকট দায়ী রহিবেন এবং তাহার নায়ক ও ধারক হইবেন প্রধান মন্ত্রী; যে দল এককভাবে অথবা অন্য কোন এক বা একাধিক দলের সহিত মিলিত হইয়া নির্ভরযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারিবেন, প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন তাঁহারাই। প্রধান মন্ত্রী ও সহকারী প্রধান মন্ত্রীর পদ কোন একটি দলের একচেটিয়া অধিকারে আসিবে না—ইহাই হইবে প্রচলিত রীতি।

অন্যান্য মন্ত্রী প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহাদের মধ্য হইতেই একজন সহকারী প্রধান মন্ত্রী নামে অভিহিত হইবেন। প্রধান মন্ত্রী যে সম্প্রদায়ভুক্ত, সহকারী প্রধান মন্ত্রী সে সম্প্রদায় হইতে নিযুক্ত হইবেন না—ইহাই হইবে স্থায়ী নিয়ম।

উল্লিখিত ব্যবস্থার একটি বিকল্প-প্রস্তাব প্রদত্ত হইল। উল্লিখিত উপাদান দ্বারা গঠিত মন্ত্রিসভা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদ কর্তৃক Single transferable vote-এর সাহায্যে নির্বাচিত হইবেন এবং তাঁহাদের কার্যকাল ব্যবস্থা-পরিষদের কার্যকালের সমান হইবে। ব্যবস্থাপরিষদ মন্ত্রিগণের ভিতর হইতে প্রধান মন্ত্রী ও সহকারী প্রধান মন্ত্রী নির্বাচন করিবেন, কিন্তু উভয়েই এক সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন না।

দেশীয় রাজ্যসমূহের মন্ত্রিগণঃ দেশীয় রাজ্য-সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব একজন মন্ত্রীর উপর অর্পিত হইবে এবং সহকারীরূপে যাঁহারা তাঁহার সহিত যুক্ত রহিবেন, তাঁহাদের সংখ্যা তিনের কম ও পাঁচের অধিক হইবে না। তাঁহারা 'ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্‌স এডভাইসার্স' নামে অভিহিত হইবেন এবং তাঁহাদের নির্বাচন-পদ্ধতি স্থিরীকৃত হইবে দেশীয় রাজ্যসমূহের সম্মতিক্রমে। মন্ত্রিমণ্ডলী সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই 'ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্‌স এডভাইসার্স'গণের সহিত পরামর্শ করিবেন এবং শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের সম্মতি গ্রহণ করিবেন।

বিচার বিভাগঃ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি সুপ্রিম কোর্ট ও প্রত্যেক ইউনিটের জন্য একটি করিয়া হাইকোর্ট স্থাপিত হইবে। বিচারকদের সংখ্যা ও বেতন শাসনতন্ত্র কর্তৃক যাহা নির্দিষ্ট হইবে, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট ও সংশ্লিষ্ট গভর্ণমেণ্টের সুপারিশ এবং রাষ্ট্রাধিনায়কের সমর্থন ব্যতিরেকে তাহা সংশোধিত হইতে পারিবে না—এই সর্তাধীনে যে, কোন বিচারকের বেতনের পরিমাণ যদি তাঁহার অনুকূলে ও তাঁহার কার্যকালে পরিবর্তিত না হয়।

ভারতের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করিবেন রাষ্ট্রাধিনায়ক এবং সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারকগণও প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শক্রমে তাঁহার দ্বারাই নিযুক্ত হইবেন। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কর্মকর্তা ভারতের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করিবেন। হাইকোর্টের অন্যান্য বিচারকগণের নিয়োগকালে রাষ্ট্রাধিনায়ক ইউনিটের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং ভারতের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শক্রমে তাহা করিবেন। সুপ্রিম কোর্ট অথবা হাইকোর্টের

বিচারপতি চিরজীবনের জন্য নিযুক্ত হইবেন—অবশ্য শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত নির্দিষ্ট কোন একটি বয়সের সর্তাধীনে।

হাইকোর্টের বিচারপতি রাষ্ট্রাধিনায়কের দ্বারা অপসারিত হইতে পারিবেন তখনই—যদি তিনি অসদাচরণ করিয়াছেন অথবা দৈহিক বা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন এই মর্মে রাষ্ট্রের কর্মকর্তা রিপোর্ট দেন এবং সুপ্রিম কোর্ট তাঁহার অপসারণ অনুমোদন করেন। অনুরূপ কারণে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিও অপসারিত হইতে পারিবেন এই সর্তে যে, তদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে গঠিত ট্রাইব্যুনাল যদি তাঁহার অপসারণ সমর্থন করেন।

দেশরক্ষা ঃ ব্যবস্থাপরিষদের নিকট দায়ী জনৈক মন্ত্রীর হাতে দেশরক্ষা-সংক্রান্ত দপ্তর অর্পিত হইবে বটে, কিন্তু তাহার নিয়ন্ত্রণের সত্যকার অধিকার ও শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে প্রধান সেনাপতির উপর।

যত সত্বর ও দ্রুততার সহিত সম্ভব জাতীয় বাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে। উক্ত বাহিনী গঠনের জন্য কমিটি নিম্নলিখিত উপায়গুলি সুপারিশ করিতেছেন ঃ

(ক) যতদিন পর্যন্ত পর্যাপ্তসংখ্যক দেশীয় সামরিক কর্মচারী শিক্ষিত করিয়া তোলা সম্ভব না হয়, ততদিন দেশরক্ষাকল্পে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী ও বৃটিশ সামরিক কর্মচারী এদেশে রাখিবার জন্য ভারতীয় ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট ও সম্রাটের গভর্ণমেণ্টের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে। (খ) যুদ্ধ শেষ হইবার সংগে সংগে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে বৃটিশ সামরিক কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ করিতে হইবে। যে সকল বৃটিশ সামরিক কর্মচারী ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন অথবা বিশেষ কোন প্রয়োজনে যাঁহাদের নিয়োগ আবশ্যক নয়, তাঁহাদিগকে পুনরায় বৃটিশ সৈন্যবাহিনীতে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। জল, স্থল ও বিমানবাহিনীতে পর্যাপ্তসংখ্যক ভারতীয় সামরিক কর্মচারী শিক্ষিত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে। যে সকল স্থানে ইউনিভার্সিটি ট্রেণিং কোর নাই, সেখানে তাহা স্থাপিত ও সম্প্রসারিত করিতে হইবে।

সরকারী চাকুরীতে প্রতিনিধিত্ব ঃ সরকারী চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক প্রতি-নিধিত্বের হার সম্বন্ধে যে আদেশ বর্তমানে বলবৎ রহিয়াছে, নূতন শাসনতন্ত্র কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত তাহা বলবৎ থাকিবে। শিখ, ভারতীয় খৃষ্টান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও পার্শী সম্প্রদায়ের জন্য বর্তমানে যে শতকরা ৮⅓ সংখ্যক আসন নির্দিষ্ট আছে, সে সম্বন্ধে কমিটির সুপারিশ হইতেছে এই যে, তাহা ভাঙিগয়া উক্ত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে নিম্নলিখিত হারে বণ্টন করা হোক ঃ শিখ শতকরা ৩⅔, ভারতীয় খৃষ্টান ৩, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও পার্শী ১⅔; কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ২৪২ ধারা অনুযায়ী সরকারী চাকুরীর কোন কোন বিভাগে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে যে বিশেষ ব্যবস্থার বিধান আছে, এই সুপারিশ দ্বারা তাহা ক্ষুন্ন হইবে না।

রাষ্ট্রাধিপতি অথবা ইউনিয়নের কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন বা ইউনিটের

প্রধান মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া ইউনিয়ন এবং ইউনিটের পাবলিক সার্ভিসেস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচন করিবেন।

মৌলিক অধিকার: নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতিমূলক একটি পূর্ণাঙ্গ ঘোষণাপত্র শাসনতন্ত্রের অঙ্গীভূত হইবে: (ক) ব্যক্তি-স্বাধীনতা; (খ) মুদ্রাযন্ত্র ও সাহচর্যের স্বাধীনতা; (গ) প্রত্যেক সংহতির সদস্যগণের সমপরিমাণ নাগরিক অধিকার; (ঘ) ধর্মাচরণ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা; (ঙ) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভাষা ও কৃষ্টির সংরক্ষণ; তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের উপর সংস্কার ও প্রথা অনুযায়ী যেসব বিধিনিষেধ আরোপিত রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ বিলোপ এবং শিখ সম্প্রদায়ের কৃপাণ ধারণের মত অন্যান্য বিশেষ প্রকার ধর্মগত আচরণের রক্ষা-ব্যবস্থা।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কমিশন: প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে একটি করিয়া 'মাইনরিটিস্ কমিশন' গঠিত হইবে, কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সেই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকই হইবেন এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ব্যবস্থা-পরিষদে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন; কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদের কোন সভ্য নির্বাচন-প্রার্থী হইতে পারিবেন না এবং কমিশনের কার্যকাল ব্যবস্থা-পরিষদের কার্যকালের সমান হইবে। কমিশনের কার্য হইবে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির স্বার্থের উপর সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা, কমিশনের প্রয়োজনমত সে সম্বন্ধীয় সংবাদ সংগ্রহ করা, বিচারবহির্ভূত মৌলিক অধিকারগুলি কার্যকরী করা সম্বন্ধে যে নীতি অনুসৃত হয়, মাঝে মাঝে তাহা পরীক্ষা করা ও প্রধান মন্ত্রীর নিকট তাহার বিবরণ পেশ করা। ক্যাবিনেট ও প্রধান মন্ত্রী কমিশনের সুপারিশ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন এবং তৎসম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল তাহার বিস্তৃত বিবরণসহ কমিশনের সুপারিশ ব্যবস্থা-পরিষদে উপস্থাপিত করিবেন। অবশ্য ব্যবস্থা-পরিষদকে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে হইবে।

পাঞ্জাবের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়: পাঞ্জাবের শিখ, হিন্দু ও ভারতীয় খৃষ্টানদের পাঞ্জাব-পরিষদে প্রতিনিধিত্বের অনুপাত বিশেষভাবে পরীক্ষা করিবার জন্য কমিটি গণপরিষদের নিকট সুপারিশ করিতেছেন।

শাসনতন্ত্রের সংশোধন: শাসনতন্ত্র প্রকাশিত হইবার ছয়মাস পূর্বে তাহার সংশোধনের জন্য কোন প্রস্তাব ইউনিয়ন ব্যবস্থাপরিষদে উত্থাপিত হইতে পারিবে না এবং যথাসময়ে উত্থাপিত হইবার পর প্রত্যেক চেম্বারের মোট সদস্য-সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগুরুত্বের দ্বারা তাহা যদি সমর্থিত না হয়, তাহা হইলে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইবে। আবার সংশোধন-প্রস্তাব গৃহীত হইবার পরেও ইউনিটসমূহের ব্যবস্থা-পরিষদগুলি কর্তৃক সমর্থিত না হইলে তাহা কার্যকরী হইবে না।

নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে শাসনতন্ত্রের অঙ্গীভূত গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় সম্বন্ধে সংশোধনী-প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারিবে না।

বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এই পরিকল্পনাটি সমালোচিত হইয়াছে। একজনের নিকট যাহা দোষ বলিয়া বিবেচিত, অন্য জনের নিকট তাহা গুণরূপে পরিগণিত হইয়াছে, ফলে মতগুলি পরস্পরের দ্বারা খণ্ডিত। পরিকল্পনাতে কোন দলের চূড়ান্ত মতবাদই অবলম্বিত হয় নাই—ইহাই বোধ করি তাহার পক্ষে একটি যুক্তি। ইহা একদিকে যেমন মুসলিম লীগের ভারত-বিভাগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, অপরদিকে তেমনি মুসলমানদিগকে গণপরিষদে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভায় হিন্দুদের সহিত সমানসংখ্যক আসন প্রদান করিয়াছে। আবার মুসলমানদিগকে বর্ণহিন্দুদের সহিত সংখ্যাসাম্য প্রদত্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা মুসলমানগণ কর্তৃক পৃথক-নির্বাচন-প্রথা বর্জিত হইবার সর্তাধীনে। পরিকল্পনাতে স্বাধীনতার প্রসঙ্গ একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। অথচ ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র রচনার পথও উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে। রাষ্ট্রাধিপতির পদ পরিকল্পনানুযায়ী নির্বাচনসাপেক্ষ, কিন্তু নির্বাচকদের পছন্দের পরিধি দেশীয় রাজন্যবর্গের তালিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত সম্পর্ক যদিও যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভার আয়ত্তাধীন, তথাপি রাষ্ট্রাধিপতির পদের জন্য তাঁহারা স্বাধীনভাবে মনোনয়নপ্রার্থী হইতে পারেন। রাষ্ট্রাধিপতির কার্যকাল যদিও পাঁচ বৎসররূপে ধার্য, তবু বড় বড় দেশীয় রাজ্য লইয়া গঠিত গ্রুপগুলির মধ্যে তাহার দীর্ঘায়িত হইবার সম্ভাবনা বিদ্যমান। মন্ত্রিসভা ব্যবস্থাপরিষদের নিকট দায়ী সত্য, কিন্তু ব্যবস্থাপরিষদের বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত যে সভা তাহা হইবে এক যৌগিক প্রতিষ্ঠান। ব্যবস্থাপরিষদের দলগুলি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত, অথচ যৌথ-নির্বাচনের দাবী উপস্থাপিত করিয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের সদস্য নির্বাচন প্রভাবিত করিবার সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছে। যাহাতে গণপরিষদ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপরিষদ ও মন্ত্রিসভায় কোন সাম্প্রদায়িক দল অপর কোন সাম্প্রদায়িক দলের উপর প্রাধান্য করিতে না পারে তদুদ্দেশ্যে বহুতর বিধিনিষেধ আরোপিত হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ রচনার দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে গণপরিষদের উপর।

অন্যান্য সমালোচনার কথা ছাড়িয়া দিলেও, রাষ্ট্রাধিপতির নির্বাচন দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। অথচ তাঁহাদের স্ব স্ব রাজ্যে জনসাধারণের হস্তে ক্ষমতা অর্পণের কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই—এরূপ বিধানের পক্ষে কোনরূপ যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে কার্য করিবার যোগ্যতা ও আগ্রহের কোন পরিচয় দেশীয় রাজন্যবর্গ আজ পর্যন্ত প্রদান করেন নাই, তাহা সত্ত্বেও শাসনক্ষমতা তাঁহাদিগকে জনসাধারণের নিকট হস্তান্তর করিবার জন্য আহ্বান না করিয়া, কেবলমাত্র দেশীয় রাজ্যের নয়, সমগ্র দেশের রাষ্ট্রাধিনায়কের পদ তাঁহাদের একচেটিয়া অধিকারে অর্পণ করিবার প্রস্তাব অত্যন্ত অসঙ্গত ও অযৌক্তিক।

(বিয়াল্লিশ)

ডাক্তার আম্বেদকরের পরিকল্পনা

ডাক্তার আম্বেদকর সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটি নূতন সমাধান প্রদান করিয়াছেন; তাঁহার মতে ইহা নাকি পাকিস্থান হইতেও উৎকৃষ্টতর। তাঁহার সমাধান মূলতঃ যে নীতির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত তাহা হইতেছে এই যে, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইবে কেবলমাত্র তুলনামূলক, খাঁটি ও বাস্তব সংখ্যাধিক্যের দাবী তাঁহারা কখনও করিতে পারিবেন না। এই নীতি হিন্দুপ্রধান ও মুসলমানপ্রধান উভয়বিধ প্রদেশেই সমভাবে প্রযোজ্য হইবে এবং কোন ক্ষেত্রেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-সংখ্যা শতকরা চল্লিশের অধিক হইবে না। ডাক্তার আম্বেদকর গণপরিষদ গঠনের একান্ত বিরোধী: সে সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তি হইল এই যে, ভারতীয় শাসনতন্ত্রের এক বৃহত্তর অংশ ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের মধ্যেই বিধিবদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং গণপরিষদ গঠন করিয়া, আবার নূতনভাবে এক শাসনতন্ত্র রচনার প্রয়াস সময় ও শক্তির অপ্রয়োজনীয় ব্যয়বাহুল্য মাত্র; এক্ষেত্রে করণীয় হইতেছে শুধু, উক্ত আইনের যে ধারাগুলি ঔপনিবেশিক মর্যাদার সহিত অসঙ্গত, সেগুলি তুলিয়া দেওয়া।

ব্যবস্থাপরিষদে প্রতিনিধিত্ব, শাসন-বিভাগে প্রতিনিধিত্ব ও সরকারী চাকুরীতে প্রতিনিধিত্ব—ডাক্তার আম্বেদকর সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটির সমাধানের জন্য স্বতন্ত্র নীতি নির্দেশ করিয়াছেন। সরকারী চাকুরী সম্বন্ধে তাঁহার প্রস্তাব, বর্তমানে যাহা শাসন-বিভাগীয় প্রথারূপে বিদ্যমান, তাহাকে বিধিবদ্ধ আকার দান করা। শাসনবিভাগে হিন্দু, মুসলমান ও তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-সংখ্যা ব্যবস্থাপরিষদে তাহাদের স্ব স্ব সম্প্রদায়গত আসনের সমসংখ্যক হইবে। অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য, তাঁহাদের প্রতিনিধিদের জন্য দুই একটি আসন সংরক্ষিত রাখিতে হইবে এবং যে সকল পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদের মধ্যেও উক্ত সংখ্যালঘু দলগুলি যাহাতে তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত অংশ লাভ করিতে পারেন সে ব্যবস্থারও বিধান রাখিতে হইবে।

মন্ত্রিমণ্ডলী সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হইবার যে প্রথা বর্তমানে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার বিলোপ করিতে হইবে এবং এরূপ-ভাবে তাহা গঠন করিতে হইবে, যেন কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধীন না রহিয়া, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরও নির্দেশসাপেক্ষ তাহাকে হইতে হয়। ইহা অপরিষদীয় হইবে এই অর্থে যে, পরিষদের কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে ইহাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া চলিবে না এবং মন্ত্রিসভার সদস্যগণ যখন পরিষদসদস্যদের মধ্য হইতেই নির্বাচিত হইবেন, পরিষদকক্ষে তাঁহাদের বসিবার, বলিবার, ভোট দিবার ও প্রশ্নের উত্তর দিবার অধিকার রহিবে, সেদিক দিয়া পরিষদীয়রূপেও গণ্য হইবার তাহা যোগ্য।

শাসন-বিভাগের সর্বোচ্চকর্তারূপে প্রধান মন্ত্রীর সকল দলের বিশ্বাস-ভাজন হওয়া কর্তব্য; কোন একটি সংখ্যালঘু দলের প্রতিনিধিরূপে যিনি মন্ত্রিসভায় আসন গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে ব্যবস্থাপরিষদস্থ সেই দলের আস্থা-ভাজন হইতে হইবে। পরিষদ কর্তৃক আনীত অসদাচরণ ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন সদস্য মন্ত্রিসভা হইতে অপসারিত হইতে পারিবেন না। এই নীতি অনুযায়ী প্রধান মন্ত্রী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হইতে গৃহীত মন্ত্রিসভার সদস্যগণ Single Transferable ভোটের সাহায্যে নির্বাচিত হইবেন সমগ্র পরিষদ কর্তৃক এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ অনুরূপ প্রথাতেই নির্বাচিত হইবেন পরিষদস্থ স্ব স্ব সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় দ্বারা।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিনিধির হার নিম্নলিখিতরূপ নির্ধারিত হইল:

৫৩ নং ছক

কেন্দ্রীয় পরিষদ

সম্প্রদায়	জনসংখ্যার শতকরা হার	প্রাপ্য আসন-সংখ্যার শতকরা হার
হিন্দু	৫৪.৬৮	৪০%
মুসলমান	২৮.৫	৩২%
তপশীলী	১৪.৩	২০%
ভারতীয় খৃষ্টান	১.১৬	৩%
শিখ	১.৪৯	৪%
এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান	০.৫	১%

(জনসংখ্যার এই শতকরা হিসাব সেন্সাসের অংক হইতে উপজাতি সম্প্রদায় বাদ দিয়া গৃহীত হইয়াছে।)

বোম্বাই

হিন্দু	৭৬.৪২	৪০%
মুসলমান	৯.৯৮	২৮%
তপশীলী	৯.৬৪	২৮%
ভারতীয় খৃষ্টান	১.৭৫	২%
এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান	০.০৭	১%
পার্শি	০.৪৪	১%

পাঞ্জাব

মুসলমান	৫৭.০৬	৪০%
হিন্দু	২২.১৭	২৮%
শিখ	১৩.২২	২১%
তপশীলী	৪.৩৯	৯%
ভারতীয় খৃষ্টান	১.৭১	২%

আসনসমূহ নিম্নলিখিত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করিয়া বণ্টিত হইবে:

(১) সংখ্যাধিক্যের শাসন নীতিগতভাবে অচল ও কার্যতঃ অসমর্থনযোগ্য।

(২) কোন সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে পরিষদের আসন-বণ্টন সম্বন্ধে যে আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেওয়া হইবে, তাহা এতবেশী হইবে না যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ দলসমূহের মধ্যে, এমন কি, লঘুতম দলের সহযোগিতার সাহায্যেও সে আপন দলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইবে না।

(৩) আসনসমূহ এরূপভাবে বণ্টিত হইবে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠদল সংখ্যা-লঘুদলগুলির মধ্যে যে কোন একটি বৃহৎ দলের সহিত মিলিত হইয়া এরূপ সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে পারিবে না যে, সংখ্যালঘিষ্ঠদলগুলির স্বার্থ সে অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারে।

(৪) আসনসমূহ এরূপভাবে বণ্টন করিতে হইবে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর না করিয়াই সংখ্যালঘু দলগুলি একত্র মিলিত হইয়া গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে পারে।

(৫) সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অংশ হইতে গৃহীত 'ওয়েটেজ' সংখ্যালঘু দলগুলির মধ্যে নিম্ন হইতে ঊর্ধ্বগ প্রথায় বণ্টন করিতে হইবে, যাহাতে সংখ্যালঘু দলগুলির মধ্যে যেটি আকারে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং সামাজিক মর্যাদা, শিক্ষা ও অর্থনীতির দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত তাহা আকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও অন্যান্য বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দলগুলি অপেক্ষা অল্পসংখ্যক আসন লাভ করিতে পারে।

ডাক্তার আম্বেদকর দাবী করেন, তাঁহার পরিকল্পনা মুসলমানদের পক্ষে পাকিস্থান অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর, কারণ, (১) পাকিস্থানের মূল ভিত্তি সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিপদাশঙ্কা ইহার দ্বারা বিদূরিত; (২) মুসলমানগণ বর্তমানে যে 'ওয়েটেজ' সম্ভোগ করিতেছেন তাহা তদবস্থই রহিবে; (৩) মুসলমান প্রতিনিধিসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ অপাকিস্থানী প্রদেশসমূহে তাঁহাদের অবস্থা এত বেশী শক্তিশালী হইবে যে, পাকিস্থানী আমলেও তাহা সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ।

ডাক্তার আম্বেদকর হিন্দুদিগকে তাঁহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনের দাবী পরিহার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন এই কারণে যে, সাম্প্রদায়িক গোলযোগের অনেকাংশের জন্য দায়ী এই দাবীই এবং তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন, তাঁহার পরিকল্পিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থরক্ষার জন্য রক্ষাকবচসহ আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সন্তুষ্ট থাকিতে।

ডাক্তার আম্বেদকরের নির্ধারিত নীতি সামান্যমাত্র পরীক্ষা করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, হিন্দু ও মুসলমান এই সম্প্রদায় দুইটি কোন দিন মিলিত হইতে পারে না—হওয়া কর্তব্য নয়—এই পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন; তাঁহার এই ধারণা নীতি ও বাস্তবতা উভয় দিক দিয়াই সমর্থনের অযোগ্য। সংখ্যাধিক্যের শাসন বলিতে তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সহিত ক্ষুদ্রতম সংখ্যালঘু দলের মিলিত শাসন এবং তাঁহার মতে এই ধরণের শাসননীতিও বাস্তবতার দিক দিয়া অসমর্থনযোগ্য; কিন্তু কোন একটি সংখ্যালঘুদলকে অপর একটি সংখ্যালঘু দলের

সহিত মিলিত হইয়া কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠদলের উপরই নয়, অন্যান্য সংখ্যালঘুদলের সহিত তাহার মিলিত শক্তির উপরেও প্রাধান্য করিতে দিতে তাঁহার কোনই আপত্তি নাই। তাঁহার প্রদত্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, আকার ও আয়তন নির্বিশেষে সংখ্যালঘিষ্ঠদলকে তিনি শতকরা মাত্র চল্লিশটি আসন দিতে প্রস্তুত, অবশিষ্ট আসনগুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে বণ্টিত হইবে। তাহার ফলে ব্যাপার দাঁড়াইবে এই যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি ইচ্ছা করিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে মন্ত্রিত্ব গঠন করিবার সুযোগ কোনদিনও নাও দিতে পারে। তিনি কেন্দ্রীয় ও অপর দুইটি প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদের সংখ্যাগত হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার তৃতীয় নীতিটি প্রয়োগ করেন নাই। উক্ত হিসাব হইতে দেখা যায়, কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ই যে বৃহত্তম সংখ্যালঘুদলের সহিত মিলিত হইয়া সুস্পষ্ট সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে পারিবে তাহা নয়, কেন্দ্রীয় ও বোম্বাই প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে যে কোন দুইটি বৃহত্তম সংখ্যালঘু-দল মিলিত হইলে সে সুবিধা অর্জনে সক্ষম হইবে।

তাঁহার পঞ্চম নীতিটি সম্পূর্ণ অভিনব। কিন্তু দেখিয়া মনে হয়, তপশীলী সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষে ইহা প্রযোজ্য নয়। অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজের দিক দিয়া উপজাতি সম্প্রদায়ই দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক অনুন্নত, অথচ সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যে একটি স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও তাহাদের নাম পর্যন্ত উল্লিখিত হয় নাইঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা নির্ণয় করিতে গিয়া সেখানে দেখান হইয়াছে যে, তাহা হইতে উপজাতি সম্প্রদায় বিযুক্ত, মাত্র সেইখানে তাহাদের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৃটিশ ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার ১৩·৫০ ভাগ তপশীলী, ২৬·৮৩ মুসলমান, ১·১৮ খৃষ্টান ও ১·৪১ শিখ এবং ইঁহারা সকলেই অতিরিক্ত আসন পাইবার অধিকারী; অথচ উপজাতিগণ সমগ্র জনসংখ্যার ৫·৬৫ ভাগ হইয়াও সে অধিকার হইতে তাঁহারা বঞ্চিত। কোন কোন প্রদেশে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় অপেক্ষা তাঁহাদের লোকসংখ্যা অনেক অধিকঃ যথা, আসামে মোট জনসংখ্যার তাঁহারা শতকরা ২৪·৩৫ ভাগ এবং তপশীলী সম্প্রদায় ৬·৬৩ ভাগ মাত্র; বিহারে তাঁহারা ১৩·৯১ এবং তপশীলীগণ ১১·৯৪; উড়িষ্যায় তাঁহারা ১৯·৭২ অথচ তপশীলীগণ মাত্র ১৪·১৯; যুক্তপ্রদেশে ও বেরারে উপজাতিগণ তপশীলী সম্প্রদায়ের প্রায় সমসংখ্যক, সেখানে উভয় সম্প্রদায় যথাক্রমে ১৭·৪৭ ও ১৮·১৪; বোম্বাইয়ে তাঁহারা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭·৭৪ ভাগ এবং তপশীলী সম্প্রদায় শতকরা ৮·৮৯ মাত্র। বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও বেরার এবং উড়িষ্যায় উপজাতিদের জনসংখ্যা মুসলমান জনসংখ্যা অপেক্ষাও অধিক, উক্ত প্রদেশ তিনটিতে মুসলমানগণ মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে শতকরা ১২·৯৮, ৪·৬৬ ও ১·৬৮ ভাগ মাত্র। উপজাতিদিগকে বাদ দিবার যুক্তি অতি পরিষ্কারঃ উল্লিখিত হিসাবে সমগ্র ভারতবর্ষে ও প্রদেশসমূহে তাঁহাদের জনসংখ্যার যে হার দেখান হইয়াছে তদনুযায়ী অনেক প্রদেশে তাঁহারা তপশীলী সম্প্রদায় হইতে সংখ্যাধিক এবং কোন কোন প্রদেশে মুসলমানগণ অপেক্ষাও সংখ্যাগুরু। কাজেই ডাক্তার আম্বেদকরের পঞ্চম নীতি যদি উপজাতিগণ সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হয়, তাহা

হইলে তাঁহাদের অনুন্নত অবস্থার দরুণ তপশীলী সম্প্রদায় অপেক্ষাও অধিক আসনের তাঁহারা দাবীদার হইবেন এবং তাহার ফলে তপশীলী ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের যে পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে, তাহা একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া যাইবে।

ডাক্তার আম্বেদকর যে নীতিগুলির কথা খুলিয়া বলিয়াছেন, তাহা ছাড়া আরও কতগুলি তাঁহাদের প্রস্তাবের মধ্যে উহ্য ও নিহিত রহিয়া গিয়াছে। মন্ত্রী নির্বাচনের বেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজে নিজেই এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে মন্ত্রী-পরিষদে তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারিবেন, অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি Single Transferable ভোটের সাহায্যে নির্বাচিত হইবে সমগ্র পরিষদ কর্তৃক। তাহার ফলে, ব্যবস্থাপরিষদে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সদস্যগণ কর্তৃক নিজস্ব ভোটে নির্বাচিত মন্ত্রিসভার প্রতিনিধি-সংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগের ৪০ ভাগ, অর্থাৎ, শতকরা ১৬ ভাগে মাত্র আসিয়া দাঁড়াইবে; অবশিষ্ট বা অবশিষ্টের অধিকসংখ্যক নির্বাচিত হইবেন সম্পূর্ণরূপে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্তৃক। সুতরাং ব্যবস্থাপরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার সহিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-গুলির সদস্যসংখ্যার যে অনুপাত, মন্ত্রিসভায় তাঁহাদের নিজস্ব প্রতিনিধিসংখ্যা তাঁহারা সেই অনুপাত অনুযায়ী নির্বাচন করিতে তো পারিবেনই, উপরন্তু মন্ত্রী-পরিষদে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রাপ্য আসনগুলিও, ইচ্ছা করিলে, এক বা একাধিক দলের সহিত মিলিত হইয়া অধিকার করিতে সক্ষম হইবেন।

তাহার পর, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় মিলিত না হইলে, তপশীলী সম্প্রদায়ের সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁহাদের কাহারও পক্ষে মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হইবে না; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যে কোন একটি সম্প্রদায় যদি তপশীলীদের সহিত মিলিত হন, তাহা হইলে অপর সম্প্রদায় ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদলগুলিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া, শাসনক্ষমতা হস্তগত করা তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত হইবে।

ডাক্তার আম্বেদকর সংবাদপত্রে প্রকাশিত পরিকল্পনানুযায়ী সমগ্র দেশের হিসাব দেখান নাই, দেখাইয়াছেন কেবলমাত্র কেন্দ্রীয়, বোম্বাই ও পাঞ্জাব ব্যবস্থা-পরিষদের। যদি সমস্ত প্রদেশগুলির হিসাব কষিয়া বাহির করিয়া, তাহার উপর ডাক্তার আম্বেদকরের নীতি প্রয়োগ করা যায়, তাঁহার নীতির অসারতা ও অযৌক্তিকতা সেই মুহূর্তে প্রকট হইয়া পড়িবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুদলগুলির মোট লোকসংখ্যা প্রদেশের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৮·২১ ভাগ; তাঁহারই হিসাব অনুযায়ী উপজাতি-বর্জিত উড়িষ্যার মোট জনসংখ্যার মধ্যে তপশীলী শতকরা ১৪·১৯ ভাগ, মুসলমান ১·৬৮, খৃষ্টান ০·৩২, একুনে ১৬·১৯; এইসব অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুদলগুলির মধ্যে শতকরা ৬০টি আসন তিনি যে কি উপায়ে বণ্টন করিবেন তাহা বুঝা দুঃসাধ্য।

(তেতাল্লিশ)

এম, এন, রায়ের শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব

শ্রীযুত এম, এন, রায় ভারতের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয় একটি প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে 'কতগুলি মৌলিক ও বিতর্কমূলক প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছে এবং তাহার বিস্তৃত বিবরণ উপস্থিত স্থগিত রাখা হইয়াছে পরে পূর্ণ করিয়া লইবার জন্য।' 'মৌলিক প্রশ্নগুলি নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধেঃ (১) ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি, (২) রাষ্ট্রের গঠন এবং (৩) অধিকারের উৎস। অনুন্নত ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবস্থা বিতর্কের অধীনরূপে বিবেচিত। প্রস্তাবে প্রচেষ্টা হইয়াছে মৌলিক প্রশ্নগুলির জবাব দিবার ও বিতর্কমূলক বিষয়গুলির সম্মুখীন হইবার।' 'গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের অর্থই হইবে ভারতীয় জনসাধারণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর—এই পূর্ব-গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া এই শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব রচিত।' বিপ্লব ব্যতিরেকে গণপরিষদ গঠন অবাস্তব, কাজেই ক্ষমতা হস্তান্তরের কার্য বৃটিশ পার্লামেন্টের উদ্যোগেই নিষ্পন্ন হইবে; পার্লামেন্টের প্রথম কর্তব্য হইবে আইনানুযায়ী ও যথারীতি ভারতীয় জনসাধারণের নিকট শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করা এবং দ্বিতীয় কর্তব্য হইবে, এমন এক শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা, যাহার সাহায্যে ভারতীয় জনসাধারণ তাহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা কার্যতঃ প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে। 'সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরের ভিত্তিতে একটি শাসনতন্ত্রের পরিবর্তে অপর আর একটি শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করিবার পক্ষে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের আবশ্যকতা অপরিহার্য।' উইলকারী যেমন করিয়া 'এক্‌জিকিউটর' নিয়োগ করেন, ঠিক তেমনিভাবেই পার্লামেণ্ট নিয়োগ করিবেন অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট। এইভাবে উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় যে বিল রচিত হইবে তাহারই সাহায্যে বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের অন্তর্গত সমগ্র অঞ্চলের শাসনক্ষমতা ভারতীয় জনসাধারণের অধিকারে হস্তান্তরিত হইবে; গভর্ণমেণ্ট ও দেশীয় রাজাসমূহের মধ্যে যে সকল চুক্তি বলবৎ আছে, উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে সেগুলি নাকচ করা হইবে এবং সংশ্লিষ্ট শাসনতন্ত্র অনুমোদন করা হইবে এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যে, ইহা হইবে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার দ্যোতক এবং ইহার বলে নিযুক্ত গভর্ণর জেনারেল হইবেন অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের নিয়োগকর্তা। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট অধিকার প্রাপ্ত হইবে এই শাসনতান্ত্রিক আইনের উৎস হইতে এবং নির্বাচনমূলক কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট সে দায়ী হইবে না; ইহা 'পিপ্‌লস কমিটি'সমূহের লোকসংখ্যা ও অধিকার-সীমা নির্ধারণ করিবে, শাসনকার্যের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, কৃষ্টি ও ভাষাগত ঐক্যের ভিত্তিতে ভারতীয় প্রদেশসমূহের সীমা নির্ধারণ করিবে, প্রাদেশিক 'পিপল্‌স কাউন্সিল' ও প্রাদেশিক গভর্ণরগণের নির্বাচন পরিচালন করিবে, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ গঠন করিবে, নবগঠিত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহের

মধ্যে কোনটি যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে থাকিতে চায় কিনা তাহা নির্ণয় করিবে, গভর্ণর জেনারেল ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের ডেপুটিগণের নির্বাচন এবং কাউন্সিল অব্ ষ্টেটের সদস্যগণের মনোনয়ন নিয়ন্ত্রণ করিবে, পরিশেষে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ 'পিপল্‌স কাউন্সিল' গঠন করিবে এবং যে সম্মত প্রদেশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে অনিচ্ছুক, সেগুলি সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

দেশীয় রাজন্যবর্গ সম্বন্ধীয় অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের সহিত এরূপ একটি পারস্পরিক চুক্তি-সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করা হইবে, যাহার বলে ভারতীয় রাজ্যসমূহের উপর শাসন পরিচালনের তাঁহাদের সর্বপ্রকার ক্ষমতা লোপ পায় এবং সেই পরিমাণ একটি বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া—যদ্দ্বারা মর্যাদাসম্পন্ন জীবনযাপনে তাঁহারা সক্ষম হন।

শাসন-প্রস্তাবে যে সমস্ত মৌলিক অধিকার ও মূলনীতি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি ঘোষণার একটি ধারা আছে, তাহাদের মধ্যে একটি হইল, 'নির্বাচনমূলক সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রথায় পরিচালিত স্বতন্ত্র নির্বাচন দ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির স্বার্থরক্ষা করিতে হইবে।' যুক্তরাষ্ট্রের আকার ও গঠনভংগী বিবৃত করিবার পর পরিকল্পনায় প্রস্তাব করা হইয়াছে, 'যে প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে থাকিবে, যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিটরূপে তাহা গণ্য হইবে না।'

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র যতদিন পর্যন্ত গঠিত না হয়, ততদিন কোন প্রদেশের যুক্তরাষ্ট্রের বহির্ভূত থাকিবার প্রস্তাব শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচিত 'পিপল্‌স কাউন্সিল' গ্রহণ করিতে পারিবে। প্রস্তাবটি ভোটাধিক্যের দ্বারা গৃহীত হইলে, সে সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই অভিমত যাচাই করিবার জন্য জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইবে। অধিকসংখ্যক ভোটের দ্বারা সমর্থিত না হইলে প্রস্তাব কার্যকরী হইবে না। যুক্তরাষ্ট্রের বহির্ভূত প্রদেশগুলি যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত বিশিষ্ট বিষয়গুলি ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবের ধারা অনুযায়ী শাসিত হইবে এবং ইচ্ছা করিলে একটি স্বতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র নবগঠিত সেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলির সহিত শুল্ক, কারেন্সী, রেলওয়ে প্রভৃতি সাধারণ স্বার্থগত ব্যাপারে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে। পূর্ব-সম্পাদিত একটি স্বতন্ত্র চুক্তির সর্তাধীনে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইবে বৃটিশ কমনওয়েল্‌থ নামক বৃহত্তর যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সদস্য। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলে, তদন্তর্গত ইউনিটগুলির তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার রহিবে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট বিচ্ছিন্ন হইবার প্রস্তাব গণভোট গ্রহণের জন্য জনসাধারণের সম্মুখে পেশ করিবেন এবং প্রদেশের ভোটাদাতাগণ কর্তৃক অধিকসংখ্যক ভোটে গৃহীত হইলে তবে তাহা কার্যকরী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবের যে অংশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদ, রাষ্ট্রীয় পরিষদ, সুপ্রিম পিপল্‌স কাউন্সিল, গভর্ণর জেনারেল, ব্যবস্থাপক সভার মুখপাত্র, মন্ত্রিসভার মুখপাত্র, প্রদেশসমূহ, সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠন, বিচার বিভাগ এবং

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম এখানে প্রদত্ত হইল না, কারণ আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় হইতেছে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও পাকিস্থান স্থাপন দ্বারা তাহার সমাধানের প্রস্তাব; কাজেই উল্লিখিত বিষয়গুলির সহিত আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। ঐ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে আলোচ্য প্রস্তাবের আনুষঙ্গিক গৌণ বিষয়রূপে গ্রহণ করা উচিত হইবে না, বিশেষতঃ বিষয়গুলি সাম্প্রদায়িক সমস্যার সহিত সংশ্লিষ্ট এরূপ কোন আভাস যখন মূল প্রস্তাবে প্রদত্ত হয় নাই।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রীযুক্ত রায় যে ব্যবস্থা প্রস্তাব করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন, 'মুসলিম লীগের দাবী সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হইয়াছে। ভারতের বর্তমান শাসনতান্ত্রিক গঠনের গন্ডীর মধ্যে ভারতীয় জনসাধারণের আয়ত্তে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবার পূর্বেই কোন কোন অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করিবার দাবী কার্যে অগ্রসর হইবার পথে অন্তরায় স্বরূপ। সুতরাং প্রস্তাবে সে সমস্যা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি অখণ্ড শাসনতান্ত্রিক ইউনিটরূপে গ্রহণ করিবার ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর কার্য নিষ্পন্ন হইবে। তাহার পর নির্বাচনমূলক ভারতীয় সকল প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বাধীনতা হইতে মুক্ত অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রদেশসমূহের সীমা নির্ধারণ করিবেন; এই উপায়ে গঠিত প্রদেশগুলির যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান সম্পূর্ণরূপে তাহাদের স্বেচ্ছাধীন বলিয়া গণ্য হইবে। বিচ্ছিন্ন হইতে ইচ্ছুক প্রদেশগুলির জন্য বিচ্ছিন্ন হইবার ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রস্তাবে এমন এক যুক্তরাষ্ট্রীয় আকার পরিকল্পিত হইয়াছে, যাহার মধ্যে বিভেদাত্মক মনোবৃত্তি প্রশ্রয় লাভের সুবিধা পাইবে না। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্র ও কেন্দ্রায়ত্ত ব্যবস্থা একত্র মিলিত হইয়াছে।'

এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য শুধু এই যে, বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা ভবিতব্যতার হস্তে ন্যস্ত রাখিয়া ও প্রদেশের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রের ভোটাধিক্যের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত রহিতে মুসলিম লীগ সম্মত হইবে না; কৃষ্টি ও ভাষাগত ঐক্যের ভিত্তিতে প্রাদেশিক সীমার পুনর্নির্ধারণ প্রস্তাবও তাহাদের মনঃপূত হইবে না, কারণ সে উপায়ে গঠিত প্রদেশগুলি ধর্ম ও সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে গঠিত প্রদেশসমূহের অনুরূপ নাও হইতে পারে, তাহা ছাড়া সে সীমা নির্ধারণের জন্য কর্তৃত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের গঠনপদ্ধতির কথা যখন সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত; সে সম্বন্ধে এইটুকুমাত্র প্রকাশ যে, তাহা নিয়োগ করিবেন গভর্ণর জেনারেল এবং গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইবেন পার্লামেণ্ট কর্তৃক। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-সমূহের স্বার্থরক্ষার জন্য নির্বাচনমূলক যাবতীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পৃথক নির্বাচনের যে ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহাও মুসলিম লীগের সন্তোষবিধানে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

(চুয়াল্লিশ)

উপসংহার

উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব-ভারতে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে মুসলিম লীগের যে প্রস্তাব, তাহার বিকল্পস্বরূপ যে সকল বিভিন্ন প্রস্তাব রচিত হইয়াছে পাঠকবর্গের সম্মুখে আমি সেগুলি উপস্থাপিত করিলাম এই উদ্দেশ্যে, যাহাতে তাঁহারা সে সমূহ বিচার করিয়া দেখিতে পারেন ও তাহাদের সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিমত গঠন করিতে পারেন। আমার নিজস্ব নির্দিষ্ট কোন অভিমত প্রদান করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া আমি মনে করি না। আমি যতদূর জানি, মুসলিম লীগ ব্যতীত অন্য কোন সাম্প্রদায়িক দল বা প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষকে স্বাধীন মুসলমান ও অ-মুসলমান রাষ্ট্রে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন নাই। এমন কি, মুসলমানদের মধ্যেও এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছেন, যাঁহারা সে প্রস্তাবের বিরোধী। এই দলগুলি অধিক সংখ্যক অথবা কত সংখ্যক মুসলমানের পক্ষে কথা কহিবার অধিকারী তাহা নির্ণয় করিবার দায়িত্ব আমার নয়। তা ছাড়া, আমরা পরে দেখিব, আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের পক্ষে তাহা নির্ণয় করিবার প্রয়োজনীয়তাও নাই। আমার বিশ্বাস, অমুসলমান প্রতিষ্ঠান মাত্রই এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা খণ্ডন-প্রস্তাবের বিরোধী, তাঁহারা এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে যে কোন একটী আলোচনার জন্য বাছিয়া লইতে পারেন এবং তাহা হইতে এমন জিনিষ গড়িয়া তুলিতে পারেন, যাহা সকলের পক্ষে ন্যায় ও সুবিচার সম্মত হইবে, সকল দলের সন্তোষ বিধানে সমর্থ হইবে। আমার বিশ্বাস, গোলটেবিল বৈঠকে এরূপ একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা খুবই সম্ভব, কাজেই যে প্রস্তাবগুলি ইতিপূর্বে উল্লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে এবং যেগুলি আমি এখন পর্যন্ত দেখি নাই বা আলোচনা করি নাই—তদাতিরিক্ত নূতন কোন প্রস্তাব বৈঠকে উপস্থাপিত করিয়া বিশেষ কোন ফল লাভ হইবে না। মুসলিম লীগ কিন্তু তাহার সভাপতি ও অন্যান্য নেতৃবর্গের মারফৎ জানাইয়া দিয়াছে, লীগের লাহোর-প্রস্তাবের স্বীকৃতির উপর যে পরিকল্পনা রচিত নয়—তাহা লইয়া আলোচনা করিতে সে অসম্মত। নূতন কোন আলোচনা আরম্ভ করিবার পক্ষে ইহা প্রাথমিক বা পূর্ব সর্ত। কাজেই যে পরিকল্পনা এই সর্তাধীনে অগ্রসর হইবে না, তাহা লীগের আলোচ্য নয়। শুধু তাহাই নয়, যে পরিকল্পনা লাহোর-প্রস্তাবের লীগ-কৃত ব্যাখ্যা মানিয়া লইবে না, তাহাও তাহার আলোচনার অযোগ্য; অথচ প্রস্তাবটিকে সর্বজনবোধ্য করিবার জন্য তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করিতেও সে অসম্মত। শ্রীযুত সি, রাজাগোপালাচারী বলেন, তাঁহার প্রদত্ত সমাধান লীগের লাহোর-প্রস্তাবের দাবী পূর্ণ করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত। প্রস্তাবে যাহা নীতিরূপে অত্যন্ত সাধারণভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, সমাধানে তাহাই লাভ

করিয়াছে সুনির্দিষ্ট আকার। কিন্তু লীগ সভাপতি সে সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা পর্যন্ত করিতে অসম্মত হন এবং মহাত্মা গান্ধীর সহিত সুদীর্ঘ আলোচনাকালে লাহোর-প্রস্তাবের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান না করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত নীতি ও তাৎপর্য সম্বন্ধে মহাত্মাজীকে সচেতন করিতে সচেষ্ট হন। অতএব দেখা যাইতেছে, মুসলিম লীগের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার প্রয়োজন নাই। এই কারণেই অনেক চিন্তার পর আমি স্থির করিয়াছি, আর নূতন কোন পরিকল্পনা প্রদান না করাই বিধেয়। যে কোন পরিকল্পনাই প্রণীত হোক না কেন, তাহাকে দুইটি মৌলিক সর্ত পূরণ করিতে হইবে; প্রথমতঃ, তাহা সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে ন্যায় ও বিচারসম্মত হওয়া প্রয়োজন; দ্বিতীয়তঃ, তাহা বর্তমান কল-কোলাহলের ঊর্ধ্বে উঠিয়া কোটী কোটী ভারতবাসীর জন্য তাহার এমন কিছু প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন, যাহার জন্য তাহারা বাঁচিতে, খাটিতে ও মরিতে গর্ববোধ করিবে। যে মানুষ, সে কোন না কোন সম্প্রদায়ের সদস্যও—সম্ভবতঃ তাহার সাম্প্রদায়িক সত্তা অপেক্ষা মানবিক সত্তাই বৃহত্তর। পরিকল্পনা যতই বিস্তৃত ও সর্ব সম্প্রদায়ের দাবী পূরণের পক্ষে যতই সযত্ন রচিত হোক না কেন, মানুষকে যদি তাহা মনুষ্যত্বের দাবী ও অধিকার দান না করে, তাহা হইলে তাহার মূল্য—যে কাগজের উপর তাহা লিখিত তাহারই সমপরিমাণ। যে পরিকল্পনা এই বিরাট দেশের দীনতম অধিবাসীকে অতীতের তুলনায় মহত্তর ও বাঞ্ছিততর জীবনযাপনের সুযোগ দান করিবে, তাহাই হইবে দেশবাসীর গ্রহণের পক্ষে যোগ্যতম।

ভারতবাসীদের সম্মুখে বস্তুতঃ দুইটি বিকল্প প্রস্তাব আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; এখন প্রশ্ন হইতেছে, তাহাদের মধ্যে কোনটি তাহারা গ্রহণ করিবে। বিকল্প প্রস্তাবদ্বয়ের মধ্যে একটি হইল, দেশ এবং অধিবাসিগণকে স্বতন্ত্র অঞ্চল সুসংহতিতে বিভক্ত করা এবং অপরটি বৃহত্তম হইতে ক্ষুদ্রতম সকল সম্প্রদায় ও সংহতির নীতি, শিক্ষা ও সমৃদ্ধিগত পরিপূর্ণ উন্নতি লাভের পথে যে সকল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাধা দণ্ডায়মান, সেগুলি অপসারিত করিয়া দেশের ও জাতির অখণ্ডতা রক্ষা করা। এ নির্বাচন কেবলমাত্র হিন্দুদের উপর নির্ভর করে না, মুসলমান ও অন্যান্য সকল সম্প্রদায়েরই ইহা করণীয় এবং তাহা করিতে হইবে অবারিত দৃষ্টি এবং সচেতন ও সতর্ক মন লইয়া পক্ষীয় ও বিপক্ষীয় যুক্তিগুলি যথাযথভাবে আলোচনা করিবার পর। সেক্ষেত্রে উপরোধ বা বলপ্রয়োগের কোন প্রশ্ন নাই, একদল অপর দলকে ছাড়াইয়া যাওয়ার কোন সমস্যা নাই। একথা অস্বীকার করা চলে না যে, এ সমস্যা কেবলমাত্র এ দেশের পক্ষেই নয়, বিশ্বপরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় সীমার বহির্ভূত লক্ষ লক্ষ মানবের পক্ষেও অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ। কাজেই, সর্বসাধারণের প্রতি সুবিচার সম্পন্ন হইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মন লইয়া কঠোর যুক্তি ও অখণ্ড বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে প্রতিটি প্রশ্ন আমাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। এই পণ যদি ন্যায় ও নীতিসংগত হয়, সকলের গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব হইবে না। এ সম্বন্ধে অতীত চেষ্টার ব্যর্থতার উল্লেখ করিয়া কোন লাভ নাই, কারণ তাহার দ্বারা আমাদের দুর্বলতা এবং আত্মপ্রত্যয়ের অভাবই প্রমাণিত হইবে।

কোন আলাপ-আলোচনা যদি সার্থক, এমন কি, সম্ভব করিতে হয়, তাহা হইলে চরমপত্র প্রেরণ আমাদিগকে পরিহার করিতে হইবে, আলোচনা আরম্ভ করিবার পক্ষে পূর্ব-সর্ত প্রদান বন্ধ করিতে হইবে এবং যে দাবী সর্বোচ্চ, আলোচনা আরম্ভ হইবার পূর্বেই তাহাই সর্বনিম্ন দাবীরূপে উপস্থাপিত করিবার প্রথা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আলোচনা, অনুরোধ-উপরোধ ও পারস্পরিক আদান-প্রদানই হইল আমাদের একমাত্র অনুসরণীয় পন্থা। তদুপরি, সভ্যতাসম্মত উপায় বলিতে বুঝায় এইগুলিকেই। বর্তমান জগতের সুসভ্য জাতিগুলি অন্যবিধ উপায়ও অপ্রমেয় পরিমাণে অনুসরণ করিতেছে সত্য, কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহা অনুসরণের অযোগ্য। এল্ হামজা তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইউরোপের কোন কোন ক্ষুদ্রকায় দেশ ও জাতি অপেক্ষা পাকিস্থান আকারে ও আয়তনে বৃহত্তর হইবে। কিন্তু আমরা ইউরোপের ক্ষুদ্রতম জাতি অপেক্ষা বৃহত্তর হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিব কেন? এ আদর্শ আমরা কেন পোষণ করিব না যে, ভারতবর্ষ হইবে ইউরোপ ও আমেরিকার বৃহত্তম রাষ্ট্র অপেক্ষাও বৃহত্তর, এসিয়ার বৃহত্তম রাষ্ট্রের সমকক্ষ? যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য জীবনধারণ ও জীবনপাত করণ স্বচ্ছন্দে সম্ভব, ইহা কি সেই শ্রেণীর উচ্চাভিলাষ নয়? আমরা বৃহৎ হইতে চাই, ক্ষুদ্র ও দুর্বলকে দলিত ও দুর্গত করিবার জন্য নয়। পার্শ্ববর্তী অথবা দূরবর্তী কোন রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিবার কোন দৃষ্টান্তের উল্লেখ ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে দৃষ্ট হয় না। আমরা বৃহৎ হইতে চাই, আমাদের আপনাদের কল্যাণের জন্য, আমাদের মধ্যে দীনতম ও আমাদের বহির্ভূত ক্ষুদ্রতম যাহারা—তাহাদের সেবা ও শুভ পরিবেশনের জন্য। এই সেবাব্রত সাধনের পথে যাহা অন্তরায়, সর্বপ্রযত্নে তাহা অপসারিত করুন। বৃহৎ হইবার অভিশাপস্বরূপ নির্যাতন ও নিপীড়ন-সক্ষম যে শক্তি করায়ত্ত হয়, তাহা সর্বথা পরিহার করুন। কিন্তু সাবধান, হতাশার অনুবর্তী হইয়া হতাশাজনক সমাধানের আশ্রয় যেন আমরা গ্রহণ না করি।

খণ্ডন-প্রস্তাব যে হতাশা হইতে উদ্ভূত সমাধান, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। ইহা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঘটিত সমস্যা উগ্রতর না করিলেও, শান্ত করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু আমার আশঙ্কা, সে সমস্যা উগ্রতরই হইবে এবং তাহার পরিণাম অতিশয় তিক্ত ও ভয়াবহ না হইয়াই পারে না। পাকিস্থান যদি আরোপিত হয়, তাহার ফলে একপক্ষ যেমন উৎফুল্ল ও উল্লসিত হইবেন, অপর-পক্ষের মধ্যে তেমনি ধূমায়িত হইতে থাকিবে বিরাগ ও বিদ্বেষের প্রচ্ছন্ন বহ্নি। বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্ব ও আত্মঘাতী ভ্রাতৃবিরোধের মূলীভূত কারণ ইহাই। ইহাকে অবজ্ঞা করিবার মত অজ্ঞতার অধীন যেন আমরা না হই। সহস্র বৎসরব্যাপী যৌথ জীবনযাত্রা ও মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি আমরা অর্জন করিয়াছি তাহার সঞ্চয়ও যেন উপেক্ষিত না হয়, কারণ বর্তমান সমস্যা সমাধানের পক্ষে কোন কিছু যদি কার্যকরী হয়, তবে সেই পারস্পরিক প্রীতির সঞ্চয়ই হইবে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বল।

কিন্তু—তাহা সত্ত্বেও একটু 'কিন্তু' রহিয়া যায়ঃ এই সমস্ত সংবেদন

সত্ত্বেও পাকিস্থান যদি অপরিহার্য হয়, তাহা হইলে ততঃপর সব সহজ ও সরল হইয়া যাইবে—এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের দ্বারা প্রতারিত না হইয়া, পরিণামের জন্য প্রস্তুত থাকা আমাদের কর্তব্য হইবে। ইহার আনন্দোজ্জ্বল দিকটির স্বপ্ন দেখা যেরূপ সহজ, বীভৎস বিপজ্জনক দিকটি কল্পনা করা তদপেক্ষা কঠিন হইবে না। সুতরাং আমাদের জীবনে ও আচরণে ন্যায়, নীতি ও সুবিচারের অনুগামী হইতে এখনও যদি আমরা সচেষ্ট হই, তাহা হইলে বিপদ ও বিনাশজনক অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আমরা এখনও পরিহার করিতে পারি। হতাশার সুর ধ্বনিত করিয়া এই গ্রন্থের উপসংহার করিতে আমি ইচ্ছুক নই। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান ও পার্শী প্রভৃতি আমাদের স্বদেশবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সুবিচার, সততা ও সাধারণ বোধের উপর আমার আস্থা এখনও অবিচলিত; আমি এখনও বিশ্বাস করি, বর্তমান সমস্যার এমন কোন সমাধান তাঁহারা সন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিবেন, যাহা গ্রহণ ও সাধনযোগ্য, আমাদের উত্তর পুরুষগণ যাহার সম্বন্ধে গর্ববোধ করিবে এবং বিভ্রান্ত বিশ্বের সম্মুখে যাহা হইবে অনুসরণযোগ্য মহান আদর্শ। আমরা যদি অহিংসার উপর একান্ত-নির্ভর হইয়া সত্যের আলোক-বর্তিকাহস্তে অগ্রসর হই, তবেই সে সাধনা সার্থক করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে।

আমাদের জীবনকালেই আমরা দুইটি বিধ্বংসী বিশ্ব-সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিলাম। প্রথম মহাযুদ্ধের পর স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্রগঠন দ্বারা বিভিন্ন জাতিগত সমস্যা সমাধানের যে প্রচেষ্টা পরীক্ষিত হয়, তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে এবং তাহাই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে বৃহত্তর ও ব্যাপকতর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের। হইতে পারে, ইউরোপ এই দুইটি মহাযুদ্ধের ফলে লাভবান না হওয়া সত্ত্বেও, যুদ্ধোন্মুখ বিভিন্ন জাতিসমূহের উপর সদাজাগ্রত সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন রাখিয়া এখনও বিশ্বশান্তি রক্ষায় সচেষ্ট। কিন্তু অতীতের সমস্ত বিভেদ ও বিদ্বেষ সত্ত্বেও আমরা কি আমাদের দেশের অভ্যন্তরে এমন এক রাষ্ট্রগঠনে সহায়তা করিতে পারি না, যাহা কেবল দেশবাসীর আত্মরক্ষার পক্ষে নয়, উচ্চতম আদর্শের উপলব্ধির পক্ষেও সহায়ক হইবে? ইহার অর্থ, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের অস্বীকৃতি নয়, তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতা। প্রয়োজন শুধু—সকলে মিলিয়া সমবেতভাবে শ্রেষ্ঠ পন্থা খুঁজিয়া বাহির করা, অখণ্ড ঐকান্তিকতা ও শুভবুদ্ধির সহিত তাহা সাধন করা।

ক্রোড়পত্র

হিন্দুমুসলমান-সমস্যা সমাধান-প্রচেষ্টার কাহিনী ১৯৪৫ সালের জুলাইয়ের সিমলা কন্‌ফারেন্স অবধি আমি বিবৃত করিয়াছি। ইতিমধ্যে এমন কতগুলি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, সে কাহিনীকে আধুনিক করিতে গেলে যেগুলির উল্লেখ প্রয়োজন। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, মহাত্মা গান্ধীর সহিত মিঃ জিন্নার আলোচনাকালে এই ধারণার অল্পবিস্তর আভাস পাওয়া গিয়াছে যে, কোন অঞ্চল মুসলিম এলাকাভুক্ত করিবার জন্য যখন নির্ণয় করিবার প্রয়োজন হইবে—উক্ত অঞ্চল মুসলমানপ্রধান কিনা, তখন প্রদেশই হইবে সে গণনার ইউনিট, জেলা বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোন অঞ্চল ইউনিটরূপে গণ্য হইবে না। লীগ এবং তাহার নেতৃবর্গ এ বিষয়ে তাঁহাদের মনের কথা খুলিয়া বলিতে পুনঃ পুনঃ অস্বীকার করিয়াছেন। অবশেষে শ্রী সি, রাজাগোপালাচারিয়া নিম্নলিখিত মর্মে তাঁহার সমাধানমূলক প্রস্তাব প্রদান করিলেন, 'ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বপ্রান্তস্থ যে সমস্ত সন্নিহিত জেলা সুস্পষ্টরূপে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেগুলির সীমা নির্ধারণের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করা হোক।' বস্তুতঃ, এই প্রস্তাবই মিঃ জিন্নাকে ১৯৪৪ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে 'নিউজ ক্রনিকলের' প্রতিনিধির নিকট এই মর্মে বিবৃতিদানে বাধ্য করিল যে, ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান নামক দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত হইবে এবং 'উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, বেলুচিস্থান, সিন্ধু, পাঞ্জাব, বাংলা ও আসাম—এই প্রদেশগুলি বর্তমানে যেভাবে গঠিত সেই আকারে মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'১ লণ্ডনের 'ডেইলি ওয়ার্কার' পত্রিকার জনৈক প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকালে ১৯৪৪ সালের ৫ই অক্টোবর তারিখে তিনি বলেন, 'পাকিস্থান দাবীর তাৎপর্য পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই বিরাট দেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব এবং উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বাংলা ও আসাম—এই প্রদেশ ছয়টির মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা সাত কোটি এবং মোট জনসংখ্যার তাহারা শতকরা ৭০ ভাগ।'২ গান্ধী-জিন্না আলোচনা সমাপ্ত হইবার পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে 'লাহোর-প্রস্তাব সম্পর্কিত কোন একটি প্রস্তাবের উত্তরে মিঃ জিন্না বলেন, ভারত-বিভাগ নিষ্পন্ন হইবে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বাংলা, সিন্ধু, আসাম ও বেলুচিস্থান, এই ছয়টি প্রদেশের বর্তমান ভৌগোলিক গঠনের ভিত্তিতে এবং প্রয়োজনমত সীমা পরিবর্তনের সর্তাধীনে।' 'সর্তাধীন' কথাটির উপর জোর দিয়া তাহার ব্যাখ্যাস্বরূপ তিনি বলেন, আঞ্চলিক পুনর্ব্যবস্থা একতরফা ব্যাপার নয়, হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান উভয়পক্ষ সম্বন্ধেই তাহা সমভাবে প্রযোজ্য; এই উক্তির দ্বারা তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে সীমানির্ধারণ-সমস্যার যেভাবে সমাধান হইয়া থাকে, পরে সেই

---

1. Jinnah-Gandhi Talks, P. 75.
2. Ibid., P. 79.

উপায়েই সে প্রশ্ন মীমাংসিত হইতে পারিবে।'৩ সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, প্রদেশই ইউনিটরূপে গণ্য হইবে—জেলা, তালুক, মহকুমা বা অন্য কোন ক্ষুদ্রতর বিভাগ নয়। আঞ্চলিক পুনর্ব্যবস্থার প্রশ্ন কিন্তু তখনও অমীমাংসিত রহিয়া যায়।

'ডেইলি ওয়ার্কারের' প্রতিনিধির নিকট প্রদত্ত মিঃ জিন্নার বিবৃতি হইতে আমরা দেখিতে পাই, উল্লিখিত ছয়টি প্রদেশের মুসলিম অধিবাসি-সংখ্যা সাত কোটি এবং মোট জনসংখ্যার তাঁহারা শতকরা ৭০ ভাগ। দেখা যাইতেছে, মিঃ জিন্না সংখ্যার উপরে বিশেষ বিশ্বাসবান নন; তাঁহার ধারণা, যে প্রস্তাব আদৌ যুক্তিসহ নয় তাহা জোরের সহিত উপস্থাপিত করিলেই ভূগোল ও সহস্রবর্ষব্যাপী ইতিহাসের মত গণিতশাস্ত্রও নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত করা সম্ভব হইবে। এই গ্রন্থের অন্য খণ্ডে জনসংখ্যার হিসাবের যে ছক প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইবে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, বেলুচিস্থান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব—উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের এই চারিটি প্রদেশের মোট লোকসংখ্যা ৩,৬৪,৯৩,৩২৫; তন্মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা ২,২৬,৫৩,২৯৪, অর্থাৎ শতকরা ৬২·০৭ ভাগ। সেইরূপ পূর্বাঞ্চলের সমগ্র আসাম ও বাঙলা প্রদেশ দুইটির মোট লোকসংখ্যা ৭,০৫,১১,২৫৮; ইহার মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা ৩,৬৪,৪৭,৯১৩, অর্থাৎ শতকরা ৫১·৬৯ ভাগ। দুইটি অঞ্চলের মিলিত লোকসংখ্যা হইবে ১০,৭০,০৪,৭৮৩ এবং তন্মধ্যে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা ৫,৯১,০১,২০৭, অর্থাৎ শতকরা ৫৫·২৩। হিসাবে দেখা যায়, উভয় অঞ্চলের মুসলমান জনসংখ্যা ৫ কোটী ৯০ লক্ষ, মিঃ জিন্না কথিত ৭ কোটী নয় এবং মোট লোকসংখ্যার সহিত তাহাদের শতকরা অনুপাতও ৫৫·২৩,—৭০ নয়।

যাহা হোক, উল্লিখিত আঞ্চলিক পুনর্ব্যবস্থা সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছুটা ধারণা এতদিনে পাওয়া গেল। বি, বি, সির মিঃ ডোনাল্ড এডওয়ার্ডস এক সাক্ষাৎকালে মিঃ জিন্নাকে প্রশ্ন করেন, ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব—এই উভয় অঞ্চলের মধ্যে ব্যবধান প্রায় হাজার মাইল ব্যাপী এবং সেই ব্যবধান রচনা করিয়া এক হিন্দু যোজক তাহাদের মাঝখানে প্রসারিত রহিয়াছে; এরূপক্ষেত্রে উক্ত অঞ্চলদ্বয় লইয়া পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠন করা কষ্টকর হইবে কিনা। উত্তরে মিঃ জিন্না বলেন, 'আপনারা যখন বৃটেন হইতে বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্যান্য অংশে যান, সুয়েজখালের মত বৈদেশিক অধিকারের উপর দিয়া আপনাদিগকে গমনাগমন করিতে হয় এবং তাহা সম্ভব হয় পারস্পরিক আপোষ-রফার দ্বারা। আজও আমরা বিনা বাধায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে হিন্দুস্থানের উপর দিয়াই যাওয়া-আসা করিয়া থাকি, সে ব্যবস্থা তখনও চলিবে না কেন? এক বন্ধুত্বসম্পন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পথে হিন্দুরাষ্ট্র যাহাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যোগাযোগের পথ তাহাদিগকে রুদ্ধ করিতে দেওয়া হইবে না এবং ইহাই হইবে উভয়ের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির অন্যতম সর্ত।'৪

ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এই দুইটি অঞ্চল

---

3. Ibid., P. 72.
4. 'The Dawn', Dtd., 2-4-46.

লইয়া একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে, ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে গৃহীত লাহোর-প্রস্তাব অনুযায়ী সাব্যস্ত হয়, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের যে সকল অঞ্চলে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাহাদিগকে লইয়া একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হইবে, একটিমাত্র নয়। মিঃ জিন্না কিন্তু এখন দাবী করিতেছেন, এই অঞ্চলদ্বয় লইয়া একটিমাত্র রাষ্ট্র গঠিত হইবে এবং হিন্দুগণ উভয় অঞ্চলের মধ্যে এক হাজার মাইলব্যাপী যোজক মুসলিম রাষ্ট্রদ্বয়কে পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করিতে দিতে বাধ্য থাকিবে। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, উভয় অঞ্চলের মধ্যে গমনাগমনের পথ বর্তমানে যখন মুক্ত, তখন ভবিষ্যতেই বা তাহা অবারিত রহিবে না কেন। সে প্রশ্নের সহজ উত্তর হইল এই যে, অঞ্চলদ্বয় বর্তমানে একই রাষ্ট্রের অধীন বলিয়া তাহাদের মধ্যে যে কেবলমাত্র গমনাগমনের পথই উন্মুক্ত রহিয়াছে তাহা নয়, দিল্লীতে অবস্থিত একই কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদ দ্বারা তাহারা পরিচালিত হইতেছে। ভারত বিভাগের পর হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান অঞ্চল দুইটি দুই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইবে, সেক্ষেত্রে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কর্তৃক তাহার নিজস্ব এলাকার ভিতর দিয়া অপর একটি স্বাধীন রাষ্ট্রকে তাহার বহুদূরবর্তী অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবার স্থলপথ প্রদত্ত হইবার প্রশ্ন একেবারে অবান্তর।

সেই একই সাক্ষাৎকালে মিঃ জিন্নাকে প্রশ্ন করা হয়, বিপুল হিন্দু জনসংখ্যা সত্ত্বেও আসাম পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য হইবে কেন? উত্তরে তিনি বলেন, 'পাকিস্থান ব্যতীত অন্য কোন অঞ্চলের সহিত আসামকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার উপায় নাই।' মিঃ জিন্নার যুক্তি সম্ভবতঃ এইরূপ—বাঙলা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইলে আসাম ভারতের অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, কাজেই পাকিস্থানের পূর্বাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ছাড়া তাহার আর উপায়ান্তর থাকে না। কিন্তু আসাম হিন্দুস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তখনই, যদি জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কুচবিহারের হিন্দুরাজ্য পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়; অথচ প্রথমোক্ত দুইটি জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা যথাক্রমে ২৩ ও ২·৪ এবং কুচবিহার রাজ্যে হিন্দুগণ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬২ ভাগ। কোন কোন অঞ্চল সার্বভৌম পাকিস্থান-রাষ্ট্রের অন্তর্গত হইবে—এ প্রশ্ন আলোচনার ক্ষেত্রে যুক্তি ও ন্যায় বিচারের কোন স্থান নাই। পাঞ্জাব, বাঙলা ও আসামের যেসব জেলায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা অত্যধিক, সেগুলিকেও পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিতেই হইবে, কারণ যে প্রদেশগুলি মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্গত বলিয়া দাবী করা হয়, ইহারা দৈবক্রমে তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। দুইটি মুসলিম অঞ্চলের মধ্যে যোজক প্রদানের পথে হিন্দুদিগকে কোনক্রমেই অন্তরায় হইতে দেওয়া হইবে না। আসাম হিন্দুস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন, অতএব তাহাকে পূর্বাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে। কিন্তু আসামকে হিন্দুস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে কেন? কারণ, অত্যধিক হিন্দুসংখ্যাধিক্যসম্পন্ন যোজকের দ্বারা হিন্দুস্থানের সহিত তাহাকে সংযুক্ত হইতে দিতে মুসলিম রাষ্ট্র সম্মত নয়। চমৎকার! যেদিক দিয়াই হোক, এই রাজনৈতিক সুর্তিখেলায় পাকিস্থানের জয় সুনিশ্চিত।

সম্প্রতি আর একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে। বাঙলার লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দি দাবী তুলিয়াছেন, কেবলমাত্র সমগ্র বাঙলা ও আসাম নয়, বিহার প্রদেশের অন্তর্গত সিংভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা ও পূর্ণিয়াও পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইবে। তাহারা যে পূর্বাঞ্চলের অংশরূপে গণ্য হইবে সে বিষয় নিঃসন্দেহ। তখন একথা বলা সম্ভব হইবে যে, ভারতের অধিকাংশ লৌহ, তাম্র ও অন্যান্য ধাতব সম্পদ এবং সমগ্র তৈল-সম্পদ পাকিস্থানের অধিকারভুক্ত। এতদিন ধরিয়া লোকে দেখাইয়া আসিয়াছে, যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য এই সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর দিক দিয়া পাকিস্থান অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত; সেই অভিযোগের উত্তরেই মিঃ সুরাবর্দি দাবী উপস্থাপিত করিয়াছেন, সে সম্পদের উদ্ভব যে অঞ্চলে, তাহা পাকিস্থানের অধিকারভুক্ত করিতেই হইবে। পাকিস্থানের আত্মনির্ভরতার পক্ষে তাহাদের অস্তিত্ব অপরিহার্য। পাকিস্থানের জন্য যে প্রদেশগুলি দাবী করা হইয়াছে—এই জেলাগুলি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হোক বা না হোক তাহাতে কিছুমাত্র আসে-যায় না; তাহাদের মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা যদি নিতান্ত নগণ্য হয়—মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ১৮·১২, তাহাতেই বা কি আসে যায়।

বিহার প্রদেশের অন্তর্গত চারিটি জেলা সমেত উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান জনসংখ্যার হিসাব পরবর্তী ৫৪নং ছকে প্রদত্ত হইল।

প্রসঙ্গক্রমে ইহাও উল্লেখ করা যায় যে, বিহারের চারিটি জেলা যুক্ত হইবার পর পূর্বাঞ্চলের মোট লোকসংখ্যার মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা ৪৮·৩৮ হওয়ার দরুণ মুসলমানগণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হইবেন; ফলে কোন একটি অঞ্চলে কেবলমাত্র মুসলমান সংখ্যাগুরুত্বের অধিকারে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবীর পক্ষে কোন যৌক্তিকতা যদি থাকিয়া থাকে, তবে এই আঞ্চলিক পুনর্গঠন-ব্যবস্থার পর তাহার চিহ্নমাত্র আর অবশিষ্ট রহিবে না। এমন কি, উভয় অঞ্চলের লোকসংখ্যা যদি যোগ করা হয়, সেক্ষেত্রেও মুসলমান জনসংখ্যা স্বল্প সংখ্যাধিক্য হইতে নামমাত্র সংখ্যাধিক্যে পরিণত হইবে, তাঁহাদের জনসংখ্যার শতকরা হার ৫৫·২৩ হইতে ৫২·৭১এ নামিয়া আসিবে। সুতরাং আঞ্চলিক পুনর্ব্যবস্থা উভয়তঃ হইবে—মিঃ জিন্নার এই উক্তির অর্থ দাঁড়াইল এই যে, হিন্দুস্থান হইবে দাতা এবং পাকিস্থান হইবে গ্রহীতা।

দুইজাতিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইবার পর হইতে আর একটি বিষয় জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। বাসভূমি, ভাষা প্রভৃতি অন্যান্য সকল বিচার্য বিষয় নির্বিশেষে কেবলমাত্র ধর্মগত যুক্তির বলেই মুসলমানগণ যখন একজাতিরূপে গণ্য হইবার যোগ্য, তখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে, যেসব মুসলমান লীগপ্রস্তাব-কথিত হিন্দুরাষ্ট্রের মধ্যে রহিয়া যাইবেন, তাঁহাদের অবস্থা ও মর্যাদার স্বরূপ কি হইবে? উল্লিখিত সাক্ষাৎকারের সময়ে যেসব অঞ্চলে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু হইবেন—সে-সব এলাকা সম্বন্ধে মিঃ জিন্নার প্রস্তাব কি প্রশ্ন করা হইলে, উত্তরে মিঃ জিন্না বলেন, 'সেইসব অঞ্চলে, দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক মাদ্রাজে হিন্দুরাষ্ট্র গঠিত হইবে; সেক্ষেত্রে সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলমানদের সম্মুখে তিনটি পথ

৫৪ নং ছক

বিহারের চারিটি জেলাসহ উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব্বাঞ্চলের মুসলমান ও অমুসলমান জনসংখ্যা

	মোট জনসংখ্যা	মুসলিম জনসংখ্যা	মুসলমান জনসংখ্যার হার	অমুসলমান জনসংখ্যা	অমুসলমান জনসংখ্যার হার
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল	৩,৬৪,৯৩,৫২৫	২,২৬,৫৩,২৯৪	৬২.০৭	১,৩৮,৪০,২৩১	৩৭.৯২
বাংলা ও আসাম	৭,০৫,১১,২৫৮	৩,৬৪,৪৭,৯১৩	৫১.৬৯	৩,৪০,৬৩,৩৪৫	৪৮.৩০
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল বাংলা ও আসাম একুনে	১০,৭০,০৪,৭৮৩	৫,৯১,০১,২০৭	৫৫.২৩	৪,৭৯,০৩,৫৭৬	৪৪.৭৬
বিহার প্রদেশের জেলাগুলি					
পূর্ণিয়া	২৩,৯০,১০৫	৯,৭৬,০৩৪	৪০.৮৪	১১,০১,৪৮৪	৫৯.১৬
সাঁওতাল পরগণা	২২,৩৪,৪৯৭	২,৬২,৮৩৬	১১.৭৬	১৮,৯৯,৯১২	৮৮.২৪
মানভূম	২০,৩২,১৪৬	১,৩২,২৩৪	৬.৫১	১১,৭১,৬৬১	৯৩.৪৯
সিংভূম	১১,৪৪,৭১৭	৪৩,২৩৩	৩.৭৭	১৪,১৪,০৫৫	৯৬.২৩
বিহার প্রদেশের জেলাগুলির একুনে	৭৮,০১,৪৬৫	১৪,১৪,৩৬১	১৮.১২	৬৩,৮৭,১১৪	৮১.৮৭
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল বাংলা-আসাম ও বিহারের জেলা চারিটির সর্ব মোট	১১,৪৮,০৬,২৪৮	৬,০৫,১৫,৫৫৮	৫২.৯৭	৫,৪২,৯০,৬৯০	৪৭.২৮

খোলা রহিবেঃ তাঁহারা সেই রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার লাভ করিতে পারেন; তাঁহারা সেখানে বৈদেশিকরূপে বসবাস করিতে পারেন; অথবা তাঁহারা পাকিস্থানে চলিয়া আসিতে পারেন। সেখানে স্থানের অভাব হইবে না; আমি তাঁহাদিগকে সানন্দে গ্রহণ করিব। কিন্তু তাঁহাদের কর্তব্য নির্ধারণ করিতে হইবে তাঁহাদিগকে।' মিঃ জিন্না একথা স্বীকার করিতেছেন যে, আজ যেসব মুসলমান ভারতবর্ষের নাগরিক, ভারত-বিভাগের পর তাঁহারা আর হিন্দুস্থানের নাগরিক-রূপে গণ্য হইবেন না; তাই তিনটি বিকল্পব্যবস্থা তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন। এই বিকল্প-ব্যবস্থাত্রয় পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক।

প্রথম প্রস্তাবঃ তাঁহারা সেই রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার লাভ করিতে পারেন। কিন্তু এস্থলে খুলিয়া বলা দরকার যে, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র কর্তৃক সেই উদ্দেশ্যে রচিত কতগুলি নিয়মাধীনেই কোন বৈদেশিক সেই রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম হন। নিজস্ব অধিবাসিগণকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার, বৈদেশিকগণের নাগরিক অধিকার লাভের পথে বাধানিষেধ আরোপ করিবার—এমন কি, সে অধিকার তাহাদিগকে আদৌ প্রদান না করিবার পরিপূর্ণ ক্ষমতা যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বৃটিশ উপনিবেশসমূহ ভারতের মতই বৃটিশ কমনওয়েল্‌থ ও সাম্রাজ্যের সদস্য, ভারতের মতই আইনতঃ তাহারা সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করে; তথাপি ভারতীয়গণকে নাগরিক অধিকার হইতে তাহারা সযত্নে বঞ্চিত রাখিয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রও বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন এবং বৈদেশিকদিগকে চাহিবামাত্র নাগরিক অধিকার প্রদান করেন না। কাজেই হিন্দুস্থান যদি বাস্তবিকপক্ষে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তাহা হইলে নাগরিক অধিকার লাভ নিয়ন্ত্রণ করিবার, তজ্জন্য বিধিবিধান প্রণয়ন করিবার এবং এমন কি, বৈদেশিক-গণকে নাগরিক অধিকার আদৌ প্রদান না করিবার পরিপূর্ণ অধিকার তাহারও থাকিবে। হিন্দুস্থান অনুমতি না দিলে, হিন্দুস্থানের অন্তর্গত মুসলমানগণ নাগরিক অধিকার লাভে সমর্থ হইবেন না। মিঃ জিন্না অবশ্য স্থির করিয়া লইয়াছেন, হিন্দুদিগকে তাঁহাদের পথে অসুবিধা সৃষ্টি করিতে কোনক্রমেই দেওয়া হইবে না।

দ্বিতীয় প্রস্তাবঃ তাঁহারা সেখানে বৈদেশিকরূপে অবস্থান করিতে পারেন। এক্ষেত্রেও তিনি সেই একই অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের মত হিন্দুস্থানও বৈদেশিকগণকে, বিশেষ করিয়া মুসলমানদের মত সংখ্যা-বহুল বৈদেশিকদিগকে আপন রাষ্ট্রসীমার অভ্যন্তরে অবস্থান করিতে দিতে বাধ্য নয়। ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য, স্বাধীন রাষ্ট্র তাহার অধিকার-সীমার মধ্যে বৈদেশিকগণ কর্তৃক সম্পত্তি আহরণ, বিশেষ করিয়া স্থাবর সম্পত্তি আহরণ প্রয়োজন হইলে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। এ ব্যাপার সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া জাগিয়া আছে।

তৃতীয় প্রস্তাব হইল, যেসব মুসলমান হিন্দুস্থানের মধ্যে পড়িবেন, ইচ্ছা করিলে তাঁহারা পাকিস্থানে চলিয়া যাইতে পারেন। কোন বৈদেশিক যদি এমন

কোন অপরাধে অভিযুক্ত না হন—যাহার জন্য তাঁহাকে বৈদেশিক রাষ্ট্রের বিচারাধীন হইতে হয়, তাহা হইলে তিনি স্বচ্ছন্দে বিদেশী রাষ্ট্র হইতে দেশীয় রাষ্ট্রে ফিরিয়া যাইতে পারেন। হিন্দুস্থানের অধিবাসী মুসলমানগণ ইচ্ছা করিলে পাকিস্থানে চলিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু অনুমতি পাইলেও, গৃহ ও ভূ-সম্পত্তি তাঁহারা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারেন না এবং নগদ টাকা, জহরত, গৃহপালিত পশু ও আসবাবপত্রের মত অস্থাবর সম্পত্তি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার তাঁহাদের অধিকার নাই। তাঁহারা যাহা ফেলিয়া যাইবেন তাহার ক্ষতিপূরণ দিতে হিন্দুস্থান বাধ্য হইবে না; কারণ ভিন্ন জাতির সভ্যপদ স্বীকার করিয়া তাঁহারা স্বেচ্ছায় হিন্দুস্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। হিন্দুস্থানের অধিবাসী মুসলমানগণ যে হিন্দুস্থান হইতে চলিয়া যাইবার এই বিকল্প-প্রস্তাব বাছিয়া লইবেন—সেকথা বিশ্বাস করা কঠিন। ভিটা ও ভূমির প্রতি তাঁহাদের আকর্ষণ এই বিচ্ছেদ-ব্যবস্থাকে অসম্ভব না করিলেও, কষ্টসাধ্য করিয়া তুলিবে। পাকিস্থানে গিয়া পৌঁছিবার জন্য অনেকক্ষেত্রেই তাঁহাদিগকে যে দূরত্ব অতিক্রম করিতে হইবে তাহা সুদীর্ঘ ও তজ্জন্য যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে হইবে তাহা দুর্বহ। পরিশেষে এইরূপ বহির্গমনের ফলে তাঁহাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য এরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে যে, সেই সম্ভাবিত ক্ষতির আশঙ্কাই হইবে এই দুঃসাহসিক পরিকল্পনার পথে প্রধানতম অন্তরায়। সুতরাং, প্রথম দুইটি বিকল্প-প্রস্তাবের মধ্যে যে কোন একটি তাঁহাদিগকে বাছিয়া লইতে হইবে এবং সে নির্বাচন ব্যাপারেও তাঁহাদের স্বাধীনতা থাকিবে না, কারণ তাহার নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণের ক্ষমতা হিন্দুস্থানের বৈদেশিক রাষ্ট্রের হস্তেই ন্যস্ত রহিবে।

দুইজাতিতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত এই সমস্যাসমূহ পাকিস্থানপন্থীদিগকে বিচলিত করে বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুস্থানের অধিবাসী মুসলমানগণ বৈদেশিক বা ভিন্ন জাতীয়রূপেই গণ্য হইবেন এবং তজ্জন্য যে সকল অসুবিধা বহন করা দরকার, তাহা তাঁহাদিগকে বহিতেই হইবে—এই অবস্থা মিঃ জিন্না অঙ্গীকার করিয়াই লইয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার এ ধারণা প্রশ্নাতীত। কিন্তু পাকিস্থানের অন্তর্গত হিন্দু ও অন্যান্য অ-মুসলমান সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে সে ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে না, কারণ তাঁহারা আপনাদিগকে ভিন্ন জাতির সদস্য, সুতরাং ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া দাবী করেন না। তাহা সত্ত্বেও বৈদেশিক-রূপেই তাঁহাদিগকে যদি গণ্য করা হয়, তাহা হইলে মুসলমানদের সহিত তাঁহাদের অবস্থাগত পার্থক্য দাঁড়াইবে এই যে, হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলমান সম্প্রদায়ের স্কন্ধে বৈদেশিকতার বোঝা তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আরোপিত, আর মুসলমানগণ স্বেচ্ছায়, দেখিয়া-শুনিয়া এবং হিন্দু ও অন্যান্য অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিরোধ উপেক্ষা করিয়া সে অবস্থা বাছিয়া লইয়াছেন।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহের সাধারণ নির্বাচন সম্বন্ধে কিছু না বলিলে এই ক্রোড়পত্র অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রত্যেকটি মুসলমান-আসন অধিকার করিয়া অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু এখানে বলিয়া রাখা দরকার, জাতীয় মুসলমানগণ লীগের

বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া গৃহীত ভোটের প্রায় এক-চতুর্থাংশ লাভ করিতে সমর্থ হন। লিপিবদ্ধ মোট মুসলমান ভোটের মধ্যে সিন্ধুতে তাঁহারা পান শতকরা ৩২ ও পাঞ্জাবে শতকরা ৩০টি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে কেন্দ্রীয় পরিষদে মাত্র একজন প্রতিনিধি প্রেরিত হন এবং তিনি নির্বাচিত হন মুসলমান ও অ-মুসলমানদের যৌথ-নির্বাচন দ্বারা। দিল্লী হইতেও একজন মাত্র প্রতিনিধি অনুরূপ উপায়ে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু এই আসনগুলি অধিকৃত হয় কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীদের দ্বারা।

প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলমানদের সংরক্ষিত আসনগুলির জন্য একদিকে যেমন মুসলিম লীগ নিজের প্রার্থী দাঁড় করান, অপরদিকে তেমনি জমিয়ত-উল-উলেমা, মোমিন, অহ্‌রর ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী মুসলমান দল হইতে এবং স্বতন্ত্রভাবেও প্রার্থী মনোনয়ন করা হয়। যেসব প্রদেশ লীগ পাকিস্থানী অঞ্চলরূপে দাবী করে ও নির্বাচন যাহাতে পরিচালিত হয়, সেগুলিতে লীগ কর্তৃক নিম্নলিখিত আসনসমূহ (৫৫নং ছক—৪৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) অধিকৃত হয়ঃ— বেলুচিস্থানে এখনও নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তিত হয় নাই, কাজেই সে প্রশ্ন অবান্তর।

মুসলিম লীগ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও আসামে মন্ত্রি-মণ্ডলী গঠন করিতে সক্ষম হয় নাই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামে কংগ্রেসই ছিল একক ও সুস্পষ্টরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠ, কাজেই উক্ত দুই প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠনের পক্ষে সেই ছিল যথোপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন; এরূপক্ষেত্রে গভর্ণর কংগ্রেসকেই আমন্ত্রণ করিলেন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য এবং তদনুযায়ী কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিল। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস যে কেবল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল তাহা নয়, পরিষদের মুসলিম সদস্যগণের মধ্যেও কংগ্রেসী সদস্য ছিলেন অধিকসংখ্যক। সিন্ধু ব্যবস্থাপরিষদে লীগ-বহির্ভূত মুসলমান ও কংগ্রেসের মিলিত সদস্যসংখ্যা যেখানে ২৯, লীগের সদস্যসংখ্যা সেখানে ২৮ মাত্র। তাহা ছাড়াও যে তিনজন ইউরোপীয় সদস্য ছিলেন, মন্ত্রিসভা গঠন ব্যাপারে তাঁহাদের নীতি ছিল নিরপেক্ষ। গভর্ণর কিন্তু মুসলিম লীগকেই মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিতে আহ্বান করিলেন; তদনুযায়ী লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইল বটে, কিন্তু উক্ত তিনজন ইউরোপীয় সদস্যের সাহায্যেই তাহা টিকিয়া থাকিতে সক্ষম। বাঙলাতেও লীগ মন্ত্রিসভা গঠনে সক্ষম হইয়াছে।

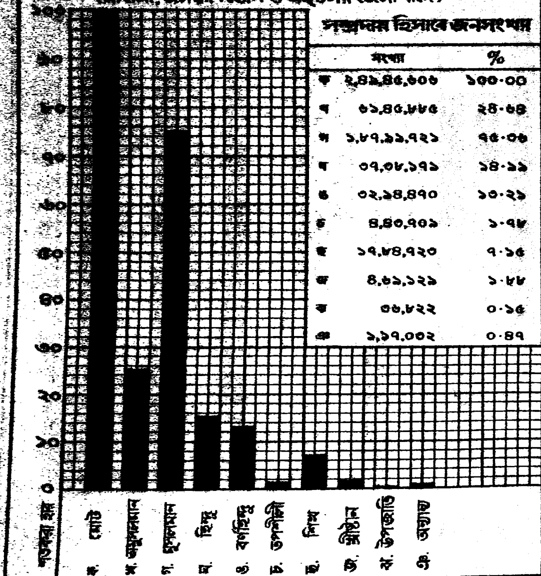
লীগ নেতৃবর্গ ঘোষণা করিলেন, মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের জন্যই তাঁহারা নির্বাচন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হন নাই। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর ও মহত্তর উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই তাঁহারা নির্বাচন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অধিকাংশ মুসলমানই যে পাকিস্থানের পক্ষে—নির্বাচনের ফলাফলের দ্বারা সে কথা সুস্পষ্ট-রূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। উল্লিখিত হিসাব হইতে কিন্তু দেখা যায়, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিকাংশ মুসলমানই পাকিস্থানের বিরোধী। সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশে যথাক্রমে শতকরা ৪৩ ও ৩৪ জন মুসলমান লীগের বিপক্ষে, সুতরাং পাকিস্থানের বিরুদ্ধে। অ-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ আসাম

৫৫ নং ছক

প্রাদেশিক নির্ব্বাচনে মুসলমানদের প্রাপ্ত ভোটের বিশ্লেষণ

প্রদেশ	লীগ-অধিকৃত	লীগ-বহির্ভূত মুসলমানগণ-কর্তৃক অধিকৃত আসন	লীগের প্রাপ্ত ভোট	লীগ-প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	লীগ-বহির্ভূত মুসলমানগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ভোট	লীগ-বহির্ভূত মুসলমানগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৭	২১	১,৪৭,৮৮০	৪১.৪	২,০৮,৮৯৬	৫৮.৫
সিন্ধু	২৬	৮	১,৯৯,৬৫১	৫৬.৮	১,৫২,২০৫	৪৩.২
পাঞ্জাব	৭৩	১৩	৬,৭৯,৭৯৬	৬৫.১	৩,৫৮,২০৫	৩৪.৯
আসাম	৩১	৩	১,৮৮,০৭৯	৬১.০	৮৪,৪৫৩	৩৯.০

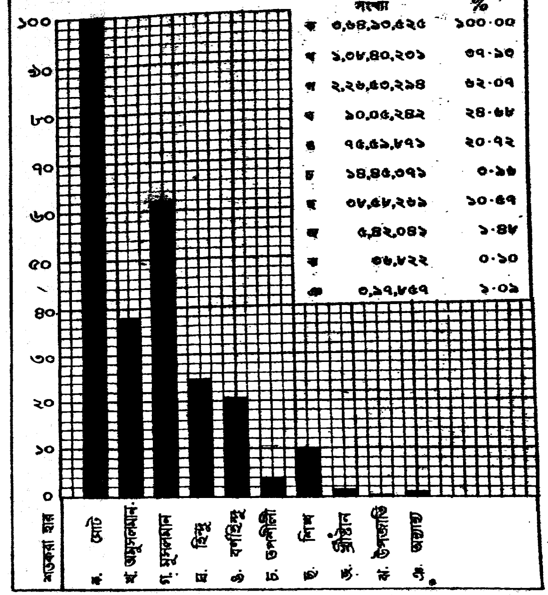
পাকিস্তান — উঃ পঃ অঞ্চল
(জেলা হিসাবে)
সিন্ধু, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও পাঞ্জাব
(আম্বালা, জলন্ধর বিভাগ ও অমৃতসর জেলা বাদে)



সম্প্রদায় হিসাবে জনসংখ্যা

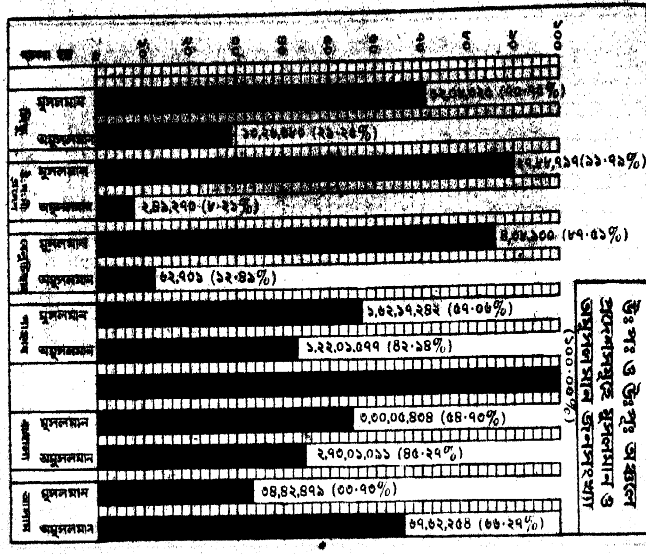
	সংখ্যা	%
ক	২,৪৯,৪৫,৬০৬	১০০·০০
খ	৬১,৪৩,৮৮৫	২৪·৬৪
গ	১,৮৭,৯৯,৭২১	৭৫·৩৬
ঘ	৩৭,০৮,১৭১	১৪·৯৯
ঙ	৩২,৯৪,৪৭০	১৩·২৯
চ	৪,৪৩,৭০৯	১·৭৮
ছ	১৭,৮৪,৭২৩	৭·১৫
জ	৪,৬৯,১২৯	১·৮৮
ঝ	৩৬,৮২২	০·১৫
ঞ	১,১৭,০০২	০·৪৭

পাকিস্তান — উঃ-পঃ অঞ্চল (প্রদেশ হিসাবে)
(সিন্ধু, উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও পাঞ্জাব)

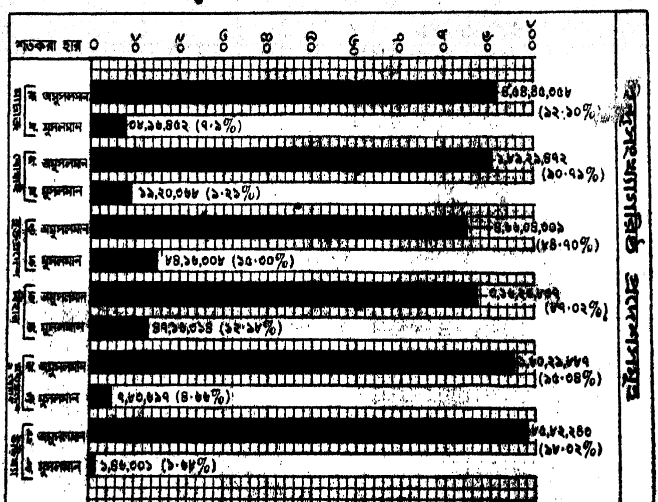


সম্প্রদায় হিসাবে জনসংখ্যা

	সংখ্যা	%
ক	৩,৬৪,৯০,৫২৫	১০০·০০
খ	১,০৮,৪০,২০১	৩৭·১০
গ	২,২৬,৫০,২৯৪	৬২·০৭
ঘ	৯০,০৫,২৪২	২৪·৬৮
ঙ	৭৫,৫৯,৮৭১	২০·৭২
চ	১৪,৪৫,৩৭১	৩·৯৬
ছ	৩৮,৫৮,২৬৯	১০·৫৭
জ	৫,৪২,০৪১	১·৪৮
ঝ	৩৬,৮২২	০·১০
ঞ	৩,৯৭,৮৫৭	১·০৯

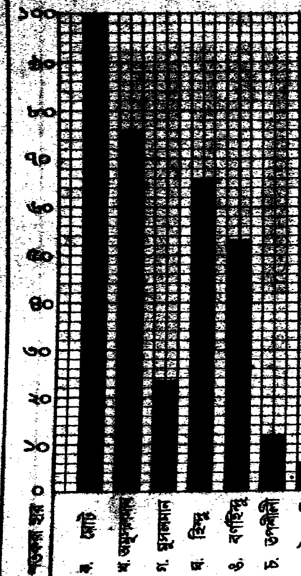


উঃ পঃ ও উঃ পূঃ অঞ্চলে প্রদেশসমূহে মুসলমান ও অমুসলমান জনসংখ্যা
শতকরা হার
মুসলমান
অমুসলমান



শতকরা হার ০ ১০ ২০ ৩০ ৪০ ৫০ ৬০ ৭০ ৮০ ৯০ ১০০
অমুসলমান
মুসলমান

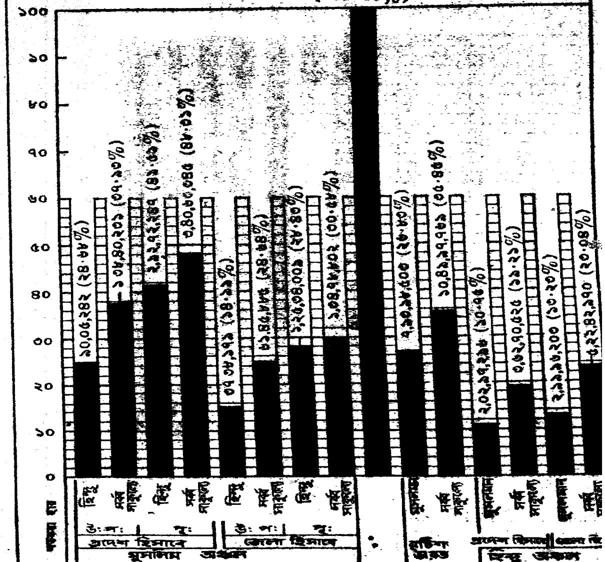
ভারতবর্ষ (বৃটিশ ও দেশীয় রাজ্য)



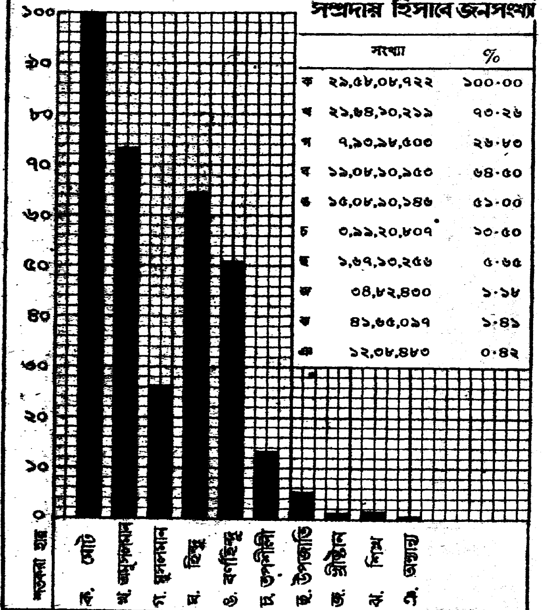
সম্প্রদায় হিসাবে জনসংখ্যা

	সংখ্যা	%
ক	৩৮,৮৬,৬৬,৫২০	১০০·০০
খ	২৯,৪৬,০৮,৫২৭	৭৬·১৯
গ	৯,২০,৫৮,০৯৬	২৩·৮১
ঘ	২৫,৪৯,০০,৫০৬	৬৫·৯০
ঙ	২০,৬২,১৭,০২৬	৫৩·০১
চ	৪,৮৮,১০,১৮০	১২·৬২
ছ	২,৫৪,৪১,৪৮৯	৬·৫৮
জ	৬০,১৬,৫৪৯	১·৬০
ঝ	৫৬,৯১,৪৪৭	১·৪৭
ঞ	২২,২৮,৫৩৬	০·৫৭

ভারতবিভাগের পর মুসলমান ও অমুসলমান অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের তুলনামূলক হিসাব



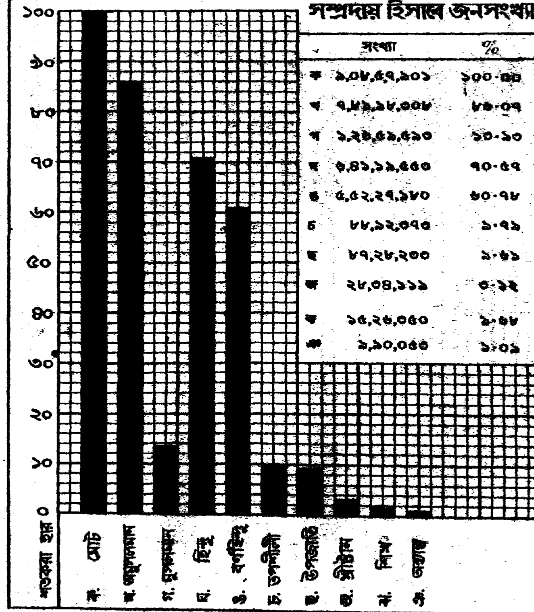
ব্রিটিশ ভারত



সম্প্রদায় হিসাবে জনসংখ্যা

	সংখ্যা	%
ক	২৯,৫৮,০৮,৭২২	১০০·০০
খ	২১,৬৪,১০,২১৯	৭৩·২৬
গ	৭,৯৩,৯৮,৫০০	২৬·৮০
ঘ	১৯,০৮,১০,৯৫৩	৬৪·৫০
ঙ	১৫,০৮,৯০,১৪৬	৫১·০০
চ	৩,৯৯,২০,৮০৭	১৩·৫০
ছ	১,৬৭,১৩,২৫৬	৫·৬৫
জ	৩৪,৮২,৪০০	১·১৮
ঝ	৪১,৬৫,০৯৭	১·৪১
ঞ	১২,০৮,৪৮৩	০·৪২

দেশীয় রাজ্য

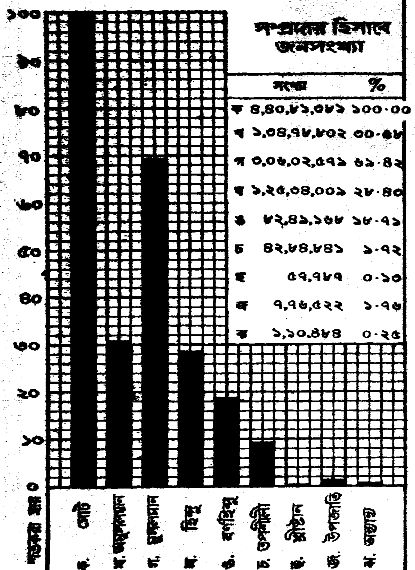


সম্প্রদায় হিসাবে জনসংখ্যা

	সংখ্যা	%
ক	৯,০৮,৫৭,৯০১	১০০·০০
খ	৭,৮৯,১৮,০০৮	৮৬·০৭
গ	১,২৬,৫৯,৫৯০	১৩·৯৩
ঘ	৬,৪১,১৯,৫৫০	৭০·৫৭
ঙ	৫,৫২,২৭,১৮০	৬০·৭৮
চ	৮৮,৯২,৩৭০	৯·৭৯
ছ	৮৭,২৮,২০০	৯·৬১
জ	২৮,৩৪,১১১	৩·১২
ঝ	১৫,২৬,০৫০	১·৬৮
ঞ	৯,১০,০৫০	১·০১

পাকিস্তান - পূর্ব অঞ্চল (জেলা হিসাবে)

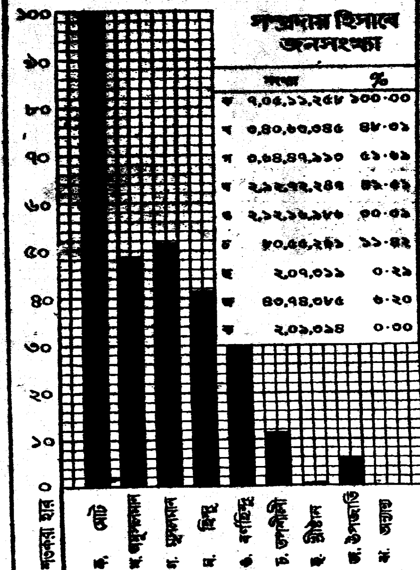
বাংলাদেশ —বর্তমান বিভাগ ও ২৪ পরগনা, কলিকাতা, খুলনা, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা বাদে।
আসাম — কেবল সিলেট জেলা।



সম্প্রদায় হিসাবে জনসংখ্যা

	সংখ্যা	%
ক	৪,৪০,৮১,০৮১	১০০·০০
খ	১,০৪,৭৮,৮০২	৩০·৫৮
গ	৩,০৬,০২,৫৭৯	৬৯·৪২
ঘ	১,২৫,০৪,০০৯	২৮·৪০
ঙ	৮২,৪৯,১৬৮	১৮·৭১
চ	৪২,৮৪,৮৪১	৯·৭২
ছ	৫৭,৭৮৭	০·১৩
জ	৭,৭৬,৫২২	১·৭৬
ঝ	১,১০,৪৮৪	০·২৫

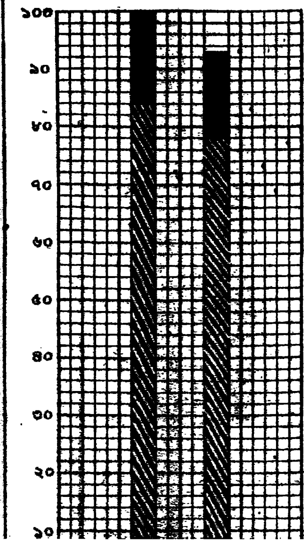
পাকিস্তান - পূর্ব অঞ্চল
প্রদেশ হিসাবে
(বাংলা ও আসাম)



সম্প্রদায় হিসাবে জনসংখ্যা

	সংখ্যা	%
ক	৭,০৫,১১,২৫৮	১০০·০০
খ	৩,৪০,৬৭,০৪৫	৪৮·০১
গ	৩,৬৪,৪৭,৯১০	৫১·৬৯
ঘ	২,১৬,৭৭,২৪৭	৩০·৭৪
ঙ	২,১২,১৬,৯৮৬	৩০·০৯
চ	৮০,৫৫,২৬১	১১·৪২
ছ	২,০৭,০১১	০·২৯
জ	৪০,৭৪,০৮৫	৫·২০
ঝ	২,০১,০১৪	০·৩০

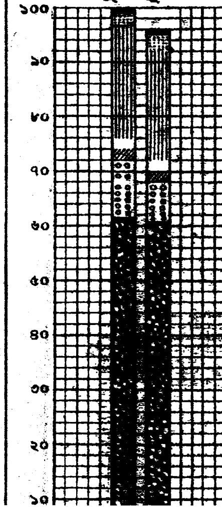
দৈনিক নিযুক্ত শ্রমিকের গড়পড়তা হার হিসাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহ



	ব্রিটিশ ভারত		হিন্দু অঞ্চল		মুসলিম অঞ্চল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
স্থায়ী	১,৩১,০৬৬	৭·৪৮	১,০৩,১২৩	৫·৯০	২৭,৯৪৩	১·৬০
মরসুমী	১,০৮০	০·০৮	১,০২৩	০·০৬	৩৫৭	০·০২
স্থায়ী	১৩,২৯,২৪৮	৭৫·৯১	১২,৫৯,৩৫৮	৭১·৯১	৬৯,৮৯০	৩·৯৯
মরসুমী	২,৮৯,৪৪৩	১৬·৫৩	২,৫৮,৭৯৬	১৪·৭৮	৩০,৬৪৭	১·৭৫

খনিজ পদার্থের উত্তোলন (মূল্য হিসাবে)

ব্রিটিশ ভারতে ও তাহার মুসলমান ও অমুসলমান অঞ্চলে (১৯৩৮)



ব্রিটিশ ভারত		হিন্দু অঞ্চল		মুসলিম অঞ্চল	
টাকা	%	টাকা	%	টাকা	%
১,৪৬,৩০,৭১৮	৬১·৬০	১,৩৫,১৮,০৫০	৬০·৭৮	১১,১২,৬৬৮	০·৭২
১,৬৫,৪০,১৪২	১০·৭৬	১,১২,৬৪,৭৮৭	৭·৩৩	৫২,৭৫,৩৫৫	৩·৪৩
৩২,৪০,৬৫০	২·১০	৩২,৪০,৬৫০	২·১০	...	...
২৬,৯১,৮২৯	১·৭৫	২৬,৯১,৮২৯	১·৭৫	...	...
৩,২০,১০,৭০৯	২০·৮৬	৩,২০,১০,৭০৯	২০·৮৬	...	...
৪০,৮১,৪৮৮	২·৭০	৪০,৮১,৪৮৮	২·৭০	...	...
৫,৬০,৮১৮	০·৩৭	২,৩৪,৮০৪	০·১৬	৩,২৬,০১৪	০·২১

প্রদেশের মুসলমানগণের মধ্যেই শতকরা ৩১ জন পাকিস্থান-বিরোধী। ইহা যখন লেখা হইতেছে তখন পর্যন্ত বাঙলার সংখ্যা পাওয়া যায় নাই বলিয়া তাহা দেওয়া সম্ভব হইল না। যে-সব প্রদেশ লীগের পাকিস্থান দাবীর অন্তর্গত নয়, তথাকার হিসাব-নিকাশের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন; বৈদেশিক যুগে অন্যত্র মুসলমানদের মতামত সেই প্রদেশস্থ মুসলমানদের পক্ষেই প্রযোজ্য হইবে, তাহার বাহিরের নয়। এস্থলে একথাও বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, যে-সব প্রদেশ বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থন করা হইয়াছে, এই প্রস্তাবিত বিভাগ-ব্যাপারে সেখানকার অ-মুসলমানদের অভিমত ব্যক্ত করিবার অধিকার যদি স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। যদি সেই সকল প্রদেশের পাকিস্থান-বিরোধী মুসলমান ভোটের সহিত অনুরূপ অ-মুসলমান একত্র করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, সমষ্টিগতরূপে সমগ্র প্রদেশ পাকিস্থানের বিরুদ্ধে এবং প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচনফল সেক্ষেত্রে পাকিস্থানের পক্ষে না গিয়া, বিপক্ষেই যাইবে।

Date of return.	Date of Return.	Date of return.	Date of return.
21.7.64			
23.2.71			
6/5/71			
28/6/71			
1/7			